রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আমার জীবন-যাত্রা

তৃতীয় খণ্ড

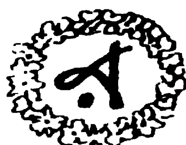
সম্পাদনা

সতীশ মিশ্র

সৈকত রক্ষিত

অনুবাদ

শুকতারা মিত্র



রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

Amār Jiban-Yatra, Bengali Translation of
Rahul Sankrityayana's *Meri Jiban-Yatra*

প্রচ্ছদ
স্বপন রুদ্র

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৫৫

ফটোটাইপসেটিং
আই· ই· আর· ই
২০৯ এ, বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশনা
ভুবন ভট্টাচার্য
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বিষয়-সূচি

ষষ্ঠ পর্ব

কৃষক মজুরদের জন্যে

সপ্তম পর্ব

রাশিয়ায়

ষষ্ঠ পর্ব

কৃষক-মজুরদের জন্য

১৯৪২-১৯৪৪

‘পার হওয়ার জন্য ভেলার মতো আমি ভাবনাগুলিকে গ্রহণ করেছি,
মাথায় বয়ে বয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়।’

বাইরের দুনিয়ায়, ১৯৪২-৪৩

আমি যখন ২৪ জুলাই পাটনা পৌঁছলাম তখন সুনীল, কার্যানন্দ এবং অন্যান্য সাথীরা প্রাদেশিক পার্টি অফিসে উপস্থিত ছিল। প্রথমে বাইরের অবস্থাটা দেখার দরকার ছিল। ২৬ জুলাই সোনপুর পৌঁছলাম। স্বাগত জানান হলো, একটা ছোটমত সভাতে বক্তৃতা দিতে হলো। ২৭ জুলাই ছাপরাতেও গেলাম। সন্ধেবেলা টাউন হলের প্রাঙ্গণে সভা হলো। বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতা যখন শেষের দিকে তখন কিছু লোক চেঁচামেচি করতে শুরু করল। এও দেখলাম যে কিছু কংগ্রেসী নেতা কমিউনিস্টদের বিরোধিতায় বিশেষভাবে অংশ নিচ্ছিল।

পরের দিন কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তিন ঘণ্টা কাটালাম। ওরা জানাল যে নতুন প্রজন্মের ভেতরে নতুন মতবাদ দ্রুতগতিতে প্রবেশ করছে। সিওয়ান কলেজের মাঠে বক্তৃতা এবং কথাবার্তায় (২৯ জুলাই) এই ধারণা আরও দৃঢ় হলো। আজিজ সাহেবের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হলো। তাঁর স্নেহ আগেকার মতই সজীব ছিল। ৩১ তারিখ পাটনায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ছিল। তার সদস্যরূপে আমারও যোগদান করার কথা ছিল। ৩০ জুলাই যখন আমি দীঘাঘাট থেকে জাহাজে করে পাটনা যাচ্ছিলাম, কিছু পুরনো পরিচিত কংগ্রেসীও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। একজন বলছিলেন যে এত বড় একটা যুদ্ধ শুরু করার কথা কংগ্রেসীরা বলছে কিন্তু দেশ তো তার জন্যে প্রস্তুত নয়। যদিও কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত এরকম কোনো প্রস্তাব পাস করেনি কিন্তু এবারকার সংঘর্ষে রেলের স্লীপার উপড়ে ফেলা হবে, তার কেটে দেওয়া হবে, কাছারিগুলো দখল করা হবে ইত্যাদি কথা জোর ছড়িয়েছিল। আমার বন্ধুও বলছিলেন যে, এত বড় কাজের জন্যে যে শক্তিশালী সংগঠন এবং অনুশাসনের দরকার, তার জন্যে জনতাকে তৈরি করা হয়নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি তৈরি করা হতো তাহলে কি এটা করা ঠিক হতো?' তিনি বললেন, 'হয়ত—কিন্তু আপনার কি মত?'

আমি বললাম, 'এটা ঠিক নয়। এরকম করলে পৃথিবীর যে সব শক্তি আমাদের স্বাধীন দেখতে চায় তাদের সহানুভূতি হারাব।' এই সময় রেল এবং তার কাটার সময় উদ্দেশ্য জাপানীদের ভারতের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যারা কোরিয়া এবং চীনে জাপানের খুনী শাসকদের ইতিহাস পড়েনি তারাই আশা করতে পারে যে জাপান ভারতকে স্বাধীনতা দেবে।'

আমাদের সঙ্গে হাজিপুরের কাছে কোনো একটি গ্রামের এক যুবক যাচ্ছিল। সে পাটনার বিদ্যুৎ কোম্পানিতে কাজ করত। সে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও পর্যন্ত আমরা টাকা-পয়সা বাড়িতে রাখি। এখন চুরি-ডাকাতি খুব বেড়ে গেছে। আমাদের টাকা-পয়সা কি তাহলে ব্যাঙ্কে রাখা উচিত, নাকি উচিত নয়?' আমি বললাম, 'ব্যাঙ্কে টাকা বেশি সুরক্ষিত থাকবে।'

সে কখনও সত্যাগ্রহতে অংশ নেয়নি, জাতীয় আন্দোলনের ওপরও ওর কোনো সহানুভূতি ছিল না। যখন রেল-তার কাটার কথা হচ্ছিল সে খুব খুশি হচ্ছিল এবং বলছিল, 'এ তো বেশ ভালোই হবে—নইলে ইংরেজ এখান থেকে যাবে কিভাবে?'

আমি বললাম, 'রেল-তার কাটা হলে পাটনা থেকে আপনার গ্রাম বহু দূর হয়ে যাবে। তখন মাসে দুবার নয়, ছয় মাসে একবারও বাড়ি যাওয়া মুশকিল হবে।' বেচারা এই কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। আমি বললাম, 'ঘাবড়ানোর জন্যে বলছি না, আর এও বলছি না যে দেশের স্বাধীনতার কারণে জনগণের চরম আত্মত্যাগের জন্যে তৈরি হয়ে থাকার দরকার নেই। প্রশ্ন হলো যে, যদি একটা সরকারকে হারাতে হয়, তাহলে ওর জায়গায় আরেকটা সরকারের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। এটা বললে চলবে না যে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি আর যাদের সামলাবার দায়িত্ব তারা সামলাবে। সামলাবার দায়িত্ব যাদের তারা সামলাবে না উপরন্তু যদি শাসনযন্ত্র আপনার হাতে না থাকে তাহলে এর পরিণাম হবে লুটপাট এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি।'

এরপর আমি এও বললাম যে যুদ্ধের সময় এই রকম করলে আমরা দুনিয়ার সহানুভূতি হারাব এবং ইংরেজ-টোরিদের[১] নির্বিচারে আমাদের দমন করার সুবিধে করে দেব।

৩১ জুলাই সদাকত আশ্রমে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ছিল। সমস্ত জেলা থেকে লোক একত্রিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রবাবু এখন ওয়ার্ধা থেকে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'আমি আপনাদের কোনো প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের জন্যে পীড়িত করিনি, যে অন্তিম যুদ্ধের জন্যে আমাদের এখন ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেই বিষয়ে আপনাদের অবগত করতে চাই।' এর পর তিনি প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন যার সারমর্ম হলো যে কংগ্রেস সর্বস্ব বাজি রাখতে চলেছে। কংগ্রেস তার ৫২ বছরের জীবনে এরকম পদক্ষেপ আগে কখনও নেয়নি। সত্যাগ্রহ যা হবে তাতে সবরকম সুযোগ-সুবিধে ও পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অহিংসা ছাড়া আর কোনো বন্ধন থাকবে না। সেই সময় পথ দেখাবার জন্যে কংগ্রেসও থাকবে না, কংগ্রেস নেতাও থাকবে না। তখন সবাইকে নিজের নেতা নিজেকে হতে হবে। তখন হিন্দু-মুসলমানের আপোষ পরে, আগে স্বাধীনতা।

জেলা থেকে আসা লোকেরা জানাল যে এত বড় সংঘর্ষের জন্যে দেশ তৈরি নয়।

অধিবেশনের পর রাজেন্দ্রবাবু প্রত্যেক জেলার সদস্যদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে

[১] ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় চার্লস-এর শাসনকালে ইঅর্কের ডিউককে (অর্থাৎ দ্বিতীয় জেমসের) সমর্থক দল বা রক্ষণশীল রাজনীতিক।—স.ম.

কথা বললেন, তাতে তাঁর বক্তব্য তিনি আরো স্পষ্ট করলেন এবং বললেন, 'অহিংসা তথা সদাচার বিরোধী কোনো কাজ যেন করা না হয়। অন্য কাজ তোমরা করতে পার।'

ওখান থেকে ফিরে আসার পর সন্ধেবেলায় আমি 'হিন্দুস্তানী প্রেস'-এ গেলাম, সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, 'রেল লাইন আর তার কাটবে, লুটপাট হবে এবং চোখ বুঁজে সরকার দমন করবে।' সেইদিনই স্বামী সহজানন্দজীর সঙ্গে কথা হলো। তিনি 'হুঙ্কার'-এর সম্পাদনার ভার আমায় নিতে বললেন যা আমাকে ৮ ডিসেম্বর অব্দি বহন করতে হয়েছিল।

কলকাতায় (১-৩ আগস্ট)—সেইদিন রাত্রের গাড়িতে আমি কলকাতার জন্য রওনা হলাম। পরের দিন (১ আগস্ট) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বৈধতা পাওয়া উপলক্ষে উৎসব এবং প্রদর্শনী ছিল। বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও প্রদর্শনীস্থলে অনেক মজদুর, ছাত্র এবং মহিলারা একত্রিত হয়েছিল। টাউন হলে কেমন করে হাজার কুড়ি লোকের জায়গা হত? স্বেচ্ছাসেবকরা সুষ্ঠুভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। আমায় এই সভার সভাপতিত্ব করার ছিল। কলকাতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আটত্রিশ বছরের। সত্যাগ্রহের সময় আমি কলকাতাকে দেখেছিলাম। যদিও এমন নয় যে এত বড় প্রদর্শনী আগে কখনও হয় নি এর চেয়েও বড় বড় প্রদর্শনী হয়েছে, কিন্তু এবারে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যাতে আমি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারিনি। একদিকে আমাদের সেই সব সুযোগ্য এবং আত্মত্যাগী বাঙালী তরুণরা ছিল, যারা নবীন ভারতের ইতিহাসের প্রথম প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করেছিল এবং স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে শিখিয়েছিল। অন্যদিকে ট্রাম, কর্পোরেশন এবং কারখানার কয়েক হাজার মজদুর ছিল, যারা মজদুরদের স্বার্থে মজদুরদের ওপর অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে কতই না সংগ্রাম করেছিল। আরেকদিকে আমি দেখলাম যে উত্তর ভারতের মজদুরদের সঙ্গে বাঙালী দেশসেবকদের যে ভীষণ একটা বিভেদ ছিল তার অবসান হয়েছে। এই প্রদর্শনী এবং সভাকে দেখে লোকে কি করে নৈরাশ্যবাদী হয়ে থাকতে পারে? আমি কলকাতায় তিনদিন ছিলাম। এই সময় সেখানকার বিদ্বৎজন এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। দেখলাম সাম্যবাদ ওদের খুব প্রভাবিত করেছে। বিহার এবং যুক্তপ্রান্তের মজদুরদের সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম পার্টি কেমন করে ওদের আত্মচেতনায় সমৃদ্ধ করছে।

৪ আগস্ট আমি কলকাতা থেকে রওনা হলাম এবং ঐদিনই পাটনা পৌঁছলাম। ৫ আগস্ট খবরের কাগজে পড়লাম যে এলাহাবাদের কংগ্রেস দপ্তরে পুলিশ তল্লাসী চালিয়েছে, ওখানকার প্রচুর কাগজপত্র তুলে নিয়ে গেছে এবং তার মধ্যে থেকে সরকার বহু কিছু খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে। এটার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে পৃথিবীর জনগণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের সঙ্গে আপস করার জন্যে যাতে চাপ না দেয়। কেবল আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ভারতকে স্বাধীনতা পাইয়ে দিতে পারবে না কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে সেটারও আমাদের বিশেষ দরকার ছিল।

৫ আগস্ট গয়া জেলার মখদুমপুরের কাছে সতীস্থানে গেলাম। ওখানকার কৃষকদের

ওপর জমিদারদের খুব অত্যাচার চলছিল। কৃষকদের ১০০ বিঘে জমি পতিত হয়ে পড়েছিল। একদিকে সরকার দেড়-দুহাজার মণ শস্য উৎপাদনক্ষম এই জমি পতিত রাখতে সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে 'বেশি শস্য উৎপাদন কর' বলে প্রচার করছিল। এটা কি পরস্পরবিরোধী ব্যাপার ছিল না? গ্রামের ৩১ জন লোক জেলে ছিল। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা এমন যাকে দমন করে রাখা যায় না। জনতা দুহাজারের কম ছিল না। স্বামীজি, আমার এবং পণ্ডিত যদুনন্দন শর্মার বক্তৃতা হলো।

৬ আগস্ট পাটনাতেও পার্টির বৈধতা পাওয়ার আনন্দে সভা হলো। এখানে বারো-তেরজন গান্ধীবাদী ছাত্র সভায় গোলমাল করার চেষ্টা করেছিল। এখন বোঝা যাচ্ছিল যে, কমিউনিস্ট পার্টি যতই বাড়তে থাকবে ওর বিরোধীরা ততই অকেজো হতে থাকবে।

৭ আগস্ট আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ঘোষণা করে 'হুঙ্কার'-এর সম্পাদনার ভার নিজে নিলাম। তার জন্যে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং টীকা লিখলাম। ৯ আগস্ট আমি নৌগাছিয়ায় (ভাগলপুর) সভার জন্যে গিয়েছিলাম। জেলা-ছাত্রসভার উৎসবের আমি সভাপতি ছিলাম। সভা ভালভাবেই হলো, ইন্দ্রদীপের বক্তৃতা এই প্রথম শুনলাম। ইন্দ্রদীপ ছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্রদের মধ্যে একজন। এম·এ-তে সে প্রথম স্থান পেয়েছিল এবং না চাইতেই রাজেন্দ্র কলেজ ওকে অর্থশাস্ত্রের প্রোফেসারের পদে নিযুক্ত করেছিল। পাটনা কলেজও ওকে লেকচারার করতে চেয়েছিল কিন্তু সে দেশসেবাকে নিজের লক্ষ্য স্থির করায় সেটা গ্রহণ করেনি। যে-সময় পার্টির ওপর প্রচণ্ড দমন হচ্ছিল, সেই সময় ইন্দ্রদীপ পার্টিকে খুব সামলে ছিল। আমি ইন্দ্রদীপের লেখা পড়েছিলাম, যার থেকে বোঝা গেল যে ওর কলমে খুবই জোর আছে। এখানে ওর বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারলাম, ভাষার ওপরেও ওর দখল আছে।

নৌগাছিয়া থেকে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল যে কংগ্রেস কার্যনির্বাহকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গান্ধী, নেহেরু, আজাদ এখন জেলে ছিলেন। জেলে ভীষণ উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল।

আগস্টের ঝড়—১০ তারিখ দুপুরে ছাপরা পৌঁছলাম। খবর পেলাম, গতকালও ছাত্ররা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছিল। আজও ওদের একটা বড় মিছিল বেরোল। জানতে পারলাম যে এখন পর্যন্ত এই জেলার ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে। কয়েকজন দেশভক্ত আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বললাম 'প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জাপানের লাভ হয় এমন কাজ আমরা করবো না। সেইসঙ্গে আমলাতন্ত্রের হাতের হাতিয়ারও আমরা হব না। লোকের মধ্যে প্রচুর উদ্দীপনা রয়েছে। অব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে এবং আমলাতন্ত্র এটা চাইবে।'

১১ আগস্ট পাটনা পৌঁছলাম। এখানেও প্রবল উত্তেজনা ছিল। ছাত্রদের মিছিল বেরোচ্ছিল। আমেদাবাদ, বোম্বাই, পুনায় গুলি চলেছে, এই খবর আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল। দুপুরের পর মিছিল বের হলো। কমিউনিস্ট ছাত্ররা বোঝাবার চেষ্টা করছিল এবং

এখন পর্যন্ত ওরা সফল ছিল কিন্তু গুলি করার খবর তরুণদের খুবই উত্তেজিত করেছিল। তাই ওরা এখন কিছু করে ফেলতে চাইছিল। একটা বড় মিছিল সেক্রেটরিয়েটের দিকে গেল। সেখানে দশ হাজার লোকের ভিড় হয়ে গেল। গুলি চলল। তিনজন লোক সেখানেই মারা গেল এবং অনেকেই আহত হলো। সন্ধেবেলায় একজন ছাত্র এল। দেখলাম ওর জামা রক্তের দাগে ভরা। সে বললে যে, আহতদের রিক্সায় তোলার সময় কাপড়ে রক্ত লেগে গেছে। মাঝরাত্তিরে সাতটা (?)[১] মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বের করা হলো। এমন কেউ ছিল না যে এই তরুণদের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেনি। মাঝে মাঝে আলো ছিল, মৃতদেহগুলো ফুল দিয়ে সাজান ছিল এবং অগুনতি লোক পেছন পেছন যাচ্ছিল। সবাইকার চোখে ক্রোধ ছিল আর মনে ছিল ক্ষোভ। এই দৃশ্য মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল।

১২ তারিখে সারাদিন হরতাল পালন করা হয়েছিল বললে পাটনার বর্ণনা পুরোপুরি দেওয়া হয় না। সেদিন পাটনা শহরে ইংরেজ রাজত্ব ছিল না। রিক্সা এবং এক্কা চলছিল না। ছাত্ররা এখন আর নেতৃত্ব দিচ্ছিল না। রিক্সা, এক্কাচালক এবং এই শ্রেণীরই লোকেদের হাতে নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল, যাদের রাজনীতি সম্বন্ধে শুধু এইটুকু ধারণা ছিল যে, ইংরেজ হচ্ছে আমাদের শত্রু। চন্দ্রশেখর এবং অন্যান্য কমিউনিস্টরা ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল কিন্তু এরা ওদের ইংরেজের দালাল মনে করছিল। আমিও কয়েকটা হোটেলে গিয়েছিলাম। কোনো ফল হয়নি। দুপুরের পর মিছিল বেরোল কিন্তু তাতে কোনো নেতৃত্ব ছিল না।

এক বিশাল সভা হলো। কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা রাষ্ট্রবিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে লোকেদের উৎসাহিত করল। শ্রোতারা বলল, 'লেকচার শোনার দরকার নেই, চলো আমরা কাজ করি।' তারপর শহরের তার কাটা হতে লাগল। আমি যে বাড়িতে থাকতাম তার পাশে একটা তারের খুঁটি ছিল। একজন লোক তার ওপরে চড়ে চীনেমাটির তৈরি বাটিগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে দিল। আমি এবং পণ্ডিত যদুনন্দন শর্ম্মা কৃষকসভা কার্যালয়ের ছাতে বসে এইসব দৃশ্য দেখছিলাম। পোস্ট অফিসে আগুন লাগানো হচ্ছিল, চিঠির বাক্স ভেঙে ফেলা হচ্ছিল। দোকানদাররা খুব খুশি ছিল। কয়েদীভর্তি লরিকে লোকেরা আটকে কয়েদীদের ছেড়ে দিল। রাজেন্দ্রবাবুর কথামত সব কিছু ঘটছিল। সেখানে প্রত্যেকে নিজের নেতা। আমি দেখছিলাম যে লোকেদের মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব বস্তুত এমন একটা মহাভাব এনে দিয়েছিল যার মধ্যে স্বার্থের কোনো নামগন্ধ ছিল না। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ওপর ইঁট রেখে দেওয়া হয়েছিল যাতে যুদ্ধের লরি ওদিক দিয়ে না যেতে পারে। এটা অবশ্য একেবারেই ছেলেমানুষী ব্যাপার। যুদ্ধের লরিকে দুর্গ কিংবা খালও থামাতে পারে না। রাতের অন্ধকারে পথচারীর পা নিশ্চয়ই ভাঙত কিন্তু রাত্তির একটা পর্যন্ত আমি দেখলাম একজন স্বেচ্ছায় লোকেদের বলছিল, 'কৃপা' করে এই দিক

[১]সম্ভবত মৃতের সংখ্যার ব্যাপারে লেখক নিঃসন্দেহ ছিলেন না, তাই বন্ধনীর ভেতরে এই প্রশ্নচিহ্নটি ব্যবহার করেছেন।—স·ম·

দিয়ে আসুন। 'কৃপা' শব্দটা বিশেষভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। কেননা এখন পর্যন্ত গ্রাম্য অশিক্ষিত জগতে এই ধরনের শব্দের ব্যবহার ছিল না।

বিপ্লব তো হলো না, কেননা তার জন্যে চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু সেখানে বিপ্লবের আবহাওয়া যে রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। শহরের জনশক্তি পুরনো শাসনতন্ত্রকে শেষ করে দিয়েছিল—কেবল শেষই করেছিল, সেই খালি জায়গা পূরণ করেনি। যদিও ছাত্ররা শহরের কর্মীদের উত্তেজিত করে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল, তবে তারা নিজেরা এদের কোনো পথ দেখাচ্ছিল না।

পরের দিন (১৩ আগস্ট) এক ভদ্রলোক খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলছিলেন, 'এবার বিপ্লব বিস্তার করবে। ছাত্রেরা গ্রামের দিকে যাবে এবং সেখানেও আগুন জ্বলবে। গান্ধীজী সবকিছুই জানতেন।'

এক বাঙালী ভদ্রলোক বলছিলেন, 'এ তো অভূতপূর্ব অরাজকতা। স্বরাজ্যও তো শেষ অব্দি রাজ্য হয়, অরাজ্য নয়। আপনি অগ্নিকাণ্ড থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন।' চেষ্টা তো চলছিল কিন্তু সরকারের দমনের সংবাদ খবরের কাগজে ছাপার পর যখন সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল, তখন উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল।

১২ আগস্ট সকাল পর্যন্ত পাটনায় রাস্তার তার কাটা হয়নি। কিন্তু সেই সময় খবরের কাগজে অন্যান্য শহরের রাস্তার তার কাটার খবর বেরোয়। আমি বললাম, 'এবার পাটনাতেও তাই হতে যাচ্ছে।' লোকেরা এই খবর থেকে শিক্ষা পেল এবং ঐ দিনই পাটনাতেও রেলের তার কাটা হলো।

সন্ধে নাগাদ উত্তেজনা কমে আসছিল। বেচারা এক্কা এবং রিকশা চালকেরা দিন আনে দিন খায়। দুদিন ওরা বিপ্লবের লড়াই-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু তাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি সেদিনের ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'আজ সন্ধেয় প্লাবন (উত্তেজনা) নিচের দিকে যাচ্ছে।' গ্রামে গ্রামে জমিদার, মহাজন এবং বেনেদের লুঠ করার প্রস্তাব উঠবে।··· এই সব দেখে আফশোশ হয়। যে অধিকার গতকাল ওরা হাতে পেয়েছিল তা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারতো।'

১২ তারিখের রাত্তিরে আন্দোলনকারীরা চাইলে লোকের কাছ থেকে দশ-বিশ লাখ টাকা, হাজার-হাজার মণ শস্য, সংগ্রহ করতে পারতো এবং তাই দিয়ে রিকশা ও এক্কা চালক এবং অন্যান্য কর্মীদের খাবার ব্যবস্থা করে ওদের অনেকদিন পর্যন্ত হরতালে সামিল রাখতে পারতো—যদিও এটা ঠিক যে ট্যাঙ্ক এবং মেশিনগান এসে গেলে ওদের টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে সেই রাত্তিরে যদি চাওয়া হতো তাহলে কাগজ বিক্রেতারা হাজার-হাজার মণ কাগজ দিত। প্রেস বিনা পয়সায় ওদের বিভিন্ন ঘোষণা এবং ছাড়পত্র ছেপে দিত। কিছুদিন পর তারা যদি অসফল হতোও, তাহলেও একটা সংগঠিত সরকার গঠন করে তার ব্যবস্থা পত্রগুলো ছাপিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটা চিহ্ন রেখে যেতে পারতো। কিন্তু আমাদের নেতারা ভেবেছিল যে প্রত্যেক লোক নিজেই নিজের নেতা হোক, ব্যাস এটাই বিপ্লব। আমার সামনে যা সব ঘটনা ঘটছিল তা দেখে আমার মনে আরও বেশি দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবে যে, বিপ্লবকে নিয়ে ফাজলামো হচ্ছে। জনতার হৃদয়ে

আবদ্ধ অসীম শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার আতসবাজীতে পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া বারুদের মত এরও কুফল এই হবে যে এখনকার অসফলতার জন্যে গুরুতর বিপ্লবের সময়ে কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে যোগ দেবে না।

১৪ তারিখে উত্তেজনা আরও কমে গেল। ছাত্ররা দুদিন থাকার পর দেখলো যে এখন আর কেউ তাদের গ্রাহ্য করছে না। ওদের সকলেই নেতা হতে চাইছিল বলে ওদের মধ্যে থেকেও একটা বিরাট সংখ্যা মাঠে নেমে পড়েছিল, যারা সবাই নিজেদের নেতা হতে চাইছিল। অনেক ছাত্র তা গতকালই পাটনা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আজ কলেজগুলোতে এক মাসের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দশটার মধ্যে হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। আমি একটা হোস্টেলে গিয়েছিলাম। নিজেদের জিনিসপত্র কোথায় রাখবে ভেবে ওখানকার কিছু ছাত্র খুবই চিন্তিত ছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট একটা ঘর খুলে দিল আর বলল, 'জিনিসের ওপর নিজের নিজের নাম লিখে এখানে রেখে দাও।'

আজ তৃতীয় দিনে রিকশা এবং এক্কা চালকেরা কাউকে কিছু না বলেই নিজের নিজের কাজে লেগে গেল। ওরা ছাত্রদের গালাগালি দিচ্ছিল। সৈন্য এসে গিয়েছিল এবং তারা লোকদের দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করাচ্ছিল। অনেক লোক তো নিজেই নিজেদের সামনের রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলেছিল। রাস্তায় কোনো ভদ্রলোক দেখা গেলে ওদেরও সৈন্যরা রাস্তা পরিস্কার করার কাজে লাগিয়ে দিচ্ছিল। দু-একজন প্রফেসরকেও ধরে এনে ওরা এই কাজ করিয়ে নিয়েছিল। সেদিন সন্ধেবেলা সামরিক আইন ঘোষণা করা হলো।

কার্যানন্দজী বোম্বেতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গিয়েছিলেন। আজ তিনি ফিরলেন স্বামী সহজানন্দও এলেন। ওঁরা নিজেদের জিনিসপত্র ফতুহাতে রেখে গিয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট জীবেন্দ্র ব্রহ্মচারী সেটা আনতে গেলন। তিনি বলছিলেন, 'এক জায়গায় পাঁচজন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কোনো গাড়ি-ঘোড়া ওখান থেকে গেলে যাত্রী পিছু চার আনা কর আদায় করছিল। গ্রামের কিছু লোক ভেবেছিল যে এখন এখানে আমাদের রাজত্ব, এখান দিয়ে যে যাবে তার ট্যাক্স দেওয়া উচিত। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় লাউড স্পীকার লাগিয়ে মোটর গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বলা হচ্ছিল যে দুটোর মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলা না হলে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে। বিরোধীদের গুলি করা হবে। রেল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং লোকেরা নৌকো করে আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছিল।'

১৬ আগস্ট বাঁকিপুর এবং পাটনায় অনেককে গ্রেফতার করা হলো। রাস্তায় আনাগোনা স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেক্রেটারিয়েট এবং অন্যান্য কয়েক স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো। জায়গায়-জায়গায় গোরা সৈন্যদের পাহারা ছিল। কোনো লোক পাস ছাড়া সেখান দিয়ে যেতে পারছিল না।

১৭ আগস্ট দেখলাম যে বহু লোক শহর ছেড়ে বাইরে পালাচ্ছে। কেউ ঘোড়াগাড়ি করে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। কিছু পরিবার নৌকো করে পালাচ্ছে। পাটনা ভীষণ তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছিল।

যখন পাটনা এবং অন্যান্য শহরে গণ্ডগোল শেষ হয়ে গেল, তখনও বিহারের গ্রামগুলোতে অনেক দিন পর্যন্ত আগুন জ্বলতেই থাকলো। ২১ আগস্ট আমি

লিখেদিলাম—'সৈন্যরা এখন বিদ্রোহকে দমন করার কাজে নিযুক্ত। গান্ধীবাদ অরাজকতা ছাড়া ব্যবস্থামত সংঘর্ষের রূপ কি কখনও নিতে পারে? আর অরাজকতা পরে বদমাশ এবং গুণ্ডাদের হাতে চলে যায়। ব্যক্তিগত লাভের জন্য লোকে লুটপাট করে। শোনপুরে এরকম হলো, বিহটাতে এরকম হলো।... নেতারা তো তাড়াতাড়ি ধরা পড়বার জন্যে উতলা হলো। দমন করবার সময় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র এটা চিন্তা করল না যে তাদের মাথার ওপর জাপান বসে আছে এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিয়েই ওদের জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।'

প্রথমে লোকেরা রেলের মালগুদামগুলোতে এবং ট্রেনে প্রচুর লুটপাট করলো। চিনি, আটা, কাপড়ের গাঁঠরি, দেশলাইয়ের পেটি এবং অন্যান্য জিনিস গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল। সৈন্যরা এই সময় গ্রামেও ঘোরাফেরা করতে শুরু করেছিল, সেইজন্যে লুঠ-করা জিনিসগুলো লোকেরা যেখানে-সেখানে ফেলে দিতে লাগলো। গ্রামের পুকুরে এবং কুঁয়োয় চিনি ফেলা হলো, যা পচে গিয়ে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো। গঙ্গা যাদের কাছে ছিল তারা জিনিসগুলোকে গঙ্গায় ফেলে দিল।

পালিগঞ্জ (পাটনা) থানার কথা একজন বন্ধু এসে বলল। একজন স্বরাজী নেতা লোক জমা করে থানায় আগুন লাগাতে গিয়েছিল। দারোগা ওকে বলল, 'জ্বালাবেন কেন? থানায় তো এখন আপনারই হুকুম চলবে।' নেতাটি তো আনন্দে আটখানা। সে থানার কাগজপত্রের ওপর নিজের স্বাক্ষর করলো এবং নিজের সীলমোহর লাগাল। পিস্তল চাইলে দারোগা বললে যে মেরুমত করতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে সপ্তাহখানেকের জন্যে 'স্বরাজ্য' থাকলো। গোরা সৈন্য আসার পর মারপিট এবং ঘরদোর জ্বালান শুরু হলো।

অমবারী এবং জয়জোরীর কৃষকরা এই স্রোতে নিজেদের গা ভাসায় নি। লোকেরা অনেক করে বলেছিল কিন্তু তারা জবাব দিয়েছিল, 'রাহুল বাবার হুকুম নিয়ে এসো, স্বামীজির চিঠি নিয়ে এসো, তবেই আমরা লড়াই-এ অংশ নেব।' আশেপাশের বন্ধুদের কাছ থেকে ওরা জানতে পেরেছিল যে, এই সময় কৃষক এবং মজদুরদের ঘোর শত্রু জাপানের কোনোরকম সাহায্য হয়—এমন কোনো সংঘর্ষ আমাদের করা ঠিক না। লোকে আঁদরের পুল ভাঙতে গেলে কমরেড জৌব্বাদ এবং মজহর তাদের অনেক বোঝালো, তবুও পুল ভেঙে দেওয়া হলো। সুখদেব সিংহ নামে একজন ছাত্র এই সময় লোকেদের বোঝাতে খুব তৎপরতা দেখিয়েছিল সেইজন্য নেতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল। সে সুখদেবকে ধরে ফেলে তৎক্ষণাৎ ঠিক করল যে ওকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক। যদিও প্রাণদণ্ড তখনই কার্যকর করা হলো না। চারদিন পর্যন্ত সুখদেবকে তাদের নিজের জেলে রাখল, এরই মধ্যে উত্তেজনা কমে যাওয়ায় সুখদেবের প্রাণ রক্ষা পেল।

সিওয়ান শহরের সভায় গুলি চললো। কিন্তু ভাঙচুর সেখানে হয়নি। বসন্তপুর, গুঠনী দরৌলী, রঘুনাথপুর ইত্যাদি কয়েকটি থানা বিদ্রোহীদের অধিকারে চলে গিয়েছিল এবং ওখানকার দারোগা ও সেপাইরা সিওয়ানে চলে এসেছিল। থানার পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় লুটপাট চলছিল। গুঠনী থানার লোকেরা এসে দারোগাকে অনুরোধ

করছিল, 'আপনি ফিরে চলুন।'

ইনারার (আজমগড়) কাছে থাকে এমন একজন বন্ধু তখনই (১৪ সেপ্টেম্বর) নিজের গ্রাম থেকে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'সৈন্যরা তো লোকেদের শুধু ভয়ই দেখাচ্ছে কিন্তু পুলিশ চোখ বন্ধ করে লুট করে চলেছে। সৈন্য তলব করার কাজও পুলিশদেরই। একদিন জানা গেল যে আমাদের গ্রামে ফৌজ আসছে। লোকেরা দুশো টাকা জমা করে দারোগার কাছে গেল। কিন্তু সে তিনশো টাকা চাইছিল। একশো টাকা জোগাড় করার অসুবিধে হচ্ছিল তাই মেয়েরা তাদের পুঁতে রাখা টাকা বার করে দিল। জানি না, দারোগা বসে বসেই এইরকম কত তিনশো টাকা পেয়ে থাকবে। লোকেরা কথা পাকা করে ফিরছিল। গ্রামের কোনো লোককে সে দূর থেকেই হাত নেড়ে কিছু বলল। সেই লোকটা ভাবলো যে সেপাই আসছে। সে দৌড়ে গ্রামে এসে অন্য লোকেদের খবর দিল। সারা গ্রাম পালিয়ে যাবার জন্যে তৎপর হলো। উনুনে চাপান হাঁড়ি উনুনের ওপরেই রয়ে গেল। খাবার সাজানো থালা যেমনকে তেমন পড়ে রইল। হাতে যা কিছু তুলে নেওয়া যায় তাই নিয়ে সবাই পালাতে লাগলো। সেদিন গ্রামের বধূদের এবং মেয়েদের একই রকম দেখাচ্ছিল।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘোমটা?' উত্তর পেলাম, 'ঘোমটা দিয়ে পালাবে কি করে?' বেচারি নববধূরা ঘরের বাইরের জায়গাগুলো কখনো দেখেনি। এখন চোখ খোলা ছিল কিন্তু কোনো জায়গা চিনতো না বলে তাদের আঙুল ধরে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। আমার ব্রাহ্মণ বন্ধু বিষণ্ন হেসে বললেন, 'এক মুহূর্তের মধ্যেই বংশের শালীনতা মিটে গেল। যেসব স্ত্রীদের মুখ আগে কেউ দেখেনি, তারা মুখ খুলে আমাদের সামনে দিয়ে দৌড়চ্ছিল।'

পুলিশদের এই সময় দুর্লভ সুযোগ এসেছিল। তারা টাকা রোজগার করতে ব্যস্ত ছিল। যেখানে কমিউনিস্টরা ছিল সেখানে তারা লোকেদের এই কাজের থেকে সরে থাকতে বলছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বলছিল যে ইংরেজ সরকার জেনেশুনে এই ঝগড়া বাঁধিয়েছে। ক্রিপ্‌স -এর আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় মিত্রদেশগুলোর নাগরিকরা ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে আবার চাপ দেওয়া শুরু করেছিল। ইংরেজ শাসক এটাই দেখাতে চাইছিল যে ভারতীয়রা আমাদের বন্ধু নয় জাপানের বন্ধু। ভারতের লোকেরা রেল এবং তার কাটলো যার সাহায্যে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সৈন্য পাঠানো হতো। এর চাইতে জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্বের বড় প্রমাণ কি হতে পারে?

কমরেড কার্যানন্দ লক্ষ্মীসরাইয়ে লোকেদের জমায়েতকে বারণ করছিল। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল এবং কয়েকদিন বাদে তাকে ছেড়ে দিল। সুবোধ (মুজঃফরপুরের) নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে একাই লোককে বোঝাচ্ছিল। সে বোঝাবার জন্যেই ভাঙচুর যারা করছিল তাদের পক্ষের একটা নোটিশ নিজের কাছে রেখেছিল। পুলিশ তার চিন্তাধারাকে জানতো। সুবোধকে ধরে তিন (?) বছরের জন্যে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। শোনপুরের কমরেড বেদান্তী লোকেদের বোঝাবার ব্যাপারে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। জনতা মহাফেজখানায় আগুন লাগাতে গিয়েছিল। ওখানে বেদান্তী বলছিল, 'ভাইসব, এই কাগজপত্র আমাদেরই, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে লাভটা কি?' ওর নামেও

মোকদ্দমা চালানো হয়েছিল এবং কেবল ভিড়ে সামিল থাকার জন্যে পাঁচ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছিল। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গয়াতে হাবিব এবং ওলাকে এভাবেই জেলে পুরে দেওয়া হয়েছিল। বিহারে কয়েকশো কমিউনিস্টকে এই রকমভাবে জেলে আটক করা হয়েছিল।

২৯ আগস্ট বিহার সরকারের চিফ সেক্রেটারি গাডবোলের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা বলি। তিনি বলেছিলেন যে এ ব্যাপারে তিনি ক্ষমতাহীন।

২২ সেপ্টেম্বর ছাপবার কালেক্টর মিস্টার কে· পি· সিংকে বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি হুকুম দিলেন, 'কাল আসুন।' ভারতীয় আই· সি· এস·-রা যে সবাই এইরকম তা আমি বলছি না। কেননা কয়েকজনকে কাছের থেকে দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। কিন্তু ওরা যে সাদা সহকর্মীদের চাইতেও বেশি দাম্ভিক তা আমি নিশ্চয়ই বলব। এদের বিষয়ে 'ছুদ্র নদী ভরি চলি উতরাঈ' এই চৌপাইটি[১] পুরোপুরি প্রযোজ্য।

২২-২৫ সেপ্টেম্বর আমি ছাপরা থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত গেলাম। রাস্তায় অনেক স্টেশন অগ্নীদগ্ধ দেখলাম। বালিয়া হয়ে যাবার সময় জানতে পারলাম যে পুলিশ এখানে কত অত্যাচার করেছে।

প্রয়াগে (২৭ সেপ্টেম্বর) 'হিন্দি গোষ্ঠী'র আলোচনাচক্রে 'মাতৃ ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত' বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। এটা কোনো নতুন ব্যাপার ছিল না, কেননা এই বিষয় আমার মতামত আমি পত্রিকাগুলোতে প্রকাশ করে যাচ্ছিলাম, তবুও দেখলাম যে আমাদের সাহিত্যিকরা এখন এই সত্যকে মানতে রাজি নয়। ওরা ভাবছিল যে এতে হিন্দির ক্ষতি হবে।' আমি ওদের আশঙ্কার জবাব দিতে গিয়ে বললাম, 'হিন্দির ক্ষতি হবার কোনো ভয় নেই। কেননা পাটনা, বেনারস ও আগ্রাবাসীদের সঙ্গে প্রয়াগবাসীদের সাহিত্য-সম্পর্ক রাখার জন্যে একটা ভাষার দরকার হবে, যা কেবল হিন্দিই হতে পারে। আমাদের প্রজাতন্ত্রের সংঘের জন্যেও একটা সম্মিলিত ভাষার দরকার সেটা হিন্দি হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জনগণকে শীঘ্রই স্বাক্ষর এবং শিক্ষিত করতে হবে—এই কাজ মাতৃভাষাই করতে পারে।'

৩০ সেপ্টেম্বর এক বর্মী তরুণের সঙ্গে দেখা। সে এখন প্রয়াগে এসেছিল। বলছিল, 'জাপানীরা যখন বর্মায় ঢুকে পড়লো তখনো পর্যন্ত সরকার কমিউনিস্টদের জেলেই আটক করে রেখেছিল। যদিও জানতো যে এরা জাপানের ঘোর শত্রু এবং জাপানীদের হাতে পড়লে এদের গুলি খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই।' সে বলছিল যে একজন বিশেষজ্ঞ ইংরেজ কর্নেল খুব বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটা অধিবেশনে বলছিল, 'জাপানী দু-সপ্তাহের বেশি টিকে থাকতে পারবে না। ওদের ফুসফুস খুবই দুর্বল, তাই ওরা বেশি উঁচুতে উড়তে পারে না। ওদের চোখ তীক্ষ্ণ হয় না বলে জাপানী বিমান

---

[১] *চৌপদী* ছন্দবিশেষ। এর প্রথমার্ধে চার পদ ও দ্বিতীয়ার্ধে চার পদ থাকে এবং সেই অনুসারে আট স্থানে যতি পড়ে। প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম তিন পদে অক্ষরসংখ্যা সমান ও মিত্রাক্ষর থাকে। চতুর্থ ও অষ্টম পদেও এই নিয়ম।—স·ম·

রাত্তিরে আক্রমণ করতে পারে না।' সরকারি অফিসারদের বীরত্বের অবস্থা এরকম ছিল যে ১০০ মাইল দূরে জাপানী সৈন্য দেখলে ওরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল। যদি কিছু অফিসার শেষ অব্দি নিজের জায়গায় দৃঢ় হয়ে থাকতো, তাহলে এত লুটপাট হতো না। কিন্তু তারা জনগণকে কখনো আপন করে নেয়নি, সর্বদা দমন করে গেছে; সেইজন্যে ওদের ভয় ছিল যে এইরূপ পরিস্থিতিতে লোকে ওদের চিবিয়ে খাবে। এই কারণেই সরকারি অফিসার সবার আগে পালিয়ে যেত। জাপানীদের সেখানে কোনো পাত্তা ছিল না, তারা দু-সপ্তাহ পরে ডেল্টার চারটে জেলায় পৌঁছেছিল, কিন্তু অফিসাররা আগেই ওখান থেকে কেটে পড়েছিল।

২ অক্টোবর আমি সারনাথ গেলাম। এবার কয়েক বছর পরে গেলাম। চীনাদের মন্দির তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখে আশ্চর্য লাগলো যে এত বছর থাকার পরও ওখানকার চীনা সাধুরা হিন্দি শেখে নি। বর্মী ধর্মশালায় বর্মা থেকে পালিয়ে আঠারো জন স্ত্রী ও বাচ্চা ছিল। স্ত্রীলোকেরা বলছিল কেমন করে সেনারা ওদের ওপর বলাৎকার করেছে। এই সব স্ত্রীলোকেরা ভারতীয়দের স্ত্রী অথবা ভারতীয় পিতার কন্যা। ১৭-১৮ বছরের ওড়িয়া মা-বাবার এক মেয়েও ছিল। ওদের বাড়িতে আড়াইশো গরু, পঞ্চাশটা মোষ, কয়েক হাজার মণ ধান এবং জমি ছিল। ওর বাবা ওখানেই মারা যায়। মা, বোন ও ভাই প্রাণ নিয়ে পালায়। সবাই রাস্তাতেই মারা যায়। সে একাই এই পর্যন্ত আসে।

যুদ্ধের পাশা উল্টালো—১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালে হিটলারের সৈন্য আবার দ্রুত গতিতে সোভিয়েতের ভেতরে ঢুকতে লাগলো। ওরা স্তালিনগ্রাদ এবং ককেশাস পর্যন্ত ঢুকে পড়লো। খুবই বিপদ! খবর শুনে মন ভীষণভাবে ব্যাকুল হচ্ছিল। ২৯ আগস্টের কাগজে পড়লাম যে লালসেনা স্তালিনগ্রাদ পৌঁছে জার্মান সেনাদের ওপর আক্রমণ করেছে। কিন্তু এখনো জার্মান সেনা দৃঢ় হয়ে ছিল। তাদের এগোতে না দেওয়ায় এটাই প্রমাণিত হলো যে, মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের মতো এখানেও সোভিয়েত তার চূড়ান্ত পরিখা খনন করে রেখেছে, যেটা পেরিয়ে সে জার্মান সেনাকে সামনে আসতে দেবে না।

পয়লা ফেব্রুয়ারি (১৯৪৩)-র খবরে পড়লাম যে, জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল পাউলুস অস্ত্র সমর্পণ করে দিয়েছে এবং এগারো জন জার্মান ও পাঁচজন ইটালিয়ান জেনারেলের সঙ্গে তাকে কয়েদি করা হয়েছে। আমি আগেও লিখেছি, সোভিয়েতের অজেয়তার প্রতি আমার কখনো অবিশ্বাস হয় নি, তবে বিশ্বাস করার জন্য প্রয়োজন ছিল জোরালো অবলম্বনের। প্রথম জোরালো অবলম্বনটি সেই সময় পাওয়া গেল, যখন দেখলাম যে জার্মান সেনা মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের কাছে পৌঁছে থেমে গেছে। তার চেয়েও বড় অবলম্বন পেলাম তখন, যখন মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে জার্মানদের মস্কো থেকে পিছনে সরে যেতে হলো। ১৯৪১-এর শীতের সাফল্যও লালসেনাদের শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, কিন্তু তাতে শীত শীত কতটা সাহায্য করেছিল বলা যায় না। ১৯৪২-এর গ্রীষ্মে জার্মান সেনা উওরোনেজ-এর দিকে এগিয়েছিল, কিন্তু সেখানে এত লড়াই করতে হয়েছিল যে, তাকে কুঁকড়ে যেতে হয়েছিল—এটা তৃতীয় অবলম্বন পাওয়া

গেল। বিশ্বাসের পক্ষে সবচেয়ে বড় অবলম্বন হলো স্তালিনগ্রাদে লালসেনার বিজয়। এই বিস্ময় জানিয়ে দিল যে, লালসেনা আগে থেকেই তার রণকৌশল এবং লক্ষ্য স্থির করে রেখেছে।

কলকাতায় (১৩-২২ অক্টোবর ১৯৪২)—১১ অক্টোবরেও ট্রেন খুব কম চলছিল এবং গোনাগুনতি জায়গার টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল। ব্যবস্থা এত জঘন্য ছিল যে, লোকেদের পুরো দিন বসে থাকতে হচ্ছিল এবং কেবল চার-পাঁচগুণ বেশি দামে টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল। ইন্দ্রদীপ, আশরাফ এবং আমার কলকাতা যাবার ছিল। বড় লাইন ধরে পৌঁছবার কোনো আশা আমাদের ছিল না বলে আমি পাটনা থেকে মুজঃফরপুরের টিকিট কাটি। মুজঃফরপুরে আমার দুই বন্ধু গেল কলকাতার টিকিটের ব্যবস্থা করতে এবং আমি আগে যা ঠিক হয়েছিল সেইমত সমস্তিপুর গেলাম। আমার ধারণা, ভারতে সস্তা এবং পুষ্টিকর খাবার মুসলমান হোটেলেই সব চাইতে ভালো পাওয়া যায়। যখন ১ পেয়ালা চা এবং একটা শিক কাবাবের জন্যে হোটেলের মালিক চার পয়সা চাইল তখন আমার বিস্ময়ের সীমা থাকলো না। আমার মনে হয় এই সময় (সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) যখন আমি এই লাইনগুলো লিখছি এক পেয়ালা চা এবং একটা শিক কাবারের দাম এত কম হবে না। তবুও এত সস্তায় খাবার দেবে এমন কোনো হিন্দু হোটেল আছে কি? তবে হ্যাঁ, নাক সিঁটকিয়ে বলতে পারবে যে মুসলমানদের ওখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নেই—ওদের এঁটো-কাঁটার কোনো বাছ-বিচার নেই। হিন্দুদের বাড়িতে যেখানে রান্নাঘরের পাশেই উঠোনের এক কোণে পচা নর্দমা—ওখানটা নিশ্চয়ই খুব পরিষ্কার। নিজের গুরুর থুথু এবং এঁটো যে খায় সে যদি এঁটো-কাটার কথা বলে, তা হলে বলতে হবে লজ্জা বলে আর কিছু নেই।

সন্ধেবেলায় বন্ধু চলে এলো। হাওড়া পর্যন্ত টিকিট পাওয়া গেছে জেনে খুশি হলাম।

১২ অক্টোবর আমরা রেলে রওনা হলাম। সেদিন ঈদ ছিল। গ্রামের নরনারী বালক-বালিকারা ভালো ভালো কাপড়-জামা পরে দলে দলে নমাজ পড়ার জায়গায় যাচ্ছিল। সেখানে মিষ্টির দোকানও খোলা হয়েছিল। সুন্দর মেলার মত লাগছিল। আমাদের কামরায় কিছু লোক ছিল যারা ধ্বংসের প্রশংসা করছিল এবং সেই সঙ্গে এও বলছিল যে, নেপাল সরকার ঘোষণা করেছে যে ইংরেজ রাজ্য থেকে যারা আসবে তাদের যতখানি চায় ততখানি জমি এবং অর্ধেক দামে শস্য দেওয়া হবে। আমাদেরই কামরায় তিন-চারজন তরাই এলাকার নেপালী ছিল। তারা বলল, 'এসব কথা সত্যি নয়। যারা পালিয়ে গেছে তারা নিজেদের আত্মীয়দের কাছেই গেছে এবং তারা নিজেরাও ধনী।' প্রশংসাকারী কি জানতো যে নেপাল রাজ্যে সামান্যতম উগ্র রাজনৈতিক মত পোষণকারীদের গুলি মেরে লাশ দুদিন পর্যন্ত টাঙিয়ে রেখে দেওয়া হয়?

গঙ্গা পেরিয়ে আমরা বড় লাইনের গাড়ি ধরলাম। কিন্তু সে-গাড়ি ঝাঝা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। হাজার-হাজার যাত্রী আটকে গেলো। তাদের মধ্যে কিছু লোক গাড়ির মধ্যে আর কিছু লোক বাইরে শুলো।

—১৯৪২—

পরের দিন (১৩ অক্টোবর) গাড়ি ছাড়লো। জসীডিতে (বৈদ্যনাথ) গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়াল। ভীষণ ভিড় ছিল সেইজন্যে নিজেই গিয়ে জল না এনে আশরাফ জল আনার জন্যে ঘটি একজনকে দিল। সে সেটা নিয়ে চম্পট দিল। আশরাফ জলের জন্যে অপেক্ষা করছিল। গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি বললাম,'বলো—হুঁশিয়ার আশরাফের জয়!' সম্ভবত ঘটিটাও ছিল অন্য কারুর।

গাড়ির একজন যাত্রী, যে একবার কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছিল এখন আবার ফিরে যাচ্ছে, কথা বলছিল। আমি বললাম, 'প্রথমে তো কেবল হৈ-চৈ শুনেই পালিয়ে ছিলেন আর এখন তো বোমও পড়তে পারে।' সে জবাব দিল, 'দেশে গেলে তো না খেয়ে মরতে হবে, কলকাতায় তবু কিছু রোজগার তো করা যাবে।' আমাদের গাড়িতে রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসা এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি রেঙ্গুনের বিষয়ে বলছিলেন যে, যখন রেঙ্গুনে বোমা পড়লো, বেশি লোক অবশ্য মরেনি কিন্তু কার সাহস ছিল যে ওখানে থেকে যায়। লোকেরা সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পালায়। হাজার হাজার গরু-মোষ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' কলকাতাতেও যেকোনো সময় বোমা পড়তে পারে। আমরা ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় অনেক গরু এবং মোষ দেখলাম। আমি ইন্দ্রদীপকে বললাম, 'এই জায়গাটা মনে রেখো। যদি এখানে বোমা পড়ে তাহলে রেলগাড়ির আশা করো না। আমরা পাঁচ-ছ জন এসেছি। মোষ তো বেওয়ারিশ হয়ে যাবে—পাঁচ-ছটা তাগড়া তাগড়া মোষ নিয়ে যাব। যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে, তখন মোষের পিঠে চড়ে যাব। দুধ খেতে পাওয়া যাব রাস্তায় ঘাসও এখন প্রচুর।' আমরা যতদিন ছিলাম, কলকাতায় বোমা পড়েনি।

কলকাতায় পুরণচন্দ্র যোশীর ক্লাশ ছিল। বিহার-উড়িষ্যা, বাংলা-আসামের প্রধান প্রধান কমিউনিস্টরা নিজেদের রাজনীতি শিক্ষার জন্যে ওখানে এসেছিলেন। যোশী চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে বর্তমান রাজনৈতিক জটিলতাকে বোঝাচ্ছিলেন। তিনি বক্তা নন কিন্তু বুঝতে এবং বোঝাতে ওঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। আমরা জানি যে 'সর্বজ্ঞ' শব্দটা মিথ্যে। সাধারণত প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান সর্বদাই বাড়তে থাকে। কিন্তু রাজনীতিতে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের কারণ জ্ঞানকে নতুন রূপ দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে যোশীর জ্ঞান খুবই ব্যাপক এবং গভীর।

কলকাতায় থাকাকালীন আমাদের মাঝে-মাঝে টিমটিমে ঝাপসা আলোয় চলাফেরা করতে হতো। আকাশ পথের আক্রমণের জন্যে সতর্ক থাকা দরকার ছিল। কমরেড মহাদেব সাহা আলিপুরে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমাকে নিয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া এক মধ্যবিত্ত গাঙ্গুলি পরিবারের হলো। বৈঠকখানা নতুন ঢংঙে সাজানো হয়েছিল। দেওয়ালে মৃত পিতার পায়ের ছাপ ঝুলছিল—প্রাচীনতার এবং আধুনিকতার অদ্ভুত এক সমন্বয়। আমাকে রান্নাঘরে খেতে হলো। অনেক রকমের মাছ এবং বাঙালী মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হলো। এর থেকে জানা গেল যে বাঙালী খাবার ভালো এবং পুষ্টিকারকও। এই বাড়ির ভাগনে ছিল পার্টির মেম্বার। ওর নামের সঙ্গে মিশ্র যুক্ত দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম এবং জানলাম যে দু-চার পুরুষ আগে তারা সরযূপারী ছিল, এখন বিয়ে করে খাঁটি বাঙালী হয়ে গেছে।

—১৯৪২—

মুঙ্গেরের গ্রামে—২৪ অক্টোবর থেকে পয়লা নভেম্বর পর্যন্ত লক্ষ্মীসরাই-এর কাছাকাছি কয়েকটা গ্রামে যেতে হয়েছিল। কমরেড কার্যানন্দ এদিকে কৃষকদের জন্যে অনেক কাজ করেছিলেন। এবং সেই কারণে ওখানে সচেতনতাও বেশি ছিল। ২৫ তারিখে আমি প্রথমে ওর গ্রাম 'সহুর' গেলাম। কিউল থেকে তিন মাইল দূরে জামালপুরগামী রেললাইনের ধারে এই গ্রাম। এখানকার গ্রাম-পঞ্চায়েত খুবই সক্রিয় এবং স্বেচ্ছাসেবকরাও সতর্ক। দেড়শো ঘরের জন্যে মাত্র ৩৫০ একর খেত যাতে মূলত ধানের চাষ হয়। গ্রামে একটা মিডিল ইংলিশ স্কুল আছে। স্বেচ্ছাসেবকদের একটা ভালো সংগঠন আছে। প্রথমে খেত চরিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু এখন স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতার জন্যে চরান বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে পুরুষদের সভায় দুহাজার লোক এসেছিল। মহিলাদের আলাদা সভা হয়েছিল। আমি এবং সরদেশাই তাতে বর্ক্তৃতা দিলাম। একটা গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রামে যাবার জন্যে এখানে তেমন রাস্তা ছিল না। ২৬ জানুয়ারি নন্দনাবাঁ যাওয়ার ছিল। সহুর এবং নন্দনাবাঁ দুটোই খুব পুরনো নাম বলে মনে হচ্ছিল। নন্দনাবাঁ তো নন্দনগ্রাম। এখানকার ধান এবং চিঁড়ে খুবই প্রসিদ্ধ। গ্রামে বুদ্ধ এবং তারার[১] দুটো মূর্তি দেখলাম, যার ওপর খোদাই করা অক্ষর দেখে মনে হচ্ছিল সেগুলো ১০ কিম্বা ১১ শতাব্দীর।

কমরেড শ্রীনন্দন খুবই উৎসাহী যুবক। ওর মা মারা গেলে একদিনের শ্রাদ্ধে পাঁচশো কিম্বা হাজার টাকা উড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে গ্রামের জন্যে একটা গ্রন্থাগার তৈরি করা সে পছন্দ করল। আমাকেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হলো। একটা সভা হলো যেখানে আমি ও সরদেশাই বললাম। সরদেশাই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের ভাইপো। ওঁর শিক্ষাদীক্ষা নিজের কাকার রক্ষণাবেক্ষণে হয়েছিল। ধানখেতের আলের ওপর দিয়ে দৌড়ানোর জন্যে তাঁর জন্ম হয়নি, বা স্যারা তেজবাহাদুর সপ্রুর প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার জন্যেও তিনি তৈরি হননি। তিনি যে আজ আমাদের প্রাচীন দেশকে নবীন করতে চাইছিলেন। নীবন করার কাজ ভারতের কর্মীরাই করতে পারে এবং সেজন্যে তিনি অলিগলি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নন্দনাবাঁতে মুসলমানদের অনেক বাড়ি আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো।

২৮ তারিখে আমরা একাঢ়া পৌঁছলাম। একাঢা—(একাঢকা)-ও প্রাচীন নাম। মগধে এই রকম প্রাচীন নাম অনেক পাওয়া যায়। আমরা একাঢ়া যাবার জন্যে সরারী ষ্টেশন থেকে চেবাড়া পর্যন্ত এক্কা করে গেলাম। চেবাড়া এক হাজার বসতির মুসলমানদের একটা ভালো গ্রাম (এদিকে এই ধরনের বারোটি মুসলমানদের গ্রাম আছে)। কোনো একসময় এটা একটা বড় বাজার ছিল কিন্তু ষ্টেশন থেকে দূর হওয়ার জন্যে শ্রীহীন হয়ে গেছে। দু মাইল হাঁটার পর একাঢ়া পৌছলাম। নাম থেকেই প্রাচীনতার গন্ধ আমি পাচ্ছিলাম এবং এখানে পৌঁছে প্রাচীনতার আরো প্রমাণ পাওয়া গেল। একটি বৌদ্ধ দেবীমূর্তির ওপর 'ইয়ে ধর্মা' লেখা ছিল। দ্বিতীয়ত বুদ্ধের মুণ্ডহীন মূর্তি যার ওপর দাতার নামও খোদাই করা ছিল কিন্তু তা খসে গিয়েছিল। এখানে বিষ্ণু এবং সূর্যেরও কয়েকটি মূর্তি ছিল। লোকে বলছিল

[১]বৌদ্ধ মন্দিরে পুরুষ মূর্তির পরিবর্তে স্থাপিত দেবী মূর্তি।—স·ম·

যে এখানকার অনেক মূর্তি লোকে তুলে নিয়ে গেছে। গ্রামে বাৎস্যগোত্রজ (মহাকবি বাণের গোত্রীয়) বাভনদের (ভূমিহার) বাড়িই বেশি। এখানেও দুহাজার লোকের এক সভায় বক্তৃতা দিতে হলো এবং অনেক রাত্তির পর্যন্ত লোকেরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিল।

পরের দিন তেউস এবং বরবিঘায় কাটালাম। তেউস জমিদারদের গ্রাম। দেড়শো বছর আগে এদের পূর্বপুরুষেরা নিখতী (রঘুনাথপুর, সারণ) থেকে এখানে এসেছিল। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করে এমন কয়েকটি জমিদার পরিবার আছে। কিছু দুরেই ছিল অমাবাঁ রাজা সাহেবের গ্রাম। কমিউনিস্টদের জমিদারের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? আর আমার তো বিশেষ করে কৃষক সংঘর্ষের কারণে বেশি দুর্নাম ছিল। কিন্তু লংকাতেও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করে—স্বার্থের জন্যে নয় লোকহিতের জন্যে। গ্রামের একজন যুবকের আগ্রহে ওখানে যেতে হলো। খাওয়া-দাওয়া এবং একটু বিশ্রাম করার পর আমরা আবার বরবিঘার সভায় বক্তৃতা করতে গেলাম। শ্রুতবন্ধু শাস্ত্রীর বাড়ি এখানে, পাশের গ্রামেই। তিনি ওখানে ছিলেন। বক্তৃতার রিপোর্ট লেখার জন্যে পাটনা থেকে সি· আই· ডি·-র ইন্‌স্পেক্টর এসেছিল। দেড় হাজার উপস্থিতির এই সভায় বক্তৃতা দিলাম।

৩০ অক্টোবর আমরা ওখান থেকে মেহুস পৌঁছোই। এটা মগধ রাজ্য। মগধ যত পুরনো ততই পুরনো এখানের অনেকগুলো গ্রাম। প্রাচীন সময়ের অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। মেহুসে মহেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে, অষ্টভূজার মূর্তি আছে, সব অঙ্গ ভাঙা। পাল বংশের শেষের দিকের বলে মনে হয়। মন্দিরের বাইরে বটগাছের নিচে বিষ্ণু এবং সূর্যের খণ্ডিত মূর্তি আছে। গ্রামের মাঝখানে আছে একটা টিলা যার ওপর খণ্ডিত মুকুটহারধর (বজ্রযানপন্থী)[১] বুদ্ধের মূর্তি আছে যাকে লোকেরা ভোজরাজ হিসেবে পুজো করে। গ্রামের দক্ষিণে অশ্বত্থ গাছের নিচে একটা বড় মূর্তি ছিল যা বছর দুই আগে কোনো পাগল ভেঙে দেয়। এখানে ১২১/৩ ইঞ্চি লম্বা, ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং ২১/২ পুরু ইট পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায় যে বাণের সময়েও এই গ্রাম ছিল।

গ্রামে এক শাকদ্বীপী[২] ব্রাহ্মণের বাড়িতে কিছু সংস্কৃত বই ছিল, কিন্তু দুশো বছরের বেশি পুরনো কোনোটাই নয়। সন্ধেবেলায় গ্রন্থাগারের বাৎসরিক উৎসব ছিল। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বক্তৃতাও হলো। অন্ধকার হবার একটু আগে দু মাইল দূরের মাফো গ্রামেও লোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে গেল। এখানেও গ্রন্থাগারে আমার বক্তৃতা হলো। বোঝা গেল মগধের এই এলাকায় গ্রন্থাকারের দিকে লোকের খুব নজর। মগধী ভাষায় ভাল ভাল

---

[১]মহাযান ও হীনযান ছাড়াও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের আরো একটি নতুন ধারার উদ্ভব হয়। এই নতুন ধারার মতাবলম্বীদের বলা হয় বজ্রযানপন্থী। এঁরাই বৌদ্ধমন্দিরে ·স্ত্রীমূর্তি (তারা বা রক্ষাকর্ত্রী)-র প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতে ও নেপালে এখনো বজ্রযানপন্থীদের উক্ত দেবী মূর্তির উপাসনা করতে দেখা যায়।—স·ম·

[২]ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন দেশের তথা পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপান্তর্গত দ্বীপবিশেষের অধিবাসী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দ্বীপে জাত শাকবৃক্ষ (সেগুন বা শিরীষ) হেতু এব নাম হয়

বই লেখা হলে গ্রামের লোকেদের পক্ষে ভাল হতো। হিন্দি পড়ে উপভোগ খুব কম লোকই করতে পারত, তবুও এদের শৌখিনতা প্রশংসনীয়।

পরের দিন (৩১ অক্টোবর) চড়ে যাওয়ার জন্যে ঘোড়া পাওয়া গেল। ৬ মাইল যাবার পর আমরা শেখপুরা পৌঁছলাম। গ্রামের নাম আধুনিক মনে হচ্ছে কিন্তু পাহাড়ের ধারে লম্বালম্বি অবস্থিত এই মফস্বল শহর কোনো প্রাচীন এলাকা বলে মনে হচ্ছে। এক ভদ্রলোক পঞ্চমার্ক (মৌর্য এবং প্রাগ্‌মৌর্যকালের) মুদ্রা দেখালেন। তিনি বলছিলেন, 'এখানে আরো কত পুরনো জিনিস পাওয়া যায়।' কিন্তু আমাকে তো ডি· এম· হাইস্কুলে বক্তৃতা দেবার পর আজই লক্ষ্মীসরাইয়ের যুব গ্রন্থাকারে যেতে হবে।

পয়লা নভেম্বর আমরা গরুর গাড়ি করে গিয়ে নদী পার হয়ে কাকন গ্রামে পৌঁছলাম। মননপুর স্টেশন এখান থেকে সাত-আট মাইল। সাধারণত জৈন ঐতিহ্য ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনায় কখনো কখনো অবিশ্বাস্য হয় কিন্তু কাকনকে যে ওরা 'কাকন্দী' নাম দিয়েছে তা নির্ভুল। কাকন্দী বুদ্ধ এবং পাণিনির সময়কার একটা বড় নগর ছিল। কাকন্দী-মাকন্দী যুক্ত নাম বলে মনে হয় কিন্তু মাকন্দী বুলন্দ শহর জেলায় কোনো এক জায়গায় অবস্থিত এবং কাকন্দী এখানে মগধের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। গ্রাম গড়ে উঠেছে সমস্ত প্রাচীন বসতি নিয়ে। গলিগুলোতে সহজেই কুষাণকালীন (খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর) ইঁট পাওয়া যায়, যা ১৬ ইঞ্চি লম্বা, ১০ ইঞ্চি চওড়া এবং ২১/৪ ইঞ্চি মোটা। ভাঙা মূর্তিও আছে কিন্তু এখানকার অনেক মূর্তি লোকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে একটি জৈন মন্দির আছে যার দর্শনের জন্যে জৈন গৃহস্থেরা যখন-তখন আসে। প্রাচীন কাকন্দী কতখানি সমৃদ্ধ ছিল বলা যাবে না কিন্তু কৃষকদের প্রতি বিঘায় (১/২ একর) ১২ মণ চাল, আড়াই মণ ডাল এবং দু টাকা নগদ দিতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় জমিদার বর্তমানে কৃষকদের কিভাবে শোষণ করছে। ওখানে না গেলে আমার এটা বিশ্বাস হত না। এত দিয়ে কৃষকদের কি বা বাঁচবে? এখানে এক গ্রামীণ কবি প্রেমদাসের সঙ্গে দেখা হলো। প্রেমদাস সভায় জাপানীদের অত্যাচারের ওপর একটা কবিতা শুনিয়েছিল, যেটা সে সেই দিনই রচনা করেছিল।

কাকন্দী থেকে ফিরে আমরা কিউল (কিমিকালা?) নদী পার হয়ে তারই কিনারে অবস্থিত রেওড়া গ্রামে গেলাম। কাঁকন থেকে মাইল তিনেক দূরে এই গ্রাম। গ্রামটি বিশেষ প্রাচীন নয় বলে মনে হলো। একটা টালির ছাদের নিচে অষ্টভূজা দেবীর মূর্তি রাখা ছিল, যার শরীরে অনেক কাপড় জড়ান ছিল। মূর্তিটির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হলো। আমি কাপড় সরালাম আর দেখলাম অষ্টম শতাব্দীর লিপিতে একটি প্রবন্ধ লেখা রয়েছে এবং তাতে পরিষ্কারভাবে 'কাকন্দী গ্রাম'-এর উল্লেখ রয়েছে। গ্রামটিতে প্রাচীন ইঁট কিংবা অন্য কোনো জিনিস পাওয়া যায় না সেইজন্যে এই মূর্তিটি নিশ্চয়ই কাকন্দী গ্রাম থেকে উঠে তুলে এনে এখানে রাখা হয়েছে। ওখান থেকে মননপুর ষ্টেশনে গাড়ি ধরলাম এবং সেই দিনই পাটনা পৌঁছে গেলাম।

কলকাতাতেই জানা গিয়েছিল যে সোভিয়েত মৈত্রীসংঘ ভারত থেকে একটি প্রতিনিধিদল সোভিয়েত দেশে পাঠান হবে বলে ঠিক করেছে। তাতে আমারও নাম ছিল।

কিন্তু এই ভ্রমণ ব্যয়সাপেক্ষ বলে আমি রাজি ছিলাম না। পাটনা পৌঁছলে জানতে পারলাম যে পাসপোর্ট নেবার জন্যে তার এসেছে। কিন্তু আমি তখন দরখাস্ত দিইনি। আমার বোম্বাই যাবার ছিল। বোম্বাই যাবার আগে দিল্লী যেতে চাইছিলাম যাতে সেখানে গিয়ে লোলার বিষয়ে খবরাখবর নিতে পারি।

ছাপরা হয়ে প্রয়াগ পৌঁছলাম। 'নিরালা'জীকে কয়েক বার দেখেছিলাম এবং ওঁর কিছু লেখাও পড়েছিলাম। ১২ নভেম্বর উনি আমার এখানে এলেন। 'বাদল', 'পত্থর কুটতী' এবং 'কুকুরমুত্তা'র কবিতা শোনালেন। নিরালা আমাদের প্রজন্মের এক অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি। কিন্তু আমি দেখছিলাম যে আমাদের সমাজ এই অদ্ভুত প্রতিভা থেকে ততটা লাভবান হচ্ছে না। নিরালারও নিশ্চয়ই প্রতিদিনের অসুবিধেগুলো অসহ্য লাগে কিন্তু ওঁর মনের গঠন এমনি যে এক প্রকারের মনের ভাব বেশিক্ষণের জন্যে থাকে না। কোনো পাঠক বোধহয় বলেছিলেন নিরালার যদি কোনো কষ্ট বা চিন্তা থাকে সেটার জন্যে উনি নিজে দোষী। ধরুন, আপনি নিজের দোষের জন্যে শাস্তি চাইছেন। কিন্তু এই শাস্তি তো নিরালা পাবেন না, এর জন্যে যা কিছু ক্ষতি তা আমাদের সাহিত্যকেই স্বীকার করতে হবে। নিরালা ব্যবহারিক জ্ঞানশূন্য যদি হনও, নিজের খেয়ালে কখনও কখনও তাঁর বোধ-বুদ্ধি লোপ পায়ও, তবু নিরালার অবদান আমাদের সাহিত্যের জন্যে। যদি আমরা ওঁকে আরো বেশি নিশ্চিন্ত এবং আরো বেশি সন্তুষ্ট রাখতে পারি তাহলে আমাদের সাহিত্য আরো বেশি লাভবান হবে। নিরালাকে বর্তমান সমাজ যেভাবে উপেক্ষা করেছে তার জন্যে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে পস্তাতে হবে। আমি এইটুকু বলতে পারি, নিরালাকে যদি নিশ্চিন্ত, সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন রাখা যেত তাহলে তিনি আমাদের জন্যে আরো উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য আমাদের দিতে পারতেন।

দিল্লীতে (১৩-১৪ নভেম্বর)—প্রয়াগ ছাড়ার সময় মহবুব আহমদ সাহেবকে এলাহাবাদ থেকে দিল্লী অব্দি সহযাত্রী হিসেবে পেলাম। যাত্রাটা খুব ভালোভাবে হলো। মহবুব সাহেবের সঙ্গেই কুচানাহরখাঁ-তে জিনিসপত্র রাখলাম। তারপর ঘুরতে বেরোলাম। কমরেড যজ্ঞদত্তের খোঁজ পেলাম না। নতুন দিল্লীতে ভিক্ষু শাসনশ্রীকে পেলাম। ওঁর ওখানেই চলে গেলাম। অনেকের মত আমারও ভুল ধারণা ছিল যে 'সোভিয়েত ইউনিয়ান নিউজ' সোভিয়েতের মাসিকপত্র। আমি ভেবেও ছিলাম যে এর সম্পাদক কোনো রাশিয়ান হবে, তাহলে তার কাছ থেকে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের বন্ধুদের খবর জানা যাবে। টেলিফোনে জিজ্ঞেস করায় তারা সম্পাদকের ঠিকানা দিতে অস্বীকার করল। যে প্রেসে কাগজটা ছাপান হতো সেখানে যোগাযোগ করে জানা গেল যে সম্পাদক নিজের ঠিকানা দেয়নি এবং সে নিজেই মাঝে মাঝে প্রেসে চলে আসে। বুঝলাম না এত রহস্যের দরকারটা কি? যাইহোক, অনেক খোঁজ-খবর করার পর জানলাম যে কাগজটি ইংরেজ সরকারের এবং রাশিয়ান নামধারী একজন পোল্যান্ডবাসী-এর সম্পাদনা করে যে চৌদ্দ-পনের বছর ধরে ইংরেজ সরকারের চাকরি করে।

তাসের প্রতিনিধি সে-সময় দিল্লীতে ছিলেন না, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।

ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। প্রথমে তো শঙ্কিত হৃদয়ে কথা বলছিল কিন্তু আমি যখন আমার স্ত্রীর এবং আরও একজনের নাম বললাম তখন প্রাণ খুলে কথাবার্তা হলো। এও জানলাম যে সে আমার স্ত্রীকে চেনে। কিন্তু ওর কাছ থেকে বিশেষ কোনো কথা জানা গেল না। একদিন ঘোরাঘুরি করার সময় রাস্তার ধারে একটা বাড়িতে লাল পতাকা দেখে ওখানে পৌঁছোলে কমরেড যজ্ঞদত্ত এবং দেওলীর কমরেড মনোহরলালের সঙ্গেও দেখা হলো। দিল্লীতে পার্টি ভাল কাজ করছে দেখে খুব আনন্দ হলো।

আগ্রায়—বেশ কয়েক বছর পর ১৫ নভেম্বর আগ্রা যাবার সুযোগ পাওয়া গেল। একসময় আগ্রায় আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল কিন্তু সেটা কুড়ি বছরেরও আগের কথা। রামন্না শাস্ত্রী ওখানে গোকুলপুরে ছিলেন। আমি ওঁর কাছে চলে গেলাম। মুসাফির বিদ্যালয়ের ছাত্রবন্ধু আগ্রাতে কি আর পাওয়া যেত? ডাক্তার লছমী দত্তের সঙ্গে দেখা করতে নামনরে গেলাম তেইশ-চব্বিশ বছর পর ওঁকে দেখার সুযোগ হলো। প্রথমে বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হলো। বোধহয় উনি জানতে পারেননি যে ওঁর সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে। আবেগপূর্ণ ভালবাসা নিয়ে দেখা করলেন। ঐ প্রৌঢ় শরীর, আমি দেখলাম, এখন তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেছে। স্মৃতিশক্তি এখনো তীক্ষ্ণ আছে। ওঁর ছোট ভাই তারা দত্ত বাড়িতে ছিলেন। পুরনো বন্ধু এবং বাড়ির বিষয় কথা হচ্ছিল। উনি থেকে যাবার জন্যে খুব অনুরোধ করলেন কিন্তু আমার সময় কম ছিল আর অনেকের সঙ্গে দেখা করার ছিল। পুরনো স্মৃতি খুবই মধুর হয়। বার্ধক্য ভালো নয়। কেবল শরীরকেই না, মনকেও তা বৃদ্ধ বানিয়ে দেয় এবং লোকে ৪০ বছর আগেকার দুনিয়ায় থাকতে চায়। ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে অনেক গরু, মোষ ছিল। তার মানে বাড়িতে প্রচুর দুধ হতো। দরজার চারদিকে কেবল গোবরই চোখে পড়ছিল। বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে থাকা গোবর, বাতাসে তার উগ্র গন্ধ এবং গরুর খুরে ডলা উঠোন সৌভাগ্যের পরিচয় বলে ধরা হয়। এই ব্যাপারে ডাক্তার সাহেবের সায়েন্সের সঙ্গে বিরোধ ছিল কিনা আমি বলতে পারব না। বিরোধ থাকলেও ধর্মের পাল্লা সায়েন্সের চাইতে ভারি হয়েছে।

পরের দিন দুর্গ দেখতে গেলাম। ছাত্রাবস্থায় দুর্গ দেখে থাকলেও মনে নেই। জাহাঙ্গীর মহল দেখলাম, যেখানে জাহাঙ্গীরের বেগম জোধাবাঈ থাকত। দেওয়ান-খাস এবং দেওয়ান-আম দেখলাম। বাদশা এবং বেগমদের থাকার এই মহলগুলো দেখলে বোঝা যায় যে হাওয়া খেলে এমন বড় বড় ঘর বানানো ওদের শখ ছিল না। আজকালকার লোকেদের যদি এই রকম ঘরে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে একে ওরা আরামদায়ক বলবে না। হয়ত সেই সময় শ্বেতপাথর, হীরাপান্না এবং সোনা-রূপা চারদিকে ছড়ান দেখলে লোকেরা বেশি আনন্দ অনুভব করত। তাজমহলও দেখে এলাম, এখন তার মেরামতি চলছিল।

বম্বেতে (১৮ নভেম্বর ২ মার্চ ১৯৪৩)—আজকাল রেলে ভ্রমণ করা একটি কঠিন কাজ। যাইহোক, আমি জায়গা তো পেয়ে গেলাম। গাড়িতে অনেক সামরিক বাহিনীর সেপাই ছিল এবং এরা বিনয় বলে কিছু জানতই না। এমনিতেই তো ট্রেনের সংখ্যা কমে

গিয়েছিল, তার ওপর সামরিক বাহিনীর সেপাইরা যে গাড়িতে বসত তারা সব সময় চেষ্টা করত তাদের বিছানা পেতে শুয়ে পড়তে। সেপাইদের জন্যে আলাদা ট্রেন ছাড়ত। ওদের জন্যে কামরাও রিজার্ভ থাকত, তবুও ওরা অন্য কামরায় বিছানা বিছিয়ে বসে থাকত এবং অনেক ঝঞ্ঝাট করে কোনো সাধারণ যাত্রী ঐ কামরায় ঢুকতে পারত। আজকাল খুব কম দেশেই হয়ত সাধারণ মানুষের প্রতি সৈনিকদের এই রকম আচরণ দেখা যাবে। এর জন্যে দায়ী কিন্তু ইংরেজ সরকার। এরা ভারতীয় সৈনিকদের দেশভক্তি নয়, রাজভক্তির শিক্ষা দিতে চাইছিল। দেশভক্তিও তো ওদের পক্ষে বিপদজনক জিনিস।

১৮ নভেম্বর আমি বোম্বাই পৌঁছলাম। মার্কসবাদ সম্বন্ধে কয়েকটা বই লেখার জন্যে বম্বে এসেছিলাম। কেন জানিনা বোম্বাইকে আমি পছন্দ করতে পারি না। কিছুদিন থাকার পরে বুঝতে পারলাম যে এর আবহাওয়া আমার অনুকূল নয়। সবসময়েই পেটের গণ্ডগোল থাকত এবং কয়েকবার জ্বরও হলো। প্রথমে আমি কিছুদিন মাটুঙ্গাতে থাকি পরে পার্টির কার্যালয়েই ছিলাম। সোভিয়েত যুদ্ধক্ষেত্রের ভালো ভালো খবর আসছিল। লাল সেনা এগিয়ে যাচ্ছিল জার্মান পিছনে হটে যাচ্ছিল, এখানেই কাগজে পড়লাম যে ডাক্তার শ্চেরবাৎস্কী আর নেই। তিনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে ওঁর মহাপ্রয়াণ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আর একবার দেখা হবে আশা করেছিলাম। উনি অনেক পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আশা করছিলেন যে কোনো এক সময় আমরা দুজনে মিলে গবেষণার কাজ করব।

ওঁর একটা চিঠি ছিল—

Leningrad
WASS. OSTNOW
7th LINE 7

My dearest Rahula,

The last letter received from you was dated April 27, it was answered by me in the midst (?) of july. After that date nothing was received but nevertheless, we have written twice. One of these days I have seen your son, a beautiful child, He speaks a little, but understands everything and we hope that He will speak everything splendidly very soon... We are very much troubled because no further news from you are coming. We hope that you have not forgotten us, lettes must come and we expect them.

With my compts. and best regards. Th. Stcherbatsky.

আমার অতি প্রিয় রাহুল, লেনিনগ্রাদ

তোমার সর্বশেষ চিঠিটা ২৭ এপ্রিলের, যার উত্তর আমি জুলাইয়ের মাঝামাঝি দিয়েছি। সেই তারিখের পর তোমার কোনো খবর পাইনি, তবুও আমরা দুবার চিঠি দিয়েছি। এরই মধ্যে একদিন তোমার ছেলেকে দেখেছি। সুন্দর একটি শিশু সেকথা কম বলে কিন্তু সব কিছু বোঝে। আমরা আশা করি যে সে শীঘ্রই ভালো করে সব কথা বলতে পারবে। ৫

সেপ্টেম্বরে ওর দু বছর পূর্ণ হবে। মা ওর ফটো তুলিয়ে তোমার কাছে হাজারীবাগের সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। আমাদের খুবই চিন্তা হচ্ছে। তোমার কোনো খবর আসছে না। আমি আমার গ্রীষ্মকালের বেড়ানোর পর ফিরেছি। এটা খুব চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ ছিল, যদিও বেশি দূরের ছিল না। যুদ্ধের সময় দূরে যাওয়া সম্ভবও ছিল না। আমরা আশা করি যে, তুমি আমাদের ভুলে যাওনি। তোমার চিঠি নিশ্চয়ই আসা উচিত, আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধাসহ।

থ· শ্চেরবাৎস্কী

ওঁর সব চাইতে শেষের চিঠি আমি ২৩ জুন ১৯৪১-এর কাছাকাছি দেওলীতে পেয়েছিলাম—

Leningrad
Wass. ostnow

7th line 2, flat 31

22-IV-31

Dearest Rahula,

We have at last received your letters from October and from 16 September, both arrived on the 19 April. The letters sent by you to my address did not arrive at all, it is nevertheless possible that some of them can still arrive, we will then inform you. But you are still in jail. Bu are you still informed how long will your arrest last? How is your health? In the two letters that have reached us there is not a word about your health. There must be some answer regarding your future. Is it not possible that you (know?) nothing or your future. Have youasked, have you insisted on being informed on your destiny?

As regard me personally I am not very bad. The winter is very cold, ice is not yet melted on the river before my windows. My activity in science is very slow. I can not during all this winter work very much, I hope it will go better. I hope for the coming spring, perhaps I will work again.

Your Igor is very active, he speaks very well, but so for only in Russian. It is impossible now to find a teacher for him. I hope it will be possible during summer. Igoris very fond of book, he is ready to spent whole day to look through pictures.

Yours most affectionately
Stcherbatsky

—১৯৪২—

লেনিনগ্রাদ
ওয়ান ওস্তনো
৭ম গলি ফ্ল্যাট ৩১
২২ এপ্রিল ১৯৪১

অতিপ্রিয় রাহুল,

শেষ অব্দি তোমার অক্টোবরের এবং ১৬ সেপ্টেম্বরের চিঠি পেলাম। দুটোই ১৯ এপ্রিল এলো। আমার ঠিকানায় পাঠান তোমার চিঠি এখনও পর্যন্ত আসেনি। সম্ভবত তার মধ্যে থেকে কয়েকটা এখনো আসতে পারে, এলে আমি তোমাকে জানাব। কিন্তু তুমি কি এখনো জেলে? তোমাকে কি জানান হয়েছে তোমাকে কতদিন আটকে রাখা হবে? তোমার স্বাস্থ্য কেমন আছে? যে দুটো চিঠি আমাদের কাছে এসেছে তাতে তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি কথাও লেখা নেই। তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা উত্তর নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। এটাও কি সম্ভব যে ভবিষ্যতের বিষয় তোমাকে কিছুই জানান হয়নি? তুমি কি জিজ্ঞেস করেছ এবং তোমার বিষয়ে কি ঠিক করবে তা জানাতে জোর দিয়ে বলেছ?

আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালই আছি। শীতকালটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আমাদের জঙ্গলের সামনের নদীটার বরফ এখনো গলে নি। আমার বিজ্ঞানের কাজ খুবই আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। এই শীতকালে বেশি কাজ করতে পারিনি। আশা করি পরে আরো ভাল হবে। আমি বসন্ত ঋতুর আগমনের প্রতীক্ষায় আছি। তখন হয়ত আমি আবার কাজ করব।

তোমার ইগর খুবই চঞ্চল। সে খুব ভাল কথা বলে, তবে এখন অব্দি কেবল রুশ ভাষায়। ওর জন্যে এখন একজন শিক্ষক পাওয়া অসম্ভব। আশাকরি গ্রীষ্মকালে সম্ভব হবে। ইগোর বই ভীষণ ভালবাসে এবং বই-এর ছবি দেখে সারাটা দিন কাটাতে প্রস্তুত।

তোমার অতি স্নেহের— শ্চেরবাৎস্কী।

ডক্টর শ্চেরবাৎস্কী আমায় কত স্নেহ করতেন তা ওঁর এই সব চিঠি পড়লে জানা যায়। লেখাপড়ার মাধ্যমে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—যদিও আমরা একে অন্যকে দেখিনি তবুও উনি আমার না-দেখা বন্ধু ছিলেন। তিব্বত নিয়ে গবেষণার খবর জানবার জন্যে উৎসুক থাকতেন। লোলার সঙ্গে সম্বন্ধ হবার পর উনি আমাকে একেবারে নিজের আত্মীয় ভাবতেন—উনি লোলার শিক্ষক ছিলেন। লোলা একবার লিখেছিল যে ডক্টর বলেছেন ইগর বড় হলে ওকে উনি দর্শন পড়াবেন। ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃত ভাষায় এত বড় একজন বিদ্বান এখনও অব্দি ইউরোপে হয়নি। ওঁর বৌদ্ধ ন্যায় (Buddist Logic 2 vols) পড়ার পর পণ্ডিত সুখলালজী এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি বলেছিলেন, 'এই গ্রন্থটিকে কাশীর ন্যায়াচার্য পরীক্ষার জন্যে অনুবাদ করা উচিত।' আধ ডজনের মত ভারতীয় দর্শন—বিশেষ করে বৌদ্ধ দর্শন-এর ওপর ফরাসি, ইংরেজি এবং রুশ ভাষায় গ্রন্থ লেখেন। আমি যখন প্রথমবার মস্কোয় থাকি তখন বার্লিনের প্রোফেসর ল্যুডর্স বিহারে আমার কাছে এসেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে ইউরোপে প্রাচ্য দর্শনের সবচাইতে বড় পণ্ডিত ডক্টর শ্চেরবাৎস্কী। ওঁর কাছাকাছি আসার পর ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয় আরো বেশি করে জানতে পারলাম। উনি পাশ্চাত্য দর্শনেও পণ্ডিত

ছিলেন সেইজন্যে দর্শনের ওপর দখল নিয়ে লিখতে পারতেন। অনেক ইউরোপীয় বিদ্বান আছেন যাঁরা নিজেদের ভাষার জ্ঞানের ভিত্তিতেই ভারতীয় দর্শনের ওপর অনেক কিছু লেখেন। তাঁরা প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য দর্শনের বিষয়ে জানেন না। তাঁরা এই ত্রুটিকে যথেচ্ছ কল্পনা এবং অপ্রাসঙ্গিক টিকা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেন। আচার্য শ্চেরবাৎস্কী ধর্মকীর্তির 'ন্যায় বিন্দু'র সুন্দর অনুবাদ করেছেন। উনি যোগাচার দর্শনের একটা বই লেখার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তবে ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক'-এর একটা সুন্দর অনুবাদ করার ইচ্ছে ওঁর সবচাইতে বেশি ছিল। ধর্মকীর্তিকে উনি 'ভারতের কান্ট' বলতেন। বস্তুত কান্টের মত ধর্মকীর্তিও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক—তবে হ্যাঁ, বাস্তববাদের দিক দিয়ে ধর্মকীর্তি হেগেল এবং মার্ক্স-এর বেশি কাছের। ওঁর চাইতে ভালো ধর্মকীতির অনুবাদক পাওয়া যাবে না। পশ্চিম ইউরোপের বিদ্বানদের মত উনি সংস্কৃতের অগভীর জ্ঞানকে পছন্দ করতেন না। ওঁর ছাত্রদেরও দেখলাম যে ওরা সংস্কৃত ভাষাকে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে—এটা সম্ভবত রুশ ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের নিকটতম সম্বন্ধের কারণে।

আমি যদি এখন লেনিনগ্রাদের সেই ঘরটায় যাই, যেখানে আচার্যের সঙ্গে বহু ঘণ্টা বহু দিন কাটিয়েছি, তাহলে তাঁর সেই প্রসন্ন মুখ এবং আন্তরিকতায় ভরা চেহারা আর কি দেখতে পাব!

আমি অনেকগুলো বইয়ের অনুবাদ করলাম, তার মধ্যে লেনিনের লেখা 'গাঁওকে গরীবোসে'র অনুবাদই সব চাইতে ভাল লেগেছে। লেনিন এটা এত সরল ভাষায় লিখেছিলেন যে আশ্চর্য হতে হয়—যিনি অতগুলো ভাবগম্ভীব গ্রন্থের লেখক তিনি এই বইটা এত সরল ভাষায় কি করে লিখতে পেরেছেন? এখানে আমি দুই-একজন কৃষক-মজদুর নেতার জীবনী লিখেছিলাম কিন্তু এখন আমার সেরকম কোনো বই লেখার ইচ্ছে জাগেনি। এখন আলাদা আলাদা জীবনী লেখারই ইচ্ছা ছিল—'ভাবছি ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে কারু কারু জীবনী লিখি' (১ ডিসেম্বর ১৯৪১)।

১৮ ডিসেম্বর একজন সাহিত্যিক বন্ধুর চিঠি পাই। উনি লিখেছিলেন—'আপনার এবং মার্কসবাদী তত্ত্বের অনেক কাছে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কমিউনিস্টদের রীতিনীতি এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাসী নই। আশা করি, আমার এই স্পষ্ট কথার জন্য কিছু মনে করবেন না।' আমি এটাকে খারাপভাবে নিইনি, আমার ডায়েরিতে শুধু এই ছোট্ট নোটটা লিখি—'হ্যায় ন নির্মল নক্ষত্রলোক-বিহারী তারকরাজ।'

আমার ইচ্ছে হল কমিউনিস্ট নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত একটা বই লিখি, যাতে ওঁদের রীতিনীতি এবং ব্যক্তিত্বের ওপর অবিশ্বাসী লোকেরা এই বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। এই থেকে 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'[১] লেখার সংকল্প করলাম। হয়তো আমার সেই বন্ধু এখনও অব্দি ঐ একই অভিমতে দৃঢ় হয়ে আছে। যদি তাই হয়, তাহলে বলব যে রাজনীতি এবং সমাজনীতি নিয়ে ফাজলামি করা খুবই সহজ।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জাপানীরা কলকাতার ওপর বোমা বর্ষণ করল। কমরেড

[১] লেখক ১৯৪৪ সালে এই জীবনীগ্রন্থটি লেখেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় *কিতাব মহল* থেকে।

মহাদেব সাহার কলকাতা থেকে বোম্বাই যাবার কথা ছিল কিন্তু টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না বলে যাওয়া হলো না।

অনেক দিন পর ২৯ ডিসেম্বর নগর (কুলু) থেকে গেশে ধর্মবর্ধনের চিঠি এলো। উনি লিখেছেন, 'আমি দুবছর ধরে লংকায় ঘোরাঘুরি করলাম। আমেরিকা যাবার নিমন্ত্রণ এসেছিল কিন্তু যুদ্ধের জন্যে যেতে পারলাম না।'

বোম্বাই ভারতের ফিল্ম জগতের রাজধানী। সবচাইতে বেশি হিন্দি ফিল্ম এখানে তৈরি হয়। আমি ওখানে যখনই কোনো ফিল্ম দেখেছি তা সময় কাটাবার জন্যে। খুব কম ফিল্মই আমার পছন্দ হয়েছে। পয়লা জানুয়ারি 'কবীর' দেখতে গেলাম। তার সম্বন্ধে ডায়েরিতে লিখেছিলাম— 'ইতিহাস এবং ভূগোলের ওপরে প্রাণ খুলে ছুরি চালানো হয়েছে। নীরুকে পাজামা পরানো হয়েছে। আজও বেনারসের দিকের জোলারা পাজামা খুব কমই পরে। রামানন্দ[১]-কে ঘণ্টা নাড়ার এক গোঁফধারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কবীরের সময়ে[২] কোথা থেকে কাশীরাজকে এনে জায়গা দিয়েছে। বেনারসের আর দরকারটা কি? ভারতীয় পুঁজিবাদীদের রাজধানী বোম্বাই সবার কর্মসংস্থান করতে পারে। নাচ-গান দেখিয়ে টাকা জড়ো করার কোনো বাধা না থাকায় অন্যসব কিছু উপভোগ করা যায় সেই টাকা দিয়ে। তুকারামের অভঙ্গে[৩] রাম-রহীম, কৃষ্ণ-করিম কথা দিয়ে গাওয়ান হয়েছে। গোয়ার কবীরপন্থীদের খঞ্জনির সঙ্গে গাওয়া ভজন গানগুলো কি খারাপ ছিল?'

পয়লা ফেব্রুয়ারি স্তালিনগ্রাদে জার্মান ফিল্ড মার্শালের বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত যুদ্ধক্ষেত্রে লালসেনার জয়যাত্রা শুরু। তারপর তো পাশা একেবারে উল্টে গেল। ৯ তারিখে খবর এলো যে কর্স্ককো লাল সেনা দখল করেছে। ১০ তারিখে খবর পাওয়া গেল, জার্মানি রস্তোফ খালি করে পালিয়েছে। জার্মানরা এখন উল্টোমুখে ফিরে যাচ্ছে।

১০ তারিখে জানা গেল, গান্ধীজী লিনলিথগোকে চিঠি লিখে বলেছেন যে, আগস্ট মাসে এবং তারপরে যে উপদ্রব দেশে হয়েছে কংগ্রেস তার জন্যে দায়ী নয় এবং কংগ্রেসকে তার জন্যে অপবাদ দেওয়া ঠিক নয়। গত ছমাস ধরে কমিউনিস্টরাও এই কথা

পৃথিবী জীবনধারণের এক ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদীদের সবচাইতে বেশি চিন্তা ছিল যুদ্ধের পর নিজেদের স্বার্থ কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়। এই কথা চিন্তা করে আমি আমার ১ ফেব্রুয়ারির ডায়েরিতে লিখেছিলাম— 'ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার পুঁজিবাদী শাসকদের যুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিপ্লব-এর চিন্তাই বেশি।

[১]কবীর প্রথমে এই বৈষ্ণব প্রচারকের শিষ্য ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর দোহার মধ্য দিয়ে নিজস্ব চিন্তাচেতনার প্রচার শুরু করেন।—স·ম·

[২]১৪৪০-১৫১৮ খ্রীস্টাব্দ।—স·ম·

[৩]এক ধরনের স্তোত্র বা স্তবগান। গাওয়ার জন্যই এগুলি এক বিশেষ ছন্দে রচিত হয়। এর ছন্দ ও গীতিধর্মীতার মূলে থাকে লোককাব্য।—স·ম·

কাসাব্লাঙ্কাতে রুজভেল্ট এবং চার্চিল কোনো বড় যুদ্ধ পরিকল্পনার জন্যে নয়, আসলে নিজেদের নাগরিকদের কাছে নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢেকে রাখার জন্যে একত্রিত হয়েছে। কমরেড স্টালিন এমন কাঁচা খেলোয়াড় নন যে ওদের এই কাজে সহযোগিতা করবেন। জোরো ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্য এবং ফ্রেঞ্চ শাসকশ্রেণীকেও রাখতে চাইছিল, সেইজন্যে ওকে কেন দ্য গলের সঙ্গে মজুরশ্রেণী থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বাধ্য করা হয়। ব্রিটিশ আমলারাও ভারতের শ্রমিকদেরও আসন্ন ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিকে দেখছে। পৃথিবীর এই পরিবর্তনকারীরা বাংলার সব স্তরের মানুষের মধ্যেই আছে। মজুররা মিলিত হবে, দেখতে হবে জিন্নার চেলারা এবং ফজলুল হক কৃষকদের মধ্যে কতখানি বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে। বুদ্ধিজীবীরা বেশিরভাগই সঙ্গে থাকবে। মালাবারে পৃথিবী-পরিবর্তনকারীদের বেশ প্রভাব আছে কিন্তু ওটা একটা ছোট প্রান্ত। তামিল প্রান্তে তাদের মজুদের ওপর জোর বেশি তবে কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের বিষয় আমি বলতে পারব না। অন্ধ্রে তাদের শক্তিশালী এবং নিয়ন্ত্রক শক্তি বাংলার মতই। বিহারে বিরোধ, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলস্য কিন্তু কৃষকদের মধ্যে আছে বিশেষ চেতনা। যুক্তপ্রদেশ এগোবে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী, মজদুর, কৃষকদের সাহায্যে এবং যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরও জন্যেও। পাঞ্জাবে বর্তমান এবং আগামী সরকারও ওদের বিরুদ্ধে যাবে এবং নাগরিক-স্বাধীনতা থাকবে না কিন্তু ওখানের কিছু শিক্ষিত এবং সমস্ত যন্ত্র, যেমন নিপুণ সৈনিক—যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অনাহারে মরবে, তারা পৃথিবীর এই পরিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করবে। শিখরা খুব শক্তিশালী হবে। হিন্দুদের ঐ সৈনিকদেরই ওপর আশা। মুসলমানদের মধ্যেও ঐ সৈনিক (পৃথিবী-পরিবর্তনকারী) থাকবে এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা একদিকে হবে। সব মিলিয়ে পাঞ্জাবের ভবিষ্যত আরো ভালো হবে। মধ্যপ্রান্ত মৃত প্রায়···। সিন্ধ-এর পরিণাম নির্ভর করছে নাগরিক স্বাধীনতা এবং লালসেনার প্রভাব থেকে কতটা সুবিধে করতে পারবে তার ওপর। বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্রে মজদুরদের ছাড়া ওদের কোনো কাজ এগোচ্ছে না এবং ওদের কোনো প্রোগ্রামও নেই। ইংরেজি জার্নালিজম দ্বারা এই কাজ করা যাবে না। বুদ্ধিজীবী প্রকৃত বিপ্লবী হয় না কিন্তু ওদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে আমাদের প্রচারে সব রকম মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। মহারাষ্ট্রে পৃথিবীর পরিবর্তনের দিকে কারুর নজর নেই। গুজরাটে কিছু আছে কিন্তু কাজ করা লোক সেখানে কম। গান্ধীজীর প্রভাব মজদুরদের ভেতর থেকেও এখনও যাইনি এবং সেইজন্যে ওরা দুর্বল থাকবে। কর্নাটক এখন মধ্যপ্রান্তের মতই। আসামে সুরমা ভ্যালি (উপত্যকা) এগিয়ে থাকবে। ভারতে ইংরেজ আমলাতন্ত্র সবচাইতে প্রতিকূল এবং শক্তিশালী। ওরা ভারতের পুঁজিপতিদের সঙ্গে অবশ্যই সমঝোতা করবে এবং বিপ্লবী শক্তিকে নষ্ট করার জন্যে ভীষণভাবে চেষ্টা করবে কিন্তু পুঁজিবাদী ইংল্যান্ডের অবস্থা ভাল থাকবে না। মজদুরদের নেতা কমিউনিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মজদুরদের একতাকে শক্তিশালী হতে দেবে না। কিন্তু তবুও ইংল্যান্ডে লালসেনার সফলতা কমিউনিস্টদের প্রচার কার্যে সব চাইতে বেশি সাহায্য করবে। যুদ্ধ শেষে থাকবে সেনা, সিভিক গার্ড, বারুদ ফ্যাক্টরিগুলো থেকে ছাঁটাই হওয়া ক্ষুধার্ত মৃতপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ। এদের সামনে টোরি মজুর নেতাদের শক্তি কোনো কাজেই লাগবে না। দেশীয় রাজ্যগুলো থেকে

পেট চলে না। জোর খাটালে গৃহযুদ্ধ হতে পারে। ইউরোপের ওপর লাল সেনার প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে। ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী সরকার জার্মানিকে হিটলারদের প্রসবভূমি বানিয়ে রাখতে চায়, যেখানে ভবিষ্যতেও সোভিয়েতকে জড়িয়ে রাখা যাবে। সোভিয়েত কিন্তু ওদের চাইতেও বেশি চালাক। তারা জার্মানিতে ইউঙ্কর এবং ক্রুপ ইত্যাদির চারাও থাকতে দেবে না। চার্চিল আর রুজভেল্ট যা-ই করতে চাক না কেন। অর্থাৎ জার্মানিতে মজদুর-কৃষক রাজত্ব না হলেও ওরা কিন্তু হবে সোভিয়েতের সমর্থক। ইংল্যান্ড নিজেদের মধ্যে স্বার্থের লড়াই ও গৃহযুদ্ধের ভয়ে লালসেনার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না। রাইনের পূর্ব এবং ইউরোপ থেকে আগত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ বিনষ্ট হবে। এর প্রভাব ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ওপর পড়বে। আমেরিকা নিশ্চিন্ত যে লালসেনা আতলান্তিক পার করে আক্রমণপূর্বক সাম্যবাদ প্রবর্তন করবে না। তাহলে ওরা কেন চার্চিলের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে? ব্রিটিশ পুঁজিবাদীর প্রতিষ্ঠা বিশ্বের দরবারে নষ্ট হওয়ায় ইংল্যান্ডে ওরা দুর্বল হবে এবং ভারতে ওদের প্রতিনিধিও দুর্বল হয়ে পড়বে, তার ফলে ভারতেই নয় উপরন্তু আফগানিস্তান এবং ইরানেও বিপ্লবী শক্তিগুলো বলিষ্ঠ হবে। চীনও সোভিয়েতের সঙ্গে থাকবে, কেন না চার্চিল-এমরি হংকং এবং অন্যান্য জায়গায় লুপ্ত ইউনিয়ন-জ্যাক উত্তোলন করার ফন্দি আঁটছে। আর জাপান? জাপানে বিপ্লবী শক্তির উত্থান অবশ্যম্ভাবী, রাজকীয় শক্তির ওপর অধিকারও সম্ভব। পুঁজিবাদী সরকারের সারা জাতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার নীতি, নিজেদের জন্যে বাজারের সুবিধে, রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং অপমান করার মনোভাব ওখানকার বিপুল সংখ্যক নাগরিকদের সোভিয়েত-পক্ষপাতী করে দেবে। সোভিয়েত তার পশ্চিমী সীমার মতো পূর্ব সীমাকেও সুরক্ষিত করবে। ওকে যে নিজের সীমানার মধ্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে হবে না, সেটা নিশ্চিত। কোরিয়ায় প্রজাতন্ত্র কায়েম হবে। মাঞ্চুরিয়া চীনের মধ্যে চলে এলেও একটি বিপ্লবী দেশ হবে। জাভা ইত্যাদিতে আগের অবস্থা কায়েম হবে, যদিও ওখানে দেখা দেবে প্রচণ্ড বিরোধ। ইংল্যান্ডের মত হল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, নাগরিকদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং পরাজয় নিশ্চিত দেখে ওখানকার লোকদের বেশি বেশি অধিকার দিয়ে জাপানীদের চেষ্টা করতে হবে তাদের ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধ মনোভাব এবং শক্তি সঞ্চয় করতে। কাজেই তখন প্রশান্ত মহাসাগরের এই উপকূলে আর প্রশান্তি থাকল না। তবে হ্যাঁ, ফিলিপাইন স্বাধীন হবে। এবার এই চিত্রপটের ভেতরে দেখুন ভারতকে। ভারতের ইস্পাতের কাঠামো নড়বড়ে, যদিও গর্ব আগের মতই।'

লড়াই ফেরত ক্ষুধার্ত যুবকেরা কিছু করার জন্যে উতলা। গান্ধীবাদ— ভারতীয় পুঁজিবাদীদের ইংরেজ পুঁজিপতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বিপ্লবী-চিন্তার অধিক প্রসার, পরিবর্তনের পক্ষে মজুরদের প্রবল শক্তি, কৃষক এবং দেশীয় রাজাদের অবিরত সংঘর্ষ, মার্কসবাদীদের সর্বত্র বিশেষ প্রভাব। 'এখন' বলুন, কে অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকবে? বিপ্লবী শক্তি নাকি ভারতীয় পুঁজিপতি ইংরেজ আমলাতন্ত্র— সাক্ষীগোপাল রাজা?

ফেব্রুয়ারির শেষে আমার আবার জ্বর এলো এবং বোম্বাই ছেড়ে চলে যাওয়াই ঠিক হলো। ৩ মার্চ বোম্বাই থেকে রওনা হলাম।

—১৯৪২—

যুক্তপ্রান্ত এবং বিহারে (মার্চ-এপ্রিল)—সেদিন পাঞ্জাব মেলে ভীষণ ভিড় ছিল কিন্তু যে কামরায় আমি বসেছিলাম তাতে কিছু সৈনিকও বসে ছিল, যার মানে অন্যদের জন্যে দরজা বন্ধ করে রাখা। ৪ মার্চ আগ্রা পৌঁছে গেলাম। জ্বর আরো দু-তিন দিন ছিল। ৮ তারিখে নাগার্জুন[১]ও সিন্ধ থেকে এসে পৌঁছালেন এবং তারপর তিন মাস আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। এবার প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্যে এদিকে এসেছিলাম। সম্মেলন চোদ্দ কিংবা পনের মার্চে হবার কথা ছিল কিন্তু জ্বরের জন্যে আমি কদিন আগেই চলে এলাম। আগ্রায় এক সপ্তাহ থাকার পর ফিরোজাবাদ চলে গেলাম। আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে গাড়িতে ভীষণ ভিড় ছিল, আগ্রা পৌঁছে তো একেবারে ঠাসাঠাসসি হয়ে ভরে গেল। যাই হোক, জানলার পাশে বসে ছিলাম সেইজন্যে চারদিকে পাকা গমের সোনালি মঞ্জরী দেখে খুব ভাল লাগছিল। ফসল কিন্তু সব জায়গায় ভাল ছিল না। সব জায়গায় সার এবং জলের ব্যবস্থা ভালভাবে হলে তবেই তো ফসল ভাল হবে? জল তো আছে কিন্তু মাটির নিচে থেকে জল কি করে বার করা হবে? বলদ এবং ভিস্তির সাহায্যে কৃষক ঘটি ঘটি জল তোলে, এ তো পিপাসার্তকে শিক দিয়ে জল খাওয়ানো। যমুনার আশেপাশের সমতল জমি পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট ছোট পাথরে ভরা। কয়েকশো পুরুষ ধরে আমরা এটাকে একটা স্বাভাবিক দৃশ্য বলে ধরে নিয়েছি, কখনও ভাবিনি যে কত মাটি প্রত্যেক বছর এই রকমভাবে সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। মেঘ কিছু কিছু জল ফিরিয়ে দেয় কিন্তু সমুদ্রের গর্ভে যে মাটি যাচ্ছে তার তো এক তোলাও ফিরে আসে না। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন শুরুতে আগ্নেয়গিরির পাথর খসে খসে হাজার হাজার বছর ধরে এক আঙুল পুরু মাটি তৈরি হয়েছিল। প্রকৃতির এটা কত মূল্যবান দান কিন্তু এর রক্ষার জন্যে আমরা কোনো ব্যবস্থা করি নি। সোভিয়েত দেশে এখন এই বিষয়ের ওপর খুব নজর দেওয়া হচ্ছে। ওখানে সিমেন্ট দিয়ে নালা এবং বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে যাতে খুব কম মাটি সমুদ্রে যেতে পারে। আমাদের এখানে জানি না কবে এ ব্যাপারে কিছু করা হবে।

ফিরোজাবাদে সেদিন কমরেড আনসারীর বাড়ি খেতে গেলাম। এরা একটি পুরনো মধ্যবিত্ত পরিবার। কয়েকশো বছর ধরে এই পরিবারে পর্দা প্রথা চলে আসছে কিন্তু ওর স্ত্রী এবং বড় মেয়ে পর্দার বাইরে চলে এসেছে। তাতে ঐ পরিবারে খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ং বৃদ্ধা মা পর্যন্ত ছেলেকে বয়কট করেছে। ছোট মেয়েটি বলছিল, 'ঠাকুমা বাসনপত্তরে হাতও দিতে দেয় না। বলে, তোমরা আল্লাকে মানো না, নরকে যাবে।' আমি ওকে বললাম, 'কাঁদো-কাঁদো ভাবে কাঁচুমাচু হয়ে ঠাকুমার পা ধরে বলবে যে, ঠাকুমা তুমি তো আঙুরের খেতে যাবে। নরক এবং স্বর্গের মাঝখানে একটা ছোট পাতলা দেওয়াল আছে—আমি যাই হই না কেন তোমারই তো নাতনি? কখনও কখনও এক-আধটা গুচ্ছ

[১]নাগার্জুন সুবিখ্যাত প্রগতিশীল কবি ও কথাসাহিত্যিক। ১৯১১ সালে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার তরৌনী গ্রামে জন্ম। হিন্দি, মৈথিলী তথা সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেন। প্রকৃত নাম বৈদ্যনাথ মিশ্র 'যাত্রী'। মাতৃভাষা মৈথিলীতে 'যাত্রী' নাম নিয়ে রচনার শুরু। তাঁর মৈথিলী কাব্যসংগ্রহ 'পত্রহীন নগ্ন গাছ', যা হিন্দিতেও অনূদিত হয়। নাগার্জুন তাঁর সৃষ্টিকর্মে এখনো সজীব।—স.ম.

পেড়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিও।' মেয়েটি বলল, 'এইরকম বললে মারতে দৌড়বে। ঠাকুমা বেচারির ভীষণ দুঃখ।'

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে আমি একাধিকবার ফিরোজাবাদ এসেছিলাম। একবার আর্যসমাজের বার্ষিকোৎসবেও বক্তৃতা দিতে এসেছিলাম। আর্যসমাজের বলিষ্ঠ বক্তা প্রয়াগদত্ত অওস্থিও ছিলেন। উনি যখন জানতে পারলেন যে আমি পূর্বাঞ্চলের ব্রাহ্মণপুত্র, তখন আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বোঝাতে লাগলেন, 'দেখ, এই ধর্মের বিশৃঙ্খলার জায়গায় ভোজন কোরো না। এখানে ডেড়-চামার সবাই খেতে ঢোকে। নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিও।' কিন্তু পণ্ডিতজীর উপদেশের জন্যে আমার কানে কোনো জায়গা ছিল না। উনি যদি আজ আমার খাবার দেখতেন তাহলে জানি না কি বলতেন।

ফিরোজাবাদ তখনকার তুলনায় অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এখন এখানের জনসংখ্যা ৪০ হাজার এবং চুড়ি তৈরির ষাটটা কারখানা হয়েছে। ফিরোজাবাদ সারা ভারতবর্ষকে চুড়ি জোগান দেয়। যুদ্ধের সময় যখন বিদেশি চুড়ি আনা বন্ধ হয়ে গেল, তখন থেকে এই শহর একাই সারা ভারতীয় নাগরিকদের সৌন্দর্য রক্ষা করছে। কিন্তু তার পথে নানান বাধা আছে—কয়লার অভাবে পঁচিশটা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে মজুরদের সংগঠন শক্তিশালী।

বছগাঁও-এ (১৩-১৫ মার্চ)—কৃষক সম্মেলন বছগাঁও-এ হবার কথা ছিল, সেইজন্যে ১৩ তারিখে আমরা গরুর গাড়ি করে বছগাঁও-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। ১০ মাইল-এর রাস্তা। কিন্তু গরুর গাড়িকে তো নিজের গতিতেই চলতে হচ্ছিল। তবুও আমাদের রাস্তা ভালভাবেই কাটল। আলিগড় এবং প্রতাপগড়ের দুজন কমরেড কৃষকদের গান গাইতে গাইতে আমার সঙ্গে যাচ্ছিল। একটা গানের কথা ছিল বেনারসী এবং অবধী ভাষায়, অন্যটায় ছিল ব্রজভাষায়। কাঁচা রাস্তার দুধারে ছিল ছোলার খেত। ছোলা পেকে গিয়েছিল। লোকেরা গাছ উপড়িয়ে নিয়ে আসছিল। সত্যযুগ থেকেই এই ধর্ম চলে আসছে তাই লোকেরা কখনই মালিককে জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করে না। কাঁচা ছোলা খেতে খেতে আমরা এগোচ্ছিলাম। গণেশ পালের 'বারমাস্যা' আমাদের গাড়োয়ানের খুব ভাল লাগল। সেই বারমাস্যায় খুব সরল ব্রজভাষায় কৃষকদের বারো মাসের দুঃখ-কষ্টের বিষয় গাওয়া হচ্ছিল। গাড়োয়ান লেখাপড়া জানত না কিন্তু সেই বারমাস্যা তাকে লিখে দেবার জন্যে গণেশ পালকে সে বার বার অনুরোধ করলো। রাস্তায় অনেক কাঠ বোঝাই গাড়ি দেখলাম। লোকেদের কাছে শুনলাম যে এগুলো চুড়ি কারখানার জন্যে যাচ্ছে। কাঠ ভিজে থাকলেও তিরিশ সেরের জন্যে এক টাকা পাওয়া যায়। ফিরোজাবাদের দশ-বিশ ক্রোশ দূরের গাছও বড় নিষ্ঠুরভাবে কাটা হচ্ছিল। বাগান এক বছরেও তৈরি হয় না, অথচ এখানে সেগুলোর ওপরে একধার থেকে কুড়ুল চালানো হচ্ছিল।

দুপুরে আমরা বছগাঁও পৌছলাম। বছগাঁও একটি সাধারণ গ্রাম, কিন্তু 'বৎসগ্রাম' নামটি প্রাচীন মনে হয়। ভরদ্বাজ বংশীয় বৎসগণ এই কুরু পাঞ্চালের অধিবাসী ছিলেন; তবে আজ থেকে তেত্রিশ-চৌত্রিশশো বছর আগে তাঁরা যে এই গ্রামেই বাস করতেন একথা

বলার মত কোনো প্রমাণ অবশ্য আমাদের হাতে নেই। গাঁয়ের বাইরে দেবস্থানের শুঙ্গ-কালের[১] যে ভাঙা মূর্তিটি দেখেছি—তা থেকে অন্তত একথা বোঝা যায় যে আজ থেকে একুশ-বাইশশো বছর আগে এই জায়গাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল।

সম্মেলন যাবার রাস্তায় পুলিশ যতদূর সম্ভব বাধা দিল। ফিরোজাবাদে তো মিছিল বের করার বিরুদ্ধে হুকুম জারি করা হলো, কিন্তু শ্রী মুন্নীলাল গোস্বামী এবং অন্যান্য কমরেডরা সম্মেলনকে সফল করার জন্যে খুবই পরিশ্রম করেছিলেন। পুলিশ শুধু এই হুকুম জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি যে যারা এই সম্মেলনে যোগ দেবে তাদের গ্রেফতার করা হবে, উপরন্তু রাস্তার ধারে ধারে তারা তাঁবু গেড়ে বসেছিল। এক হাজার মহিলার উপস্থিতিই প্রমাণ করে দিল যে কমরেড হাজরা এবং তাঁর সহায়িকা মুন্নী শুক্লার পরিশ্রম বিফলে যায়নি। যদিও রোদ মাথায় করে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে দৌড়াদৌড়ি করার জন্য হাজরার নবাব পরিবারে জন্ম হয় নি কিন্তু তিনি নিজেই এই জীবন বেছে নিয়েছিলেন। হাজরা এক ব্রাহ্মণ পরিবারের বাড়িতে উঠেছিলেন। হাজরাকে বিদায় দেবার সময় আমি সেই বুড়িমার চোখে জল দেখেছি। নিজের মেয়েকে মা যেভাবে বিদায় দেন, ঠিক সেভাবেই বুড়িমা হাজরাকে বিদায় দিলেন। বুড়িমার মনেই আসেনি যে হাজরা মুসলমানের মেয়ে। এক সপ্তাহেই হাজরা বুড়িমার ঘরের মেয়ে হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক কৃষককবি আর গায়ক সভায় এসেছিলেন। বেনারস জেলা থেকে ধর্মরাজ আর রামকেরও এসেছিলেন। আমি রামকেরের কবিতার খ্যাতির কথা আগেই শুনেছিলাম। ডুগডুগি বাজিয়ে যখন তিনি গাইলেন—'সুখেই থাকো আর দুঃখেই থাকো/ তুমি তোমার ঘরে আমি আমার ঘরে শুনে শ্রোতারা তো মুগ্ধ হয়ে গেল। আমার ভয় ছিল—এই পাঞ্চালী ভাষার ক্ষেত্রে বেনারসের গাঁয়ের ভাষা লোকে বুঝবে না কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করে রামকের তাঁর নির্ভেজাল দেহাতী ভাষার গান শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। বুঝতে পারলাম যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের স্থানীয় মাতৃভাষাগুলোর মধ্যেও শব্দে এবং বাক্‌ধারায় এত মিল যে লোকে বেশ ভালোই বুঝতে পারে। সম্মেলন সফল হলো। মহিলাদেরও একটি সম্মেলন হলো। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন গোস্বামীজীর স্ত্রী।

১৫ মার্চ মাঝরাতে কিছু লোক গাড়িতে আর কিছু লোক পায়ে হেঁটে রওনা হলো। প্রতাপগড়ের ভাই একটি বিরহা গান ধরল— 'যার পিছনে আজ অনেক ঠকবাজ।' কয়েকজন তরুণ গানের এই কলিটি তুলে নিয়ে তার সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে জুড়ে রাতভর সারা রাস্তা সেই বিরহা গাইতে গাইতে ফিরোজাবাদ পৌঁছে গেল।

ফিরোজাবাদ গিয়ে দেখি হাজরা আর মুন্নী শুক্লা একজন মুসলমান আর একজন জৌনপুরী ব্রাহ্মণ-কন্যা একই থালায় খাচ্ছে। একজন কমিউনিস্ট তার খাওয়া-পরা গোপন করে না। এসব নিয়ে নিশ্চয় কথাও উঠেছে। কিন্তু ওদের কোনো পরোয়া নেই। ওরা যে-ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে তার কাছে এসব নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। মুন্নীর পক্ষে এটা

[১] ১৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগে। এই সময় মৌর্য সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উত্তরাধিকারী হয় শুঙ্গরা। শুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্যরাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে অধিকার করেন।—স·ম·

নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার কারণ মাত্র ছমাস হলো সে বাড়ির বাইরে পা রেখেছে।

সেদিন রাতে আমার খাবার ব্যবস্থা হলো ডক্টর আশরাফের ভায়রা-ভাইয়ের বাড়িতে। আশরাফের স্ত্রী কুলসুমও এখন এখানেই আছেন। পাঁচ-ছ বছর বয়সের 'সাহেবজাদা'র সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো—সে তখন কয়েকটি ছেলের সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় গিয়েছিলেন?' লজ্জা-টজ্জার কোনো ব্যাপারই ছিল না, সে খুব অনায়াসে উত্তর দিল, 'স্কুল থেকে আসছি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়তে গিয়েছিলেন?' এবার অনায়াস উত্তর, 'বাচ্চাদের দেখতে গিয়েছিলাম।' যেন মহাশয় নিজে বাচ্চা ছিলেন না আর ষোল-সতেরো বছরের ছাত্ররা সবাই বাচ্চা। আসলে ছেলেটি তো আর কেউ নয় সহজাত বক্তা আশরাফেরই সন্তান।

খাওয়া-দাওয়া তো বেশ ভালো হলোই, কিন্তু সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল মেয়েদের গানের চর্চা। হাজরার গানের সঞ্চয়ও প্রচুর। কুলসুমের বিয়ের আগের কিছু গান মনে ছিল। উনি ছিলেন মথুরা জেলার এক গাঁয়ের মেয়ে, তাও আবার হিন্দু। তাঁর গানগুলো সবই হিন্দুদের গান। বিয়ে আর কন্যা বিদায়ের কত মর্মস্পর্শী গান কু'সুম শোনালেন। গানের বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ দেখে বললেন, 'আমি যখন বাপের বাড়িতে থাকব তখন একবার আসুন, অনেক ভালো ভালো গান শোনাব।' ও হ্যাঁ, এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়নি। কুলসুমের ভাই ধনসিংহ আর প্রতাপসিংহ হচ্ছেন হিন্দু রাজপুত আর তাঁর স্বামী ডক্টর আশরফ হচ্ছেন মুসলমান রাজপুত। ভারতের এরকম পনেরো-বিশ লক্ষ রাজপুত আছেন যাঁদের কাছে ধর্ম নয়, জাতিই প্রধান। কেউ হয়তো ধর্মে হিন্দু, কেউ মুসলমান কিন্তু এঁদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হয়ে থাকে। কুলসুমের বিয়েটাও এভাবেই হয়েছে। আমার মনে হলো, এঁরা কয়েকশো বছর আগেই ভারতের ভবিষ্যৎ-চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

প্রয়াগ, বেনারস হয়ে আমরা ছাপরা পৌঁছলাম। আগেই খবর পেয়েছিলাম যে পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদীর বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। কয়েক হাজার টাকার গয়নাগাটি আর কাপড়-চোপড় খোয়া গেছে। আমার দু-তিনটে বড় বড় বাক্সের ভারি ওজন দেখে চোর ভেবেছে বাক্সগুলোতে নোট ভর্তি আছে—তাই সেগুলোও তুলে নিয়ে গেছে। খেতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খুলে দেখে ওতে শুধু বই আছে। কিছু কাপড়ও ছিল—সেগুলো নিয়ে বাকি সবকিছু ওখানেই ফেলে রেখে গেছে। আমার আসল সম্পত্তি ওরা একদম ছোঁয়নি দেখে আমার খুবই আনন্দ হল—কয়েক বছরের ডায়েরি ছিল ঐ বাক্সে।

২৫ মার্চ খাদ্যাভাব নিয়ে পাটনায় নাগরিক সভা ছিল। মুসলিম লীগ, হিন্দুসভা, জমিদার, এবং কমিউনিস্ট সবাই এতে সামিল হয়েছিল। পাঁচ মাস আগে আমি যখন পাটনা ছেড়ে যাই—কমিউনিস্টরা তখন সদ্য এই কাজে নেমেছিল। তখন ওরা একলা ছিল, কিন্তু আজ সকলেই ওদের সঙ্গ দিচ্ছিল। টাকায় তিনসের চাল আর দুসের গম বিক্রি হচ্ছিল—তাও পাওয়া মুশকিল। ছাতু বিক্রি হচ্ছিল যেখানে দশ-বারো আনা সের, সেখানে চিনি পাওয়া যাচ্ছিল ছ-সাত আনা সের। চার-পাঁচ বছর আগে কেউ যদি বলত যে দুসের চিনির বদলে একসের ছাতু পাওয়া যাবে তো কেউ সেকথা বিশ্বাসই করতো না।

কিন্তু যুদ্ধ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। ছাপরার গ্রামে গ্রামে যখন ঘুরছিলাম তখন লোকজন শুধু একথাই জিজ্ঞেস করছিল যে এ লড়াই শেষ হবে কবে? টাকায় আড়াই সের চাল কেনার ক্ষমতা আর কতজনের ছিল? দুটাকা জোড়া ধুতি এখন দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। চারদিকে ছিল ত্রাহি-ত্রাহি রব।

৫ এপ্রিল আমি আতরসন (ছাপরা)-এ ছিলাম। লোকে বলছিল গতকাল মহারাজগঞ্জে টাকায় দুসের চাল বিক্রি হয়েছে। আজকাল খাদ্যশস্যের ডাকাতি খুবই বেড়ে গেছে।

৭ এপ্রিল সিওয়ানে এক ভদ্রলোক বলছিলেন, 'কমলা রায়ের(?) বাড়িতে কিছু লোক খাদ্যশস্য ধার চাইতে গিয়েছিল। উনি দিতে অস্বীকার করায় ডাকাতরা ওঁর খামারে আগুন লাগিয়ে দেয়, তার ফলে দেড় হাজার মণ খাদ্যশস্য পুড়ে ছাই হয়ে যায়।' এটা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক কথা—খাদ্যশস্য পোড়াও, লুঠ কোরো না। এক সময় মানুষের খাদ্যশস্যে আর পশুদের খাবার ঘাসে আগুন লাগানো অত্যন্ত পাপ কাজ বলে মনে করা হতো। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। কনৈলাতে আমাদের বাড়িতে অনেক ধান হতো আর শীতে বিরাট বিরাট খড়ের গাদা করা হতো। আগুন পোয়ানোর সময় আমরা ছেলেরা যখন দু-চার আঁটি খড় আগুনে দিতাম তখন আজী (ঠাকুমা) রেগে চিৎকার করে বলতেন, 'গরুর খাবার আগুনে পোড়াচ্ছ—খুব পাপ কাজ হচ্ছে!' একথা শুনে সত্যিসত্যি আমরাও কিছুটা সংযমী হয়ে যেতাম।

৮ এপ্রিল আমরা জৈজোরী গেলাম। চাষের কাজ হচ্ছিল। বাদলা দিন। দুপুরবেলা দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও হলো। খেতের ফসল যতক্ষণ না ঘরে ওঠে ততক্ষণ চাষীর মনে ভয় থাকে।

দেখলাম এক্কাগাড়ির ভাড়া বেশি বাড়েনি। দুধ আর নুনের দাম আগের মতই আছে; কিন্তু বলদের দাম কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। চাষীরা বলছিল, যে 'আমাদের বলদগুলো সরকার সৈন্যবাহিনীর জন্য কিনে নিচ্ছে।' কেউ কেউ বলল, 'বলদকে ওজন করে ৪০ টাকা মণ দাম দিয়েছে।' যাই বলা হোক, সেনাবাহিনীর খাদ্যের জন্য এখন অনেক বেশি সংখ্যক গরু-বলদকে যে মারা হচ্ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং চাষবাসের ব্যাপারে এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফরিদপুরে হক সাহেবের 'আশিয়ানা'তে গেলাম। ২২ বছর আগে বাবু মথুরাপ্রসাদের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। সেই দিনটির কথা মনে পড়ে —যেদিন বেগম হক আমাদের চা খাইয়েছিলেন। আর বাবু মথুরাপ্রসাদ আমাকে বৈষ্ণব ভেবে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে চা-পানে কোনো দোষ নেই। কিন্তু আমি তো আগেই কূর্গে মুসলমানের সঙ্গে এক থালায় খেয়ে এসেছি। ১৯২৬ সালে যখন হক সাহেবের কাছে এসেছিলাম তিনি তখন বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে বসেছিলেন। বললেন, 'এসো বোস, এখানে পড়াশুনা করো, আর অধ্যাত্মবিদ্যা অভ্যাস করো।'

দুপুরবেলা এখানেই মজহরের কাছে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা জৈজোরী গেলাম। সেদিন জৈজোরীতে এবং তার পরের দিন অমবারীতে কৃষক-সভা হলো। বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আমি কিছু বললাম। জৈজোরীতেই শুনতে পেলাম যে অদমাপুরের বাঁধ (ঘাঘরা নদীর) নাকি রাহুলবাবা বেঁধে দিয়েছেন। আমি একটু আশ্চর্য হলাম। অমবারীতে

যখন আদমপুরের বাঁধ নির্মাণ করার জন্য কাঁসর-ঢোল বাজিয়ে রাহুলবাবার গান রামায়ণের সঙ্গে গাইতে শুনলাম, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। শুধু তাই নয়—মাঝীর রেলপুল ভূমিকম্পের সময় ভেঙে গিয়েছিল, সেই পুলের মেরামতির কৃতিত্বও ইংরেজ কোম্পানি বা ইংরেজ সরকারকে নয়, রাহুলবাবাকেই দেওয়া হচ্ছিল। গল্প যে কিভাবে তৈরি করা হয় এই ঘটনা তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অদমাপুরের বাঁধ বাঁধার গল্পে সত্য অংশ এইটুকুই ছিল—ঘাঘরার বাঁধের দাবিতে এক জবরদস্ত জনসভার আয়োজন করেছিলাম ছাপরায়, এতে বারো-তেরটি থানার কৃষক যোগ দিয়েছিল, অমবারীর কৃষকরাও সামিল হয়েছিল। পরে সরকার যখন সেই বাঁধ বানিয়ে দিল এবং যেখানে একদানাও শস্য হত না সেখানে জল পেয়ে গত চার বছর ধরে যখন খুব ধান হতে লাগল, তখন কৃষকরা তাদের সহজ বুদ্ধি আর ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ে অদমাপুরের বাঁধের সঙ্গে আমার নামও জুড়ে দিল। অমবারীর কৃষকরা এখন ভালো অবস্থায় ছিল। চন্দ্রেশ্বরবাবু আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে এই কৃষকদের সম্পর্ক এখন বেশ ভালোই। সত্যাগ্রহের সময় গুপ্তেশ্বরবাবুই আমাকে মারবার জন্য লাঠিয়ালদের উসকে দিচ্ছিলেন। আর আজ উনি নিজেই খুব উৎসাহ নিয়ে তাঁর বাড়ির দোরগড়ায় সভার আয়োজন করেছেন, প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের চাঁদা দিয়েছেন, অন্যদেরও দিতে বলেছেন। সভা শেষে জলযোগ করালেন এবং অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, 'যে স্বপ্ন আমরা দেখছি তাতে কারো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।'

চৌত্রিশ বছর পর

চৌত্রিশ বছরটা যে কি, এর আগে আমি কখনো তার মুখোমুখি হইনি। গোনা যায় এমন তো অনেক ঘটনাই ছিল, যেগুলো চৌত্রিশ কেন তারও অনেক বেশি বছর ধরেই শুনে যাচ্ছিলাম; কিন্তু চৌত্রিশ বছরের সত্যিকার রূপ আমি তখনই বুঝলাম যখন আমার জন্মস্থান ও আমার দাদুর গ্রাম পন্দহাতে আমি সেইসব দেখলাম যেগুলো দেখেছিলাম আমার যৌবনের বসন্তে। আর আজ? আমার তিনমামীমার মধ্যে সুরজবলী মামার স্ত্রীর কথাই ধরুন। ইংরেজি ১৯০৯ সালে আমি যখন গ্রাম ছাড়ি তখন উনি ছিলেন কুড়ি-বাইশ বছরের এক সুন্দরী তরুণী, আর আজ গঙ্গা-যমুনার অসংখ্য নালার মত বলিরেখা তাঁর মুখের ওপর আঁকা রয়েছে। তার ওপর একটা চোখও যেতে বসেছে। সেই সুন্দর মুখের কোনো চিহ্ন আজ আর নেই। পন্দহায় এখন যারা আছেন তাদের মধ্যে আমার পরিচিত মুখের সংখ্যা এক ডজনের বেশি হবে না, এবং তাদের সবারই অবস্থা ছিল পাকা আমের মতো।

যদিও আমার পরিচিত মুখগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই চিরদিনের মতো গত হয়েছে,

—১৯৪২—

তবে তাদের জায়গায় অনেক তরুণ মুখ আমি দেখলাম এবং অনেকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। এই নবপরিচিত মুখগুলোর দেখা পেয়ে যে আনন্দ পেলাম সেটাই আমাকে একটি সত্য কথা বুঝিয়ে দিল যে, নতুনদের জন্য পুরনোদের জায়গা খালি করে দেয়া জরুরি।

সাতাশ বছর হয়ে গেছে আমি আমার নিজের জেলা আজমগড় যাই নি। আমার বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে সঙ্গে সঙ্গে ৯ এপ্রিল ১৯৪৩-এর পর, আমার আজমগড় জেলায় যাবার ইচ্ছে ছিল। যদিও আমার বন্ধুদের মতো আমিও এই সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলাম। তবু নানা কাজ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যে এবছরও বোধ হয় আর যাওয়ার সময়-সুযোগ পাওয়া যাবে না, কিন্তু সময় পাওয়া গেল।

১২ এপ্রিল রাত একটার সময় সিওয়ান (ছাপরা) থেকে নাগার্জুন আর আমি ট্রেনে আজমগড় রওনা হলাম। বেলা একটা নাগাদ মউ-এর তপ্ত মাটিতে পা রেখেও এক ধরনের আনন্দ অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল, আমার কোনো অধিকার থেকে এতদিন আমি বঞ্চিত ছিলাম আর আজ আবার সেটা আমি ফিরে পাচ্ছি। পরের ট্রেনটির যে কামরায় আমি বসেছিলাম সেখানে আরো অনেক বলিষ্ঠ গ্রামের ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁদের লম্বা-চওড়া-স্বাস্থ্যবান চেহারা দেখে আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। তাঁরা সেই ভাষাতেই অত্যন্ত উজ্জীবিত হয়ে কথা বলছিলেন যে ভাষা আমিও মায়ের দুধ পান করার সঙ্গে সঙ্গে শিখেছি। আমার খুব আফশোশ হচ্ছিল কারণ এখন আমি আর সে-ভাষা বলতে পারি না। আজমগড়ে সাতদিন থাকাকালীন আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঐ ভাষাতে কথা বলার চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু আমার মুখ থেকে শুধু ছাপরার ভাষাই বেরিয়ে আসছিল।

আজমগড়ের তরুণ সাহিত্যিক শ্রীপরমেশ্বরীলাল গুপ্ত স্টেশনে হাজির ছিলেন, সুতরাং শহরে ধর্মশালার খোঁজ করার আর দরকার হলো না। এ যাত্রায় আমি এক তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে এসেছি আর শৈশবের স্মরণীয় জায়গাগুলোর সঙ্গে আবার পরিচয় করার, এবং দেখার লোভ ছিল, সেজন্য কোনো জনসভা, অভিনন্দন ইত্যাদিতে সামিল হতে একেবারেই চাই নি। আনন্দের কথা গুপ্তজী আমার মনের কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন।

আজমগড় শহর আমার গ্রাম পন্দ্‌হা থেকে মাইল সাতেকের বেশি নয়—কিন্তু তাহলেও শহরে আমি খুব কমই গিয়েছি। ওখানকার তহশীল স্কুলটা দেখেছিলাম। এবার গিয়ে দেখলাম স্কুল অন্য জায়গায় উঠে গেছে। স্কুলের বাড়িটি নতুন, কিন্তু পুরনো বাড়ির শ্রীহীনতা বজায় রাখার জন্য সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছে। শিবলী-মঞ্জিল আজমগড়ের একটি দারুণ জিনিস। ইসলামিক সংস্কৃতির পণ্ডিত এবং আরবী-ফারসীর মহাজ্ঞানী আল্লামা শিবলী ছিলেন এক মহান প্রতিভাধর ব্যক্তি। তিনি নিজের কলম আর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা মারফৎ দেশের বিপুল সাংস্কৃতিক সেবা করেছেন। তাঁর কাজকে আরো বিস্তৃতরূপে সচল রেখে মৌলানা সুলেমান নদবী তাঁর জীবন্ত স্মৃতিকে স্থায়ী করে রেখেছেন দেখে অত্যন্ত আনন্দ হলো। এই শিবলী-মঞ্জিলে কত বিদ্বান ব্যক্তি কত কষ্ট স্বীকার করে আর আত্মনিমগ্ন হয়ে ইসলামের চর্চায় এবং গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত আছেন। শিবলী-মঞ্জিলের দার্-উল-মুআরিফ উর্দু-সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

১৩ এপ্রিল সকাল আটটার সময় আমরা দুজন এক্কাগাড়িতে চেপে রানীকীসরাইয়ের

দিকে রওনা হলাম। শহরের বাইরে বেরোতে বেরোতে পুলিশ আমাদের এক্কাওলাকে যে নিয়মকানুনের কথা শোনাল সেটা আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা—পুলিশ আজ সর্বশক্তিমান।

পাঁচ-ছ বছর বয়সে আমি যখন প্রথম পড়াশোনা করতে রানীকীসরাইয়ে পা রেখে ছিলাম, তখন খুব ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করতাম। পন্দহা গ্রামের ছেলেদের কাছে রানীকীসরাই ছিল একটি সম্ভ্রান্ত নগরী। ওখানকার প্রতিটি কথার মধ্যে মর্যাদা ফুটে উঠত। রানীকীসরাইয়ের ছেলেরা যখন 'পকড়না' বলত তখন বুঝতাম 'ধরনা' নয় 'পকড়না'ই হচ্ছে শহুরে শব্দ। যখন দেখতাম রানীকীসরাইয়ে পুরুষদের ধুতির একভাগ এক্কপায়ের হাঁটুর কাছে আর একভাগ অন্য পায়ের গোড়ালির কাছ বরাবর থাকে, তখন মনে হতো—এই হচ্ছে শহুরে পোশাক। পরের দিকে রানীকীসরাইয়ের শহুরে জীবনের সেরকম মর্যাদা আর না থাকলেও রানীকীসরাইয়ের মাদ্রাসায় ছটি বছর আমার আত্মনির্মাণে তা একটি বড় অংশ জুড়ে আছে।

পথ চলতে চলতে আমি একেবারে বসতির বাইরে চলে এলাম তবু কোনো মুখকে চিনতে পারলাম না। এক ব্যক্তি কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ করছিলেন—কিন্তু রামনিরঞ্জন পণ্ডিত যে রানীকীসরাইতে থাকতে পারেন এটা আমার খেয়াল ছিল না। আমরা দুজনে স্টেশনের দিকে বাঁক নিলাম। আমার অতি পরিচিত পুকুর রানী-সাগরের দক্ষিণ পাড়ে হিন্দি মিডিল স্কুল আর প্রাইমারি স্কুল পাওয়া গেল। ছুটি ছিল তাই জায়গাটা ছিল নির্জন।

তারপর আমরা পুকুরের উত্তর পাড়ে গেলাম। আজও সেখানে মহাবীরের মন্দির বর্তমান, এমনকি তার বানরসেনার সংখ্যাও কম ছিল না। সেই কুয়োটিও ছিল আর জলে এখনও ছিল সেরকম দুর্গন্ধ যেমনটি আমাদের শৈশবে প্রত্যেক বছর একমাসের জন্যে পেতাম। দুজন সাধু ওখানে ছিলেন তাঁদের কিছু কথা জিজ্ঞেস করলাম। গেরুয়াধারী ফক্কড়বাবা (বলদেও দাস) আমাকে ভালো করে দেখতে লাগলেন আর দু-চার কথা হতে না হতেই উনি ঝট্ করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আপনি রাহুলজী নন তো?' ফক্কড়বাবাও তখন রানীকীসরাইয়ের স্কুলে পড়তেন, আমি ওনার দু-ক্লাস নিচে পড়তাম। সুতরাং এখন আমার পরিচিতদের ঠিকানা পাওয়া সোজা হয়ে গেল, যদিও আমার পরিচিতের মধ্যে অধিকাংশই ইহজীবন সাঙ্গ করে ফেলেছিলেন। মহাবীরজীর মন্দিরের কাছে বট গাছের গোড়ায় একটি ভাঙা মূর্তি রাখা ছিল, মূর্তিটি যে গুপ্তযুগের[১] সেটা আর গোপন ছিল না।

ফক্কড়বাবার সঙ্গে সেই জায়গায় এলাম যেখানে একদিন আমাদের পুরনো মাদ্রাসা ছিল। মাঝখানে দালান, তিনদিকে বারান্দা, একদিকে দুটো ঘর—মাদ্রাসার এই ছবিটি এখনও আমার স্মৃতিপটে আঁকা আছে। প্রতি বছর শীতে চুনকাম করা উজ্জ্বল দেওয়ালগুলো এখনও আমি দেখতে পাই। চারদিকে দেওয়াল-ঘেরা উঠোনে লাগানো

[১]চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী। গুপ্তযুগের প্রারম্ভ ধরা হয় ৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের কাল থেকে।—স·ম·

গাঁদা ফুলের সুগন্ধ যেন আজও আমি পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন জায়গাটার যা অবস্থা দেখলাম তাতে আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। এখন সেখানে মাদ্রাসার আর কোনো চিহ্নই নেই। ওখানে বাসক পাতার গাছ আর কিছু অন্যান্য কাঁটাওলা গাছ ছিল। লোকে এখন এ জায়গাটা খোলা পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করছিল। তবে হ্যাঁ, আমার চেনা এক-আধটি তেঁতুল গাছ এখনও মজুত ছিল। বাজারে দ্বারিকাপ্রসাদ, রামনিরঞ্জন পণ্ডিত আরও কিছু বন্ধু-বান্ধবদের দেখা পাওয়া গেল। সবাই আন্তরিক স্বাগত জানালো।

রানীকীসরাই থেকে পন্দ্‌হা গ্রাম মাইল খানেকের বেশি দূর হবে না। দুপুর রোদে যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের ছিল না, কিন্তু আমার আসার খবর পন্দ্‌হাতে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের চলে যাওয়ার আগেই রামদীন মামার ছেলে কৈলাশ এসে হাজির।

মাদ্রাসায় আসার দুটো রাস্তা ছিল, ছোটবেলায় গল্প শুনেছি—রাস্তার একটিকে ছমাসের আর একটিকে এক বছরের রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা হতো; যদিও দুটোর মধ্যে কোনটি ছমাসের আর কোনটি এক বছরের সেটা কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারি নি। আমার কাছে তো দুটোই কঠিন ছিল। একটি ন্যাড়া অশ্বত্থ গাছ ছিল আর সেই ন্যাড়া-বাবার প্রতাপ এতই প্রবল ছিল যে শাকসব্জী ফল বিক্রেতা স্ত্রী-পুরুষরাও কিছু একটা ভোগ না চড়িয়ে ঐ জায়গা পেরোত না। দ্বিতীয় রাস্তায় পড়তো নিমগাছে ঢাকা বালদণ্ড রায়ের পুকুর—সেখান দিয়ে এমন কি দুপুরবেলায়ও নিরাপদে পার হওয়া খুবই মুশকিল ছিল—হাজার হাজার ভূত-পেত্নীরা তখন সেখানে নাচানাচি করতো। এই দুটি জায়গার বাবাদের পায়ে পড়ে দিদাকে তার নাতির জন্য দয়া ভিক্ষা করতে দেখে আমারও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে এই জায়গাদুটোই মারাত্মক বিপদে ভরা। আমি ছিলাম উর্দু ভাষার ছাত্র—কিন্তু 'বাবা'দের এত ভয় পেতাম যে 'মহাবীরের নাম শুনলে পরে/ভূত-পিশাচ কাছে আসতে ডরে'-র মহিমা শুনে পুরো 'হনুমান-চালীসা' মুখস্ত করে ফেলেছিলাম।

আমরা বালদণ্ডের পুকুরের রাস্তা ধরেই গেলাম। রাস্তার ধারে পতিত জমি আর জঙ্গল সবই এখন চাষের খেত হয়ে গিয়েছিল। বহু বছর হলো ভূতেরা পুকুরের ওপর নৃত্য-মহোৎসব বন্ধ করেছে—লোকের মন থেকে ভয় দূর হচ্ছে। ন্যাড়া-বাবার হালও দেখলাম আরও খারাপ। উঁচু রাস্তার ধারে কয়েকটি পাতাসহ একটি শীর্ণ শাখাযুক্ত দীর্ঘ অশ্বত্থ গাছটিকে বহুদূর বিস্তৃত বৃক্ষ-বনস্পতিহীন প্রান্তরে দণ্ডায়মান দেখলে রাতের বেলায় কোনো নিঃসঙ্গ পথিকের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়াটাই ছিল অনিবার্য। কিন্তু বহু বছর হয়ে গেছে, কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে, রাস্তার ধারে ধারে উঁচু উঁচু গাছের সারি দাঁড়িয়ে গেছে আর ঐ সারির মাঝে অশ্বত্থ গাছটি তলিয়ে গেছে—যার ফলে ন্যাড়া-বাবার প্রভুত্বে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছে। আর এখন তো ঐ গাছও কেটে ফেলা হয়েছে। ন্যাড়া-বাবা নতুন প্রজন্মের জন্য নিজের অস্তিত্ব খুইয়ে বসেছে।

পন্দ্‌হায় ঘুরতে ঘুরতে পরিচিত বৃদ্ধদের মধ্যে প্রথমে দেখা হলো লৌহর দাদুর সঙ্গে। তাঁর অশ্রুগদগদ কণ্ঠে 'কুলবন্তীর ছেলে কেদার' বলে বুকে জড়িয়ে ধরা আমার ধৈর্যের ওপর প্রবল প্রহারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। চোখকে শুকনো রাখতে আর গলার স্বর ঠিক

করতে আমাকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল।

ছেলেবেলার প্রিয়জনদের চেহারাগুলো আমার সামনে দিয়ে পেরিয়ে যেতে লাগল। আমার দাদুরা তিন ভাই ছিলেন। আমার মা ছিলেন আমার দাদুর একমাত্র সন্তান আর দাদুর বড় ভাইয়ের পাঁচজন এবং ছোট ভাইয়ের দুজন ছেলে ছিল। সাতজন মামার মধ্যে শুধু জহরমামাই বেঁচে আছেন। আমি যখন ছোট তখন তিনি কলকাতায় পুলিশের সেপাই ছিলেন—এক-আধ মাসের ছুটিতে যখন বাড়ি আসতেন সঙ্গে আনতেন টাটকা শাঁসওলা নারকেল। এখন তিনি পেনসন পাচ্ছিলেন, চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মুখের গড়ন তাঁর বাবার তিন ভাইয়ের মতোই ছিল। বিশ্বামিত্র বা বশিষ্ঠ ঋষির মতো শুধু সাদা দাড়িই নয়, দাদুর মতো তার মুখ আর রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শেষমেশ আমার চোখ ভিজিয়েই ছাড়লো। রানীকীসরাইতে কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম তবে ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছিলাম। কিন্তু পন্দ্‌হার কাছে হেরে গেলাম। কুলবন্তীর ছেলে আর রামশরণ পাঠকের নাতি—কেদারনাথকে দেখতে সারা গাঁয়ের লোক আসতে লাগল। আমার তিন বিধবা মামী—তাঁদের সবারই পুত্র-পৌত্র আছে—ভাগনেকে দেখতে এলেন। চোখের জলে ধোয়া তাঁদের মুখ দেখে আমার প্রিয় মামী রামদীন মামার প্রথমা স্ত্রীর কথা বারবার মনে পড়ছিল। তাঁর স্নেহ আমার শৈশবের বহুমূল্য স্মৃতিগুলোর একটি।

পন্দ্‌হার গলি-ঘুঁজি, তালগাছ, পুকুর ইত্যাদি তেরো বছর ধরে রাতদিন দেখেছি, আর তারপরও আরো তিনবছর পন্দ্‌হার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। গাঁয়ের পুরনো জায়গা দেখতে বেরোলাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো—পুরনো কুয়ো-খানাখন্দ-পুকুরের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল সেগুলো যেন কমে গিয়ে তিনভাগের একভাগ হয়ে গেছে। পৃথিবী কি সত্যিসত্যি ছোট হয়ে গেল না ছোট ছিলাম বলে ঐ ছোট জায়গাগুলো বড় দেখাতো? আমাদের পুরনো পাঁচিলের গায়ে কয়েকটি ঘরও ছিল, দরজার দিক পরিবর্তন হয়েছে, উঠোনেরও পরিবর্তন হয়েছে। সেই উঠোন আর তার পাশের ঘরটি দেখতে গেলাম। যেখানে আমার মা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর বড় ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু সে-ঘরের কোনো চিহ্নই আজ আর নেই। উঠোন, কয়েকটি ঘর, বাইরের দরজা, মাটির হাঁড়ি রাখার ঘর তথা বৈঠকখানা সব যেন চার দেয়ালে ঘেরা এক দৃশ্যমান যন্ত্রণা হয়ে পড়ে আছে। খোলা জায়গার খানিকটা অংশ নতুন খাপরা দিয়ে ঢাকা ছিল, সেটাই ছিল আমার আঁতুড়ঘরের জায়গা। পুরনো কুয়োটি এখনও ছিল, আজও তার জল তেমনি মিষ্টি আছে শুনে খুব আনন্দ হলো।

গভীর রাত পর্যন্ত গাঁয়ের বৃদ্ধ আর তরুণের দল নানা কথা জিজ্ঞেস করতে থাকলো। চৌত্রিশ বছর পর রামশরণ পাঠকের নাতি এবং হিন্দি লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রামে ফেরার খবর পেয়ে আশেপাশের গাঁয়ের লোকও আসতে লাগল।

১৪ এপ্রিল পন্দ্‌হা গ্রামের আরো কিছু স্মরণীয় জায়গা আর দেবতাদের দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। হাত-মুখ ধোবার জন্য গাঁয়ের উত্তরদিকে গেলাম। দেখলাম, বনওয়ারী মাঈয়ের পাশের ঝোপঝাড় সাফ হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জহর মামার লাগানো মহুয়া গাছগুলো। বনওয়ারী মাঈয়ের স্থান দেখে মনে হচ্ছিল যে নমাসে-ছমাসে কেউ ভুল

করে পুজো-প্রসাদ দেয়। ওখানে একটি ভাঙামূর্তি থাকতো। লোকে বলল, 'কিছুদিন আগে মাঈ অন্তর্ধান করেছেন।' গাঁয়ের এইসব পুরনো দেবস্থানগুলোতে অনেক ভাঙাচোরা কিন্তু শিল্পমণ্ডিত প্রাচীন মূর্তি দেখা যায়, বনওয়ারী দেবীর মূর্তিও সেরকমই একটি হতে পারে এবং কোনো শিল্প বা অর্থপ্রেমিক যে তাকে উধাও করেছে এতে সন্দেহ নেই।

সেদিন ছিল রামনবমীর রাত। ছেলেবেলায় 'রামনবমী'র বদলে তার অন্য নাম 'বড়কা বসিঔড়া'টাই আমি বেশি শুনতাম। আজ বোধহয় পন্দ্‌হা ছাড়ার পর প্রথমবার 'বসিঔড়া' নামটি শুনতে পেলাম। আমার মামী (কৈলাশের মা) বিশেষ জলখাবার বানাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একবার 'বসিঔড়া'র কথা শোনবার পরও আমি কেন অন্য খাবার খেতে যাব? খাঁটি মাষকলাইয়ের ডাল (হলুদ ছাড়া), তেলের বেড়হিন (ডালভরা পরোটা), গুলগুলা আর লালভাত ছেলেবেলার পরিচিতি খাবার ছিল। আজও সেগুলো খেতে খুব আনন্দ হচ্ছিল। সারাদিন ধরেই আমাদের গাঁয়ের এবং নিকটস্থ গাঁ থেকেও লোক আসতে থাকল। এদের মধ্যে আমার রানীকীসরাইয়ের সহপাঠী জগেসর (ঝিলমিট) আর বাঁকীপুরের বাবু সরযূ সিংহও ছিলেন। আমি ষোল-সতেরো বছর বয়সের সরযূবাবুকে দেখেছিলাম। এখন তাঁর চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, তিনি এখন কয়েকটি নাতির দাদু।

সন্ধেবেলা আবার গাঁয়ের পাড়াগুলোতে এমনিই ঘোরাঘুরি করলাম। দেবতাদের মহত্ত্ব অবশ্যই এই চৌত্রিশ বছরে হ্রাস পেয়েছে। যে মহামায়ের থানে নবদম্পতিদের পুজো দেওয়ার জন্য যাওয়া অনিবার্য ছিল, আজ সে জায়গারও আশপাশ পায়খানার ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে এবং গাছের গুঁড়িতে যে পাঁচ-সাতটি সিঁদুরের দাগ দেখলাম মনে হলো সেগুলো সত্যযুগের দেওয়া। আগে বিয়ে, পুত্রসন্তানের জন্ম ইত্যাদি উপলক্ষে গুণে গুণে গ্রাম দেবতাদের ভোগে শাবক (শুকর ছানা) দেওয়া হতো। আমার মামাতো ভাই দীপচন্দ আর কৈলাশের হিসেব মতো এক ডজনের ওপর শাবক ওদের নামে বাকি পড়ে আছে। হনুমতবীর আর অনারবীরকে লোকে এমনিতেই তো আর ভয় করে না—যেমন আমি ভয় করি না বুড়োদের। কিন্তু জহর মামা বলছিলেন—আমি সারাজীবন ধরে চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরো শোনালেন কিভাবে অনারবীর বাবা তাঁর সেবকদের উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হয়ে এই কয়েকবছর আগে গাড়িতে জুতে দেওয়া বলদ দুটোকে পেছন থেকে দাবিয়ে একেবারে শূন্যে তুলে ফেলেছিলেন—বলদ দুটোর প্রায় ফাঁসি হয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, শেষে কোনোরকমে দড়ি কেটে দিয়ে বলদ দুটোর প্রাণ বাঁচান গেছে। আশ্চর্যের কথা হলো, এইসব দেখেও নতুন প্রজন্ম দেবতাদের পুজো-আচ্চা করতে রাজি নয়।

পন্দ্‌হা গাঁয়ের প্রান্তে একটি ছোট্ট বসতি বসই। বাদশাহী আমলে এখানকার সৈয়দদের বৈভব-সূর্য ছিল মধ্য-গগনে। এরা এদের তৈরি পণ্য সোজা লক্ষ্ণৌ পাঠাতো। আজ আর এদের বাড়ির কোনো চিহ্ন নেই। কয়েকজন সৈয়দ ছেলে তো আমার সঙ্গেই রানীকীসরাইতে পড়তে যেত। ওদের সঙ্গে কতবার আমি ওদের বাড়ি গিয়েছি। ঘরগুলোর ইঁট খসে খসে পড়ছিল—তার মধ্যেও অনেক ঘর বেশ ভালোই ছিল। বাড়ির উঠোনে চারপাইয়ের ওপর বসে বৈভবশালী বংশের সন্তান—সৈয়দ-স্ত্রী নিজের ছেলেদের সঙ্গে আমাকেও একই রকমভাবে স্নেহময় আপ্যায়ন করতেন। আজ ওঁদের বংশের কেউই

বস্‌ইতে বেঁচে নেই। বাড়ির ইটগুলো পর্যন্ত উধাও। বাড়ির পিছনে সেই ডালিম গাছ আর আতা গাছেরও কোনো চিহ্ন নেই—যেগুলোর প্রতি ছেলেবেলায় আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রাচীন সৈয়দদের ইঁট-চুনের কবরের ওপর অশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করে আমি কোইরীদের বাড়ির দিকে চললাম। এখন শাক-সব্জীর তত খেতও নেই আর তত বাড়িও নেই। আমার ছেলেবেলার সহপাঠী হীরাদের বাড়িতে এখন আর কেউই বেঁচে নেই। বসইতে কত ঘর তাঁতি ছিল—কিন্তু আজ এরা কাপড় বোনার বদলে শনের সুতলি বানাচ্ছে—কতজন তো কাপড় বোনাও ভুলে গেছে।

ফেরার পথে ছেলেবেলার সহপাঠী রাজদেব পাঠকের সঙ্গে দেখা। ওর সব চুল শনের মতো সাদা হয়ে গেছে। সে বাচ্চাদের 'চিব্‌ভী ডাঁড়ী' খেলার নিমন্ত্রণ জানালো। একবার মনে হলো—হায়! আবার যদি বারো-তেরো বছর বয়সে ফিরে যাওয়া যেত! কিন্তু তাহলে পরের দুই প্রজন্ম কোথায় থাকতো? সতমীদের বাড়িরও কোনো চিহ্ন নেই। সতমীর চারটে বাচ্চা কিভাবে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে দারিদ্রের বলি হলো সেকথা আমি একটি গল্পে লিখেছি।[1] সতমীর সবচেয়ে ছোট ছেলে সন্তু এখনও হয়ত কোথাও বেঁচে আছে।

পন্দ্‌হা যাবার আগে অল্প কিছু নাম আর মুখ আমার পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ওখানকার নতুন-পুরনো চেহারা দেখে, ওখানকার মাটিতে আর পরিবেশে ঘুরে ঘুরে এবং শ্বাস নিতে নিতেই পুরনো স্মৃতি জেগে উঠতে লাগল। সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ওপরে যাদের দেখেছি তাদের চিনতে আর অসুবিধে হলো না।

১৬ এপ্রিল আমরা নিজামাবাদ গেলাম। এখানকার স্কুল থেকেই আমি ১৯০৯ সালে উর্দু-মিড্‌ল্ পাশ করেছিলাম। পুরনো মিড্‌ল্ স্কুলের জায়গাতেই শুধু না, তার ভিতের ওপরেই তার মতোই দেখতে একটি পুরনো বাড়ি হয়েছে। মিড্‌ল্ স্কুল এখন মফস্বল শহরের পশ্চিমে চলে গেছে। দুই স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে আমার পরিচিত কেউ ছিলেন না। টৌসের ঘাট আর তার পাশে ছোট্ট শিবমন্দিরটি এবং নানকশাহীর সাধু-নিবাসটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না। অবশ্য ঘাটের ওপর নতুন জিনিস বলতে ছিল দু-একটি পানের দোকান। খবর পেয়েছিলাম আমার পুরনো শিক্ষক পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রিয় নিজের বাড়িতেই আছেন। তাঁর বাড়ি শহরের ভেতরের সাধু-নিবাসের পাশে। এই সাধু-নিবাসটিও আগের মতোই আছে। তবে একটি ফারাক অবশ্যই বোঝা যায়—বাইরের ছাতের নিচে পা রাখতেই লোকের মাথায় জোরজবরদস্তি আঘাত করা হয়। পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রিয় 'হরিআউঠ'জীর শিষ্য ছিলেন। স্কুলের এবং সাহিত্যের দুটোরই। আমাকে দেখে খুশি হলেন। নাগার্জুনজী নিজের কবিতা—'জাতিগৌরব গঙ্গাদত্ত' শোনালেন। এরপর শ্রোত্রিয়জীও নিজের লেখা কিছু কবিতা শোনালেন।

নিজামাবাদের সেইসব কুমোরদের বাড়িতেও গেলাম—যারা খিলজী শাসনের আমলে দেবগিরি থেকে এখানে এসে বসবাস করতে থাকে। এদের তৈরি মাটির পাত্র

[1] গল্পটির নাম *'সতমী কে বচ্চে'*। পরবর্তী সময়ে (১৯৩৫) লেখক এই নামেই একটি সংকলন প্রস্তুত করেন যা *কিতাব মহল* থেকে প্রকাশিত হয়। এটাই লেখকের প্রথম গল্প সংকলন।—স·ম·

সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় কুমোরদের সঙ্গে এদের আত্মীয়-কুটুম্বের সম্পর্ক আছে, কিন্তু এরা নিজেদের কারুশিল্প অন্য কুমোরদের শেখাতে নারাজ—তাই এরা নিজেদের মেয়েদের পর্যন্ত এই কারুশিল্প শেখায় না। যুদ্ধের আগে এদের তৈরি লক্ষ লক্ষ টাকার পাত্র—চায়ের সেট, ফুলদানি ইত্যাদি দেশ-বিদেশে যেত, কিন্তু আজ অবস্থা ভালো নয়। এখন এই ঝিনকারীর কুমোরদের সংখ্যা এক ডজনের বেশি হবে না।

ফেরার সময় পন্দ্‌হার সীমান্তে সেই জমিও দেখলাম যেখানে কয়েক বছর আগে 'ঘোড়রোজ' (নীলগাই) শিকার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেবাসুর-যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর এখন শান্তি। হিন্দুরা হায় হায় করছিল—পাঁচ দশ বছর আগে যেখানে দু'চারটে ঘোড়রোজ দেখা যেত, সেখানে আজ এদের সংখ্যা বেড়ে পঞ্চাশে গিয়ে পৌঁছেছে এবং চাষের খুব ক্ষতি করছে। আমি বললাম, 'ঘোড়রোজ ছাগল আর হরিণ জাতীয় প্রাণী, এদের কান, চোখ, লেজ ওরকমই হয়, মলও ওরকমই হয়।' ওরা আবার আমাকে বলল, 'ছাগলের মত এরাও একাধিক বাচ্চা দেয়।' এতসব শোনার পরও লোকে এদের গাই বানিয়ে ধর্মযুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

১৩ এপ্রিল আমি যখন রানীকীসরাই পৌঁছেছিলাম তখনই কেউ আমার পিতৃগ্রাম কনৈলাতে খবর দিয়ে দিয়েছিল। আজমগড় জেলার জন্য আমার হাতে সময় ছিল স্রেফ সাতদিন তাই এই কম সময়ের মধ্যে কনৈলাকে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে রাখতে চাই নি। আমার মামাতো ভাই দীপচাঁদ আর কৈলাশ বারবার কনৈলাতে খবর দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় চুপ করে গেছে।

পরের দিন (১৪ এপ্রিল) দুপুরবেলা দেখি আমার ছোটভাই শ্যামলাল সাইকেলে চেপে পন্দ্‌হায় এসে হাজির। আমি একটু আশ্চর্য হলাম—কে খবর দিল? বুঝলাম চৌত্রিশ বছর পর ফিরে আসা মানুষের খবর লোকের কাছে খুব আকর্ষণীয়। সেই কারণেই আমার আসার খবর রানীকীসরাইয়ের সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। রানীকীসরাইতে কনৈলার চুড়িহারদের আত্মীয়স্বজন ছিল। সেখান থেকে কেউ কনৈলায় গেছে আর সেদিনই আমার আসার খবর দশমাইল দূরে পৌঁছে গেছে। ভাই বাড়ির লোকদের আর গাঁয়ের লোকদের হয়ে যাবার জন্য খুবই জোরাজুরি করল, কিন্তু আমি রাজি হলাম না। বললাম, 'সামনের বার হবে।' শ্যামলাল সেদিনই ফিরে গেল।

১৬ তারিখ বিকেলবেলা রোদ থাকতে থাকতেই কনৈলা থেকে দলে দলে লোক আসা শুরু হলো। পাঁচজন-ছজন করে রাত দশটা পর্যন্ত তারা আসতে থাকলো। এদের সংখ্যা তিরিশের ওপর পৌঁছে গেল, আর এদের মধ্যে ছিলেন বহুজাতের প্রতিনিধি। গাঁয়ের বুড়ো কাকা রঘুনাথ আর দাদাঠাকুর সুখদেব পাণ্ডের এই দশ-এগারো মাইল রাস্তা পেরিয়ে আসা দেখে আমি অবশ্যই কিছুটা বিচলিত বোধ করলাম। এখানে আসার পক্ষে কনৈলার সবচেয়ে বেশি অসমর্থ ছিলেন রামদত্ত কাকা, কিন্তু আমাকে দেখার জন্য উনি যে কতটা উৎসুক ছিলেন তার পরিচয় আগেও এক-আধবার পেয়েছি। আমাদের গাঁয়ের অনেক বৃদ্ধাদের দর্শন পাওয়া থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম। আমার সংস্কৃতের প্রথম গুরু তথা

পিসেমশাই মহাদেব পণ্ডিত (বছওয়ল) আমাকে দেখার জন্য কয়েকবার খবর পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আমি যেতে পারিনি—দু'তিন বছর আগে তিনি মারা গেলেন। আমার জন্মের সময়কার সম্মিলিত পরিবারের ঠাকুমা মাত্র এগারো দিন আগে মারা গেছেন আর সেদিন আমার বংশজরা তাঁর শ্রাদ্ধ সেরেই এসেছিলেন। গাঁয়ের আরো কিছু বৃদ্ধাদের দেখার সুযোগ থেকে নিজেকে আর বঞ্চিত করতে চাইছিলাম না, তাই গাঁয়েরই নাতি আমার সমবয়স্ক অঘোর রঘুনাথবাবা যখন আমাকে কনৈলা যেতে বললো তখন আমি রাজি হয়ে গেলাম।

গ্রীষ্মের দুপুরে পথ চলা সুখের ব্যাপার নয়, তাই ভোরেই যাওয়া ঠিক করলাম। সকালে হাতিকে জিন পাঠিয়ে আনতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে আমরা পায়ে হেঁটেই রওনা দিলাম। দেড় মাইল হাঁটার পর হাতি আমাদের ধরল। প্রথমে রঘুনাথবাবার সঙ্গে আমি আর নাগার্জুন হাতির ওপর বসলাম। তবে আমরা দুজনেই এমন 'হাল্‌কা' শরীরের লোক যে নাগার্জুনজীর বুঝতে দেরি হলো না—হাতির পিঠে চড়ার চেয়ে পায়ে চলাই তার পক্ষে অধিক আরামদায়ক হবে। সেদিন দুপুর পর্যন্ত আকাশে মেঘ ছেয়ে ছিল। রঘুনাথবাবা আমার কৃত পুণ্যের শক্তির কথা বলছিলেন। কনৈলা থেকে দু'মাইল আগে ডীহায় পৌঁছলে বৃষ্টি জোরে পড়তে লাগল কিন্তু ওখানেই আমাদের হাতমুখ ধোয়া আর জলযোগ করারও কথা ছিল।

ডীহার আপার প্রাইমারি স্কুলটির আজ (১৭ এপ্রিল) ছুটি ছিল, তাই ওখানকার প্রধান শিক্ষক আমার সহপাঠী পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ পাণ্ডেয় ছিলেন না। গত কয়েক বছরে শিক্ষার বেশ প্রসার হয়েছে, জায়গায় জায়গায় নতুন মিড্‌ল্ স্কুল আর নানা ধরনের স্কুল থেকে এটা বোঝা যায়। রানীকীসরাইয়ে আমি যখন পড়তে গিয়েছিলাম, তখন ওখানে একটি ছোট্ট লোয়ার প্রাইমারি স্কুল ছিল, আর আজ ওখানে মিড্‌ল্ স্কুল হয়েছে। ডীহায় তখনই একটি মাদ্রাসা ছিল তবে এখন সেখানে তিনজন শিক্ষক পড়াতেন। আমি তো বরাবর দাদুর সংগে পন্দহাতেই থাকতাম তাই আমার পড়াশোনা রানীকীসরাই আর নিজামাবাদেই হয়েছে। তবে কনৈলার ছেলেদের পক্ষে ডীহার স্কুলটাই কাছে ছিল। এখন তো কনৈলাতেও আর একটি প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। কনৈলা থেকে দু-আড়াই মাইল দূরে ধরওয়ারাতে ছিল মিড্‌ল্ স্কুল। ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে মিড্‌ল্ স্কুল পাশ করা ছেলে কদাচিৎ দেখা যেত কিন্তুএখন প্রত্যেক গ্রামে এবং অধিক সংখ্যায় দেখা যাচ্ছিল। পন্দহায় কুবের দাদুর ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া ছেলেকে চাষের কাজে লাগাতে দেখে আমার সত্যি বেশ ভালো লাগল, তবে চাষের কাজে শিক্ষার প্রয়োগ যদি না হয় তাহলে সমস্ত পড়াশোনাই ব্যর্থ। শিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞানকে চাষের কাজে প্রয়োগ করছেন এটা দেখা যায় না। গাঁয়ে শিক্ষা প্রসারের প্রভাব যদি আর কোনো বিষয়ের ওপরে বেশি পড়ে থাকে তো সেটা হলো মামলা-মোকদ্দমার বৃদ্ধি। জমি-সম্পত্তির জন্য জাল-জুয়াচুরি বেড়ে যাচ্ছিল। এতে জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল হয় নি।

কনৈলার গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে—যেখানে প্রাইমারি স্কুলটা আছে—পুরনো বাড়ি ধ্বসে পড়েছিল, সেখানে কতগুলো বাড়ি আর বড় বড় গাছ দেখা গেল। অতীতের দীর্ঘ

বছরগুলো গাছের মাধ্যমে সহজেই হিসেব করা যায়।

আমরা গ্রামের বাইরে থাকতে থাকতেই ছেলেদের দল তাদের জন্মগত-নেতাদের সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানাতে এসে পড়ল—একে অভ্যর্থনা জানানো আর তামাশা দেখা—দুই বলা যায়। ওদের মধ্যে পাঁচ থেকে বারো বছরের ছেলেরাও ছিল।

গ্রামের নিকটেই ডাঙা জমির মধ্যে নির্জন একটি কুয়োর কাছে এসে আমি হাতি থেকে নামলাম। আমার ছোটবেলাতেও এই কুয়োটি এইরকম নির্জন-ডাঙা জমিতেই ছিল, আর গাঁয়ের লোক এখান থেকেই পানীয় জল নিয়ে যেত। নিজের দরজার সামনে কুয়ো কাটিয়ে আমার বাবা এই অসুবিধে দূর করার প্রথম চেষ্টা করেন। আজ তো গাঁয়ের মধ্যে অনেকগুলো কুয়ো হয়েছে। সেই ডাঙাজমির কুয়োর আশেপাশে একডজন ঘর বসেছে—ওদের মধ্যে চুড়িহার আর দর্জিদের সংখ্যাই বেশি। আমারই বয়সী কিন্তু সম্পর্কে কাকা রাজবলীর (রজব্ আলী) থুতনিতে ঝুলে থাকা দাড়ি শাদা হয়ে গিয়েছিল। দেখে খুব আনন্দ পেলাম যে এককালের মুমূর্ষু চুড়িহার আর দর্জি-পরিবারগুলো আজ বেশ স্বচ্ছল। কনৈলাতে তখন দু'তিনটি পরিবার ছাড়া আর সবারই দরিদ্র অবস্থা দেখে গিয়েছিলাম কিন্তু আজ সবারই অবস্থা ভাল ছিল। সে-সময় গাঁয়ের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি জমি ছিল অনুর্বর—এখন ঐ জমির অনেকটাই লোকে চাষের জমি বানিয়ে নিয়েছিল। আগের জমিতেও লোকে এখন অনেক বেশি শ্রম দিচ্ছিল। জলসেচের জন্য কতকগুলো পাকা কুয়ো বানানো হয়েছিল। মামলা-মোকদ্দমা অপেক্ষাকৃত কম—এটাই হচ্ছে কনৈলার সমৃদ্ধির কারণ। আমার অনুপস্থিতিকালে যে দুটো প্রজন্ম এসেছে তাদের সমস্যার সমাধান এই অনুর্বর ডাঙা জমিই করে দিয়েছে—অন্তত গাঁয়ের ব্রাহ্মণদের (জমিদার) সম্পর্কে একথা সত্যি; হয়তো আরও এক প্রজন্ম আরও কিছু অনুর্বর জমি উদ্ধার করে নতুন চাষের খেত বানাতে পারবে। গাঁয়ের বাড়িগুলোর জায়গা এবং আকার দুয়েরই পরিবর্তন হয়েছে। আগের চেয়ে ঘরগুলো এখন অনেক বেশি সুন্দর, পরিষ্কার এবং বড় হয়েছে—এজন্য অনেক পরিবারকে গাঁয়ের মধ্যিখানের জায়গা ছেড়ে পুবদিকে সরে যেতে হয়েছে। সাতাশ বছর আগে আমি তিন-চারদিনের জন্য শেষবার কনৈলা এসেছিলাম। সে-সময়কার বাড়িগুলোর নকশা এখনও আমার মনে আঁকা ছিল কিন্তু এখন কোনো বাড়ি চিনতে হলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হতো।

গ্রামে পৌঁছতেই আবাল-বৃদ্ধ নরনারী তাদেরই মত রক্তমাংসে গড়া কেদারনাথের এদিক-ওদিকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি বংশীকাকাকে সজল চোখ দেখলাম এবং আমার হাত তাঁর পদস্পর্শ করলো। গাঁয়ের সবচেয়ে বয়স্কা মহিলা যমুনাঠাকুমার গলার আওয়াজে আগের মতোই জোর চলছিল, তবে এখন তাঁর শরীর অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। গাঁয়ের মধ্যে পাথরের পুরনো ঘানিটা এখনও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু লোকে কাস্তে, খুরপি ইত্যাদি ঘষে ঘষে তার কিনারে অনেক গর্ত করে ফেলেছিল। আমাদের প্রাচীনপন্থী নেতা যা-ই বলুন, কনৈলার গ্রামবাসীদের কিন্তু পুরো বিশ্বাস যে লোহার ঘানি সরিয়ে পাথরের ঘানির যুগে ফিরে যাওয়া যায় না।

বেলা এগারোটা নাগাদ আমরা কনৈলাতে পৌঁছেছিলাম। ওখানে মাত্র চারঘণ্টা থাকার

কথা—এজন্য প্রতিটি মিনিট সদ্ব্যবহার করার দরকার ছিল। আমার ভাইদের মধ্যে শ্যামলাল আর রামধারী বাড়িতেই ছিল। সবচেয়ে ছোট শ্রীনাথ দিল্লীতে জনগণকে রসগোল্লা খাওয়াচ্ছিল। সাতাশ বছর আগে যাদের বয়স চোদ্দ-পনেরো ছিল তাদের চিনতে পারছিলাম, তবে সেরকম মুখ খুব কম ছিল। আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় দুধনাথ ভাইয়ার ভুরু দুটিও শাদা হয়ে আসছিল। রামদত্ত কাকার শরীরে হাড় আর চামড়া ছাড়া যা চোখে পড়ছিল তা ছিল হাড়-চামড়া একত্রে বেঁধে রাখার জন্য ধমনীগুলো।

স্নান করতে যাবার সময় জন্মের পর যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি সেই বন্ধুদের ঘর দেখতে পেলাম। বংশী কাকা আর তাঁর ভাই, আমারই সমবয়স্ক, কিসুনা (কিম্না) কাকার বাড়ি পুরনো জায়গা থেকে অনেক দূরে করা হয়েছিল। বাগানের ধারে যে নিঃসঙ্গ অশ্বত্থ গাছটাকে লোকে বলত ভূতের কেল্লা—এখন সেটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর ভূত? এত লোকের ভিড়ে বেচারি ভূতেরা আর থাকতে পারে? আমি একবার এক জায়গায় বলেছিলাম, 'মানুষ বসবাস করতে আরম্ভ করলেই ভূতেদের ছেলে-পুলে নিয়ে পালানো জরুরি হয়ে পড়ে।' কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'মানুষের ছেলেপুলেরা ইঁট-পাটকেল-লাঠি ইত্যাদি ছোঁড়াছুঁড়ি করে কিন্তু ভূত আর তাদের ছেলেমেয়েদের তো দেখা যায় না, তার ফলে ভূতেদের মধ্যে কানা-খোঁড়া ল্যাংড়াদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এজন্য ভূত আর তার বউকে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হয়।'

আমার কয়েকজন ভাইদের মতোই অনেক পাঠকেরও এই যুক্তি পছন্দ হবে না—কিন্তু ভূত-পেত্নীরা যে অনেক জায়গা খালি করে দিয়ে গেছে—এ ব্যাপারে সবাই একমত।

পুরনো কনৈলা গ্রামে একটু সবুজপাতা দেখার আশায় দৃষ্টি প্রলুব্ধ হয়ে থাকত কিন্তু আজ প্রত্যেকের দরজায় হয় পাকুড় নয় নিমগাছ ছিল। গরমের সময় গাছের শীতল ছায়া কত সুখদায়ক আর মনোহর! দেখে খারাপ লাগল কনৈলার বাগান অনেকটাই উজাড় হয়ে গেছে এবং নতুন আমলকী লাগানোর ঝোঁক লোকের মধ্যে নেই।

স্নানের পর আমি গাঁয়ের ঘরগুলো দেখতে বেরোলাম, সঙ্গে পারিষদবর্গকে ঠেকানো যাচ্ছিল না। চামারদের পাড়ার পর, ব্রাহ্মণ, আহীর, কাহার, চুড়িহার, দর্জি ও মেষপালকদের ঘর দেখতে দেখতে এবং নমস্কার-টমস্কার করতে করতে প্রায় সমস্ত গ্রামটাই ঘুরলাম। পত্রহীন বটগাছের নিচে বুদ্ধদেবকে বসে থাকতে দেখে শাক্যরক্ত-পিপাসু কোশলরাজ বিদুডভ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পাশেই তো আমার রাজ্যের সীমার ভেতরে বটগাছের এই ঘনছায়া আছে। ভগবান, আপনি সেখানে কেন বসছেন না?'

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'বন্ধুদের ছায়া শীতল হয়। এই বটগাছটি শাক্যদের মাটির গাছ।'

খাবার তৈরি ছিল। শ্যামলাল আমাদের দুজনকে খাওয়ানোর জন্য ওর বাড়ি নিয়ে গেল। সাতাশ বছর আগে যে বাড়ি দেখেছি তার কাছে এ বাড়িটা তো প্রাসাদ মনে হচ্ছিল। আগেকার বাড়ির তিনটে উঠোন এই উঠোনটির মধ্যে ধরে যাবে। উঠোনটি পুব-পশ্চিমে লম্বা তাই অনেকক্ষণ ধরে রোদ পাওয়া যায়। নর্দমার মুখ দক্ষিণ দিকে দেখে

ছেলেবেলা থেকে বহুবলে ওর সঙ্গেই আমার অন্তরঙ্গতা বেশি ছিল। তিরিশ বছর আগে একবার আমরা দুজনে জামা পরে রুটি খেয়েছি—তাই দেখে ওর মা কেঁদেছিলেন। আজ তার পুত্রকে আমার আর নাগার্জুনের মত 'সর্বভুক'-এর সঙ্গে বসে ডালভাত খেতে দেখে তাঁর স্বর্গীয় আত্মা হয়তো ভীষণ ধড়ফড় করছে। তবে কনৈলার সরপঞ্চ শ্যামলালও আমাদের সঙ্গে বসে খাচ্ছে দেখে তিনি নিশ্চয় শান্তি পাবেন।

পরের দিন রাত থাকতেই নাগার্জুন আর আমি হাতিতে চড়ে রওনা হলাম। চঁড়েসর থেকে এক্কা নিয়ে বেলা দশটা নাগাদ (১৮ এপ্রিল) আজমগড় পৌঁছলাম। লোকমুখে খবর শুনে কত লোক দেখা করতে এলো। আজমগড়ের কবি 'শৈদা' আর 'চন্দ্র' নিজেদের কিছু কবিতা শোনালেন, 'যাত্রী' (নাগার্জুন)ও তাঁর নিজের রচনা শুনিয়ে সভার মনোরঞ্জন করলেন। ঠিক সাতদিন থাকার পর ১৯ এপ্রিল বেলা দশটার ট্রেন ধরলাম আর বেলা দুটো নাগাদ আজমগড় জেলার সীমা পেরিয়ে গেলাম।

উত্তরাখণ্ডে, মে-জুন ১৯৪৩

গরম পড়ে গিয়েছিল। কিছু লেখাপড়া করার কথা ভাবছিলাম। ইচ্ছে হলো হরিদ্বার চলে যাই। ওখানে লেখাপড়ার কাজটা মনে হয় হবে। প্রয়াগে ছ দিন থেকে আমি আর নাগার্জুন হরিদ্বার রওনা হলাম। লক্ষ্ণৌ থেকে সোজা হরিদ্বারের গাড়ি ধরলাম। হরদৈ জেলা পর্যন্ত এখনও এখানে-ওখানে উষর জমি দেখা যাচ্ছিল কিন্তু রুহেলখণ্ডের সীমানার ভেতর ঢুকতেই চারদিকে উর্বর জমি দেখা দিল। জায়গায় জায়গায় গ্রাম আর সবুজ বাগান ছিল। পাঞ্চালরাজ, দিবোদাস আর সুদাসের ঐশ্বর্যের পেছনে আছে এই উর্বর ভূমি। এই উর্বর ভূমিই বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজদের দিয়ে ঋগ্বেদের সুন্দর সুন্দর শ্লোকগুলি রচনা করিয়েছে। এত উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও পাঞ্চালবাসীদের আজ শরীর শীর্ণ, অঙ্গ বস্ত্রহীন। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে গণরাজ হটিয়ে পাঞ্চালবাসীরা শাসনক্ষমতা রাজার হাতে দিয়ে নিজেরা হয়ে যায় প্রজা। অবস্থার অবনতি হতে হতে আজ এখানে এসে ঠেকেছে। কিন্তু চক্র পরিবর্তন নিশ্চয় হবে এবং সেকাজ অন্য কেউ নয় এই পাঞ্চালবাসীদেরই করতে হবে। একসময় এই পাঞ্চাল উত্তর ভারতের এক শ্রেষ্ঠ জনপদ ছিল কিন্তু আজ সে পুরোপুরি সুপ্ত।

বেরিলীতে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ালো, আর মোরদাবাদে তো ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। পৌনে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর রেলের লোকজন চিৎকার করে বললো, 'নামুন, নামুন বগি কেটে দেওয়া হবে।' আমাদের বগিও কাটবার কথা ছিল। কামরা বদলানো মাত্র গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। যাহোক, আমরা অবশ্য অন্য কামরায় বসে

গিয়েছিলাম, না জানি কি মনে করে গাড়ি আবার ফিরে এসে স্টেশনে ধরনা দিল। পার্শেল ট্রেনে চড়ে আমরা খুবই পস্তালাম। তবে একটা লাভ হলো। এমনিতে রাতে যেতে হতো কিন্তু এখন দিনে যাওয়া যাচ্ছে। মুরাদাবাদ আর বিজনৌর-এর মাটি খুবই শস্যশ্যামলা। এখানে আখের চাষ খুব বেশি হয়। এদিকে টাকায় তিনসের আটা বিক্রি হচ্ছিল তবু লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। আমরা লুকসর পৌঁছলাম। হরিদ্বার যাবার গাড়ি সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল, বেলা বারোটা নাগাদ আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। পাণ্ডা তো ওখানে অনেক ছিল, কিন্তু আমাদের পাণ্ডার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু কোথাও তো উঠতে হতো? যে ধর্মশালাতেই জিজ্ঞেস করতে গেলাম সেই বললো, 'না।' আমরা যখন ধর্মই মানি না তখন ধর্মশালায় থাকবার অধিকারই বা কি করে থাকবে? অনেকগুলো ধর্মশালার দ্বারস্থ হবার পর মা গঙ্গাই আমাদের বুদ্ধি দিলেন। বুঝলাম কোনো পাণ্ডাকেই ধরতে হবে।

হরিশ্চন্দ্র পাণ্ডার কাছে গিয়ে বললাম, 'ভাই, আমরা ধম্মোকম্মো করতে আসিনি, আমরা বেড়াতে এসেছি; আমাদের একটা থাকার জায়গা করে দাও।' আমার বেশ এবং ভাষা দেখে পাণ্ডা বুঝলো যে এদের সাহায্য করতে কোনো বাধা নেই। সূরজ মলের ধর্মশালায় আমাদের সাতজন্মেও জায়গা মিলতো না—এমনই একজন যমরাজ ধর্মশালার দরজায় বসেছিল; কিন্তু হরিশ্চন্দ্র পাণ্ডার মদতে আমাদের দুজনের জন্য কোণে একটি অন্ধকার কুঠরি পাওয়া গেল।

এপ্রিল মাসের শেষ। প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। গঙ্গা এখানে সত্যি গঙ্গা, যার শীতল জলের মহিমা মুনি-ঋষিরা হাজার বছর ধরে গেয়ে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও গাইবেন। স্নান করে খুব আনন্দ পাচ্ছিলাম। এক হাত লম্বা লম্বা রুই মাছ এখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল। ভগবান এদের মানুষের খাবার জন্যই তৈরি করেছেন কিন্তু এখানে ওদের কেউ পোঁছেও না। আজ আমি তীর্থ-উপবাস করলাম—শুধু ফলাহার। শেঠেরা ধর্মশালার পেছনে প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। কিছু কামরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যদিও সেগুলো তাদেরই জোটে যারা তাদের 'যোগ্য'। কিন্তু হিন্দুধর্মে পায়খানার জন্য এক পয়সা খরচা করাও পাপ মনে করা হয়। একথার প্রতিধ্বনি সর্বত্র শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। পায়খানা ছিল অতীব নোংরা আর প্রস্রাবের জন্য তো সারা উঠোনটাই খোলা ছিল। আমাদের রাজভক্তরা বলবেন যে ভারতবাসীদের একথা বোঝাতে হাজার বছর লাগবে। আমি তা মনে করি না। সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় আমি দেখেছি সেখানকার লোকে কত তাড়াতাড়ি এই সামাজিক আচরণ বুঝে যায়।

সন্ধের দিকে বেড়াতে বেরোলাম। আগের চেয়ে হরিদ্বার অনেক বেড়ে গেছে। 'হরি কি পৌড়ী'র ওপর বিড়লার ঘণ্টাঘর দাঁড়িয়ে আছে। আগে এই ঘণ্টাঘর আরও অন্য কিছুর বার্তা বহন করতো কিন্তু আজ এটি একটি ভারতীয় পুঁজিবাদের মহান কীর্তিস্তম্ভ। বিড়লা ঘাট দেখলাম এবং শেঠদের কিছু বাড়িও দেখলাম। ব্যবসায়ীদের কাছে রাজারা এখন মিথ্যে। রাজাদের খরচ বেড়ে গেছে কিন্তু আয় তেমন নেই। কিন্তু শেঠেদের আয়ের কোনো সীমা নেই। ভারতীয় পুঁজিবাদ এখন তার যৌবনে পদার্পণ করেছে। তার প্রমাণ আমাদের তীর্থক্ষেত্রগুলোতেও পাওয়া যায়। এক শেঠের দালানের গায়ে জনগণের অনেক

রকম লেখা দেখলাম। আমারও ইচ্ছে হলো তবে নিজের নাম লেখার ইচ্ছে নয়। আমি পেনসিল দিয়ে লিখলাম—

'দান খয়রাত, তীর্থ হজ যাত্রা করে।
ধনীরা আঁচল দিয়ে রক্তের দাগ সাফ করে।।'

হরিদ্বারে পা রাখারই এত অসুবিধে হলে এখানে লেখা-পড়া আর কি করে করা যাবে? ভাবলাম, যাই, ঋষিকেশ দেখে আসি। ঋষিদের জায়গা, ওখানে হয়তো কোথাও থেকে যাওয়া যাবে।

১৩ আনা দিয়ে লরিতে চাপলাম। হরিদ্বার বেড়েই চলেছে। মাইলের পর মাইল সড়কের ধারে বাড়ি ঘর আর বাগান তৈরি হয়েছে। বহু জায়গা জুড়ে জঙ্গল কাটা হয়েছে—সেখানে চাষ হচ্ছে। ৩৪ বছর আগে এই রাস্তা দিয়ে যখন গিয়েছি তখন হরিদ্বার একটি ছোট্ট জায়গা ছিল। তার বেশিরভাগ জায়গাই ছিল জঙ্গলে ভরা।

আর ঋষিকেশ? ঋষিকেশ এখন এক প্রাসাদ-নগরী। কোথায় সেই সময়কার দু-চার জায়গায় ছোট ছোট কুটির আর কোথায় এই অট্টালিকা! যদিও সে সময়ে কালিকমলীওলার ক্ষেত্র আর পাঞ্জাবক্ষেত্র ছিল—কিন্তু ওগুলো ছিলো খুব ছোট ছোট। এখনতো এ দুটো ক্ষেত্রই শহরের অর্ধেকটা জুড়ে বসেছে। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দোকান হয়েছে। এখান থেকে মোটর-লরি দেবপ্রয়াগ আর টেহরী যাতায়াত করে। অনেকগুলো পাঠশালাও আছে। আমরা লছমনঝোলার দিকে চললাম। জায়গায় জায়গায় সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য প্রাসাদ কুটীরের নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় ধর্মের দোকানেও আছে, যেখানে বইয়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে আরও নানাভাবে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। ঋষিকেশে কে সবচেয়ে বড় ধর্মের ব্যাপারী সেটা বলা মুশকিল। যদি শিবানন্দকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, তবে ব্রহ্মলীন জয়দয়াল গোয়ন্দকা রুষ্ট হবেন। ভাই তুলসীদাসের পৃষ্ঠায় সবাই সমান।—'কোই বড় ছোট কহত অপরাধ'।

দুপুরে লছমনঝোলা পেরিয়ে গেলাম। ঝোলাও আগেকার মতো নেই। এদিকেও অনেক পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে আমি বাবা রামউদার দাস ফলাহারীর নাম শুনেছিলাম, আমার নামও তাই ছিল, চিত্রকূট বা অন্য কোথাও থাকার সময় কেউ আমাকে তার কথা বলেছিল। সে সময় লছমনঝোলার এই দোকান সবে শুরু হয়েছিল। যাইহোক, এখনতো আর আসল মানুষটি নেই, কিন্তু 'চন্দ্র, সূর্য যতদিন' আছে, তাঁর কীর্তিও থাকবে। ডজন ডজন মন্দির, ধর্মশালা আর কুটির তৈরি হয়ে গেছে। সদাব্রতও খুব চলছে। সাধু-সন্তরা ধার্মিক শেঠদের দুধ-ভিক্ষা নিয়ে নির্বিবাদে ভাগরাতও-ভজন করেন। এমন অভাগা কমই আছে যারা এই শরতের জ্যোৎস্নার মত বিচ্ছুরিত হাজার হাজার সৌধ দেখে এবং কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে ধর্মাত্মা ব্যবসায়ীরা এগুলো বানিয়েছে তাদের দানশীলতার খবর পেয়ে গদগদ চিত্ত হবে না। আমাদের পক্ষে কিন্তু গদগদ চিত্ত হতে আরও একটি বাধা ছিল। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পায়ে হেঁটে আসার ফলে শরীর বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওখানে না পাওয়া গেল বসার মত একটু ঠাণ্ডা জায়গা, না পাওয়া গেলো কোনো মোহান্ত বা শেঠের সাহায্য।

—১৯৪৩—

শেষমেশ এখানেও আমাদের উদ্ধার করার জন্য পাওয়া গেল সেই একজন মজুর। কয়েকজন মজুর বাড়ি তৈরির কাজ করছিল। এরা আমাদের আশ্রয় দিল, বিশ্রামের জন্য চাটাই দিল। খুব তেষ্টা পেয়েছিল। নিচে নেমে গঙ্গা থেকে জল ভরে আসার ক্ষথা এদের বলতে পারছিলাম না। ওরা পাত্র দিল—নাগার্জুনজী জলভরে নিয়ে এলেন। দু-তিন ঘণ্টা বিশ্রামের পর রোদের তেজ কমে এলো। আমরা আবার গঙ্গার বাঁ দিকের পাড় ধরে স্বর্গাশ্রমের দিকে চললাম। রাস্তায় এখানে-সেখানে অনেক কুটির ছিল, প্রচুর আমগাছও লাগানো হয়েছিল। তবে অনেক কুটির পরিত্যক্তও ছিল। কি ব্যাপার, ধর্মভূমি ভারতবর্ষে কি তপস্বীদের অভাব ঘটল? নাকি টিনে ছাওয়া এই কুঁড়েগুলোতে আমাদের তপস্বীরা থাকতে রাজী নন? তবে সন্দেহ নেই এটা গ্রীষ্মকাল। আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে ঐ ঘরগুলোতে কি প্রচণ্ড আগুনের হলকা বইছিল।

স্বর্গাশ্রাম সত্যি স্বর্গের মতোই। কিন্তু একি রকম স্বর্গ যেখানে অপ্সরাকুল নেই? অবশ্য গরমের জন্য অনেক জায়গাই খালি পড়ে ছিল। বর্ষা আর শরতের সময় এই জায়গার শোভা হয়তো আরও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে যখন আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার পদার্পণ ঘটলো তখন লোকে ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন হয়ে গেলো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন গৈরিক বস্ত্র পরতে লাগল তখন শ্রদ্ধাভক্তি দশগুণ হয়ে ফিরে এলো। দেখলাম কত শিক্ষিত তরুণ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই কুটিরগুলো পরিক্রমা করছে।

নৌকাতে গঙ্গা পার হয়ে আমরা আবার এ পারে চলে এলাম। আবার সেই বানরের দল আর কুষ্ঠ রোগীদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঋষিকেশে ফিরে এলাম। ঋষিকেশের মত ভারতবর্ষের আর কোনো তীর্থক্ষেত্রে এত কুষ্ঠ রোগীর দেখা পাওয়া যাবে না। আজ ঋষিকেশ অযোধ্যার কান কেটে দিচ্ছে। সেই হাজার হাজার সাধু আর সন্ন্যাসিনী, সেই একইরকম ভক্তিভাব। কিন্তু এত কুষ্ঠ রোগীকে নিজের কোলে জায়গা দেবার সাহস অযোধ্যারও হয়নি।

আমরা সেদিন ঋষিকেশে কেবল জায়গা দেখতে গিয়েছিলাম। বোঝা গেল ওখানে জায়গা পাওয়া যেতে পারে আর সেটা হরিদ্বারের চেয়ে বেশি উদারতার সঙ্গে। এদিকে দু-তিন দিন হলো আমার মাথা ঘুরছে। এটা নিশ্চয় গরমের জন্য। তাই ভাবলাম হরিদ্বার, ঋষিকেশ বা জ্বালাপুর কলেজে থাকলে কাজ হবে না। এখন কোনো ঠাণ্ডা জায়গা দেখতে হবে। আনন্দজীর হরিদ্বার আসার কথা ছিল, তাঁকে আমি খবরও পাঠিয়েছিলাম। সে কারণে তাঁর জন্য খবর রেখে যাওয়াটা জরুরি ছিল।

এ বছর হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন হরিদ্বারে হবার কথা ছিল। প্রথমে আমার বড় ইচ্ছে ছিল সম্মেলন দেখে যাব, কিন্তু মাথার ব্যথা আমাকে কাবু করে ফেলল। সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির কার্যালয়ে গেলাম। ওখানে পণ্ডিত কিশোরী দাস বাজপেয়ী উপস্থিত ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আনন্দজী কবে আসছেন?' তিনি বললেন, 'আমার কাছে এখনও কোনো খবর আসেনি।' বললাম, 'আনন্দজী এলে তাঁকে বলবেন তাঁর বন্ধু এসেছিলেন, গরম সহ্য না হওয়ায় পাহাড়ে গেছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার

নাম?' মিথ্যে বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বললাম, 'কেদার নাথ পাণ্ডে, আজমগড় জেলায় থাকি।' বাজপেয়ী খুশি হলেন। মনে থাকলে তিনি আনন্দজীকে কেদার নাথ পাণ্ডের বার্তা দিয়ে থাকবেন।

উত্তর কাশীর দিকে—৩০ তারিখ খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা ঋষিকেশগামী লরি ধরে পঞ্জাব-সিন্ধ-এর তীর্থযাত্রীদের ক্ষেত্রে এসে নামলাম। ভক্তরা এত ঘর বানিয়ে রেখেছে যে, অনেক খালিই পড়ে আছে। ম্যানেজারটি ভদ্রলোক ছিলেন, হাওয়া-বাতাস খেলে এরকম একটি ঘর আমরা থাকার জন্য পেলাম। চারপাই, প্রদীপ, জলের ঘড়া সব ব্যবস্থা ছিল। তীর্থক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ খাবার-দাবারও দিতে রাজি ছিল কিন্তু আমাদের তা প্রয়োজন ছিল না। সন্ধের দিকে একটু ঠান্ডা হলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম। বেড়িয়ে ফিরবার পথে কুটিরগুলোর দিকে গেলাম। একটি নাথপন্থী ধর্মশালা দেখলাম। নাথ-সাহিত্য সম্পর্কে আমার সাধারণ কিছু প্রশ্ন ছিল। ওখানে যখন গেলাম মহাত্মারা জ্ঞান দিতে শুরু করলেন, 'পুঁথিপত্রে আর কি আছে—নাথের বাণী গুরুমুখ থেকেই গ্রহণ করা হয়।' আমার আগ্রহে যেন কয়েকশো কলসী জল ঢালা হলো। ওখানে সাহিত্যের ব্যাপারে আর কি আশা করা যেত? আরো জিজ্ঞেস করার পর একটি ছাপা রদ্দি ভজনের বই পাওয়া গেল—যাতে চুরাশিজন সিদ্ধপুরুষের নামগান ছিল। অর্ধেকেরও কিছু বেশি নাম ঠিক-ঠিকভাবে চুরাশি জন সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে ছিল দেখে আমি একটু আশ্চর্যই হলাম। আমি নাথপন্থীদের এরকম বই দেখিনি যাতে সিদ্ধদের এতগুলো নাম ঠিকঠাক ছাপা হয়েছে। এখানেই পদুমনাথের সঙ্গে দেখা, বেশি লেখাপড়া করেন নি, কিন্তু লোকটি স্পষ্ট বক্তা। তিনি বললেন, 'ভীষ্মনাথ নামে এক পণ্ডিত এখন নাহন এস্টেটে আছেন। তিনি অনেক 'শবদ' সংগ্রহ করেছেন কিন্তু ছাপেন নি।' আমি ঋষিকেশের প্রশংসা করে দু-চার কথা বললাম এবং অযোধ্যাপুরীর সঙ্গে তার তুলনা করলাম। তাতে পদুমনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘর।' আমি বললাম, 'কি বলছেন নাথজী?' পদুমনাথ বললেন, 'সাধুগুলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তীর্থক্ষেত্র থেকে রুটি সংগ্রহ করে আর খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে, সন্ধেবেলা আবার শহরে ঘুরে বেড়াতে থাকে।' একথা যদি সত্যিও হয় তো এতে সাধুদের দোষ কোথায়? প্রাচীন কালে ঋষিদের আশ্রমেও এরকম কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান ছিল না। কোনো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন—

> 'বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা ঃ,
> তেএপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈবৈব মোহংগতা ঃ।
> শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং য়ে ভুঞ্জতে মানবা ঃ,
> তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ বিন্ধ্যাসত্তরেৎসাগরম্।।'[1]

[1]'বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতিরা বায়ু, জল ও পাতা ভক্ষণ করেন। তাঁরাও পঙ্কজরূপ স্ত্রীমুখের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। ঘি ও দুধের সঙ্গে যারা শস্যাহার করে তারা যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে পারে তাহলে বিন্ধ্যা পর্বত সাগরে ভাসবে।'—স·ম·

কিন্তু এই ঘোর কলিযুগে প্রবল শব্দে বিন্ধ্যপর্বতকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি একথা বলছি না যে এই ব্রহ্মচর্যের কোনো সুফল নেই। তবে যত হিন্দু বিধবা রমণীকে ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য করা হয়েছে, তাদের মুক্ত করে দিলে ভারতের জনসংখ্যা আরো কত বেড়ে যেতো। কতজন শিক্ষিত ব্যক্তি জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন, বিধবা-বিবাহ বন্ধ করে এ ব্যাপারে অনেকাংশ সুরাহা হয়েছে। ব্রহ্মচর্যে সাধুদের কি ফললাভ হয়েছে সে ব্যাপারে কিছু বলা একটু মুশকিল। লন্ডনে একবার এক হিন্দু তরুণ সাধুদের নিন্দা করছিলেন—এরা নিষ্কর্মা—বিনাপয়সায় খায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি স্টাড্‌বুল (মহাষাঁড়) দেখেছেন কি?' তিনি বললেন, 'দেখেছি।' আমি বললাম, 'এ ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। ইউরোপীয়রা স্টাড্‌বুলের খুব কদর করে, সেজন্য ওদের এখানে গোজাতির দিন-দিন উন্নতি হচ্ছে। আপনি কোনো স্টাড্‌বুলকে গাড়ি টানতে বা হাল টানতে দেখেছেন?'

'না দেখিনি।'

'তাহলে আপনার কথামত এরা নিষ্কর্মা আর বসে বসে খাওয়ার জাত?'

তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, তাহলে আপনি কি বলতে চান—উন্নত বংশধরদের জন্ম দেবার জন্যই সাধুদের প্রয়োজন? ওদের কতজনের তো নিজেদের বংশধরই দোষমুক্ত নয়। ওরা আবার কি করে উন্নত বংশধর বানাবে?'

আমি বললাম, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। দু-চারটে স্টাড্‌বুল যদি খারাপ হয় তার জন্য তো আপনি তাবৎ স্টাড্‌বুলদের কোতল করার হুকুম দেবেন না? আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি সাধুর প্রতাপে কোনো অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বলতে দেখেন নি?'

'আপনি কি বলতে চান নিঃসন্তান ঘরে সন্তানের জন্ম?'

'হ্যাঁ।'

বোধহয় তাঁর নাম ছিল ওমপ্রকাশ। তিনি হেসে বললেন, 'অন্যের কথা কেন বলব, আমার নিজের কাকার ঘরেই এটা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'আপনি আপনার কাকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—কিন্তু তাই বলে সেই রাগ এই গোটা সম্প্রদায়ের ওপর মেটানো কি ঠিক?'

শুধুমাত্র ঋষিকেশ, অযোধ্যা বা বেনারসের সাধুদের এভাবে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার ঘরে ঐ একই মাটির উনুন। আসলে ব্রহ্মচর্য এবং ভক্তিভাব দুটোকে আলাদা আলাদা করে বিচার করাটাই ঠিক। কিন্তু আমাদের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ সেটা মানতে রাজি নন। এ জন্য মানবপ্রকৃতিকে ভিন্ন রাস্তা ধরতে হয়—যার মধ্যে কয়েকটি রাস্তা খুবই ইতর এতে সন্দেহ নেই। আমার একবন্ধু একবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সাধু এবং সাধুনীদের জন্য নিয়ম-রীতিসম্মত মঠ তৈরি করা হোক। সাধুনীদের বন্ধ্যাত্বকে স্বাভাবিকভাবে বা কৃত্রিমভাবে নির্দিষ্ট করা হোক এবং ঈশ্বর ভজনাকারীদের ব্যাপারে যেন কোনো রকম দুর্ভাবনা না করা হয়। জানি না, বন্ধুর এ প্রস্তাব অনুমোদনযোগ্য কিনা।

পয়লা মে দশটার সময় আমরা টেহরী যাবার মোটর ধরলাম। মোটরে আগে থেকেই খুব ভিড় ছিল। 'মুনি কি রেতি'তে আসার পর মোটরে আরো ১৫ বস্তা নুন চাপানো হলো। আমাদের তো ভয় হতে লাগল—পাহাড়ী রাস্তায় কোথাও হঠাৎ বসে না পড়ে। এই এস্টেটের অফিসারের দায়িত্ব ছিল, যাত্রীদের তোয়াক্কা করার আর কি প্রয়োজন? তিনঘণ্টা ধরে গাড়ি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার চললো। ঋষিকেশের পাশের পাহাড় টপকাতে হতো। রাস্তা বেশ খাড়া ছিল। পাহাড়ী দৃশ্য আর ইঞ্জিনের ঘট ঘট আওয়াজ উপভোগ করতে করতে আমরা এঁকেবেঁকে ওপরে চড়তে লাগলাম। ১০ মাইল চলার পর নরেন্দ্রনগরে এলাম। সে সময় গোটা গাড়োয়ালে টেহরীর রাজবংশ শাসন করতো। গোরখাদের রাজত্ব এলো। এরপর সাহায্য করার পারিশ্রমিক হিসেবে ইংরেজ আবার গাড়োয়াল নিয়ে নিল এবং গাড়োয়াল এস্টেট টেহরী রাজবংশের হাতেই থেকে গেল। এস্টেটের জনসংখ্যা সাড়ে চার লাখ আর ভূমি-রাজস্ব পাঁচ-ছ লাখ।

রাজা নরেন্দ্র শাহ নিজের নামে এই নরেন্দ্রনগর বানিয়েছিলেন। তার আগের রাজা বানিয়েছিলেন প্রতাপনগর। এখানে না আছে কোনো শিল্প বা ব্যবসা, না আছে বড় কোনো করবার। উপরন্তু প্রত্যেক রাজার আছে নিজের নামে নগর স্থাপন করা এবং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রাসাদ আর মহল বানানোর সখ। ময়দানবের মতো মুফতে নগর বানিয়ে পত্তন করার তো কেউ ছিল না তাই পুরো খরচটাই আসতো প্রজাদের কঠিন পরিশ্রমে উপার্জিত সম্পদ থেকে, ফলে দুঃখ-কষ্ট পুরোটাই এসে পড়তো প্রজাদের ওপর। টেহরী নগরকেও এর কিছু ফল ভোগ করতে হয়েছে, কেননা ওখানকার বেশির ভাগ অধিবাসীদেরই এই নগরে আসতে হতো। তাই টেহরীর শত শত বাড়ি যদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তো তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নরেন্দ্রনগরে রাজপ্রাসাদ এবং সরকারি বাড়ি ছাড়া কিছু দোকানপাটও আছে। দু ঘণ্টা লরিটা ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার চলতে শুরু করল। রাস্তা যথেষ্ট চওড়া নয়। তাছাড়া পাহাড়ী রাস্তা ঘুরে ঘুরে গেছে। বেশ কয়েকবার লরিটার খাদে পড়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। চড়াই-উৎরাই করতে করতে চম্পার ডাঁড়া[1] পার হয়ে গেলাম। উচ্চতা চার হাজার ফুটের বেশিই হবে। নরেন্দ্রনগর থেকে যাবার পথে পাহাড়ে জঙ্গল দেখা গেল। নির্বিচারে জঙ্গলকে কেটে জমি তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কোথাও এখনও গমের গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে দোকানও পাওয়া গেল। আর চাইলে, কালিম্পঙের মত না হলেও, চা পাওয়া যাচ্ছিল। সন্ধে নাগাদ আমাদের লরি গঙ্গার উপত্যকায় এলো। এই বিস্তৃত উপত্যকা জুড়ে সব জায়গাতেই শুধু গ্রাম আর চাষের জমি চোখে পড়ল। টেহরীর বাইরে নদীর এ পাড়েই লরি দাঁড়িয়ে গেল। ভারবাহকের মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে আমরা শহরের দিকে চললাম। একটি শিখ ধর্মশালায় থাকার ঘর পাওয়া গেল।

টেহরী শহরে—টেহরীতে আমরা বেশিক্ষণ থাকতে চাইনি কিন্তু 'বোঝী' (ভারবাহক)

[1] গিরিসংকট বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমি, যা পথরূপে ব্যবহৃত হয়।—স·ম·

পাওয়া খুব সহজ ছিল না, এখানে তাই থেকে যেতে হলো। খাওয়ার কোনো অসুবিধে ছিল না—হিন্দুদের জন্য অনেকগুলো পাকশালা ছিল যেখানে মাছ-মাংসও পাওয়া যেত।

পরের দিন টেহরী শহর দেখতে বেরোলাম। কোনো শহরে শিল্প-উদ্যোগ না থাকলে যে চেহারা হয়, এ শহরের চেহারাও ছিল তাই। রাজারা নিজের নিজের নামে নগর বানিয়ে আরও সর্বনাশ করেছেন। এটা পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। বোধহয় তাঁরা ভেবেছিলেন যে নিজেদের নাম তাঁরা এভাবে অমর করে রাখছেন। ধরুন, এক লাখ বছর পরেও প্রতাপনগর আর নরেন্দ্রনগর থেকেই গেল কিন্তু এদিকে এক বা দুই প্রজন্ম পরে যদি ভারতের সমস্ত রাজবংশই লোপ পেয়ে যায় তো কে জানবে যে এই প্রতাপ আর এই নরেন্দ্র কে ছিলেন?

টেহরী শহরের অবস্থান বড় সুন্দর জায়গায়—দুটো নদীর সঙ্গম স্থলে। এখানে একটি ইন্টার কলেজ আছে। রাজ্যের অনেক জায়গায় স্কুলও আছে, কিন্তু ব্রিটিশশাসিত ভারতের মতোই এখানকার শিক্ষিতরাও অফিসের চেয়ার ভাঙতেই পারে। অফিসে এত চেয়ারও নেই—তাই এর পরিণাম হলো বেকারি।

আমরা প্রাচীন মন্দির দেখতে গেলাম। সত্যেশ্বর মহাদেবের কাছেই এক বটগাছের নিচে একটি ভগ্ন চতুর্ভূজ মূর্তি আছে, মূর্তিটি মুসলমান আমলের আগের বলে মনে হয়। টেহরী যদি সে সময় রাজধানীই থেকে থাকে, তাহলে সে ছিল অন্য কোনো রাজবংশের।

টেহরীতেও চালের দর টাকায় দুসের আর আটা টাকায় তিনসের ছিল। গরিবলোক এত বেশি দামে কি করে খাদ্যশস্য কিনবে? এই পাহাড়ী নদীগুলো থেকে সহজেই নালা কেটে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। এখানে ফলের চাষ করা যায়। কিন্তু ওখানকার শাসকেরা আধুনিক যুগ থেকে শুধু বিলাসিতাই গ্রহণ করে। এদের দৃঢ় বিশ্বাস যতদিন গঙ্গা-যমুনায় জল থাকবে ততদিন চলতে থাকবে ইংরেজ রাজত্ব। আমাদের উদ্ধার করার জন্য বাইরে থেকে আর কে আসবে? আবার ভেতরে যদি কেউ বেগড়বাই করে তো তার জন্য আমাদের জেল পড়ে আছে—লোককে সেখানে ঠেসে ঠেসে পুরে মারা হবে। ওরা জার এবং কাইজার-এর মতো মুকুটধারীদের মুকুট ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে দেখেও কোনো শিক্ষা নিতে পারেনি। ইংলণ্ডের এক রাজা আজ দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা দেখেও এদের আক্কেল হয় নি। প্রজারা ওদের কাছে পোকামাকড়ের মতো এবং স্বয়ং ভগবান এদের পাঠিয়েছেন শাসন করার জন্য। হ্যাঁ, মোটর গাড়ি চলার মতো কিছু রাস্তা নিশ্চয় বানানো হয়েছে। রাস্তা তৈরির জন্য যেমন অনেক লোকে কাজ পেয়েছে তেমনি হাজার হাজার ভারবাহকেরা যারা মালপত্র বইবার কাজ করতো তারা আজ বেকার হয়ে পড়েছে।

তিনদিন অপেক্ষা করার পর এখান থেকে ৪৪ মাইল দূরে উত্তরকাশী যাবার জন্য আট টাকা দিয়ে একজন মালবাহক পাওয়া গেল। দুদিনের রাস্তার জন্য আট টাকা খুবই বেশি কিন্তু আমরা টেহরীতে বসে বসে অপেক্ষা করতে চাইছিলাম না।

৪ মে সকাল ছটা বাজতেই রওনা হলাম। অনেকদূর পর্যন্ত রাস্তা ছিল সোজা। গুর্জর সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের গরু-মোষ নিয়ে ওপরে যাচ্ছিল। একুশ-বাইশশো বছর আগে এরা ভারতবর্ষে এসেছিল, সম্ভবত তখন থেকে আজ পর্যন্ত পশুপালনকেই এরা

পেশা হিসেবে ধরে রেখেছে। সব গুর্জররাই যদি পশুপালক হতো তাহলে পাঞ্জাবে না গুজরাট[1] আর গুজরাঁবালা থাকতো, আর না সৌরাষ্ট্র বা অন্য কোনো স্থানকে নিজেদের নাম দিয়ে গুজরাট[2] বানাতে পারতো। সমতলে যখন জঙ্গল যথেষ্ট ছিল তখন পশুদের নিয়ে এই উঁচু-নিচু পাহাড় পেরনোর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এখন সমতলে জঙ্গল কোথায়? সে জন্য মে মাসের শুরুতেই সমতলভূমি ছেড়ে হিমালয়ের রাস্তা ধরতে হয় এদের। এরা যখন মধ্য-এশিয়া থেকে আসে তখন হয়তো এদের অন্য কোনো ধর্ম ছিল, ভারতবর্ষে এসে এরা হয়তো হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে ছিল—আজ এরা মুসলমান। এদের পূর্বপুরুষরা মধ্য-এশিয়া ছেড়ে এসে ভালো করেছিল না মন্দ করেছিল সে বিষয়ে আমাদের আর কি মতামত থাকতে পারে? শেষমেশ হুনদের আক্রমণে নিজেদের জন্মভূমিতেই প্রাণসংশয় দেখা দিল বলেই তো বাধ্য হয়ে এদের মধ্য-এশিয়া ছেড়ে যেতে হয়। গুর্জরদের প্রাচীন মাতৃভূমিতে এখন সোভিয়েত পঞ্চায়েতি রাজ কায়েম হয়েছে। ওখানকার পশুপালকেরাও এখন রেডিও নিয়ে ঘোরে। ওদের জীবন ভয় বা দুশ্চিন্তার জীবন নয়—সুখ এবং সমৃদ্ধির জীবন এখন ওদের। ইচ্ছে হলো গোটা হপ্তাটাই এই যাযাবর গুর্জরদের সঙ্গে কাটিয়ে দিই। তাতে আমার কোনো লোকসান হতো না। এখনও ওদের মধ্যে হয়তো কিছু প্রাচীন গান বেঁচে আছে, প্রাচীন রাগ, নৃত্য আছে, হয়তো প্রাচীন বিশ্বাসও আছে, কিন্তু আমার কাছে তখন না ছিলো উপযুক্ত পোশাক, না ছিল পোশাক তৈরি করার মত যথেষ্ট সময়।

এরা পাঞ্জাবী ভাষা বলে। এদের গায়ের রং অন্যান্য পাহাড়ীদের চেয়ে ফর্সা নয়, তবে এরা খুব স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘকায়। একটি গুজরী তরুণীর জ্বর হয়েছিল। ভল্যানীর চড়াইতে এসে বেচারি আর চলতে না পেরে এক জায়গায় বসেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কিছু সাহায্য করতে পারি?' সে শুধু বলল, 'সামনে আমার লোক আছে। ওকে আমার খবরটা দিয়ে দেবেন।'

লোক পাওয়া গেল। সে ঘোড়া নিয়ে তার অসুস্থ তরুণীকে আনতে যাচ্ছিল। আমি তাকে খবরটি দিলাম। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম তিব্বত—গুগের রাজ্যসীমা ভল্যানীর এই চড়াই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৫ ঘণ্টায় ১২ মাইল পথ হেঁটে আমরা বেলা এগারোটার সময় ভল্যানী পৌঁছলাম। এখানে ধর্মশালা আর দোকানপাট আছে। ভারবাহকেরা ওদের সংগে আমাদের জন্যও রান্না করলো। খাওয়া-দাওয়ার পর চার-পাঁচ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে বেলা চারটের সময় আবার রওনা হলাম।

চারদিকে ছিল শুধু খেত আর খেত। জলের জন্য এখানকার মানুষ কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো আর গঙ্গার এই অপার জলরাশি এমনি-এমনি কাজে বয়ে চলে

[1]বর্তমানে গুজরাট (Gujrat) এবং গুজরাঁবালা (Gujranwala) এই দুটি স্থানই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।—স·ম·

[2]এখানে গুজরাট (Gujarat) রাজ্যের কথা বলা হয়েছে।—স·ম·

যেত নিচে। রাজ্য যদি একজন ইঞ্জিনিয়ার আর কিছু লোহা-কাঠ-সিমেন্ট-এর ব্যবস্থা করতো তাহলে এখানে জলসেচের জন্য ক্যানেল তৈরি করা যেত আর তখন এই সারা পর্বতগাত্র ঢাকা পড়ে যেত ফলের গাছে এবং ঢেউ খেলানো সবুজ শস্যক্ষেত্রে।

বিকেলে সূর্যাস্তের পর আমরা নগুন পৌঁছলাম। এখানে একটি ধর্মশালা আছে। ধর্মশালায় যেমন ছিল ভিড় তেমনি নোংরা। আমি তাই সীতারাম মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণ পরই প্রয়াগ (বালিয়া জেলা) থেকে এক পেনসনভোগী জর্জ সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন। তাঁদেরও থাকার জায়গা নিয়ে অসুবিধে হচ্ছিল। আমি ছাপরায় থাকি শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আমার মেয়ের বিয়ে ছাপরায় হয়েছে।' যাইহোক, আমরা একই ভাষায় কথা তো বলতে পারতাম। ধর্মশালায় পিঁপড়ে আর ছারপোকার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হতো, এখানে নিশ্চিন্তে ছিলাম। সামনে দিয়ে ভাগীরথী কলকল স্বরে বয়ে যাচ্ছিল। কোনো এক বৈষ্ণব সীতারাম মন্দিরটি একদা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরটি দেখাশোনার জন্য কোনো সাধু ছিল না। এখন একজন গৃহস্থ ধূপ-ধুনো দিত। আমাদের মত শ্রদ্ধাহীন লোকও যখন দু-একআনা দিতে পারে, তখন অন্য কোনো দাতাও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

পরের দিন (৫ মে) ছটা বাজতেই আমরা রওনা হলাম। ১৫ মাইল পর ধরাসু পেলাম। এখনও সকাল আছে দেখে আমরা আর সেখানে দাঁড়ালাম না—আরও ৬ মাইল হেঁটে ডুংডা পৌঁছলাম। ধরাসুর পর খুব জঙ্গল পাওয়া গেল। বড় বড় পাইন গাছ সারা পাহাড় ঢেকে রেখেছে। কোথাও কোথাও গ্রাম আর খেতও চোখে পড়ে। এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরে বিশ্রাম করলাম। বেলা চারটে থেকে আবার চলতে শুরু করলাম। আড়াই ঘণ্টা পর মাতরী পৌঁছলাম। তখনও দিন ছিল কিন্তু দেখলাম আকাশ বাদল মেঘে ভরে গেছে। বৃষ্টির আশঙ্কায় মাতরীতেই থেকে গেলাম। একটাই মাত্র দোকান ছিল। দোকানদারটি থাকবার জায়গা আর বাসনকোসনও ভাড়া দিল। আমাদের ভারবাহকেরা রান্নাবান্না শুরু করে দিল। এক আধঘণ্টা দিন থাকতে থাকতেই আশ্রয় নেওয়া পথিকের পক্ষে ভাল। টাকায় তিনসের আটা আর আড়াইসের চাল—অর্থাৎ সমতলের চাইতে এখানে খাবার সস্তা। তবে নিচে থেকে বেশি লোক এসে গেলে খাবার-দাবারের দাম বেড়ে যাবে। ফেরার সময় আমি দেখলাম এ বছর যাত্রী খুব বেশি আসছে। উত্তরাখণ্ডে খাবার সস্তা এবং সুলভ—এ খবর শহরবাসীদের কাছে পৌঁছোয়নি তো!

উত্তরকাশীতে (৬—২৪ মে)—সকাল হতেই আমরা ফের চলা শুরু করলাম। মাঝে মাঝে আরও এক-আধটা দোকান পাওয়া গেল। রাস্তা সমতল ছিল—মাত্র ৫ মাইলের রাস্তা। আটটা নাগাদ আমরা উত্তরকাশী পৌঁছে গেলাম।

বিড়লা ধর্মশালার নাম শুনে আমরা সেখানে গেলাম। মুন্সী সাহেব এখনও নিদ্রা যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাকে জাগাতে হলো। সে আমাদের চেহারা-আকৃতি দেখল। আমাদের চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। আমরা বলার পর সে ওপরের একটি ঘর খুলে দিল। জানলার কাঁচ ভাঙা হলেও তার জালি-দেয়া কপাট

ঠিকই ছিল। ভাঙা কাঁচের ভেতর দিয়ে মাছি যখন আসতেই পারে তখন আর কপাটের জালিকে তার কিসের ভয়? অন্য একটি ঘর দেবার কথা বলতেই মুন্সী রুক্ষ গলায় বলল, 'এই ঘরটাই শুধু আছে—ব্যস!'

বাজারে গিয়ে দেখি দুটো ছাড়া আর সব দোকানই বন্ধ। নাগার্জুন— আটা-ডাল-কাঠ নিয়ে এলেন। ভারবাহকরা রান্না করলো। খাওয়া-দাওয়ার পর ভারবাহকরা মজুরি নিয়ে চলে গেল। আমরা বেশ পরিশ্রান্ত ছিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভেবেছিলাম—'যাক, ঘরটা মাছিওলা হলেও একটা থাকার জায়গা তো পাওয়া গেছে। এখানে থেকে কিছুদিন লেখা-পড়া করা যাবে।' কিন্তু জানা গেল শেঠদের সাহায্য আমাদের কপালে নেই। মুন্সীজী এসে বলল, 'গোস্বামী গণেশ দত্ত বা বিড়লা-শেঠের চিঠি ছাড়া তিনদিনের বেশি কাউকে থাকতে দেয়া যাবে না।' অত্যন্ত রূঢ়ভাবে এই কথাগুলো সে বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সে আদেশ কোথায়?' সে বলল, 'আমি যা বলছি তাই আদেশ।'

তিনদিন থাকার নিয়মটি যথার্থ সেটা অস্বীকার করা যায় না। যদি এক-একজন যাত্রী তিন সপ্তাহ ধরে থেকে যায় তাহলে বাকি যাত্রীরা যাবে কোথায়? আমি ওকে বললাম, 'যতদিন আর কোনো যাত্রী না আসছে ততদিন থাকতে দাও। ইতিমধ্যে অন্য কোনো জায়গায় ব্যবস্থা করে নেব।' সে 'না' বলে দিল। এই অসুবিধে তো দেখা দিলই, সেই সঙ্গে দ্বিতীয় অসুবিধে হলো নিজের হাতে রান্নাবান্না করা। যদি দুবেলা আমাদের নিজের হাতে রান্না করতে আর বাসন-কোসন মাজতে হয়, তাহলে দিনের আলোর বেশির ভাগটাই এ কাজে চলে যাবে। আর দিনের আলো এখন মূল্যবান জিনিস, কারণ কেরোসিন তেল পাওয়া সহজ কথা নয়।

আমরা দুজন বেরোলাম অন্য জায়গা খুঁজতে। কোনো পাণ্ডার কাছে গেলে জায়গা হয়তো পাওয়া যেত, তবে ভিড়-ভাড়াক্কার ভয় ছিল। কালীকমলীওলা-র ধর্মশালায় গেলাম। ওখানকার পরিচালক সন্ন্যাসীটি ছিলেন বড় শিষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু দেখলাম ওখানেও খুব ভিড়। এত ভিড়ের জায়গায় থাকা উচিত মনে হলো না। পাঞ্জাব-সিন্ধ-এর ধর্মশালায় পৌঁছলাম। ওখানে দুটো নতুন ঘর তৈরি হয়েছিল। নতুনের অর্থ হলো ওখানে এখনও ছারপোকা আর পিঁপড়ে বাসা বাঁধেনি। ক্ষেত্র পরিচালক বেশ খুশি হয়েই আমাদের একটি ঘর দিয়ে দিলেন আর বললেন, 'এক পাঞ্জাবী মাতাজী এই ঘর বানিয়েছিলেন, তিনি সাধুসঙ্গ করার জন্য এখানে আসেন। তিনি যদি এসে পড়েন, তবে ঘর খালি করে দিতে হবে।' বললাম, 'তাই হবে।'

গঙ্গা এখান থেকে খুবই কাছে। খাওয়া-দাওয়ার কথা উঠলে পরিচালক বললেন, 'একবেলা তো আমাদের এখানেই কয়েকশো সাধুকে ভোজন করানো হয়, সেই সঙ্গে অন্য যাত্রীরাও খেয়ে যান।' আমি বললাম, 'শুধু আমাদের খাবারটুকু রান্না করার ব্যবস্থা করে দিন, ব্যস এইটুকু কৃপা আমরা চাই। আমরা বিশেষ কিছু খাবার চাই না—আর সকলের জন্য যা রান্না হবে আমরাও সেই সব জিনিসই দিয়ে দেব আমাদের জন্য।'

পরিচালক আমাদের জন্য বেশ সন্তোষজনক ব্যবস্থাই করে দিলেন। থাকা-খাওয়া

সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সেদিনই আমাদের জিনিসপত্র ওপরে নিয়ে আসা হলো।

উত্তরকাশী নামটি পঞ্চাশ-ষাট বছর হলো দেওয়া হয়েছে, না হলে সরকারি খাতাপত্রে আজও একে বাড়াহাট (বাড়াবাজার) বলা হয়। হিমালয়ের তীর্থগুলোতে যখন শেঠ-মহাজন এবং রাজা-বাবুরা আসতে শুরু করলো এবং তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট আয় হতে লাগল, তখন লোকে নতুন নতুন প্রয়াগ আর কাশী বানাতে শুরু করল। উত্তরকাশীও এরকমই একটি নকল কাশী। তবে তার মানে এই নয় যে বাড়াহাট আগে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল না। এটা খুবই ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন জায়গা। এখানকার পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাব্দীর ত্রিশূল সারা ভারতবর্ষে স্বকীয় বিশিষ্টতার এক অদ্বিতীয় নিদর্শন। একাদশ শতাব্দীর অষ্টধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যের সুন্দর এক নমুনা। উত্তরকাশী ষষ্ঠ শতাব্দীতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যের সঙ্গে তো ধর্মের দোকানদারি চলে না, তাই বাড়াহাটকে উত্তরকাশী হতে হয়। শক্তির বিষয়ে আমার জানা ছিল কারণ তার সম্বন্ধে গুপ্তকালীন অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি আমার কাছে 'গঙ্গা'র পুরাতত্ত্ব সংখ্যায় ছাপার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি ওখানকার বিষয়ে আরো কিছু জানতে চাইছিলাম। জানা গেল, এখানকার পাঠশালায় শ্রীচন্দ্রশেখর শাস্ত্রী পড়ান। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি যা কিছু জানতেন সব বললেন। শুনে আফশোশ হলো যে তিনি গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের গ্রাম মুখবাতে বদলি হয়ে গেছেন। যদিও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইতিহাসে আগ্রহ থাকে না, তবু যেহেতু চন্দ্রশেখরজী এখানকার বাসিন্দা তাই তাঁর পক্ষে আরও কিছু জানা সম্ভব ছিল।

ওখান থেকে চলে আসছি এমন সময় এক দাড়িওলা গুজরাটী ব্রহ্মচারী এলেন। চন্দ্রশেখর পণ্ডিতের সঙ্গে আমার সংস্কৃতে কথাবার্তা চলছিল। আমি বৌদ্ধ শুনে ব্রহ্মচারীর মুখমণ্ডল একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বোধহয় ভাবলেন যে, ভগবান শঙ্করাচার্য[১]-র তাবৎ ক্রিয়াকর্ম তাহলে মাটিতে মিশে যেতে বসেছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি বুদ্ধের চেলা হতে আরম্ভ করে তবে বেদান্তের আর কি ভবিষ্যত থাকতে পারে? তিনি শিষ্টাচারের ধার ধারলেন না—শাস্ত্রী তাঁর পরিচয় দিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি·এ·, এল·এল·বি· বলে। তবে আমি অক্সফোর্ড, কেমব্রিজের অনেক গাধা দেখেছি তাই আর আশ্চর্য হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

পরদিন (৭ মে) পুলিশের এক সেপাই এলো, জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন থাকবে?' আমি বললাম, 'কিছুদিন থাকবো, আমার চিঠিপত্র আসার আছে ('দর্শন দিগ্‌দর্শন'-এর

[১]স্বনামখ্যাত আচার্য শঙ্কর। ইনি কেরল ও মলবার দেশে ৭৮৮ থেকে ৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে আবির্ভূত হন এবং বত্রিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে ইনি শঙ্করের অবতার বলে কথিত। পদ্মপাদ হস্তামলক সুরেশ্বর বা মণ্ডন ও ত্রোটক এঁর প্রধান শিষ্য। এঁর অন্যতম শিষ্য আনন্দগিরি 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা। 'দশনামী-দণ্ডী', -নাম-, শৈব-সম্প্রদায় এঁর প্রবর্তিত। 'আত্মবোধ', 'আনন্দ-লহরী', 'মণিরত্নমালা' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং উপনিষৎ গীতা প্রভৃতির ভাষ্যের ইনি রচয়িতা। ইনিই ভারতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করেন।—স·ম·

প্রুফ আসার কথা ছিল)।' সে বলল, 'পুলিশ-চৌকিতে গিয়ে নাম লিখিয়ে, দস্তখত করে আসতে হবে।'

বেলা চারটের সময় পুলিশ-চৌকিতে গেলাম। চেহারার বিস্তৃত বিবরণ আর পিতার নাম-গ্রাম ইত্যাদি সব লেখা হলো। এই হুজ্জুতির উদ্দেশ্য হলো তাড়াতাড়ি উত্তরকাশী থেকে তাড়ানো। বুঝলাম এর নকল টেহ্‌রীতে পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা হয়তো পড়বেন—কেদারনাথ পাণ্ডে ... পণ্ডিত বৈজনাথ ... তাঁরা কি করে বুঝবেন যে রাজ্যে একজন বিপজ্জনক লোক ঢুকে পড়েছে।

নাগার্জুনজীর চটিজোড়ার অবস্থা হয়ে এসেছে—তাঁর জুতোর দরকার ছিল। গ্যান্‌তেসু গেলাম মুচির কাছে। তার কাছে চামড়া ছিল না। উত্তরকাশীতে দোকান ছিল প্রচুর কিন্তু এখনও অনেক দোকান বন্ধ ছিল। যাত্রীদের মেলা শুরু হয় নি। দোকানে আলু পাওয়াও ছিল সমস্যা।

আমরা এখানে থেকে 'দর্শন দিগ্‌দর্শন'-এর প্রুফ দেখব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম একটি উপন্যাস লিখব। নাগার্জুনজী তিব্বতী ভাষা অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি তিব্বত যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। উপন্যাস তো চল্লিশ-পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। লেখাটা পছন্দ হলো না।

বিকেলে (৮ মে) পুবের দিকে বেড়াতে গেলাম। রাস্তার ওপর এক দুর্গামন্দির দেখলাম। মন্দিরের বাইরে অনেক ভাঙা মূর্তি পড়ে আছে। জুতো কেনা জরুরি ছিল—জানা গেল নদীর ওপারে বোঙা গ্রামে জুতোর কারিগরদের ঘর। পুল পার হয়ে বুড়ো কেদারের রাস্তার তিন মাইল পর্যন্ত গেলাম। ওখানেও জুতো বানানোর মত কোনো লোক পাওয়া গেল না। রাস্তায় দেখলাম শুকনো তেজপাতা পড়ে আছে। এখানে এইসব গাছের জঙ্গল রয়েছে অথচ এখানকার লোক তার ব্যবহার জানে না। এখানে এই পাহাড়ে মেয়েরাই বেশি কাজ করে। শুধু রান্না করা নয়—চাষবাসের কাজও এরা করে। হয়তো হাল ধরে না, তবে জমিতে সার দেয়া, বীজ বোনা, নিড়েন দেয়া, সবই মেয়েদের কাজ। পুরুষদের তো কোনো কাজ করতে দেখা যায় না। তবে পুরুষদের এক ধরনের রোজগার আছে। তারা গঙ্গাজল নিয়ে যুক্তপ্রান্ত, বিহার—আরও দূর দূর জায়গা পর্যন্ত চলে যায়। স্থানীয় সমস্ত রাজপুতরা ব্রাহ্মণ সেজে গঙ্গাজল বিক্রি করে বেড়ায়। গঙ্গাজলও খুব কমই থাকে, বেশির ভাগ কুয়োর জল, নদীর জলই থাকে। যেখানেই জল শেষ হয় সেখানেই আবার গঙ্গাজল ভরে নেওয়া হয়। গঙ্গোত্রীর আশেপাশের লোকেদের এর থেকে মোটা আয় হয়।

এখানে বিয়ের জন্য কন্যাকে কিনতে হয়। আয় অনুসারে কন্যার দাম পাঁচশো, হাজার পর্যন্ত উঠে যায়। আগে বাল্যবিবাহ বেশি হতো, কিন্তু সরকার এর বিরুদ্ধে আইন তৈরি করেছেন—এখন ১৪ বছরের কম বয়সের মেয়ে আর ১৮ বছরের কম বয়সের ছেলের বিয়ে হতে পারবে না। আইনে তো বলে পাত্রীর দাম ১০০ টাকার বেশি নেয়া যাবে না কিন্তু বিয়ের জন্য কোনো মেয়েকে তো বাধ্য করা যায় না আর গোপনে কত টাকা দেওয়া হলো তাই-বা জানা যাবে কি করে? পাত্রীর দামের একচতুর্থাংশ রাজ্য সরকার নেয়। তবে

মূল্য ১০০ টাকার বেশি নেয়া হয় না। যখন বনিবনা হয় না তখন স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঝালার বাসিন্দা এক সাধু বলছিলেন যে ওখানে এক-একটি পরিবারে তিন-চারজন করে পরিত্যক্তা স্ত্রী বসে আছে।

উত্তরকাশীতে একটি মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল আছে। এখানে কিছু সুতো কাটা ও বোনার কাজ শেখানোরও ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক মোতিলাল উলের সুতো কাটা ও বোনার কাজ দেখালেন। এখন অবশ্য কোনো লোকসান নেই, কেননা মিলের তৈরি গরম কাপড়ের দাম খুব বেশি, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে মিলের সস্তা কাপড়ের যখন বন্যা বয়ে যাবে তখন এই দামী কাপড় কে পুঁছবে? টেহরী সরকার এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা থেকে ঘরে ঘরে মেশিনে কাপড় তৈরি করাতে পারে না? এই বিভাগের উপযোগিতা তো শুধু কয়েক বছরের জন্য।

আজই স্বামী রামতীর্থের শিষ্য স্বামী আনন্দের সঙ্গে দেখা হলো। অত্যন্ত মিশুকে এবং উদার হৃদয় ব্যক্তি।

আমরা যেখানে ছিলাম তার কাছেই থাকতেন সিদ্ধ গম্ভীরনাথের (গোরখপুর আর গয়া) শিষ্য সাধু প্রজ্ঞানাথ। তিনি উত্তরকাশীর বিদ্বান সাধুদের মধ্যে একজন। প্রথমত, তিনি নাথপন্থী হওয়ার দরুন তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, শুনেছিলাম তিনি মানস সরোবর হয়ে এসেছেন—আমাদেরও থোলিঙ পর্যন্ত যাবার ছিল। তাঁর কাছে জানলাম ভৈরোঘাটি থেকে ১০ দিনে থোলিঙ পৌঁছোন যেতে পারে।

নাথ-পন্থ সম্পর্কে বলা যায়—ওরা বিশ্বাস করে ৮৪ সিদ্ধও ছিলেন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। কয়েকজন ছাত্রকে তিনি কোনো বেদান্ত গ্রন্থ পড়াচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকলাম যে তিনি কোন ভাষা বলছেন, গদ্য না পদ্য? যদি মুখ গোল করে বাংলা বলতেন তো তাও বুঝতে পারতাম। কিন্তু এখানে দেখলাম প্রত্যেক উচ্চারণেই নাসিকার পূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে, অগুনতি অনুস্বারের উচ্চারণ করা হচ্ছে। ৮৪ সিদ্ধ সম্পর্কে আমি যখন তিব্বতী গ্রন্থের কিছু কথা বললাম, তখন তিনি বললেন, 'ও সব মিথ্যে কথা।' ৮৪ সিদ্ধ খাঁটি আস্তিক আর অদ্বৈতবাদী—তাঁদের কীর্তির কথা তো ছেড়েই দিলাম, তাঁদের নামও যিনি বলতে পারেন না—তাঁর পক্ষে এমন দাবি করা সত্যি সাহসের ব্যাপার। কিন্তু তাঁকে কে বোঝাবে? তিনি হচ্ছেন দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে বিচরণশীল জীব। এমনিতে সাধু প্রজ্ঞানাথের স্বভাব অত্যন্ত মধুর এবং অমায়িক। সাধু প্রজ্ঞানাথেরই গুরুভাই হচ্ছেন সাধু শান্তিনাথ। তাঁর পাণ্ডিত্য অত্যন্ত গভীর। সিদ্ধ গম্ভীরনাথকে তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় সিদ্ধযোগী বলে মানা হয়। তাঁর অলৌকিকতার যদি এক শতাংশও সত্য হয়, তাহলে ভারতকে সুখী এবং স্বাধীন করে দেয়া তাঁর শুধু কড়ে আঙুলের কাজ ছিল। তাহলে তিনি কেন সেটা করলেন না? ভগবানের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চান নি বা রক্তপায়ী শোষকশ্রেণী পুজো-প্রার্থনা করে তাঁকে একাজ থেকে বিরত রেখেছিল।

আরও একজন সিদ্ধামাতা আনন্দময়ী বাংলায় আবির্ভূতা হয়েছেন। উত্তরকাশীতেও তাঁর একটি কালীমন্দির আছে। তাঁর অদ্ভুত শক্তি সম্পর্কে কত বইও লেখা হয়েছে। কন্‌খলের স্বামী কৃপালুদেবের জীবনী নিয়ে 'সন্তদর্শন' নামে একটি সচিত্র মোটা বই ছাপা

হয়েছে। এ বইতেও স্বামীজীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কয়েকশো উদাহরণ আছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি রমন, যোগীরাজ অরবিন্দ ইত্যাদি সব বড় বড় মৎস্য সম্পর্কে আর কিই-বা বলার আছে? তাঁর সিদ্ধাইসমূহের তো কোনো আদি-অন্ত নেই। তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা নিয়ে যেসব বড় বড় বই লেখা হয়েছে সেসব দেখে কখনও কখনও আমার রাগ হতো; কিন্তু পরে বুঝেছি শোষক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই এসব উৎপন্ন হয়। যতদিন শোষক শ্রেণীর ধ্বংস না হবে ততদিন এসব আবর্জনা দূর হবে না। মনের একাগ্রতার কারণে মেসমেরিজম্-এর মত কিছু শক্তির সঞ্চার হয় আর তাই নিয়ে কথার পাহাড় খাড়া করা হয়। একবার তো আমার ইচ্ছে হয়েছিল এক সিদ্ধার জীবনী লিখি, তাতে আধুনিক, প্রাচীন সব সিদ্ধাইকে জুড়ে দিই। বইটি খুব শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে লেখা হবে আর আনন্দময়ীর জীবনীর মত ওতে বিভিন্ন মুদ্রার অনেক ছবিও লাগিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সেই বই ভক্তদের কাছে পেশ করা হোক, দেখি ওদের শ্রদ্ধা এইসব কুৎসিত কথা কতটা সহ্য করতে পারে। লেখার জন্য আমি অনেক বইও সংগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু লেখার সময় হয় নি।

সাধু শান্তিনাথ তাঁর গুরু গম্ভীরনাথের সঙ্গে থেকে খুব যোগাভ্যাস করলেন। কিন্তু যোগের মধ্যে রোগের প্রচণ্ড আশঙ্কা হলো। ডাক্তার বলল, 'এখনও যদি নিজেকে সংযত না করেন তবে স্বাস্থ্য তো ভেঙে পড়বে এবং মাথাও খারাপ হয়ে যাবে।' তিনি তখন দর্শন পড়া শুরু করলেন। গভীরভাবে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করলেন, পাশ্চাত্য দর্শনও পড়লেন। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এ সমস্ত হলো দার্শনিকদের শূন্যে বিচরণকারী মিথ্যে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফাঁপা কল্পনামাত্র। তিনি এ বিষয়ে বই লিখেছেন। তাঁর গভীর অধ্যয়নের ফল হলো তাঁর বই—'ধর্ম-দর্শনের সমালোচনামূলক পরীক্ষা' ('The Critical Examination of the Philosophy of the Religion, 2 vols.)।

সাধু প্রজ্ঞানাথ তাঁর গুরুভাইকে শুধু যে নাস্তিক ভাবতেন তাই নয়, তাঁর লেখা কোনো বই পড়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে ভীষণ অবজ্ঞা দেখালেন। সাধু প্রজ্ঞানাথ অত্যন্ত পরিশ্রম করে বেদান্তের ওপর দু-তিনটি বই লিখেছেন; কিন্তু তর্ক সেই হাজার বছরের পুরনো। তাঁর আশা তাঁর এই কীর্তি চিরস্থায়ী হবে। আমি বললাম, 'আপনি এগুলো খুব ভালো কাগজে লিখে মাটিতে পুঁতে দিন। হয়তো হাজার, দু-হাজার বছর পর লোকের হাতে পড়বে, তখন এর কদর হবে।'

আমাদের বাসার উল্টোদিকে ছোট্ট একটি বৈষ্ণবদের ঠাকুরবাড়ি ছিল। মন্দিরের মোহান্তিনী এক ৫০ বছরের প্রৌঢ়া বৈরাগী ছিলেন। তাঁর দিদিমা এই মন্দিরটি স্থাপন করেন, তারপর তাঁর মেয়ে আর নাতনী আসে। তিনি ছাপরা জেলার গুঠনি থানার বাসিন্দা ছিলেন। খুব ছোটবেলাতেই তাঁর নাতনী এখানে এসেছিল; এখন আর ছাপরার ভাষা বলতে পারেন না। পাশেই কোনো গাঁয়ে তাঁর বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্বামী তাঁকে ত্যাগ করে—এখন তিনি এই ঠাকুরবাড়ির মোহান্তিনী। মন্দিরের জমি আর আঙিনা ছাড়া আর কোনো সম্পত্তিই নেই। বেচারি চেয়েচিন্তে কোনোরকমে দিন কাটান।

১৬ মে আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলাম। এটা যখন উত্তরকাশী তখন বিশ্বনাথেরও থাকার কথা। কিন্তু এই বিশ্বনাথ একদম নতুন। তবে হ্যাঁ, মন্দিরের সামনে আট-দশহাত উঁচু যে পিতলের ত্রিশূলটি (শক্তি) আছে সেটা ভারতের অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক জিনিস। এই ত্রিশূলের পুজো হয়। মেঝে থেকে কিছুটা ওপরে ত্রিশূলের গোড়ায় সংস্কৃতে লেখা তিনটি লাইন আছে। লিপি হচ্ছে সেইরকম যা মৌখরি[১] হরিবর্মার (ষষ্ঠ শতাব্দী) হড়হার লেখাতেই পাওয়া যায়; যে লিপি থেকে তিব্বতী অক্ষর বেরিয়ে এসেছে। একাদশ শতাব্দীতে বাড়াহাট তিব্বতী রাজাদের হাতে ছিল, সে কথাই এখন বলব। ত্রিশূলের দু'জায়গায় কিছুটা শঙ্খলিপিতেও লেখা আছে। শঙ্খলিপি এখনও পড়া যায় নি। সৈদপুর-ভিতরির গুপ্ত স্তম্ভের ওপরও এই লিপিতে লেখা আছে (এখন এই স্তম্ভ বেনারসের সরকারি সংস্কৃত কলেজের চত্বরে পোঁতা আছে)। সুলতানগঞ্জ (ভাগলপুর) থেকে কিছু দূরে এক পাহাড়ের গায়েও আমি এই লিপি দেখেছি। জাভা দ্বীপেও এই লিপি পেয়েছি।

আমরা প্রাচীন মন্দিরের খোঁজে, পরশুরামের মন্দির দেখে, উজালির উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। আনন্দস্বামীর সঙ্গে তখনই দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'এখানে পিতলের একটি বুদ্ধমূর্তি আছে। ডক্টর পান্নালাল এখানে এসেছিলেন। তিনি এই মূর্তিটিকে অত্যন্ত প্রাচীন বলেছেন। মূর্তির নিচে লেখাও আছে কিন্তু লিপি এমন যে কেউ পড়তে পারে নি।' তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। পরশুরাম মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি ছোট কুঠরি আছে, যাকে দত্তাত্রেয়র মন্দির বলা হয়। এই অজ্ঞাত জায়গায় ভারতীয় ভাস্কর্যের এক সুন্দর নমুনা, তথা পশ্চিম-তিব্বত এবং ভারতের সম্পর্কের ঐতিহাসিক শৃঙ্খলার রূপ নিয়ে এই বুদ্ধমূর্তিটি বিদ্যমান। আগের মন্দিরটি গোল ছিল। মন্দিরের ওপর পুণ্ডরীকার (ছত্রমুকুট)ও ছিল। কাঠের ছত্রী ছিল। মন্দিরের চারদিকে দেবদারু কাঠের থামের ওপর পরিক্রমা বানানো ছিল। মন্দিরটি পড়ে গেছে। ২০ বছর আগে স্বামী পূর্ণানন্দ (কৈলাস) এই নতুন মন্দির বানিয়েছিলেন। পাঁচ-ছ পুরুষ ধরে পুরী নামের গৃহস্থ পুজারী এখানে পুজো করছেন। মন্দিরের পনের-কুড়ি টাকা আয়ের নিষ্কর জমি আছে। সরকারের তরফ থেকে বার্ষিক ১০০ টাকা ঠাকুর-ভোগের জন্য পাওয়া যায়। মূর্তিটিকে দত্তাত্রেয়[২] মূর্তি বলা হয়। মূর্তিটির প্রভামণ্ডল অংশটিকে সোনা ভেবে কেউ কেটে নিয়ে গেছে। কাটা অংশটি দেখে লোকে অনুমান করে যে আগে দত্তাত্রেয়র তিনটি মাথা ছিল যার মধ্যে দুটো মাথা বৌদ্ধরা কেটে ফেলেছে। বাঁদিকে কাঁধের ওপর পর্যন্ত প্রভামণ্ডলের কিছু অংশ বেঁচে গেছে, কিন্তু নিচের অংশ একেবারেই নেই। মূর্তিটি ৩০" (৪৫ আঙুল) উঁচু নিরেট পিতলের তৈরি। চোখের মণিতে সদা উজ্জ্বল রূপো এবং ঠোঁটে তামা ব্যবহার করা

[১] পশ্চিম উত্তর-প্রদেশের কনৌজ অঞ্চলে রাজত্বকারী বংশ।—স·ম·

[২] এঁর পিতা অত্রি, মাতা অনসূয়া। অত্রি ভগবানের কাছে পুত্রার্থ বর প্রার্থনা করলে ভগবান তাঁকে 'ময়া দত্তোহহম্' (আমি আপনাকেই দিলাম) বলে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন। এই হেতু ইনি 'দত্ত' নামে খ্যাত। ইনি চতুর্থ অবতার।—স·ম·

হয়েছে। আসন-পীঠ ১৩ আঙুল উঁচু অর্থাৎ আসন সমেত পুরো মূর্তিটি ৫৮ আঙুল বা প্রায় ৩ ফুট ২ ইঞ্চি উঁচু। মূর্তিটি ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা হয়, ফলে মুখের কিছু ক্ষতি হয়েছে। দু'কাঁধ ঢাকা চীবর আছে। পাদপীঠের সামনের দিকে তিব্বতী অক্ষরে লেখা আছে— 'ল্হ-বচন-পো-ন-গ-র-জ-থুবস-প' (দেবভট্টারক নাগরাজের মুনি)। লিপি সম্বন্ধে আমার 'অগাধ জ্ঞান' দেখে আনন্দস্বামী খুব আশ্চর্য হলেন। শেষ পর্যন্ত ডক্টর পান্নালালের মত গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি যে লেখা পড়তে পারেন নি সেটা দেখামাত্র অনায়াসে পড়ে দিলে আশ্চর্য হবেন না কেন? আমি তাঁকে বললাম, 'এখানকার রাস্তা থেকে কোনো ভোটিয়াকে ধরে আনুন সে এই লেখা পড়ে দেবে।' নাগার্জুনজীও যখন লেখাটি পড়ে দিলেন তখন তাঁর বিস্ময়ের উপশম হলো। আমি বললাম, 'তাহলেও এই মূর্তির গুরুত্ব কম নয়।' এই মূর্তি ৯০০ বছরের কিছু বেশি পুরনো। যিনি এই মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন তাঁকে আমি জানি। এমনিতে আনন্দস্বামী আমার নাম আগে থেকে জানতেন তাই লেখাটি পড়ে দেবার জন্য যে তাঁর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়। পশ্চিমী তিব্বতের গুগে (শঙ্-শুঙ্)-তে ১০৩০ সাল নাগাদ খোরদে নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ইনিই থোলিঙ্-এর মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধা ছিল, তবে তাঁর অন্ধভক্তি ছিল না। এতে বোঝা যায় যে তাঁর তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস ছিল না। তিব্বতে তখন বৌদ্ধ ধর্মে নানা বিকৃতি এসেছিল। রাজা খোরদে চাইলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের আবার উন্নতি হোক। তিনি জনাকুড়ি তরুণকে সংস্কৃত শিখতে কাশ্মীর পাঠালেন, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুজন সাফল্য নিয়ে ফিরেছিল। নিজের ভাইকে রাজ্য দিয়ে রাজা তাঁর দুই ছেলে নাগরাজ এবং দেবরাজকে নিয়ে ভিক্ষু হলেন। ভিক্ষু হবার পর খোরদের নাম হলো যেশে-ওদ্ (জ্ঞানপ্রভ)। রাজভিক্ষু জ্ঞানপ্রভ ভারত থেকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে আসার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর জীবিতকালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আসতে পারেন নি। তিনি যখন ব্যয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমান্তে যান তখন প্রতিবেশি তুর্কজাতীয় রাজা গর-লোক তাঁকে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমার মনে হয় ভল্যানীর গিরিপথ সেই সময় গুগে রাজ্যের সীমা ছিল, আর বাড়াহাট ছিল সেই রাজ্যের ভেতরে। গ্যান্সু, ধরাসু ইত্যাদি নাম প্রাচীন নামের পরিবর্তিত রূপ বলে মনে হয়। মনে হয় সে সময় এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তিব্বতীরাও ছিল। 'মুখবা'র মত কয়েকটি গ্রামের কথা তো আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, বর্তমান বাসিন্দারা অনেক পরে সেখানে এসেছে। সম্ভবত চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভল্যানীর এদিকে তিব্বতী শাসনের চিহ্ন লোপ পেতে শুরু করে। জ্ঞানপ্রভর পুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ যিনি এই সুন্দর মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন। জ্ঞানপ্রভর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো চঙ্-ছুব্-ওধ্ (বোধিপ্রভ) অত্যন্ত সচেষ্ট হয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে আমন্ত্রণ জানান এবং ১০৪২ খ্রীস্টাব্দে নিজের রাজ্যে সংবর্ধনা দেন।

তিব্বতী ইতিহাস থেকে আমি এটুকুই জানতাম যে নাগরাজ তাঁর পিতা জ্ঞানপ্রভর সঙ্গেই ভিক্ষু হয়ে যান। এ থেকে বোঝা যায় যে নাগরাজ রাজত্ব করেন নি। কিন্তু এই মূর্তিতে তাঁকে ভিক্ষু বলা হয় নি। বলা হয়েছে 'ল্হ-বচন-পো' (দেবভট্টারক), যা শুধু

রাজার উদ্দেশেই লেখা যায়। রাজভিক্ষুর জন্য ব্যবহৃত শব্দ হলো 'ল্‌হ-ব্‌ল-ম'। এর অর্থ হলো যে নাগরাজের রাজত্ব ছিল পশ্চিম তিব্বতে এবং তাঁর রাজ্যের এই জায়গায় ১০২৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন।

উত্তরকাশী ছেড়ে যাবার আগেই আমার খানিকটা খ্যাতি হচ্ছিল। তহশীলদার সাহেবও কিছু জিজ্ঞেস করলেন। শিক্ষিত যাত্রীদের মধ্যেও কেউ কেউ আসতে লাগলেন, এঁদের মধ্যে উজ্জয়িনীর ডাক্তার নাগরের ধর্মপত্নী আর আমাদের মালখাচকের (ছাপরা) বদ্রীবাবুও ছিলেন।

গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে প্রস্থান—শেষ পর্যন্ত প্রুফ আর আমার হাতে এলো না, তাই ২৬ মে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত এক ভারবাহককে নিয়ে আমরা রওনা হলাম। দু'তিন মাইল যাবার পর রাস্তার বাঁদিকে ছোট একটি বাংলো দেখলাম। উত্তরকাশীতেই খবর পেয়েছিলাম যে গোস্বামী গণেশ দত্তজী এখানে এসে তপস্যা করছেন। তপস্যা অবশ্যই করেন, দুনিয়ার লোকে গরমের সময় পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে আর গোস্বামীজী পাহাড়ে আসেন শীতে। একপ্রকার গলে যাবার জন্যই তিনি হিমালয়ে আসেন। তাঁর লোকেরা একথাও বলল যে গোস্বামীজী স্রেফ ফলাহারের ওপর থাকেন এবং তাবৎ ফলাহারের সামগ্রী নিচ থেকে আসে। যে ভক্ত গোস্বামীজীর জন্য রোজ ১০ টাকার ফলাহার পাঠান তিনিও ধন্য। শুনেছি গোস্বামীজী যখন-তখন মৌনী হয়ে যান। মৌনী, ফলাহারী, হিমালয়ের তপস্বী—কত যে গুণের অধিকারী এই মহাপুরুষ। বিড়লার ধর্মশালায় পাথরের ওপর লেখা দেখে বুঝেছিলাম যে এটা বিড়লাদের ধর্মশালা। যখন নদী আর অন্যান্য জিনিসের ওপর লেখা নাম দেখছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল না, এ সমস্ত মায়াই হচ্ছে গোস্বামী গণেশ দত্তের সনাতন ধর্মসভার। যাইহোক, অদ্বৈতবাদ অনুসারে গণেশদত্ত = বিড়লা = সনাতন ধর্মসভা—ঠিকই আছে। ভাবছিলাম গোস্বামী গণেশ দত্তজী যদি কয়েক বছর আগেই হিমালয়ের তপস্যাটা শুরু করতেন তাহলে মালব্যজীর কৃষ্ণাশ্রমের চরণে মাথা ঠোকার প্রয়োজনই হতো না—এখানকার এই খাঁটি ব্রাহ্মণ মহাতপস্বীই গিয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি রচনা করে দিতেন। এতে কোনো সন্দেহই নেই যে গোস্বামী গণেশ দত্ত হচ্ছেন হিন্দু ধর্মের এক দিব্য বিভূতি এবং সনাতন ধর্মের তিনি প্রাণ। তপস্যার পথেও পা বাড়িয়েছেন তিনি। কে বলতে পারে তিনিও একদিন গঙ্গোত্রীর দিগম্বরদের মধ্যে সামিল হয়ে যাবেন কিনা। আজও পাঞ্জাবের কোটিপতি ধনীরা গোস্বামীজীর চরণধূলি মাথায় নেওয়ার জন্য রেষারেষি করছে। গোস্বামীজীর হিন্দু-উর্দু পত্রিকা তাঁর 'ত্যাগমূর্তি'র প্রশংসায় মা সরস্বতীকেও হার মানায়।

মনেরীর কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছিলাম। সেখানে কয়েকজন তিব্বতী নারী-পুরুষের দেখা পেলাম। এই খাম্‌বা শ্রেণীর লোকেরা শীতকালে ঋষিকেশ, দেরাদুন তথা আরও নিচে চলে যায়। এখন এরা তিব্বতের দিকে যাচ্ছিল। এরা ছোটখাটো ব্যবসা করে। সেদিন ওদের একটি পরিবারে একজন ভিক্ষুণী মারা গিয়েছিল এবং ওরা চা-ছাতু ইত্যাদি দিয়ে ভোজের আয়োজন করছিল। আমি ওদের কাছে গিয়ে থোলিঙ্‌ সম্পর্কে কিছু

জিজ্ঞেস করলাম। আমি লাসার তিব্বতী ভাষা বলছিলাম, ওরা ভেবে বসল আমি লাসার দিকের লোক। মুখের বিশেষত্ব দেখাটা ওদের প্রয়োজন মনে হয় নি।

মনেরীতে আমরা খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিলাম। এদিককার পাহাড়ীরা এমনিতে পেঁয়াজ তো খুবই খায়, কিন্তু যাত্রার দিনগুলোতে ব্যবসায়ীদের কৃপায় পেঁয়াজ পাওয়া মুশকিল। পেঁয়াজ ছাড়া কি তরকারি রান্না ভালো হয়? মনেরীতে মা গঙ্গার কৃপা হলো। একটি লোক পেঁয়াজের বোঝা নিয়ে যাচ্ছিল—আমরা তার কাছ থেকে কিছু পেঁয়াজ কিনলাম। সেদিনটা আমরা 'সৈজো'তেই থেকে গেলাম। গাঁয়ের একজন দোকান খুলে বসেছিল। দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা এখানে থাকাই ঠিক করলাম। উজ্জয়িনী আর বেনারস থেকে আসা যাত্রীরাও এখানেই থাকলেন। ভারবাহকরা পেঁয়াজ দিয়ে আচ্ছা করে তরকারি রাঁধল। রান্নার সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীমতী নাগরাজ এই দেবাহারের অর্ধভোজন তো করলেন, তবে পুরোভোজনের জন্য বদ্রীবাবুই এগিয়ে এলেন।

পরের দিন (২৭ মে) আমরা কিছুটা আগে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় চড়াই থাকলেও খুব একটা কষ্টকর ছিল না। মল্লাচট্টী প্রায় অর্ধেক পথে পড়ল। এখান থেকে বুড়ো কেদারনাথের রাস্তা আলাদা হয়ে যায়। আমরা ভটওয়ারী পৌঁছলাম। এখানে ডাকবাংলো, ধর্মশালা এবং অনেক দোকানও আছে। ধর্মশালাতে আমরা খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম করলাম।

বেলা তিনটের সময় আবার রওনা হলাম। বেলা পড়ে আসছিল—আমরা ঋষিকুণ্ডে পৌঁছলাম। ৩৪ বছর আগে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন পাথর বাঁধানো এত ভালো কুণ্ড ছিল না, স্নান করার এত সুবন্দোবস্তও ছিল না। এখন তো ঋষির মন্দিরও তৈরি হয়ে গেছে এবং পাণ্ডা বলছিল যে এই ঋষির তপস্যার ফলেই এখানে উষ্ণকুণ্ডের জন্ম হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে আমাদের ভারবাহকের কথাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। সে বলল, 'একবার মহাদেব আর পার্বতী কৈলাস যাচ্ছিলেন। রাস্তায় মহাদেবের পেচ্ছাপ পেয়ে যায় আর সেই থেকেই এই উষ্ণকুণ্ডের জন্ম।' আমি বুঝতে পারছিলাম যে মন্দিরের পূজারী ঋষির তপস্যার গল্প নিচের লোকেদের ঠকাবার জন্যই বলে, তা নাহলে এই সত্য-পরম্পরার খবর নিশ্চয়ই তার অজানা ছিল না। উজ্জয়িনী-মণ্ডলীর সত্যাত্মাজী (হঠযোগী)[১] আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মহাদেবের এই প্রস্রাব-তীর্থে স্নান করতে করতে আমি সত্যাত্মাজীকে বললাম, 'গ্রীষ্মকালে একবার পার্বতীর সঙ্গে মহাদেব কাশী থেকে আসছিলেন। গাঁজা-ভাং-এর অভ্যেস যায় নি, কিন্তু এই ঠাণ্ডা জায়গায় যখন পৌঁছলেন তখন এখানে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছিল। মহাদেবের পেচ্ছাপ পাওয়ারই কথা—এই সেই জায়গা যেখানে সদাশিব পেচ্ছাপ করেছিলেন।' সত্যাত্মাজী একথা মানতে রাজি ছিলেন না, আবার ওদিকে পূজারী ছেঁড়া ঘাস নিয়ে সংকল্প করানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, 'সংকল্প থাক, আপনার পয়সা এমনিই পাবেন।'

স্নান করতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। অন্ধকার নামতে নামতে আমরা গঙ্গনানী পৌঁছে

[১]প্রাণ ও অপান বায়ু নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধিলাভকারী যোগী।—স.ম.

গেলাম। কুণ্ড থেকে এটা বেশি দূর নয়। উজ্জয়িনীর যাত্রীদের ভিড়টা আসতে অনেক দেরি হলো। শ্রীমতী নাগরের পথ হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। লণ্ঠন নিয়ে লোকে তাঁকে দেখতে গেল। রাতে আমরা এখানেই থাকলাম। গঙ্গনানী খুব ঠাণ্ডা জায়গা। উপত্যকাও এখানে খুব সংকীর্ণ।

২৮ মে আমরা আরো এগিয়ে গেলাম। পথে এখন দেবদারু গাছ দেখতে পাচ্ছিলাম। কয়েক মাইল যাবার পর এক ধর্মশালা (লারনাগ) দেখতে পাওয়া গেল। কোনো ধর্মাত্মা এই ধর্মশালাটি বানিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে একজন গাই-বলদ নিয়ে থাকত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে ছ'আনা সের দুধ আর আট আনা সের আটা দিতে পারে। বললাম, 'তাহলে পায়েসই বানানো হোক।'

পায়েস রান্না আরম্ভ হলো। এখানে প্রচুর মাছি। মাছিভক্ষক গিরগিটি (সাঁড়া)ও কম নয়। লোকজন শুয়ে পড়লে তাদের শরীরের ওপরই এরা আক্রমণ কৌশল আরম্ভ করলো। এরা কামড়ায় না। এদের বিষও নেই। কিন্তু সমতলবাসীরা অবশ্যই এদের খুব ভয় পায়। রুটি-পায়েস খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার আমরা চললাম। ৪ মাইল পর্যন্ত রাস্তা ছিল সাধারণ তারপর সুখীচট্টীর চড়াই শুরু হলো। এখানে গঙ্গার কিনারে পাহাড়ের দেয়াল এমন খাড়া উঠেছে যে রাস্তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। দু-তিন মাইল চড়াই হবে, কিন্তু নতুন লোকের এখানে মন ভরে যায়। আশেপাশে অনেক খেত। কত আখরোট গাছ। আপেল, পীচ জাতীয় ফল এখানে প্রচুর পরিমাণে ফলানো যায় কিন্তু সেদিকে কারো নজর নেই। সুখীর ঠাণ্ডায় মারছা, মাড়ুয়া, চীনা ধান এবং ফাফড়ার চাষই আদ্যিকাল থেকে হয়ে আসছে, তবে এ বছর কিছু গমও বোনা হয়েছিল। ফসল ভালোই হয়েছে মনে হচ্ছিল। এই প্রচেষ্টা সফল হলে এখানে গমের চাষও হতে থাকবে। আলু ছিল দশ পয়সা সের এবং খুব ভালো আলু। কালীকমলীওলার একটি ভালো ধর্মপালা আর দুটো দোকান ছিল। আমাদের থাকার জন্য একটি ঘর পাওয়া গেল। রাতে এখানেই বিশ্রাম নিলাম।

২৯ মে প্রথম এক মাইল আমাদের চড়াই উঠতে হলো। রাস্তা সুখী গ্রামের পাশ দিয়ে ছিল। আবার উৎরাই এলো। এখান থেকে নীচে তাকালে সামনে গঙ্গার বিস্তৃত উপত্যকা চোখে পড়ছিল, যার আশেপাশের পাহাড় দেবদারু গাছে ঢাকা ছিল। আন্দাজ ৪ মাইল পর ঝালা গ্রাম এলো, গ্রামটি রাস্তা থেকে দূরে, কিছুটা নীচে। আমরা দু'এক জায়গায় ঘোলের খোঁজ করলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। নামতে নামতে গঙ্গার কোলের কাছে চলে এলাম। এবার বাগৌরী পৌঁছলাম। এটা সীমান্তবর্তী তিব্বতীভাষীদের গ্রাম। তিব্বতীরা এদের রোঙ্‌পা বলে আর অন্যান্য পাহাড়ীরা বলে জাড়্। আসলে এরা হিন্দু তিব্বতী জাতি। এদের মুখে তিব্বতী-মোঙ্গল ভাব আছে, মাতৃভাষাও তিব্বতী, তবে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট ভারতীয় রক্তও গ্রহণ করেছে। এরা এখনও বৌদ্ধধর্ম মানে, লামার পুজো করে; কিন্তু ক্ষত্রিয় হবার ইচ্ছা প্রবল এবং তার চাবিকাঠিটি যে ব্রাহ্মণদের হাতে সেকথাও এরা জানে। বাগৌরী এদের স্থায়ী গ্রাম নয়, আসলে এরা নেলঙের অধিবাসী। সেখানে এদের জমি আর ভালো ভালো বসতবাড়ি আছে; কিন্তু শীতকালে বরফপড়ার আগেই বাড়িতে তালা দিয়ে এরা নীচে চলে আসে। বাগৌরীতে বড়জোর দু'চারদিনের জন্য

আস্তানা গাড়ে। তারপর উত্তরকাশীর নীচে ডুঁড়াতে শীত কাটায়। ডুঁড়াতে এদের বাড়িগুলো আমরা শূন্য দেখে এসেছি। মে মাসের শুরুতেই এরা বাগৌরীতে চলে আসে আর দুমাস থেকে নেলঙ্ চলে যায়। এদের এই ধরনের তিনটে গ্রাম আছে।

বাগৌরীতে আমরা মামুলি কিছু কথাবার্তা বললাম, তারপর হরশিলের ব্রহ্মচারীজীর মন্দিরে চলে গেলাম। হরশিলও এখন হরিপ্রয়াগ হবার চেষ্টায় আছে। রাজারাম ব্রহ্মচারীজী এখানে একটি বেশ ভালো মন্দির আর ধর্মশালা বানিয়ে দিয়েছেন। এখানে অন্নসত্রও খোলা হয়েছে। ব্রহ্মচারী কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তাঁর একটিই বোবা ছেলে আছে। ব্রহ্মচারী তাঁর ছেলেকে তিনবার বিয়ে দিয়েছেন। তিন বৌয়ের মধ্যে ভানদে (ভানুদেবী) নামে একজন এদিককার পাহাড়ে দেবী (?) হয়ে আছেন। স্বামী কৃষ্ণাশ্রমই হচ্ছেন সেই দিগম্বর ত্যাগীপুরুষ যাঁকে দিয়ে মহাপ্রাণ মালব্যজী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বনাথ মন্দিরের শিল্যান্যাস করিয়ে ছিলেন। তিনিই প্রথম পুরুষ যিনি এগারো-বারো হাজার ফুট ওপরে গঙ্গোত্রীতে এসে দিগম্বর হয়ে থাকতে শুরু করলেন। এই ঠাণ্ডায় উলঙ্গ হয়ে থাকা সোজা কথা নয়। প্রথম প্রথম ঠাণ্ডার সময় হরশিল চলে আসতেন। লোকে বলে রাজারাম ব্রহ্মচারীর সবচেয়ে সুন্দরী বধূ ভানদেকে তিনি গীতা পড়াতেন, কিন্তু তিনি তো মৌন থাকতেন—তাহলে গীতা পড়াতেন কিভাবে? যাকগে, পাহাড়ীরা নিজেদের ভাষায় যে গান বেঁধেছে তাতে গীতা পড়ানোর কথা আছে। গানের কিছু অংশ এরকম—

‘চবন্নীকো পেরা, তেঁ ক্যা বুরা মানো বাজারামকো ডেরা।
ঝাকা বুনী খাটরে ভান দে! তেঁ ভলে সীক্যো গীতাকো পাঠ ভানদে ভক্তানী।
চীণে তু বংগলা, তেঁ নেকানো ছোড়ী হরশিলকো জংগলা, হে ভানদে।
সুঁগানীকে গোলী, তে না ভালো ভানদে! অবোলাকে বোলী॥’

ভানদে কৃষ্ণাশ্রমের কাছ থেকে এমন জ্ঞান পেল যে সে কৃষ্ণাশ্রমের সঙ্গেই থেকে গেল। কৃষ্ণাশ্রম শ্বশুরকে তিনশো টাকা দিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে ফেললেন। ভানদে এখন ভগবৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী নামে তার গুরুর সেবাতেই নিয়োজিত থাকে। গঙ্গোত্রীতে কৃষ্ণাশ্রমের একটি বড় বাংলো আছে। পাণ্ডারা খুব বাধা দেয় কিন্তু ভক্ত শেঠেরা তবু স্বামীজীর চরণে প্রণাম করার জন্য যায় এবং খুব পুজো করে।

এমনিতে আমাদের হরশিলে থাকার ছিল কারণ নেলঙ্‌বাসীদের সঙ্গে থোলিঙ্-এর দিকে যাবার কথা ছিল, কিন্তু ভারবাহকরা যাবে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত—তাই ভাবলাম, চলো গঙ্গোত্রী হয়েই আসা যাক। হরশিল-এ একটি বৈদিক পাঠশালা ছিল। পণ্ডিত হরেশ্বরজী নৌটিয়াল এখানকার শিক্ষক ছিলেন। চলতে চলতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো এবং আমরা অনেক মালপত্র এখানেই রেখে গেলাম। সেদিন আড়াই মাইল গিয়ে ধরালীতে থাকলাম। ধরালী পঞ্চাশ-ষাট ঘরের একটি সুন্দর গ্রাম। এখানে পঁওয়ার রাজপুতরা থাকে। অনেকগুলো ধর্মশালা আছে, গঙ্গার পাড় খুব চওড়া।

পরের দিন বৃষ্টি আরম্ভ হলো আর ঠাণ্ডাও খুব বেড়ে গেল। ঠাণ্ডার চোটে তো আমাদের ঘরের বাইরে বেরোনই কঠিন মনে হচ্ছিল অথচ দেখলাম এক বাঙালী সাধু চার আঙুল প্রমাণ কৌপীন পরে গঙ্গায় নেমে একপায়ে খাড়া হয়ে জপ করছেন। যাতে পড়ে

না যান সেজন্য কোমরের নীচে একটি লাঠি দিয়ে ঠেকনা দেয়া আছে। তিনি ওখানে এইভাবে দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেন। এটা কম তপস্যা নয়! কিন্তু এখন দেখি তপস্যার আকর্ষণ একটু কমে আসছে। শ্রদ্ধাভক্তির স্বর্ণযুগ তখন ছিল যখন কৃষ্ণাশ্রম এখানে এসেছিলেন, তাঁর নাম কাশী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন এরকম তপস্বী প্রায় একডজন আছেন তাই মহিমা তো কমে যাবেই। আমার কয়েকজন বন্ধু এর জন্যে আফশোশ করছিলেন। আমি তো বললাম, 'উত্তরাখণ্ডে ১০০ দিগম্বরের দরকার, তবে শ্রদ্ধার বাঁধ ভাঙবে।' যোগ এবং সমাধি সম্পর্কেও একই কথা। ছয় ঘণ্টা সমাধিস্থ হতে পারে এমন যদি লাখখানেক বাপের ব্যাটা জন্মায় তাহলে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনের আকর্ষণ খতম হয়ে যাবে। এবং লোকে বেশি করে বুদ্ধির ওপর নির্ভর করবে।

পরের দিন (৩০ মে) বৃষ্টির জন্য বেলা দুটোর আগে আমরা ধরালী ছেড়ে রওনা হতে পারলাম না। দেবদারু গাছের ছায়ায় পথ চলতে খুব ভালো লাগছিল। গঙ্গার পাড়ে পাণ্ডাদের গ্রাম মুখবা দেখা যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গাড়োয়াল নেপালের হাতে চলে যায়। নেপালীরা (গোর্খা) গঙ্গোত্রীতে মা গঙ্গার এক মন্দির বানিয়ে মানসা গাঁয়ের গঙ্গারামের ছেলে কিদু আর কেদার দত্তকে পুজোর ভার দেয়। তখন থেকেই গঙ্গোত্রীতে এক মহাতীর্থের স্থাপনা হয়। আপনি যদি কোনো পাণ্ডাকে আজ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন তো সে সত্যযুগের পরের কোনো কথাই বলবে না। কেদার দত্তের ছয় পুরুষের মধ্যে (কেদার দত্ত-গৈরী দত্ত-দেবী দত্ত-মোতিরাম- হরিনন্দ-তুলসীরাম) তুলসীরামই আছেন, তাঁর বয়স এখন ৬০ বছর।

সাড়ে তিন মাইল পর সাঙলার (ঝাঁগলা) পুল পেলাম। ওপারে কেউ ভালো একটি ধর্মশালা তৈরি করে দিয়েছিল। কোনো এক সাধু ছিলম টেনে আগুন ফেলে দিলে ধর্মশালা পুড়ে যায়। পুল পার হয়ে আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম সেখানকার দেবদারু ছিল আরো সুন্দর। মাইল খানেকের কিছু বেশি পথ চলার পর দেখি বাঁদিকের একটি রাস্তা চলে গেছে ওপর দিকে আর একটি রাস্তা ডানদিক দিয়ে চলে গেছে নীচের দিকে। আমরা সহজবুদ্ধি প্রয়োগ করে নীচের দিকেই চললাম। সামনে পেলাম দুই গঙ্গার সঙ্গমস্থল। কিন্তু সঙ্গমস্থল এত নীচে আর রাস্তা এত বিপজ্জনক ছিল যে কোনো ভক্তই এই সঙ্গমে স্নান করার সাহস করতো না, যদিও একেই আদি প্রয়াগ বলা উচিত। জল দেখে আরও একটি মিথ্যে ধরা পড়লো। বস্তুত এ গঙ্গা সে গঙ্গা নয় যার কিনারে গঙ্গোত্রীর অবস্থান। নেলঙ্ থেকে আসা গঙ্গায় যত জল আছে তার অর্ধেকও এই গঙ্গোত্রী থেকে আসা নদীতে নেই, তবু কি করে এটা আসল গঙ্গা হলো? কারণ গোরখা সৈনিকদের পক্ষে নেলঙ্-এর দিকে যাওয়া সহজ ছিল না, তাই যে প্রবাহটি রাস্তায় পড়েছে তাকেই 'মা গঙ্গা' নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। সামনে লোহার পুল পেলাম, ফের চড়াই শুরু হলো। রাস্তার ওপরেই একটি ছোট্ট গর্ত থেকে লাল জল বেরিয়ে আসছিল। আমি বললাম, 'এর নাম গৌরীকুণ্ড বা রজস্বলা কুণ্ড হওয়া উচিত। কোনো শেঠ যদি দু-চার হাজার টাকা খরচ করে তো কোনো সমস্যাই থাকবে না। আর এতেও সন্দেহ নেই যে এই কুণ্ড-পুজোর পর চরণামৃত নিতে আগ্রহী একশোজন অপুত্রকের মধ্যে পনেরো-বিশজন নিশ্চয়ই পুত্রবতী হবেন।'

পরের চটির নাম ভৈরব চটি। আমি আমার ভক্ত বন্ধুদের বললাম, 'ভৈরব মহারাজ এখানেই জন্মেছিলেন যেখানে থেকে এই লাল জল বেরুচ্ছে।' আমিও চরণামৃত নিলাম। এতে সোডার মত গন্ধ আসছিল আর সেই সঙ্গে কিছুটা দুর্গন্ধও ছিল। ভৈরব চটিতে এখন দুটো ধর্মশালা তৈরি হয়েছে। যে লোহার ঝুলন্ত পুলের ওপর দিয়ে চৌত্রিশ বছর আগে পার হয়েছিলাম, এখন সেটা ভেঙে গেছে কিন্তু লোহার তার এখনও এমুড়ো-ওমুড়ো লাগানো রয়েছে।

সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা আবার সামনে রওনা হলাম। হিমালয়ের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য ছিল আমাদের সম্মুখে। চড়াই বেশি ছিল না কিন্তু আমরা নয় হাজার ফুটেরও বেশি ওপর দিয়ে চলছিলাম বলে আমাদের ফুসফুসকে শ্বাস নেবার জন্য বাড়তি কাজ করতে হচ্ছিল, ফলে বেশি ক্লান্ত লাগছিল। আমাদের পা উঠছিল ধীরে ধীরে। এখানে এক জায়গায় আমরা জংলী ছোলা দেখেছি। ছোলার শাক মুখে দিতেই টক লাগলো। গঙ্গোত্রীর আধমাইল এদিকেই গৌরীকুণ্ডের পুল পেলাম। এই পুল পেরিয়েই লোকে দিগম্বর তপস্বীদের দেখতে যায়।

সাড়ে আটটা নাগাদ অন্ধকার নামতে নামতেই আমি গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম, নাগার্জুনজী আর ভারবাহক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। এখনকার গঙ্গোত্রী আর সেই চৌত্রিশ বছর আগের গঙ্গোত্রী ছিল না। কত পাকা বাড়ি হয়ে গেছে এখানে। এক পাণ্ডার সাহায্যে আমাদের একটি থাকার ঘর পাওয়া গেল। ধরালীতে বৃষ্টি হচ্ছিল আর সেই বাদল মেঘেই এখানে বরফ বৃষ্টি হচ্ছিল। বরফ গলে গিয়েছিল, শনশন করে হাওয়া বইছিল—আর যা ঠাণ্ডা পড়েছিল সে কথা আর বলে কাজ নেই।

কাঠ প্রচুর কেনা হয়েছিল, হাওয়া বইছিল এত জোরে যে কেউ দরজা খুলতে দিচ্ছিল না, ধোঁয়ার চোটে রাতে দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম। গোমুখ এখান থেকে ১৪ মাইলের পথ। রাস্তার বরফ এখনও গলে নি। আমার মতে এই গঙ্গা যখন আসল নয় তখন এই গোমুখও আসল হতে পারে না। আসল গোমুখ তিব্বত সীমান্তে আছে। এখন তিব্বত সীমান্ত নিয়েও ঝগড়া চলছে। তিব্বতীরা বলে ঝাঁগলার পুলের আরো নীচে মুখবার রাস্তার ওপর শুমগুমা নালাই হচ্ছে তিব্বতের সীমা। এইভাবেই টেহরীর রাজা যে পর্যন্ত সীমা বলে মেনে নিয়েছেন, তারপরও চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল নীচে তিব্বতীরা রাজ্যের সীমা নিয়ে আসতে চাইছে। ঝাঁগলা পর্যন্ত পাহাড়ের দেবদারু গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়েছে আর সীমানা নিয়ে ঝগড়ার ফয়সালা যুদ্ধ থামা পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়েছে।

সকালে খুব ভালো রোদ উঠল। লোকেরা গঙ্গা স্নানে গেল। আমি শুধু মনে মনে স্নান করলাম। এদিক-সেদিকের কিছু ফোটো তুললাম। জয়পুরের রাজা পাথরের নতুন মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন। কয়েক বছর আগে গোরখাদের বানানো মন্দির মা গঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। গঙ্গার মন্দিরেও গেলাম। পুরনো মন্দিরের নিদর্শন হিসাবে শুধু তাম্র ফলকটিই আছে, যার ওপর ভুল সংস্কৃততে একটি লেখ আছে। পাণ্ডারা বহু চেষ্টা করলো বোঝাতে যে এই তীর্থস্থান ভগীরথ মহারাজার সময় থেকেই চলে আসছে। কিদু-কেদার থেকেই যে মুখবার আরম্ভ হয়েছে এরা সেকথাও মানতে রাজি নয়, তবে আমি দু-তিনজন

পাণ্ডার কাছ থেকে ঐতিহাসিক রহস্যের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলাম।

ছাপরার যোগানন্দজীও গতকাল থেকে আমাদের সঙ্গে হয়ে গিয়েছিলেন। আগস্ট উপদ্রব-এর পর যখন ধর-পাকড় শুরু হয় সে সময় গোপালগঞ্জের দিককার এক কংগ্রেসী কর্মকর্তা বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে এক আনাড়ী সাধু সেজে গুজরাট এবং আরও কোথায় কোথায় ঘুরতে থাকেন, পরে ঋষিকেশে এসে গঙ্গার ভেতর রোজ দাঁড়িয়ে থাকা এক দিগম্বর তপস্বীর চেলা হয়ে যান আর মাঝে মাঝে গুরুর জায়গায় নিজেও দাঁড়াতে শুরু করেন। তিনি ঋষিকেশে শোনা কথারই সমর্থন করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে ঋষিকেশে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের সংখ্যা সমান নয়। দুই সন্ন্যাসী পিছু একজন সন্ন্যাসিনী। সাধুদের ভণ্ডামির মধ্যে তাঁকে থাকতে হয়েছিল, ফলে সাধুদের প্রতি তাঁর বিরক্তি এসে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন পুরনো কংগ্রেস-কর্মকর্তা, আমাকেও ভালো করেই জানতেন, ফলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। গঙ্গাতে স্নানের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই স্নান করবেন।' শুনে তিনি ঐ ঠাণ্ডা জলে পাঁচ-সাতটা ডুব দিলেন। ঋষিকেশেও গঙ্গার জল ঠাণ্ডা থাকে, শীতের সময়ও তাঁকে নেংটি পরে ঐ জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—তাই এতগুলো ডুব দেবার সাহস ছিল।

দিগম্বরদের দর্শন করার জন্য ভক্তরা তাঁদের আস্তানার দিকে যাচ্ছিল, আমার যেতে ইচ্ছে করলো না। পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ কৃষ্ণাশ্রম আর ভানদেকেও দেখে এসেছিল। দুপুরের পর আমরা যখন ফিরছিলাম, তখন গৌরীকুণ্ডের পুলের কাছে উলঙ্গ, কালো, বিশাল জটাধারী এক দিগম্বরকে পাথরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। যাইহোক, আমাদেরও উত্তরাখণ্ডে এক তপস্বী দর্শন হয়ে গেলো। পরে নাগার্জুনজী বলেছিলেন যে, এই মহাত্মাটি কৈলাসের রাস্তায় থোলিঙ্ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। সতের হাজার ফুট ওপরে সংকীর্ণ গিরিপথ এমনি এমনি পার হওয়া সত্যিই সাহসের কাজ। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে গেলে হয়তো সয়ে যেত কিন্তু হঠাৎ চলার ধকল শরীরে সইল না। তাই মহাত্মাজীর জ্বর এসে গেল। তিনি মৌনও থাকতেন, কিন্তু মৌনী ভেঙে নাগার্জুনজীর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, 'এখন আর আমি কৈলাস যাব না।' তিনি সেখান থেকেই ফিরে এলেন। ১১ হাজার ফুট ওপরে অভ্যাস করলে মানুষ বারোমাস বিনা কাপড়ে, উলঙ্গ থেকে ঠাণ্ডা সহ্য করার শক্তি অর্জন করতে পারে—এই তপস্বীরা এই কথাটিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শীতে ওখানে কোনো ভক্ত যায় না। থাকার কুটির বানানো আছে। কাঠের জন্য পাশেই রয়েছে জঙ্গল। কে জানে এই সব লোক তখন আগুন পোহায় কিনা। কৃষ্ণকায় দিগম্বরটির ভুঁড়ি দেখে এটাও বোঝা গেল যে এই তপস্যায় শরীর কৃশ হয় না। যদি খাবার জন্য প্রচুর ঘি-চিনি-আটা পাওয়া যায়।

হরশিলে (১-৭ জুন)—৩১ মে দুপুরে আমরা গঙ্গোত্রী থেকে ফিরলাম। ভারবাহকদের আমরা সকালেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। নাগার্জুন ও আমি ছাড়া আমার দলে যোগানন্দ এবং জগাধরীর কাছে থাকেন যে সন্ন্যাসিনী তিনি ছিলেন। সেদিনই আমরা সাড়ে আটটার সময় ধরালী এলাম। দ্রুত হাঁটা হয়েছে তাই এখানে পৌঁছে শরীর যেন ভেঙে আসছিল।

পরের দিন (১ জুন) খুব ভোরেই রওনা হয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হরশিলে চলে এলাম। মাথায় এখন থোলিঙ্ যাবার পাগলামি চেপে ছিল। পশ্চিম তিব্বতের এক প্রান্তে (ছ-মুরতী) ১৯২৫ সালে আমি একবার গিয়েছিলাম। একাদশ শতাব্দীতে এখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলোতে সংস্কৃতের কয়েকশো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল, তাই আমার আশা ছিল যে ওখানে সংস্কৃত গ্রন্থও নিশ্চয় পাওয়া যেতে পারে। পরে নাগার্জুনজী থোলিঙ্ থেকে ফিরে এসে বললেন যে একথা তিনিও বিশ্বাস করেন কিন্তু সমস্ত গ্রন্থই তিব্বত সরকার মোহর লাগিয়ে আর সব জিনিসের সঙ্গে বন্ধ করে রেখেছে। উত্তরকাশীর বুদ্ধমূর্তি এবং মূর্তির ওপর নাগরাজের লেখাটি দেখে আমার তো খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল যে অন্তত থোলিঙ্ পর্যন্ত তো চলে যাই। কিন্তু একমাসের বেশি সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না, এটাও ছিল একটা অসুবিধে। সেদিন নম্বরদার[১] দিলীপ সিংহের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, 'নেলঙ্-এর লোকেরা সাত-আট দিন পরে ওপরে যাবে।'

পণ্ডিত হরেশ্বরজীর সঙ্গে সেদিনই আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। তিনি সবরকম ভাবে চেষ্টা করছিলেন যাতে আমাদের কোনো অসুবিধে না হয়। তাঁর ছাত্ররা আমাদের রান্নাও করে দিচ্ছিল।

পণ্ডিত হরেশ্বরজী বললেন, 'এখান থেকে মুখবার রাস্তায় পাহাড়ের ওপর কোনো এক রাজার রাজধানী ছিল, তার ভাঙাচোরা দেয়াল আর অন্যান্য জিনিস এখনও দেখতে পাওয়া যায়।' ১ জুন আমরা খাওয়া দাওয়া করে এই প্রাচীন রাজধানী কাছোরার উদ্দেশে রওনা হলাম। চড়াই ভাঙতে হলো প্রায় এক মাইলের বেশি। ওপরে পরিষ্কার দেখা গেল বসতির চিহ্ন। মাটিতে পোঁতা কিছু কিছু পাথরও দেখা গেল। পরিত্যক্ত খেত প্রচুর। পাহাড়ের ওপর পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—সবই এখন শ্রীহীন পড়ে আছে। যেখানে যেখানে পোঁতা-পাথর দেখা যাচ্ছে সেখানে খনন করা হলে কিছু পুরনো জিনিস হয়তো পাওয়া যেতে পারে। পণ্ডিতজী এখানকার প্রাচীন ইতিহাস শোনালেন। প্রথমে গুমগুমা থেকে সুখীর চড়াই পর্যন্ত এক রাজা রাজত্ব করতেন, তাঁর রাজধানী ছিল কাছোরাতে। রাজার ভাই থাকতো সীমান্তে। দুই ভাইয়ে হলো ঝগড়া। ছোট ভাই পালিয়ে ভুটান রাজ্যে চলে গেল। ভুটানের রাজা তার সাহায্যের জন্য সেনা পাঠিয়ে দিল। তখনি কাছোরা ধ্বংস হলো। কেউ কেউ বলে, 'কাছোরা নয়, রাজধানী ছিল সীমা এবং ভুটান সৈনিকেরা না জেনে তাদের বন্ধুর বাসস্থান কাছোরাতে আগুন লাগায়।'

৩ জুন আমরা কাছোরা গেলাম। বড় কাছোরার আগে ছোট কাছোরা পড়ল। এখানে আগে অনেক খেত ছিল, সরকার এখন এ জায়গাটাকে 'সুরক্ষিত অরণ্যাংশ' বানিয়েছেন। পুরনো খেতগুলোতে দেবদারু গাছ লাগানো হয়েছে। ছোট কাছোরার পরেই সামান্য চড়াই পড়ল। আধ মাইল চলার পরই আবার খেতের বিস্তৃত জমি এসে গেল। কিছু কিছু খেত এখনও আছে। কাছোরা রাজ্যে প্রথমে বড় বড় আটটি গ্রাম ছিল, যার মধ্যে গরতোক, রতোটিয়া, ভাণ্ডার, কোটা (গুমগুমা)—এই চারটি গ্রাম এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। সীমা,

[১] গ্রামের জমিদার, যিনি খাজনা আদায়ে তাঁর অংশীদারদের মদত দেন।—স·ম·

কাছোরা, পুরালী আর সুখী এখনও কোনোভাবে টিকে আছে। কাছোরার ইতিহাস সম্পর্কে আরও জানা গেল—'দুই ভাই ছিল। রাজ্য দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হলো। পরম্পরা অনুসারে বড় ভাইয়ের বড় অংশ পাওয়া উচিত, কিন্তু ছোট ভাই সেটা দেবে না বলে ঝগড়া করলো। ছোট ভাই যখন নিজে কিছু করতে পারলো না তখন ভুটানে গিয়ে সৈন্য নিয়ে এলো। পথে প্রথমে ছোট ভাইয়ের রাজধানী সীমা পড়লো। ভুটানের সৈনিকরা ভুল করে সীমা জ্বালিয়ে দিল। কাছোরাতে দেবীর মন্দিরে ষাট জন বন্দী শত্রু-সৈন্য পাওয়া গেল। তারা দেবীর মন্দির মার্কণ্ডেয়তে আগুন ধরিয়ে দিল। রাজা আহত হয়ে মারা গেল। তার বংশধরেরা পালিয়ে রামোলী চলে গেল।'

নীচে কোনো একটি পুরনো মন্দিরে আমি পাথরের চৌকাঠ দেখেছি। পাথরের মধ্যে লোহা ঢোকানোর জন্য ছিদ্রও দেখেছি। আগে এখানে সেচের নালাও ছিল, যা দিয়ে এখানকার সমস্ত জমিতে চাষ হতো। প্রাচীন বসতির অবশেষ বলতে এখন কিছু পোঁতা-পাথর আর দু-একটি খুবানি গাছ আছে। ওখান থেকে আরও এক মাইল চড়াই ওঠার পর আমরা একটা জায়গায় এলাম। এখানে পাথরের ওপর গণেশের দ্বিভূজ মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। মূর্তির এক হাতে ছিল কুঠার, অন্য হাতে কোনো মন্দির শিখরের আমলক ছিল, যাতে একত্রিশটি আমলকীর রেখাচিত্র ছিল। বলা হচ্ছিল এটা অন্য কোনো জায়গা থেকে আনা হয়েছে। পাশের একটি শিলার গায়ে উনিশটি অক্ষরের একটি লেখ খোদিত ছিল। দ্বিতীয় লাইনে কেবল একটিই অক্ষর ছিল। অক্ষরগুলো স্পষ্ট নয়। তবে 'ক, য়, জ' দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে দশম শতাব্দীর কাছাকাছি কোনো এক সময়ে এটা লেখা হয়েছিল। আমার ডায়েরিতে লেখাটি নোট করে নিলাম। এখানে স্ট্রবেরি খেতে পাওয়া গেল, এখানকার লোক স্ট্রবেরিকে 'ফলোগ' বলে।

পণ্ডিত হরেশ্বরজী বললেন, 'ভটওয়ারী থেকে আধ মাইল ওপরেও কোনো একজন রাজা থাকতো, ওখানে কিছু পাথরের মূর্তি এখনও আছে। সুখীর ওপরেও এরকম একজন রাজা থাকতো।' তিনি বলতে চাইছিলেন যে নেলঙ্ থেকে উত্তরকাশী পর্যন্ত এলাকায় এরকম পাঁচজন রাজা ছিল—। হোসিঙ্ (হোসলিন) নামে এক সাহেব হরশিল স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম তিনি দেবদারু গাছ কেটে সেই কাঠ নদীতে ভাসিয়ে নীচে চালান দিতেন। লোকেরা জানতই না যে এই কাঠের কোনো মূল্য হতে পারে। হোসলিনের বাংলো এখনো আছে। দেবদারু কাঠের এটা একটা দোতলা বাংলো। ঘরগুলো বড় বড়, তাতে শোবার ঘর, পড়ার ঘর, খাবার ঘর, বৈঠকখানা আর স্নানের ঘরও আছে। শীতকালে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থাও ছিল। কাঠের ওপর কিছু কারুকার্য দেখতে পেলাম। দরজাগুলো খুব বড় বড়। বাইরে সাহেব আপেলের বাগান করেছিলেন, এখন তাঁর দু-একটিই গাছ অবশিষ্ট আছে। হোসলিন চেয়েছিলেন এখানে তার বংশধর রেখে যেতে, তাই তিনি মুখবার এক বাজগী সম্প্রদায়ের মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর সন্তান সাহেব না হয়ে থাকতে পারলো না। সে হরশিলকে বেচে দিল।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর থেকে এই বাংলোতে কেউ থাকে না। এখন এটি সরকারি সম্পত্তি। সামান্য কিছু খরচ করে মেরামত করলে একে ঠিক করে নেওয়া যায়। হোসলিনই প্রথম

এখান থেকে কাঠ চালান দিয়েছিলেন। আজ প্রচুর পরিমাণে কাঠ গঙ্গা দিয়ে ভেসে হরিদ্বারে পৌঁছচ্ছে। তিনি আপেলের বাগান করেছিলেন আর আজও রাজোদ্যান এবং ব্রহ্মচারীর বাগানে আপেল, নাসপাতি, বিহী[১], খুবানি ইত্যাদির গাছ লাগানো রয়েছে। নতুন আপেল হতে এখনও কয়েক মাস দেরি ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচারীজীর দোকানে খাবার জন্য গত বছরের আপেল পাওয়া গেল। হোসলিনই এ অঞ্চলে প্রথম আলুর চাষ শুরু করেন। আজ এখানকার সব গ্রামেই প্রচুর আলুর চাষ হয়।

পণ্ডিত হরেশ্বরজী নৌটিয়ালের ছাত্র সুর করে রুদ্রী আর যজুর্বেদ পড়ছিল। ৩৩ বছর আগে আমিও এ ভাবেই ওপরে নীচে হাত নেড়ে বেনারসে রুদ্রী আর যজুর্বেদ সংহিতা পড়েছি। কিন্তু সে সময় অর্থ বোঝার ক্ষমতা ছিল না। আমি রুদ্রী হাতে নিয়ে দেখলাম। মনে হলো একে রুদ্রী বলাই ভুল। বস্তুত এটা ইন্দ্রী, কারণ এতে ইন্দ্রের মন্ত্রই সবচেয়ে বেশি আছে। জানা যায় ইন্দ্র আদি দেবতাদের মন্ত্রের একটি সংগ্রহ, আগে যার অন্য কোনো নাম হয়তো ছিল, পরে শৈবরা একে দখল করে নেয় এবং এর নাম বদলে 'রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী' রাখে।

এদিকের জঙ্গলে জিম্বু প্রচুর ফলে। এখানকার লোকে জিম্বুকে লাদু বলে। সম্ভবত এই লাদু (পলাদু) থেকেই পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) হয়েছে। লাদু হলো জংলী পেঁয়াজ কিন্তু এদিকে একেই দেবতাদের ভোগে প্রিয় মশলা বলে মনে করা হয়। এখানকার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে রোজ এই লাদু দিয়েই ভগবানের ভোগ—ডাল-তরকারি তৈরি করা হয়। গঙ্গোত্রীর মা গঙ্গাও তা খুবই পছন্দ করেন। পাণ্ডারা যাত্রীদের এটা প্রসাদ হিসেবে দেয়। এক শেঠ-শেঠানীকেও পাণ্ডা লাদু দিয়েছিল। বোধহয় এরা আগরওয়াল ছিল। ওরা তরকারিতেও লাদু দিল। শেঠানীর সেটা পছন্দ হলো না। তিনি অভিযোগ করছিলেন। আমি বললাম, 'রাম রাম! এ আপনি কি করছেন? আপনি এখানে দেবতার প্রসাদ নিতে এসেছেন না অভিশাপ? এটা হচ্ছে কৈলাসের ওষধি, পেঁয়াজ নয়। এর গন্ধ যদি আপনার ভালো না লাগে তবে সেটা আপনার দুর্ভাগ্য জানবেন। হতে পারে কারো কারো ধূপের গন্ধও খারাপ লাগে।' তাঁর সঙ্গের পাণ্ডাটি খুব খুশি হলো। আমাকে সমর্থন করে সে বলল, 'আপনি একেবারে সত্যি কথা বলছেন—আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দেবতার ভোগ দিতে পারি না কিন্তু এই লাদুর ভোগ চিরকালই চলে আসছে।' শেঠানী বলতে লাগলেন, 'আমার তো এটার গন্ধ পেঁয়াজের মতো লাগছে।' পাণ্ডা এবং আমি দুজনেই একমত ছিলাম যে, এটা হলো নাকের দোষ। আমার প্রতি নৌটিয়ালজীর শ্রদ্ধা আর সম্মান দেখে শেঠ-শেঠানী এটুকু বুঝেছেন যে এই লোকটির শাস্ত্র-বেদ জ্ঞান আছে। আমি গাম্ভীর্যের সঙ্গে ফতোয়া দিলাম, 'আপনার যদি এ যাত্রায় পুণ্য লাভ করতে হয় তবে লাদু তথা দেবতার ভোগের প্রতি যে অপমান আপনি করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করুন। দুবেলা রান্নায় লাদু দিয়ে আহার গ্রহণ করুন। সম্বারে এবং মসলায় লাদুর প্রয়োগ করুন।' শেঠানী তো ভয় পেয়েই ছিলেন, তবে জানি না তিনি দেবতাকে প্রসন্ন করছিলেন না অসন্তুষ্ট রেখেই ফিরে গিয়েছিলেন।

[১] আচার ও মোরব্বায় ব্যবহৃত নাসপাতির আকারের ফলের গাছে (quince)।—স·ম·

গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীবাবু ও শ্রীমতী নাগরও ফিরে এসেছিলেন। এরাও এখানে দু'এক রাত কাটালেন। বদ্রীবাবু তো পেঁয়াজ পছন্দ করতেন, শ্রীমতী নাগরেকেও আমি লাদু মাহাত্ম্য শোনালাম। কিন্তু তিনি আমার রসিকতার সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন তাই তাঁকে বশ করা গেল না।

চৌত্রিশ বছর আগে ঋষিকেশ ছিল তপোবন। এখন ঋষিকেশ অযোধ্যার মতোই একটি শহরে পরিণত হয়েছে আর সাধুদের জীবনযাত্রাও অযোধ্যার সাধুদের মতোই হয়ে গেছে। উত্তরকাশীতে সাধুদের ভিড় বেড়েই চলেছে। সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি হয়েছে। যুদ্ধের কারণে হতে পারে নি, না হলে এতদিনে ওখান থেকে টেহরী পর্যন্ত মোটর চলার রাস্তা তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু যুদ্ধের পর তা কে ঠেকাবে? উত্তরকাশীও ঋষিকেশের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছে। এখন গঙ্গোত্রীতেও দোকানপাট বাড়ছে। গঙ্গোত্রীও সেদিনের স্বপ্ন দেখছে—যেদিন অন্তত গরমকালে ঋষিকেশ পর্যন্ত বাস যাবে।

তিব্বতের পথে—এখন আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিলাম। নগার্জুনজী তো তিব্বতী ভাষা অধ্যয়ন করতে অনির্দিষ্টকালের জন্য যাচ্ছেন। কিন্তু আমি তিন-চার সপ্তাহের বেশি সময় দিতে পারবো না। আমার ইচ্ছে ছিল থোলিঙ্ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসা। ভাবা হলো, এখান থেকে ঘোড়া আর লোক নিয়ে নিলে সময়মতো কাজ শেষ করা যাবে। আমার এক পায়ে একটু চোট লেগেছিল, তার জন্যও চলতে কষ্ট হচ্ছিল। খোঁজাখুঁজি করে নেলঙ্-এর শিবদত্ত নামে একটি যুবককে পাওয়া গেল। এই যুবকটি ছিল অত্যন্ত ধার্মিক স্বভাবের। আমার সম্বন্ধে নানা কথাই লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি ফর্ফর করে তিব্বতী তো বলতে পারতামই, কয়েকবার লাসা ঘুরে এসেছি, তাছাড়া আমার লেখা তিব্বতী ভাষায় প্রথম বই এবং ব্যাকরণ তো ছিলই। সুতরাং খ্যাতিবৃদ্ধি নিশ্চিত ছিল। শিবদত্ত যখন শুনলো আমি থোলিঙ্ যেতে চাই, তখনই সেও যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। মজুরি ঠিক হলো রোজ ১ টাকা আর খাবার। সে নিজেই খুঁজে খুঁজে তার কাকার একটা মাদি ঘোড়া জোগাড় করল। উত্তরকাশীতে আমি একশো টাকার নোট একটা ভাঙিয়ে ছিলাম, কিছু খুচরো পয়সাও ছিল। কিন্তু থোলিঙ্ যাবার জন্য আরো টাকার প্রয়োজন ছিল। একশো টাকার নোট যখন ভাঙাতে দিলাম তখন জানা গেল যে এ নোট ভাঙানো যাবে না, কারণ নোটের ওপর কোনো এক ব্যাঙ্কের ছাপ রয়েছে। সমতলে এ ব্যাপারটা সহজেই বোঝানো যেত কিন্তু এখানে এই দাগী নোট নিতে কেউ রাজি ছিল না। সমস্ত গুড়টাই এখন গোবর হয়ে যেতে বসেছিল! সেদিনই (৭ জুন) জয়পুর থেকে এক বড় শেঠ এসে গেলেন। এমনিতে কিছুটা অসুবিধে হতোই, কিন্তু কেউ একজন তাঁর কাছে আমার মহিমা কীর্তন করে থাকবেন, তাই রাত্রিবেলা শেঠজী নিজেই 'আসতে পারি' বলে আমার কাছে এলেন। পরিচয় হলো। নোটের ঝামেলার কথা বললাম। তিনি পাঁচ টাকার কুড়িটি নোট দিয়ে দিলেন। যাক, মা গঙ্গা এই সমাধান করে দিলেন।

৮ জুন আমরা তিনজন ছাতু খেয়ে সকাল আটটার সময় রওনা হলাম। আমি ঘোড়ার ওপরে চড়লাম। ধরালী আর সাঙ্লার (ঝাঙ্লা বা জাঙ্লা নয়) পেরিয়ে কোপঙে

মেষপালকদের চটিতে দেবদারু গাছের নীচে থামলাম। এখানেই চা আর ছাতু খাওয়া হলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেলা একটা নাগাদ আবার চলতে আরম্ভ করলাম। কিছুদূর গিয়ে গঙ্গোত্রীর রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলাম। পুরনো ঝুলন্ত পুলের আগেই দেবদারু গাছে ভরা একটি অত্যন্ত রমণীয় জায়গা পেলাম—বোধহয় হিমালয়ে এটাই অতি সুন্দর দেবদারু বন। মন চাইছিল, এখানেই এক-আধমাস থেকে যাই। ঘন সবুজ দেবদারুর পাতার ছায়ার ভেতর সূর্যের আলো ঢুকতে পারতো না। নীচে সরু সরু শুকনো পাতার গালিচা বিছানো ছিল। চতুর্দিক থেকে দেবদারুর হাল্কা সুগন্ধ ভেসে আসছিল। রাস্তার ধারে একটু খোলা জায়গা ছিল। এখানে এক নেলঙ্-এর পরিবার আস্তানা করে ছিল। এদের গরু আর চমরীগুলো জঙ্গলে চরে বেড়াচ্ছিল। ঘরের যুবতী মেয়েটি বহুমূত্র রোগে অত্যন্ত অসুস্থ। এরা ওষুধ চাইল কিন্তু আমাদের কাছে ওষুধ ছিল না। আমি দই-ভাত খাওয়াতে বললাম। কিছু দূরে সমতল পাহাড়ের গা পাওয়া গেল। তারপর উৎরাই এবং চড়াইয়ের রাস্তা। মাঝে মাঝে এই রাস্তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। রাস্তা তৈরির জন্য শ্রম আর অর্থ সবটাই দেয় নেলঙ্, টেহরী রাজকোষ কিছুই দেয় না। এখন এই জায়গা নিয়ে তিব্বত আর টেহরী সরকারের মধ্যে রেষারেষি চলছে।

দুপুরের পর থেকেই এমন রাস্তায় এসে পড়লাম যে ঘোড়ার পিঠে আর থাকতে পারলাম না। গরদঙ্-এর কাঠের পুলের কিছু আগেই রাত কাটাবার জন্য থামলাম। চারদিকে পড়ে ছিল টুকরো টুকরো পাথর আর ভীষণ গর্জনে বয়ে যাচ্ছিল গঙ্গা। জোর হাওয়া বইছিল তাই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছিল। আশেপাশে প্রচুর জংলী বাথুয়া শাক ছিল। চর্বি-আলু-চাল আর লাদু দিয়ে আমরা বাথুয়ার থুক্পা রাঁধলাম। চা হলো। ঘোড়ার ঘাসের জন্য খুব বিব্রত হতে হলো।

৯ জুন সকাল ছটায় আবার রওনা হলাম। নেলঙ্বাসীদের বানানো কাঠের পুল পার হলাম। পথ ছিল দুর্গম। আসলে ওই রাস্তা তৈরি করতে মানুষ খুব কমই হাত লাগিয়েছে। এক-আধ জায়গায় খুবানি গাছ দেখা গেল, যার থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে এখানে কোনোসময় মানুষ বাস করতো। পুলটা পার হতেই আমরা পদুম (সরো[১], শুগ্পা বা বালসাম্) গাছের সারি দেখতে পেলাম। ক্রমশ দেবদারুগুলো ছোট এবং কম হতে হতে একেবারে শেষ হয়ে গেল। তারপর নেলঙ্-এর কয়েক মাইল আগে পর্যন্ত পদুম গাছই দেখা গেল। আজ কয়েক জায়গায় এমন বিপদজ্জনক পথ ছিল যে পায়ের তলা হড়কে যাচ্ছিল। এরকম শুকনো মাটি এবং কাঁকরের রাস্তা আমাদের অতিক্রম করতে হলো। একজায়গায় শিবদত্তকে ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে সমস্ত মাল নামিয়ে রাস্তা পেরোতে হলো। ঘোড়াটাকেও লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যেতে হলো। এদিককার ঘোড়াগুলো যেন টিকটিকির বাচ্চা, তা না হলে এই রাস্তা পার হওয়া সহজ ছিল না। একজায়গায় প্রত্যাবর্তনরত এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলো। বেচারা পথ ভুল করে গাঙ্গোত্রী না গিয়ে এদিকে চলে এসেছিলেন। যেখানে পথ দুভাগ হয়ে যায় সেখানে বড় বড় করে হিন্দিতে

[১] ফার, অ্যাস্প, লার্চ বা সাইপ্রিস জাতীয় শাঙ্কবাকার বৃক্ষ।—স·ম·

লেখা সাইনবোর্ড দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে একটা ছোট কাঠের তক্তা একটা গাছের গায়ে এমন জায়গায় লাগানো ছিল যেখানে খুব কম লোকেরই চোখ যায়। বোধহয় এই গরদঙ্কে নৌটিয়ালরা গরতোক বলত। গরদঙ্-এর সামনে একটি পাহাড় দেখিয়ে শিবদত্ত বললো যে আগে ওখানে একটা দুর্গ ছিল। একটা বসতিও ছিল এবং এখনও খুবানি গাছ দেখা যায়। নেলঙ্বাসীদের ভেড়াগুলোকে যেদিক-সেদিক থেকে আসতে দেখা গেল। ছ'মাইল হাঁটবার পর আমরা ছাতু খেলাম। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। নেলঙে পৌঁছবার একমাইল আগেই বন শেষ হয়ে গেল। এখন তিব্বতের মত ন্যাড়া পাহাড় এবং ন্যাড়া মাঠ দেখা যাচ্ছিল। নেলঙ-এর সীমা শেষ হওয়ার আগেই মেলিঙ এবং চোরঘাটে ছিল গঙ্গার সঙ্গমস্থল। শিবদত্ত বলেছিল যে এদিক দিয়ে বুশহর (কনৌর) যাওয়া যায়। পথে এক জায়গায় নালাতেও বরফ ছিল। আমরা সেটা পেরিয়ে ছটার সময় নেলঙে পৌঁছলাম।

নেলঙ—ষাট-সত্তরটি ঘর নিয়ে একটি বড় গ্রাম। বাড়িগুলোর ছাদ কাঠের এবং দেওয়ালেও প্রচুর পরিমাণে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রাম এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। প্রতি বাড়ি থেকে এক-একজন লোক এসে খেতে যব বুনে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ফাফড়া বোনার এখনও দেরি ছিল। ঘরগুলো তালাবন্ধ ছিল। ভাটওয়ারীর পাহাড়ী লোকেরা ভেড়া-ছাগলের পিঠে শস্য নিয়ে নুনের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য এসেছিল। কিন্তু নুন নিয়ে আসা ভুটিয়াদের কোথাও দেখা গেল না। একটি শস্যগোলার ভাঙা বারান্দায় আমরা আস্তানা গাড়লাম। প্রচণ্ড হাওয়া বইছিল, তাই ঠাণ্ডাও খুব। কিন্তু দু-তিন সপ্তাহ থাকার পর মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন শীতটা আর তেমন অসহ্য লাগে না।

১০ জুন আমরা তিনজন ঘোড়া নিয়ে থোলিঙ্ রওনা হলাম। প্রায় একমাইল যাওয়ার পর দুটি চাটানের মাঝে গঙ্গা বইতে দেখা গেল। আমরা শুনেছিলাম যে এখানে এক বিকট দৈত্য থাকে যে প্রত্যেক বছর না জানি কত প্রাণের বলি গ্রহণ করে। পুলটা চোখে পড়তেই কথাটির পূর্ণ সত্যতা বিশ্বাস করলাম। পুল তো নয়, গোল গোল দুটো বাঁশ। একদিকে একহাত চওড়া আর একদিকে মাত্র এক বিঘৎ। বাঁশগুলোর ওপর ছোট গাছের ডাল এবং তার ওপর পাথরের টুকরো বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাঁটলে বাঁশগুলো দুলতো। তার চেয়েও বেশি ডালগুলো নড়তো এবং পাথরগুলা আরও বেশি থরথর করতো। নীচে প্রলয়-কোলাহল তুলে গঙ্গার ফুটন্ত জল বইছিল, যার চার-পাঁচ হাত পরেই ছিল বড় বড় চাটান। এখানে পড়লে যোগীর মত তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করতে হবে। সামান্য ভাবন-চিন্তারও সুযোগ পাওয়া যাবে না, শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পুল পার হওয়ার সময় চোখের সামনে এই দৃশ্য ফুটে উঠছিল।

শিবদত্ত তো পিঠে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া ছাগলের মতন খটখট করে পুল পার হয়ে গেল। আমি মনের ভাব মুখে একটুও প্রকাশ না করে ওপারে পৌঁছোলাম। পড়লে হাত-পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাহলে এরকম মৃত্যুকে ভয় পাবার কি দরকার? উপরন্তু আমি এটাও জানতাম যে এই দৈত্যটি হাজারে একজন

মানুষের বলি গ্রহণ করে, কাজেই আমি স্বেচ্ছায় বাকি ৯৯৯ জনের মধ্য থেকে নিজের নাম কাটিয়ে নেব কেন? কিন্তু নাগার্জুনজী ভীষণ সমস্যায় পড়লেন। ভয়ে পিছিয়েও যাওয়া যায় না, তাহলে লোকে কি বলবে? কিন্তু যখন বাঁশকে নড়বড় করতে দেখেন, ডাল এবং পাথরগুলো কাঁপতে দেখেন, নীচে মৃত্যুর অট্টহাসি দেখেন, তখন শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমি ওঁকে নীচে মৃত্যুর মুখ-বিবরের দিকে না-তাকানোর মন্ত্রটা বলে ছিলাম। কিন্তু নদীর অট্টহাসি তাঁকে আকৃষ্ট না করে পারলো না। যাক, ভেবে-চিন্তে উনি পা বাড়ালেন। মনে হচ্ছিল ওঁর এক-একটা পায়ের ওজন আশি মণ। যেখানে বিপদ সবচাইতে বেশি সেখানে দৌড়ে পেরোনো দরকার। এপারে যখন এলেন, তখন আমি বললাম, 'জয় অপরাজিতা মাই কী!' অপরাজিতা নিজেই নিজের সিঁদুর অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

যাই হোক, আমরা তিনজনেই ওপারে পৌঁছে গেলাম, আমাদের মালপত্রও পার হলো। কিন্তু ঘোড়া কিভাবে পুল পার হবে? শিবদত্ত তবুও ঘোড়াটাকে আনার চেষ্টা করলো। কিন্তু পুলটা শুঁকেই ও চার-পা পেছনে সরে যাচ্ছিল। আমিও বললাম যে ঘোড়াটাকে মারা ঠিক নয়। আমরা দুজন এপারে বসে রইলাম। শিবদত্ত গ্রামে গিয়ে দুজন পাহাড়ীকে আসার জন্য রাজি করাল। অনেকগুলো দড়ি জুড়ে একটি বড় দড়ি বানানো হলো, আর একজন লোক দড়িটাকে নদীর ওপারে নিয়ে গেল। পুলের একশো-দেড়শো গজ নীচেই নদীর ধারাটা চওড়া হয়ে গিয়েছিল। এখানে ঘোড়ার গলায় দড়ি বেঁধে জলের মধ্যে নামিয়ে টানা হলো।

আমার কিন্তু এই পদ্ধতিটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছিল না। মধ্য-তিব্বতে আমাদের কয়েকবারই ঘোড়াকে নদী পার করাতে হয়েছিল। কিন্তু ওখানে দড়ি-টড়ি দিয়ে বাঁধা হতো না, এমনিই হৈ হৈ করে পাথর ছুঁড়ে ঘোড়া এবং খচ্চরগুলোকে পার করানো হতো। কিন্তু প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব একটা ধারা থাকে, এখানকার লোকেরা এই নিয়মই বার করেছে। সম্ভবত এই আনাড়ি পাহাড়ীদের জায়গায় নেলঙ্-এর লোকরা থাকলে বেশি বুদ্ধি খাটাত।

জলে পড়ার পর ঘোড়াটা সাঁতার কাটতে লাগল। ওকে দড়ির সাহায্যে তেরছাভাবে পার হতে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাহাড়ীরা ওকে সোজা টানতে শুরু করলো, ফলে দড়িটা ছিঁড়ে গেল এবং ঘোড়াটা ভেসে যেতে লাগল। ও যেই পা ছুঁড়ল অমনি গলার লম্বা দড়িটা ওর তিনটে পায়েই জড়িয়ে গেল। ঘটনাচক্রে একটু দূরে গঙ্গার দুটো ধারার মাঝে একটা দ্বীপমতন ছিল, ঘোড়াটা তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনের দুটো এবং পেছনের একটা পা দড়ি দিয়ে জড়ানো ছিল। বেলা দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত লোকরা ঐ দ্বীপটায় পৌঁছোবার চেষ্টা করে গেল। প্রবল স্রোতের জন্য জলে কেউ পা রাখতেই পারছিল না। নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো। ঘোড়াটা ডুবে না মরলেও এখন না খেয়ে মরার সম্ভাবনা ছিল। এই দ্বীপটায় পাথর ছিল, জলও পাওয়া যেত কিন্তু কোনও রকমে ওখানে একমুঠো ঘাস পাঠাবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমি ডায়েরিতে লিখলাম—'হাত—পা বাঁধা অবস্থায় ঘোড়াটা ওখানেই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। সন্ধে নাগাদ বরফ গলে জল অনেকটা বেড়ে যাবে। ভুটিয়া তিনজন বলল, এখন মরবে না। কাল জল নেমে যাবার প্রতীক্ষায় গ্রামে বসে আছি, থেকে থেকে সমস্ত প্রাণ কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায়

কাঁপিয়ে নিচ্ছে। এই পুল এবং গঙ্গা অনেকের বলি নিয়েছে।'

ঘোড়াটা বাঁচবে এই আশা আমার মনে এক শতাংশও ছিল না। আজই (১০ জুন) নুন নিয়ে অনেকগুলো ভুটিয়া এলো, তার মধ্যে কয়েকজন ঘোড়াটাকে আনার চেষ্টা করলো

পরদিন (১১ জুন) আমি শিবদত্তকে বললাম, 'আমি জনপ্রতি দুটাকা করে দেবো, যে কোনওভাবে লোকজন নিয়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে ওখান থেকে বের করো।'

শিবদত্ত পাঁচজন ভুটিয়াকে নিয়ে গেল। আমি গ্রাম থেকে একটু নীচে নেমে দেখলাম যে ঘোড়াটা ঠিক সেইভাবেই চুপচাপ পড়ে আছে। আমি যখন একদম হতাশ হয়ে ছিলাম, তখন, এগারোটার সময়ে কেউ একজন খবর দিল—ঘোড়াটা বেরিয়ে এসেছে।

এখন ঘোড়া নিয়ে থোলিঙে যাবার নাম কে করবে? আর ঘোড়া ছেড়ে দিলে আমাদের প্রচুর মালপত্র নিয়ে শিবদত্তর পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। আর একটা উপায় ছিল, আমি দু-এক হপ্তা নেলিঙেই থেকে যাই, লোকজন আসুক, নতুন পুল তৈরি হোক, তারপর আবার থোলিঙের উদ্দেশে রওনা হওয়া যাবে। কিন্তু আমার হাতে অত সময় নেই। জুলাই-এর মধ্যে আমায় ফিরতে হবে। কাজেই আমি ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম। নাগার্জুনজীকে বললাম, 'তুমিও চল, দার্জিলিঙে তিব্বতী পড়বে।' কিন্তু তাঁর সংকল্প খুব দৃঢ় ছিল। তিনি সেটা ছাড়তে চাইছিলেন না। পাথেয় এবং উপহার দ্রব্য তাঁর কাছে রেখে, শিবদত্ত এবং ঘোড়াটাকে নিয়ে আমি ১২ জুন ফিরে এলাম।

মুসৌরির দিকে—ফেরার সময় খুব তাড়াতাড়ি আমরা পা চালালাম। ভৈরবঘাটের পুরনো পুলের কাছে সেই পরম রমণীয় দেবদারু বনে নেলঙ্‌বাসীদের কাছে চা পান করলাম। কোপঙে শেরসিংহের সঙ্গে দেখা হলো। ওঁকে বলাতে উনি আশ্বস্ত করলেন, 'আমরা ভালোভাবে নাগার্জুনকে থোলিঙ পৌঁছে দেব।' সাড়ে বারো ঘন্টায় ২৫ মাইল হেঁটে সেইদিনই সন্ধে আমরা হরসিল পৌঁছলাম। শিবদত্ত মুসৌরী পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হলো, সেজন্য পরদিন (১৩ জুন) আমরা গঙ্গনানীতে থেকে গেলাম। এখন বর্ষাকাল। পথে ভেজার অবস্থা ছিল তবে আনন্দস্বামী একটা বর্ষাতি দিয়েছিলেন সেটা খুব সাহায্য করলো। নেলঙ্ থেকে তৃতীয় দিনেই আমরা উত্তরকাশী পৌঁছে যেতাম কিন্তু গঙ্গোরী পৌঁছোতেই প্রবল বর্ষা শুরু হলো, আর আমাদের ওখানেই থেকে যেতে হলো।

১৫ জুন সকালই আমরা উত্তরকাশী পৌঁছে গেলাম। আনন্দস্বামীর সঙ্গে দেখা করলাম। 'দর্শন-দিগদর্শন' এর প্রুফের দুটো বান্ডিল এসেছিল। আমি প্রুফ দেখতে লাগলাম। মুসৌরী পর্যন্ত যাওয়ার জন্য স্বামী গণেশানন্দকে সঙ্গী পাওয়া গেল।

প্রুফটা দেখে এখান থেকেই পাঠিয়ে দিতে হবে তাই আমায় ১৬ জুন আড়াইটে পর্যন্ত উত্তরকাশীতেই থেকে যেতে হলো। স্বামী গণেশানন্দর সঙ্গে ঠিক করলাম যে উনি ডুঁড়ায় পৌঁছে অপেক্ষা করবেন। শিবদত্ত আর আমি ডাকঘরের কাজ মিটিয় রওনা দিলাম।

বৃষ্টিতে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক জেগেছিল— চর্তুদিকেই সবুজ-সবুজ ঘাস চোখে পড়ছিল। ডুঁড়ায় নেলঙ্-এর লোকেদের ঘরের বাইরের দিকে বড় বড় পাতাওলা ধুতুরা গাছ হয়েছিল। গোবর আর নাদির এত সার জমে গিয়েছিল যে তাতে বহু একর জমি

ভরাট করা যেত। ডুঁড়ায় নেলঙ্-এর লোকেরা সম্প্রতি নিজেদের একটা বস্তি তৈরি করেছে। দু-তিনটে ঘর বাদ দিয়ে বাকি সব সাধারণ ঝুপড়ি। রাত্রে আমরা ডুঁড়ায় থামলাম। শিবদত্ত রুটি-তরকারি-ভাজী বানাল। তিনজনে জমিয়ে খেলাম।

স্বামী গণেশানন্দ দেখা গেল 'ছিপা রুস্তম'। উনি আনন্দস্বামীর কাছে আমার খুব প্রশংসা শুনে থাকবেন। কিন্তু এখন ওঁর গুণ প্রকাশ পেতে লাগল। উনি সেসব জায়গা ঘুরে এসেছিলেন যেখানে যাওয়ার স্বপ্ন আমি কোনও সময় দেখেছিলাম এবং তা এখনও পূর্ণ হয় নি। উনি ইয়ারকন্দ এবং চৈনিক কুর্কিস্তানে ঘুরে এসেছেন। লাসা এবং মানস সরোবরও উনি দেখেছেন। জাভাতেও উনি থেকেছেন এবং ফরাসী ইন্দোচীনের সেগোঙও দেখে এসেছেন। গাড়োয়াল আর সিমলারর পাহাড়ে তো সর্বদাই ওঁর পায়ের তলায়। আমার সামনে এমন এক মানুষ ছিলেন যাঁকে আমি ঈর্ষা করতে পারতাম। তবে এটা নিশ্চিত যে তাঁর না ছিল অন্তর্দৃষ্টি, না ছিল কলমের জোর, তাই আমাদের ফক্কড়-সাধুরা যেমন হাজার হাজার বছর ধরে চীন, ককেশাস ইত্যাদি দুর্গম দেশে ঘুরেও নিজেদের কোনো ছাপ রেখে যান নি, স্বামী গণেশানন্দও তাঁদেরই মত অনামী রইলেন।

১৭ জুন ছটা বাজতেই আমরা রওনা হলাম। ধরাসুতে গুড় খেয়ে চা পান করলাম। খাওয়ার জন্য আমরা আরও একমাইল গিয়ে একটা দোকানে থামলাম। খাওয়ার পর চারটের সময় রওনা দিলাম। নালা পেরিয়ে আমরা টেহরির রাস্তা ছেড়ে দিলাম। শুনেছিলাম ভল্যানার থেকে মুসৌরি যাওয়ার পথ আরও ভালো কিন্তু আমরা একবছরের জায়গায় ছ-মাসের পথ ধরলাম—যে-পথে পাহাড়ীরা চলাফেরা করতো। ডানদিকে ছিল কিছু খেত, তার মধ্য দিয়েই আমাদের পথটা চলে গিয়েছিল। গরম ছিল, সেজন্য স্বামী গণেশানন্দ কিছু মালপত্র শিবদত্তকে দিয়ে এবং কিছুটা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁর অঙ্গে ছিল শুধুমাত্র একটি কৌপীন যার থেকে পেট অনেকটা বাইরে বেরিয়ে ছিল। কয়েকটি স্ত্রীলোক খেতে কাজ করছিল। তারা স্বামীকে দেখে খুব হাসতে লাগল, কিন্তু স্বামীজী 'কুকুররা ঘেউ ঘেউ করে, হাতি এগিয়ে যায়' এই লোকোক্তিটি চরিতার্থ করছিলেন। চারদিকে পাইন গাছ ছিল। এক জায়গা থেকে দেখতে পেলাম যে 'নগুন'-এর চটিটা দূরে নীচের দিকে দেখা যাচ্ছে। চড়াই খুব কষ্টকর ছিল না কিন্তু সামনের নালা থেকে বেশ কষ্টকর উৎরাই পড়ল, নামার পর সেরকমই শক্ত চড়াই শুরু হলো। এখন আমি পাহাড়ী রাস্তায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, কাজেই আর কারো পিছনে পড়ে থাকার লোক ছিলাম না।

সন্ধে আটটায় লালুরী পৌঁছলাম। এটা মাত্র দশ-বারোটা ঘরের একটা গ্রাম। আমরা গ্রামের নম্বরদার এক গৌড়-সারস্বতী ব্রাহ্মণের বাড়ির দোরগোড়ায় থাকলাম। উত্তরকাশীতে খুবানি কাঁচা দেখে ছিলাম, হরসিলে তা আরো কাঁচা ছিল, উত্তরকাশীতে আবার যখন ফিরে এলোম তখন খুবানির চাষ শেষ হয়ে গিয়েছিল। লালুরীতে আমরা খুবানি খেতে পেলাম। এখানে ব্রাহ্মণ সেজে গঙ্গাজল বিক্রি করে এরকম অনেক রাজপুতের দেখা পাওয়া গেল। এরা শীতের শুরুতে দেশে গিয়েছিল এবং এখন ফিরে আসছিল। বুঝলাম যে 'গঙ্গাজলের' ব্যবসাটা কিছুটা সংগঠিত চেহারা পেয়েছে। হরিদ্বারের

লালা করমসিংহ এদের মাসিক শতকরা দুটাকা সুদে টাকা ধার দেন। ফেরার সময় লোকেরা সুদে-আসলে শোধ করে দেয়।

১৮ জুন ভোর হতেই আমরা আবার রওনা হলাম। গতকালের সেই নালাটার থেকে যে খাড়া চড়াই শুরু হয়েছিল, তার এক-তৃতীয়াংশই আমরা পেরোতে পেরেছিলাম। আজ আবার পাইনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা ওপরে উঠছিলাম। মোরয়ান (মরাড)-এর গিরিসঙ্কট পর্যন্ত তিন মাইল প্রচণ্ড চড়াই পড়লো। পাইন শেষ হয়ে যাওয়ার পর বর্ফানী (বান ইত্যাদি) গাছের বন শুরু হলো। গিরিসঙ্কটের সঙ্গে ভল্যান থেকে আমার পথটাও মিশে গেছে। উৎরাইতে কিছুটা যাবার পর একটা ঝরনা দেখা দিল। আজকের উৎরাই গতকালের মত অত কঠিন ছিল না। গড়েত-এর চটিতে একটা দোকান আর ভাঙাচোরা টিনের ছাদওলা একটা নোংরা ধর্মশালা আছে, দুপুরের খাবার জন্য আমরা ওখানেই থামলাম।

খাবার পর আবার যাত্রা শুরু হলো। ভীষণ গরম লাগছিল, তবে আমরা নীচের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এই যা রক্ষা। থানাভবন (ভবন) এসে গেল। অনেক দূর পর্যন্ত কাঁকরের পথ ছিল। একজায়গায় লপ্‌সি নিয়ে খেলাম। বিকেলে আমরা আবার পাইন বনের মধ্যে চলতে শুরু করলাম। গরমও ছিল না। ফেড়ী গ্রামে পৌছোতে অন্ধকার হয়ে এলো। থাকবার জায়গার খোঁজ করলাম, না পেয়ে ভনসারীর দিকে এগোতে লাগলাম। অন্ধকার রাত ছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পথ আর ঠাহর করতে না পারায় পড়ে যাওয়ার ভয় হতে লাগল। কাজেই পাইন বনের মধ্যেই আমরা শুয়ে থাকলাম। হয়তো ওখানে ভালুক অথবা অন্য কোনো জানোয়ার থাকতো। কিন্তু আমরা তার কোনো খবরই জানতাম না।

১৯ তারিখ ভোর হতেই আমরা আবার রওনা হলাম। একমাইল পরেই ছিল ভনসারী। এখানে এলে অনেক আরামদায়ক আশ্রয় পাওয়া যেত। বুলন্দ শহরের লালাজীর দোকান ছিল। লালা স্বামীজীর পরিচিত। ওঁর ছেলেটা খুব অসুস্থ ছিল। পিতার আগ্রহে স্বামীজী ওখানেই থেকে গেলেন কিন্তু না খাইয়ে লালাজী আমাদের ছেড়ে দিতে চাইছিলেন না। আমি বললাম, বাড়িতে যা আছে তাই খাইয়ে দিন।' রাতের কিছু পরটা বেঁচেছিল, তাই খেয়ে চা পান করে আমি আর শিবদত্ত রওনা দিলাম।

একমাইল মৃদু চড়াই-এর পর টেহরী রাজ্যের চুঙিঘর দেখা গেল। এখানে আপেলের বাগানও ছিল। চুঙিকর আদায়কারীরা আমাদের সহজেই ছেড়ে দিল। একমাইল আরও চলার পর সুজাখোলীর জোত পাওয়া গেল। এখানে অনেক মিষ্টির দোকান ছিল। সামনেই ৩৪ মাইল নীচে দেরাদুন শহর চোখে পড়ছিল। মুসৌরী মাত্র ৬ মাইল দূরে ছিল আর রাস্তাও খুব ভালো। মেঘের ছায়ায় হাঁটতে লাগলাম এবং দশটার সময় মিউনিসিপ্যালিটির চুঙিঘর পৌছে গেলাম। মালপত্রের জন্য এক আনা মাসুল দিতে হলো, তারপর আমরা লনঢৌর বাজারে এলাম। এখানে শিবদত্তের পরিচিত কিসনা খম্বার একটা দোকান ছিল। মালপত্র রেখে আমরা বেড়াতে বোরোলাম। হোটেলগুলোতে থাকার কোনো জায়গা ছিল না আর আমার অন্য পরিচিতও কেউ ছিল না। কিসনা খম্বা খুবই ভদ্রব্যক্তি। ওঁর দোকানটি অত্যন্ত ছোট। তিনি বললেন, 'আপনাদের কষ্ট তো হবেই, তবুও আমার ইচ্ছে

আপনারা এই ঘরেই থাকুন।' এখানে কি আর কষ্ট ছিল? যারা বাহান্ন হাঁড়ির ভাত খেয়ে এসেছে?

সেইদিন মুসৌরীর বাজারে ঘুরতে থাকলাম, আমার তো এখানে বেশ গরমই মনে হচ্ছিল। আমি বলছিলাম, 'এখানে এমন কি ঠাণ্ডা পাওয়ার জন্য লোকেরা আসে?' তবে আমার এটাও খেয়াল করা উচিত ছিল যে সাতদিন আগে আমি ১১,৬০০ ফুট ওপরে নেলঙে ছিলাম, আর মুসৌরী মাত্র ৬,৬০০ ফুট ওপরে। আমি হিমালয়ের একজন অনন্যপ্রেমী, কিন্তু হিমালয়ের এই আধুনিক শহরগুলোকে আমি খুবই ঘৃণা করি। ওখানে মনে হয় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আজকেই খবরের-কাগজে পড়লাম যে, লর্ড বেবল ভারতের ভাইসরয় নির্বাচিত হয়েছেন—একই গোয়ালের গরু তিনি ছাড়া আর কে হতে পারে?

জৌনসারে—২০ জুন শিবদত্ত আমাদের বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলো। ও খুবই পরিশ্রমী, খাঁটি এবং ভালোমানুষ। আমার সঙ্গে থেকে ও এটা টেরই পায় নি যে ও কারো চাকরি করে, সেজন্য ওর ভালোবাসাও ছিল খুব বেশি। আমি নাগার্জুনজীর জন্য চিঠি লিখে দিলাম আর ওকে বললাম, 'তুমি নিজের সঙ্গে তাঁকে থোলিঙ নিয়ে যাবে।' সে নিজেও থোলিঙ যাওয়ার জন্য উৎসুক ছিল। চিঠি তো নাগার্জুনজী পেয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর নেলিঙ ছাড়া পর্যন্ত শিবদত্ত ওখানে পৌঁছোতে পারে নি।

আমি একটাকা দিয়ে দেরাদুনের লরিতে বসলাম। আজকাল যাত্রীরা নীচ থেকে ওপরের দিকে যায়, সেজন্য বেশিরভাগ লরি খালি হয়েই নীচে নামে। সওয়া নটার সময় লরিটা রওনা দিল, আর রাস্তা পেরিয়ে এক ঘন্টা পরে ওটা দেরাদুন পৌঁছে গেল। সাত হাজার ফুটের ওপর থেকে এখন একুশো ফুট-এর ওপর চলে এলো, কাজেই গরমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার আর আছে কি? হোটেলের খোঁজ করছিলাম, এমন সময় পাহাড়ীজীর সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে আমার নামে রাশিয়ার থেকে কোনো টেলিগ্রাম এসেছে। এই টেলিগ্রামটা লোলারই হতে পারে।

পার্টির অফিসে গেলাম। জানতে পারলাম যে, আনন্দজী কোনো শেঠের বাড়িতে উঠেছেন। ওখানে যাওয়ার পর আমাকেও নিরুপায় অতিথির অতিথি হতে হলো। এখন দেরাদুনে খুব লিচুর বাহার। যতক্ষণ আমি দেরাদুনে রইলাম, মূলত লিচুর ফলাহার করেই কাটালাম। সন্ত নিহাল সিংহের বাড়ি ওখান থেকে বেশি দূরে ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল, সেজন্য দু-তিনবার ওখানে যেতে হলো। সন্তজীর সারা জীবনটাই ছিল সাহসের। তাঁর কলমের জোর যত, ততটাই তিনি নির্ভীক। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা ঘুরে এসেছেন—নিজের কলমের জোরে এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে। দেরাদুনে তিনি নিজর বাড়ি তৈরি করেছেন, কিন্তু সেটা নিজস্ব বাসার চিন্তা করে নয়। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনি চান এটাকে দেশের জন্য কোনো এক উপযোগী সংস্থায় পরিণত করা হোক। শ্রীমতী সন্ত নিহাল সিংহ, যিনি একজন আমেরিকান মহিলা, খুবই স্নিগ্ধ স্বভাবের। ছ'মাস আগে যখন ওঁকে দেখেছিলাম, তখন এই দম্পতির মুখে বার্ধ্যকের এত ছাপ পড়ে

নি, কিন্তু এখন সেখানে গোধূলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

আনন্দজী, সুশীল ও আমি এই তিনজন গোড়া থেকেই ছিলাম। এখন বদ্রীপুরের তরুণ সত্যেন্দ্রজীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। ঠিক হলো যে কালসী দেখে আসা যাক। কালসীতে অশোকের শিলালিপি আছে, সেটা দেখার জন্য কেন আমার জিভে জল আসবে না?

২৩ জুন চারজনেই গাড়িতে চড়লাম আর দুপুরে চুহড়পুরে পৌঁছে গেলাম। মোট পঁচিশ মাইলের দূরত্ব। চুহড়পুর ভাল গঞ্জ, এখানে শস্যের বড় হাট আছে। সাহারানপুর থেকে একটা সিধে রাস্তা এখানে এসেছে। অশোকের সময় পাটনা থেকে তক্ষশিলা যাবার প্রধান রাজপথ সাহারানপুরের মধ্য দিয়ে ছিল। সাহারানপুর থেকে কালসী পর্য্যন্ত এই পথটা তা হলে অশোকের সময়ও ছিল। চুহড়পর কালসীকে টেক্কা দিল। বাইশ-তেইশশো বছর ধরে হিমালয়ের পাদদেশে যে ছিল একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র, এখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এবং এর পিছনে চুহড়পুরের বিশেষ হাত আছে। চুহড়পুর সমতলে অবস্থিত। ছড়াবার জন্য প্রচুর জায়গা পড়ে আছে। দেরাদুন আর সাহারানপুরের দিকে এখান থেকে পাকা রাস্তা গেছে। সে পথে দিনরাত লরি দৌড়চ্ছে। আবার হিমালয়ের পাদদেশও এখান থকে দূরে নয়। তাহলে এর কাছে কালসী কি করে দাঁড়াতো? সত্যেন্দ্রজীর পরিচিত এক উৎসাহী তরুণ আনন্দকুমারের বাড়িতেই আমরা উঠলাম। চুহড়পুরের আশেপাশে তিনটে খ্রীস্টানদের গ্রাম আছে, যেখানে প্রধানত চাষ-আবাদ হয়। পঞ্চাশ বছর আগে এদের বিজনৌর, বুলন্দশহর ইত্যাদি জেলার থেকে এনে বসবাস শুরু করা হয়েছিল। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর পুরো এলাকাটা এনফেল্ড নামের একজন সামরিক অফিসারকে দেওয়া হয়েছিল, পরে সে নিজের জমিদারী নাহন (সিরমৌর)-এর রাজার কাছে বিক্রি করে দেয়। চুহড়পুরে চায়ের বাগান আছে। এর চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত চায়ের ভালো চাষ হয়। চায়ের পর ধানের খেতই প্রধান। পাশ দিয়ে যমুনার একটি খাল বয়ে যাচ্ছে।

কালসীতে—বেলা দুটোর সময় দুটো টাঙ্গায় আমরা কালসীর দিকে রওনা হলাম। আনন্দকুমারজীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাই আমাদের দলটা এখন পাঁচজনের। চাকরৌতা যাওয়ার রাস্তাই কালসীর রাস্তা। যমুনার এ পারেও এক এক জায়গায় ছোট ছোট পাহাড় আছে। আমরা লোহার পুল দিয়ে যমুনা পার হলাম। সাড়ে ছ'মাইল যাবার পর কালসীর ডাকবাংলো এলো। রাস্তার থেকে এক ফার্লঙ নেমে যমুনার তটে একটি ঘরের ভেতরে এই শিলাটা আছে, যার ওপর ২২০০ বছর আগে রাজা অশোক ধর্মকথা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন।

চৌকিদার এসে তালা খুলে দিল, আমরা ভেতরে গেলাম। শিলাটির দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাশে লিপি খোদাই করা রয়েছে। পুব পাশে হাতির একটি অতিসূক্ষ্ম রেখাচিত্র আছে, যার ওপরে লেখা আছে 'গজতম'। সেকালে বুদ্ধের মূর্তি তৈরি হয়নি, তাই গজতম দিয়ে বুদ্ধকে বোঝানো হতো। ঘরের ভেতর গুপ্তযুগের কিছু অলংকৃত পাথর রয়েছে। অশোক এমন সব জায়গাতেই লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন যেখানে বেশির ভাগ লোকই

সেগুলো দেখতে পায়। এটিও সেরকম একটি জায়গা। পাহাড় থেকে নেমে যমুনা এখানেই সমতলে পড়ে, আর শিমলা স্থাপিত হওয়ার আগে কনৌরের (বুশহর) লোকেরা এই পথ দিয়েই নীচে নামতো। এখনও শীতকালে কনৌরবাসীরা ছাগল এবং পশমের জামাকাপড় বিক্রি করার জন্য এদিকে আসে। সেজন্য এই স্থান একদিকে যেমন হিমালয়ের একাংশের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতির প্রসারকেন্দ্রও ছিল।

আমরা নিজেদের টাঙ্গায় এসে বসলাম আর দেড় মাইল যাওয়ার পর কালসী পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা পাহাড়ের নীচে নয়, বরং পাহাড়ের কটিদেশে বা কোলে অবস্থিত। পাশেই অমলাত্তয়া নামে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে। কালসীর আশেপাশে অনেক আমবাগানে আছে। ওপরে নীচে এত সমতলভূমি আছে যেখানে পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যার একটা ভালো শহর তৈরি হতে পারে। থাক, শহর তৈরির চিন্তা করছে এমন লোককে এখানে সবাই আজ পাগল বলবে। দোতলা-তিনতলা কত বাড়ি এখানে খালি পড়ে আছে যেখানে অনায়াসে দেড়শো-দুশো পরিবার থাকতেও পারে। মীরা ভগিনী যখন নিজের আশ্রমের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'কালসীতে থাকলে আশেপাশের গরিব লোকদের সেবা করা যায় আর বাড়ি তৈরি করার জন্য এক পয়সা খরচও করতে হয় না। আমি অনেক প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। কিন্তু টাটকা মৃত দেহ দেখলে যে অনুভূতি হয় তা কয়েকশো বছর ধরে পথে পড়ে থাকা হাড়গোড় দেখলে হয় না। কালসী একটি তরতাজা শবদেহ। এর প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ করলে একথা বলতে কষ্ট হয়, তবে এখন এছাড়া আর কীই বা বলা যায়? এখন এখানে আট-দশ ঘর মুসলমান (পাঠান, শেখ) আর কুড়ি-বাইশ ঘর বেনে আছে। আর জৌনসারের লোকদের কিছু ঝুপড়ি আছে। শীতকালে তিন-চার মাসের জন্য চক্রৌতার তহশিলদার এখানে চলে আসে, সেজন্য হয়তো এতগুলো ঘর আরও কিছুদিন চালিয়ে নেয়; কিন্তু এখানে ধারে কাছে না আছে কোনোও চাষ, না কোনোও দোকান পাট, না কোনোও শিল্পবাণিজ্য, তাহলে কালসীর সামনে কি আর আশা থাকতে পারে? দুটো-তিনটে রাজপথের সারি ধ্বংস হয়ে গেছে আর ওখানকার বাড়িগুলো পড়ে গিয়ে ঢিবি হয়ে আছে। শুধু একটা রাস্তা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। ওর ধারেও কিছু বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে, কিছু বাড়ির দুহাত দেওয়াল খাড়া আছে,কিছু বাড়ির ওপরে ছাদ নেই, কতগুলোর ছাদে বহু জানলা আর কিছু বাড়ি বহু বছর ধরে নিষ্প্রদীপ অবস্থায় সুনসান দাঁড়িয়ে আছে। যেদিন আমরা গেলাম সেদিন একটি বাড়ি থেকে বরযাত্রীদের যাওয়ার কথা ছিল। মোটরগাড়ি ছিল, বাজনাও ছিল, লোকেরা জমকালো জামাকাপড় পরে ছিল। বেনে মহিলারা রামধনুর নানা রঙের কাপড় পরে গান গাইছিল। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম যে এই শ্মশানে এ কী হচ্ছে! যে বণিকদের বাড়ি মেরামত করার ক্ষমতা আছে, তারা বছরে দু'এক বার বিবাহ-উৎসবের জন্য আসে, তারা অন্য শহরে নিজেদের বাড়ি করে নিয়েছে। সম্ভবত এমনও দু-তিন ঘর আছে যাদের জমিদারি থেকে কিছু রোজগার হয়—তারা কালসীকে ছাড়তে চায় না।

চকরৌতার নীচে যমুনা আর টৌস-এর মধ্যে দেরাদুন জেলার এই এলাকাটা জৌনসার

নামে পরিচিত। চকরৌতার পর বাবরের এলাকা। জৌনসার ও বাবর মিলিয়ে সম্পূর্ণ এলাকার আয়তন ২৫,১১৪ বর্গমাইল। ১৮৮৭ সালে এর জনসংখ্যা ছিল ২৩,২৮৮, ১৪ বছর পর ১৯০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৯১,১০০ আর ১৯৩১ সালে ৮০,০০০ হয়ে গেল। বাসক বিবসক-বুথিয়ার, চাল্টা এখানকার অচ্ছুত জাতি। এদের সংখ্যাই সব থেকে বেশি। এরপর চৌহান, তোমর, নেগী, রাওয়াত—এর মত রাজপুত জাতিগুলো আছে। কিছু ব্রাহ্মণও আছে। চকরৌতা এবং অন্য জায়গাগুলোর অনেক বাইরের বনিক-দোকানদাররাও বসতি করেছে। জৌনসারী ও বাবরীর লোকেদের মধ্যে এখনও বহুপতিবিবাহ—সব ভাইদের এক স্ত্রী চালু আছে। এদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট সারল্য আছে। এই শতাব্দীর গোড়াতেও কারো বাড়ি কোনো অতিথি গেলে খাবার-দাঁবার ও অন্যান্য দ্রব্যের মত বাড়ির অবিবাহিতা তরুণীকে দান করে অতিথি সৎকার করা হতো। এটা ছিল প্রাচীনকালের প্রথা।[১] সরল জৌনসারীরা শুদ্ধ ভাবনা থেকেই এটা করতো কিন্তু সমতলের লোকেরা এই প্রথাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিণত করতে লাগল। যখন জৌনসারীরা এটা বুঝতে পারল তখন তারাও এই প্রথাটাকে খারাপ মনে করল এবং ধীরে ধীরে এই প্রথা লুপ্ত হয়ে গেল। কৃষি ছাড়া এখানকার লোকেদের জীবনের আর কোনো অবলম্বন নেই। চকরৌতায় গোরাদের ছাউনি হওয়ার পর থেকে এই এলাকায় যৌনরোগ অনেক বেড়ে গেছে। বাণিজ্য এবং সুদের ব্যবসা করে বণিকরা লোকেদের ভীষণ ঠকাতে আরম্ভ করেছে। চুয়াল্লিশ বছরে জনসংখ্যা তিনগুণ বেড়ে যাওয়াটাও ওদের দারিদ্রের অন্যতম কারণ। অনুন্নত প্রদেশ ঘোষণা করে সরকার এই এলাকায় সংস্কার-আইন চালু করে নি কিন্তু জৌনসারীদের মধ্যে কংগ্রেসের আহ্বান ক্ষীণস্বরে হলেও নিশ্চয় পৌঁছে গেছে। এটা এমন এক অঞ্চল, যেখানে নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এখানকার পাহাড়ের আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি ফল থেকে বছরে কয়েক কোটি টাকার আয় হতে পারে। যেখানে পশমী বস্ত্র ও মোজার কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানুষের বাহুবলকে যদি পুরোপুরি কাজে লাগানো যায় তাহলে এটা অনেক সমৃদ্ধ প্রদেশ হতে পারে কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এর কি কোনো আশা আছে?

কালসীতে আমরা নিজেদের জিনিসপত্র আর্যসমাজে রাখলাম। শহরটাই যখন সুনসান তখন আর্যসমাজ কি আর জমজমাট হবে? বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে আমরা অমলাওয়ার ধারে একটু ওপরের দিকে গেলাম। আমবাগানগুলোর পাহারাদারের কাছ থেকে পাকা আম নিলাম আর নদীতীরে বসে খুব খেলাম। এরপর বস্তির থেকে নীচের দিকে গেলাম। এখানে গম ভাঙানোর কয়েকডজন চাকি আছে কিন্তু দু-তিনটে ছাড়া সবই অকেজো। খাওয়ার লোক যত থাকবে, সেই অনুযায়ী গম ভাঙানো হবে।

রাতে খাওয়ার সমস্যা দেখা দিল। না ছিল মিষ্টির দোকান, না ছিল চাল-আটার দোকান। পয়সা দিয়েও খাবার জোগাড করা সম্ভবপর ছিল না। আনন্দজীর তো রাত্রে

[১] *The Mothers*, 3 Vols., 1926. Westermark—*The History of human Marriage*—লেখক।

খাওয়ার পাট ছিল না। আমিও বললাম, 'আমার দরকার নেই।' কিন্তু সুশীল, আনন্দকুমার আর সত্যেন্দ্রর তো কিছু খাওয়ার দরকার ছিল। বিশেষত আনন্দকুমার এটা পছন্দ করছিলেন না যে কালসীতে অমি ক্ষুধার্ত থাকি। কিছু উৎসাহী তরুণ জৌনসারীর অধিবাসীদের জন্য একটা 'অশোকাশ্রম' খুলে রেখেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত ধর্মদেব বিদ্যালংকার এখন জেলে ছিলেন কিন্তু চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবু ওখানে ছিলেন। ওঁকে খাওয়াবারও চিন্তা হতে লাগল। যাক্, ওরা কোনওরকমে বরযাত্রীদের সঙ্গে আমাদেরও খাওয়ার ব্যবস্থা করলো। আমি খেতে গেলাম না, তবে ওখান থেকে লুচি-তরকারি আমার জন্য এসে গেল। যোগাযোগ বলতে হবে, যদি বরযাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে কালসীতে আমাদের না খেয়েই থাকতে হত। তার মানে এই নয় যে কালসীতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। কালসীর প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। যে জায়গায় ওটা অবস্থিত, তা দেখে আমার বিশ্বাস, কালসী একদিন আবার বেঁচে উঠবে।

পরের দিন (২৪ জুন) আমাদের চকরৌতার লরি ধরার কথা ছিল। লরি আসতে কিছু দেরি ছিল। জলযোগের জন্য আমি সঙ্গীদের আম খুঁজতে বললাম। খোঁজাখুঁজি করে আমরা একজন টিনসারাইওলা মুসলমানের দেখা পেলাম। এই জনশূন্য বস্তিতে টিনসারাইয়ের কাজ আর কি হবে, সেজন্য সে আম বিক্রি করেও কিছু রোজগার করছিল। এখান থেকে আমরা শতখানেক আম কিনে বালতিতে ভিজিয়ে খুব চুষলাম।

লরি এলো। আমরা তাতে চড়ে রওনা হলাম। দুপুর বেলা সহিয়া (সৈঁয়া) পৌঁছলাম। এখানে আনন্দকুমারজীর ভগ্নীপতির দোকান আর মহাজনী ব্যবসা ছিল। ওখানেই খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করলাম। তারপর আনন্দকুমার ও আমি লরি করে চকরৌতার উদ্দেশে রওনা হলাম। অন্য তিনজন হেঁটে রওনা হলো। ওদের রাতটা পথেই কাটাতে হলো কিন্তু আমরা সন্ধেবেলা ওখানে পৌঁছে আর্যসমাজে উঠলাম—আনন্দকুমারের পরিবার আর্যসমাজী[১] ছিল। আর্যসমাজের মন্দিরের অবস্থা দেখে মনে হলো যে অনুগামীদের মধ্যে তেমন উৎসাহ নেই। চকরৌতার গ্রামটা পাহাড়ের মেরুদন্ডের ওপর অবস্থিত। পাহাড়ের মেরুদন্ড সাধারণত খুব প্রশস্ত হয়, কিন্তু এটা একটা শীর্ণ গরুর মেরুদন্ডের মতন। আর গ্রামটা মশার ঠ্যাঙের মত এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। গোরা সৈনিকদের ছাউনি হলে তা থেকেই পুরো আয় হয়। আবহাওয়া ভালো। দেববন (৯৩৩১ ফুট) এবং লাখামণ্ডলও যাওয়ার ছিল কিন্তু কারো উৎসাহ ছিল না।

২৫ জুন সুশীল ও সত্যেন্দ্রর সঙ্গে আনন্দজী পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন, আর আনন্দকুমার ও আমি খোলা লরির ওপরে। সূর্যাস্তের আগে আমরা চুহড়পুর পৌঁছে গেলাম। আনন্দজীর দলকে সেদিন কালসীতেই থেকে যেতে হলো।

পরদিন (২৬ জুন) যমুনা স্নান এবং জমিয়ে আশ্রম যজ্ঞ হলো। দুপুর নাগাদ পিছনে পড়ে থাকা লোকেরাও এলো। সন্ধেয় আমরা গৌতমকুণ্ড দেখতে গেলাম। হয়তো কখনো এখানে জঙ্গল ছিল, কিন্তু এখন কাটা হয়ে গেছে। কুণ্ডটা বেশ ভালো যদিও তত পরিষ্কার

[১] দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈদিক ধর্মানুগামী সম্প্রদায়।—স.ম.

নয়। এখানে বছরের কোনো এক সময় বড় মেলা হয়ে থাকে। আগেও লিখেছি, যমুনার এপারের এলাকা নাহনের রাজার জমিদারি, আর যমুনার ওপার তো নাহনেরই রাজ্য। ১৮৫৭-র আগে জৌনসার আর বাবরের এলাকাও নাহনের রাজত্বের মধ্যে পড়তো, কিন্তু 'অর্ধ তজহিং বুধ সর্বস জায়ে'[১]-র প্রবাদ অনুযায়ী রাজা এই ভাগটা ইংরেজদের দিয়ে দিল।

সন্ধেবেলা আর্যসমাজে বক্তৃতা দিলাম। ওখানকার ব্যবস্থাপকরা নিজেরাই রাশিয়া সম্বন্ধে বলতে বললেন। শ্রোতাদের মধ্যে অনেক মহিলোা ছিলেন।

বাসমতীর দেশে—২৭ তারিখ দুপুরের আগেই আমরা দেরাদুনে ফিরে এসেছিলাম। সত্যেন্দ্রজীর ইচ্ছে ছিল যে আমরা বদ্রীপুরে ওঁর বাড়ি যাই। দেরাদুনের বাসমতী চাল খুব বিখ্যাত—বোধহয় পৃথিবীর কোথাও এত ভালো চাল হয় না, কিন্তু এর খেত দেরাদুনে নেই। তপোবনের খেতের বাসমতী খুব ভালো বলা হয় আর বদ্রীপুরও বাসমতীর জন্য বিখ্যাত। বাসমতীর পর রামজোয়ান চাল কালসীর নীচের দিকেও খুব ভালো হয়। বাইরের লোকেরা চালের এই সূক্ষ্মতার বিচার করে না। সত্যেন্দ্রজীর সঙ্গে টাঙ্গায় করে আমরা বদ্রীপুর গেলাম। টাঙ্গায় তাঁর স্নাতক ভগিনীও যাচ্ছিল। ৪০০ একর খেত এবং ১০০ ঘর নিয়ে বদ্রীপুর গ্রাম। এখানকার কয়েকটি পরিবার যথেষ্ট সুখী এবং সংস্কৃত। সত্যেন্দ্রজী জাতিতে কর্নবাল—অহলুবালিয়া (কলবার)-এর কুড়িটি ঘর গ্রামের জমিদার। মূলত বাসমতীর চাষ এবং সম্প্রতি কিছু লিচুর বাগান থেকে জীবিকা নির্বাহ হয়। গ্রামের ৫০ ঘর চামার তো হাজার বছর ধরে নরক ভোগ করার জন্যেই জন্মেছে। খালের ধারে পুবের মজুরদের অনেক ঝুপড়ি আছে। 'পুবের মজুর' মানে পূর্ব-অযোধ্যা থেকে আসা মজুর। জানা যায়, উত্তর ভারতের পূর্ব ইউ, পি এবং বিহারে মজুরদের খনি আছে। ফিজি, মরিশাস, ট্রিনিডাড, জামাইকা, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন থেকে শুরু করে কলকাতা, বোম্বাই, লাহোর, করাচি পর্যন্ত এখানকার লোকেরা তাদের খাটুনি বিক্রি করে বেড়ায়। দেরাদুনে স্থানীয় মজুর দুর্লভ এবং দাম বেশি। তাই পুবদেশীরা ঘর-দোর নিয়ে এসে এখানে তাদের ঝুপড়ি করে ফেলেছে।

সত্যেন্দ্রজীর তিন কাকা। তিনজনেরই চাষবাস একসঙ্গে তবে থাকা এবং খাওয়া দাওয়া আলাদা আলাদা। বোধ হয় পশ্চিমী সভ্যতা তাঁদের এই ধরনের ব্যবস্থার অনুযায়ী করে তুলেছে। তিনটে উনুন জ্বালাতে কত কাঠ, কত পরিশ্রম বেড়ে যায়। তার জন্য বাঁধুনি মহিলাদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, কিন্তু সেটা করতে অসুবিধে হবে। সত্যেন্দ্রজীর ঘর গ্রামে ছিল, তবে তা গ্রামের ঘর ছিল না। বেশ পাকা সিমেন্ট, ইট, কাঁচ এবং লোহা দিয়ে বানানো খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি। বিজলি বাতি লাগিয়ে দিলে সেটা সোভিয়েত দেশের পঞ্চায়েতি গ্রামের বাড়ির মত মনে হবে। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সবাই শিক্ষিত এবং সংস্কৃত ছিলেন। শিক্ষা হোক, সংস্কৃতি হোক, পয়সা হোক কিন্তু তারপরও

[১]'যখন সর্বস্ব চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন বুদ্ধিমানরা অর্ধেক ত্যাগ করে।'—স·ম·

নরনারী গতর খাটিয়ে পরিশ্রম করুক। সত্যেন্দ্রজীর বানপ্রস্থ কাকা আর্যসমাজী হয়েও গোঁড়া ছিলেন। আমার মনে হয় ঘরের শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপারেও হয়তো তাঁর হাত বেশি ছিল। আমার মনে হয় না তিনি শিক্ষা+সংস্কৃতি + ধন = কুঁড়েমি—এই সূত্র মানতেন। তবে সেখানকার পরিবেশ আমার অনেকটা এরকমই মনে হলো। প্রত্যেক ব্যাপারে শহরের অন্ধ অনুকরণ ছিল। সজীব গ্রামীণ জীবনের সুবাস সেখানে দেখা যেত না। মেয়েরা শিক্ষিতা ছিলেন আর এটা প্রশংসা করতেই হবে ওঁরা নিজেরাই রান্না করেছিলেন। শিক্ষিতা আর এটা প্রশংসা করতেই হবে ওঁরা নিজেরাই রান্না করেছিলেন। সেদিন ওঁর কাকার বাড়িতে বিরাট ভোজ হয়েছিল। বাঁধানো খোলা উঠোন, প্রচুর হাওয়া আর এককোণে টক আঙুলতার ঝাড়। সেই পরিবারের জীবনযাত্রা দেখে আমি খুশি হইনি এমন নয়, কিন্তু শ্রমবিমুখতাকে আমি ঘৃণা করি। তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি যে নির্দেশ দিতাম, সেটাকে লোকে পাগলামি মনে করতো। পুরুষদের সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি কোদাল চালাবার জন্য ছিল না, সেই সমস্ত অভিনবতম ফ্যাশানের শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ঢুকে বাসমতীর চারা পোঁতার জন্যও ছিল না। কিন্তু আমার মত যদি খাটতো তাহলে আমি তাদের দিয়ে এটাই করাতাম।

পরদিন (২৮ জুন) আমরা বেড়াতে বের হলোম। দক্ষিণদিকে দেড়মাইল দূরে গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী নোয়াদা। আমরা সে-পর্যন্ত পৌঁছতে পারি নি, পদ্মসর পর্যন্ত গেলাম, তারপর সেখান থেকে ঘুরে মাজরী গ্রামে গেলাম। এখানে একটা নানকপন্থী মঠ আছে। মঠটাকে ট্রাস্টের হাতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মোহান্ত খুশিমত খরচের জন্য মঠের জমির অপব্যবহার করছিল। ট্রাস্টিরা এই পরিস্থিতির বিষয়ে সতর্ক ছিল না। —হ্যাঁ, তারা জমি সোজাসুজি বিক্রি না করে খুব কম হারে হস্তান্তরযোগ্য পাট্টা লিখে দেয়।

গ্রামের দিকে ফেরার সময় আমরা বাসমতীর খেতগুলো দেখলাম। এগুলো ধানের মতো করে লাগানো হয় নি, রবি ফসলের মতো রোপন করার সময় তার আল উঁচু করে দেওয়া হয়। খেতের মাটি ভালো, আর ভালো খেতে একর প্রতি কুড়ি মণ বাসমতী ফলে, যার দাম এখন ৪০০ টাকার মতো হবে। তবে এর চেয়ে ভালো আয় আখ থেকে হতে পারে, অর্থাৎ একর প্রতি হাজার টাকা।

২৮ তারিখেই আমরা দেরাদুনে ফিরলাম। পরদিন দেরাদুনের বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে কাটালাম। দুন পাবলিক স্কুলে সেসব ছেলেরাই পড়তে পারে যাদের বাবা-মার মাসিক দুশো টাকা খরচ করার সামর্থ্য আছে। কর্ণেল ব্রাউনের স্কুলে দেড়শো টাকায় কাজ হয়ে যায়। এই স্কুল পাক্কা সাহেব তৈরির টাঁকশাল। সাহেব তৈরি করাটা ক্ষতির ব্যবসা নয়, কারণ বড় বড় সরকারি চাকরিগুলো ওদের কাছে সহজলভ্য। আর্যসমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডি· এ· ভি· কলেজ আর মহাদেবী কন্যা কলেজ, যেখানে কলেজ স্তর পর্যন্ত পড়ানো হয়। সৈনিক স্কুল দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না, তবে ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (অরণ্য গবেষণা কেন্দ্র) দেখার আগ্রহ অবশ্যই ছিল কিন্তু সেটা এখন বন্ধ ছিল। হিন্দি অনুরাগীরা আর্যসমাজে ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি তাঁদের কাছে এই বক্তব্য পেশ করলাম যে হিন্দি এখন আসমানী ভাষা, এর সঙ্গে মাটির

সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। অনেকে আট-দশ বছর পর্যন্ত পড়ে এর ওপর নিজেদের অধিকার লাভ করে আর 'হিন্দি আমাদের মাতৃভাষা' বলে বইও লিখে থাকে। আমিও বই লিখি কিন্তু হিন্দি আমার মাতৃভাষা এরকম পণ করি না। আর যাঁরা মাতৃভাষার লেখক নন, তাঁদের ভাষায় কৃত্রিমতা থাকে খুব বেশি। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে হিন্দিভাষার বেশির ভাগ লেখকই এই শ্রেণীর। কিন্তু হিন্দির শেকড় শুধু আকাশে নয় পাতালেও আছে, আর সে-পাতাল হলো—চকরৌতা তহ্শীল (জৌনসার বাবর) বাদ দিয়ে দেরাদুনের বাকি অঞ্চল, বুলন্দশহরের গুলাওঠী তহশীল, মীরাট-মুজঃফরনগর-সাহারানপুরের তিন জেলা—অর্থাৎ কুরুদেশ। হিন্দি এই কুরুদেশের মাতৃভাষা। কুরুদেশীয় খুব কম লোক হিন্দির লেখক হয়েছেন, যাঁরা আছেন তাঁরা মাতৃভাষার লেখকদের নকল করেন আর চাষী, মজুর, কারিগরদের সজীব ভাষা দিয়ে হিন্দিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন না। আমার মতে যতক্ষণ হিন্দিভাষার শেকড় কুরুভূমির মাটির সঙ্গে সংযুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ হিন্দির কৃত্রিমতা দূর হবে না।

বুঝলাম না, আমার কথাগুলো কতজন শ্রোতার পছন্দ হলো। 'ভোলগা থেকে গঙ্গা'র কতকগুলো কাহিনী পড়ে আর্যসমাজীদের অনেকে আমাকে গাল-মন্দ করছিলেন।

আবার কলমের আবর্তন, ১৯৪৩

পয়লা জুলাই আনন্দজী, সুশীল ও আমি দেরাদুন থেকে হরিদ্বার এলাম। স্টেশনে গুরুকুল কাঙড়ীর একজন বিদ্যার্থী ও পন্ডিত ভগবানবল্লভ রামকিংকর পাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। পাণ্ডেজীর নাম নিয়ে মানুষের মধ্যে খুব অভিযোগ ছিল। তবুও ভালো, মারাঠী ও গুজরাটীদের মতো নামের সঙ্গে পিতার নামও যোগ করা হয় নি। সেটা করলে এবং মোটা অক্ষরে লিখে সেঁটে দিলে তাঁর নাম তাঁর শরীরকেও ছাপিয়ে যেত। ভগবান পাণ্ডে বা বল্লভ পাণ্ডেই যথেষ্ট ছিল, ভগবানবল্লভ পাণ্ডে পর্যন্ত রক্ষে ছিল। আর রামকিংকর আসলে ওঁর কবিতা লেখার ছদ্মনাম। যেটাকে পাণ্ডের পরে লাগালে লোকেরা নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পেত। কিন্তু একসঙ্গে ভগবানবল্লভ রামকিংকর পাণ্ডে বলা খুব কঠিন, মনে রাখা তার থেকেও কঠিন। পাণ্ডেজী সংস্কৃতের পণ্ডিত এবং হিন্দির কবিও। ওঁর স্বভাব খুব ভালো, আর ভাবধারাও দক্যানুসী[১] নয়। আমাদের গুরুকুল কাঙড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল পাণ্ডেজীর শহর কন্‌খলের রাস্তায় পড়তো। জলযোগ না করিয়ে তাঁরা কি করে ছেড়ে দেন? প্রথমে আমরা ওঁর বাড়ি গেলাম, তারপর গুরুকুল কাঙড়ীতে অধ্যাপক

[১] দক্যানুস-এর যুগের। দক্যানুস ছিলেন একজন অত্যন্ত অত্যাচারী প্রাগৈতিহাসিক রাজা। হিন্দিতে এই আরবী শব্দটি 'ভীষণ প্রাচীন বা 'সেকেলে' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—স.ম.

কেশবদেবের বাড়িতে উঠলাম। গুরুকুলের বর্ষপূর্তি উৎসবের সময় আসার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখন আমি আসতে পারি নি। এখন নিজে নিজেই এসে পড়েছিলাম। যদিও এই প্রতিষ্ঠান প্রাচীন বৈদিক যুগকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে কিন্তু অতীত আর ফিরে আসে না—এই কথাটা এখানকার বেশির ভাগ অধ্যাপক এবং প্রায় সব যুবকরাই স্বীকার করেন, কিন্তু গুরুকুলের বৃদ্ধ পরিচালকরা এখনও এই সত্যটা মানতে রাজি নন। ১৭ বছর আগে যখন আমি এই প্রতিষ্ঠানটি কাঙড়ী গ্রামে দেখেছিলাম, তার থেকে এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যার্থীরা যে শুধু কুর্তা-পাজামা পরে তাই নয়, তারা নতুন কথা শোনার ও শেখার জন্যই প্রস্তুত। আমি 'তিব্বত যাত্রা', 'সোভিয়েত দেশ' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। একদিন জ্বালাপুর মহাবিদ্যালয়েও গেলাম। কিন্তু আচার্য হরদত্ত শাস্ত্রী ঐ সময় ওখানে ছিলেন না। অন্য বন্ধুরা খুব আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি দেখালেন। এখানে মূলত প্রাচীনধারায় সংস্কৃতি পড়ানো হয়। কাঙড়ী গুরুকুলে ইংরেজি ও আধুনিক বিজ্ঞানের জন্যও যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। সংস্কৃত শিক্ষা, তা প্রাচীন বা আধুনিক যে পদ্ধতিতেই হোক, সমান গুরুত্বপূর্ণ, যদি আমরা আমাদের জাতির ঐতিহাসিক প্রগতি বুঝবার জন্য শিখি, তা না হলে তা কেবল তোতাপাখির মুখস্থবুলিতে পর্যবসিত হয়। আর যদি ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতাকে মজবুত করার জন্য তাকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা হবে ব্যভিচার।

কাঙড়ীতে অধ্যাপকদের উঠোনে ছিলাম। সেখানে সম্ভবত চোদ্দ-পনের জন অধ্যাপক থাকতেন, যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন পাঞ্জাবী। বাঙালীদের যেমন সবার আগে মাছের চিন্তা হয়, পাঞ্জাবীদের তেমনি দুধের। খাঁটি দুধ চাই আর বাটি বা ঘটি ভরে নয়, বালতি ভরে। এর ফলস্বরূপ প্রত্যেক বাড়িতে ভালো জাতের গরু বা মোষ পোষা হয়েছে। একে খারাপ বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত সব কিছুর স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে। পাঞ্জাবী স্ত্রী কতটা প্রিয় সে ব্যাপারে মত দেওয়ার অধিকার আমার নেই। কিন্তু পাঞ্জাবী গৃহিণীদের বাড়িতে অতিথি হওয়া খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার—তবে খাওয়ার মাত্রাটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই।

অধ্যাপকদের স্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন, আর শিক্ষিতা তো ছিলেন সকলেই। কিন্তু তাঁদের কাজ কি ছিল? দুবেলা রুটি তৈরি করে খাওয়ানো আর প্রতি বছর একটা করে বাচ্চার সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাকে সামলানো—বাচ্চাদের সামলানোর কাজটা সোজা নয়। চড়-চাপড় তো প্রত্যেক মা-ই জানে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মায়েরা এই কাজে বোধহয় আরও এগিয়ে আছেন। কিন্তু মার খেতে খেতে অনেক বাচ্চা আবার মাকে কাঁদিয়ে ছাড়তে ওস্তাদ হয়। রান্নাবান্নার পর অধ্যাপিকাদের সব থেকে বড় কাজ হলো শিশুদের দেখাশোনা করা, তারপর আবার বাড়ির গরু এবং মোষ সামলানো। এর মধ্যে কোনো কাজকেই আমি খারাপ মনে করি না। কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম যে এ কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের ষোলো বছর ধরে পড়ার উপযোগিতা কোথায়? আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম, 'প্রত্যেক বাড়ির নার্সারি ভেঙে দিয়ে একটা শিশুশালা তৈরি কর, বাড়ি-বাড়ির গরু-মোষদের জন্য একটা গোশালা তৈরি কর, আর প্রতি বাড়ির রান্নাঘর-উনুন ভেঙে একটা রন্ধনশালা তৈরি কর।' কিন্তু এর

উত্তরে বলা হতো, 'শিশুশালা বাদে অন্য জিনিসগুলো ওখানে তো ছিলই।' যদি ছিল তবে লোকেরা কেন সেখানে খেতে যায় না? কেন সেখান থেকে দুধ নেয় না? বৌ-এর হাতে তৈরি রুটি যদি মিষ্টি লাগে তা হলে চোদ্দ-পনের জন বৌ যদি পালা করে হপ্তায় হপ্তায় রান্না করে দেন, তাহলে কম করে মাসে তিন হপ্তা ওঁরা ছুটি পাবেন। এর পরও যদি কারো জিভ কথা না শোনে, তাহলে লোহা গরম করে পাশে রাখা উচিত। পশুশালা ওঁরা আরও সহজে করতে পারেন, কারণ নিজের নিজের গরু-মোষ নিজেদেরই ব্যবস্থাপনায় একসঙ্গে রাখা যেত, লাভ-লোকসানের প্রশ্নই ছিল না। শিশুশালা তো আরও সাফল্যের সঙ্গে চালানো যায়। বাচ্চারা খুব আনন্দেই থাকবে, কারণ পাঞ্জাবী মায়ের চাঁটিও জোরদার। যদি একই উঠোনের ভেতরে পনের-ষোলটা পরিবার না থাকতো তাহলে হয়তো আমি এধরনের প্রস্তাব করতে পারতাম না। পরে জানলাম পনের-ষোল নয়, বত্রিশটি পরিবার থাকে। কাঙড়ী গুরুকুল এমন জায়গায় অবস্থিত আর তার এতটাই সম্ভাবনা ছিল যে যদি নিজস্ব সেকেলে ভাবধারা ত্যাগ করে কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতো, তাহলে এখানে দু হাজার বিদ্যার্থী জড়ো হতো, আর প্রফেসারদের সংখ্যা বত্রিশ নয়, একশো হতো।

ভগবানজীর সঙ্গে ৩ জুলাই হরিদ্বারে গেলাম। মোহান্ত শান্তানাথ ওখানকার সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন। উৎসাহী এবং বিদ্যানুরাগী মানুষ। আমার আরও কিছুদিন এখানে থাকার ছিল, প্রুফ দেখার কাজ শেষ করে একটু বর্ষা নামলে এগোতে চাইছিলাম। ওঁর খুব ইচ্ছে যে আমি ওঁর ওখানে থাকি। কিন্তু যতক্ষণ আমি নিজের চোখে না দেখে নিচ্ছি যে কলকাত্তওয়ালী মা-কালীর পায়ের তলায় শিব যে-ভাবে পড়ে থাকে সরস্বতীর পায়ের তলায় লক্ষ্মী ঠিক সেভাবে পড়ে নেই, ততক্ষণ লক্ষ্মীর বাহনের থেকে দূরে থাকাই আমার পছন্দ।

শ্রবণনাথ জ্ঞানমন্দির দেখলাম। এখানে মোহান্তজী খুব ভালো বইয়ের সংগ্রহ করেছেন। সেই সঙ্গে সংবাদপত্র ও গ্রন্থপাঠ এবং গবেষণা করার পক্ষে অনুকূল স্থান। নীচে একটি ভালো বক্তৃতা-কক্ষ আছে। এই ধরনের গ্রন্থাগার ভারতবর্ষে দুর্লভ। মোহান্তজী গ্রন্থাগারের উন্নতির দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখেন এবং হিন্দি ও সংস্কৃতের নতুন বই আনিয়ে নেন।

শেষপর্যন্ত ঠিক হলো যে আমি ভগবানজীর বাড়িতেই থাকব। তিনি আশ্বস্ত করলেন যে বেশি লোকে জানতে পারবে না আর আমি একান্তে লেখাপড়া করতে পারবো। ৬ তারিখ আনন্দজী ও আমি হরিদ্বার গেলাম। কনখলের থেকে হরিদ্বার ৩ মাইলের বেশি নয়। খাওয়া শেষে আমরা গঙ্গার ওপরের দিকে বেড়াতে বেড়াতে একেবারে বাইরে চলে গেলাম। আর কাঠের স্তূপের কাছে চুনাপাথরের বেদিতে বসলাম। জায়গাটা ছিল গঙ্গার পাড়ে। ধীরে ধীরে মাধুকরী নিয়ে অনেক সাধু এলেন। তাঁরাও ভোজন করে বসে পড়লেন। কিছু মাদ্রাজী সাধু এসে ওখানেই ভাত রান্না করলেন। ওখানে আলোচনা চলছিল—এই খাবার আর সেই খাবার, এই ক্ষেত্রের আর সেই ক্ষেত্রের। আমরা কখনও অনেকক্ষণ ধরে ওদের দেখছিলাম, কখনও গঙ্গার প্রবহমান ক্যানেস্তারার ভেলার ওপরে

দুধওলাদের যেতে দেখছিলাম।

সন্ধেবেলা টাঙ্গায় করে আমরা কনখলের উদ্দেশে চললাম। কিছু দূর যাবার পর দুজন লোক জোর করে টাঙ্গায় উঠে বসলো। আনন্দজী বললেন, 'আমরা কনখল যাওয়ার জন্য পুরো টাঙ্গাটাই নিয়েছি।' এতে দুজন আগন্তুকের মধ্যে একজন—পাঞ্জাবী পালোয়ান—বলতে লাগল, 'তোমরা নেমে যাও! এটা আমার টাঙ্গা।' আমরা চুপ করে ছিলাম, কিন্তু কিছু লোক ওখানে জড়ো হয়ে গেল। তার মধ্যে থেকে কিছু লোক বোঝাতে আরম্ভ করল, ফলে পালোয়ানটা গালাগাল দিতে লাগল। লোকেরাও উত্তেজিত হলো আর ঝগড়ার সমস্ত উপকরণ তৈরি হয়ে গেল। টাঙ্গাওলাটা অন্য টাঙ্গা এনে হাত-জোড় করতে লাগল। ওর কথা ভেবে আমরা টাঙ্গাটা ছেড়ে দিলাম। অনেকদিন ধরে নাগরিক জীবনের অন্য দিকটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। শহর হলো ফাঁকিবাজ লোকদের আস্তানা। যখন তারা অন্যের রোজগার মাগনায় খায়, তখন এদের রোজগারও অন্যেরা মাগনায় খাবে না কেন? ছেলেবেলায় আমি বেনারসে গুণ্ডা দেখেছি, এও দেখেছি যে ওরা কত ঠাটবাটে থাকে। ওরা সাধারণ লোকদের বিরক্ত করে না। ওদের যজমান ছিল বড় বড় শেঠ আর বাবুরা। শেঠজীর কাছে ধরা যাক এক হাজারের দাবি করা হলো, তিনি কি করে দিতে অস্বীকার করবেন? অস্বীকার করলে বাজারের মধ্যেই মাথায় জুতো পড়তো। এরজন্য প্রধান গুণ্ডার লোকটিকে তো জেলে যেতে হতো না, কারণ কে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বিপদ ডেকে আনবে? যদি জেলে চলেও যেত, তাহলে ওর কি ক্ষতি হতো? যে মারত সে তো পুরস্কার পেতই। এই পালোয়ানটাও ওই রকমের গুণ্ডা ছিল। ওর এই কথাটা বলা ঠিকই ছিল, 'এটা আমার টাঙ্গা।' টাঙ্গাওলার একবারও বলার সাহস হলো না, 'না, এটা আমার টাঙ্গা।' যতক্ষণ শহরের এই ফাঁকিবাজরা আছে আর ঘুষ নেওয়া কোতোয়াল এবং দারোগাদের পেশা রয়েছে, ততক্ষণ গুন্ডারা খতম কি করে হতে পারে?

প্রফেসর নন্দদুলাল বাজপেয়ীর নিবন্ধসংগ্রহ হিন্দি সাহিত্যে 'বীসবী শতাব্দী' পড়ছিলাম। আমি এ বিষয়ে নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'দ্বিবেদীজী রত্নাকর এবং মৈথিলীশরণ গুপ্তের ব্যাপারে যে বিশ্লেষণ করেছেন সেটা ঠিকই মনে হয়। (বাজপেয়ীজীর) ভাষা যথেষ্ট প্রভাবশালী, ভাবনায় অধ্যয়ন এবং দূরদৃষ্টির ছাপ আছে।'

(৭ জুলাই) 'প্রেমচন্দের আলোচনা করার সময় তিনি অনেকটা নীচে নেমে এসেছেন, আর সমালোচক না হয়ে ব্যক্তি-বিবাদী হয়ে গেছেন, প্রেমচন্দের দোষগুলো খুব বাড়িয়ে দেখানো আর গুণের জন্য যথাসম্ভব একটা শব্দও না ব্যবহার করা—এই মনোভাব নিয়ে আলোচনা লেখা হয়েছে।'

এখানে স্বামী চন্দ্রশেখর গিরির সঙ্গে দেখা হলো। তিনি এখন নিরঞ্জনী আখড়ার একজন মোহান্ত। আখড়াগুলোর সম্পর্কে আমি মাঝে মাঝে কিছু কথা শুনেছিলাম, কিন্তু আমি ওঁর গড়নের অধ্যয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ কখনো পাই নি। গিরিজীর কাছ থেকে কিছু কথা জানতে পেরে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল, তারপর আমি কাছ থেকে নির্বাণী আখড়াকে অধ্যয়ন করতে চাইলাম। গিরিজী সাহায্য করলেন। আখড়ার অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও সাহায্য করলেন, আর আমি 'সন্ন্যাসী অখাড়ে' এই নামে একটা রচনা লিখে

ফেললাম। বহু শতাব্দী ধরে গণতন্ত্র ভুলে যাওয়া ভারতে কিভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক গণতন্ত্র সংঘটিত হয়েছে, আখড়াগুলো এর ভালো উদাহরণ। যদিও ওদের মধ্যে অনেক বিকার এসে গেছে। কিন্তু যদি আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে লোকেরা ওখানে প্রবেশ করে তা হলে তারা অনেক কিছু সংশোধন করে দিতে পারে।

ভগবানজী নিয়ম করে রোজ শংকরের বটিকা সেবন করে থাকেন। ১০ জুলাই ওঁর ইচ্ছা হলো যে আমিও একটু খাই। ১৯১৪-র পর আমি কখনও ভাঙ খাই নি কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত হলাম যে বেদের সোম, পশতো[১]-র ওম, পারসীদের হোম, তিব্বতীদের সোমরাজা হলো এই সিদ্ধি—তিব্বতী আর পশতো দুটোতেই ওপরোক্ত শব্দ সিদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমি ভাবলাম যে আবার একটু সোম চেখে দেখা উচিত, কারণ ২৯ বছরের স্মৃতি দিয়ে কাজ চলতে পারে না। সন্ধেবেলা আমিও সিকিভাগ সোম খেলাম এবং ঠিক ঋষিদের মতো মধু আর ক্ষীরের সঙ্গে। রাত্রিবেলা যখন আমরা বেড়াতে লাগলাম, তখন এর প্রভাব পড়তে আরম্ভ করলো। আমরা একটা আমবাগানে পৌঁছলাম। ভগবানজী বেছে বেছে আম নিচ্ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল যে আম কিনতে তিনি আড়াইযুগ কাটিয়ে দিয়েছেন। পনেরো-কুড়িটা আম বোধহয় বেছেছিলেন। এমন সময় আমি বললাম, 'পর্যাপ্তমস্তি।' মনে হলো শিরার ভেতরের মজ্জাগত পরমাণুগুলো খুব দ্রুতগতিতে চলছে। বোধহয় ওই কারণেই একটুখানি সময় অনেক বেশি মনে হচ্ছিল, সামান্য শব্দ অনেক বড় হয়ে শোনা যাচ্ছিল। বাইরে থেকে সহাস্য থাকার চেষ্টা অবশ্যই ছিল, জিভে স্বাদ ঠিক পাচ্ছিলাম না আর খাওয়ার পরিমাণটা তো আন্দাজই করতে পারছিলাম না। সেই সময়েই আমি নিজের মস্তিকের অবস্থার বিষয়ে আনন্দজীকে দিয়ে কিছু লিখিয়েছিলাম, সম্ভবত এখনও সেই কাগজটা ওঁর কাছে আছে। সোমের অভিজ্ঞতা হলো, তাতে দেখলাম যে, যে মানসিক কাজে মস্তিকের অনেকগুলো প্রকোষ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন, সেই কাজটা সিদ্ধি খেয়ে করা যায় না। শৃঙ্খলাহীন বা একাকী বৃত্তিগুলোকে দিয়ে হাসিখুশির কাজ অবশ্যই করানো যায়। আমার এরকম অভিমতে ভগবানজীর আপত্তি ছিল, কিন্তু আমি নিজের মানসিক অবস্থা যেরকম দেখেছিলাম সেরকম অভিমত প্রকাশ করেছিলাম।

১২ জুলাই-এর চিঠি পেলাম। জানতে পারলাম যে লেনিনগ্রাদ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, যাতে লোলা লিখেছে—'একসঙ্গে থাকা দরকার, লেনিনগ্রাদে এসো, অথবা আমাদের ভারতে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। অনেক চুম্বন' (Necessary to be together. Come to Leningrad or arrange our departure for India. Many kisses.)।

প্রথমে আমি পাসপোর্ট নিই নি। সেই সময় লোলার নাম-ঠিকানা ছিল না, কিন্তু এখন যাওয়ার জন্য প্রাণটা উতলা হয়ে উঠল। ভারতবর্ষ একটা বিরাট জেলখানা। এটা তখনই বোঝা যায় যখন আপনি এখন থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য সীমান্তে পৌঁছবেন আর সেপাই

[১] ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত ভূখণ্ডের ভাষা।—স·ম·

বলবে, 'জেলারের হুকুম?' এখন পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দেবার ছিল, কি জানি কতদিন লাগবে।

১৯ জুলাই প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হলাম। ২১ ওখানে পৌঁছোলাম। এখানে কিছু প্রুফ দেখার ছিল। দেখে আনন্দ হলো যে উদনারায়ণ তিওয়ারী তাঁর ডক্টরেটের জন্য প্রবন্ধ (থিসিস) তৈরি করে ফেলেছেন। এখন টাইপ করে শুধু দেওয়া বাকি আছে। তিনি আট-নয় বছর ধরে খুবই তৎপরতার সঙ্গে ভোজপুরী ভাষার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি হয়তো এই রচনাটা কয়েক বছর আগেই শেষ করতে পারতেন কিন্তু ওঁর তাড়াতাড়ি ডক্টরেট হওয়ার দিকে ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা আগ্রহ ছিল নিজের বিষয়ের সম্পূর্ণ অধ্যয়নের দিকে। এজন্যই তিনি পালি আর হিন্দি-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের আরও দুটো এম·এ· ডিগ্রি করেছিলেন।

২৬ তারিখ খবর ছড়ালো যে মুসোলিনী জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আর বোদোগলিও ইটালির প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ফ্যাসিস্ট দুর্গে ফাটল ধরলো। লালসেনাও এগিয়ে যাচ্ছিল, আর এখন কেবল শীতের মধ্যেই তারা এগিয়ে যাবে এমন ব্যাপার ছিল না।

'প্রমাণবার্তিক স্ববৃত্তিটীকা' ছ'বছর ধরে কম্পোজ হয়ে পড়েছিল। 'স্ববৃত্তি'র লুপ্ত অংশগুলোকেও আমি তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংস্কৃত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনো প্রকাশক ঠিক করা সম্ভব হয় নি। বিহার রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ছাপবার কথা ছিল, সেটাও হয়ে ওঠে নি। ভারতীয় বিদ্যাভবনের (বোম্বাই) সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল। ওখানেও ঠিক হয় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাপার কথা ঠিক হয়েছিল, কিন্তু কাগজের ঝগড়ার দরুন সেটাও তিক্ততার মধ্যে রয়ে গেল। শেষকালে কিতাব মহলের মালিক শ্রী শ্রীনিবাস আগরওয়াল প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন এবং আমি এখন ওই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম।

বোম্বাইতে (৫ আগস্ট—৬ সেপ্টেম্বর)—এখন আমার পাসপোর্ট নেওয়ার চিন্তা ছিল। ৫ আগস্ট বোম্বাইর উদ্দেশে রওনা হলাম। একটা কামরায় কিছুটা বেশি জায়গা ছিল, তাতে বসবার সময় আমি আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম, 'এই কামরাটা কেটে যাবে না তো?' ওরা বলল, 'না।' কিন্তু জব্বলপুরে সেই কামরাটা কাটা গেল।

পাশের কামরাটায় ঢুকলাম, সেখানে খুব ভিড় ছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আশেপাশের লোকেরা ছিল আরানিবাসী। আমিও ছাপরার ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলাম। ভাষার যাদু দেখতে পেলাম। আমি বসবার জায়গা পেয়ে গেলাম, আর পরে তো শোবারও জায়গা পেয়ে গেলাম। এইসব ভাইয়েরা বোম্বাই যাচ্ছিল। চাকরি করার জন্য নয়, জুতো বানাবার জন্য। জানতে পারলাম, বোম্বাইতে এক হাজারের ওপর আরার চামারভাই থাকে। খাবার-দাবারের ভেদাভেদ না থাকাতে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গেল। যাত্রাটা আরও বেশি আনন্দে কাটলো। ওরা মূল্যবৃদ্ধির কথা বলছিল। গত বছরের থেকে শস্যের দাম আরো বাড়ছিল, ফলে কাগজের নোটগুলো হাতে আসতে সময় লাগতো কিন্তু খরচ যে কোন ফাঁকে হয়ে যেত তা টের পাওয়া যেত না। ওরা পরিতাপ করছিল, 'আমরা

আগে জমি ধরে রাখি নি কেন। পূর্বপুরুষেরা ভুল করেছিল, তখন জমি এত দুর্মূল্য ছিল না। যার কাছে জমি আছে, সে আজ খাওয়া-পরার দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত। আমাদের কাছেও জমি থাকলে কি আর এরকম দশা হতো?' ওরা কি জানতো যে পূর্বপুরুষদের পক্ষে জমি পাওয়া আরও কঠিন ছিল। জমি যদি পাওয়া যেত তবে দু পয়সার জন্য কে হাল চালাতো?

বিকেল পাঁচটায় গাড়ি ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে (বোরী বন্দর) পৌছোল। আমি পার্টি অফিসে গেলাম। বোম্বাইয়ে দুটো কাজ করার ছিল—পাসপোর্ট জোগাড়ের চেষ্টা আর 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'[1]-র জন্য আরও কিছু জীবনী সংগ্রহ করা। জীবনীর কাজ তো সেদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল। আমি এই বইতে যতগুলো জীবনী লিখেছি, তার জন্য চরিত্রগুলোর নায়কদের জিজ্ঞেস করে, তাঁদের বাল্যকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত জীবনের ঘটনাগুলোর নোট নিয়েছিলাম, শিক্ষা-দীক্ষা এবং পরিবেশের খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম। এই নোটের সাহায্যে আমি বারো তেরোটা জীবনী তৈরি করে ফেলেছিলাম।

পাসপোর্টের আবেদনের ওপর একজন জে·পি·র স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। বন্ধু মীরজকর সাহায্য করলেন এবং ডাক্তার মালিনী সুখতনকর সই করে দিলেন। অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম যে এতে পুলিশ কমিশনারেরও সই থাকা উচিত। আমি তাঁর কাছে গেলাম। জানা গেল যে এখন বিহার সরকারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি সই করবেন। পাঁচ-ছ দিন এতে লেগে গেল। ১৯ তারিখ বলা হলো যে আমার দরখাস্ত পাসপোর্ট অফিসে পাঠানো হয়েছে। পাসপোর্ট যে এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না সেটা আমি ভালোভাবেই জানতাম। এখন ওটা বোম্বাই গভর্নমেন্ট দেখবে, তারপর সে ভারত সরকারের কাছে পাঠাবে, আরো খোঁজ-খবর হবে। যাক, আমি আমার কাজ চুকিয়ে ফেলেছিলাম।

এবার শুধু শস্যের দুর্মূল্যই দেখলাম না, সেই সঙ্গে বাজারে খুচরো পয়সা পাওয়াও ছিল মুশকিল। এক পয়সা-এক আনা-দু আনার বদলে ডাকঘরের টিকিট রাখতে হতো। যার কাছে কিছু পয়সা আসতো, সে দু-এক টাকার খুচরো রাখার চেষ্টা করত—কি জানি কোন সময় কি জিনিস কিনতে হয়। খুচরো পয়সা আগেই কম ছিল। আর এখন কোটি-কোটি মানুষ কিছু না কিছু খুচরো নিজের কাছে রাখতে চাইছে, তাহলে খুচরোর আরও আকাল পড়বে না কেন?

৭ বছর আগে 'বার্তিকালংকার' (প্রমাণবার্তিক-ভাষ্য)-কে আমি তিব্বত থেকে লিখে এনেছিলাম। এখন পর্যন্ত ওটা ছাপবার ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি। মুনি জিনবিজয়জী ওটা ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। আমি এতে নিশ্চিন্ত বোধ করলাম, যদিও তা মিছিমিছি। আমি এক ডজনেরও বেশি জীবনীর নোট নিলাম আর ৭ সেপ্টেম্বর ওখান থেকে প্রস্থান করলাম।

[1] *লেখকের এই জীবনী গ্রন্থটি ১৯৪৪ সালে লেখা। কিতাব মহল থেকে প্রকাশিত।—স·ম·*

—১৯৪৩—

প্রয়াগ (৮ সেপ্টেম্বর—৩ অক্টোবর)—৮ সেপ্টেম্বর সকালে গাড়ি মধ্যপ্রদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষার দিন। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ দেখা যাচ্ছিল। গাড়িগুলো সৈন্যভর্তি ছিল। সাধারণ মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছিল বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি, শস্যের মূল্যবৃদ্ধি, খুচরো না পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই চাইছিল যে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে থাক। প্রয়াগে আমি প্রুফ দেখা ছাড়া 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'র জন্য জীবনীগুলো লিখতেও আরম্ভ করলাম। এখন আরও জীবনী সংগ্রহ করার ছিল।

২৬ সেপ্টেম্বর কবি সম্মেলনের সভাপতি হয়ে কানপুর যেতে হলো। বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ লোক যেভাবে পোকা-মাকড়ের মত মারা যাচ্ছিল, তা শুনে সারা ভারতের হৃদয় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কয়েকজন কবি খুব করুণরসের কবিতা শোনালেন। রাত সাড়ে এগোরোটার সময় কবি সম্মেলন থেকে বিদায় নিলাম।

কমরেড ইউসুফের জীবনীর জন্য নোট নেওয়ার দরকার ছিল। রাত পাঁচটা পর্যন্ত আমি ওকে জিজ্ঞেস করে করে নোট নিতে থাকলাম। ইউ· পি·র শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় নেতা ইউসুফ একেবারে স্বনির্মিত পুরুষ। শ্রমিক থাকাকালীন সে শ্রমিকদের দুঃখ অনুভব করেছিল। অধ্যয়ন আর চিন্তনে তাঁর চোখ খুলে গেল এবং ইউসুফ সেই পথ ধরলো যে পথে সে আজও হাঁটছে। সন্তসিংহ আজ ইউসুফ, কিন্তু ধর্মের জন্য নয়। যখন পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে ওর পেছন পেছন ঘুরছিল তখনই সে এই নাম পালটে ফেলেছিল।

স্টেশনে এক-দেড় ঘন্টা বসলাম, তারপর ট্রেনে করে দুপুরবেলা প্রয়াগে পৌঁছলাম। সারা রাত ঘুমোতে পারি নি, সেজন্য (২৭ সেপ্টেম্বর) বাকি দিনটা ঘুমিয়ে কাটালাম। সন্ধেবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি পরিষদে 'প্রগতিশীলতার' ওপর বক্তৃতা দিলাম। প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকরাও ওখানে এসেছিলেন। অনেক সমঝাদার এবং সৎ লোকও অজ্ঞানতাবশত ভ্রমের মধ্যে পড়েন। আমি বললাম, 'প্রগতিশীলতার অর্থ এই নয় যে সুর, তুলসী, কালিদাস আর বানকে সেকেলে ধারার বলে মনে করতে হবে। তাঁরা সামন্তযুগে জন্মেছিলেন। তাঁদের কবিতার দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পুষ্ট হয়েছিল, সেজন্য তাঁদের কবিতাগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া উচিত। মহানকবির জন্ম যে সমাজে এবং যুগেই হোক না কেন, তিনি সর্বদা আমাদের কাছে মহান থাকবেন। যতক্ষণ তাঁদের কবিতায় সেই শক্তি আছে, আমাদের হৃদয়ে সেই কোমলতা আছে—যাতে আনন্দের সময় মুখ উৎফুল্ল হয়, বিষাদের সময় চোখ ভিজে ওঠে, ততদিন এই মহাকবিদের কোনো বিপদ নেই। প্রাচীন কবিদের ত্যাজ্য করার কথা যে বলবে সে প্রগতিশীল নয়, পাগল।' আমি এও বলেছিলাম, 'আপনারা বোধহয় এটা আমার ব্যক্তিগত মত মনে করেন কিন্তু তা নয়। স্বয়ং এঙ্গেলস্ প্রফেসর ড্যুরিঙ্—এর এই মতকে জোরের সঙ্গে খন্ডন কবেছিলেন যে গ্যেটে ইত্যাদি মহাকবিদের রচনা পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া উচিত।' আমার ভাষণের পর একজন সাহিত্যসেবী বলল, 'যদি প্রগতিশীল লেখকদের আমাদের অতীতের কাব্যকৃতির প্রতি এই ভাবই থাকে, তা হলে আমার সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই, পৃথিবী বদলাবার জন্য ওঁদের সাহিতিক প্রচেষ্টার আমরা বিরোধী নই।'

—১৯৪৩—

আলমোড়া, পাঞ্জাব, কাশ্মীর যাত্রা (৪—৩০ অক্টোবর)—'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'র জন্য আমার আরও অনেক জীবনীর দরকার ছিল। ভরদ্বাজ ভুবালীতে ছিলেন, পন্তজী আলমোড়াতে এবং বহু চরিত্রনায়ক ছিলেন পাঞ্জাবে। ৪ অক্টোবর আমি আলমোড়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে একদিনের জন্য লক্ষ্ণৌতে থামলাম। তারপর ছোট লাইনের ট্রেন ধরলাম। ৭ তারিখ সকালে ভোজীপুরাতে পৌঁছলাম, সেখান থেকে অন্য ট্রেনে বসে কাঠগোদামে পৌঁছলাম। কাঠগোদাম হিমালয়ের পাদদেশে। এখান থেকে নৈনিতাল আর আলমোড়ার লরি যায়। ভুবালী আর রানীখেত আলমোড়া যেতে পথে পড়ে। আমি সোজা আলমোড়া গেলাম। সাতটার সময় আলমোড়া পৌঁছলাম। জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৭০০ ফুট ওপরে এবং অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ চলছিল, কাজেই গরমের নাম ছিল না। সেদিন সন্ধেবেলা দেখলাম আলমোড়ার সমস্ত নরনারী উদয়শংকর কলাকেন্দ্রের দিকে চলেছে। আজ ওখানে রামলীলা হওয়ার কথা। আমি তক্ষুণি এসে একটা হোটেলে উঠেছিলাম। সেজন্য আর ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে হলো না। পণ্ডিত সুমিত্রানন্দন পন্ত উদয়শংকর কেন্দ্রেই উঠেছিলেন।

পরদিন (৮ অক্টোবর) আমি ওঁর কাছে গেলাম। জায়গাটা অতি রমণীয়। দেখে দুঃখ হলো যে উদয়শংকর কলাকেন্দ্রের যে-রকম সাহায্য পাওয়া উচিত, তা পাচ্ছে না। লক্ষ্মীর বসবাস সমুদ্রের ধারে, আর উদয়শংকর নিজের কলাকেন্দ্র এখানে হিমালয়ের এক কোণে স্থাপিত করেছেন, এটাও ওতে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু এর থেকেও বেশি বাধা লক্ষ্মীর বাহনদের নির্বুদ্ধিতা। আমি শুনেছিলাম, কোনো রাজা সাহেবকে দেখাবার জন্য একবার কলাপ্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। কেরলের কথাকলির (মূকনৃত্য) এক মহান শিল্পীর সেই কলাপ্রদর্শনের সময়েই মৃত্যু হয়েছিল, এবং তখন প্রদর্শন বন্ধ করতে হয়েছিল। রাজা সাহেব এই শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না, উল্টে অভিযোগ করলেন, 'আপনারা আমাকে নৃত্য দেখান নি।' এই রকম রাজাদের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে? বোধহয় উদয়শংকরও বুঝতে পারছিলেন যে শেঠ আর রাজাদের জোরে ওঁর শিল্পের প্রসার সম্ভব হবে না, সেজন্য উনি জনগণের দিকে বেশি ঝুঁকছেন। উনি যখন জানতে পারলেন যে আমি এসেছি তখন দুই ভাই ওখানে এসে পৌঁছলেন। শিল্পের সঙ্গে আমার একটুও পরিচয় নেই কিন্তু আমি তো বলব যে রসগোল্লার সত্যিকারের তারিফ তখনই হয় যখন ওটা তৈরি করার প্রক্রিয়া না জেনেও লোকে তার ভালো স্বাদ অনুভব করে।

আমি পন্তের জীবনীর নোট নিলাম। শ্রী বোশী সেন আর ওঁর স্ত্রী (আমেরিকান) আলমোড়াতেই থাকেন। ছ বছর আগে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন কিন্তু তখন আসতে পারি নি। এখন হাতে সময় ছিল, সেজন্য আমি খুঁজতে খুঁজতে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। সেন মশাই জীববিজ্ঞানের গবেষণায় রত ছিলেন। এদিকে আমার নিজের 'বিশ্বকী রূপরেখা'[১] লেখার জন্য আমাকে বিজ্ঞানের কত গ্রন্থই না পড়তে হয়েছিল। কিন্তু

[১] *১৯৪২ সালে লেখা এই গ্রন্থটি কিতাব মহল থেকে প্রকাশিত।*—স.ম.

বিজ্ঞানকে যতক্ষণ না রসায়নাগারের সাহায্য নিয়ে অধ্যয়ন করা হচ্ছে, ততক্ষণ না ভালো করে জ্ঞান হয়, আর না সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায়। সেদিন তাঁর 'বিকেকানন্দ রসায়নাগার'-এর নতুন বাড়ির উদ্বোধন হলো। আমি ওখানে পৌছলাম। সেন দম্পতি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। ওঁরা রসায়নাগার দেখালেন। আমি কালই এখান থেকে চলে যাব জেনে খুব আফশোশ করতে লাগলেন।

রাতে হাঁটতে হাঁটতে ঝীজাড় পাড়ায় পৌঁছলাম। পূরণচন্দ্র যোশীর জন্ম এখানেই হয়েছিল। যোশীর বাবা পণ্ডিত হরনন্দন যোশীর কাকার পৌত্র পণ্ডিত ভোলাদত্ত আগে স্টেশন মাস্টার ছিলেন, এখন উনি একটা দোকান করেছেন। যখন উনি জানতে পারলেন যে আমি পূরণের বন্ধু আর যেখানে পূরণ জন্মেছিল সেই বাড়িটা দেখতে চাই, তখন উনি আমাকে আত্মীয়ের মত মনে করলেন। সাম্যবাদের বার্তা এখনও আলমোড়ার দিকে পৌঁছোয় নি। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে ভারতের স্তালিনকে যে-স্থান জন্ম দিয়েছিল, যেখানকার লোকেরা সাম্যবাদের ব্যাপারে এত কম জানে। আমি কেরালা আর অন্ধ্রের ছোট ছোট গ্রামগুলো দেখেছি। সেখানকার নরনারীরা শুধু যোশীকে চেনে তাই নয়, বরং তাঁর আঙুলের ইশারায় প্রাণ পর্যন্ত দিতে তৈরি। নিজের সুপুত্রকে আলমোড়া অবশ্যই চিনবে। পণ্ডিত ভোলা দত্ত যোশীর রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। খবরের কাগজও কমই পড়েন। তবে যোশী যে এখন বড় মানুষ হয়ে গেছেন এ-খবর ওঁব কানেও নিশ্চয়ই পৌঁছে থাকবে। কতটা বড় মানুষ এটা উনি জানতেন না। উনি জানতেন না যে সে ভারতের সবচেয়ে সুসংগঠিত, সবচেয়ে বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ বিপ্লবী সেনার সর্বপ্রধান সেনাপতি। উনি বার বার বললেন, 'পূরণকে এদিকে আসতে বলবেন।' আমি বললাম, 'তার ওপব কাজের অনেক চাপ। সে সময় বের করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আমি এটা অবশ্যই চাইবো যে সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে একবার ঝীজাড়ের এই ছোট্ট কুঠুরিটা অবশ্যই দেখে যাক, যেটাতে মালতী ৩৬ বছর আগে তাকে জন্ম দিয়েছিল।' উনি এখনও শোনেন নি যে যোশীর বিয়ে হয়ে গেছে। উনি বৌমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমি বললাম, 'কল্পনা বাঙালী। সে পিস্তল এবং বোমা ছোঁড়ার সাঙ্ঘাতিক অভ্যাস করেছিল—মৃতের ওপর নয়, জীবিতদের ওপরও। ফাঁসি থেকে সে একচুলের জন্য বেঁচে যায় এবং যাবজ্জীবন দীপান্তরের শাস্তি পায়। এই হলো তোমার ভ্রাতৃবধূ কিন্তু বুড়ী নয়। বোধহয় সেও তোমার বাড়ি দেখতে চাইবে।' তারপর উনি আমাকে সেই পুরনো বাড়িটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। তিনতলায় এখনও সেই বড় রান্নাঘরটা রয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলো খোপ করা আছে। আরও কতকগুলো ছোট ছোট কুঠরি দেখলাম। পুরনো ধাঁচের বাড়ি সেইজন্য ছাতগুলো নীচু আর দরজাগুলো ছোট ছোট। আমাকে অনেকটা মাথা নীচু করে ওগুলোর ভেতর যেতে হচ্ছিল। বাড়িটা একশো বছরের থেকে কম পুরনো ছিল না। পরিবারের সবাই চাকুরে সেইজন্য বেশিরভাগ লোক বাইরে বাইরে থাকেন এবং বাড়িটার অনেক অংশ খালি পড়ে থাকে।

৯ অক্টোবর বারোটার সময় আমি ভুবালী চলে এলাম। পথে রানীখেতে নেবে শুধু চা খেলাম। ভুবালীতে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটা ভালো স্যানিটোরিয়াম আছে। এটা গরমের

সময়—ভ্রমণার্থীদের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। তবু স্যানিটোরিয়ামের জন্য এখানে দেখা-সাক্ষাত করতে অনেক লোক আসতো।

আমি মালপত্র নিয়ে হোটেলে গেলাম। সে একটা খোপের জন্য দেড় টাকা চাইছিল আর এমন কোনও গ্যারান্টি ছিল না যে তাতে ছারপোকা থাকবে না। আমি একটা ধর্মশালায় নিজের জিনিসপত্র রাখলাম। বেড়াবার সময় যশপাল দম্পতির সঙ্গে দেখা হলো। কিছুক্ষণ ওঁদের সঙ্গে কথা হলো। স্যানিটোরিয়াম সম্পর্কে জানতে পারলাম যে লোকেরা সকাল সাড়ে আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এবং বিকেলবেলা চারটে থেকে ছটা পর্যন্ত দেখা করতে পারে।

দেওলীর পর আজ ভরদ্বাজকে দেখলাম। শরীরে প্রচুর মাংস হয়েছিল আর দেখতে অনেক সুস্থ লাগছিল। কিন্তু যক্ষ্মা বড়ই প্রতারক রোগ, এখন খুব সাবধান থাকা দরকার। উনি বেড়াতে বের হতেন। একদিন ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলেন, তারপর কয়েকদিন ধরে জ্বর হতে লাগল।

দ্বিতীয় দিন (১০ অক্টোবর) আমি জীবনীর জন্য নোট নিলাম। প্রথম রাতে ছার এবং পোকামাকড়ে অস্থির করে তুললো। সমতলে মশারা বিরক্ত করে আর পাহাড়ে ছার এবং পোকামাকড় বড় বিপদ! আসলে পরিচ্ছন্নতা না থাকার দরুন এগুলো হয়। আর ওষুধ-বিষুধ দিয়ে পরিষ্কাব রাখা অসাধ্য কাজ। যাক, দ্বিতীয় দিন জামাল কিদওয়াইর সঙ্গে দেখা হলো। উনিও থাকবার জন্য আগ্রহ দেখালেন। কৃষি-বিভাগের একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা, রাত্রিবেলা আমি ওঁর বাড়িতেই থেকে গেলাম।

১১ তারিখ আবার লরি ধরলাম। বেরিলী থেকে সাহারানপুরের রাস্তা না ধরে আমি কাঠগোদাম যাওয়ার ছোট লাইনের রাস্তাটাই বেছে নিলাম। বড় লাইনে বেশি ভিড় হয় এই চিন্তাও ছিল। কাঠগুদাম থেকে বদায়ুন হয়ে হাথরাস। দিনের বেলা হলে উত্তর-পাঞ্চাল আর দক্ষিণ-পাঞ্চাল এই ভূভাগ ভালো করে দেখতাম কিন্তু বেরিলীর আগেই রাত হয়ে গিয়েছিল। হাথরাসে একটু থাকার পর দিল্লী মেল পাওয়া গেল। ইন্টার ক্লাশের টিকিট ছিল। ভিড়ের জন্য একটা কামরা ছেড়ে দিলাম। ততক্ষণে ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসে পড়লাম এখানে শোয়ার জায়গাও পাওয়া গেল।

দিল্লীতে (১২—১৩ অক্টোবর)—পরদিন (১২ অক্টোবর) দুপুরবেলা ট্রেন পৌঁছোল। পার্টির ঠিকানা জানতাম। ওখানে টাঙ্গায় করে দরিয়াগঞ্জে বন্ধু যজ্ঞদত্ত শর্মার বাড়ি পৌঁছলাম। যজ্ঞদত্ত আগে একটা কলেজে প্রফেসর ছিলেন, কিন্তু পার্টির সেক্রেটারি হওয়ার দরুন উনি যথেষ্ট সময় পেতেন না। চাকরি ছেড়ে এখন সম্পূর্ণ সময়টা পার্টির কাজে লাগান। ওঁর স্ত্রী শিক্ষিতা যুবতী। উনি জানেন যে হিন্দুর ঘরে জন্ম হয়েছে, ওর পক্ষে স্বামীকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। যক্ষদত্ত এই মতটা মানেন না কিন্তু তাতে কি? যাক, এর থেকে একটা লাভ তো হলো, স্ত্রী চিন্তা করতে বাধ্য হন—কম্যুনিস্ট পার্টি কি ব্যাপার, কি তার আদর্শ, যার জন্য তাঁর স্বামী সুখের জীবন ত্যাগ করে জেল আর দুর্ভিক্ষের পথ ধরেছেন? সেই সময় সে নিজের স্বামীর কথা কখনও

বুঝতে পারতো না, কিন্তু যখন আমি দ্বিতীয়বার (১৯—২৩ ফেব্রুয়ারি) দিল্লী গেলাম, তখন পত্নীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন পেলাম। এখন তাঁর সেই শুকিয়ে যাওয়া মুখ ছিল না। শুচিবাই তো আর ছিল না, তবে মাছ-মাংস-ডিমের নাম নেওয়া এখনও সহ্য হয় নি।

ছোট্ট বাচ্চা বিন্দুকে আমি নিজের বন্ধু করে নিয়েছিলাম। খাওয়ার জন্য পাশের মুসলমান হোটেলে যেতাম। বিন্দু বলল, 'আমিও যাব।' প্রথমে তো বলল, 'আমি পায়ে হেঁটে যাব।' অথচ জুতোও পরে নি। রাস্তায় পা পুড়ে যেতে লাগল। কোলে তুলতে হলো। যাতে সে কোনও জিনিসে হাত না দেয় তাই আমি আগেই আইসক্রিমের কাঠি ধরিয়ে দিয়েছিলাম। হোটেলে গেলাম। মাংস আর রুটি সামনে এলো। বিন্দু বলল, 'আমিও খাবো।' বেচারা মাংসের টুকরোটা তো খেতেই পারলো না, কারণ এখনও অভ্যাস হয় নি, কিন্তু মাংসের ঝোলে দু-একটা গ্রাস ভিজিয়ে নিল। প্রচুর লংকা ছিল তাই বেশি খাওয়া সাহস হলো না। এখন মাত্র তিন বছরের ছিল, কিন্তু খুব সওয়াল-জবাব করতো। পাসপোর্টের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি ওখানে গিয়েছিলাম। টোট্‌নহাম ফোনে জানালো, 'পাসপোর্ট এখনও আমাদের হাতে আসে নি।' পররাষ্ট্র বিভাগের সহায়ক সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন হাসান বললেন যে পার্সপোর্ট এলে পর লেখালেখি করে ওটা বোম্বাই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কোনও বড় দরের লোক যতক্ষণ মধ্যস্থতা না করছে, ততক্ষণ সরকারি অফিসে কিভাবে প্রভাব ফেলা যায়?

পাঞ্জাবের গ্রামে (১৪—১৭ অক্টোবর)—সেই দিনই আমি ফ্রন্টিয়ার মেল ধরলাম আর দ্বিতীয় দিন (১৫ অক্টোবর) সাড়ে আটটায় অমৃতসরে পৌঁছে গেলাম। বাবা মোহনসিং ভকনা আর বাবা বাসাখা সিংহের জীবনীর জন্য নোট নেওয়ার ছিল। মুনারিয়া বাজারে এদিক-ওদিক খুঁজলাম কিন্তু দেশভক্ত পরিবার সহায়তা কমিটির খোঁজ পেলাম না। তারপর 'স্বতন্তর'-এর ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে পুতলীঘরের কাছে ডাক্তার গুরুবখস সিং-এর বাংলোয় পৌঁছলাম। না 'স্বতন্তর'-এর দেখা পেলাম, না ডাক্তারবাবুর। তবে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সন্তকাউর স্বাগত জানালেন। আজই ভকনা যেতে চাইছিলাম কিন্তু টাঙ্গা পাওয়া গেল না। আজ গুরু রামদাসের জন্মদিন ছিল। দরবার সাহেবে দীপমালা জ্বালানো হচ্ছিল। দর্শকদের খুব ভিড় ছিল। যতই হোক এটা শিখদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থান যে। আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানে কম্যুনিস্টদের বেশি কাজ কৃষকদের মধ্যে। ছাত্রদের মধ্যেও কিছুটা কাজ আছে, ওঁরা টাঙ্গাওলা শ্রমিকদের সভাও সংগঠিত করছে, মহিলোদের মধ্যে কোনও কাজ হয় নি। বিত্তবানরা তো ওদের ছায়া দেখলে চটে যায় আবার শিক্ষিতবর্গও উদাসীন।

বন্ধুবর রামসিংহ কালামালার সঙ্গে পরামর্শ হলো আর ওঁর সঙ্গে আগে বাবা বসাখা সিংহের জন্মগ্রাম দাদের-এ যাওয়া স্থির হলো। ১৬ তারিখ সকাল ছটার সময়ই আমরা তরনতারনের গাড়িতে বসলাম। তরনতারনও শিখদের একটা তীর্থস্থান, ভাল একটা মফস্বল শহর এবং ম্যুনিসিপ্যালিটি, কিন্তু রাস্তাগুলো আর গলিগুলো সেরকমই নোংরা, যেরকম অন্য শহরগুলো। আমরা দেড়টাকায় সিরহালী যাওয়ার টাঙ্গা ঠিক করলাম।

সিরহালীতে পুলিশ-থানা আছে, পাশে কিলানুমা সরাই। ৪০ বছর আগে যেরকম ছিল পাঞ্জাবে ইংরেজের শাসন যেরকম ছিা সেরকমই আছে, গ্রামে দারোগাদের দাপট লাটসাহেবের থেকে কম নয়।

টাঙ্গা থেকে নেমে আমরা হাঁটতে লাগলাম। সিরহালী খুব বড় গ্রাম, আর সবচেয়ে বড় বাড়ি হিন্দু মহাজনদের। 'কোমা গাতা মারু'-র বাবা গুরুদত্ত সিংহের এটাই জন্মভূমি। গাঁয়ের থেকে বেরিয়ে আমরা খেতের রাস্তায় গেলাম। এখানকার মাটি খুবই উর্বরা। খেতগুলো তেমন বড় বড় নয়, বাকি সব জিনিসই বড় বড়—মোষ বড় বড়, গরুও বড়, স্ত্রীলোকও বড়, পুরুষরাও বড়। এক জায়গায় আমি হালচালককে দুটো বিশাল বলদ দিয়ে হালচাষ করতে দেখলাম। সে মাঝে-মাঝে গানও করছিল। আর যখন বলদগুলো একটু ঢিলে দিচ্ছিল তখন ওদের গালাগালও দিচ্ছিল। পরে আবার নিজের গানের কলিটা গাইছিল। পাঞ্জাবের বন্ধুরা পাঞ্জাবীতে অনেক কবিতা লিখেছে। আমি কালামালাকে বললাম, 'বন্ধু, তুমি কি এমন কবিতা লিখেছ যা গাইবার জন্য এই হালচাষীও লালায়িত?' 'না, আমি লিখি নি।?' এটা আমি জানতাম, পাঞ্জাবী কবিরাও শিক্ষিতশ্রেণীর জন্যই কবিতা রচনা করতে চায়, ওঁদের এই চিন্তা নেই যে ওঁদের কবিতার প্রেমিক এই গ্রামেও বাস করে।

সিরহালী থেকে দাদের তিন মাইল। এক-দেড় ঘন্টায় আমরা ওখানে পৌঁছে গেলাম। বাবা বসাখাসিং দেখামাত্রই গলা জড়িয়ে ধরলেন। দেওলী থেকেই আমি বাবাকে জানতাম। বাচ্চাদের মতন কি সরল আর স্নিগ্ধ স্বভাব! ওঁকে অজাতশত্রু বলা যেতে পারে, যদিও শোষকদের সরিয়ে উনি শ্রমিক-কৃষকরাজত্ব কায়েম করতে চান। শত্রুরাও ওঁদের সম্মান করে থাকে। ওঁর সমস্ত জীবন কষ্ট আর যন্ত্রণার জীবন। উনি যেখানে থাকেন সেখানে প্রেমের এক বিস্তৃত পরিধি তৈরি হয়ে যায়। আমাদের জন্মগ্রামে খুব কমই সন্ত প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। তুলসীদাসও বলেছেন—

'তুলসী তহাঁ ন জাইএ, জহা জনমকো ঠাঁও।
গুন ঔগুন জানৈ নঁহী,ধরৈ পাছিলো নাঁও।।'

বাবা বসাখা সিং একজন সন্ত। নিজের গ্রামেও ওঁর বেশ সম্মান। উনি খুবই ঈশ্বর ভক্ত। কিন্তু আমার মত ঈশ্বরের শত্রু পাওয়া মুশকিল। ওঁর ভক্তির একটা বড় অংশ হলো জনসেবা। কয়েক বছর ধরে তিনি ক্ষয়রোগের রুগী। জেল থেকেও তাঁকে মৃতপ্রায় মনে করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে, ততক্ষণ ইনি নিজের প্রতিটি মুহূর্ত জনসেবায় ব্যয় করতে চান।

আমি বাবার জীবনীর নোট নিলাম। সময় বেশি ছিল না, তাই একটু-আধটু গ্রামীণ জীবন দেখলাম। অন্য প্রদেশের চাইতে পাঞ্জাবী কৃষক বেশি সুখী, এর অনেকগুলো কারণ আছে। এখানে বড় বড় জমিদার নেই, কৃষক নিজেই নিজের জমির মালিক, লোকবসতিও খুব ঘন নয়। সেজন্য লোকেদের হাতে যথেষ্ট খেত থাকে। পাঞ্জাবী কৃষক কূপমণ্ডুক নয়। সে নিজের জীবিকার জন্য সাত সমুদ্র পার হয়ে যায়। এমনিতে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের কয়েকলাখ লোক সমুদ্র পার হয়ে গেছে তবে স্বাধীন শ্রমিক হিসেবে নয়, বরং শর্তে আবদ্ধ

—১৯৪৩—

কুলী হিসেবে। ওরা যেখানে গেছে সেইখানেই থেকে গেছে। পাঞ্জাবী কৃষক স্বাধীনভাবে মজুর খাটার জন্য কানাডা পৌঁছে গেছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গেছে, মেক্সিকো, পানামা আর আর্জেন্টিনা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে ওদের নিজের গ্রামের প্রতি ভালোবাসা আছে, তাই বাড়িতে পয়সা পাঠায়, নিজেও আসে। বাবা বসাখা সিংও মজুর খাটার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সেখানে উনি নিজের খেতজমি করে নিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯১৪ সালে যখন দেশের স্বাধীনতার ডাক পড়লো, তখন সব ছেড়েছুড়ে ভারতে চলে এলেন। তখন থেকে ওঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় জেল এবং নজরবন্দী অবস্থায় কেটেছে।

সেদিন সন্ধেবেলা আমি পালোয়ান বিশনসিংকে দেখলাম। ইনিও স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের শাস্তি পেয়েছিলেন। এখন ওঁর বয়স ৬০ এর কাছাকাছি, কিন্তু আমার মন তাঁর শরীরকে দেখে ক্লান্ত হতো না। আমিও বেশ লম্বা-চওড়া তবু আমার মত তিনজন লোক বিশনসিং-এর শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ভবিষ্যত ভারতে আমাদের এখানে কি রকম পুরুষ হওয়া উচিত বিশনসিং তার একটা উদাহরণ। এখনও প্রশস্ত বুক, উন্নত কাঁধ, সিংহের মত বড় বড় থাবা জানান দিচ্ছিল যে সেই শরীরে কতটা শক্তি রয়েছে।

১৭ তারিখ আবার আমরা ঐ পথ দিয়েই তরনতারন এলাম আর ওখান থেকে লরিতে বসেই অমৃতসরে পৌঁছে গেলাম।

বাবা মোহনসিং ভকনাও অমৃতসরে এসে গিয়েছিলেন, ওঁর জীবনের নোট তো আমি ওখানেই নিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে নিজের বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে ছাড়তে চাইছিলেন না।

১৮ অক্টোবর আমরা দুজনে স্টেশনে নামলাম, আর ওখানে থেকে দু মাইল হেঁটে ভকনা পৌঁছলাম। এক বিরাট পৈতৃক সম্পত্তি ধর্মের নামে উড়িয়ে দিয়ে বাবা মোহনসিংও মজুর খাটার জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন। আমেরিকায় উনি জানতে পারলেন স্বাধীন দেশে জন্মাবার আনন্দ কি জিনিস। উনি ওখানকার ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার ধ্বনি তুললেন, বিদ্রোহ পার্টি কায়েম করলেন, যার প্রথম সভাপতি তাঁকেই করা হয়েছিল। শেষ বলিদান দেওয়ার জন্য উনি ১৯৩৪-এ ভারতে এলেন এবং ফাঁসিকাঠ থেকে নেমে অন্যান্য সঙ্গীদের মত নিজের জীবনের বেশির ভাগটা জেলগুলোতে কাটালেন। দেওলীতে আমি দেখতাম যে কোমর বেঁকে গেলেও বাবা কত পরিশ্রমী ছাত্র বলে নিজেকে প্রমাণ করছেন। বাবার চার পুরুষ ধরে বংশে একটি সন্তান থাকছিল। এখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বংশও শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একে শেষ হওয়া বলা উচিত নয়, উনি নিজেকে এক বিশাল বংশে মিলিয়ে দিয়েছেন। গ্রামের ভেতরের বাড়িটা উনি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। আর থাকবার জন্য নিজের জমিতে একটা বাড়ি করে দিয়েছেন। এই খেতটাও উনি পার্টিকে লিখে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। পাঁচ-ছয় ঘন্টা থাকার পর আমি সন্ধের ট্রেন ধরলাম এবং সেদিন রাতেই লাহোর পৌঁছে গেলাম।

আট-নয় বছর পর আমি এবার লাহোরে এলাম। লাহোর দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে। আমার ছাত্রজীবনের সময় এখানে ইংরেজ কোম্পানির বড় বড় দালান ছিল না, কিন্তু এখন

তো চৌরঙ্গীর মতন বাড়িঘর দেখা যায়। আমি লাহোর গিয়েছিলাম কিছু জীবনীর জন্য। সেই কাজ তো হয়ে গেল, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বাকি ছিল। পণ্ডিত বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী বৈদিক কোষের যে কাজটা হাতে নিয়েছিলেন, সেটা বেশ বড় আকার ধারণ করেছে। বৈদিক সাহিত্যের গবেষণা ওঁর এক চিরস্মরণীয় কীর্তি হয়ে থাকবে। উনি এম· এ·-তে এত নম্বর পেয়েছিলেন যা তাঁর আগে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ পায় নি। শাস্ত্রী পাশ করার পর বিলেতে গিয়ে পড়ার জন্য উনি বৃত্তি পাচ্ছিলেন। ওখান থেকে ফিরে এক পাক্কা সাহেবের মত আরামের জীবন কাটাতে পারতেন, ছেলেপুলেতে ঘর ভরে যেত, ভবিষ্যতের জন্য নিজের সূত্র রেখে যেতেন, কিন্তু যৌবনেই উনি এসব জিনিসে লাথি মারলেন আর গবেষণা এবং অধ্যয়নকে নিজের জীবনের লক্ষ্য করলেন। গবেষণা ওঁর দৃষ্টিকে বিস্তৃতি দিল। উনি নিজের সিদ্ধান্তের কাছে প্রতিষ্ঠার তোয়াক্কা করেন নি। বেদের ব্যাপারে তাঁর মতের ঔদ্ধত্য দেখে আর্যসমাজ খুব আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু তিনি তার পরোয়া করেন নি। এটা দেখে আমার আনন্দ হলো যে আমার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে অন্তত একজন তো আছেন যাঁর বিকাশ এখনো পর্যন্ত থেমে যায় নি, অর্থাৎ এখনও উনি সজীব।

২০ অক্টোবর বন্ধু বি· পি· এল, বেদী আমাকে নিজের কুটিরে নিয়ে গেলেন। লাহোর থেকে মাডল টাউন যথেষ্ট দূরে। মধ্যবিত্তদের নতুন বসতি। সেখানে লোকেরা নতুন-নতুন সুন্দর বাড়ি তৈরি করে নিয়েছে, কিন্তু বেদীর নিজের কুটির—খড়ের দেয়াল এবং খড়ের ছাদ। জমি তো ওঁর ভাইয়ের, যিনি নিজের ফকির অনুজ ও অনুজ-বধূকে ঝুপড়ি তোলার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। এই ঝুপড়িতেই বেদী ও তাঁর স্ত্রী ফ্রেডা ন বছরের ছেলে রঙ্গার সঙ্গে থাকেন। বেদীর জীবনী আমি 'নএ ভারতকে নএ নেতা'তে আগেই লিখেছি। দুজনেই অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু ওঁরা দেশপ্রেমের কন্টকাকীর্ণ পথকে আপন করে নিয়েছেন। বেদীও দেওলীতে ছিলেন। ফ্রেডাকে আমি ওখানে দেখতে পাই নি। ফ্রেডা ষোল আনা পাঞ্জাবী মহিলো হয়ে গেছে, কাপড়-চোপড় আর খাওয়া-দাওয়ায় শুধু নয়, ভাবে এবং চিন্তাধারায়ও। ওর বড় জা আই·সি· এস·-এর বৌ বিশুদ্ধ পাঞ্জাবী মহিলা, কিন্তু শাশুড়ি তাঁর ইংরেজ বউকে যতটা মানেন, ততটা তাঁর বড় বউকে মানেন না। ওঁরা যখন আয় করার পথ ত্যাগ করলেন তখন ব্যয় কম করার পথও বার করা উচিত? দুজনে নিজের জীবন খুব সাদাসিধে করে ফেলেছেন। আমি ফ্রেডাকে হাসতে হাসতে বললাম, 'লোলাকেও আমি কিছুদিনের জন্য তোমার কাছে রেখে যাবো, তুমি ওকে নিজের চেলা করে নিও আর সব রহস্য বলে দিও।' সে বলল, 'হ্যাঁ নিশ্চয়।' বেদী পাঞ্জাবী ভাষার খুব ভাল বক্তা। আমি বললাম, 'পাঞ্জাবীতে কিছু লেখো।' সে 'হ্যাঁ' বলেছে।

রঙ্গা বাপের মতই বড় সুন্দর পাঞ্জাবী কথা বলে। নিজের ক্লাশের ছেলেদেরও সর্দার। ও যে পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু—এ চিন্তাই ওর হয় না।

পরদিন (২১ অক্টোবর) লাহোরে সাহিত্যিকরা আমার সম্মানে একটা চা-পার্টি দিলেন। পাঞ্জাবী, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজির লেখকরা ওখানে জড় হয়েছিলেন। আমি সাহিত্য বিষয়ে কিছু বললাম। ডাক্তার লক্ষ্মণ স্বরূপের সঙ্গেও দেখা হলো। এবার আমি ওঁর কাছে যেতে

পারি নি, অভিযোগ করা উচিত ছিল। তবে আমি তো রাজনৈতিক চিন্তাধারার কথা মনে করেও যেতে সঙ্কোচ করছিলাম। তখনও পর্যন্ত আমি ওঁর চেহারায় বার্ধক্য দেখি নি। কিন্তু এখন তার পরিষ্কার ছাপ দেখা যাচ্ছিল।

কাশ্মীর—শের-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার জীবনী আমার আরও নেওয়ার ছিল। আমি সেই রাতেই (২১ তারিখ) রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশে রওনা হলোম। আজকালকার রেলভ্রমণে যদি দাঁড়াবার জায়গাও মাত্র পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি তো বসার জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। রাতে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে গেলাম।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে কাশ্মীর যাওয়ার মোটর গাড়িতে একটা সিটের ভাড়া ৫৫ টাকা, কিন্তু এখন লোকেরা পাহাড় থেকে সমতলে নামছিল। অক্টোবরের শেষে কে আর পাহাড়ে যায়? লরিতে গেলে আরও ১০ টাকা কম পড়তো। কিন্তু পথে আরও দুদিন কাটাতে হতো। তাই আমি ২৫ টাকা দিয়ে মোটরে বসলাম। প্রথমে অনেক দূর পর্যন্ত সমতল এলাকা ছিল, তারপর এলো পাহাড়। রাস্তার থেকে কিছুটা দূরে মারী। ড্রাইভার তবু সওয়ারীর জন্য ওখানে গেল। সিমলা আর মুসৌরীর মত এটাও সাহেব ও মধ্যবিত্তদের হাওয়া বদলের স্থান। কোনো সওয়ারী পাওয়া গেল না। কিন্তু যাক, আমিতো মারী দেখে নিলাম।

কয়েকটা সংকীর্ণ উপত্যকা (ডাঁড়া) পার হয়ে আমরা ঝিলম নদীর উপত্যকায় এলাম। কিছু দূর পর্যন্ত সীমান্তরেখা ধরেও হাঁটতে হলো। তারপর একটা পুল পার হয়ে কাশ্মীরের রাজত্বে প্রবেশ করলাম। দোমেল-এ চুঙির লোকরা জিনিসপত্র দেখলো। আমার কাছে কোনও জিনিসই ছিল না। সামনে সফেদা এবং বিরির পাতাগুলো হলোদ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল—শীত এসে গিয়েছিল।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর ১৯৮ মাইল। ৩৩ মাইল থাকতে বারামূলা এলো। এটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫২০০ ফুট (এক মাইল) ওপরে অবস্থিত। এখন রাস্তার দুধারে সফেদার সারি ছিল। কোথাও কোথাও সফেদা গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন চারাও গজিয়ে গিয়েছিল। আমরা এখন কাশ্মীরের বিস্তৃত উপত্যকায় ছিলাম। এখন তো চিনারের পাতাও আগুনের মত লাল বর্ণ হয়ে ঝরে যাচ্ছিল। সেজন্য সবুজের সৌন্দর্য আর কোথায় দেখতে পেতাম? কিন্তু দ্বিতীয়বার গ্রীষ্মের যাত্রায়ও আমি অনুভব করেছিলাম যে এখানকার নগ্ন পর্বতের এমন এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে, যার সুষমার বর্ণনা দিতে লোকে কখনও ক্লান্ত হয় না।

সন্ধেবেলা আমি শ্রীনগরে পৌঁছে গেলাম। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে জম্মু-কাশ্মীরের জাতীয় কনফারেন্সের হেডকোয়ার্টার মুজাহিদ-মঞ্জিলে পৌঁছে গেলাম। ফোন করে জানতে পারলাম যে শেখসাহেব শহরেই আছেন। আমার শ্রীনগরে দেখার কিছু ছিল না। এর আগের দুটো যাত্রায় আমি যথেষ্ট দেখে নিয়েছিলাম।

পরদিন (২৩ অক্টোবর) শিকারা (ছোট নৌকো) করে আমি মীরা-কাদাল গেলাম। শেখ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। পরের দিন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ

করলেন। এই সময়ে লোকেরা দ্রুত নীচে চলে যাচ্ছিল। বাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছিল। বাস করার নৌকোগুলো খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু শীত সহ্য করতে এখানে কেই বা রাজি ছিল? এই দুর্মূল্যের বাজারেও মিষ্টি মিষ্টি নাসপাতি খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল।

২৪ অক্টোবর আমি শেখ সাহেবের বাড়ির দিকে চললাম। ওঁর গ্রাম সৌরা এখন শহরের অংশ হয়ে গেছে কিন্তু সেটা ছ মাইল দূরে। পথে নৌশেরা পড়ল—সুলতান জয়নাল আবেদীন একে নিজের রাজধানী করেছিলেন। সৌরাতে শাল তৈরি করার কারিগর এবং কৃষক-মজুররা থাকে। খেত খুবই কম। শেখ আবদুল্লাকে খুব সমস্যার মধ্যে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি আলিগড় থেকে এম·এস·সি· করেছেন। ছোটোখাটো একটা সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু মানুষের দারিদ্র্য ও অসম্মান দেখে উনি নিজের কথা ভুলে গেলেন। মানুষের অধিকারের জন্য একটু জিভ নাড়তেই উনি রাজার বিরাগভাজন হলেন। এরপর ওঁর জীবন রাজনৈতিক সংঘর্ষের জীবনে পরিণত হলো। কয়েক শতাব্দী ধরে যাদের ভীতু মনে করা হয় এমন কাশ্মীরীদের মধ্যে উনি প্রাণ সঞ্চার করলেন। রাজ্য সরকার গুলি চালাল। লোকদের জেলের ভেতর পুরে দিল। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হলো না। শেখ আগে মুসলমানদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু লড়াই বলে দিল যে সব মেহনতি মানুষের দুঃখ একইরকম। আজ উনি কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু-মুসলমানদের প্রিয় নেতা।

অজয় ঘোষ বারামূলায় ছিলেন, সেইজন্য ২৫ অক্টোবর আমাকেও এসে ওখানেই থাকতে হলো। মেহমুদের স্ত্রী ডাঃ রশীদাও এখন এখানেই ছিলেন। আমার অজয়ের জীবনীর নোট নেওয়ার ছিল। ব্যস, এইটুকুর জন্যই ওখানে উঠেছিলাম।

২৬ তারিখ দেখলাম যে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার লরি পাওয়া মুশকিল। সেজন্য এবটাবাদের লরি ধরলাম। ড্রাইভার ছিল পাঠান। খুব ভালো লোক। দোমেলের পুল থেকে রাস্তাটা আলাদা হয়ে গেছে। আমরা মুজঃফরাবাদ (২২০০ ফুট) হয়ে সন্ধেবেলা রামকোট (২৫৭৮ ফুট) পৌঁছলাম। এখানেই সীমান্তপ্রদেশ—কাশ্মীর সীমান্ত।

এখন আমরা হাজারা জেলায় প্রবেশ করলাম। কুনহার নদীর ধারে গড়ীহবিবুল্লা ভালো বসতি। এখন পাহাড়ে কিছু দূর পর্যন্ত আমরা জঙ্গল পাই নি। কিন্তু সামনে চড়াই পড়ল। পাহাড়টা পাইনের জঙ্গলে ঢাকা ছিল। এখন রাত হয়ে গিয়েছিল। মানসহরাতে আমাদের থামতে হলো। হোটেলে থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। দাম যখন সস্তা তখন ঘরের সাজসজ্জা আর পরিচ্ছন্নতা দেখার দরকার নেই।

দ্বিতীয় দিন (২৭ অক্টোবর) আমরা সকালেই এবটাবাদে পৌঁছে গেলাম। ওখান থেকে অন্য লরি পেলাম আর উৎরাইতে নামতে নামতে হাবেলিতে পৌঁছে গেলাম।

এখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি ট্রেনও যায়, কিন্তু আমি লরিতে যাওয়াই পছন্দ করলাম। এখন সমতলভূমি ছিল। অন্যান্য জায়গার তুলনায় এ এলাকার লোকেদের ফলের বেশি শখ। হরিপুরের বাইরে অনেকগুলো বাগান ছিল। আর এখন তো ওখানে আমাদের পেয়ারাও পৌঁছে গেছে। হাসানআব্দাল (পাঞ্জা সাহেব) পৌঁছে আমরা হাওড়া-পেশোয়ারের বড় রাস্তা ধরলাম। লরিতে খুব ভিড় ছিল। জায়গায় জায়গায়

সৈন্যরা ছিল। মিলিটারি গাড়ি এবং লরিগুলো এদিক-ওদিক দৌড়চ্ছিল। পাশ দিয়ে তক্ষশিলা চলে গেল। দুপুরের পর আমরা রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে গেলাম এবং তিনটের গাড়ি ধরে দিনেদিনেই লাহোর।

আজ দীপাবলী কিন্তু খুব কম বাড়িতেই প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। দেশের বড় বড় নেতারা যখন জেলে পচছিলেন, তখন কে আর প্রাণ খুলে দীপাবলী পালন করতো?

২৯ অক্টোবর সন্ধেবেলা প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হলোম। লক্ষ্ণৌতে গাড়ি পালটে ৩১ অক্টোবর সূর্যোদয়ের আগেই প্রয়াগ পৌঁছে গেলাম।

প্রয়াগে (৩১ অক্টোবর—৯ ডিসেম্বর)—সবার আগে আমার 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা' শেষ করার কথা। এর জন্য প্রয়াগে জমিয়ে বসতে হলো। এটা লিখতে লিখতে প্রুফও দেখতে থাকি।

২০-২১ নভেম্বর কানপুর প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘেও যেতে হলো। প্রেসের কাজও ভীষণ ঝঞ্ঝাটের। অন্যান্য পেশার লোকদের মত প্রেসের লোকেরা খুব মুশকিলের সঙ্গে কথামত কোনো কাজ করে থাকে। 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'-তে আমি বিয়াল্লিশটা জীবনী দিয়েছি। নভেম্বরের মধ্যেই বইটা ছাপা হওয়ার আশা ছিল কিন্তু ১০ তারিখে আমি যখন বেনারসের দিকে রওনা হলোম, তখনও দুটো জীবনী বাকি ছিল।

বেনারসে ৪ দিন থাকলাম। যেখানে-সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম। যুদ্ধ সম্পর্কে লোকেরা অনেক কথা বলছিল। আগে যখন সোভিয়েতের অপরাজেয়তার কথা বলতাম তখন লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে শুনতো, কিন্তু এখন সোভিয়েতের জয় ওদের সম্মুখেই হচ্ছিল। লালসেনা যে দুর্দান্তভাবে স্তালিনগ্রাদে জার্মানদের হারিয়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে তারা আর শত্রুদের নিঃশ্বাস নিতে দেয় নি। সারা বছরটা ছিল লালসেনাদের বিজয়ের বছর।

১৫ ডিসেম্বর এগারোটায় দিনের বেলার গাড়ি ধরলাম। প্রথমে তো ভালো খোলামেলা জায়গা পাওয়া গেল। সারনাথ থেকে ভরতে আরম্ভ করলো। ঔড়িহারে আরও ভরে গেল। গাজিপুরে ভিড় হয়ে গেল। বালিয়াতে ধাক্কাধাক্কি আর ছাপরায় পৌঁছে এমন অবস্থা হলো যে কাছারি স্টেশনে যাওয়ার চিন্তাই ত্যাগ করলাম এবং এখানেই নেমে রিক্সোয় করে পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদীর বাড়ি গেলাম।

কলেজ হয়ে যাওয়ায় ছাপরার চিন্তাজগতে অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে আর সেটা শিক্ষার্থীদের জন্যই। এমনিতে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট উকিল তো প্রথম থেকেই ছাপরাতে থাকতেন। তবে ওকালতির পেশাটা খুবই হৃদয়হীন পেশা। আজকের সমাজে তার খুব দরকার আছে, কারণ বিশাল বৈষয়িক সম্পত্তি রক্ষার ভার তার ওপর। কিন্তু আসলে ওটা প্রতিভাবানদের কবর তৈরি করার কাজেই লাগে।

জানতে পেরে শিক্ষার্থীরা আসতে আরম্ভ করলো আর জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং সাহিত্য নানান বিষয়ে কথাবার্তা চলতে থাকলো। আমি 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'-এ লিখেছি যে আমাদের ন্যায়-বৈশেষিকরা অনেক কিছু কথা গ্রিক দার্শনিকদের কাছ থেকে নিয়েছে। এই

বিষয়ে আমি কলেজের ছাত্রদের সামনে বললাম। হয়ত পঁচিশ বছর আগে বললে এর অনেক বিরোধ হতো। কারণ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে যে নবজাগরণ হয়েছিল, তার একটা অর্থ এও করা হত যে ভারতবর্ষ সর্বদা পৃথিবীকে শিখিয়েছে, সে কারও থেকে কিছু শেখে নি। কিন্তু এখানে বিরুদ্ধতার ক্ষীণ রব উঠলো। আর তাও এই ভুল ধারণাটা নিয়ে যে আমি ভারতের সমস্ত দর্শনকে গ্রিসের অবদান মনে করি। আমি তো এটাই বলতাম যে ভারতবর্ষ আর গ্রিসের মধ্যে দর্শন নিয়ে যথেষ্ট আদান-প্রদান হয়েছে।

১৮ তারিখ পাটনা চলে গেলাম। পরদিন ওখানে খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে এক বিরাট সভা হলো, যাতে ৯ হাজার লোক একত্রিত হয়েছিল। বছরখানেক আগে যখন কম্যুনিস্ট বন্ধুরা অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদি রোজকার সমস্যা নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল তখন লোকেরা এটাই ভাবতো যে কিছু হবে-টবে না, অযথাই এই তরুণরা নিজেদের সময় নষ্ট করছে। কিন্তু আজ সবাই নবযুবকদের প্রশংসা করছিল। লীগ, কংগ্রেস, হিন্দুসভা সব চিন্তাধারার লোকই জড় হয়েছিল। ওদের দাবি এবং ওদের স্বর এত লঘু ছিল না যে সরকার তা উপেক্ষা করে। লোকেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল।

একদিন শ্যামবাহাদুর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি শীতের সময় যখন জয়সওয়ালজীর কাছে যেতাম, তখন শ্যামবাবুর সঙ্গে রোজই দেখা হয়ে যেত। খুবই সরল এবং সজ্জন ব্যক্তি। ১০ বছরের মধ্যেই কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। বার্ধক্য আর প্রমেহ মিলে ওঁকে একশো বছরের বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে। জীবনের প্রতি বিরক্ত ছিলেন—বাগানের আমেরও একদিন ঝরে যাওয়ার সময় আসে। বয়স হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি বেশিরভাগ নিজের সমবয়সী এবং বৃদ্ধদের দিকে পড়ে, আর সে তাদের মধ্য থেকে কাউকে আজ কাউকে কাল মরতে দেখে। সেজন্য তার মানব-জীবনের একদিকেরই চেতনা হয়, যার থেকে কেবলই হতাশা বারোমাস নতুন নতুন রূপে দেখা দেয়। কিন্তু মানব-উদ্যানে কেবল হল্যোদ হয়ে যাওয়া খসে পড়া আমই থাকে না বরং বারোমাসেই নতুন নতুন মঞ্জরি এবং নতুন মুকুল ধরতে থাকে। যদি মানুষ ওদিকে দৃষ্টি দিত তাহলে সে আশাবাদী হতো। কিন্তু এটা তখনই হতে পারে যখন মানুষ পরবর্তী প্রজন্মের লোকেদের বাপ-ঠাকুর্দা হবার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে অভিন্ন সৌহার্দ এবং সহৃদয়তা স্থাপন করবে।

২৫ তারিখ ছাপরা হয়ে বেনারসে ফিরে এলাম। এ বছর ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স (প্রাচ্য পরিষদ) এখানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হবার কথা ছিল। সেজন্য ভালো ততদিন এখানেই থাকা স্থির করলাম।

ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপের কুটির হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই ছিল। সেজন্য থাকার ভালো ঠাঁইই ছিল। সামনেই পণ্ডিত সুখলালজী থাকতেন। সেখানে গুজরাটী-জৈন খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। বই লিখবার বা প্রুফ দেখার ঝামেলা ছিল না। ফলে আলাপ-আড্ডা কালক্ষেপণের ভালো উপায় ছিল। মুনি জিনবিজয়জী সম্প্রতি এখানেই উঠেছিলেন। কাশ্যপজীর চীন যাওয়ার ডাক এসেছিল কিন্তু উনি যাওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা করছিলেন। কখনও বলতেন যে ওখানে জাপানীদের বোমা পড়ছে। কখনও

অন্য কোনও অজুহাত দেখাতেন। আমি এরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য অনেক বোঝালাম কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে মহাদেববাবা নড়ে-চড়ে বসবেন। সারনাথ যাওয়া-আসার জন্য নিজের পরিকল্পনা মাফিক উনি একটা রিকশা তৈরি করিয়েছিলেন, যাতে বসার জায়গাটা ইচ্ছে করে এক তৃতীয়াংশ কম করিয়েছিলেন। এটা স্থূলত্ব কম করার জন্য হতে পারে না। বোধহয় অন্য কেউ যাতে সঙ্গে না বসে এই চিন্তাটাই কাজ করে থাকবে, কিন্তু বড় বড় রিকশাতেও খুব কম লোকই ওঁর সঙ্গে বসতে রাজি হবে। আর রিকশার দুটো ধারই এত উঁচু করে দিয়েছিলেন যে যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়, তাহলে লোকে লাফ দিয়ে পালাতেও পারবে না। কাশ্যপজী দার্শনিক, আর দার্শনিকের পক্ষে সব সম্ভব কিন্তু আমার বাস্তববুদ্ধি এটাকে বিবেচনাপ্রসূত কাজ বলে ভাবতে পারছিল না।

একদিন অস্‌সিতে আমি পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের পত্নী শাস্ত্রী সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সবে বসেছি কি পুলিশের লোক এসে হাজির। সে নাম-ধাম জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো। কিন্তু আমি তো দাগী চোর ছিলাম সেজন্য ওসব খবর দিলে কিই বা ঝামেলা হত? হ্যাঁ, এটা নিশ্চিতই জানতে পারলাম যে পুলিশ এই বাড়িটাকে ফাঁদে ফেলার জন্য ছিপের মতন ব্যবহার করছে।

৩০ ডিসেম্বর প্রাচ্য-পরিষদের জন্য পণ্ডিতরা আসতে আরম্ভ করলেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, ডক্টর সুকুমার সেন এবং আরও কত পণ্ডিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

৩১ সয়াজী গ্রন্থাগারের বিশাল হলে দ্বাদশ প্রাচ্য পরিষদের সম্মেলন হলো। এতে কার সন্দেহ আছে যে স্যার রাধাকৃষ্ণণ সুবক্তা। কিন্তু সেইসঙ্গে হিন্দুদের লাঠি পেটানো ওঁর স্বভাব। সেইভাবেই উনি আবোলতাবোল বলে গেলেন। এরপর দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ নিজের লিখিত বক্তৃতা পড়ে পরিষদের উদ্‌ঘাটন করলেন। লক্ষ্মীর বাহন হওয়া ছাড়া ওঁর আর কি গুণ ছিল যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের এই সম্মেলন উদ্বোধনের ভার ওঁকে দেওয়া হলো? ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা উনি খুব গাইলেন। লোকেরা না শুনে কি করবে?

সন্ধেবেলা সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। সেই সময়ই জানতে পারলাম যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বালকৃষ্ণ মিশ্রর দেহাবসান হয়েছে—সংস্কৃতের এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত চলে গেলেন।

১৯৪৪-এর ১ জানুয়ারি থেকে পরিষদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার বৈঠক হতে লাগল। ডক্টর আলটেকার একটি প্রবন্ধ পড়লেন যাতে উনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, কুষাণদের হাত থেকে মধ্যপ্রদেশকে মুক্ত করার গৌরব গুপ্তদের নয়, যৌধেয়দের। 'ভোলগাসে গঙ্গা' লেখার সময় যখন আমি 'সুপর্ণ যৌধেয়' নামে গল্পটা লিখেছিলাম, তখন থেকেই মাথায় এই চিন্তা ঘুরছিল যে মহাশক্তিশালী যৌধেয়দের ওপর একটা উপন্যাস লিখব। এখন সেটা লিখবার সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হলো।

পাসপোর্টের আবর্তে, ১৯৪৪

৩ জানুয়ারি আমি প্রয়াগ পৌঁছলাম। বোম্বাইয়ের চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে সরকার পাসপোর্ট দিয়ে দিয়েছেন। ৭ তারিখ আমি বোম্বাই পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে সরকার আফগানিস্তানের পথে নয়, কেবল ইরানের পথে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই শর্তও জুড়ে দিয়েছে যে যতক্ষণ না ইরান এবং সোভিয়েতের ভিসা পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পাসপোর্ট ব্যবহার করা যাবে না (Not available for the Union of Socialist Republics and Iran without visas from the respective consul offices)।

এটা পাসপোর্ট দেওয়া নয়, খেলা করা। সোভিয়েত কনসুলেট ভারতে নেই। তাহলে এখান থেকে কি করে ভিসা পাওয়া যাবে? ইরানে সোভিয়েতের কন্‌সাল্ আছে আর বোম্বাইয়ে ইরানের কন্‌সাল্ আছে। কিন্তু তাকে লিখে দেওয়া হয়েছিল যে সোভিয়েতের ভিসা না দেখে ইরানের ভিসা দেবে না। তাহলে এর মতলবটা কি? এতো পাসপোর্ট দেওয়া আর না দেওয়া সমান হলো। সরকার আফগানিস্তানের পথে ভিসা বোধহয় এইজন্য দেয় নি যে ও দেশটা ইরানের মত তার মুঠোর মধ্যে নেই। সরকারের নিয়মরীতি বোঝা গেল। বৌ-বাচ্চার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য একটি মিত্রদেশে যেতে দিতে আপত্তি করে সে দুনিয়ার বদনাম কিনতে চায় না, আবার সে এটা চায় যে আমি যেন ভারতের বাইরে না যেতে পারি।

১৩ জানুয়ারি আমি ভারত সরকারকে চিঠি লিখলাম যে পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রাখা হয়েছে ওগুলো মেনে আমি সোভিয়েতে যেতে পারব না। সেজন্য আমাকে আফগানিস্তানের পথে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক অথবা ইরানের ভিসা নেওয়ার আগে যেন সোভিয়েতের ভিসা নেওয়ার শর্ত না দেওয়া হয়। এই পাসপোর্ট চারমাস পর পাওয়া গিয়েছিল। তাতে এটাই মতলব ছিল যে আবার লেখালেখিতে কয়েক মাস নষ্ট হোক।

গোয়ালিয়রে (১৫-১৮ জানুয়ারি)—গত বছরেও গোয়ালিয়র ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রসংসদ সভাপতি হবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। তখন তো যেতে পারি নি, কিন্তু এবার যেতে রাজি হয়েছিলাম।

১৪ জানুয়ারি পাঞ্জাব মেল ধরলাম। পরদিন ট্রেন স্টেশনে পৌঁছোল। 'সুমন'জী আর অনেক ছাত্রদের সঙ্গে প্রিন্সিপাল পিয়ার্সকে পেলাম। পিয়ার্স মশাইয়ের নামের সঙ্গে আমি আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম। উনি সিলোনেও থেকেছেন কিন্তু এর আগে আমি ওঁকে দেখি নি। আমি এটা জানতাম যে উনি সেই ইংরেজদের মধ্যে পড়েন যারা ভারতীয়দের সঙ্গে বৈষম্য রাখার বিরোধী। উনি তো এক ভারতীয় মহিলাকে বিয়ে করে তার বাস্তব

পরিচয় দিয়েছেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কথা হতে লাগল। রাতে কবি-সম্মেলন হলো। 'নেপালী', 'সুমন' এবং অন্যান্য অনেক কবিরাও কবিতা পাঠ করলেন। শ্রোতারা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলো। আমি হোস্টেলে উঠেছিলাম। ছাত্রেরা আমার সময়ের যতটা খুশি সদ্ব্যবহার করুক আমি তাতে বাধা দিতে চাই নি। সারাদিন কোনও না কোনও বিষয়ের আলোচনা চলতে থাকতো।

সন্ধেবেলা ছাত্রসংসদ (কলেজ ইউনিয়ন)-এর বার্ষিক অধিবেশন ছিল। ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের কাজ আমায় করতে হলো। তারপর কিছু বলতেও হলো। তারপর চা-পান এবং চিত্তবিনোদনের প্রোগ্রাম ছিল। কোনও অশিষ্ট রসিকতা ছিল না কিন্তু কয়েকজন ভদ্রলোক এক-আধটা রসিকতাও পছন্দ করলেন না। যাই হোক, আজ আমরা যুগ-সংক্রান্তিতে আছি। এখানে অতীত ও বর্তমানের দুটো মানদণ্ড বিদ্যমান। কয়েকটা ব্যাপারে অতীতের মানদণ্ডের সঙ্গে বিরোধ হোক এটা স্বাভাবিক।

রাত্রিবেলা আবার কলেজ হলে সভা হলো। 'সাংস্কৃতিক ঐক্য'-র বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যাতা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মত ব্যক্ত করলেন। আমিও কিছু বললাম।

১৭ জানুয়ারি গোয়ালিয়রের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার ছিল। পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ গর্দে মশাই এবং প্রিন্সিপাল পিয়ার্স আমাকে সঙ্গে নিয়ে দেখাতে চললেন। গোয়ালিয়র (গোপগিরি)-এর দুর্গ খুব পুরনো। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এখানে কোনো সামন্ত রাজার রাজধানী ছিল। দুর্গটি পাহাড়ের ওপরে অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত। চিতোরের মত এখানে প্রাচীন মন্দির অনেক আছে। তবে সেই সময়কার মূর্তিগুলিকে ভেঙেচুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তেলীর মন্দির বাস্তুকলা এবং ভাস্কর্য উভয় দৃষ্টিতেই অত্যন্ত সুন্দর। সম্ভবত এটা নবম শতাব্দীর। এবং চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈলপ এটা নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাহলে এর সময়টা দশম শতাব্দী হবে। ভোজ-এর কাকা মুঞ্জকে তৈলপ পরাজিত করেছিল এবং সে-ই রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় কর্ককে পরাস্ত করে সেই বংশের উচ্ছেদ ঘটায়। এখানে মূর্তিগুলি দেয়ালের গায়েই রয়েছে। সব মূর্তিরই অঙ্গগুলো ভাঙা। মন্দিরে এখন কোনও মূর্তি নেই। শাশুড়িবউ-এর মন্দির স্থাপত্যের বিচারে ভালো, তবে তৈলপ মন্দিরের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না।

ওখান থেকে আমরা রাজা মানসিংহের মহল দেখতে গেলাম। এই মহল পঞ্চদশ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের এই স্বাধীন রাজা বানিয়েছিলেন। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের বাড়িগুলি দেখলেও বোঝা যায় সেগুলিতে আজকের বাড়িঘরের মত আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা নেই। এখানকার রানীদের ঘরগুলি তো জেলের অন্ধকার কুঠরির মত। এমনিতে ঘরগুলির স্থাপত্য মন্দ নয়।

নীচে নেমে পুরনো গোয়ালিয়র হয়ে মিউজিয়ামে গেলাম। এটি একটি পুরনো মহলের মধ্যে অবস্থিত এবং গর্দেজীর অক্লান্ত পরিশ্রমের এটি একটি প্রমাণ। সংগ্রহ অল্প কিন্তু খুবই ভালো। সেগুলো ক্রমানুসারে রাখার জন্য অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। রাতে গোয়ালিয়র রাজ্যের ছাত্রসঙ্ঘের অধিবেশন ছিল। সাম্যবাদী রাজ্যের প্রভাব ছাত্রদের ওপরে পড়েছে, কৃষকসভার ওপরে পড়েছে এবং মজদুরদের ওপরেও তার প্রভাব

পড়েছে। আর এটা কি করে সম্ভব যে সাম্যবাদের অগ্রগতির প্রভাবকে সমস্ত লোকই পছন্দ করবে? প্রবন্ধক খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু বিরোধী লোকজন গোলমাল করার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। অধিবেশন শুরু হলো। আমি বক্তৃতা দিলাম। কেউ কিছু বলে নি। এরপরে লোকেরা বড় বড় প্রস্তাব পাঠ এবং সেগুলির ওপর লম্বা লম্বা স্পিচ দিতে শুরু করলো। শ্রোতারা তো এজন্যে আসে নি, ওরা এসেছিল বাইরের বক্তাদের ভাষণ শুনতে। সংঘের লোকদের উচিত ছিল তাদের প্রস্তাবগুলো প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পাস করিয়ে নেওয়া। এক-আধটি প্রস্তাবে লোকদের বোঝানোর জন্য এক-আধটি ভাষণও যদি হতো তাতেও ক্ষতির ছিল না। কিন্তু সভার লোকেরা 'রাহুলজী গো-ভক্ষক, সে হিন্দুদের শত্রু' ইত্যাদি ইত্যাদি বলে লোককে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছিল যদিও তাতে কোনো ফল হয়নি। রাহুলজী এখানে সভায় বলছিলেন তবুও ওদের গণ্ডগোল করার সাহস হয় নি। কেননা তারা জানতো যে শ্রোতারা কেউ তাদের সমর্থন করবে না। কিন্তু যখন বড় বড় প্রস্তাব এবং লম্বা লম্বা ভাষণ শুনতে গিয়ে জনগণ বিরক্ত হয়ে ওঠে তখন দশটি লোকই সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। অধিবেশনের সভাপতি ডঃ রামবিলাস শর্মা যেই বলার জন্য উঠে পড়ে, অমনি আট-দশটি লোক চেঁচাতে শুরু করে। জনসাধারণ তটস্থ হয়ে তামাশা দেখতে থাকে। প্রস্তাব তো পাস হয়ে গেল, কিন্তু অধিবেশন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলো না।

১৮ জানুয়ারি একই দিনে আমার চার জায়গায় ভাষণ ছিল। আমিও ভাবলাম, যতটা খুশি কাজে লাগিয়ে নাও। সকালে মুরার-এর আর্যসমাজ মন্দিরে সম্মেলন হলো। এখানে ভাষণ নয়—বিপদ কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে এক-দেড় ঘণ্টা সৎসঙ্গ চলতে থাকল। আমি বললাম কেন আমাদের সমাজে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। তারপর মুরার হাইস্কুলের ছাত্রদের সামনে 'সোভিয়েত শিক্ষা' বিষয়ে ভাষণ দিলাম। ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকরা সেটা বেশি পছন্দ করলেন। তার কারণ শিক্ষিত শ্রেণীর জীবন আজকের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে চিন্তাপূর্ণ।. যাওয়ার পর সার্বজনিক সভাভবনে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সার্বজনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বার্তালাপ চলতে থাকল।

সন্ধে সাতটায় হিন্দি সাহিত্যসভার পক্ষ থেকে 'তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য' বিষয়ে ভাষণ দিলাম। এখানে শিক্ষিত ব্যক্তি এবং সাহিত্যিকরাও ছিলেন।

সেই রাতেই দিল্লীর উদ্দেশে আমার রওনা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তেল-ঘি খাওয়ার ফলে পেট খারাপ হয়ে গেল। কয়েকবার পায়খানা হলো এবং আজ 'সুমন'-এর বাড়িতে থেকে যেতে হলো। 'সুমন' হিন্দির এক তরুণ কবি। তার কাছে হিন্দির প্রত্যাশা অনেক।

১৯ তারিখ রাতে আমি পেশোয়ার এক্সপ্রেসে দিল্লীর উদ্দেশে রওনা হলাম।

দিল্লীমে (২০-২৩ জানুয়ারি)—সকাল সাতটাতেই আমাদের গাড়ি দিল্লী পৌঁছে গেল। পাসপোর্টের জন্য একটু চেষ্টা করতে চাইলাম কিন্তু আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে জানা গেল যে এতে কোনো লাভ হবে না। যেখানে খবর পৌঁছোয় নি, সেখানে খবর পাঠিয়ে দিলাম।

—১৯৪৪—

২৩ জানুয়ারি দিল্লীর পার্টি-কনফারেন্স হলো। দিল্লীতে কম্যুনিস্টদের শক্তি প্রথম যাত্রায় যা দেখেছিলাম এখন সেটা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। পার্টি-মেম্বারও বেশি ছিল এবং যজ্ঞদত্ত এখন একা ছিলেন না। ফারুকী, বহাল সিংহ এবং অন্য অনেক কমরেড প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। দিল্লীর ন-দশ হাজার মুনিমদের জোরদার সংগঠন ছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্ত মুনিম পার্টিকে নিজের পার্টি বলে মনে করত। মেয়েদের মধ্যে সরলা খুব চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। মিল-শ্রমিকরাও পার্টির কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। সকালে পতাকা উত্তোলনের কাজ আমাকে দেওয়া হলো। সন্ধে সাতটায় যখন সভা শুরু হলো, তখন বৃষ্টি পড়তে লাগল।

কিন্তু পাঁচ-ছ হাজার শ্রোতা বরাবর জমে রইল। সাজ্জাদ জাহীরের কলমের রত্নকে তো আমি দেখেছিলাম। কিন্তু উনি যে এত ভাল বক্তা সেটা এখনই জানতে পারলাম।

নটার সময় নাটক আরম্ভ হলো। সঙ্গে ভাই যজ্ঞদত্তের পত্নীকে আমি গ্রাম্য বৌয়ের বেশে নাটকে অংশ নিতে দেখেছি। সে নিশ্চয়ই এখন আগের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

আমার সবচেয়ে ছোটভাই শ্রীনাথ দিল্লীতে মিষ্টির কাজ করতো—এটা আমি জানতাম। গতবার আমি ওকে খুঁজবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাই নি। সেও সভায় এসেছিল। কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। পরের দিন আমরা সকালের ট্রেন ধরলাম।

ইন্দোর (২৫-২৮ জানুয়ারি)—যথেষ্ট বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সন্ধে পর্যন্ত বৃষ্টি আর বৃষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলাম। কোটা পৌছনো পর্যন্ত সূর্যাস্ত হয় নি। মাঝরাতে ট্রেন রতলামে পৌছোল। কামরায় এত ভিড় হয়ে গেল যে বাইরে বেরনো কঠিন ছিল। ইন্দোরে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। তাতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকাল (২৫ তারিখ) আটটার সময় ট্রেন ছাড়ল। এখন আমরা প্রাচীন অবন্তী ও তার পরবর্তী মালব দিয়ে যাচ্ছিলাম। মালবকে সর্বদাই অন্নের খনি মনে করা হয়ে থাকে। এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে ওখানে কখনও আকাল পড়ে নি। ভূমি বেশিটাই সমতল। কালো মাটি জানান দিচ্ছিল যে সে খুব উর্বর। পাহাড় খুবই কম। এই সময় গম ও ছোলার খেতে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। একজন কৃষক বলছিল, 'কৃষকদের সময় ভালো যাচ্ছে। দু মণ কার্পাস থেকে ১০০ টাকা পাওয়া যাচ্ছে।' হ্যাঁ, ওদের কষ্ট থাকলে তা ছিল কাপড়ের এবং কারখানাজাত অন্যান্য দ্রব্যের। ইন্দোর ঢোকার আগে কয়েকটা কাপড়ের মিল পাওয়া গেল।

ইন্দোরে মধ্যভারত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সম্মেলনে আমার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। আমি সময়ের আগেই এসেছিলাম। আসার খবরও আমি আগে থেকে দিই নি। বারোটার সময় ইন্দোরে পৌছলাম। টাঙ্গা নিয়ে খুঁজতে বের হলাম। লাল ঝাণ্ডার কারণে বেশি ঘুরতে হয় নি। অতঃপর আমাকে কমরেড সরমণ্ডলের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। গোয়ালিয়র আর ইন্দোর দুটোই মারাঠা রাজ্য। ইন্দোর মহারাষ্ট্রের আরও কাছে সেজন্য নগরবাসীদের মধ্যে বহুসংখ্যক মারাঠী আছে। এখানে যত তরুণ কম্যুনিস্টরা আছে তার

মধ্যে মহারাষ্ট্রীরা অধিক সংখ্যায়, আমাকেও মহারাষ্ট্র পরিবারে অতিথি হতে হলো।

পরদিন (২৬ জানুয়ারি) সোভিয়েত মৈত্রী সংঘ চা-পানের ব্যবস্থা করলো। অনেক সোভিয়েত বন্ধু ওখানে একত্রিত হয়েছিলেন। ইন্দোরে প্রকাশ্য সভা নিষিদ্ধ ছিল, সেজন্য খোলাখুলিভাবে বক্তৃতা সম্ভব ছিল না। এখানে আমি সোভিয়েতের বিষয়ে বললাম। সংঘের কাছে সোভিয়েত থেকে আনা অনেক বই, ছবি ও কার্টুন ছিল। একটা বড় ছবিতে একটা খুবই ভাবপূর্ণ দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। লালসেনা পিঠের ওপর বন্দুক রেখে দিনপ্রোর (নীপার) নদীর ধারে পৌঁছে নিজের লোহার টুপি খুলে তাতে মহানদীর জল ভরে পান করছে। তার মুখের ভাবটি ছিল যেন মাতৃস্তন থেকে কয়েকমাস ধরে বঞ্চিত এক শিশু অপার আনন্দে মায়ের স্তন পান করছে। সোভিয়েতবাসীদের কাছে নিজেদের নদীগুলি খুবই প্রিয় এবং পবিত্র। দুবছর আগে নীপার মহানদী জার্মানদের হাতে চলে গিয়েছিল, আজ লালসেনা মা নীপারের তীরে পৌঁছেছে আর তৃপ্তি নিয়ে সেই পুণ্য-জল পান করছে। আমরাও গঙ্গাকে ভালবাসি কিন্তু আমাদের প্রেম সাধারণত লৌকিক, সাকার নয়।

সন্ধেবেলা মারাঠী সাহিত্য সমিতির হলে সম্মেলন আরম্ভ হলো। হলে যত লোক ধরে, ততটাই ভরে গিয়েছিল। শামু সন্ন্যাসী স্বাগত ভাষণ পাঠ করলো। আমি নিজের বক্তৃতা শোনালাম।

পরদিন সকালে আবার বৈঠক বসলো। কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া হলো আর কতগুলি প্রস্তাব পাশ হলো। দু'ঘণ্টা পরে হোলকার কলেজে ছাত্রদের সামনে সোভিয়েতের শিক্ষা-দীক্ষার ওপর বক্তৃতা দিলাম। এরকম বক্তৃতা আমি কয়েক বছর ধরেই দিয়ে আসছি কিন্তু এখন লোকে শুধু মনোযোগই নয় বিশ্বাসের সঙ্গে শোনে, কারণ লালসেনাদের বিজয় ২৫ বছরের সোভিয়েত বিরোধী নোংরা, মিথ্যে প্রোপোগাণ্ডাকে অমূলক প্রমাণিত করেছে। লোকেরা মনে করে যে সোভিয়েতে নিশ্চয়ই এমন কোনো ব্যাপার হয়েছে যাতে জারের রুশ সেনা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাতে পরিণত করেছে।

সন্ধেবেলা কারখানার শ্রমিকদের সম্মুখে বক্তৃতা দিলাম। রাতে আবার সম্মেলন শুরু হলো। আজ মূলত ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শামু ভীলদের একটা গান গেয়ে নৃত্য প্রদর্শন করলো। এই নৃত্য দলবদ্ধভাবে হয়ে থাকে। একক নৃত্যে সেই আনন্দ কি করে পাওয়া যেতে পারে? তার ওপর সেখানে কোনও বাজনাও ছিল না। তবে শামু এর গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছে। এটা দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। লোকেরা খুব পছন্দ করলো। শামু কয়েকটা পারিতোষিক পেল। সবশেষে আমার বক্তৃতার সঙ্গে সম্মেলনের সমাপ্তি হলো।

দ্বিতীয় দিন (২৮ ফেব্রুয়ারি) কানাডার প্রফেসর উইলমোন্ট দেখা করতে এলেন। কয়েক বছর ধরে উনি চীনে অধ্যাপনা করছিলেন, এখন ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন। উনি চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি কথা বললেন। আর বললেন, যে চিয়াঙ কাইশেকের সরকার চীনা কম্যুনিস্টদের দু'চোখে দেখতে চায় না। রাতে জেনারেল লাইব্রেরিতে তিব্বত সম্পর্কে বক্তৃতা দিলাম।

উজ্জয়িনীতে (২৯-৩০ জানুয়ারি)—উজ্জয়িনীর কমরেড দিবাকর নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব উৎসুক ছিল, আমিও ভাবলাম যে দশ বছরের পুরনো স্মৃতিকে আবার সতেজ করে আসি। ২৯ তারিখ আমরা দুজনে উজ্জয়িনীর জন্য রওনা হলাম। ইন্দোর যাওয়ার সময়ও ফতেহাবাদ স্টেশন পড়েছিল। এটা মালবের সব থেকে ঠাণ্ডা জায়গা মনে করা হয়। এর উচ্চতা তেমন বেশি নয় কিন্তু খুব বিস্তৃত প্রান্তর, আর এখানে বোধহয় নিরন্তর হাওয়া বইতে থাকে। দুপুরে আমরা উজ্জয়িনীতে পৌঁছলাম।

প্রফেসর প্রভাকর মাচওয়ের বাড়িতে উঠলাম। ঐ দিন পৌনে তিনটের সময় মাধব কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে সোভিয়েত সম্পর্কে বক্তৃতা দিলাম। দেখে আনন্দ হলো যে এখানে ছ-সাত হাজার হস্তলিখিত গ্রন্থের ভালো সংগ্রহ রয়েছে, যার মধ্যে ভূর্জপত্রের ওপরে শারদা[১] লিপিতে লেখা একটা ছেঁড়া বৌদ্ধসূত্রও রয়েছে। এটা সম্ভবত গিলগিট বা এরকম অন্য কোনও স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। সন্ধেবেলায় শ্রমিকরাজের বিষয়ে এক সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতে হলো। হাজার হাজার লোকের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল যে ২৫০০ শত বর্ষের প্রাচীন মহানগরী উজ্জয়িনী আধুনিক কথাবার্তা শোনার জন্য প্রস্তুত।

রাত্রিবেলা ডাক্তার নাগরের বাড়ি গেলাম। ডাক্তার নাগর বাড়িতে ছিলেন না। গঙ্গোত্রী যাত্রায় ওঁর স্ত্রীর হাতের সুস্বাদু রান্না আমি অনেকবার খেয়েছিলাম। এটা কি সম্ভব যে উনি না খাইয়ে আমাকে আসতে দেবেন? সেই যাত্রায় পরিচিত বদ্রীবাবু ও অন্যান্য সঙ্গীদের দেখা পেলাম না। সকালে মডেল স্কুলের ছাত্রদের সামনে এক বক্তৃতা দিলাম। দুপুরবেলায় টাঙ্গায় করে উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষগুলো দেখতে বের হলাম। প্রথমে শহরের বাইরে বেশ্যা টিলার দিকে গেলাম। টাঙ্গা আগেই ছেড়ে দিতে হলো। তারপর হেঁটে টিলার ওপর উঠলাম। বোধহয় এটা ভারতের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধস্তূপ—অনুরাধাপুর (লংকা)-এর রত্নমাল্য-চৈত্যর থেকেও বড়। এর পৌনে তিন ইঞ্চি মোটা ইঁটগুলো জানিয়ে দিচ্ছিল যে এটা মৌর্যযুগে তৈরি। খুব সম্ভব, ভারতের অনেকগুলো শহরে নির্মিত অশোক-স্তূপগুলোর (ধর্মরাজি কা-চৈত্য) মধ্যে এটা একটা। আর হয়তো এটা সেই উদ্যানেই তৈরি যেখানে প্রদ্যোতের রাজ-উদ্যান ছিল। যেটাকে রাজা নিজের পুরোহিত এবং পরে বুদ্ধের তৃতীয় প্রধান শিষ্য মহাকাত্যায়নকে দান করেছিলেন। এখন এটা দেখতে একটা ছোট পাহাড়ের মত লাগে। ওপর থেকে উজ্জয়িনীর সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমি দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক লক্ষ জন-বসতির উজ্জয়িনী এখন কয়েক হাজারের এক মফস্বল শহর হয়ে রয়ে গেছে। উজ্জয়িনী ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের খুব সেবা করেছে। কয়েক শতক পর্যন্ত সে বৌদ্ধদের এক মহাকেন্দ্র ছিল। নবম-দশম শতকেই পারমার রাজারা উজ্জয়িনী থেকে সরিয়ে ধারাতে নিজেদের রাজধানী তৈরি করলো এবং তখন থেকে শুরু হলো এই মহানগরীর পতন—যেখানে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দরবার ছিল, যেখান কালিদাস

[১] এই লিপির উদ্ভব ঘটে অষ্টম খ্রীস্টাব্দে। কাশ্মীর উপত্যকা এবং তার সন্নিহিত দক্ষিণ ও পূর্বের উপত্যকাগুলির প্রায় দু লক্ষাধিক মানুষের মুখের ভাষা শারদা। সাধারণত এই অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন রয়েছে এবং হিন্দু বিদ্যালয়গুলিতেও এই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। শারদা-লিপি আবির্ভূত হয় কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বাংশে। এখনো পর্যন্ত সর্বশেষ যে শারদা-লিপিটি উদ্ধার করা হয়েছে তা ৮০৪ খ্রীস্টাব্দের।—স·ম·

নিজের সরস কবিতাগুলো পাঠ করতেন, যেখানে মহাক্ষাত্রপ[১] নহপান[২] এবং চষ্টন, রুদ্রদাম এবং রুদ্রসিংহ শাসন করেছিলেন আর একে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র করে তুলেছিলেন। শুঙ্গ এবং মৌর্যরা যার শ্রীবৃদ্ধি করেছিল, প্রদ্যোতের শাসনকালে যে একবার সমগ্র ভারতের রাজধানী হওয়ার জন্য পাটলিপুত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল—সেই উজ্জয়িনী আমাদের সামনে ছিল। যদিও কাপড়ের মিলগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া জানান দিচ্ছিল যে উজ্জয়িনী আধুনিক দুনিয়াতেও বেঁচে থাকার আশা রাখে; কিন্তু উজ্জয়িনী তখনই আবার তার গৌরব ফিরে পাবে যখন মালবরা[৩] নিজেদের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে, মালবী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে, উজ্জয়িনী তার রাজধানী হবে এবং উদ্যোগ-বাণিজ্য ও শিল্পের এক প্রধান কেন্দ্রের রূপ ধারণ করবে।

ওখান থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে উঁড়াসার কাছে মহাসরোবর দেখতে গেলাম। মহানগরী উজ্জয়িনীতে সম্ভবত এই ধরনের অনেক সরোবর ছিল। প্রাচীন উজ্জয়িনী কেবল সৌধ ও অট্টালিকার নগরীই ছিল না, সে উদ্যান এবং উপবনেরও নগরী ছিল। উঁড়াসার কাছে আমরা সেই গর্তগুলোও দেখলাম যেখানে কিছুদিন আগে খননের ফলে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। ফিরে মহাকালের কাছে এলাম। উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষে বহু ঐতিহাসিক ধন-সম্পদ পড়ে আছে, এগুলো খোঁজার তেমন চেষ্টা হয় নি। রাস্তাগুলো বের করতে, গলিগুলো তৈরি করতে গিয়ে অনায়াসে বসতির কয়েকটা স্তর বেরিয়ে আসে আর কোথাও কোথাও গোয়ালিয়র সরকার একটু-আধটু খোঁড়াখুঁড়িও করেছে, কিন্তু এটা একেবারে প্রারম্ভিক চেষ্টা। পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ ব্যাস নিজের জন্মভূমি এবং তার ইতিহাসের বড় প্রেমিক। কিন্তু যতক্ষণ সেই প্রেমনগরের সমস্ত জনগণকে ছাড়িয়ে সমস্ত মালব-জনগণের মধ্যে না ছড়াচ্ছে, ততক্ষণ উজ্জয়িনী নিজের রহস্য ব্যক্ত করতে পারবে না। ওর পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রথমে মালব-জনগণের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

শ্রমিক বন্ধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো তারপর সাড়ে সাতটার সময় আর্যসমাজের প্রাঙ্গণে 'পৃথিবীকে ভারতের অবদান' সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিলাম। প্রায় দু'হাজার শ্রোতা ছিল। বোধহয় অনেক ভারতপ্রেমিক ভেবেছিলেন যে আমি কেবল অবদান-এর কথাই বলব, কিন্তু আমি বললাম যে ভারত নিজের স্বাধীনতা এবং সজীবতার যুগে পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে। সেইসঙ্গে অন্যদের থেকে নিঃসঙ্কোচে অনেক কিছু নিয়েওছে—যবনরা নিজেদের কলা, জ্যোতিষ, দর্শনের অনেক কথাই আমাদের শিখিয়েছে। হয়তো কিছু ভাইদের আমার এই স্পষ্টবাচন পছন্দ হয় নি।

বোম্বাইতে (১ ফেব্রুয়ারি—৫ মার্চ)—৩১ জানুয়ারি এগারোটার সময় আমি নাগদা থেকে

[১] শক রাজাদের শাসনকালে তাঁদেব রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই প্রদেশগুলোর সামরিক শাসনকর্তাদের বলা হতো 'মহাক্ষাত্রপ'।—স·ম·

[২] জনৈক শক রাজা।—স·ম·।

[৩] মালব রাজ্যের অধিবাসী। প্রাচীন মালব ছিল রাজস্থানের নটি প্রজাতন্ত্রের একটি, যাকে সমুদ্র গুপ্ত অধীনস্থ করেন।—স·ম·।

ট্রেন ধরলাম। স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দিল্লী থেকে আসা ট্রেন পেলাম, আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনই পেলাম, যেটা প্রত্যেক স্টেশনে থামতে থামতে যাচ্ছিল। দোহাদে আমি দিনেদিনেই পৌছে গেলাম। এটাই গুজরাট আর মালবের সীমারেখা। মালব প্রজাতন্ত্র ছোট নয়। তার কার্পাসের খেত এখনও ইন্দোর ও উজ্জয়িনীর অনেক কাপড়ের কল চালাচ্ছে। মালবের কৃষক-শ্রমিক, জনসাধারণ কয়েকটা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে। ঔরঙ্গজেবের সময় (১৭০৭) পর্যন্ত মালব শাসকদের সুবিধের জন্য অনেক ভাগে বিভক্ত ছিল না। সে ছিল অখণ্ড মালব। আজ অখণ্ড ভারতের চিন্তা হয়। কিন্তু অখণ্ড মালবের জন্যও কি কারও মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয়? চাষ খুব ভালো হয়, কার্পাস আর কাপড়ও তৈরি হয় কিন্তু মালববাসীরা নিজেদের পরিশ্রমের রোজগার নিজেরা খেতে পায় না। ওদের রক্তে সামন্ত ও শেঠদের প্রাসাদের মাটি তৈরি হয়—সামন্ত-শেঠরা নিজেদের মালব-সন্তান বলতেও চায় না। মালবে নগ্ন মূর্তি আর শুকনো কঙ্কাল আর কতদিন দেখা যাবে? আর কতদিন সত্যিকারের শস্যশ্যামলা মালব-মাতা নিজের দুগ্ধ থেকে নিজের সন্তানদের বঞ্চিত করবে?

দোহাদের পর এখন সিধে গুজরাট। আমাদের কামরায় নোংরা-ময়লা কাপড় পরা লোকজনের জায়গায় পরিষ্কার কাপড় পরা লোকজন এলো। গাড়িতে বাজার দর এবং ফাটকাবাজির কথা শোনা যেতে লাগল। এটা বলা চলে না যে গুজরাটে কেবল বেনিয়ারাই থাকে। তবে আমার মনে হয়, ভারতে আর কোনো জায়গা এরকম নেই যেখানে এত বেশি সংখ্যায় লোক ব্যবসার ওপর নির্ভর করে। ছোট ব্যাপারীদের বড় ব্যবসায়ীদের মুখের মধ্যে থেকে বাঁচতে বা মরতে হয়। এই শ্রেণীটা সাম্যবাদকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, সেজন্য তার বিরুদ্ধতা সবচেয়ে বেশি করে। গান্ধীবাদ যে এখানকার রাজনৈতিক ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

রাত এগারোটার সময় গাড়ি বরোদা পৌছল। গুজরাট মেলে বসার জায়গাটুকু বেশ কষ্ট করে পাওয়া গেল। এটাই রক্ষে যে পরের স্টেশনগুলোতে এই ট্রেনের জন্য টিকিট পাওয়া যায় না। সেজন্য ভিড় আর বাড়লো না। সকাল আটটায় বোম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশন পৌছলাম।

পাসপোর্টের ব্যাপারে এখনও গণ্ডগোল চলছিল। আমি সেই দিন (১ ফেব্রুয়ারি) ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'আমলারা পাসপোর্ট গণ্ডগোল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কখনও বলে— ইরান সরকার চায় না। চমৎকার! মহারাজা সাহেব চান না। আবার কখনও বলে—এর অতীতের রাজনৈতিক রেকর্ড খারাপ। তাহলে পাসপোর্ট দেওয়ার নাটক কেন করলো? আবার কখনও—এই লোকটা বউ-বাচ্চাকে ডেকে নিচ্ছে না কেন?'

পরদিন আমি লোলাকে তার করলাম—'পাসপোর্ট পেয়ে গেছি কিন্তু সোভিয়েত ভিসার দরকার। সোভিয়েত সরকারকে বলে তেহরান আর কাবুলের কন্সাল্দের ভিসা দিতে রাজি করাও। নয়তো ইগরকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসো। উত্তর তারেও পাঠাও।' এরকম অনেক তার লোলাকে করেছি, কিন্তু যে তারগুলো ওর কাছে পৌছেছে এটা তার মধ্যে একটা। আজকাল সেন্সর কর্তৃপক্ষের আলস্য এবং দুর্বুদ্ধির জন্য লেনিনগ্রাদ থেকে

তারবার্তাও দেড় মাসে পৌঁছোয়। লালসৈন্যরা জার্মান ফাসিস্তদের থেকে নিজেদেরই রক্ষা করে নি বরং ইংরেজদেরও রক্ষা করেছে। কিন্তু ভারতের ইংরেজ আমলাতন্ত্র এখনও সোভিয়েতকে কলেরা এবং প্লেগের দেশ মনে করে আর চায় যে ওখানে কেউ যেন যেতে-আসতে না পারে।

আমি পাসপোর্ট পেয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য সম্ভাবনা ছিল যে যে কোনো সময় আমাকে ভারত থেকে রওনা হতে হবে। মুনি জিনবিজয়জী বললেন, 'সোভিয়েতে যাওয়ার আগে 'বার্তিকালংকার'-এর দু-একটা খণ্ড যদি সম্পাদনা করে দেন তো ভাল হয়।' উনি ভারতীয় বিদ্যাভবনে একটা নির্জন ঘরও দিলেন। দ্বিতীয়দিন আমি ওখানে চলে গেলাম। তিনতলায় চারদিক থেকে বাতাসযুক্ত ভালো ঘর ছিল। যখন বোম্বাইতে অন্য জায়গাগুলোতে ঘাম ছুটতো, তখনও এখানে হাওয়া বইত। তার লাগোয়া স্নানঘর ছিল। সেজন্য আমার এদিক-ওদিক যাওয়ার দরকার হতো না। ধর্মকীর্তির গ্রন্থ 'হেতুবিন্দু'র টীকা (অর্চট বা ধর্মাকিরদত্ত প্রণীত) কোনও জৈন ভাণ্ডারে পাওয়া গিয়েছিল। এই টীকার টীকা (দুর্বেক মিশ্র) আমি তিব্বতের ঙোরগুম্বাতে পেয়েছিলাম। এর সম্পাদনা পণ্ডিত সুখলালজী করেছিলেন। কিন্তু ধর্মকীর্তির মূলগ্রন্থ তখনও পাওয়া যায় নি, সেজন্য ওঁর ইচ্ছা ছিল যে আমি ওটার তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংস্কৃতে করে দিই।

প্রথমে আমি এই কাজটা করলাম। ধর্মকীর্তির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সম্বন্ধপরীক্ষা'র খণ্ডিত সূত্রগুলোকেও তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংস্কৃতে করে ফেললাম। 'বর্তিকালংকার' প্রায় ১৮ হাজার শ্লোকের এক বিশাল গ্রন্থ যা তিন খণ্ডে ছাপা হবে। তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠভেদ দিয়ে ওটাকে সম্পাদনা করা সব থেকে বড় কাজ ছিল। তাতেই লেগে পড়লাম এবং দুখণ্ডের কাজ সম্পূর্ণ করে ছাড়লাম।

১৪, ১৫ ফেব্রুয়ারি স্বামী সত্যস্বরূপ আর ওঁর গুরু স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। স্বামী সত্যস্বরূপের সঙ্গে বেনারসেই দেখা হয়েছিল কিন্তু স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ এই প্রথম পেয়েছিলাম। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, 'একুশ বছর আগে গয়া কংগ্রেস-এর সময় আপনার ভাষণ শুনেছিলাম।' দুজনই সংস্কৃতের পণ্ডিত এবং সেইসঙ্গে বুদ্ধিজীবীও। বেনারস ছাড়ার পর স্বামী সত্যস্বরূপের চিন্তাধারার আরও দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। উনি সাধু শান্তিনাথের খুব প্রশংসা করছিলেন আর বলছিলেন যে সেই নির্ভীক, নির্লোভ এবং প্রতিষ্ঠাবিমুখ মহাপুরুষের জীবনী আমার লেখা উচিত। শান্তিনাথের প্রখর বুদ্ধির উৎকর্ষ আমি ওঁর গ্রন্থগুলোতে দেখেছি। আমি ওঁর জীবনী লিখতে চাই কিন্তু এখন আমার হাতে এত সময় ছিল না যে ওঁর খোঁজে বেরুব। আমার 'ভোলগাসে গঙ্গা', 'মানব সমাজ' ইত্যাদি বই গুরুশিষ্য পড়েছেন। সত্যস্বরূপ বলছিলেন, 'সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই এগুলো পড়ে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। একজন বিদ্বান সন্ন্যাসী বলেছিলেন যে এটাই তো আমাদের সত্য এবং শ্রেয়স্কর পথ মনে হচ্ছে। কিন্তু কি করবো? আমাদের ভক্ত হলো এই শেঠেরা আর তাঁদের জন্য এগুলো কুইনাইনের বড়ি!'

২০ ফেব্রুয়ারি মাতুঙ্গা গেলাম। ওখানে একজন আধুনিক ধারার দর্শনের পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হলো। উনি ব্যবহারে মার্কসের নীতি স্বীকার করতেন, কিন্তু দর্শনে নিজেকে আরও

উঁচু তলায় স্থাপিত করতেন। অসীমকে সীমিত করতে উনি রাজি। ওঁর কাছে সত্য অসীম। আমি বললাম, 'সীমার পরে কি আছে তা তো আমরা জানি না, তাহলে নিজেদের অজ্ঞানতার ভিত্তিতে অসীম সম্পর্কে নানারকম কল্পনা করা কি নিরালম্ব নয়? আমাদের জ্ঞান বিশ্বের ততটুকু অংশের কথাই বলতে পারে যেখান পর্যন্ত বিজ্ঞান পৌঁছোতে সক্ষম। বিজ্ঞানের সীমারেখা নিরন্তর বেড়েই চলেছে। সেজন্য আমাদের জ্ঞানের সীমাও বাড়ছে। বিজ্ঞানের সীমানার বিস্তারের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিরও বিস্তার হওয়া উচিত। কিন্তু বুদ্ধি যদি ব্যাকুল হয়ে অন্ধকারে লাফ দিতে চায় তাহলে এটা কেবল দুরাগ্রহ। জ্ঞানের সীমানা বৃদ্ধি করার একমাত্র উপায় হলো প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ব্যবহার। যেহেতু প্রয়োগের গতি আলোর গতির মত অত দ্রুত নয়, সেজন্য লাগামটা কল্পনা (বুদ্ধি)র হাতে দিয়ে দেওয়া ভুল।

২২ ফেব্রুয়ারি লোলার তার এলো। সে এটা তিন দিন আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি পাঠিয়েছিল। সে লিখেছিল—'ভো ক স-এর মারফত পাঠানো চিঠি পেয়েছি, তার কর, লেনিনগ্রাদে আসার সম্ভাবনা আছে' (Letter Voks received Telegraph, Possibility arriving Leningrad.)। আমি সেদিনই তারের মাধ্যমে জবাব দিলাম, যে 'আমি আসতে চাই। সোভিয়েত ভিসা পাঠাও।'

বোম্বাইতে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চলছে। প্রত্যেকটি লোক নির্ধারিত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছে। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র গরিবদের জন্য। ধনী লোকেরা হোটেলে গিয়ে যত ইচ্ছে খাবার খেতে পারে, বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনেও আনতে পারে। আসলে শাসনটাও তো বিলিতি ধনীদের এবং তা বড়লোকদের লাভের জন্যই। তাহলে আর অভিযোগের কি প্রয়োজন?

২৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে পড়লাম যে চার্চিল মার্শাল টিটোকে যুগোস্লাভিয়ার নেতা স্বীকার করে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এটা অত্যন্ত তেতো বড়ি ছিল। কিন্তু চেম্বারলেনের পক্ষেও হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি তেতো গুলো ছিল না? সে এই ভেড়াটাকে খুশি করার জন্য নিজের অনেক বন্ধুকে বলি দিয়েছে। কতবার ওর কাছে গিয়ে নাক ঘষেছে আর বুঝিয়েছে যে আমরা যদি লড়াই করি তাহলে পৃথিবী বলশেভিক হয়ে যাবে। কিন্তু হিটলার নিজের বলশেভিক শত্রুদের লোহার ছোলার মত দেখল এবং সাম্রাজ্যবাদী ভক্তদের দেখল নরম হালুয়ার মতন। সেজন্যই ও তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।। চার্চিলও এ পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়ার জমিদার ও পুঁজিপতিদের ভীরু সরকারকে তার বিশ্বাসের পাত্র ঠাওরে ছিল। কিন্তু ভীরু সরকারের প্রধান সেনাপতি মিখাইলোভিচ যুগোস্লাভিয়ার হিটলারী সৈন্যদের সাহায্যে দেশভক্তদের সংহার করতে সমস্ত শক্তি ব্যয় করছিল এবং মিখাইলোভিচের চেতনিক সৈনিক হিটলারের পতাকা তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই কথাটা টিটো বহুবার বলেছে। সোভিয়েত রেডিও এটা কয়েকবার ব্রডকাস্ট করেছে কিন্তু বিলিতি পুঁজিপতিরা এটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মনে হচ্ছিল যে, ওদের যুগোস্লাভিয়াতে আবার পুঁজিপতি সরকার গড়ার যতটা চিন্তা ছিল, হিটলারকে হারাবার চিন্তা ততটা ছিল না। ভারতে আমরা জানি যে চার্চিল এমেরি এবং তাদের দাস এখানকার ফ্যাসিস্টদের হারাবার তত চিন্তা করে না, যতটা চিন্তা করে যুদ্ধের পর নিজের শাসনকে

অক্ষুণ্ণ রাখার, ভারতকে সম্পূর্ণ শোষণ করার। যদি ভারতীয়রা জাতীয় সরকার স্থাপন করতে পারে আর ভারতীয় সৈনিকরা বুঝতে আরম্ভ করে যে আমরা অন্যদের স্বাধীনতার জন্য নয়, বরং নিজেদের স্বাধীনতার জন্যই লড়ছি, তাহলে ভারতে ইংরেজের শাসন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। যদি সবরকমের কাঁচামাল রেখে যুদ্ধ জেতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মোটরগাড়ি, ট্যাঙ্ক, বিমানের মত যন্ত্রপাতিগুলো ভারত নিজের জায়গায় তৈরি করতে শুরু করে, তাহলে যুদ্ধের পর এখানে ইংরেজদের অখণ্ড শোষণ থাকতে পারবে না। ইংরেজ পুঁজিপতিদের স্বার্থ তাদের ভাবতে বাধ্য করছিল যে টিটোর মতন হিটলারকে নাজেহাল করা কম্যুনিস্ট ও তার যুদ্ধবাজ সৈনিকরা যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে রাজা-নবাবদের আর যুগোশ্লাভিয়াতে কেরদানি চলবে না। পুঁজিবাদ ওখান থেকে বিদায় নেবে।

মিখাইলোভিচ আর তার মালিকারাও বুঝতে পারছিল যে টিটো নিজের বীরত্বে ওখানকার জনগণের হৃদয় যে ভাব জাগ্রত করেছে, তাতে ওদের শ্রেণীর সাঙ্ঘাতিক বিপদ হতে পারে। যুগোশ্লাভিয়া যদি হিটলারের গোলামি স্বীকার করে নেয় তাহলে বণিক শ্রেণী ওখানে জমিয়ে থাকবে। তাই নিজের শ্রেণীর স্বার্থের জন্য সে হিটলারের সঙ্গে যুক্ত হলো। কিন্তু চার্চিলের শ্রেণীস্বার্থ হিটলারের শ্রেণী স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। সেজন্য সে চেতনিক-এর আশা ছেড়ে টিটোকে মান্য করল। এসব হয়ে যাওয়ার পরও ভারতের আমলাতন্ত্র শাসক তিনমাস পর পর্যন্ত চেতনিকদের 'বাহাদুরি'র সিনেমা দেখাতে উৎসাহ দিতে থাকলো। ইউরোপে, নিদেনপক্ষে যুগোশ্লাভিয়ায়, বিলিতি সাম্রাজ্যবাদীদের চালাকি চললো না, কিন্তু ইতালি, গ্রিস, পোল্যাণ্ডে ওরা এখনও নিজের চাল চালিয়ে যাচ্ছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি জানতে পারলাম যে আমার উপন্যাস 'সিংহ সেনাপতি'র কয়েকটি বাক্য নিয়ে অনেক কট্টরপন্থী জৈন খুব লাফালাফি করছে। তারা নিজেদের গুজরাটী-হিন্দি পত্রিকায় লেখকের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখছে। এমন কি কথা ছিল? উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নেই। একজন রঙ্গপ্রিয়া স্ত্রীলোক জৈন সাধুদের নগ্নতাকে প্রাকৃতিক প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করেছে। ব্যাস, এতেই আমার বন্ধুরা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে। যেখানে তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রসঙ্গ, সেখানে উপন্যাসের নায়ক তাঁর প্রতি খুবই শালীনভাব ব্যক্ত করেছে। কিন্তু নায়কের কথা কে আর জিজ্ঞেস করছে? কোথাও থেকে কিছু নিয়ে ঝগড়া করার প্রবৃত্তি ওখানে ছিল। এক-আধ জায়গা থেকে ভীতিপ্রদর্শনেরও গুঞ্জন এলো। আমি বললাম, 'কৌশাম্বীজীকে বিরক্ত করায় শেঠদের মন চটে যায় নি তো? যদি আর উচ্চবাচ্চ্য না করতে হয় তবে ভীমরুলের চাকে আঙুল না দেওয়াই ভালো।

এবার বেজওয়াড়াতে নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। আমি সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি ছিলাম, কিন্তু সে বছর (১৯৪০) সম্মেলনে যাবার আগেই গ্রেফতার হয়ে গেলাম। গত সম্মেলনেও আমি ভাকনা যেতে পারি নি, সেজন্য এবার ওখানে যাবো স্থির করলাম।

৬ মার্চ সর্দার পৃথ্বীসিংহ, ডাঃ অধিকারী আর অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে আমরা মাদ্রাজ এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। পরদিন সকাল আটটায় হায়দ্রাবাদে এলাম। এখানে গাড়ির

কামরা বদলাতে হলো। যদিও ভারতের করদ রাজ্যগুলো এখনও কয়েক শতাব্দী আগের স্বপ্ন দেখছে কিন্তু নতুন চিন্তাধারাকে বাধা দেবার শক্তি ওদের মধ্যে নেই। বোধহয় ওরা এখনও এটা মানতে রাজি নয়। অন্য কোনও সময় ব্যবহার করার ইচ্ছে নিয়ে নিজেদের লোহার পাঞ্জা আগলে বসে আছে। কিন্তু তখন ওরা জানতে পারবে যে ওরা এমনই একটা প্রচণ্ড অগ্নির সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাচ্ছে যার স্পর্শে ওদের লৌহ মুষ্টি গলে জল হয়ে যাবে। হায়দ্রাবাদের পার্টি মেম্বাররা খবর পেয়ে গেল এবং ওদের কয়েক ডজন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেল। ওরা শ্লোগান দিচ্ছিল, বিপ্লবের গান গাইছিল। ওদের মধ্যে বেশি ছিল মুসলমান আর ছিল হিন্দু, মারাঠা এবং অন্ধ্রবাসীও। দু-তিনজন মহিলাও ছিল। লোকেরা অবাক হয়ে দেখছিল।

এই যাত্রায় আমি 'সর্দার পৃথ্বীসিংহ'র টাইপ করা জীবনী পড়তে শুরু করলাম আর স্থির করলাম যে এর ওপর হিন্দিতে একটা বই লিখব।

৭ মার্চ রাত আটটার পর আমরা বেজওয়াড়ায় পৌঁছলাম। মোগল রাজপ্রাসাদে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আমাদের নিজস্ব আবাসে পৌঁছে দেওয়া হলো।

অন্ধ্রতে, ১৯৪৪

অন্য প্রান্তের অশিক্ষিতরাও তেলেঙ্গা নামের সঙ্গে পরিচিত কিন্তু যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের গ্রাম্য মহিলারা মিলিটারি সিপাইকে তেলেঙ্গা বলে। সম্ভবত অষ্টাদশ শতকে কোম্পানির ভারতীয় ফৌজ তেলুগুভাষীদের দিয়েই শুরু হয়েছিল, আর পরবর্তী কালে কোম্পানি বাহাদুরের সব সৈন্যকেই তেলেঙ্গা বলা হতে লাগল। যদিও নিজের কলমের জোরে বাঙালী অথবা অন্যান্য নব্যশিক্ষিতরা কোম্পানি বাহাদুরের ভিত বেশ শক্ত করেছিল। তাহলেও ভারতের আদি তলোয়ার, যা কোম্পানি রাজত্বের বুনিয়াদ গড়েছিল, তা তেলেঙ্গাদেরই ছিল। ভারতে বিদেশী শাসন নিয়ে আসতে তেলেঙ্গারা সহায়তা করেছিল। অবশ্যই এটা নিন্দার ব্যাপার, কিন্তু এর বেশিরভাগ দোষ তাদের নয়, দোষ ইতিহাসের, যেটা এখানে দেখাবার অবকাশ নেই। তবে ওদের সৈন্যবল ছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই।

যে সোয়া লাখ বর্গমাইল ভূমিখণ্ডে তেলেঙ্গা বা তেলেগুভাষীরা বাস করে তাকে অন্ধ্রদেশ বলা হয়। শাসকদের সুবিধের জন্য আজ অন্ধ্রদেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে অনেকগুলি অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ওর উত্তর ভাগটা মধ্যপ্রদেশের চাঁদা জেলা, বস্তার রাজ্যে যেখানে কেটে নেওয়া হয়েছে সেখানে পশ্চিমভাগ এবং সমগ্র অন্ধ্ররাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মধ্যে আছে। শুধু হায়দ্রাবাদ শহরই নয়, রাজ্যের বেশির

ভাগটাই তেলেঙ্গানার মধ্যে পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিমে কোলারের সোনার খনির সঙ্গে অন্ধ্রের অনেকগুলো অংশ মহীশূর রাজ্য দখল করে নিয়েছে। যে ভাগটা ব্রিটিশ-ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশে রয়ে গেছে সেটাও শাসকদের দ্বারা উপেক্ষিত। কিন্তু আজ তিন কোটি অন্ধ্রবাসী নিজের দুরবস্থা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। যুগ ওদের সঙ্গে আছে। আজ শাসকদের সুবিধের জন্য জনগণ নয়, জনগণের সুবিধের জন্য শাসন প্রয়োজন এবং সেটা জনগণেরই শাসন হওয়া উচিত। অন্ধ্রবাসী জানে যে, ন্যায়ের দোহাই দিলেই ন্যায় পাওয়া যায় না। দুর্বলেরা কখনও ন্যায়ের আশা করে থাকে না। আজ তাই অন্ধ্রবাসীরা পাশ বদল করছে।

অন্ধ্রবাসীরা চিরকালই এক পরাক্রমশালী জাতি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আর তার পুত্র বিন্দুসার হিন্দুকুশ (আফগানিস্তান)-এর ধার পর্যন্ত নিজের সীমা বিস্তারে সফলতা পেলেন কিন্তু কলিঙ্গ বা পূর্ব অন্ধ্র বিজয়ের জন্য মৌর্যদের তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। অশোক সমগ্র ভারতের সৈন্যবল একত্রিত করে অন্ধ্রদের ওপর আক্রমণ চালালেন। কিন্তু অন্ধ্ররা মাটি দিয়ে নয় ইস্পাত দিয়ে তৈরি। তারা নিজের প্রাণাধিক প্রিয় স্বাধীনতাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়ার লোক ছিল না। বীরত্ব এবং আত্মবলিদানে অপরাজিত থেকেও সংখ্যার বিচারে ওদের পরাজিত হতে হলো। তবে সেই সঙ্গে ওরা অশোককে খুব শিক্ষাও দিল। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর অশোক চণ্ডাশোক নয় ধর্মাশোক হয়ে গেলেন। বীর অন্ধ্রবাসীদের বলিদান আর ওদের রক্তে রক্ষা গোদাবরী এবং কৃষ্ণার ধারা দেখে অশোকের মানব হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠল। অন্ধ্রবাসীরা অবশ্য নিজেদের স্বাধীনতার কিছুটা হারিয়েছিল কিন্তু পরবর্তী মৌর্য সম্রাটদের সময় ওরা আবার মজবুত হয়ে গেল, আর একশো বছর না কাটতেই খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ওরা নর্মদা ও উড়িষ্যা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত অধিকার করে নিল। এইভাবে নবম শতাব্দীর শেষে পৌঁছে অন্ধ্রবাসীদের বিজয় পতাকা গঙ্গা এবং যমুনার পাড়েও উড়তে লাগল। হ্যাঁ, তখন মহারাষ্ট্র আর অন্ধ্র একই ছিল। উভয়েরই শাসক-সামন্তদের ভাষা এক ছিল আর বোধ হয় কিছু শাসিতদেরও ভাষা ছিল এক। মহারাষ্ট্রে শাসকদের ভাষা শাসিতদের ভাষাকে উচ্ছেদ করলো, কিন্তু অন্ধ্রবাসীরা পুরনো নামের সঙ্গে শাসিতদের ভাষাই শুধু বজায় রাখলো না, বরং শাসকদের সঙ্গে তাদের ভাষাকেও নিজেদের মধ্যে বিলীন করে নিল।

খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল অন্ধ্ররাষ্ট্রও ছিন্নভিন্ন হতে লাগল। শকদের দ্বারা উৎখাত হয়ে অনেক উত্তর ভারতীয় (উত্তরপ্রদেশ-বিহার) রাজবংশীয় অন্ধ্রে আশ্রয় নিল, বোধহয় ওরা স্থানীয় রাজন্যদের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়ও ছিল। যখন অন্ধ্র সাম্রাজ্যের পতন হচ্ছিল তখন ইক্ষ্বাকুবংশীয় চাণ্ডামুল যে সম্ভবত পূর্ব অন্ধ্রের সামন্তরাজা ছিল, সেখানে নিজের রাজত্ব স্থাপিত করলো। ধান্যকটক এবং শ্রীপর্বতের (নাগার্জুনী কোণ্ডা) সুন্দর প্রস্তরস্তূপ এবং তাদের অপূর্ব মূর্তিগুলি চাণ্ডমূলের বোন চাণ্ডিসিরী ও পুত্র রাজা সিরীবীর পুরিসদাত (শ্রীবীরপুরুষদত্ত)-এর শুধু নয়—অন্ধ্র শিল্পীদেরও অমর কীর্তি। পৃথিবীখ্যাত এই স্থাপত্য কলার জন্য অন্ধ্রদের মাথা গর্বে কেনই বা উন্নত হবে না? কিন্তু সেই শিল্পীদের সন্তানরা আজ শুধু মাচেরলায় পাথরের ফলক কাটতে ও ধরণীকোট (ধান্যকটক)-এ ইঁট-পাথর বইতেই জানে। মানুষের সুদিনের সঙ্গে তার শিল্পের দিনগুলিও

কি আবার ফিরে আসবে না?

তৃতীয় শতকের পর থেকে আবার সমগ্র অন্ধ্র একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারলো না। এই সামন্তযুগের অন্তর্কলহের দরুন সে নিজের শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশীয়দের পক্ষে বিপক্ষে যুদ্ধে ব্যয় করতে লাগল। আর কখনও কখনও অন্যের পিতাকে পিতা বলে সন্তোষ লাভ করছিল। বিজয়নগর তো প্রকৃতপক্ষে কর্ণাটকের রাজবংশ ছিল, কিন্তু অন্ধ্রও তার সঙ্গে আত্মীয়তার অহংকার করতো।

বর্তমান শতকে যখন দেশব্যাপী চেতনা জেগে উঠল, তখন অন্ধ্রর বিশৃঙ্খল কিন্তু সুপ্তপ্রায় চেতনাও স্পন্দিত না হয়ে পারলো না। চেতনার উন্মেষের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশীয়দের বোধ হলো কিভাবে তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে সমস্ত অন্ধ্রবাসীদের একটি রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনের সূচনা হলো। দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার, তখন দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র জাতীয়তাবাদের দুর্গ হয়ে উঠল। আমলাতন্ত্র এটাকে ভাঙবার জন্য নানারকম অস্ত্র ব্যবহার করলো যার মধ্যে, একটি ছিল অব্রাহ্মণ আন্দোলন। যারা সবচেয়ে বেশি ত্যাগের ঢাক পেটায় সেই ব্রাহ্মণরা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে নিজের স্বার্থসাধনে কত নীচে নামল উত্তর ভারতের লোকরা তা অনুমান করতে পারে না। ওদের মতো দক্ষিণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুটো জাতিই আছে, তাও শূদ্ররা সৎ-শূদ্র নয়। সেজন্য ব্রাহ্মণ-দেবতাগণ নিজের হাতে ছাড়া অন্যের হাতের রান্না, এমন কি জলপানও করতে পারেন না। রাজু-রেড্ডি- কাম্মা স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের রাজপুত আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্য আছে। দুজনের চেহারা-টেহারা, রঙ-রূপ একরকম, আর রাজুদের সঙ্গে উত্তরের রাজপুতদের বিবাহ-সম্পর্কও আছে কিন্তু দক্ষিণের ব্রাহ্মণদের কাছে এরা সকলেই শূদ্র। ওদের হাতে জলও খাওয়া যায় না! যাঁরা স্বদেশী-বিদেশীদের ম্লেচ্ছ-শূদ্র গণ্য করে সেই ত্যাগের প্রতিমূর্তিদের নিজস্ব আচরণ কিরকম? ইংরেজি পড়ে বিদেশী ম্লেচ্ছদের জুতো পরিষ্কারের কাজে এরাই অগ্রণী ছিল! তা হলে আর ওদের কৃপার পাত্র হবেন নাই বা কেন? চাকরিতে তাদেরই গাদাগাদি, কাছারিতে তাদের ভিড়, এমন কি তোষামোদকারী লেজুড়দের মধ্যেও তাদের আধিক্য, শারিরীক পরিশ্রম থেকে সরে থাকা এই সমস্ত ফাঁকিবাজশ্রেণী বিদেশীদের শাসনকালে নিজের সুখ ও আধিপত্য খুব বৃদ্ধি করলো। ব্রাহ্মণ-দেবতারা এখনও নিজেদের আরাধ্য দেবতাদের পূজা-অর্চনা করতে বদ্ধ পরিকর, কিন্তু তাদের আরাধ্য দেবতাদের কাছে অত চাকরি ছিল না। অসন্তুষ্ট এবং সৎ ব্রাহ্মণদের চাকরিতে এগিয়ে যেতে দেখে আমলাতন্ত্র অব্রাহ্মণ-আন্দোলনকে উৎসাহ দিল। যদিও সে আন্দোলন তামিলনাড়ুতে যতটা অন্ধ্রে ততটা বাড়তে পারে নি। তবু এর প্রভাব অবশ্যই পড়লো। এর একটা ফল হলো এই যে মন্টেগু-সংস্কারের পর অব্রাহ্মণ মন্ত্রিমণ্ডলী অব্রাহ্মণ বালকদের শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিল। তাদের ছাত্রবৃত্তি দিয়ে গ্রাম থেকে ছাড়িয়ে স্কুল ও কলেজে পাঠানো হলো। কিছুদিন পর্যন্ত খুলল তখন নিজেদের সাফল্যে আনন্দে ডগমগ করছিল। তাদের চোখ যখন ১৯৩১-৩২-এর সত্যাগ্রহে সুন্দরাইয়ার মত অব্রাহ্মণণ তরুণদের দলে দলে অন্দোলনে ঝাঁপ দিতে দেখল। এদের মধ্যে অনেকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পেরেছিল। সেখানে

—১৯৪৪—

তারা বুঝতে পারলো যে, মুষ্টিমেয় স্বার্থলোভী ব্রাহ্মণদেরকেই তাদের নিজেদের সমস্ত শক্তির লক্ষ্য করে তোলা লজ্জার কথা। নতুন এবং স্বাধীন অন্ধ্র ব্রাহ্মণদের নয়, ওদেরই সব থেকে বেশি। ওরা রাশিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও কিছু কিছু কথা শুনেছিল এবং সেজন্য ওদের এটা বুঝতে সময় লাগল না যে ওদের বিরোধীপক্ষ শিখণ্ডী নয়, অন্য কেউ। সুন্দরাইয়া, গোপালাইয়া, নারায়ণ রাও ইত্যাদি শত শত তরুণ দেশের স্বাধীনতার জন্য খোলা মনে, চোখ খুলে রেখে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের বৃদ্ধ অব্রাহ্মণ পিতারা অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এখন নিষ্ফল হলো। তরুণরা ভাবলো— সমস্ত খেলা তো আমরা জানি, খনিতে কারখানাতে আমরাই কাজ করি, ফাঁকিবাজ ব্রাহ্মণরা তো আকাশে ঝুলছে। অন্ধ্রের কঠিন মাটি স্বাধীনতার পর আমাদেরই হবে। ওদিকে প্রাসাদ রাও, ভেঙ্কটাচারের মত ব্রাহ্মণ তরুণরাও বুঝতে পারলো যে চোখে ধুলো দেওয়ার দিন চলে গেছে। দেশের শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করলে কাজ হবে না। সাম্যবাদ সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করেছে, স্বদেশী আন্দোলনের অন্ধকার কোণগুলিকে আলোকিত করেছে। তরুণরা ছড়িয়ে পড়া শক্তিগুলিকে গোটাতে আরম্ভ করলো। প্রসাদ রাও নিজের ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করলো ও শূদ্রদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে জনগণকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলার প্রয়াস শুরু করলো। সুন্দরাইয়া অস্পৃশ্যদের দল নিয়ে রেড্ডিদের কুয়োতে চড়াও হলো। হাজার হাজার বছর ধরে দণ্ডায়মান অস্পৃশ্যতার পাঁচিল ভেঙে পড়ল। সর্বত্র বৃদ্ধরা ক্ষুব্ধ হলেন, অব্রাহ্মণ নেতা তথা ব্রাহ্মণ কংগ্রেসী পাণ্ডা সকলেই একসুরে বিরোধ করতে লাগল।

কিন্তু অন্ধ্রের তরুণরা কেবল সমাজ সংস্কারের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করলো না। তাঁরা শোষণ বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে নিজেদের সময় নষ্ট করতে চায় না, তারা কাটতে চায় সমস্ত মন্দের মূল—আর্থিক শোষণ ও বৈষম্যকে। খেতমজুরদের কষ্ট উপলব্ধি করে তাঁরা শোষণ মুক্তির জন্য তাদের সংগঠিত করলো। জমিদারদের অত্যাচার তারা দেখল এবং সেই অত্যাচার সহ্য করাতে লড়াইয়ে সর্বাগ্রে থেকে কৃষদের সংগঠিত করলো। এই সমস্ত নেতারা যদিও অল্পবয়স্ক ছিল, কিন্তু তাদের গুণ শোষিত জনগণকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করলো। আমলাতন্ত্র তাদের পেছনে লাগল। প্রবীণ-কংগ্রেসী নেতারা তাঁদের আর্ত-চিৎকার ওয়ার্ধা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সেখান থেকেও খুব কঠিন কঠিন অনুশাসন বের হলো। ঘরের, গ্রামের এবং দেশের শাসকরা ওদের বিরুদ্ধাচরণে কোনও কিছুই বাদ রাখল না, বাজে থেকে আরো বাজে অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হলো, কিন্তু শোষিত জনসাধারণ এই তরুণদের নেতৃত্বেই এগিয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণদের এই ব্যবস্থার দরুন অন্ধ্র, মালাবার ইত্যাদি প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের জল বা রুটি ইত্যাদির প্রশ্ন উঠতে পারলো না। ব্রাহ্মণরা অন্ন-জল নিজেদের জাতি পর্যন্তই সীমিত রাখতো, শূদ্রদের খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে তাদের ধর্মাচরণের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাহলে অব্রাহ্মণদের আর গরজ কিসের? ফলে অন্ধ্রে হিন্দুদের অন্ন-জল মুসলমানদের অন্ন-জল হতে পারলো না। হ্যাঁ, প্রসাদ রাওর মত ব্রাহ্মণদের ঘরে কিছুটা হা-হুতাশ অবশ্যই হলো। রেড্ডি-কম্মা পরিবাররাও অস্পৃশ্যদের সঙ্গে অন্ন-জল গ্রহণ করতে আপত্তি প্রকাশ করলো। কিন্তু

অন্ধ্রের তরুণরা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে খুবই মামুলি ব্যপার ভাবে। তারা তো করছে জনতার রুটিরুজির সংগ্রাম—কৃষকদের জমির ওপর স্বাধিকার, বেগার শ্রমের অবসান, পুলিশের ঘুষ ও অত্যাচার দূর করা এবং জনসাধারণকে সমস্ত অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক করে তোলা। জনতা নিজের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করলো যে, আলাদাভাবে এক-একটা তৃণ কিছুই নয় কিন্তু হাজার তৃণ একত্রিত হয়ে হাতিকেও ফেলে দিতে পারে। জনতার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে এই যুবনেতাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বাড়ল।

কৃষক সম্মেলন

১৪—১৫ মার্চ (১৯৪৪)-এ বেজওয়াড়ায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক শাসককুল অন্ধ্রের কৃষক ও তাদের নেতাদের ক্ষমতা জানতো। ফ্যাসিস্টদের প্রতি যত ঘৃণা এই কৃষকরা এবং তাদের নেতারা হৃদয়ে পোষণ করতো, ততদূর পর্যন্ত আমলাতন্ত্র পৌঁছতে পারতো না। নিজেদের অন্ধনীতি অনুযায়ী সে দেশের ফ্যাসিস্ট বিরোধী নেতাদের জেলবন্দী করে দেশদ্রোহীদের কাজকে সহজ করে দিল। আর দেশভক্তির পোশাক পরে সে সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে নানারকম প্রচারকার্যে এবং জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে লাগল। কিন্তু অন্ধ্রের এই যুবনেতারা শ্রমিক কৃষক জনগণের আপনার লোক ছিল। জনগণ এদের কথায় বিশ্বাস করতো, আসলে বিপদে-আপদে সর্বত্রই ওরা এদের নিজেদের সঙ্গে পেত। আকাল হোক বা মহামারী, পুলিশ-জমিদারের অত্যাচার হোক বা বিশাখাপত্তনমের উপর জাপানীদের বোমাবর্ষণ—সর্বদাই প্রাণ হাতে করে কারা মানুষের পাশে দাঁড়াত সেটা ওরা ভালো করেই জানত। কৃষকদের উৎসাহ ও শক্তি বেজওয়াড়ায় বিরাট আকার নিক, আমলাতন্ত্র সেটা দেখতে চাইতো না। সম্মেলনের কাজকর্মে সবরকমের বাধা দেওয়া সে নিজের কর্তব্য মনে করলো। কয়েক সপ্তাহ আগে ও পরে চারদিক থেকে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত সমস্ত স্টেশন থেকে বেজওয়াড়া আসার টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ভেবেছিল এইভাবে কৃষকরা সম্মেলনে আসা থেকে বিরত হবে। কিন্তু নিজেদের সম্মেলনে আসতে কৃষদের কে আটকাতে পারবে? ওদের কাছে গাড়ি ছিল, অনেকের কাছে তো নৌকা ছিল আর পা তো ছিল সবার। পুলিশের গোয়েন্দারা মিথ্যে কথা রটাতেও ইতস্তত করলো না। কখনও বলল—পথ বন্ধ কখনও বলল—ওখানে তো গুলি চলবে, কখনও কখনও আবার এও বলল যে, এই শহরটা সরকার সিল করে দিয়েছে। নগরের স্বাস্থ্যবিভাগের অধ্যক্ষ অসুখ ছড়ানোর ছুতো দেখিয়ে সম্মেলন বন্ধ করার আলাদা চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অন্ধ্রের কৃষক ও তাদের নেতারাও কাঁচা খেলোয়াড় ছিল না। ওখানে পাঁচ হাজার শিক্ষণপ্রাপ্ত (কম্যুনিস্ট) পার্টি-মেম্বার, দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা, আর এক লক্ষ কৃষক সভার সদস্য এবং গ্রামের পর গ্রাম লালঝাণ্ডার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার লোক ছিল। আমলাতন্ত্র, দেশদ্রোহী এবং নেতৃত্বের জন্য প্রাণ দিতে পারে এরকম অনেক কংগ্রেসী নেতা কপাল চাপড়াতে লাগল, তবু কৃষকদের সম্মেলন খুব জোরদার

ভাবে হলো। দু হাজার স্বেচ্ছাসেবক কয়েকদিন আগেই পৌঁছে গিয়েছিল. এরপরর আরও চার হাজার এসে পৌঁছল। ১৩ তারিখ রাতে ওদের সংখ্যা আট হাজারেরও ওপরে পৌঁছল যার মধ্যে পাঁচশো মহিলা-সেবিকা ছিল।

১৪ তারিখ সকাল আটটায় বের হলো সেই স্মরণীয় মিছিল, যার তুলনা কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কিত মিছিলের সঙ্গেও করা কঠিন। কেননা, ওটা নির্ভর করে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের উৎসাহ এবং অর্থের ওপর, আর এটা ছিল কৃষক ও শ্রমজীবীদের মিছিল। দু'মাইল পর্যন্ত মানুষদের চলন্ত প্রবাহ ছিল, যার মধ্যে কয়েক হাজার লাল পতাকা উড়ছিল। হাজার হাজার কণ্ঠ নিঃসৃত গগনভেদী স্লোগান বিজয়ওয়াড়াকে' মুখরিত করছিল। দর্শকদের ভিড়ে অট্টালিকা এবং ছাদগুলি শুধু হয়, পথের ধারের গাছগুলিও ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অন্ধ্রের ভালো জাতের বৃহদাকার সুন্দর গরুর গাড়িতে সভাপতি বসেছিলেন। শত্রুরা শোকে মূর্ছা যাচ্ছিল আর মিত্ররা পুলকিত হচ্ছিল। নির্জীব মানুষদের মধ্যে নতুন চেতনা, নতুন আশা জন্ম নিচ্ছিল।

সম্মেলনে এক লক্ষের বেশি নারী-পুরুষ জড় হয়েছিল। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মানুষ রাত প্রায় চারটে পর্যন্ত সঙ্গীত ও অভিনয় উপভোগ করেছিল। আমি কংগ্রেসের অনেক অধিবেশন দেখেছি, কিন্তু মহিলাদের এত সংখ্যায় উপস্থিতি সেখানে কখনও দেখা যায় নি। ১৫০০০-এর বেশি মহিলারা বেলা চারটের সময় রোদ্দুরের মধ্যে এসে বসে যেত। স্বয়ং-সেবিকারা জল খাওয়াবার খুব ভালো ব্যবস্থা করেছিল। জলে আর ছোঁওয়াছুঁয়ির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে তো একই মাটির গেলাসের থেকে সবাই জল খাচ্ছিল। এত ভিড়ের মধ্যে এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভবই ছিল না।

রাত দশটা থেকে নৃত্য ও অভিনয়ের প্রোগ্রাম আরম্ভ হলো। আমাদের বাঙলার বন্ধুরা ললিতকলায় অগ্রণী। আমরা ভাবছিলাম যে এখানে ওরাই বাজিমাত করবে। আমাদের ধারণা ছিল, অন্ধ্রের গ্রামীণ জনগণ পতাকা উত্তোলন করতে, স্লোগান দিতে এবং লাখ-দু'লাখ সংখ্যায় একত্রিত হয়ে উৎসাহ ও প্রেম প্রদর্শন করতে যথেষ্ট অগ্রসর, তবে কলার ক্ষেত্রে বাঙলার কাছে পৌঁছতে ওদের অনেক দেরি আছে। কিন্তু অন্ধ্র আমাদের এই ধারণাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে দিল। দুদিনের কলা প্রদর্শনের পর কমঃ মুজঃফর এবং কমঃ গোপাল হালদার তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করে বললেন, 'এদের কাছে সেই অতল ধারা (জনতা) আছে, যে সমস্ত শিল্পের জননী; এখানকার কর্মীরা নিজেদের কলা নিয়ে জনতার কাছে যায় নি বরং তারা জনতার থেকেই আত্মস্থ করেছে। অথচ বাঙলায় আমরা মধ্যবিত্তদের শিল্পকলার সংস্কার নিয়ে জনতার কাছে যাই এবং ওদের সংস্কৃতিকে ঠিক করে শিখতে পারি না।'

অন্ধ্রের বন্ধুরা যখন জনগণের জন্য সংগ্রাম করছিল, তখন তাদের কারও মনেই হয়নি যে জনসাধারণ শুধু রাজনৈতিক জ্ঞান নেওয়ার পাত্রই নয়, বরং তারা যথেষ্ট প্রতিদান দিতে পারে। সত্যযুগের কংগ্রেসী নেতারা বছরে একবার শ্রুতিমধুর ইংরেজি বক্তৃতা দিয়ে আর সরকারের কাছে কিছু দাবি-দাওয়া জানিয়ে নিজেদের দেশভক্তি সাঙ্গ করত। জনগণের সঙ্গে তাদের কোনও আদানপ্রদান ছিল না, জনগণ তাদের চিনতও না। গান্ধীজী

দাবিদাওয়ার পথ পরিত্যাগ করে গণশক্তিকে আহ্বান জানালেন। এখন আর না প্যাঁচালো ইংরেজি বক্তৃতার দ্বারা কাজ হাসিল করা সম্ভবপর হচ্ছিল, আর না ছমাসে-নমাসে শহুরে অধিবেশনগুলির দ্বারা। তাঁরা নিজেদের দাবিকে জনতার দাবিতে পরিণত করতে ওদের কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করলো। জনগণও আড়মোড়া ভাঙল। ইন্দ্রের সিংহাসন দুলে উঠল। গান্ধী আন্দোলনও জনতার বাহ্যিক স্পর্শমাত্র পেল। স্বরাজ এবং স্বাতন্ত্র্যের জেহাদ জনগণ মুগ্ধ ও সচকিত হয়ে শুনল। তাদের কাছে নিরাকার স্বরাজ নিরাকার ঈশ্বরের মতন মনে হলো। কিন্তু অন্ধ্রের তরুণ কম্যুনিস্টরা নিরাকার স্বরাজের জন্য জনগণকে আহ্বান করছিল না। ওরা তাদের রোজকার লড়াই লড়ে দেখাচ্ছিল যে আমরা সাকার স্বরাজ চাই—ফাঁকিবাজদের নয়, কর্মীদের এই পৃথিবীর মালিক করতে হবে, তাহলেই সব বিপদ থেকে মুক্তি সম্ভব হবে। কয়েকবছর ধরে তারাও কৃষকদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে থাকল, সংগ্রাম করতে থাকল, তারপর জনগণ তাদের বলল যে বক্তৃতার ভাষা ছাড়াও আর একটা ভাষা আছে, যার প্রয়োগে অল্পেই অনেক বেশি বোঝানো সম্ভব হয় এবং জনগণের অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্লাবিত করা যায়। সেই ভাষাটা হলো গণসংগীতের, নৃত্যের, অভিনয়ের ও প্রহসনের ভাষা। কোনো কোনো গান তো আগের বারের কৃষক-শ্রমিক সংগ্রামের সময় বাঁধা হয়েছিল। সংগীত যে অভিনয়ের সহযোগিতায় হাজার গুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এটা ১৯৪২-এ জানতে পারা গেল। বোধহয় কোনও শিক্ষিত তরুণ এর প্রয়োগ শুরু করেনি। সংগ্রামরত জনতার কোনও সন্তান দেবতা প্রেম অথবা অন্যান্য পুরনো বিষয়বস্তুর পরিবর্তে নিজেদের নতুন চাহিদাগুলি উপস্থাপিত করার জন্য প্রথম কলার প্রয়োগ করলো। বোধহয় তরুণ নেতাদের মধ্যে অনেকে গ্রাম্য নাচ-গানকে সুনজরে দেখত না আর নিজে মাঠে নামা তো সকলের কাছেই সংকোচের ব্যাপার ছিল। কিন্তু শীঘ্রই ওদের মোহভঙ্গ হলো। ওরা দেখল যে গণশিল্পের ভাষা ওদের চিন্তাধারাকে খুব সহজেই প্রত্যেকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারে। বীর কৃষক আর তার আত্মত্যাগের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী (বীরকথা) দুটো সাধারণ একমুখী ঢোলের সাহায্যে গান করে সারারাত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবার জন্য মানুষকে বাধ্য করা যায়। এখন ওরা নিজেদের বীরকথা রচনা করল—কৃষকদের লড়াই, শ্রমিকদের পরিশ্রম স্তালিনগ্রাদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক বীরকাহিনী তৈরি হলো। কৃষক এবং শ্রমিকরা তাদের মধ্য থেকেই কবি ও গায়কের যোগান দিল। শিক্ষিতরাও শিষ্যত্ব মেনে নিল। চারদিকে এই বীরত্বের কথাগুলোর চাহিদা দেখা দিল। সেদিন যখন আমি গুন্টুরে ছিলাম তখন পার্টি থেকে এক কৃষকের বিবাহের জন্য বীরকথার দলকে আহ্বান করেছিল এবং ১৬০ টাকা দক্ষিণা দিয়েছিল। আজ অন্ধ্রের প্রতিটি জেলাতেই নয়, প্রতিটি তহশিলেও নিজের নিজের বীরকথা মণ্ডলী আছে।

সেই সময় অন্ধ্রে ৫০০০ পার্টি মেম্বার ছিল, যার মধ্যে হোলটাইমার এর সংখ্যা ১০০০ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তার মধ্যে ৭৪ শতাংশ বিবাহিত ছিল। কম্যুনিজম বাড়ি থেকেই শুরু করা উচিত এটা ওরা মানত। তাদের স্ত্রী ও মা-বোনেরা প্রথমে যদিও এই তরুণদের পাগল মনে করত, কিন্তু এখন ওরা বুঝতে পারছিল যে প্রত্যেকটি স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ পাগলামি নয়।

গত বছর পর্যন্ত মহিলাদের জন্য বিশেষ শিক্ষালয় ছিল। যেখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে শুরু করে ৩ মাস পর্যন্ত তাদের শিক্ষা চলত। তাদের স্বামী এবং ভাইরা কেন বিপ্লবী হয়ে উঠেছে তা এই ক্লাসগুলোতে তারা জানতে পারত। রাজনৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ, নার্সিং, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি অনেক জিনিস ওদের শেখানো হতো। যে আগুন অন্ধ্র তরুণদের মধ্যে জ্বলেছিল, তা এখন অন্ধ্রের তরুণীদের হৃদয়েও প্রজ্জলিত হলো। তরুণীদের মধ্যে অনেকেই রাজু, রেডডি, কাম্মা প্রভৃতি পরিবারভুক্ত ছিল—তাদের বাড়িতে পর্দাপ্রথা ছিল, তারা পুরুষদের সামনে বেরোত না, বাইরে গেলে গরুর গাড়ির চারদিক ঢেকে দেওয়া হতো। কয়েকশো তরুণ নিজেদের স্ত্রী এবং বোনেদের ঘরের বাইরে নিয়ে এল। সমাজের কুলপতিরা রেগে আগুন হলেন, আর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা এটাকে একটা সুযোগ ভেবে এই তরুণ-তরুণীদের ওপর সব রকমের কলঙ্ক লেপন করতে লাগল। কিন্তু নিজের কথা ভেবে জনগণ সর্বদাই তাদের সঙ্গেই থাকল যারা প্রাণ দিতে পারে। যখন কম্যুনিস্ট তরুণীরা তাদের বীরকথামগুলী রচনা করল, তখন বিরোধীপক্ষ আরও আকাশ মাথায় তুলে নিল। বীরকথা নৃত্য নয়। মাঝে মাঝে দু তিন পা এগিয়ে পিছিয়ে হেঁটে গান করতে হয়। বিরোধীরা বলতে লাগল, 'দেখ এরা বেহায়া মেয়েদের দিয়ে নাচগান করিয়ে বেড়ায়।' সম্মেলনের সময় উদয়া আর ওর দুই বন্ধু জোয়ার মর্মভেদী বীরগাথা গেয়েছিল। ৪০ হাজার নরনারীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এমনিতে মহিলারা নিজেদের গান এবং অভিনয় সাধারণত মহিলাদের মধ্যেই করে থাকে। কুকুররা তো ঘেউ ঘেউ করেই, কিন্তু জনসাধারণ যখন ওই তরুণীদের পক্ষে তখন এসব ভ্রূক্ষেপ করা কেন?

ভাগবতকথা এবং কালক্ষেপ-এর পুরনো ঢঙে কেউ কেউ নতুন যুগের কথা শোনালো। দুজন যুবক অন্ধ্রের ভিখিরি ফকিরদের বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো। একজনের হাতে ছিল চিমটে আর একজনের হাতে খর-খর করে ঘোরে এরকম একটা কাঠের টিয়াপাখি। 'আল্লা আল্লা' করে মাঝে মাঝে দু-চারটে হিন্দি কথা আর বাদবাকিটা তেলুগু ভাষায় তারা এমন বিচিত্র ভাবভঙ্গিমা করে গাইছিল যে যারা ভাষা বুঝতে পারে না তারাও প্রভাবিত না হয়ে পারল না। আমাদের মধ্যে অনেকের কানগুলো খাড়া হয়ে গেল-অন্ধ্রের বন্ধুরা মাটিকে সোনা করার বিদ্যা শিখে নিয়েছে। জনগণের মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম এরকম যে কোনও গান বা অভিনয়কে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। মেবারের যাযাবর শস্যওলারা একসময় অন্ধ্র পর্যন্ত গরুর গাড়িতে মাল নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করতে যেত। রেলপথের ফলে ওরা নিজেদের ব্যবসা থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, ওরা নিজেদের দেশেও ফিরতে পারল না, কয়েকহাজার ওখানেই থেকে গেল। আজও তারা হিন্দি কথা বলে আর নিজেদের হোলি ইত্যাদি পর্ব উদযাপন করে। দিনমজুরি বাদে ওদের মহিলারা নাচগান করে কিছু ভিক্ষা উপার্জন করে। গরবার মত হাততালি দিতে দিতে শরীরকে এপাশে-ওপাশে ঝুঁকিয়ে চক্রাকারে ঘুরে যাওয়া আর দেশী সুরে গান—এটিই হলো লম্বাডী নৃত্য। এই যাযাবরদের এখানে লম্বাডী বলা হয়। লম্বাডী মহিলাদের মত ঘাগরা-ওড়না পরে, চুলগুলো কানের ওপর দিয়ে কড়ি আর রুপোর ঝুমকো দুল ঝুলিয়ে ৭ থেকে ১২ বছরের কয়েকটি মেয়ে লম্বাডী নাচ দেখাল। গানগুলোর সুর লম্বাডীদের ছিল, কিন্তু

তেলুগু ভাষার কথাগুলো বাঙলার আকাল বা মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করার মত ছিল।

খোলা মঞ্চের ওপর কোনো পর্দা ছাড়াই হিটলার, মুসোলিনি, তোজোকে নিয়ে সুন্দর প্রহসন করা হলো। এই প্রহসনে শুধুমাত্র হাসির খোরাকই ছিল না, ওতে দেখানো হয়েছিল রাবণের মত ফ্যাসিস্টরা পৃথিবীর চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে এগিয়ে গেল, কিভাবে স্তালিনগ্রাদ এবং অন্যান্য জায়গায় তাদের পরাজয় শুরু হলো। আবিসিনিয়া, টিউনিসিয়া, সিসিলি প্রভৃতি স্থানের পতনের সঙ্গে মুসোলিনির পতন হলো। তারপর হিটলারের হাত ধরে মুসোলিনির কান্না খুব আকর্ষণীয় ভাবে প্রদর্শিত হয়েছিলো। মাঝিদের নাচ আর অন্য অনেক অভিনয় এত সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করল, 'অন্ধ্র আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, আমরা বুঝতে পারিনি যে যাকে লোকেরা গ্রাম্য মনোরঞ্জন বলে তার মধ্যে এত শিক্ষণীয়, এত মাধুর্য, এত বিনোদন এবং শক্তির উৎস আছে।' আলিগড়ের বন্ধুরা ঢোলা, চবোলা, ধোপা-কুমোর এবং অন্যান্য খেটে-খাওয়া জাতির নানান রকমের গান এবং নাচ শুনিয়ে বলল, 'এখন থেকে আমরাও গণজাগরণের জন্য লোকশিল্পের ব্যবহার করব।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের মধ্যে কেউ নিজে নাচ-গান করতে পারে?' এক যুবক বলল, 'হ্যাঁ, আমি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নাচতে গেলে লজ্জা পাবে না তো?' যুবক বলল, 'এতদিন লজ্জা পেতাম, কিন্তু মনে হয় এখানে কৃষ্ণা[১] মা সেটা ধুয়ে দিয়েছেন।'

যখন চারদিক থেকে সমস্যার পর সমস্যা আসছিল, তখনও সম্মেলনের কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের কাছে ব্যাপৃত ছিলেন। আত্মবিশ্বাসের কারণ ছিল। ওঁরা শুধু হাওয়ায় কাজ করেন নি। কৃষকরা খুব উৎসাহের সঙ্গে সম্মেলনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেদিন পনেরশো গরুর গাড়ি প্যাণ্ডেলের আশোপাশের জায়গায় জড় হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা পরিচ্ছন্নতা এবং জলের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছিল, বাকি লোকদের এবং পশুদের খাবার জিনিস কৃষকরা নিজেরাই নিয়ে এসেছিল। যেভাবে লোকসংস্কৃতিকে এক নতুন রূপ দেওয়া হয়েছিল সেই ভাবেই কৃষকরা ধর্মীয় পালাগুলিকেও এক নতুন চেহারা দিল। তীর্থ যাত্রীদের 'প্রভা' (শিখর)-র ওপর দেবতাদের ছবির জায়গায় শ্রমিক কৃষক নেতাদের বিরাট-বিরাট ছবি লাগানো হয়েছিল এবং সেগুলিকে লালঝাণ্ডা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। যাতায়াতের জন্য গাড়িগুলো অত্যন্ত দরকারী হলেও গ্রামবাসীরাও প্রভার জন্য একটা গাড়ি সংরক্ষিত রেখেছিল। এক একটা গ্রাম সম্মেলনের জন্য তিন হাজার টাকা দিয়েছিল আর সেখানকার দু'হাজার স্ত্রী-পুরুষ উৎসবে যোগদান করেছিল। গ্রামের বাড়িতে থাকতে লোকেরা রাজি ছিল না। এ কথা বলাতে এক বৃদ্ধা পরিষ্কার জবাব দিল, 'আমি নিশ্চয়ই যাবো। কি জানি ভবিষ্যতে আবার এই সুযোগ পাবো কিনা।' বিজয়ওয়াড়ার প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে এক মুসলমান পরিবার গাড়িতে এসেছিল। এদিককার গ্রামের মুসলমানরাও এক ধরনের হিন্দি কথা বলে। আমি এই গাড়িটার ওপর একটা সবুজ আর একটা লাল পতাকা দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই দু'রঙের পতাকা

[১] অন্ধ্রে প্রবাহিত কৃষ্ণা নদী।—স·ম·

কেন?' স্বাস্থ্যবান, দৃঢ়চেতা, বলশালী যুবক জবাব দিল, 'এটা আমাদের মুসলিম লীগের পতাকা আর এটা আমাদের কৃষক মজুরদের।' সে বলল, 'আমাদের গ্রামের সমস্ত মুসলমান কৃষকসভাতে এবং আমাদের মেহবুব পার্টিতে আছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের জন্য হিন্দিতেও গান বাঁধা হয়েছে?' উত্তর পেলাম, 'কমরেড মেহবুব আমাদের ভাষায় নাটক লিখেছেন, নাটক করেওছেন। আমরা জানি ফ্যাসিস্ট দানবের অত্যাচার, আমরা জানি সরকারের নিষ্কর্মা নীতি।'

ওখানে নয়, তবে পরে গুন্টুরে কমরেড মেহবুবের সঙ্গে দেখা হলো। এদিককার দক্ষিণের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হিন্দি (দকিনী) খুব মিষ্টি ভাষা। তার ব্যাকরণও খুব সহজ। লিঙ্গ-বচনের নিয়ম খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, বাইরের প্রদেশের লোকেদের জন্য এই ধরনের হিন্দি ভাষা হওয়া উচিত। মেহবুব উর্দুও ভালো জানেন। কিন্তু তিনি আর মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকদের জন্য নাটক লিখছেন না। তিনি ওদিককার অন্ধ্রই নয়, বরং দক্ষিণ ভারতের সমস্ত মুসলমান জনগণের জন্য নাটক লেখেন। সেজন্য দক্ষিণী ভাষাকে কাজে লাগিয়েছেন। উনি নিজের নাটকগুলি ছাপাতে চান কিন্তু ওদিকে উর্দুর সেরকম কোনও প্রেস নেই। অন্ধ্রের কম্যুনিস্টরা মুসলিম লীগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, ওঁরা তাকে মুসলমানদের জাতীয় সংস্থা মনে করেন এবং তাকে দুর্বল নয় বরঞ্চ সবল দেখতে চান। সেজন্য মুসলমান শ্রমিক-কৃষদের তাঁরা মুসলিম লীগের সভ্য হতে প্রেরণা দিয়ে থাকেন। তাঁরা ভাল করেই জানেন যে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক জনতা সামিল হয়ে গেলে মুসলমি লীগ রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ আর পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা এই গরুর গাড়ির পাড়াগুলোকে প্রবল আকর্ষণ নিয়ে দেখতে যেতেন। বালসঙ্ঘ-এর বালকরা দূরদেশ থেকে আসা আমাদের প্রতিনিধিদের দেখে লাল সেলাম ঠুকতো এবং তেলুগুভাষায় প্রেরণার গান শোনাতো।

জল এবং পায়খানা ছাড়াও এত বিশাল জনসাধারণকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু খাবার ঘরের ব্যবস্থাপকগণ এক লাখ লোককে খাওয়ানো খেলা মনে করতো। ওদের ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল যে কারও খাওয়ার কষ্ট হতো না। একবার খাওয়ার চার আনার টিকিট ছিল। এককে বারে চার থেকে পাঁচ হাজার লোককে বসাবার ব্যবস্থা ছিল, যাকে দুশো-আড়াইশোর বেষ্টনীতে ভাগ করা হয়েছিল। সেখানে না ব্রাহ্মণের ব্যাপার ছিল, না ছিল শূদ্রের, না হিন্দুর, না মুসলমানের। মানুষমাত্রেই একসঙ্গে এক পক্তিতে বসে ভোজন করছিল।

সম্মেলন উপলক্ষে অনেক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। হাজার হাজার বলদ, গরু আর মোষের এক বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল। সরকারের কৃষি-বিভাগের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা উচিত ছিল কিন্তু ওখানে তাদের কোনও চিহ্ন ছিল না। মধ্য-অন্ধ্রের এই জেলাগুলিতে ভালো জাতের গরু-মোষ পোষার কত যে শখ আছে তা এই প্রদর্শনী দেখে বোঝা যাচ্ছিল। অন্ধ্রের উত্তম বংশজাতদের সহেবিয়ানা, এবং মন্টগোমারী (মাহীওয়াল)-র বংশপরম্পরায় সুন্দর সুন্দর গরু-বলদ আর মোষও ওখানে ছিল। যে বলদরা প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল তাদের দেখার জন্য দর্শকদের ভিড় লেগেই থাকত।

প্রাচীন অন্ধ্রের তীর্থযাত্রা

ধান্যকটক (অমরাবতী), নাগার্জুনীকোণ্ডা, জগইয়াপেট্ট, গোলী ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসাবশেষ অন্ধ্রতেই আছে। প্রত্যেক পুরাতত্ত্ব-প্রেমিক এবং শিল্পানুরাগীদের কাছে এগুলো ভারতের মহানতীর্থ। আমি এদের বিষয়ে পড়েছিলাম, শিলালিপি এবং ভাস্কর্যগুলির ফটোও দেখেছিলাম। ১৯৩৩-এ ওখানে যেতে গিয়েও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এবারে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চাইছিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে আমি শ্রীযুক্ত সঞ্জীবদেবের মত পথপ্রদর্শক পেয়ে গেলাম।

সঞ্জীবদেব অন্ধ্রে একজন বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক, আর আমার মত ওঁরও ভবঘুরে জীবনযাপনের বাতিক ছিল। হিমালয়, উত্তর-ভারত এবং বাংলায় উনি কয়েক বছর ঘুরেছেন। ওঁর গ্রাম তুম্মপুডী। কৃষ্ণানদী পেরিয়ে দু'তিনটে স্টেশনের পরেই পড়ে। এই এলাকাটা জমিদারি ব্যবস্থার আওতায় নয়, এটা রাইয়তি এলাকা অর্থাৎ কৃষক ও সরকারের মধ্যবর্তী ভূস্বামীরা এখানে নেই।

তুম্মপুডীর ধার দিয়ে কৃষ্ণার বড় একটা খাল বয়ে যাচ্ছে। খেতগুলোর পাঁচ -ছ হাত লম্বা মোটা কয়লার মতো কালো মাটি জানান দিচ্ছে যে এখানকার জমি খুবই উর্বর; সেজন্য এক একরের দাম তিন-চার হাজার টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। গ্রামের আশেপাশে মিষ্টি লেবুর অনেকগুলো বাগান আছে, তাল আর বাবলা গাছ তো অসংখ্য—'তুম্মপুডী'র মানে হলো বাবলাক্ষেত্র। বোধহয় বাবলার জঙ্গলে এই গ্রাম সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে। গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিক সঞ্জীবদেবের সমজাতীয় কাম্মারা। ওদের অনেকের বাড়ি গ্রামের মত নয়, শহরের মত মনে হয়। সঞ্জীবদেবকে তাঁর কাকা পুষ্যি নিয়েছিলেন। বাড়িতে কেবল বৃদ্ধা কাকীমা ছিলেন, যিনি বেদান্তী হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বউ দেখার প্রলোভন নিয়ে আছেন। বোধহয় সঞ্জীবদেব এখন আর ওঁকে খুব নিরাশ করবেন না। গ্রামের একটি মেয়ে অনেকদিন ধরে ওঁর জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছে, কিন্তু সে ওঁর শিল্পানুরাগী মনের উপযুক্ত নয়। আবার সঞ্জীবদেব শহুরে পরীদেরও পছন্দ করেন না।

বাড়িটা পাকা, দোতলা, আলোবাতাস যুক্ত, সেটা সাজাবার কোনও চেষ্টা করা হয় নি। উঠোনে তুলসীর একটি চারা বাঁধানো উঁচু থালার উপর দুলছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, কাকীমা শুধু শুষ্ক বেদান্তীই নন। তিনি আমাদের জন্য অন্ধ্রের সুন্দর রান্না তৈরি করলেন, হ্যাঁ, ঝালের দিকে একটু দয়া দেখিয়ে।

আমরা পিঁড়িতে বসলাম। সবুজ কলাপাতায় অতিথিকে খাওয়ানো এখানে খুব ভালো বলে মনে করা হয়। কিন্তু খাবার সাজানো কলা-পাতা রান্নাঘর থেকে খাওয়ার জায়গায় আনা সহজ কাজ নয়, সে জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে গোলতলযুক্ত কানাহীন থালা থাকে, যার থেকে পাতাটাকে অনায়াসে টেনে এনে সামনে রাখা যায়। প্রত্যেক বার ঘি দিয়ে ভাত ভিজিয়ে দেওয়ারে নিয়ম অন্ধ্রে আছে। তরকারি, চাটনি, আচার, দই, সম্বর সব কিছু পাতার মধ্যে সামলানো কঠিন নয়, কিন্তু লংকা, নুন, তেঁতুল আর লেবু দিয়ে তৈরি ডালের রস 'চারু'র বিরাট ধারাকে ভাতের মধ্যে সামলানো আমার পক্ষে সর্বদাই বিরাট সমস্যা। দক্ষিণের অভ্যস্ত লোকেরা এ সময় কব্জি পর্যন্ত তাদের হাতটা ভাত চটকাতে আর চারু

মাখতে কাজে লাগায় কিন্তু চীনা চপস্টিকের সঙ্গে অভ্যস্ত হলেও এখন পর্যন্ত আমি একাজে অসফলই রয়ে গেলাম। এখানকার কাম্মা পুরুষদের দেখেছি, কিন্তু মহিলাদের দেখা সম্ভব নয়, কারণ তাঁরা অন্ধ্রের সেই তিন কুলীন বংশের মধ্যে পড়েন, যাদের মহিলারা পুরুষদের সামনে বার হন না। কাম্মা লোকদের রূপ, বর্ণ আর আকৃতি দেখে বোঝা যায় যে উত্তর ভারতের লড়াকু জাতির সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে।

ধান্যকটক—১৮ মার্চ আমরা দুজন রেলপথে গুন্টুর গেলাম। ধান্যকটক (অমরাবতী) ওখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে। মোটর-বাস সবসময় চলে। ধান্যকটক বৌদ্ধদের কাছে এখনও পবিত্র স্থান এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধদের কাছে এটা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। এর নামেই তিব্বতে আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় মঠ (আট হাজার ভিক্ষুদের জন্য) ডেপুঙ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'ডেপুঙ' শব্দের অর্থ হলো ধান্যকটক বা ধান্যরাশি। তান্ত্রিক বৌদ্ধমত অনুযায়ী বুদ্ধ তন্ত্র-মার্গের প্রথম উপদেশ এখানেই দিয়েছিলেন, সেজন্য এ স্থান ওঁদের কাছে বুদ্ধগয়ার থেকে কিছু কম পবিত্র ছিল না। যদিও এতে ঐতিহাসিক সত্যের অংশমাত্রও নেই কিন্তু এর থেকে অবশ্যই স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

ধান্যকটক যাওয়ার পথ-নির্দেশক কিছু বই তিব্বতে লেখা হয়েছে, যাতে বেশির ভাগ শোনা কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। ধান্যকটকে মৌর্যদের পর বৌদ্ধদের এক বিরাট দুর্গ ছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। ধান্যকটকের মহাচৈত্যে ভাস্কর্যের সুন্দর নিদর্শন ছিল, সেখানকার পাষাণ ফলকগুলি এখনও তার সাক্ষী। এগুলির প্রায় সবই লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। অমরাবতীর শিল্প এক স্বতন্ত্র শৈলী। কিন্তু শুধু শিল্প ক্ষেত্রেই নয়, এই চৈত্য (স্তুপ) বৌদ্ধদের একটি প্রধান ধার্মিক সম্প্রদায় 'চৈত্যবাদী'কেও নিজ নামে পরিচিত করেছে। তিব্বতী পরম্পরা অনুসারে ধান্যকটকের পূর্ব এবং পশ্চিমের দুটো পাহাড়ের কাছে বাস করার দরুন দুটো বৌদ্ধ সম্পদায়ের নাম হয়েছিল পূর্ব-শৈলীয় এবং অপরশৈলীয়। ধান্যকটক থেকে পাঁচ মাইল পূর্বে এখনও একটা পাহাড় আছে কিন্তু পশ্চিমের পাহাড়টা তিরিশ মাইলের থেকে বেশি দূরে।

ধান্যকটক কৃষ্ণা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। সমুদ্র থেকে এখান পর্যন্ত নৌকাগুলির আসতে কোনও বাধা না থাকায় সমৃদ্ধির সময়ে ধান্যকটক একটা প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল; সেইসঙ্গে ধান্যকটক অন্ধ্র সাম্রাজ্যের পূর্ব ভাগের রাজধানী রূপে বোধ হয় অশোকের সময় থেকেই পরিচিত ছিল, পরে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের সময়ে তা নিজের চরম উৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। ধান্যকটকের ধ্বংসাবশেষ আজও আট-দশ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই ধ্বংসাবশেষের উপর অমরাবতীর ছোট মফস্বল শহর এবং ধরনাকোটের ছোট একটি গ্রাম অবস্থিত। অমরাবতীর কাছে, কিন্তু ধরনাকোট থেকে মাইলখানেক পশ্চিমের মহাচৈত্যের ধ্বংসস্থান। এর সুন্দর প্রস্তরফলকগুলি অনেক আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তারপরে খনন করে যে প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে, তার থেকে কিছু জিনিস এখনও ছাউনি করা ঘেরা জায়গায় রাখা আছে। যদিও উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি ভেঙে গেছে, কিন্তু তাও এগুলি ধান্যকটকের দক্ষশিল্পীদের হাতের তারিফ আদায় করে। ধরনাকোটে শেখ, সৈয়দ, মুঘল,

পাঠান, মুসলমানদের অনেকগুলো পরিবার বাস করে, যাদের জীবিকা হলো চাষবাস এবং কেনাবেচা করা, কিন্তু তাদের মধ্যেই ওই শিল্পীদের সন্তানরাও আছে, যারা নিজের হাতে মহাচৈত্যকে সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন ধান্যকটকের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের গর্ভে আমাদের শিল্প এবং ইতিহাসের কত সামগ্রী লুকিয়ে আছে তা আজকের সমাজব্যবস্থায় জানা সম্ভব নয়। এটা তখনই জানা যেতে পারে যখন দেশের ভবিষ্যত সহস্রশীর্ষ সহস্রবাহু জনগণের হাতে আসবে, যখন নতুন অন্ধ্রে উৎসাহ, শিল্পপ্রেম, সময় এবং শ্রমের অভাব থাকবে না।

শ্রীপর্বত (নাগার্জুনী কোণ্ডা)

১৯ তারিখে আমাদের দলটা চারজনের হল। গুন্টুর থেকে রেলপথে মাচেরলা পৌঁছলাম দুপুরে। মাচেরলা পৌঁছবার কয়েক মাইল আগে থেকেই পাথুরে জমি দেখা যায়। এই পাথরগুলো কোথাও কোথাও দুয়েক হাত মাটির তলায় থাকে, কোথাও কোথাও ভূমির সঙ্গে একই স্তরে এবং কোথাও একটু উপরেও উঠে থাকে। এগুলো সিমেন্টের পাথর। এক সিমেন্ট কোম্পানি এগুলো ট্রেনে করে পঞ্চাশ মাইল দূরে নিজেদের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যায়। এখনকার অন্ধ্রের ঝুপড়িগুলোর জন্য সিমেন্টের দরকাব হয় না, কারণ আজকের জনগণ নিজের এবং সিমেন্টের পাহাড়ের মালিক নয়। যখন এদের মালিকানা হবে তখন একটা ছোট ফ্যাক্টরিতে কাজ চলবে না, তখন এই সিমেন্ট প্রসবিনী ভূমি এক সিমেন্ট উৎপাদক নগরে পরিণত হবে এবং আজকের নিস্পৃহতা এবং দারিদ্রের কোনও চিহ্ন থাকবে না।

মাচেরলা একটা ছোট বাজার। অট্টালিকার উপযুক্ত প্রস্তরফলক এখনও এখানে তৈরি হয়ে থাকে, শ্রীপর্বতের ধ্বংসাবশেষ খনন হওয়ার পর গরুর গাড়ি চলার মত রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। পথটা উঁচু-নিচু পাহাড়ী জমির মধ্যে চলে গেছে। আমরা দুটো গরুর গাড়ি ভাড়া করেছিলাম। প্রচণ্ড রোদ ছিল, আর অনেক দূরে দূরে অবস্থিত পথের চার-পাঁচটা গ্রামেই শুধু জল পাওয়া সম্ভব ছিল। আমরা শ্রীপর্বতের পাশের গ্রাম 'পুল্লারেডিগুলম'-এর এক ব্রাহ্মণযুবককে সঙ্গী পেয়েছিলাম। আমি ওকে এখন পর্যন্ত পার্টি-সমর্থক বলেই জানতাম, আমি কি জানি যে সতেরশো বছরের পুরনো শিলালিপিগুলোকে সেও আমার মতই করে ফরফর করে পড়তে থাকবে। যুবকটি সংস্কৃত বা পালি ভাষা পড়ে নি, তাও সে যেখানে-সেখানে শব্দের অর্থ বুঝে ফেলত। এই রহস্যটা আমি পরের দিন জানতে পারলাম। পলনাড-এর এই পাহাড়ী এলাকা অনেকদিন পর্যন্ত বীরদের জায়গা ছিল। আজও এখানকার বীরদের অনেক বীরগাথা লোকেরা রাত জেগে জেগে শুনে থাকে। এই কয়েক বছর আগে এখানে যারা লিডারী করতে চায় তারা একটা আন্দোলন করল, যাতে জনগণ তাদের ঐতিহ্যকে উৎসাহের সঙ্গে স্মরণ করল। নেতারা রাজনৈতিক শিক্ষা বা সংগঠন করতে তো জানত না। উচ্ছৃঙ্খল জনতা একবার খুব উৎসাহ দেখাল, তারপর পুলিশ আর মিলিটারি যখন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন ওদের যা দুর্গতি হল তাতে মেদিনীপুর এবং বালিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। এখনও

লোকেরা শঙ্কিত থাকে কিন্তু পলনাডের স্বাভাবিক বীরত্ব এখনও সেই মাটি ছেড়ে যায় নি।

গ্রামে কোথাও কোথাও লম্বাড়ী যাযাবর লোকদেরও ঝুপড়ি আছে। আগের গ্রামেই তো আমি ওদের ভাষা সর্বপ্রথম শুনতে পেয়েছিলাম, সেজন্য আমি সেটা পরখ করে দেখার জন্য নিজের কথাবার্তা চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করলাম। পরে জানতে পারলাম যে এটা মেবারের দক্ষিণ সীমান্তের ভাষা। 'ছে', 'ছো' লাগিয়ে পরের গ্রামে আমি যখন এক মহিলাকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম, তখন ওর চেহারা চকচক করে উঠল। সে ভাবল আমিও বুঝি লম্বাড়ী। হয়ত কুড়ি বছর আগে হলে আমিও কিছুদিন লম্বাড়ী হয়ে থাকতাম। এদের থাকবার খুব ছোট ছোট খড়ের ঝুপড়ি আছে। এরা অন্ধ্রের খুবই গরিব জাতি। নিজেদের পূর্বপুরুষদের ভাষা, বেশভূষা, আদব-কায়দা এখনও এরা ধরে রেখেছে, সেজন্য এরা সাধারণ জীবন নয়—এক অজ্ঞানতাপূর্ণ দারিদ্রের জীবন কাটাচ্ছে। জীবনের দুঃখ ভুলে থাকবার জন্য ওদের নিজেদের নৃত্যগীত আছে, যাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে, কখনও পয়সা হাতে এলে সুলভ মদিরার সহায়তা নিয়ে থাকে। সেই লম্বাড়ী মহিলা আমাকেও লম্বাড়ী ভেবে খুব পুলকিত হয়েছিল। সেই ছিন্ন মলিন বস্ত্রে আবৃত শরীর, কড়ির ঝুমকো শোভিত কেশরাশি-পরিবৃত কৃশ গৌরবর্ণ মুখের ওপর অকাল বার্ধক্যের সঙ্গে ঝিলিক মারা হাসি আমার মনে কি না জানি ভাবের জন্ম দিচ্ছিল! কিন্তু আমি এই ভেবে খুশি হলাম যে অন্ধ্রের নতুন নেতারা জনগণের জন্য কাজ করছেন, ওদের অন্ধ্রে কোনও জাতির জীবনযাত্রায় বাধা দেওয়া সম্ভব নয়।

দশ মাইল পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। এবার জমি শুধু এবড়ো-খেবড়োই ছিল না, ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় ঢাকা পাহাড়ও এখানে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, যখন আমরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছলাম। বন্দুরা বলল যে এটা দুর্গের প্রথম ফটক। এর পরই উৎরাই শুরু হল আর একটু এগিয়ে আমরা দ্বিতীয় ফটক পেলাম। ফটক মানে বড় বড় পাথরের দেয়াল যেগুলো দুদিক থেকে কাছাকাছি এসে গেছে। প্রথম ফটকের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত কিন্তু দ্বিতীয় ফটক সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না।

রাত নটার সময় আমরা পুল্লারেড্ডীগুডুম-এ পৌঁছলাম। এটা দেড়শো ঘরের একটা ছোট্ট গ্রাম। গ্রামে দুটো ছোট ছোট ধর্মশালা (চোলট্রি বা ছত্রম্) আছে। একটা ধর্মশালা গ্রামের বেনেরা ধর্মের উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। দুটো ঘরের মধ্যে একটাতে আমরা জিনিসপত্র রাখলাম আর বাইরের বারান্দায় এবং তার পরের খোলা উঠোনে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম।

শ্রীপর্বতের এই লম্বা চওড়া উপত্যকা একটা বড় কড়াই-এর মত চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কড়াই-এর ধার দু জায়গায় ভেঙে গেছে, যেখানে কৃষ্ণা তার চরণ স্পর্শ করেছে। কৃষ্ণার তীরে মোগল অর্থাৎ নিজামদের রাজত্ব। ধান্যকটক এখান থেকে নীচে প্রায় সত্তর মাইলের মতন। কিন্তু নৌকো পোর্তুগাল পর্যন্তই আসতে পারে। এর পর পাথরের চাঁই-এর দরুন আসতে পারে না; অর্থাৎ লঙ্কা এবং অন্যান্য দ্বীপের যে বৌদ্ধ যাত্রীরা নিজেদের শিলালিপি এই শ্রীপর্বতে রেখে গেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের

সামুদ্রিক নৌকো নিয়ে পোর্তুগাল পর্যন্ত এসে থাকবেন, তারপর ওঁদের উনত্রিশ মাইল পায়ে হেঁটে যাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়েছে।

শ্রীপর্বত 'আশ্চর্যবার্তাসহস্রাং'-এর উৎপত্তিস্থল ছিল। শ্রীপর্বতের তন্ত্রমন্ত্রবেত্তাদের অলৌকিকতার প্রতিধ্বনি সংস্কৃতের অনেক কাব্যেই গুঞ্জরিত হয়েছে। দ্বিতীয় শতকে মহান দার্শনিক নাগার্জুন-এর তো এটা খুবই প্রিয় স্থান ছিল। তারপরে এটা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান হয়ে উঠল। নাগার্জুনের অনেক দার্শনিক রচনা এখানেই লেখা হয়ে থাকবে। তাঁর 'সুহৃদ' সাতবাহন[১] নরপতিকে উদ্দিষ্ট। বিখ্যাত 'সুহৃল্লেখ' উনি সম্ভবত এখানে বসেই লিখে থাকবেন। সুশিক্ষায় পরিপূর্ণ এর পৃষ্ঠাগুলি আজও তিব্বতী এবং চীনাভাষার অনুবাদে সুরক্ষিত আছে। নাগার্জুন নিজের 'বিগ্রহব্যার্তনী' এবং অনান্য প্রবন্ধের দ্বারা তর্ক ও ন্যায়শাস্ত্রের যে সূচনা করেছিলেন, সেটাই পরবর্তী কালে সমস্ত ভারতের ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের উৎস হল।

এখন শ্রীপর্বতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। পর্বত ও কৃষ্ণা পরিবৃত শ্রীপর্বত একটা প্রাকৃতিক দুর্গ, কিন্তু এটা যে কখনও কোনো বিরাট রাজধানী ছিল, তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। চান্তমূলের বোন চান্তিসিরী আর পুত্র রাজা বীরপুরিসদত (বীরপুরুষদত্ত) ও তাঁর পুত্র রাজা এহুবল চান্তমূল অজস্র ধনরাশি ব্যয় করে শ্রীপর্বতের শোভন স্তূপগুলি তৈরি করিয়েছিলেন। রাজধানী ধান্যকটক থেকে সত্তর মাইল দূরে এই দুর্গম পর্বতে এই অদ্ভুত কৃতিগুলির নির্মাণ এই স্থানের ধার্মিক মাহাত্ম্যের পরিচয় দেয়।

পরদিন আমরা খুব সকালে স্তূপের ভগ্নাবশেষগুলি দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। দু-তিন ফার্লং পর একটা ছোট্ট টিলার উপর একটা ছোট্ট স্তূপ আছে। তার উত্তরদিকে ভিক্ষুদের থাকবার ঘরগুলি দিয়ে ঘেরা উপোসথাগার পেলাম। এর ইঁটগুলি ১৬ ইঞ্চি লম্বা, ৯ ইঞ্চি চওড়া আর দু ইঞ্চি মোটা ছিল। টেকরী থেকে আর একটু পূর্বদিকে গেলে সমতল ভূমিতে শ্রীপর্বতের সব থেকে বড় স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই স্তূপ অনেক 'অশ্বমেধয়াজী' রাজা বীরপুরুষদত্তর পিসি চান্তিসিরী তৈরি করিয়েছিলেন। শিলাস্তম্ভগুলির উপর খুব সুন্দর অক্ষরে অনেকগুলি দীর্ঘ রচনা উৎকীর্ণ আছে, যাতে ধান্যকটকের ইক্ষ্বাকুবংশের বহু ব্যক্তির নাম এবং তাঁদের ধর্মপরায়ণতার উল্লেখ আছে। এই লিপিগুলির থেকে জানা যায় যে চান্তমূল (শান্তমূল)-এর দুই বোন ছিল- বড় চান্তিসিরীর বিবাহ পোগিয় বংশজ খন্দসিরির সঙ্গে হয়েছিল। চান্তমূলের পুত্র রাজা বীরপুরুষদত্তর রানী ছটসিরি (যষ্ঠিত্রী)-র পিতার নাম ছিল হম্মসিরি (হর্ম্যশ্রী)। বীরপুরিসদত্তের পুত্র রাজা এহুবল চান্তমূলের নামও শিলালেখে আছে। উজ্জয়িনীর বুদ্রধর ভট্টারিকারও দানের একটি উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত সেই সময় ধান্যকটকের রাজবংশের উজ্জয়িনীর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। স্তূপের শিলাকঞ্চুক অনেক মূর্তিচিত্রের দ্বারা অলংকৃত ছিল, যার অনেকটা অংশ খনন-কার্যে পাওয়া গেছে এবং আজও তা পাশের মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে। মহাচৈত্যের কাছে

[১] কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে সাতবাহন রাজ্যের পূর্বাংশ তৃতীয় শতকে জয় করে নিয়েছিল ঈক্ষ্বাকু রাজবংশ। পল্লবরা আবার তাদের পরাজিত করে।—স·ম·

আর একটা চৈত্যঘর আছে যার ইঁটগুলি ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১১ ইঞ্চি চওড়া এবং তিন ইঞ্চি মোটা। মহাচৈত্যের একদিকে ৩৬ টি স্তম্ভের বিরাট উপোসথাগার ছিল।

মিউজিয়ামে তৎকালীন অন্ধ্রের ভাস্কর্যের যে অদ্ভুত নিদর্শন পাওয়া যায় তা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শিল্পীদের কাছে এই শ্বেতপ্রস্তরগুলি পাথর নয়, মনে হয় মাখন বা মোম ছিল। কত কোমল হাতে ওরা নিজেদের ছেনি চালিয়ে থাকবে! শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যের কাজ দারুন! বড় মূর্তিগুলিতেই শুধু না, ক্ষুদ্রতম মূর্তির ক্ষেত্রেও সেই একই নৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়। নিষ্প্রাণ পাথরে কি রকম সজীবতা সঞ্চার করা হয়েছে! উৎকীর্ণ দৃশ্যগুলিতে কোথাও বুদ্ধের জীবনচরিত সংকেতের দ্বারা অঙ্কিত আছে, আবার কোথাও সাক্ষাৎ মূর্তির দ্বারা। অনেক জাতক গল্পের দৃশ্যও রয়েছে। এক জায়গায় কুলীন স্ত্রী-পুরুষদের নৃত্য হচ্ছে। সঙ্গে বীণা, ঢোলক ইত্যাদি বাদ্য বাজছে। এই মহিলাদের অনেক অলংকার আজও অন্ধ্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নাকে চার-চারটে গয়না পরার মত মহিলাদের তখন খুব অভাব ছিল। এক জায়গায় এক যোদ্ধাকে অঙ্কিত করা হয়েছে, তার মাথার উপর ছুঁচলো টুপি। লম্বা জামা, কটিবন্ধ আর পাজামার সঙ্গে তার লম্বা দাড়িও আছে।

শ্রীপর্বত যদিও মহাযানপন্থী এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধদের কাছে পরম পুণ্যস্থান ছিল, তাহলেও এখানকার এই দৃশ্য ও মূর্তিগুলির মধ্যে মহাজান ও তন্ত্রযানের ছায়া দেখা যায় না।

মহাচৈত্যের থেকে দক্ষিণে কয়েক ফার্লং দূরে দু-তিনটে আরও বৌদ্ধবিহার এবং স্তূপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বড় বড় স্তম্ভ এবং মূর্তিগুলি যেভাবে ভেঙে গেছে, তাতে মনে হয় যে বিহারগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীপর্বত শিলালেখে পূর্ণ, যদিও সেগুলোতে কয়েকটি নামের বাইরে অন্য কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এই শিলালেখগুলিতে সেই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যেটা পালির কাছাকাছি। ইক্ষ্বাকু এবং তার উত্তরাধিকারী পল্লব রাজাদের প্রাকৃত রচনাগুলি বলে দেয় যে, সম্ভবত এই ভাষাই সে সময়ের শাসকবর্গের মাতৃভাষা ছিল। এটা নিশ্চিত যে, বর্তমান তেলুগু ভাষার প্রাচীন রূপই ছিল সর্বসাধারণের ভাষা। সেই সময় অন্ধ্র-সাম্রজ্যের পশ্চিম এবং পূর্বভাগে জনগণের ভাষা এবং শাসকবর্গের ভাষার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়েও শাসকদের ভাষার (শিলালিপির ভাষা) রমরমা ছিল। এটা কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞাতব্য বিষয় যে কোন শতকে মহারাষ্ট্রে মারাঠী জনগণের নিজস্ব ভাষার স্থান দখল করল এবং অন্ধ্রের তেলুগু ভাষা শাসকদের ভাষাকে নির্বাসিত করল। 'ইকড়ে', 'তিকড়ে', 'কোণ্ডা' (পর্বত) ইত্যাদি মারাঠীতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া বহু শব্দও দুটি রাজ্যের এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ করছে।

লম্বাডী—পুল্লারেড্ডিগুড়ম-এ অনেক লম্বাডী পরিবার বাস করছে। পুরুষদের পোশাকে কোনও তফাৎ নেই, কিন্তু মহিলারা নিজেদের বেশবাস প্রত্যেক দেশে এবং কালে সহজে ত্যাগ করে না। লম্বাডী মহিলারাও এর ব্যতিক্রম নন। এখনও তাঁরা মেবারের যাযাবরদের পোশাকটা বজায় রেখেছেন। যেগুলো অন্ধ্র মহিলাদের লম্বা শাড়ির পাশে বিচিত্র দেখায়।

নিজেদের ঘাঘরা, ওড়না আর কড়ি-রুপোর গুচ্ছ বসানো চোলি সেলাই করতে ওদের নিশ্চয় খুব অসুবিধে হয়ে থাকে। হাতের কাঁকন ও হাতির দাঁতের চুড়িগুলো বাহুর উপরিভাগ পর্যন্ত চলে যায়। ওদের নাচে খুব পরিশ্রম হয়। ওরা নাচের সময় একটা গান করেছিল-

'তুঁ পাঁচ পচীস দে, তু মোরে ভাই, গুগরুগ্।
তারী বাসড়ীরে মুড়ো ছোড় রে, পাঁচ পচীস দেরে।
তারে বেটানে পূচণ দেরে, মোরে ভাই।
তারী বেটীনে পূচণ দেরে।
তারে খ্বাড়িন পূচণ দেরে।
তারী বাড়ীনে পূচণ দেরে।
তারে ভাইনে পূচণ দেরে।
তারী ভাইরী খ্বানীনে দেরে।
তারে ভীয়ানে পূচণ দেরে।
তারী যাড়ীনে পূচণ দেরে।
তারী ভোজাইনে পূচণ দেরে।
তারী বাইনে পূচণ দেরে।
তারী ভ্যাননে পূচণ দেরে।। ১ ।।'
'ভীযানে হাথে সোনেরী অঁগুঠী, খোঁসলা, খোঁসলা।
বাপুরে হাথে সোনেরী ঝারী।
মিচুড়া (বিচ্ছু) খোঁসলারে।
দাদারে হাথমো সোনেরা ঝারী, মিচুড়া খোঁসলা খোঁসলারে।
কাকারে হাথে সোনেরা কড়া, মিচুড়া।। ২ ।।'
'ককা বসেরিয়ে, দরজী ঝীকড়িয়া।
নসার ছাঁণ, লেখো করোরে, দরজী ঝীকড়িয়া ।। ৩ ।।'

লম্বাডীরা আজ গঙ্গার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু গঙ্গাকে এখনও ভুলে যায়নি, কৃষ্ণা গোদাবরী গীতের জায়গায় লম্বাডীনীরা গান করে, 'ব্যাতণুরে পগলা, হেঠে গঙ্গা বহীজা'

লম্বাডী ভাষার কিছু শব্দ হ'ল-

বাপ, য়াড়ী (মা), ভীয়া (ভাই) ভোজাই, সাড়ী (শালিকা), নানা (দাদু), নানী (দিদিমা), কাকা, (পিতামহী), দাদা (পিতামহ), দাদী, মাসা, (মাসী), ফুপী(পিসি), ফুপা (পিসেমশাই), বাপুর বর (বাপের বাড়ি), ভ্যাঁন (দাদুর বোন), বাই (মোট বহন), সসুরো (শ্বশুর), সাসু (শাশুড়ি), মামা, জম্মী (ভূমি), খেতব (খেত), ঘউ(গম), সাড়(ধান), চাওয়ড়(চাল), গোয়াড়িনী(ভার্যা), ছ্বাড়া(ছোকরা), ছ্বাড়ী(মেয়ে), রাড়ীঘর (বাপের বাড়ি), অঙ্গার, পানী (জল), নুন, মরচা (লঙ্কা), মাড়ী(মাছ), বোটী (মাংস), কুকুড়ী(মুর্গী), ছেড়ী(ছাগল), গোরলী(মোষ), গাওড়ী (গাই), বড়দ(বলদ), বাদড়(বাদল), রাম(আকাশ),

ভাটা(পাথর), ডোকরা(বুড়ো), ডোকরী(বুড়ি)।

দক্ষিণে হোলি পালনের রীতি নেই, কিন্তু লম্বাডীরা সেটা বেশ ঘটা করে উদযাপন করে। যদিও আজ ওরা চালের দেশে বাস করছে, কিন্তু রুটি আজও ওদের প্রধান খাদ্য।

নতুন অন্ধ্রের কিছু গ্রাম

দাওলুর—বেজওয়াড়ার কৃষক সম্মেলন আমরা কৃষকদের উৎসাহ লক্ষ করেছিলাম। আমি ওদের এক-আধটা গ্রাম দেখতে চাইছিলাম। সঙ্গীদের বলতেই দাওলুর দেখার ইচ্ছে জাগলো। এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ ইঁট-পাথরের সঙ্গে বা ইংরেজি শিক্ষিতদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। এবার খেতমজুরদের লালগাঁওতে যাবার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে বন্ধু পিচ্চাইয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ভালো হিন্দি জানেন। দাওলুর তেনালী স্টেশন থেকে আঠারো-উনিশ মাইল দূরে অবস্থিত। মোটর-বাস গ্রামের কাছ্ পর্যন্ত যায়। আমরা প্রায় দশটা নাগাদ ওখানে পৌঁছে গেলাম।

দাওলুর গ্রামে ৩০০০ একর (এক একর সমান ৪৮৪০ বর্গগজ) জমি আছে। গ্রামে একশোটি পরিবারের কাছে জীবন-নির্বাহযোগ্য জমি রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ব্রাহ্মণ, দশটি কাম্মা এবং একটি বেনে পরিবারের কাছে প্রচুর জমি আছে, ওরা কুলীন পরিবার। ২২০টি অচ্ছুত পরিবারের মধ্যে পঞ্চাশ জনের কাছে এক-আধ একর খেত আছে। বাকি কৃষকরা এখানে মজুর খাটে। পঞ্চাশটি কম্মো, তেলুগু আর মুসলমান পরিবারেরও জীবিকা কেবল মজুর খাটা। তিনজন মুসলমান কাঠমিস্ত্রী। তারা হাল-টাল বানাবার কাজ করে। পাঁচজন নাপিতও নিজেদের বৃত্তি নিয়ে জীবনযাপন করে আর ফসল ওঠার পর প্রত্যেক কৃষক ওদের দুবস্তা করে ধান দেয়। তিরিশটি ধোপা-পরিবারেরও কোনরকমে চলে যায়। কুড়িটি এরুকুল পরিবার ঝুড়ি বানায়, যেটা শস্যের দামে বিক্রি করে। তিরিশটা তেলুগু পরিবারের মধ্যে কিছু ফেরিওলা আছে। তিনটা চুণ্ডু পরিবার গ্রামের পাহারাদারের কাজ করে। পনেরটি ভ্রাম্যমান পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বীরকথা বলে ভিক্ষা করে। গ্রামের তিন-চতুর্থাংশ পরিবারের জীবিকা কেবল মজুরিতে চলে। কিন্তু এই তিনশো খেতমজুর আজ সমস্ত গ্রামের হর্তাকর্তা। যে বারো-তেরো জন ধনী কৃষক আছে তাদেরও এত সাহস নেই যে গ্রামের বিরুদ্ধে যাবে। আজ এই গ্রামের মজুরসভার ৪০০ সদস্য আছ আর কৃষকসভার ১০০, মহিলাসভার ১০৬ এবং বালসংঘের ৬০। এ ছাড়া ৫২ জন ভলন্টিয়ার আছে। কম্যুনিস্ট পার্টির ৪০ জন মেম্বারের মধ্যে ৩২ জন অচ্ছুতদের জাতির মজুর। কিন্তু দাওলুরের এই অচ্ছুতদের শুধুমাত্র পাঠকদের বোঝার সুবিধের জন্য আমি অচ্ছুত লিখছি, তা না হলে ওরা নিজেদের অচ্ছুত মনে করে না। অন্যেরাও ওদের সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করে না। ওদের আত্মসম্মান কম্যুনিস্ট শিক্ষা এবং কাজের দ্বারা স্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছে। এটা সত্যি যে, এখন ওদের দারিদ্র ঘোচে নি কিন্তু আগের থেকে অনেকটা কমে গেছে। মজুরিও বেড়ে গেছে আর দাওলুরের মজুর কমরেড যে রকম সৎভাবে কাজ করে, তাতে রাস্তার ঠিকাদার এবং অন্যান্য লোকেরা ওদের নিয়োগ করতে পছন্দ করে।

দাওলুর কৃষকদের মধ্যে এই পরিবর্তন এলো কি করে? এই অচ্ছুতরা খ্রীস্টান হয়ে গেছে। এদের জন্য গীর্জার দরজাও খোলা এবং গ্রামে একজন পাদ্রীও থাকে। কিন্তু সাহেব পাদ্রী এই নবদীক্ষিত খ্রীস্টানদের থেকে ততটাই দূরে থাকতে লাগল যতটা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। মজুরি বাড়ানো অথবা আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য হিন্দু মালিকদের, মহাজনদের এবং সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হত, কিন্তু তার জন্য সাহায্য করতে পাদ্রী রাজি ছিল না। নিজের ভেড়াগুলোকে মরার পর স্বর্গে পৌছে দেওয়াটাই ওঁর পক্ষে সবচেয়ে সহজ কাজ মনে হত।

গ্রামে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৩৬-এ। সূর্যনারায়ণ রাও (কাম্মা) কংগ্রেসের উৎসাহী কর্মকর্তা এবং তালুক-কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। নিজের কাজে তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান। সমাজের একটুও তোয়াক্কা না করে উনি নিজে এক বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। কংগ্রেসের কাজ করার জন্য ওঁর এক পা সর্বদা জেলেই থাকত। উনি রাজমহেন্দ্রী জেলে ছিলেন। সেখানেই উনি কমরেড রামলিঙ্গাইয়ার সান্নিধ্যে আসেন। রামলিঙ্গাইয়া তাঁকে সাম্যবাদের বড়ি খাওয়ালেন। সূর্যনারায়ণ তাঁর গ্রামে মজুরদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করলেন। কিন্তু মজুররা ওঁদের কথা শুনতে রাজি ছিল না। ১৯৩৬-এ ওরা দেখতে পেল শুধু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। পাদ্রী বলত, 'এরা নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী, এদের কথা শুনো না।' দুর্ভাগ্যবশত সূর্যনারায়ণের মত তরুণদের এখনও এটা বোধগম্য হয়নি যে, ঈশ্বর আর ধর্মকে লাঠি নিয়ে আক্রমণ মানে শুধুমাত্র পাতা ছেঁড়া। সমস্ত বিপত্তির মূল হলো আর্থিক অসাম্য এবং আর্থিক শোষণ। সমস্ত শক্তি এই শোষণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত। তাহলে 'নষ্টে মূলে নৈব শাখা ন পত্রম্।'[১]

নিরাশ হয়ে সূর্যনারায়ণ বাইবেলের উপর অধিকার অর্জন করলেন এবং ধনীদের বিরুদ্ধে লেখা বাইবেলের অংশগুলি লোকদের সামনে তুলে ধরতে আরম্ভ করলেন। বছরখানেক পরিশ্রম করার পর মজুরদের মধ্যে কয়েকজন তাদের সহনুভূতি দেখাতে লাগল। ১৯৩৭ সাল চলছিল, মজুররা দুই কুনকে ধানের জায়গায় আড়াই কুনকে মজুরি হিসাবে চাইল। কাজ দেবার মালিকরা মজুরি বাড়াতে অস্বীকার করল। ৫০০ মজুর-মজুরনী খেতের কাজ ছেড়ে দিল। সূর্যনারায়ণ এবং তাঁর বন্ধুরা আশেপাশের গ্রামে গিয়েও মজুরদের বোঝাল এবং তাতে পাশাপাশি চোদ্দটা গ্রামের মজুররা হরতালে সামিল হল। মালিকরা অন্য গ্রাম থেকে মজুর আনিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা করল কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ফসলের কাজের ক্ষতি হচ্ছিল। আসলে হাল দেওয়া, বোনা, কাটার কাজ বছরের বারোমাস তো চলে না, এক সপ্তাহ-দুসপ্তাহের মধ্যে ওখানে বছর খানেকের কাজ নষ্ট হয়ে গেল। তিনদিনের হরতালের পর সমঝোতা হল এবং তাও দুই এর জায়গায় আড়াই নয়, তিন কুনকে মজুরিতে। মজুরসংঘের উপর এখন মজুরদের পূর্ণ আস্থা এসে গেল। স্বর্গে কি পাওয়া যাবে এটা খুব সন্দেহের ব্যাপার। কিন্তু প্রতিদিন এক কুনকে মজুরি বৃদ্ধি ওরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। তাহলে ওরা নিজেদের শক্তি ও সংগঠনের

[১]'মূল যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার না শাখা থাকে, না পাতা থাকে।'—স·ম·

সবচেয়ে বড় সাফল্য মজুর সংঘকে কেন মনে-প্রাণে ভালবাসবে না?

পাদরীরা কম্যুনিস্টদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হতে দেখে দ্বিতীয়বার ভয় দেখিয়ে বলল, 'যদি মজুররা সঙ্ঘ না ছাড়ে তাহলে আমরা বিবাহ করাবো না।' তারা ভাবলো যে সব থেকে বড় ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া হয়েছে, এখন মজুরদের মতি অবশ্যই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মজুরদের তো লাখ-দুলাখের কিছু সম্পত্তি ছিল না যে বিয়েটা নিয়মকানুন অনুযায়ী না হলে ভাগাভাগিতে বাধা পড়বে। তারা বলল, 'ছেড়ে দাও, আমরা গির্জাতে বিয়ে করতে যাবো না। আমাদের বিবাহ আমাদের শ্রমিকসংঘই করাবে।' তারপর শ্রমিকসংঘের পঞ্চ পুরোহিত হতে আরম্ভ করলেন। পঞ্চদের সম্মুখেই বরের গলায় বধূ মালা পরিয়ে দিত এবং বর বধূকে সৌভাগ্যের প্রতীক মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দিত। খাওয়া-দাওয়ার নিমন্ত্রণ সংঘই করে দিল এবং বিয়েতে পাঁচ টাকার বেশি ব্যয় করতে নিষেধ করে দিল। শ্রমিক সংঘের সংগঠনে যোগ দিয়ে ওরা যেভাবে যেভাবে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি হতে দেখতে পাচ্ছিল এবং যতই ওরা কম্যুনিস্টদের সংসর্গে বেশি বেশি আসছিল ততই ওরা নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে পারছিল। দেশী মদ এবং সিগারেটের বাজে খরচ বন্ধ করে দিল। 'রে', 'তুই' দিয়ে গালিগালাজ ছেড়ে দিল। ওদের ভাষা এবং পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সবেতেই পরিবর্তন দেখা দিল।

১৯৩৭-এর সেই আন্দোলনই দাওলুর-এর শ্রমিক বন্ধুদের শেষ সংগ্রাম ছিল, তারপর থেকে আর কারও ওদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস হয়নি।

নিজেদের সংগঠিত শক্তির জোরেই সার্থক সংগ্রাম করে দাওলুর শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। সোভিয়েত দেশের কথা ওরা খুব মন দিয়ে শুনত। ওদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে সারা ভারতের কৃষক-শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে যদি চায়, তাহলে এখানেও লাল পতাকার বিজয় হতে পারে। পার্টি কমরেডরা ওদের রাজনৈতিক শ্রেণীচেতনা বাড়াবার জন্য খুব চেষ্টা চালাতে লাগল। নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হল। এই নতুন সাম্যবাদী শ্রমিকদের মধ্যে লজ্জার ব্যাপার ছিল যে তখনও তারা টিপছাপ দিত। পার্টির সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এলে লোকেরা বসে শুনত। যে জায়গাটা বুঝতে পারত না সেটা কোনও বন্ধু বুঝিয়ে দিত। জীবিকার জন্য গাঁয়ের লোকদের মজুর খাটতে হত। সেখানে কোনও কাজ না থাকলে রাস্তা তৈরির কাজ করত। আর কখনও কখনও কাজের খোঁজে একশো মাইলেরও বেশি হেঁটে নিজামের রাজ্যে চলে যেত। উঁচু জাতের হিন্দুদের অত্যাচারের ভয়ে ওরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। রুটির লড়াইয়ের জন্য ওরা যখন শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে সংগঠিত হল, তখন পাদ্রীরা নাস্তিক এবং পতিত বলে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। এখন কম্যুনিস্টরাই ওদের সব ছিল, কম্যুনিজম-এর বইপত্রই ওদের রামায়ণ-বাইবেল ছিল। যখন ওদের মস্তিষ্ক ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করত তখন সোভিয়েত দেশের কল্পনা করত। অবসর সময়ে পরিশ্রান্ত হলে যখন ওদের কোনও চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন হত, তখন পুরনো গানগুলোতে ওরা আর তত রুচি পেত না। কয়েক শতকের বিকাশপ্রাপ্ত গ্রামের সংগীত এবং অভিনয়কে ওরা নতুন রূপ দিতে শুরু করল। ওদের মধ্যে নিজস্ব কবি জন্ম নিল যারা নিজেদের বীরকথা রচনা করল। বেশি শিক্ষিত এবং সংস্কৃতবান সঙ্গীরা

একাজে হাত লাগাল এবং তারা অনেক জিনিস তৈরি করল। গ্রামের বাইরে যখন কাজ করতে যেত, তখন ঢোলক-বাদ্য অবশ্যই সঙ্গে যেত, তবে সেটা অবসর সময়ের জন্য। দাওলুর শ্রমিকদের কাজ দিয়ে মালিকদের দেখাশোনা করার কোনও প্রয়োজন হত না। তারা কাজে ফাঁকি দেওয়াকে পাপ মনে করত। কাজের সময়ে তারা কত না গান বানিয়েছিল। কোথায় সেই ধর্মান্ধতা যে খ্রীস্টধর্ম-বিরোধী মনে করে সঙ্গীদের মারার জন্য প্রস্তুত ছিল আর কোথায় দাওলুরে (শরণগ্রাম) তৈরি হল কম্যুনিজমের দুর্গ।

১৯৪০-এ দাওলুরে শ্রমিকদের কনফারেন্স হল, যাতে পাঁচ হাজার শ্রমিক এসেছিল। সাম্যবাদ এখন ওদের আপন জিনিস। সেটা বোঝাবার জন্য ওরা নিজেরাই নতুন নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করত। পুঁজিবাদের মধ্যে জনগণ কেন বিকশিত হতে পারে না আর সাম্যবাদে কেন সবদিক দিয়ে পথ খোলা থাকে, এই সম্পর্কে একজন শ্রমিক অন্য শ্রমিককে বলছিল, 'দেখছ না গাছের তলায় লাগানো বাজরা আর গাছ থেকে দূরে লাগানো বাজরাগুলোকে। গাছের ছায়ার মতন পুঁজিবাদ মানুষকে বিকশিত হতে দেয় না। মার্কবাদের পথ ছাড়া শ্রমিকদের অন্য কোনও পথ নেই।' এটা বোঝাতে ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, 'ভাই আহারই হল জীবন-মরণ, বাজরার উপর বসে থাকা কাকের দিকে ঢিল ছুঁড়লেও সে ওটাকে ছাড়তে পারে না।' ছড়ার থেকে দানাটা বার করে নেয়। তাই কাকের বাজরা ছেড়ে যাওয়া চলবে না।' এক জায়গায় ওদের কুলীন মালিক পায়ের তলে ভেসলিন লাগিয়ে গাছের নীচে শুয়েছিল, তার উপরে মাছি এবং পিঁপড়ে ঘিরে ধরেছিল। একজন আর একজনকে বলল, 'এ হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের মাহাত্ম্য।'

সন্ধেবেলা তিন হাজারেরও বেশি লোক জমায়েত হল আর আমাকে ওদের উদ্দেশে কিছু বলতে হল। রাতে সংগীত পরিবেশিত হল। সাত থেকে বারো বছর বয়সী কয়েকটি মেয়ে অনেকগুলি সুন্দর গান করল, যার বিষয়বস্তু ছিল দেশপ্রেম, বাঙলার দুঃসময়, খাদ্য সমিতি, নিস্ফলা জমিতে চাষ, সুন্দর সুন্দর জমির মাহাত্ম্য এবং প্রাণ দিয়ে আমরা লাল ঝাণ্ডার রক্ষা করব। তারপর কিছু অভিনয় হল। দুজন মেয়ের মধ্য থেকে একজন অন্ধ ভাই সাজল আর একজন ভাইকে লাঠি ধরিয়ে রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এল, তারপর দুজনেই অন্নকষ্ট আর সুবিধাবাদীদের লোভের বিষয়ে করুণরসের গান গেয়ে ভিক্ষা করার অভিনয় করল। বেজওয়াড়াতে উদয়ার বীরগাথা মণ্ডলীতে সূর্যনারায়ণের স্ত্রীর খুব সফ্য অংশগ্রহণ ছিল। আর এখানে সূর্যনারায়ণ স্বয়ং অত্যন্ত সুন্দরভাবে বীরকথা বললেন। ওঁর চুটকিগুলো শুনে লোকেরা হেসে গড়িয়ে পড়ত। হিটলারকে নিয়ে পাগল-গীতও খুব চিত্তাকর্ষক ছিল।

পার্টি দাওলুর শ্রমিকদের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার করেছিল তার সুস্পষ্ট প্রভাব ওদের প্রত্যেক কাজে দেখা যেত। ঘন্টাইয়া একজন পার্টি-মেম্বার। ওর বাড়িতে স্ত্রী আর চারটি শিশু। জীবিকা হল মজুরখাটা কিন্তু সম্প্রতি সে একটা ইঁটের বাড়ি তৈরি করে নিয়েছে, যাতে মোট পঞ্চাশ টাকা লেগেছে আর তাও বেশির ভাগ টাকা পুরনো বাড়ি থেকে কাঠ কিনতে খরচ হয়েছে। সে নিজেই ইঁট বানিয়েছে, দেয়াল গেঁথেছে। হাঁ, এই কাজে অন্যান্য সাথীরাও ওকে সাহায্য করেছে। ওদের দুটো মোষ আর দুটো মুর্গি ছিল। বাড়িটা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন।

—১৯৪৪—

সেদিন সূর্যনারায়ণের বাড়িতে একটা ছোটখাটো ভোজ হয়ে গেল যাতে পঁচিশ-তিরিশ জন বন্ধু উপস্থিত ছিল। অচ্ছুত খ্রীস্টান থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলেই একসঙ্গে বসে ডাল-ভাত খেল আর কাম্মা(ক্ষত্রিয়) এঁটো পাতা ফেলল। যে ব্যবহারিক ভ্রাতৃভাব কম্যুনিস্টরা দেখায় তা খ্রীস্টান পাদ্রীও করতে অক্ষম, এবং সেই সঙ্গে এতে উঁচু জাতের অনুগ্রহও নেই।

কাটুর—কাটুর কৃষ্ণা জেলার বেজওয়াড়া থেকে বাইশ মাইল পূর্বে একট বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মুসলিপট্টনমের পথে আঠারো মাইল বাসে করে গিয়ে আমরা নেমে পড়লাম এবং চারমাইল গবুর গাড়ি করে যাত্রা সম্পূর্ণ করলাম। কাটুরে চার হাজার একর জমি আছে যাতে ধান, কড়াই এবং মুগডালের চাষ হয়। চটি ও মাটির বাসন তৈরি, কাপড় বোনা, কাঠোর ও সোনার কাজ অনেকেরই জীবিকা অর্জনের উপায়। ১৫০টি পরিবারের ৫৩০০ লোকের বেশির ভাগের জীবিকা নির্বাহ শুধু চাষের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ১১৫০টি ঘরের মধ্যে ৫০০টি ঘরের কাছে নিজেদের কোনও জমি নেই। ৪০০ পরিবারের জমির পরিমাণ এক একরেরও কম। একটি পরিবারের সাধারণভাবে খাওয়া-পরার জন্য পাঁচ একর জমির দরকার। এইভাবে কাটুরের ২৫০টি পরিবারই অন্ন ও বস্ত্রের অভাবের মধ্যে রয়েছে। গ্রামের সবচেয়ে ধনী কৃষক (জমিদার নয় কারণ ওখানে বাইয়তি ব্যবস্থা) ভেংকট রামাইয়ার কাছে সোয়াশো একর জমি আছে। তার পরে ভেঙ্কটরাও একশো একরের ধনী। তিরিশ একরের বেশি জমির মালিক আটটি কাম্মা পরিবার। কুড়ি থেকে ত্রিশ একর পর্যন্ত জমির মালিক কুড়িটি কাম্মা পরিবার আর দশ থেকে কুড়ি একর পর্যন্ত পঞ্চাশটি পরিবার এবং পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত ষাটটি পরিবার আছে। কুড়িটি ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে দশটির হাতে পাঁচ একরের কম জমি আছে আর পাঁচ জনের কোনও জমি নহৈ এবং তাদের জীবিকা হল পুরোহিতগিরি, স্কুলমাস্টারি বা অন্য কোন ধরনের চাকরি।

তিরিশটা রাজু পরিবারের মধ্যে কুড়িজনের কাছে পাঁচ একরের কম জমি আছে, এবং পাঁচটি পরিবারের অবলম্বন অন্যের মজুরি খাটা।

পাঁচশো ঘর কাম্মার মধ্যে পঞ্চাশ জন ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক এবং একশো পঞ্চাশ ঘরের জমির পরিমাণ পাঁচ একরের কম।

কোমটি (বেনে) পরিবারের সংখ্যা পনের, পাঁচজনের জমি আছে এবং দশজন জমি না থাকলেও দোকান এবং ব্যবসা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

দুশো ঘর মাদিকাদের (চামার) সকলেই ভূমিহীন শ্রমিক, তাদের মধ্যে কুড়িজন জুতো বানায়।

চল্লিশটি মালা (অচ্ছুত) পরিবারের প্রত্যেকের কাছেই এক-আধ একর জমি আছে, কিন্তু প্রধান অবলম্বন মজুরি।

তিরিশটি কুমোর পরিবারের কাছে জমি না থাকাতে বাসন তৈরি করা ওদের অবলম্বন। কুড়িটি সালী (তাঁতী) পরিবারের মধ্যে দু-তিনদিন ঘরের হাতে দু-এক একর জমি আছে। বাকিদের কাপড় বুনে কাজ চলে। কুড়ি ঘর মঙ্গলী (নাপিত ও ব্রাহ্মণ) পরিবারের সকলের

কাছেই কম-বেশি জমি আছে, তার মধ্যে একজনের (লক্ষী নরসু বৈদ্য) কাছে আছে তিরিশ একর জমি। বাকিরা নিজেদের পেশায় নিযুক্ত। পঁচিশটি রজক পরিবারের জীবিকার একমাত্র উপায় কাপড় কাচা। ছটি কৌসত (স্বর্ণকার) পরিবারে হাতে এক আধ একর জমি আছে। তাদের প্রধান জীবিকা সোনার কাজ করা। তিনজন হিন্দু কাঠের মিস্ত্রী হাল-ফলা তৈরি করে, আর তার মধ্যে একজনের কাছে তিন একর জমিও আছে। দুজন মুসলমান ছুতোর পরিবারের জীবিকা চাষীদের জন্য গাড়ি তৈরি করা। এ ছাড়া ইদানিং কিছু কাম্মা যুবকরাও চেয়ার-টেবিল তৈরি করতে আরম্ভ ক'রছে। পঁচিশটি পরিকল পরিবার জমি রাখে না, এদের মহিলারা দেবতার সহায়তায় ভবিষ্যৎ গণনা করে এবং পুরুষরা ভূত তাড়ায়। সেই সঙ্গে মহিলা-পুরুষ সকলেই হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি নাটকের দ্বারা চিত্তবিনোদন করতে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ায়। তিরিশটি গোল্লা বা যাদব পরিবারের সকলের কাছেই পাঁচ একরের কম জমি আছে। এরা ভেড়া-ছাগল পালে এবং মজুরিও খাটে। দশটি গামড়া বা কলালী (জংলী) পরিবার তাড়ি চোলাইয়ের ব্যবসা করে এবং তাদের হাতে দুই থেকে পাঁচ একর পর্যন্ত জমিও আছে। পঁচিশটি উপ্পরা পরিবারের মধ্যে পনেরটি পরিবারের দুই থেকে পাঁচ একর পরিমাণ জমি আছে, মাটি খোঁড়া, কুয়ো তৈরি করা এদের কাজ। পনেরোটি কাপু পরিবার আছে, তাদের মধ্যে পাঁচ ঘরে গৃহস্থের সকলের কাছেই পাঁচ একরের কম জমি আছে। এদের প্রধান কাজ ভাড়ার গাড়ি চালানো। দশটি কুম্মু বেলম পরিবার ভূমিহীন শ্রমিক। পাঁচটি এরিকুলা (বসোর) সকলেই ভূমিহীন, ঝুড়ি এবং শৌচাগার তৈরি করা এদের প্রধান কাজ। ওরা শূকরও পোষে যা ব্রাহ্মণ, কোমটী আর মুসলমান ছাড়া সকলেরই খাদ্য। কুড়িটি মুসলমান পরিবারের জীবিকা কেবলমাত্র মজুরি। ছটি সেট্টি বালিজী (কুঙ্কুম) পরিবার গরম মশলা তৈরি করে বিক্রি করে। এদের মধ্যে একজনের কাছে সাত একর আর বাকিদের কাছে এক-আধ একর জমি আছে। এরা মজুর খাটে না। গ্রামে জঙ্গম শৈবদের একটি ঘর আছে যার কাপড় সেলাই করে এবং ভূমিহীন। ছটি পরিবার সাতানীদের (রামনুজভক্ত)। সকলের কাছেই দু-এক একর জমি আছে কিন্তু প্রধান জীবিকা হল ধনুর্মাসে মাথায় বিগ্রহ আর হাতে তানপুরা নিয়ে ভিক্ষে করা, যার থেকে দশ-বারো বস্তা শস্য ওরা অনায়াসে পেয়ে যেত, কিন্তু এখন লোকেদের ভক্তি-শ্রদ্ধা কমে গেছে।

কাটুর অন্ধ্রের শ্রমিক সংঘের সভাপতি কমঃ গোপালাইয়ার জন্মস্থান এবং স্থানীয় ৪৫ জন পার্টি-মেম্বারের অতিরিক্ত ১২ জন বাইরের জেলায় কাজ করেন। কয়েকটি ধনী পরিবার বাদে সমস্ত গ্রামই কম্যুনিস্টদের পথের পথিক। ধনী লোকেরাও বিরোধ করতে সাহস করে না। তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল—একজন ধনীর সদ্য তৈরি করা জমকালো পাকা বাড়ির উপর সিমেন্ট দিয়ে কাস্তে হাতুড়ি আঁকা রয়েছে। এখানকার বিভিন্ন সংগঠকের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ।

রায়ত সংঘম্ (কৃষকসভা)	৪৫০
মহিলা সংঘম্	৪০৬ (১০ জন পার্টি-মেম্বার)
বাল সংঘম্	২৫০

ভলান্টিয়র	১৮০
কুলি (শ্রমিক) সংঘম্	৫০০
যবুজন (তরুণ) সংঘম্	২০০
কুট্টপানিওয়ালা(দর্জি) সংঘম্	২০

গ্রামে নাটক, কোলাট নাচ এবং গানের নিজস্ব দল আছে। মহিলা সংঘমে ছুত-অছুত, ধনী-দরিদ্র সব ঘরের মহিলারাই যুক্ত আছেন। প্রথমে ধনী পরিবারের পুরুষরা এর বিরুদ্ধতা করল, কিন্তু স্ত্রীরা মহিলা সংঘমের উদ্দেশ্য বুঝতে আরম্ভ করল এবং তাঁরা পুরুষদের বিরোধিতার তোয়াক্কা করলেন না। তাঁরা অন্নবস্ত্র, নুন, কেরোসিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ থেকে আরম্ভ করে বহুবিবাহ রদ এবং মেয়েদের উত্তরাধিকার অর্জন নিয়েও আন্দোলন করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বেজওয়াড়া সম্মেলনে এসেছিলেন, মহিলা সংঘের সভানেত্রী পূণ্যবতী ৫০ বছরের এক উৎসাহী বৃদ্ধা পার্টি-মেম্বার এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তেলুগু পড়েছেন। সেক্রেটারি দ্রৌপদী এখন নিজের স্বামীর সঙ্গে অভ্রের খনিতে মজুরির কাজে চলে গেছেন। সহ-সম্পাদিকা রাজেশ্বরী (২৫ বছর) ১৯৩৯ থেকেই কাজ করছে। সে তেলুগু ছাড়া হিন্দিও জানে। বুড়োরা প্রথমে খুবই বিরোধী ছিলেন আর স্বামীরও কিছুটা বিরোধিতা ছিল, কিন্তু পার্টি-মেম্বার হয়ে তারা এসব গ্রাহ্য করবে কেন? মহিলা সংঘম্ অনেক স্বামীদের মার-গালের অভ্যাস ছাড়িয়ে দিয়েছে। একবার গ্রামে আগুন লাগল মহিলা সংঘমের স্ত্রীলোকেরা আগুন নেভানোর কাজে সাহায্য করল, যার খুবই প্রভাব পড়ল। দ্বিতীয় বার আগুন লাগলে সংঘের বাইরের ৪০ জন মহিলা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল, এঁদের মধ্যে অনেক পর্দানশীনও ছিল। সাতজন মহিলা এ-আর পি-এর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। বহু মহিলা স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও পার্টিকে সাহায্য করেছিল। কিছু মহিলা নিজের সৌভাগ্যচিহ্ন মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত দান করেছিল। কিছু মহিলা স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও 'প্রজাশক্তি' (সাপ্তাহিক) আনিয়ে পড়ে। বেচারি বিরোধী স্বামীরা কম্যুনিস্টদের প্রচারে পরাস্ত। নরসহিয়া নিজে নিরক্ষর কিন্তু ওর স্ত্রীর সামনে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করে। তবে স্ত্রী শুধু সভা করতে আর পড়তেই জানেন না, সেইসঙ্গে গৃহকর্মেও খুবই নিপুণা। যখন পার্টি অবৈধ ছিল এবং কয়েকজন কমরেডের নামে ওয়ারেন্ট ছিল, তখন নিজেকে বিপদে ফেলে অনেক মহিলাই তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। ওঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা আছেন যাঁকে সব কমরেডরাই মাই বলেন। মাই এবং তাঁর স্বামী উভয়েই পার্টির তরুণদের প্রতি অপার স্নেহ পোষণ করেন।

গ্রামে বেড়াতে বেড়াতে আমরা এক জায়গায় লাল পতাকা উড়তে দেখলাম। জানতে পারলাম, একটা গোশালাকে বালকসংঘম্ দখল করে নিয়েছে। সেখানে দেয়ালে ভারত, এশিয়া ও পৃথিবীর মানচিত্র টাঙানো ছিল। গান্ধী, নেহরু, স্তালীন, সুন্দরাইয়া প্রভৃতির ফটো দিয়ে অফিস সাজানো হয়েছিল। একদিকে তোজো, হিটলার আর মুসোলিনীর কার্টুন ছিল। তোজোর পেটে বাঁশ দিয়ে বেঁধানো ছিল, এবং হিটলারের মুখে ছিল চুরুট, কোলাটের (চতুর্থ চান্নার মত দুটো কাঠি বাজিয়ে ছেলেদের নাচ) দল বালসংঘম্ তৈরি করেছিল। ওদের ঝাণ্ডা, পতাকা, মিছিল আর স্লোগান তো লেগেই আছে। মহিলা

প্রেসিডেণ্ট সূর্যাবতীর দুই মেয়ে ও এক ছেলে বালকসংঘমে আছে। বড় ছেলে নাগভূষণ মুসলিপটনম্ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং বিদ্যার্থী সংঘমের উৎসাহী সদস্য। সে সাম্যবাদী ভাগবতম্-এর ভালো অভিনেতা এবং বেজওয়াড়া সম্মেলনে একটা নাটকে সে তোজোর পার্ট করেছিল। পুণ্যাবতীর স্বামী বীরাইয়া কৃষক সভার অধ্যক্ষ।

দাওলুরে খেতমজুর নেতৃত্ব দেয় আর কাটুরে দেয় কৃষক।

২৩ মার্চ আগামী কালের সম্বৎসরারম্ভে (যুগাদি)-এর গণপ্রস্তুতি চলছিল। ঘর এবং আঙিনা গোবর দিয়ে লেপে সাদা চুন দিয়ে ছক কাটা হয়েছিল। ছকগুলি ভরাট করতে অনেক রকমের আলপনা আঁকা হয়েছিল। তাতে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। রাত্রে পার্টি-অফিসের সামনে হাজার খানেকের উপর নরনারী জড় হল, ওদের অনুরোধে আমি সোভিয়েতে দেখা কয়েকটি দৃশ্যের বর্ণনা করলাম।

অন্ধ্রের সব গ্রাম দাওলুর বা কাটুর হয়ে যায়নি কিন্তু এরকম গ্রামের সংখ্যা শ'খানেক এবং তা দিন দিনই বাড়ছে। অন্ধ্রের তরুণরা শূন্য কল্পনার জগতে বিচরণ করছে না। তারা ঐকান্তিকভাবে নিজের দেশকে পাল্টাতে চাইছে। বৃদ্ধ জাতীয় নেতাদের মধ্যে অনেকেই এই জাগরণ দেখে আনন্দিত। তাঁরা যে চারাগাছটি রোপন করেছিলেন তাঁদের সন্তানরা যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে তাকে বিশাল বৃক্ষে পরিণত করছে। কিন্তু এরকম নেতাও আছেন যাঁরা এটাকে ঈর্ষার বস্তু মনে করেন।

কেরালায়—ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তই আমি এক বা অনেকবার দেখেছি। কিন্তু মালাবার বা কেরলা দেখার সুযোগ এখন পর্যন্ত মেলেনি। মালাবারও তো রয়েছে এক কোণাতে। ২৭ মার্চ সকালে আমরা মহীশূর থেকে কালিকট যাবার বাস ধরলাম। মহীশূর থেকে কালিকট ১৩২ মাইল। এতটা লম্বা রাস্তা বাসে যাওয়া খুব একটা আরামপ্রদ নয়, কিন্তু এখন রেলে তো আরও বিপদ।

আমাদের বাস সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হল। পাহাড়ী জমি। যদিও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইল চলার পর পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারটা আছে। তখন পাহাড় আর জঙ্গল শুরু হয়ে যায়। উচ্চতার দরুন গরমও লাগে না। অনেক জায়গায় হরিণীরা লাফাতে লাফাতে সামনে দিয়ে চলে যায়। মহীশূর থেকে ৫৯ মাইলের দূরত্বে একটা ছোট সেতু আছে এটাই এই রাজ্যের সীমানা; পুলের দশগজ আগেই আমাদের মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। আমি ভাবলাম মোটরগাড়ি বিকল হয়ে গেছে অথবা যাত্রীদের এখানে কিছুটা বিশ্রাম করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কালিকটের মোটরগাড়ি এসে গেল এবং যাত্রীদের এটার থেকে ওটায় অদল-বদল করা হল। সাড়ে বারোটায় আমরা রওনা হলাম।

সামনে ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও টোডা লোকদের ঝুপড়ি। এরা এখন একটু বেশি কাপড়ের ব্যবহার শিখেছে। ওদের স্ত্রীলোকেদের কোমরের নিচেই শুধু কাপড় দেখে বুঝলাম দিল্লী এখনও অনেক দূর। মালাবারের গ্রামে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে সর্বদা ঘাম উদ্রেককারী এই প্রদেশে সারা শরীর আচ্ছাদিত করা বিলাসিতা মাত্র। মালাবারের কিছু

নবশিক্ষিত মহিলাদের বাদ দিলে সব মহিলাই কোমরের উপর বস্ত্র ধারণ করাটা প্রয়োজন মনে করেন না—তবে হাঁ, মুসলমান মহিলারা এর ব্যতিক্রম।

আমরা ওয়াইনাদ তালুকে যাচ্ছিলাম, যা প্লেগ আর ম্যালেরিয়ার বাসা। চা বাগানের পর অনবরত রবার বাগান পড়তে লাগল। দুটোই খুবই লাভের জিনিস, কিন্তু লাভটা তো মুষ্টিমেয় ধনীদের পকেটে যায়, বাকি লোকেরা রক্তজল করে কাজ করে এবং খিদেয় মরে। ভারতের সব অংশেই এক গ্রামের সব লোক নিজেদের বাড়ি এক জায়গায় তৈরি করে। কিন্তু মালাবারে সবকটা বাড়িই দূরে দূরে ছড়ানো। বোধহয় এই প্রদেশে অনাদি কাল থেকে চোর ডাকাতদের অতটা ভয় ছিল না, 'গ্রাম' (দল) তৈরি করার দরকার হয়নি। হাঁ, মাঝখানে কিছু বাজার-হাট পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে দোকানগুলো সব এক জায়গায় এক সারিতে ছিল। পনের-কুড়ি মাইল আগে থেকেই নারকেল ও সুপারি ঘেরা পাহাড় এবং উপত্যাকা পাওয়া গেল। মধ্যে মধ্যে ধানখেতও ছিল। লংকার দৃশ্য মনে পড়ছিল।

আমাদের বাসটা কালিকটে একজায়গায় গিয়ে আটকে গেল। জানা গেল, আজকে গভর্ণর সাহেব এসেছেন যার জন্য পথ অবরোধ করা হয়েছে। ঘন্টার পর ঘণ্টা যদি গাড়িগুলো আটকে দেওয়া হয় তাহলে ভিড় দেখে কে? সব যাত্রীরাই হাঁপিয়ে উঠছিল। একজন লোকের জন্য হাজার হাজার লোকদের বিরক্ত করা এটা অবশ্যই আশ্চর্যের কথা কিন্তু আজকের সমাজ তো এই ব্যবস্থা মেনেই চলছে। শাসক জনতার সুবিধের জন্য নয় বরং জনতা শাসকদের সুবিধের জন্য। শাসকদের জনতার অসুবিধেয় কি এসে যায়? সে তো চায়ই জনতা খুব বিরক্ত হোক এবং শাসকবর্গের রোয়াব তাদের প্রভাবিত করুক। কেন একজন গভর্ণরকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে সমস্ত ট্রাফিক আটকে যাবে এবং লোকেরা কয়েকট ঘণ্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে? যদি কোন শাসকের জীবনের বিপদ থাকে তাহলে তার ভক্তদের শহরের বাইরে ডেকে নেওয়া উচিত। ভক্তেরা নিজের ভগবানের কাছে বনেও পৌছে যেতে পারে। তার চেয়েও সহজ হত যে গভর্ণর সাহেবের গাড়ির দুশো গজ সামনে মোটর সাইকেল আরোহী দেহরক্ষী চলত এবং তাঁর বাঁশি শুনে পুলিশ পথ বন্ধ করত, তাহলে লোকেদের হয়রানি মাত্র পাঁচ-দশ মিনিটের জন্যই হত। কিন্তু এখন বোধহয় ইংরেজ প্রভুরা লোকদের বিরক্ত করে তাদের উপর দাপট দেখানো ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। ওরা এখনও পুরনো দুনিয়ায় বিচরণ করছিল, যা জগৎ থেকে খুব শিগগিরই লোপ পেতে চলেছে।

রিক্সা নিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে কোনওরকমে আমি গন্তব্য স্থলে পৌছলাম।

মালাবারও অন্ধ্রের মত কয়েকটি অংশে বিভক্ত। সোয়া কোটি জনসংখ্যার ষাট লক্ষ ত্রিবাংকুর রাজ্যে আর আঠারো লক্ষ লোক কোচিনে বাস করে। চল্লিশ লাখ ব্রিটিশ ভারতে বাস করে যার শাসনকেন্দ্র হল কালিকট। কয়েক লক্ষ মালাবারী দক্ষিণ, কানাড়া এবং পার্শ্ববতী অন্যান্য জেলাতে ছড়িয়ে রয়েছে।

মার্চের শেষের দিকেই মালাবারে বেশ গরম লাগছিল কিন্তু এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছাড়া অন্য কোনও ঋতুই হয় না। যে মাসগুলোতে ঘাম একটু কম হয় তাকেই এখানকার লোকেরা শীতকাল বলে। অন্ধ্রের মতই মালাবারেরও ব্রাহ্মণ বাদ দিলে বাকি সব

হিন্দু-মুসলমান, খ্রীস্টানের একই অন্ন-জল, সেজন্য রেলের স্টেশনগুলিতে হিন্দু-জল ও মুসলমান-জল দরকার নয় না এবং ব্রাহ্মণদের হোটেলগুলো ছাড়া বাকি সমস্ত হোটেলে সবাই খাওয়া-দাওয়া করতে পারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, এখন পর্যন্ত মালয়ালম ভাষার কোনও সিনোমা তৈরি হয় নি। একদিন রাতে একটা সিনেমা দেখতে গেলাম। হলটা ভর্তি দেখলাম। আমার বন্ধু বলল, 'দর্শকদের মধ্যে শতকরা দশজনের বেশি লোক নেই যারা হিন্দি বুঝতে পারে। তামিল ভাষা মালয়ালমের খুব কাছাকাছি। মালয়ালমে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য এবং তামিলে তাদের অভাব কিন্তু দুটো ভাষারই মূল ধাঁচটা একইরকম, যার জন্য তামিল বোঝা মালয়ালীদের পক্ষে খুব সহজ। তামিল ফিল্‌মও আসে কিন্তু সেগুলোর জন্য দর্শকদের এত ভিড় হয় না। এখানেই শুধু নয়, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রেও নিজেদের ভাষার ফিল্‌ম তৈরি হয়। তা সত্ত্বেও লোকেরা নিজেদের ভাষার চাইতে হিন্দি ভাষার ফিল্‌মগুলিই বেশি পছন্দ করে, যদিও ভাষা তারা বুঝতে পারে না।' কারণ জিজ্ঞেস করাতে সঙ্গীরা বলল, 'হিন্দি ফিল্‌মে অভিনয় খুব ভালো হয়।' কেউ বলল, 'হিন্দি ফিল্‌মের নায়ক নায়িকারা বেশি সুন্দর।' কারও মতে, 'ওদের সঙ্গীত বেশি মধুর।' হয়ত তিনটি জিনিসই আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকবে। দক্ষিণী সঙ্গীত (কর্ণাটক সঙ্গীত) নিজের ওপর হরিদাস এবং তানসেনের উৎকর্ষের এক ফোঁটাও পড়তে দেয়নি। দক্ষিণ আজ পর্যন্ত গর্ব করে, 'আমরা শুদ্ধ। অপরিবর্তিত কর্ণাটক সংগীতে ধনী।' ষোড়শ শতাব্দীতে যে নতুন সংগীত-প্রবাহ হিমালয়কে পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে সাতপুরা আর সহ্যাদ্রির পর্বতভুলোতে ঠেকে গিয়েছিল আজ সে দক্ষিণকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দক্ষিণের সনাতনী সঙ্গীতশাস্ত্রী এবং ওস্তাদরা খুব নাক ও ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। তামিল, তেলুগু, কন্নড় ফিল্‌মে উত্তরের সংগীতের বন্যায় এরা খুব আপত্তি করে থাকেন, কিন্তু এই শুদ্ধ আত্মাদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে, এটা যে কোনও দক্ষিণ ফিল্‌ম দেখলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। বরং ফিল্‌ম দেখারও দরকার নেই, রেলে যেতে যেতে গায়নরত ভিখিরি বালকরাও বলে দেবে যে হাওয়া কোনদিকে বইছে। সারা ভারতের সঙ্গীতে এখন একটা ভাষাই বলা হচ্ছে। ফিল্‌মগুলো শুধু সঙ্গীত এবং অভিনয়ই ঐক্য স্থাপন করে নি, বরং বেশভুষার ওপরও এদের খুব প্রভাব পড়ছে। কোনও এক সময় মহিলাদের বেশ দেখে তাঁরা কোন প্রদেশের জানা সহজ ছিল, কিন্তু এখন শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে সেটা দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বাঙলা এবং গুজরাটে শাড়ির জন্য নিজেদের রাজত্ব কায়েক করা সহজ ছিল , কিন্তু দক্ষিণের মহিলারা ত্রিশ-ত্রিশ হাত লম্বা শাড়ি কি জানি কি করে তিন হাতের শরীরে জড়িয়ে নিত! এখন তারাও ৩০ হাতের জায়গায় ১০ হাতে এসে যাচ্ছে। এর কারণ যুদ্ধ আর মূল্যবৃদ্ধি নয়, এর কারণ হল সেই সৌন্দর্য, যাকে হিন্দি ফিল্‌মের তারকারা তাদের শাড়ির দ্বারা প্রদান করেছেন। পুরুষদের পোশাকেও প্রভাব পড়েছে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের চাইতে কম-পুরুষ কি বেশি ঐতিহ্য-পরায়ণ? আর অলংকার? হিন্দি ফিল্‌মের বিরুদ্ধে আমার সর্বদাই একটা নালিশ আছে যে ওতে কোনও স্থানের পরিচয় থাকে না, ঘটনা বলা যায় কোনও হিন্দি ভাষাভাষী

প্রদেশ, গ্রাম বা শহরের নয় বরং আকাশে বা ফিল্ম-প্রযোজকের মস্তিষ্ক প্রসূত। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি ওঁদের নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দেব যে ওঁরা পূর্ব ইউ· পির কাঁপ (কর্ণফুল) আর ঝুমকোকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। রুপোর এই ছটাক দু'ছটাকের অলংকার, যেটাকে আমি কোনও দিন ফুল মনে করিনি, এখন বাস্তবেই ফুল হয়ে গেছে। সিনেমা তারকাদের হাতে অবশ্যই কিছুটা যাদু আছে, কখন জানি না ওরা নাকের অলংকারকেও সর্বজনপ্রিয় করতে আরম্ভ করবে। মালাবারের মহিলারা কানের অলংকারের তো দুর্গতি করে ছেড়েছে। একটাকার সমান গোল সোনা না রুপোর গুল্লী (চাকা) কানে ঝোলাতে হত, যার জন্য ওদের কানের ফুটোগুলোকে এত বড় করতে হত যে অলংকার পরার সময় তাকে চামড়ার একটা পাতলা রেখা ঘিরে ফেলত কিন্তু অলংকার খুলে ফেললে সেই মোটা সুতো গুলো ছেঁড়া দড়ির মত ঝুলে থাকত।

প্রথমে জাতীয়তাবোধের দরুন ভিন্ন প্রদেশে যাত্রা করার সময় লোকেদের হিন্দি বোঝবার দরকার হত কিন্তু এখন হিন্দির ফিল্মের আকর্ষণ অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে হিন্দি পড়ার প্রেরণা দিয়েছে। আমি সিনেমাগুলিতে দেখেছি বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে যাতে লেখা আছে—ছুটিতে হিন্দি শিখে নাও।

মালাবারের একটি গ্রামে—কারিয়েল্লুর মালাবার জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম। যদিও সরকারি হিসেব অনুযায়ী এখানে কেরালার শেষসীমা কিন্তু প্রতিবেশী দক্ষিণ কন্নড়-এর পাশের তালুকে সত্তর শতাংশ পর্যন্ত মালয়ালী লোকেরা থাকে, সেজন্য কেরালার সীমা পঁচিশ মাইলের বেশি উত্তর পর্যন্ত রয়েছে।

কালীকোট (কালিকট) থেকে চারঘণ্টা রেলপথে আমরা চারবাত্তুর স্টেশন পৌঁছলাম। কারিয়েল্লুর গ্রাম স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে। সমস্ত জমি পাহাড়ী আর উঁচুনীচু-পাহাড়গুলো এত ছোট যে ওগুলো পুকুরের বড় বড় পাড় মনে হয়। সবচেয়ে নীচু জমিগুলো ধানের খেত। উঁচুতে নারকেল বাগান, যেখানে কোথাও কোথাও কাজু, কলা এবং কাঁঠালের গাছও লাগানো হয়েছে। লোকেদের বাড়ি নিজের নিজের বাগানের মধ্যে। যাদের জমি নেই তারা অন্য কারও বাগানে বাস করে। কারিয়েল্লুরে ১১৩০ টি পরিবারের (জনসংখ্যা ৫২০০) মধ্যে মাত্র ৪০০ পরিবারের নিজস্ব জমি আছে। কারিয়েল্লুর কৃষকদের প্রিয় গ্রাম। এখানে কৃষকসভার ৬৬৩জন মেম্বার আছ, মহিলাসংঘমের ২০০ জন,বালকসংঘমের ৩০০। ৫৩ জন পার্টি-মেম্বার আছেন, যার মধ্যে তিনজন তাঁদের সারা সময়টা জনসেবার কাজে লাগান। পার্টি মেম্বারদের মধ্যে কাজের জন্য ২৬জন কৃষক, ৮ জন শ্রমিক, ১২ শিক্ষক, ৫ জন দোকানদার এবং ২ জন পুরোহিত আছেন। জাতিগতভাবে ২ জন ব্রাহ্মণ, ৪জন উনিতিরী (ক্ষত্রিয়), ২ জন কোঙ্কনী ব্রাহ্মণ, ১২ জন নায়ার(পোদুগল), ২ জন মুসলমমান, ৭ জন মনিয়ানী, ১৪ জন থীয়া (কালাল), ১ জন নানদিয়া (নাপিত), ১ জন বেনে, ৭ জন চালিয়ে (তাঁতি) এবং ১ জন বর্ণন।

গ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি থীয়া (কালাল), যাদের ৩০০টি পরিবার আছে। ১০০ পরিবারের কাছে আধ একর থেকে ১৫ একর পর্যন্ত জমি আছে, কিন্তু ১০ একরের বেশি

জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা মাত্র ১৫টি আর ৫ থেকে ১০ একরের মালিক ২০টি পরিবার। ৮ জনের পরিবারের জন্য ৫ একরের খেত বা বাগান থাকা প্রয়োজন। এক একর নারকেল বাগানে ৮০টা গাছ হয় এবং একটা গাছ থেকে এখন বছরে দেড়-দুটাকা পাওয়া যায়। থীয়া লোকদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২০০ পরিবার)-এর হাতে কোনো জমি নেই। তারা হয় মজুরি অথবা তাড়ি চোলাই এবং বিক্রির কাজ করে। তাড়ির বেশির ভাগ নারকেলের থেকে চোলাই করা হয়। তাড়ির স্বাদ তো আমি জানি না, কিন্তু তাড়ি থেকে বানানো সোঁদা-সোঁদা গুড় খেতে খুব ভালো লাগে।

নায়ার পরিবারের সংখ্যা ২০০, যার মধ্যে ৫০টিকে বাদ দিলে সকলের কাছেই কিছু না কিছু জমি আছে। ৫টি পরিবার ১৫ একরের বেশি জমির মালিক, যাদের ধনী কৃষক বলা উচিত। ১৫টি পরিবার ১০ থেকে ১৫ একরের মধ্যে এবং ৩০ জন ৫ থেকে ১০ একরের মধ্যে। ৫০টি ভূমিহীন পরিবার মজুরি খেটে দিন চালায়।

১৫০টি বেনে (তেলী) পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫০ জনের কাছে জমি আছে, যার মধ্যে ২টি পরিবার ১৫ থেকে বেশি একরের মালিক এবং ৫টি পরিবার ১০ থেকে ১৫ একরের মালিক। বাকিদের কাছে ৫ একরের কম জমি আছে। ভূমিহীন ১০০টি পরিবারের মধ্যে অল্প কয়েকজন তেল নিষ্কাশনের কাজ করে, অন্য সকলের জীবিকা মজুরি।

১২০ টি চালিয়া পরিবার আছে যার মধ্যে ৩টি পরিবারের কাছে জমি আছে এবং ১০টি পরিবারের কাছে তো ১০ একরেরও বেশি আছে। বেশির ভাগ লোকই মজুরি খাটে। কয়েক ঘর সুতো কাটা ও বোনার কাজ করে দিন কাটায়। বোনার মজুরি গজ প্রতি ৫ আনা। কিন্তু পাঁচ গজের ধুতি বুনতে ৩ দিন লাগে— একদিন সুতো গোটানো বানানো আর বাকি দুদিন বোনা। এইভাবে ওরা দিনে আট আনা পর্যন্তই আয় করতে পারে। সুতো কাটার মহিলারা আজকাল রোজ ৪ আনা পর্যন্ত পায়, কিন্তু পুরো কার্পাসই পাওয়া যায় না। আবার একটা ঘরে তো আমি ৪ জন সুতো কাটা মহিলাদের মধ্যে দুটো চরকাই দেখতে গেলাম।

নাম্বুতিরী ব্রাহ্মণ— এরা আসলে মালাবারের ভূদেববংশ। যখন থেকে এঁদের চরণ মালাবারে পড়েছে (এটা দু হাজার বছর আগের কথা) তখন থেকে মালাবার এঁদের কাছে দেবলোক। এঁদের কায়িক পরিশ্রমের কখনও প্রয়োজন পড়েনি। ধর্মশাস্ত্র তৈরি এবং বিনষ্ট করা এঁদের হাতে ছিল সেজন্য এঁরা নিজেদের এবং আপন সন্তানদের সুখের সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যে সময় এই লোকেরা কেরালায় এসেছিলেন সে সময় এখানে মাতৃতন্ত্রের প্রচলন ছিল। অন্যান্য দোষের মত এখানেও সমাজে পরিবর্তন হয়ে থাকবে, কিন্তু ব্রাহ্মণরা ১৯৩৩-৩৪ পর্যন্ত সেটা অচল করে রাখলেন। রাজবংশ, তেরুআপ্পাড়, উনিতিরী এবং নায়ারদের মত উচ্চ এবং বিত্তবান জাতিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই নিয়মই আছে যে বাড়ির সম্পত্তির অধিকারিণী হবে কন্যা আর ছেলেরা বোনের আজ্ঞাবাহী হলে ভাত-কাপড় পেতে পারে। ব্রাহ্মণরা যেখানে অন্যান্য জাতির জন্য মাতৃতন্ত্রের এত কঠোর নিয়ম বজায় রাখল, সেখানে নিজের জাতিকে মাতৃতন্ত্রকে ছুঁতেও দেয় নি। সারা দক্ষিণে

যেখানে মহিলারা পর্দা মানে না, সেখানে নাম্বুতিরী মহিলাদের কঠোর পর্দার সম্মুখে উত্তর ভারতেব পর্দাও মিথ্যে হয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে ওরা নিজেদের দেওরের সামনে পর্যন্ত যেতে পারে না, সন্তান যাতে বড় হয়ে নির্ধন না হয়ে যায়, সেজন্য নাম্বুতিরীরা জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রচলন করল, যাতে সম্পত্তির অধিকার কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রেরই থাকতে পারে। কনিষ্ঠ পুত্রেরা পিতৃসম্পত্তি থেকে না পেত কিছু, না নিজের জাতের মেয়েদের বিয়ে করতে পারত। ১৯৩৩-৩৪-এর আইনে এখন ছোট ভাইদেরও অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওদের সম্পত্তি এবং স্ত্রীর থেকে এই বঞ্চিত হওয়া দুর্বাসার তপস্যার জন্য ছিল না। কনিষ্ঠ পুত্ররা রাজবংশ, তিরুআপ্পাড়, উনিতিরী এবং নায়ার এই চার জাতের মেয়েদের মধ্যে নিজেদের জন্য মেয়ে খুঁজতে পারত—পত্নী নয়, কারণ নাম্বুতিরী পুরুষরা ওদের হাতে অন্নজল কি গ্রহণ করবে, ছুঁলে পরে তাকে কাপড় পরে স্নান করতে হত, আর তাদের সন্তান ব্রাহ্মণ নয়, রাজবংশী, তিরুআপ্পাড়, উনিতিরী কিংবা নায়ার হত। যদি মেয়ে হত তবে নিজের মায়ের সম্পত্তির অধিকারিণী হত। ভারতের অন্য প্রদেশগুলিতে শংকরাচার্যের বংশের এই প্রথার কথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হবে আর বলবে যে উক্ত চার জাতি এই প্রথাকে নিজেদের আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ মনে করে এর প্রতিবাদ করল না কেন? আসলে, কোনও কুল-কন্যাকে কোনও দায়িত্ব এবং সন্তানকে পিতৃগোত্রের অধিকার না দিয়ে বিয়ে করা তাকে রক্ষিতার মত করে রাখা ছাড়া আর কি? কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত মালাবারের এই জাতিগুলি এটাকে অহংকারের ব্যাপার ভাবত যে তার মেয়ের সঙ্গে কোনো নাম্বুতিরীর সম্পর্ক আছে। আজও কোচিন রাজ্যের গদিতে ব্রাহ্মণ পুত্রই বসে, তবে হ্যাঁ, বর্মা নামে। কেরালায় ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ত্বের এক নতুন পরিভাষা তৈরি করে দিয়েছে— রাজবংশী নায়ার কন্যার ব্রাহ্মণ জাত পুত্র ক্ষত্রিয়, কোচিন রাজার নিজের সন্তানরা শুধু মেনন (নাযার) পদবী পায়, আর পত্নী হল স্রেফ পত্নী। রাণী হবে সে যে কোনও ব্রাহ্মণের কন্যা অথবা কোনও ব্রাহ্মণেরই স্ত্রী যার ছেলে গদিতে বসেছে। কোচিনে সচরাচর কোনও মা রাণী হবার সুযোগ পায় না কারণ রাজবংশের বোনেদের, ভাগ্নীদের এবং ভাগ্নীপুত্রদের সব ছেলেরাই বয়স অনুযায়ী কোচিনের গদিতে বসার অধিকারী। এরকম উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা ৩০০-র কাছাকাছি এবং ৬০, ৬৫ বছর বয়স হওয়ার আগে গদিতে বসার সুযোগ বোধ হয় কেউ কেউ পায়। তবে হ্যাঁ, এইসব উত্তরাধিকারীরা ব্রাহ্মণপুত্র, ব্রাহ্মণ নয়। নাম্বুতিরী বংশীয় কনিষ্ঠপুত্রদের জন্য এই ব্যবস্থা ক্ষতিকারক নয়, আর্থিক দৃষ্টিতে এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের দিক থেকেও।

আজকাল যদিও শিক্ষিত নায়াররা এটা পছন্দ করে না কিন্তু এরকম বিবাহ এখনও হয়। নতুন আইনে এই সুবিধেও করে দেওয়া হয়েছে যে, নাম্বুতিরী পিতার সম্পত্তিতে তার অব্রাহ্মণী পুত্রেরও অধিকার আছে। আজও এরকম সম্বন্ধ কেন হয় জিজ্ঞেস করাতে একজন উন্নিতিরী যুবক বলল যে এখনও ওদের প্রবল প্রতিপত্তি।

উন্নিতিরী জাতির মধ্যেও এক বিচিত্র প্রথা আছে। যদি কন্যাকে কোনও নাম্বুতিরী (ব্রাহ্মণ) নিজের স্ত্রী করে থাকে তাহলে ঠিক আছে, তা না হলে ওর বিয়ে সোজাসুজি উন্নিতিরী ঘরে হতে পারে না। তাকে প্রথমে নিজের জাতের থেকে উন্নত তিরুঅপ্পাড়

জাতির কোনও পুরুষকে চার দিনের জন্য বিয়ে করতে হবে। সাবালিকা মেয়েদের বিয়ে হয় আর সে চারদিন দিবারাত্রি একটা ঘরে সেই পুরুষের সঙ্গে থাকে। তারপর তিরুআপ্পড় নজর-ভেট নিয়ে চলে যায়, এবার সেই কন্যার বিবাহ কোনো উন্নিতিরীর সঙ্গে হতে পারে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে তিরুআপ্পড় পরিবার খুব অল্পই আছে এবং তাদের এইরকম সম্বন্ধের জন্য দূর দূরান্তে যেতে হয় যার জন্য বেশির ভাগ বৃদ্ধ তিরুআপ্পড়ই নিয়ম রক্ষা করতে এসে থাকে। আমি আমার উন্নিতিরী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই প্রথা তুলে দেওয়া হয় না কেন?' উত্তর পেলাম 'বৃদ্ধরা আপত্তি করবে এবং তার চেয়েও বেশী নাম্বুতিরীরা।'

'নাম্বুতিরীরা?'

ওদের প্রত্যক্ষ কোনও ক্ষতি তো নেই। কিন্তু একটা ইঁট সরালে সম্পূর্ণ ইমারত ধ্বসে পড়ার ভয় থাকে। ওই গ্রামেই দুই উন্নিতিরী ভগিনী দুই নাম্বুতিরীর স্ত্রী ছিলেন। তাদের বাবা-মা-ভাই কেউ ছিল না আর বাড়ি ছাড়া না ছিল কোনও সম্পত্তি—একজন নাম্বুতিরী নিজের বৌ এবং বাচ্চাদের জন্য কিছু দিত। দ্বিতীয়জন পরে নিজের জাতিতে বিবাহ করল, তার সম্পত্তিও ছিল, কিন্তু সে নিজের উন্নিতিরী বৌ ও বাচ্চাদের কোনও খোঁজ খবর নিত না। গ্রামের যুবকরা এটা খুবই খারাপ মনে নিয়েছিল এবং সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন নাম্বুতিরী পিতাকে পথে আনার কথা চিন্তা করছিল।

কারিয়েল্লুরে ৫০ ঘর নাম্বুতিরী আছ যার মধ্যে ১৫ জন ছোটখাটো জমিদার (জনমী)। দুজন চাষ করে দিন চালায়। বাকিরা পুজো-আর্চা করে অথবা ব্রাহ্মণদের জন্য নানান জায়গায় স্থাপিত অন্নসত্রে ঘুরে বেড়ায়। এখন বাড়ির সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাওয়ার দরুন তাদের আর্থিক স্তর নেমে যাচ্ছে। কোথায় কয়েক প্রজন্ম আগে পর্যন্ত ২৫ একর অখণ্ড জমি পাওয়া গিয়েছিল. আর কোথায় সেটা ভাগ হতে হতে দ্বিতীয় প্রজন্মে ৪-৫ একর মাত্র রয়ে গেল। এখানকার নাম্বুতিরী যুবকরা হোটেল এবং দোকান করার দিকেও অগ্রসর হয়েছেন

গ্রামে মুসলমানদেরও ৪৬টি পরিবার আছে, যাদের মধ্যে ৪ জনের কাছে জমি আছ (২ জনের কাছে ১৫ একরের বেশি এবং ১ জনের কাছে ৫ একরের বেশি)। ১০ ঘর দোকানদার আছ। এদের মধ্যে কয়েকজনের গোলমরিচের বাগানও আছে। বাদবাকি সবাই মজুরি খেটে চালায়।

৩০টি পরিবার মোগামদের (ধীবর)। এদের জমি নেই। এদের কাজ মাছ ধরা এবং এজন্য এরা আশেপাশের নদী ছাড়াও সাত-আট মাইল দূরে সমুদ্র পর্যন্ত যায়।

৩০টি মুওয়ারী (পাথরকাটা) পরিবার আছে। যে নরম পাথর কুয়ো এবং দেওয়াল তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলো কাটা এদের কাজ। এদের হাতে জমি নেই।

৮টি আশারী (ছুতোর) পরিবার ভূমিহীন এবং এরা ছুতোরের কাজ করে।

৬০টি উন্নিতিরী পরিবার আছে, যার মধ্যে এক ঘরের কাছে ৫ একরের বেশি জমি আছে এবং ৪ জনের কাছে ৫ একরের কম। ২ জন ছোটখাটো ভূস্বামী আছে, ৪জন শিক্ষক। যে সুবিধে ব্রাহ্মণরা উন্নিতিরীদের কাছে পায়, সে সুবিধে উন্নিতিরীরা নায়ারদের

কাছে পায়। উন্নিতিরী স্বামী নিজের নায়ার স্ত্রীর হাতে জল খেতে পারে না কিন্তু তার হাতে চিঁড়ে, পান ও চা নিতে পারে। বিবাহ-চিহ্ন (মঙ্গলসূত্র) উন্নিতিরী কন্যাকে তিরুআপ্পড়ের কাছ থেকে কিভাবে নিতে হয় এ সম্পর্কে একটু আগেই আমরা বলেছি।

গ্রামে কোলয়াদের (অচ্ছুত) চারটি পরিবার। এদের কাছে কোনো জমি নেই এবং এদের দারিদ্র চূড়ান্ত পর্যায়ের। ওদের কাজ ঝুড়ি-চাটাই বোনা। আমি দেখে আশ্চর্য হলাম যে ১৩ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ঝুপড়িতে ১২টি বয়স্ক ছেলে কিভাবে থাকতে পারে! নারকেল পাতার ছাউনি আর দেওয়াল বলতে ঝোপ ঝাড়ের বেড়া। তালা বা দরজার ওখানে কোনো প্রয়োজন ছিল না। ঘরে চার-পাঁচটি মাটির বাসন ছিল। ভাঁড়ারে খাদ্যশস্য কিছুই ছিল না। সে সময়ে তিনটি বাচ্চা এবং তাদের প্রৌঢ়া মা ঘরেই ছিল। বাকি লোকেরা গ্রাম থেকে দূরে কোথাও মজুরি খাটতে গিয়েছিল। মহিলা ঝুড়ি বুনছিল। একদিনে একটা ঝুড়ি তৈরি হয়। তারপর সেটা ও আধসের ধানে বিক্রি করবে। তাই দিয়েই তিনটি বাচ্চা এবং নিজে খাবে। শুধু সন্ধেয় একবার খাওয়া জোটে। যদি দয়া করে কেউ মাড় দিয়ে গেল তাহলে ছেলেরা একটু বাড়তি পেয়ে গেল। আধসের ধান শুনে আমায় আশ্চর্য হতে দেখে মহিলা বলল, 'অনাহারেব ব্যাপারে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না।' এর মধ্যে একটু অহংকারও ছিল, কিন্তু এই অহংকার হল বিপদ সইতে সইতে পাথর হয়ে যাওয়া হৃদয়ের অহংকার। তার গায়ে কোমর থেকে নিচে সোয়া হাত চওড়া আর তিন হাত লম্বা একটি কাপড় ছিল। বাচ্চাদের কাপড়ের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় না।

কারিয়েল্লুর গ্রামের ৫২০০ জন লোকের জন্য ৩০০০ একর জমি আছে, যার মধ্যে ১২০০ একর ধানখেত এবং বাদবাকি বাগান। গ্রামের জমিদার বাইরের লোক এবং কৃষকদের বেশি শোষণ করাই ছিল তাঁর কাজ। জমি উর্বর। প্রতি একর (২৮০৩৪$^{৫}/_{৯}$ বর্গগজ) ধানের খেত ২৫০০ টাকায় বিক্রি হয় এবং নারকেল খেত একর প্রতি ২০০০ টাকায়। জমির উপর গ্রামের লোকদের যদি অধিকার থাকত, তবুও গ্রামের লোকদের খাওয়া পরার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। ওদিকে জমিদারের দিক থেকে খাজনা বৃদ্ধি আর অন্য রকমের অন্যায় কর এবং বেগারখাটার বোঝা ছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষ এই জুলুম চিরস্থায়ী মনে করে সহ্য করে আসছে। ১৯৩১-৩২-এর সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারী যুবকরা যখন গান্ধীবাদে নিরাশ হয়ে পড়ল এবং সাম্যবাদের পথ ধরল, তখন তার গুঞ্জন কারিয়েল্লুরের মত গ্রামেও পৌঁছল। ওরা ভেবেছিল যে এই অত্যাচার শাশ্বত কারণ আমরা এটা চোখ বন্ধ করে সহ্য করে এসেছি। আমরা আর সইবো না এবং এই প্রাচীন প্রথাকে আমরা শেষ করেই ছাড়বো। তাঁদের চিরকালের রাজা ভেঙ্গলের জমিদারের মত বড় বড় ধনীদের সঙ্গে লড়াই করতে হত। যারা সরকারের খয়ের খাঁ এবং কৃপার পাত্র ছিল, পুলিশ তাদেরই পিছনে ছিল। আইন ও আদালতকে বশ করার মন্ত্র তাদের কাছে ছিল. এদের নেতাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না— আসলে, ভগবান যদি জীবিতই হন তাহলে শ্রমজীবীরা কয়েক শতাব্দী ধরে নরকের জীবন কেন ভোগ করছে এবং তাদের রক্ত জল করা আয়ের উপর ফুর্তি করে বেড়ায় যে অকর্মণ্যরা তারা কেন তাদের অত্যাচার করছে? পৃথিবী এবং আকাশের সমস্ত শক্তিগুলির সঙ্গে ওদের সংগ্রাম করতে হল। প্রথমে অল্প কয়েকজন

সাহস দেখাল, তারপর অন্যদের মনেও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল এবং কয়েক বছরের সংঘর্ষের পর জমিদারদের পরাস্ত হতে হল। এখনও জমিদারি প্রথা উঠে যায় নি। কিন্তু তার প্রভামণ্ডল ফিকে হয়ে গেছে। আয়ও হ্রাস পেয়েছে। মনে হল তার দম ফুরিয়ে আসছে। কারিয়েল্লুরের জনতা এই সবই নিজের শক্তিতে অর্জন করেছে। যদিও এখানে অনাহার আছে, কিন্তু যে তরুণদের ওপর বিশ্বাস করে সংগ্রাম দ্বারা তারা নিজেদের লুপ্ত আত্মসম্মান উদ্ধার করেছে, অনেকগুলি আর্থিক সুবিধা পেয়েছে,সেই তরুণদের কথায় বিশ্বাস করেই তারা আশা করে যে কোনও একদিন কেরল নিজের অন্য গ্রামগুলিকে সাম্যবাদী করে সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করে দেবে। গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা প্রথমে বিরোধী ছিলেন, মাঝারি কৃষকরা ছিল তটস্থ, কিন্তু আজ কেউ প্রিয় কারিয়েল্লুরের বিরোধী হতে পারে না। ব্রাহ্মণ, নায়ার, মুসলমান প্রভৃতি জাত থেকে আসা ৫৩ জন পার্টি-মেম্বার নিজেদের মধ্যে ধর্ম, জাত, ছোঁয়াছুঁয়ির কোনও তফাৎ মানে না। তারা নিজেদের সাথীদের নিজের ভাইয়ের থেকেও বেশি বিশ্বাস করে।

কারিয়েল্লুরে ঘুরবার জন্য জমিগুলির এক সীমা থেকে আরেক সীমা পর্যন্ত যেত হত, কারণ কোনও ঘরই একশো গজের কম দূরে নয়। গ্রামের কেন্দ্রে নারকেল বাগানে পার্টি কার্যালয়। সেটা ওদের শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও ছিল। ওরা নিজেদের গান বেঁধেছিল কিন্তু পুরনো লয়, নৃত্য ইত্যাদি বজায় রেখে।

এখন (৩০ মার্চ) পুরক্কলী (তরুণনৃত্য)-র মরশুম ছিল। তরুণরা তালি বাজিয়ে ও গান করে চক্রাকারে ঘোরে। প্রাচীনকালে নাচে দেব-দেবীদের গান গাওয়া হত, কিন্তু আজ এরা গাইছে কয়ুরের বীরদের গান, জাপানী ও জার্মান অত্যাচারের গান, লাল দুনিয়ার গান।

সেই দিন রাত্রে গ্রামের তরুণরা নিজেদের অনেকগুলি নৃত্য এবং গীত পরিবেশন করল! যদিও তারা আগে থেকে আমার আসার সংবাদ জানত না, কিন্তু সমস্ত গ্রাম সংগঠিত, ১৫০ জন ভলান্টিয়ারের মধ্যে ৩৬ জন গেরিলা বিদ্যায় শিক্ষিত, কারণ সমুদ্রতীরে অবস্থানে জন্য যতটা ক্ষতির সম্ভাবনা সিংহলের, ততটাই ক্ষতির সম্ভাবনা মালাবারেরও ছিল। প্রথম নাচটা ছিল ছেলেদের, কোলকলী। এটি সারা ভারতেই দুটো কাঠি বাজিয়ে এক ধরনের নাচ। তারপর ৭ থেকে ১০ বছরের মেয়েরা নিজেদের কুম্মীনৃত্য দেখাল, যা গরবার মত নাচ। গান এবং নাচ দুটোই ওরা খুব সুন্দরভাবে করে দেখাল। তারপর চাকু চালানো এবং অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামের পর অনেক তরুণ লাঠি ও ছোরাখেলায় দক্ষতা দেখাল তলোয়ার সবশেষে পুরক্কলী (নৃত্য) দেখানো হল। আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য কমরেড টি· বি· কুঞ্জীরামন (ছোটুরাম) , কম: কুঞ্জীকৃষ্ণ নায়ার এবং কম: পি, কুঞ্জিরামনকে ধন্যবাদ দিলাম।

জাতিগুলির পর্যায়—নাম্বুদিরী সব থেকে বড়। তার মধ্যে আবার জ্যেষ্ঠপুত্র সবচেয়ে বড়, কনিষ্ঠপুত্র আর রাজবংশী নায়ার কন্যার সন্তান (কোচিনের বর্মা)-এর নম্বর দ্বিতীয়। তিন নম্বর হল কোয়তম্বুরনের, যারা কিনা ত্রিবাংকুরে রাজাদের পিতা বা ভগিনীপতি হয়ে থাকে। কোচিন রাজবংশে নাম্বুতিরীর যে কাজ ত্রিবাংকুরে কোয়তম্বুরন সেই কাজই করে।

বর্তমান ত্রিবাংকুরের রাজা এবং তার অনুজ কোনো কোয়তম্বুরনেরই পুত্র। ওর ভগিনীও কোয়তম্বুরন কুলেই পরিণীতা।

কোচিনের মত ত্রিবাংকুরেও রাজ্যের উত্তরাধিকার সহোদর ভাই অথবা ভাগ্নীদের ক্রমানুসারে বর্তায়। বর্তমান ত্রিবাংকুরের মহারাজার পর ওর অনুজ গদিতে বসবে এবং ওর পরে ওর ছ বছরের ভাগ্নে বসত, যে সদ্য মারা গেছে। ত্রিবাংকুরের রাজবংশ তম্বুরন, যেটা কোর তম্বুরণ থেকে এক ধাপ নিচে। ত্রিবাংকুরের রাজাকে পৈতের অধিকারী হওয়ার জন্য—অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য—একটি সোনার গরুর পেটের থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু এই হিরণ্য গর্ভক্রিয়া তাকেই ক্ষত্রিয় বানায়। তার সন্তান অথবা বংশকে নয়। তম্বুরণের পর সেই জাতিগুলির নম্বর আসে যারা মন্দিরগুলির আলাদা-আলাদা অধিকারী হয়ে আসছেন—যেমন তিরুআপ্পড়, নম্বীসন, উন্নিতরী, ওয়ারিয়ার, মাড়ার, কুরুপ্প, পিশারডী, কুডওয়াল। এদের মধ্যে তিরুআপ্পড় এবং নম্বসন পৈতে ধারণ করে। সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে বিনাশ করতে সক্ষম পরশুরাম এখনও জীবিত। ওর ভয়ের চোটে উন্নিতিরী বেচারারা পৈতে শরীরের বাইরে না রেখে ঘিয়ের সঙ্গে পেটে রেখে দেয়। এর পর নায়ারদের নম্বর আসে। নারাব্দের পর মনিয়ানী। বানিয়া (তেল), চালিয়া (ততওয়া), থীয়া (কালান বা পাসী)। সোগয়ার (ধীবর), নাবিদিয়ার (নাপিত), রন্নতন (ধোপা), চেট্টী (স্বর্ণকার), আশারী (ছুতোর), কোল্লন, (কামার), মুশারী (পিতলকার), চেম্বুটী (তাম্রকার), বন্নন (ভূর্তনর্তক), পুলেয়া (বুসোর)। চিরপুডী (চামার), কাণসন (ছত্রকার), মাইল (টুকরিকার) ইত্যাদি। মালাবারের জাতিগুলির মধ্যে শেষ চারটি জাতি অচ্ছুত এবং বাদবাকিদের কে বড় কে ছোট তার ফতোয়া ব্রাহ্মণেরা নিজেরা না দিয়ে ওদের কলহের জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

যে রকম ঘোর অপরিবর্তনীয় ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা মালাবারে এখন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, এখন তার স্থান এক ঘোর পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে নিচ্ছিল। মালাবারের এই নতুন ধারার বাহক হল কম্যুনিস্ট পার্টির দু হাজার কর্মঠ মেম্বার, যাদের ত্যাগ এবং নির্ভীকতার প্রশংসা শত্রুরাও করে থাকে।

কারিয়েল্লুর থেকে আমি ৩০ মার্চ সন্ধেবেলা রওনা হলাম। ৬মাইল পরে পয্যনুর বাজারে আসলাম। এখানেও স্বাগত জানাবার জন্য শোভাযাত্রা তৈরি ছিল। তারপর এক সভায় একটু বলতে হল। রাত্রে আমি পার্টি-সেক্রেটারি নাম্বিয়ারের বাড়িতে থাকলাম। ইনি নায়ারবংশীয় ছিলেন। কিন্তু মায়ের দিক থেকে পিতা কোনও নাম্বুতিরী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পরদিন সাড়ে নটার ট্রেন ধরলাম। কালিকট স্টেশনে তরুণ কবি কে· পি· জে· নাম্বুতিরীর সঙ্গে দেখা হল, ওর সঙ্গেই আমি শোনোর গেলাম। স্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে ভরতপুরা নদী আছে। এটাই ব্রিটিশ মালাবার এবং কোচিন রাজ্যের সীমারেখা। পুল পেরিয়ে চেত্তুরুত্তী গ্রামে পৌঁছলাম। কেরলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ মেনন ভাল্লাথোল এখানেই থাকেন। ভাল্লাথোল অনেকগুলো মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য লিখেছেন। এখন ওঁর বয়স ৬০ বছরের বেশি, কিন্তু এখনও উনি নিজক্ষেত্রে তরুণ। ওঁর চিন্তাধারায় নিরন্তর প্রগতি ঘটে চলেছে। উনি কেবল কাব্যেরই আচার্য নন, কেরলের প্রাচীন নাট্যশিল্পকে

বাঁচিয়ে রাখতেও ওঁর বিরাট অবদান আছে। কথাকলীর (মূকনৃত্য) উনি একজন সম্মানিত আচার্য। সংগীত ও নৃত্যকলাকে উজ্জীবিত করতে উনি এক কলামণ্ডল স্থাপন করেছেন। ব্যক্তিগত নেতৃত্বের ফলে কলামণ্ডলের হয়ত ক্ষতি হতে পারে—এই চিন্তা করে উনি কলামণ্ডল এবং ৫০ হাজারের তহবিল রাজ্যের হাতে সঁপে দিলেন, কিন্তু রাজ্যের নির্জীব যন্ত্রে পড়ে কলামণ্ডলের উন্নতি কি হবে সেটা আরও ক্ষয় পেতে লাগল। এখনও অনেক কলাপ্রেমী ওঁর ওপর চাপ দিচ্ছে। যাতে উনি কলামণ্ডলকে নিজের হাতে তুলে নেন। কলামণ্ডলের নাট্যশালা হালে সৈনিকদের বাসস্থান হয়ে গিয়েছে। ভাল্লাথোল ১৯০৭-এ বাল্মিকী রামায়ণের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। ওঁর মহাকাব্যগুলির মধ্যে একটি হল 'চিত্রযোগম্।' কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অবলম্বনে উনি 'অচ্ছন মকলম্' নামে কাব্য লিখেছেন, যাতে শকুন্তলা নিজের পিতা বিশ্বামিত্রকে খুব ভৎর্সনা করেছেন— বিশ্বামিত্র মেনকার সঙ্গে শুধু শারীরিক সুখের সম্বন্ধ রেখেছেন কিন্তু কন্যার কোনও দায়িত্ব নেন নি। কবির এই কথাটায় খুব খটকা লেগেছিল।

আমি যখন ওঁর বাড়ি পৌঁছলাম তখনও উনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। ওঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে দুজন এবং তিন কন্যার একজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কবির বৃদ্ধা স্ত্রী বাড়িতেই ছিলেন। তাঁরা স্বাগত জানালেন। সমস্ত পরিবার সুরুচিসম্পন্ন। পুত্রদের মধ্যে দুজন পার্টি-মেম্বার। ভাল্লাথোল নিজেও পার্টিকে খুব ভালোবাসেন। সন্ধেবেলা উনি এলেন। কানে খুব কম শোনেন। সেজন্য কথা বলা খুব সহজ ছিল না, তবু কিছু কথাবার্তা হল।

পরদিন দুপুরের পর আমি স্টেশনের পথ ধরলাম। আমি কেরল ছাড়বার সময় নিজের ডায়েরিতে ওখানকার সম্পর্কে লিখেছিলাম— 'কেরলের সামাজিক প্রগতি অনেকটা পিছিয়ে আছে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মাতৃতন্ত্র থাকার কুফল তো হওয়াই উচিত। তার ওপর ব্রাহ্মণেতর সমস্ত উচ্চজাতির কন্যারা ব্রাহ্মণদের সংগে যৌন সম্পর্ক রাখতে প্রস্তুত। এখানে কয়েকটা ব্যাপারে তিব্বতের সঙ্গে মিল আছে। প্রত্যেক মানুষ (অতিথির কাছ থেকে) পিণ্ডি ছাড়াতে প্রস্তুত।

ট্রেন ধরতেও খুব অসুবিধে হল। ভীষণ ভিড় ছিল। পরদিন (৩ এপ্রিল) সকাল আটটায় ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছলাম।

কর্ণাটকে (১৯৪৪)— ২৬ মার্চ আমি ব্যাঙ্গালোর হয়ে কেরলে গিয়েছিলাম। সে সময় আমার মাত্র একদিন থাকার সুযোগ হয়েছিল। আর এবারও মাত্র দুদিনই (৩-৪ এপ্রিল) এখানে থাকতে পারলাম। গ্রামগুলোতে যাওয়ার আমার সুযোগ ঘটে নি।

ব্যাঙ্গালোর কর্ণাটকের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ব্যাঙ্গালোর শহর এবং ছাউনির লাগোয়া অনেকগুলি বসতি আছে; যার মধ্যে ব্যাঙ্গালোর ছাউনি ইংরেজদের অধীন। এমনিতেই এখানকার ছাউনি যথেষ্ট বড়, এখন তো এখানে এক লাখের বেশি সৈন্য থাকে। এখানে সেনা অফিসারদের কলেজ আছে, কয়েকটি বিমানবন্দর আছে। এক শহরে প্রায় তিরিশটির মত সিনেমা হল আছে।

কন্নড় (কর্ণাটকী) ভাষার লেখকদের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রগতিশীল। এখান থেকে যাবার সময় কমরেড উপাধ্যায় এবং অন্যেরা কথা আদায় করে নিয়েছিল যে এদিক দিয়েই যাবো। রাত্রে ট্রেনে ঘুমোবার সুযোগ পেলাম না সেইজন্য দিনে কয়েকঘন্টা ঘুমিয়ে নিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে কোনো একটা কন্নড় ফিল্ম দেখব। কন্নড়ের ফিল্মের ক্ষেত্র খুবই সংকুচিত। তাদের চাহিদা কম। কাজেই খুব কম ছবি তৈরি হয়েছে। প্রায় তিরিশটির মত সিনেমা হল আছে কিন্তু তাতে বেশির ভাগই হিন্দি ফিল্ম চলে। আগেও আমি লিখেছি—হিন্দি ফিল্মের মাধ্যমে হিন্দুস্তানী সংগীত এবং বেশভূষা দক্ষিণ পথ জয়লাভ করেছে, অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত সাময়িক সাফল্য পেয়েছিলেন, হর্ষবর্ধনকে তো পরাজয় স্বীকার করে পলায়ন করতে হয়েছিল কিন্তু সেই দক্ষিণাপথকে আমাদের সিনেমা-তারকারা নিজেদের সৌন্দর্য, বেশবাস, হাবভাব এবং কোকিলকণ্ঠ দ্বারা মুগ্ধ করে দিয়েছেন। সম্ভবত এই বিজয়ে আমাদের দক্ষিণী ভাইরা রাগ করবেন না।

জানতে পারলাম যে 'পান্‌তুলম্মা' নামে একটি তেলুগু ছবি চলছে। কুমার নাট্যাচার্যর সঙ্গে আমরা ওখানে গেলাম। ছবিটির কাহিনী ছিল— পনতুলম্মা অনাথাশ্রমে পালিতা কন্যা, লেখাপড়া করে গ্র্যাজুয়েট হল। তারপর মিউনিসিপ্যালিটির বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হয়ে গেল। চেয়ারম্যান এক নম্বরের ঘুষখোর এবং বিলাসী লোক ছিল, সে পনতুলম্মাকে ফাঁদে ফেলতে চাইল। পনতুলম্মা অস্বীকার করায় সে তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করল। কিন্তু একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্রাহ্মণ যুবক পনতুলম্মাকে আশ্রয় দিল, তার ফলে তার বৈদিক ব্রাহ্মণ পিতা পুত্রকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করল। যুবক-যুবতী তখন অন্য কোথাও গিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকে। মা মরণাপন্ন শুনে পুত্র দেখতে আসে এবং তাকে অস্পৃশ্যের মত বাইরে খেতে দেওয়া হয়। সে খেতে অস্বীকার করে বেরিয়ে আসে। দরজায় পনতুলম্মার সঙ্গে দেখা হয়। গ্রামের তরুণরা খবর পায়। তারা যুবক-যুবতীর জয়ধ্বনি করতে থাকে। বৈদিক পিতা বিশাল জনতার ধ্বনি শুনতে পায় এবং বুঝে ফেলে যে এখন আর তার যুগ নেই, সেজন্য সে নতুন যুগকে স্বাগত জানায় এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে। ঘোর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দক্ষিণে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই ছবিতে তার খানিক পরিচয় ছিল।

দক্ষিণের প্রযোজকরা বাজারের ঘাটতির অভাবজনিত ক্ষতির ভয়ে ছবিতে অত টাকা ঢালতে পারেন না, যতটা হিন্দি ছবিতে করা হয়ে থাকে। সেজন্য তাঁরা অত ভাল ভাল শিল্পী যোগাড় করতে পারেন না। তাও ওখানে উঁচুদরের শিল্পী নেই সে কথা বলা ঠিক নয়। ওখানকার ছবিগুলোতে স্বাভাবিকতা খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে গ্রাম্য জীবনের। এর এটাও একটা কারণ যে সিনেমাগুলি নিজের ভাষার অঞ্চলে তৈরি হয়। আর ভাষাও কেতাবী নয়। সজীব কথোপকথনের ভাষা।

পরদিন (৪ এপ্রিল) 'বার্তা'-(দৈনিক পত্রিকা)-র কার্যালয়ে কন্নড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে কথাবার্তা হল। তার মধ্যে বেশির ভাগই প্রগতিশীল লেখক। আজকের জীবিত ভাষাগুলির মধ্যে কন্নড় সাহিত্য হিন্দি (অপভ্রংশ) এবং তামিলের পরে সবথেকে প্রাচীন। এখনও এখানকার কবিতায় ভাষা ও কাব্যশৈলীতে পুরনো ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যাঁ, গল্প ও উপন্যাস

অবশ্যই নতুন ঢঙে লেখা হচ্ছে। কন্নড় প্রদেশও চারটি ভাগে বিভক্ত— কিছু মাদ্রাজ অঞ্চলে, কিছুটা বোম্বাইতে, তারপর অনেকটা ভাগই মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পড়ে। অন্ধ্রের ক্ষেত্রেও খানিকটা এ রকমই হয়েছে কিন্তু তাও অন্ধ্রের বেশির ভাগ অংশই এক জায়গায় আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও কর্ণাটকীদের প্রাচীন ক্ষমতা এখনও লুপ্ত হয়নি। কংগ্রেসী আন্দোলনে তারা মহারাষ্ট্রের থেকে এগিয়ে আছে। কর্ণাটকে কম্যুনিস্ট পার্টির বার্তা অনেক পরে পৌঁছেছে, এখনও তারা এক বছরও হয়নি। তাও ওখানে ১০০ মেম্বার ছিল যার মধ্যে অনেকেই পূর্ণ সময় পার্টির কাজে ব্যয় করত।

আমরা সভা থেকে ফিরছিলাম। এক জায়গায় পনের-কুড়ি জন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের ভিতরে প্রবেশ করতেই কুট করে আওয়াজ হল। আমি পকেটের দিকে তাকিয়েই দেখলাম শেফার (ফাউন্টেন পেন) নেই। পেছন ফিরে দেখলাম একটা ছেলে খুব জোরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যতক্ষণে বন্ধুকে বলবার চেষ্টা করলাম ততক্ষণে আরও দূরে এগিয়ে গেছে। তাও আমরা গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। ততক্ষণে সে কলমটা অন্য কারও হাতে দিয়ে দিয়েছে। পুলিশ চৌকি পর্যন্ত গেলাম কিন্তু তারপর ভাবলাম অযথা হয়রানি, কলম তো আর পাওয়া যাবে না, কালই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। ওটা ওখানেই ছেড়ে দিলাম। শেফার খুব ভালো ফাউন্টেন পেন, আর আজ তো তার দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি ওটা দিয়ে চার-পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা বই লিখেছিলাম। সেজন্য বলতে পারি যে দাম উশুল হয়ে গিয়েছিল। ওই কলমটা এলাহাবাদে এক সপ্তাহ গুম হয়ে থাকার পর ফিরে পেয়েছিলাম। আমি সে সময় খুব খুশি হয়েছিলাম। আমার সব থেকে বড় ফিলসফি হল এই যে, যে জিনিসটা চলে গেছে তার জন্য আর আফশোশ কোরো না। এইভাবে পকেটে ফাউন্টেন পেন রাখলে চুরির ভয় থাকে— এরকম উপদেশ আমি অনেকবার শুনেছি। অধিকাংশ সময় বাইরে বেরোবার মুহূর্তে ফাউন্টেন পেনটা আমি ভেতরে ঢুকিয়ে দিতাম, আজও খেয়াল ছিল। কিন্তু কোনও পরোয়া না করে ওটা ওভাবেই ঝুলে থাকতে দিয়েছি। যাক, কলমটা গেল। অনেক বছর পর একবার আবার জিনিস চুরি যাওয়ার অভিজ্ঞতা হল।

সন্ধেবেলা তরুণদের সামনে এক বক্তৃতা দিতে হল।

বোম্বাই-এ, ১৯৪৪

৬ এপ্রিল দুপুরবেলা আমরা বোম্বাই পৌঁছলাম। এখনও পাসপোর্টের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের সময় বেকার নষ্ট করার কোনও প্রশ্নই ছিল না, আর এইভাবে থাকলে মনে অবসাদ এসে যায়। সর্দার পৃথ্বীসিংহের জীবনী লিখতে চাইছিলাম, কিন্তু এখনও উনি অন্ধ্র থেকে ফেরেন নি। ভাবলাম ততক্ষণ কালক্ষেপণের জন্য কিছু পড়া উচিত। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই 'পঞ্চগ্রাম' হাতে এল। তারপর ওঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'মন্বন্তর' পড়তে পেলাম। উনি একজন সিদ্ধহস্ত শিল্পী, সেই সঙ্গে নিত্য, নির্বিকার, একরূপে অপরিবর্তিত শিল্পী নন, উনি নিজের আশপাশের পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে দূষণ নয়, ভূষণ

মনে করেন। 'পঞ্চগ্রাম'-এ লেখক খুব সাফল্যের সঙ্গে পুরনো এবং নতুন প্রজন্মের সংঘর্ষ, পুরনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থের সঙ্গে নতুন সামাজিক স্বার্থের সংঘর্ষ, প্রাচীন আচারের সঙ্গে নব্য আচারকে চিত্রিত করেছেন। দৃশ্য এবং পাত্র সবই গ্রামের। তার মধ্যে এক ধরনের স্বাভাবিকতা আছে। আমি তার ওপরে লিখেছিলাম— 'সব মিলিয়ে ভালই, যদিও বিশ্বনাথের প্রতি লেখকের আশা দেখানো উচিত হয়নি, যখন তাকে দু লাইনেই মেরে ফেলার ছিল। দেবও ভাবধারায় কাঁচাই থেকে যায়।' 'মন্বন্তর'-এর বিষয়ে লিখেছিলাম— 'ভালো উপন্যাস— বিজয়দার স্বাভাবিক চিত্র, কানাইয়ের ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া, গীতার আত্মমর্যাদাবোধ। নীলার চরিত্রচিত্রণ খুব ভালো হয়নি, দেবপ্রসাদ টিপিক্যাল লিবারাল (উদারপন্থীদের নমুনা), গুণদার স্ত্রী অর্থডক্স (সনাতনী) তবুও গান্ধীভক্ত।'

এই সময় মাথার মধ্যে চারটে বই ঘুরপাক খাচ্ছিল— 'হিন্দি কাব্যধারা' (এখনও এর নামকরণ হয়নি), 'সর্দার পৃথ্বীসিংহ', 'ভাগো নহী বদলো', 'জয় যৌধেয়।' তবুও কোনো বড় কাজে হাত দেবার সাহস হচ্ছিল না। ভাবছিলাম যদি পাসপোর্ট পেয়ে যাই, তবে কাজ আধখেঁচড়া অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে।

বোম্বাইয়ে এখন আমি পার্টি-অফিসে ছিলাম। ছারপোকার জ্বালায় রাতে ঘুমনো মুশকিল ছিল। দু-তিন দিন পর আমি আবার ছাতে শুতে আরম্ভ করলাম। সেখানে ছারপোকার থেকে ছারপোকার থেকে প্রাণে বাঁচলাম। ছারপোকার থেকে বড় দেবতারাও ত্রাহি ত্রাহি করছে, তা আমার আর দুঃখ কি—

'ক্ষীরাব্ধৌ হি হরিঃ শেতে হরঃ শেতে হিমালয়ে।
ব্রহ্মা চ পংকজে শেতে মন্যে মৎকুণ শংকয়া।।'[১]

১৪ এপ্রিল আমি আমার দক্ষিণ-যাত্রার বিষয়ে-একটা রচনা লেখাচ্ছিলাম, শান্তি (ইন্দ্রদীপের স্ত্রী) লিখছিল। তিনটে বেজে গিয়েছিল। আজ আমাদের আম খাওয়ার জন্য সমুদ্রের ধারে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। মহেন্দ্র আচার্য আম কিনতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা আওয়াজ হল, আর সেই সঙ্গে ধাক্কা লাগল, ভেজানো দরজা খুলে গেল। আমি ভাবলাম ভূমিকম্প হয়েছে। দু-চার মিনিট পর আবার জোর ধাক্কা। আমি নিশ্চিত হলাম যে এটা ভূমিকম্প। আমরা চারতলায় ছিলাম। সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ি ছিল। মাঝখানে খেতওয়াড়ি মেনরোডের একটা সরু রাস্তা। যদি বাড়িটা পড়ে যাবার মত হত, তাহলে নিচে রাস্তায় গিয়ে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বাড়ি দুটো এরকম তিন-তিনটে রাস্তা ঢেকে ফেলতে পারত। তবুও জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। নিচের লোকেরা একটা দিকে খুব লক্ষ করে দেখছিল। আমরাও নিচে নেমে গেলাম, দেখলাম যে ডক (বন্দরী)-এর দিকে আকাশে খুব জোর ধোঁয়া উঠছে। খানিক পর আবার একটা প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হল এবং আশেপাশের সব বাড়িগুলো কেঁপে উঠল। লোকেরা বন্দরের দিক থেকে ছুটে চলে আসছিল। দু-তিনজন বন্ধু যাচাই করতে

[১] 'বিষ্ণু ঘুমান ক্ষীর সাগরে, শিব ঘুমান হিমালয়ে, ব্রহ্মা ঘুমান পদ্মের ওপরে—যেন ছারপোকারই ভয়ে।'—স·ম·

বেরোলেন। জানতে পারলাম যে বারুদে আগুন লাগায় জাহাজ উড়ে গেছে এবং অনেক মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে, বাড়িগুলোতে আগুন লেগে গেছে। কিছুক্ষণ পরে ওখান থেকে ফিরে এসে সুনীল জানা বলল, যে বহু লোক আহত হয়েছে। রাস্তায় সে এমন মৃতদেহ দেখেছে যার হাতটা মানুষের মতই ছিল, বাকি শরীরটা মাংসপিণ্ডের ড্যালা হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং ইন্দ্রদীপ চললাম। স্যান্ডহার্ট রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, কিন্তু রেলপোলের কাছে পৌঁছতেই সৈন্যরা ওদিকে যাওয়ার রাস্তা আটকে দিল। রাতের অন্ধকারে লাল লাল শিখাগুলো খুবই ভয়ংকর মনে হচ্ছিল। একটা গুলি দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছলাম। দেখলাম রেললাইনের ওপারের বাড়িগুলো দাউ-দাউ করে পুড়ছে। আর এপারে চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলো থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। লোকেরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। রেলপথের ধারের গুদামে চৌকাঠশুদ্ধ দরজার ভিতরে এমনভাবে পড়ে গিয়েছিল যেন সহস্রহস্তির বলযুক্ত কোনও পালোয়ান দু হাতে টিপে ওগুলো নিচে ফেলে দিয়েছে। জানলাগুলোতে কাঁচের কোনও চিহ্ন ছিল না। রাস্তার উপর ওগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়েছিল। আমি চটি পরে আসার জন্য পরিতাপ করছিলাম। চারদিকে বিভ্রান্তিকর অবস্থা। কিন্তু কিছু স্বয়ংসেবক এবং সৈনিক লোকদের বিপদসঙ্কুল জায়গা থেকে উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত ছিল। রাস্তা আর ফুটপাতগুলোতে লোকেরা খড়িমাটি দিয়ে লিখে দিয়েছিল যে শরণার্থীদের কোন জায়গায় যেতে হবে।

রাত্রে আমি ছাতে শুয়েছিলাম। অন্ধকারে ধোঁয়া কি করে দেখা যাবে কিন্তু প্রজ্বলিত আগুনের শিখা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

মহেন্দ্র যখন আমের দর-দাম করছিলেন, তখনই প্রচণ্ড শব্দটা হয়েছিল। উনি আম নিতে ভুলে গেলেন এবং দোকানিও দোকান বন্ধ করতে আরম্ভ করল।

পাসপোর্ট এবং ভিসা পাওয়ার পর যুদ্ধের সময় আরও একটা বিরাট ঝামেলা ছিল—টাকার বদলে বিদেশী বিনিময় পাউন্ড নেওয়া। সরকারি আদেশ ছাড়া আপনি এক পাউণ্ডও পেতে পারেন না। পাউন্ডের জন্য আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে লিখেছিলাম। ১৩ এপ্রিল ব্যাঙ্ক কিছু প্রশ্ন করেছিল যার উত্তর দেয়া হয়েছিল। ২২ তারিখ আমি ওখানে গেলে ব্যাঙ্কের লোকেরা বলল, 'আপনি আগে ডিফেন্স (সেনাবিভাগ) থেকে বৌ-বাচ্চাদের আনার অনুমতি নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা পাউন্ড দেব।' আমি খরচের বিবরণ দিয়ে আবেদনপত্রে লিখে দিয়েছিলাম যে সোভিয়েত দেশে যাওয়ার এবং স্ত্রী-পুত্রদের আনবার জন্য আমার এত পাউণ্ডের প্রয়োজন। স্ত্রী-পুত্রদের আনবার কথা লেখার দরকার ছিল না। কারণ এই প্রশ্নটা সোভিয়েত দেশে যাওয়ার পরে উঠত। কিন্তু যেতে না পারলে তো টাকা-পয়সা পাঠাবার প্রয়োজন পড়ত। বসে বসে আমি আর এক বিপদ ডেকে আনলাম। আজও ইংরেজ অফিসারদের মেজাজ কত তুঙ্গে সেটা এই লোকটার সঙ্গে কথা বলবার সময় জানতে পারলাম। তার ব্যবহার ভীষণ রূঢ় ছিল এবং সে সাধারণ ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দিতেও অপরাগ ছিল, কিন্তু এটা তার দোষ নয়, দোষ আমাদের দাসত্বের।

বোম্বাইয়ে থাকতে আমি যখন-তখন কোনও ফিল্‌ম দেখতে চলে যেতাম। এখানে দুটো ফিল্‌ম সম্পর্কে আমি নিজের ডায়েরিতে যা লিখেছি তা উদ্ধৃত করছি—'রাত্তিরবেলা

'শুক্রিয়া' দেখতে গেলাম, অভিনয় যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র নাচ-গান ও সৌন্দর্যপ্রদর্শনের জোরেই এই ফিল্মটা দর্শকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর স্বয়ংবর (হচ্ছে), যাতে নীনা (রমলা) সমস্ত প্রার্থীদের অস্বীকার করে। শেষের জনকে না দেখেই অস্বীকার করায় সে 'শুক্রিয়া' বলে। ডাকার পর নীনা তাকে দুটো চড় মারে, তখন নায়কও কয়েকটি চড় মারে। প্রেম শুরু হয়ে যায়। হিরো (নায়ক) এক নম্বরের বিলাসী (মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত)। সে এক বেশ্যাকন্যাকে প্রতারণা করে। (টাকার লোভে) নীনার বাবা মেয়ে জন্মাবার আগেই, মেয়েকে সুন্দরের সঙ্গে বিবাহের পর সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার উইল (ইষ্টিপত্র) লিখে দেয়। সুন্দর গুরুর কাছ থেকে নির্বোধ হয়ে বেরিয়ে আসে। মনোহর (নায়ক) ওকে বোকা, বিলাসী তৈরি করে, সে কাজে বেশ্যাকন্যা সাহায্য করে। চালটা ধারা পড়লে নীনা অস্বীকার করে। শেষপর্যন্ত সুন্দর বেঁচে যায়। সুন্দরের গুরুর আদর্শ জয় হয়। গল্প একেবারেই বিশৃঙ্খল। নিষ্প্রাণ এবং উদ্দেশ্যহীন।'

পরদিন (২০ এপ্রিল) আমি 'জমিন' দেখলাম। তার বিষয়ে লিখেছিলাম—'এতদিন বাদে এই একটি হিন্দি ফিল্ম্ এসেছে। যার প্রশংসা করা যায়। সংলাপ অপূর্ব, কৌরবী উচ্চারণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে সফলতাও এসেছে। কাহিনী-সুসম্বন্ধ, গভীরতা আছে··· অভিনয়ে যা কিছু আছে, ধ্বনি তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নায়িকা (দুর্গা খোটে), দাড়িওলার এবং কানে কালার পার্ট খুব সুন্দরভাবে ফোটানো হয়েছে। কালা লোকটি তো দারুণ করেছে। কাহিনী হল—ভূমিকম্পের দরুন দাড়িওলা এবং বন্যা আকালের জন্য নায়িকার গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। প্রথম জনের কাছে দুটি ছাগল এবং দ্বিতীয় জনের কাছে একটি গরু থেকে যায়। দাড়িওলা জমি আঁকড়ে ধরে, নায়িকাও গরু নিয়ে সেখানে উপস্থিত। দুজনে নতুন জীবন শুরু করে—কৃষকের জীবন। কৃষক কিছুদিন পর ছাগলগুলো এবং জিনিসপত্র বিক্রি করে এক বধিরের গাড়িতে কৃষির জিনিসপত্র (হাল, চরকা···) নিয়ে বাড়ি পৌঁছয়, তিনজনে মিলে কাজ আরম্ভ করে দেয়। জমিতে সরকারি অফিসার হঠাৎ এসে হাজির হয়। তাকে পয়সা দিয়ে তারা নিজের কাজ করে। সেখানে নুন আছে দেখে পুঁজিপতিও এসে উপস্থিত। এখন বিপদের সূচনা হয়। সেই জমিতে নুনের পরে তামা বের হয়। বিক্রি না করার জেদ করায় পুঁজিপতি দলিলটি চুরি করতে চায়। নায়িকা তাকে মেরে ফেলে। বড় পুঁজিপতি স্ত্রীর হয়ে লড়াই করার এবং ছেলেকে পড়াবার ভান করে উপকার করার কথা বলে। কিন্তু করে না। স্ত্রী ১২ বছরের জন্য জেলে যায়। ছেলেকে মারধর করে। সে জাহাজে করে বেরিয়ে পড়ে। নায়িকা ছাড়া পেয়ে ছেলেকে ফেরৎ চায়। শেঠ বলে যে সে বিলেতে পড়তে গেছে। শেঠকন্যা (খুরশিদ) মোটরগাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের দেখা, দুজনের পরিচয়, কিন্তু যুবক ঘৃণা করে। সে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে। বধির প্রথম থেকেই শেঠের ফাঁদের বিরুদ্ধে ছিল। ছেলে-মেয়েতে প্রেম হয়। তামা শেষ হয়ে যাবার পর তেল বের হয়। ছেলে শেঠের কাছে জমি বিক্রি করতে প্রস্তুত, মা অসম্মত। শেঠও জন্মভিটে বিক্রি করার জন্য বিদ্রূপ করে। ছেলেটির চোখ খুলে যায়। শেঠকে জমিটা ছেড়ে দেওয়ার

কথা বলা হয়। শেঠ ডিনামাইট বসাবার হুকুম দেয়। যুবক শেঠের সাইনবোর্ডটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যার দরুন গুণ্ডারা মাথা ফাটিয়ে দেয়। এখন শেঠকে মারবার জন্য জনতা এগিয়ে আসে। তরুণী কন্যা পিতার ঠিকানা জানাতে অস্বীকার করে। যুবক তাকে মারবার জন্য হাত তোলে। মেয়েদের গায়ে হাত তোলা কাপুরুষতা এই বলে মা থামিয়ে দেয়। জমি ছেড়ে দেওয়ার শর্তে শেঠকে অভয় দেওয়া হয়। শেঠ-গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চায়, মেয়েও যেতে চায়। মা এই বলে হাত ধরে ফিরিয়ে আনে, 'ছেলেকে সঙ্গে এনেছিলে। এখন ওকে একলা ফেলে চলে যাচ্ছ?' (সিনেমায়) কৃষকদের আচার-ব্যবহার বেশ গম্ভীর ও স্বাভাবিক। দাড়িওলা একটু সিধেসাধা। শেঠ নৃশংস। বস্ত্রহরণের পরিবর্তে অন্য কোনও গ্রামীণ চিত্তবিনোদনের জিনিস আনতে পারত। গানগুলো ভালো ছিল না, ফটোগ্রাফিও ত্রুটিপূর্ণ। যোগীর বেশ উপযুক্ত হয়নি।'

শহরে জায়গা খুব কম ছিল। পার্টি বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দূরে আন্ধেরীতে একটা বাংলো ভাড়া করা হয়েছিল। যেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন থাকতে পারত। ২২ তারিখ আমিও কমরেডদের সঙ্গে এখানে এলাম। এই বাংলোটা আন্ধেরীরও বাইরে ছিল, ভাল বাগান ছিল। আশেপাশেও আমের বাগান এবং অন্যান্য বাংলো একে অন্যের থেকে দূরে ছিল। বন্ধুরা প্রতিদিন দশটা বাজার আগেই শহরে চলে যেত কিন্তু আমার 'সর্দার পৃথ্বীসিংহ' লেখার কথা। সেজন্য শহরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমি ২৪ এপ্রিল থেকে 'সর্দার পৃথ্বীসিংহ' লেখাতে আরম্ভ করলাম এবং জৌনপুর জেলা নিবাসী যুবক ঠাকুর ভগবানসিংহ খুব তৎপরতার সঙ্গে লিখতে লাগলেন।

ভিসার গণ্ডগোল—২৭ তারিখে জানা গেল যে ভারত সরকার প্রথম শর্ত তুলে নিয়েছে এবং ইরানের ভিসা নিয়ে আমি সেখানে যেতে পারি।

২৯ এপ্রিল দশটার সময় বোম্বাই গেলাম। ঘুরতে ঘুরতে গামড়িয়া রোডে ইরান কন্‌সালের কাছে গেলাম। আগের অভিজ্ঞতায় আমি জানতাম যে ভিসা দেওয়া এক-আধ ঘণ্টার কাজ। একজন সঙ্গী জিজ্ঞেস করাতে আমি বলে দিয়েছিলাম, আমার যাওয়া ৯৯·৯% ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু ইরান কন্‌সালের সঙ্গে কথা বলার পর প্রচণ্ড নিরাশ হলাম। তিনি বললেন, 'যতক্ষণ তেহরান থেকে সরকার অনুমতি না পাঠাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা ভিসা দিতে পারি না।' ছ মাসের আগে কি অনুমতি পাওয়া যাবে?

৫ মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চিঠি পেলাম যে তারা ১২৫ পাউণ্ডের বিনিময় দিতে রাজি আছে।

৮ মে আমি বিনিময়ের জন্য ২০০০-এর চেক নিয়ে এলাম। পরদিন ইরান কন্‌সালের কাছে দুটো ফটোসহ ভিসার জন্য দরখাস্ত দিলাম। তিনি ভিসাটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্য একটা টেলিগ্রাম বয়ান করে দিলেন। আমি সেটাও পাঠিয়ে দিলাম। এখন আমার কাছে পাসপোর্ট ছিল। কিছুদিন বাদে টমাস কুক ১২৫ পাউন্ডের চেকও দিয়ে দিল। কিন্তু ইরানী ভিসার অনুমতির আজ (২৭ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত কোনও পাত্তা নেই। ইরান কন্‌সাল বলে দিয়েছিলেন, 'কবে নাগাদ অনুমতি আসবে কিছু ঠিক নেই।' আমি ঐ সময়টা বই লেখার

কাজে লাগাবো বলে স্থির করলাম।

আমাদের বাংলোয় রান্না করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য আন্ধেরীতে সর্দার পৃথ্বীসিংহের সেই বাড়িতে চলে এলাম এবং প্রভা বৌদি ও তাঁর জা (সর্দার পৃথ্বীসিংহের অনুজপত্নী) দুর্গার হাতে মিষ্টি মিষ্টি রুটি খেয়ে বই লেখায় লেগে পড়লাম।

কনেরীর গুহায়—আন্ধেরী থেকে দূরে কনেরীর গুহা (লেনা) আছে। আমি ওদের নাম আগেই শুনেছিলাম। বৌদি ওগুলো কয়েকবার দেখেছেন। ১০ মে সকালে আমরা ট্রেনে করে বোরীভিলী গেলাম। গুহাগুলো স্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে। পথ পাহাড়ী ও জঙ্গলাকীর্ণ। গরুর গাড়ি কিছু দূর পর্যন্ত যেতে পারে কিন্তু সেটা আরামপ্রদ বাহন নয়, সেজন্য খাবার জিনিসপত্র সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

পথে করমচার অনেক বাগান ছিল। হিমালয় এবং উত্তর ভারতে আমরা অনেক বুনো করমচা খেয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলো খুব ছোট ছোট হয় আর এগুলো ছিল কড়ির মত সাইজের। আমরা যেখানে-সেখানে করমচা খেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু চিন্তা ছিল যে রোদ প্রখর হবার আগেই ওখানে পৌছতে হবে।

প্রায় দশটা নাগাদ আমরা গুহাগুলোর কাছে পৌছলাম। অজন্তা ও ইলোরাতেও অনেকগুলো গুহা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে। ইলোরার অনেকগুলো গুহা তো দোতলা-তিনতলা প্রাসাদের মত মনে হয়, কিন্তু সেখানে গুহাগুলো একই জায়গায় লাইন দিয়ে আছে। কনেরীতে গুহার সংখ্যা একশোর বেশি এবং এক মাইল পরিধির মধ্যে। এগুলো পাহাড়ের গায়ে যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। তিন নম্বর গুহা একটি বিরাট চৈত্যশালা—কার্লের চৈত্যশালার থেকেও বড়। এখানে যে ভিক্ষুরা থাকত তারা এগুলোতে উপাসনার সময় একত্রিত হত। সম্পূর্ণ চৈত্যশালাটি পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে। দ্বারের বাঁ দিকের দেয়ালে দুজন রাজা এবং দুই রাণীর মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। রাজাদের শরীর সুপুষ্ট এবং সুন্দর, বাণীদের চেহারায় সৌন্দর্যের সঙ্গে নিঃশঙ্কা এবং স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। বাইরের দিকের দুটো স্তম্ভের উপর খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের অক্ষরে বিস্তৃত শিলালিপি আছে। লেখাটা কোথাও কোথাও খণ্ডিত হয়ে গেছে। এই গুহাটি কোনও এক সাতবাহন রাজা তৈরি করিয়েছিলেন। বাইরের দিকে দুটি সিংহস্তম্ভ আছে। সব থেকে বাইরে একটি লম্বা মাঠ আছে। যেখানে চার-পাঁচ হাজার মানুষ বসতে পারে। এই গুহাটির ডানদিকে আরও একটি অসম্পূর্ণ চৈত্যালয় আছে, যার থেকে একটু তফাতে এক নম্বরের গুহাটি আছে, যেটি ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এখান থেকে আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। নীচে-উপরে নেমে উঠে আমরা গুহাগুলোর মধ্যে বিচরণ করতে লাগলাম। এমনিতে এই পাহাড়গুলো নগ্ন নয় কিন্তু এখানে জলধারা দেখা যায় না। পিপাসায় দর্শকদের খুবই কষ্ট হয়। ১৮০০ বছর আগে ভিক্ষুরা তাই জলের খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল। প্রায় সব গুহার নিচে চৌবাচ্চা খোঁড়া রয়েছে। আর এমন করে নালা কাটা হয়েছে যাতে বর্ষার সমস্ত জল এই চৌবাচ্চাগুলোতে জমা হয়। সে-সময় এখানে হয়ত হাজার বারো লোক থাকত এবং রোজ স্নানের এবং

খাওয়ার জল খরচ হত। তাও এখানে জলের অভাব হয়ত থাকত না। সবার আগে চৌবাচ্চার কাছে বসে জলের কালো রঙটা দেখলাম। তখন মনে হল যে খাওয়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু যখন ঘটিতে তুললাম তখন খুবই পরিষ্কার দেখা গেল এবং সেই সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা। মে মাসের গরমে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত পথিকের কাছে এই জল বস্তুত অমৃত। আজও ওখানে শত-শত দর্শক আসা-যাওয়া করছে এবং এই অমৃত পান করে ভিক্ষুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। যদিও কার্লে, ভেরুল (ইলোরা), অজন্তা (অজিণ্ঠা), ইত্যাদি গুহাগুলোতেও জলের ব্যবস্থা আছে কিন্তু এরকম প্রতিটি পদে এবং এত ভাল ব্যবস্থা কোথাও নেই। গুহাগুলো পাহাড়ের মেরুদণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সব জায়গারই এই ব্যাপার। চৌত্রিশ নম্বর গুহার ছাতে এখনও কিছু রঙিন চিত্র আছে। যার থেকে বোঝা যায় যে গুহাগুলোর দেওয়াল ও ছাতগুলো সুন্দর-সুন্দর চিত্রে শোভিত ছিল। এখানে সাতবাহন রাজা গৌতমীপুত্রের কালের[১] একটি লেখ আছে। বুদ্ধের অনেকগুলো কেদারায় বসা, দাঁড়ানো অথবা ধ্যানস্থ উৎকীর্ণ মূর্তি আছে। ৭৯ নম্বর গুহায় বাইরের খোলা অঙ্গন পাথরে খোদাই করা। আশেপাশে বসার জন্য পাতলা ছাতা, ডানদিকে জলকুণ্ড আছে। বাঁদিকের ঘরটা বোধহয় রান্নাঘর। দুটি স্তম্ভ এবং তিন দরজার বারান্দা, তারপর একটি দরজা, যাতে কখনও পাল্লা লাগানো ছিল। তারপর চওড়া সংঘ-শালা আছে যার দুদিকে পাতলা চাতাল রয়েছে। বাঁ-দিকে দরজা দেওয়া দুটো ঘর—পাল্লাগুলো এখন নেই। দেওয়ালে এখনও কোথাও কোথাও পলেস্তারা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার ডান দিকের চেয়ারে বুদ্ধ বসে আছেন, যাঁর বাঁদিকের ভিতে অবলোকিতেশ্বর এবং অন্য কোনও দেবীমূর্তি খোদাই করা রয়েছে। ৬৭ নং গুহা উত্তরাভিমুখী। এখান থেকে ঘোড়বন্দরের সমুদ্র এবং পার্বত্য দৃশ্য খুব সুন্দর দেখা যায়। এর বহির্ভাগেও পাথর কেটে অঙ্গন তৈরি করা হয়েছিল, যার দুদিকে পাতলা বেদি এবং একদিকে জলাধার। বারান্দাটি চারটি স্তম্ভের, যার তিনদিকের দেওয়ালে মূর্তিগুলো উৎকীর্ণ, যেগুলো অধিকাংশই বুদ্ধদেবের, এবং বুদ্ধও বেশিরভাগ চেয়ারে বসে আছেন। ডানদিকের দেওয়ালে অবলোকিতেশ্বর আছেন, যাঁর সঙ্গে দুটি স্ত্রীমূর্তি আছে, এই তিনটি মূর্তিই বড় সুন্দর। দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে একটি বর্গাকার হল (শালা)। এর চারটি দেওয়ালে শুধু মূর্তিই উৎকীর্ণ রয়েছে। মূর্তিগুলো সুন্দর এবং ওগুলো দেখে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি যে এখানকার গুহাগুলো কিভাবে চিত্রের সাহায্যে অলংকৃত করা হয়েছিল।

কনেরীতে বুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিই বেশি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধকেন্দ্র হয়ে থাকবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সাতবাহন রাজারা নাসিক এবং অন্যান্য গুহার ভিক্ষুদের অনেক দান করেছিলেন। বিরাট চৈত্যশালাটি ওঁদেরই দান মনে হয়। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দীর পরও শিলাহার রাজবংশ বৌদ্ধসংঘের বিরাট পৃষ্ঠপোষক ছিল। সবথেকে পিছনের প্লাস্টার দেখলে মনে হয় যে দশক এবং একাদশ শতাব্দীতে এখানে

[১] দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ। এই সময়েই গৌতমীপুত্র ও তাঁর ছেলে বাশিষ্ঠীপুত্রের রাজত্বকালে সাতবাহন রাজা বিশিষ্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।—স.ম.

ভিক্ষুরা বাস করত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে অবলোকিতেশ্বরের মত মহাযানী বোধিসত্ত্বদের মূর্তি তৈরি হতে শুরু হয়েছিল, এটা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু অবলোকিতশ্বরের মূর্তিই এখানে বেশি রয়েছে। এটা সেই বিখ্যাত পোতলক পর্বত নয় তো, যেটা কৈলাসের শিবের মত অবলোকিতেশ্বরের বাসস্থান মনে করা হত। লাসাতে দলাই লামার বিখ্যাত পোতলা প্রাসাদ এই সুপ্রসিদ্ধ পোতলক পর্বতের নামেই তৈরি হয়েছে।

দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আমরা গুহাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মাঝখানে শুধু একটু খাওয়া এবং বিশ্রামের জন্য বসেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার থেকেও বেশি পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন প্রভা বৌদি। সাড়ে আটটার সময় আমরা বোরীভিলী স্টেশনে এলাম এবং ট্রেনে করে আন্ধেরী পৌঁছে গেলাম।

বোম্বাইতে ছারপোকারা দম বার করে দিয়েছিল। আর আন্ধেরীতে মশার দল। মশাদের মশারি দিয়ে ঠেকানো যায়, কিন্তু ছার আর পোকা-মাকড়দের সেরকম কোনও ওষুধ নেই।

৬ মে জানতে পারলাম যে অসুস্থতার দরুন গান্ধীজী ছাড়া পেয়েছেন। সর্বত্রই লোকেরা আনন্দ-উৎসব করছে। এতদিন পর্যন্ত মশার কষ্টই ছিল, এখন প্রচণ্ড গরম চেপে ধরল। বোম্বাইতে লু চলে না। কিন্তু দিনে রাতে এমন কোনও সময় ছিল না যখন শরীর ঘামে হত না জবজবে। সমস্ত শরীরে ছোট ছোট ফোঁড়া বেরিয়ে গেল, মনে হচ্ছিল সভ্যতা বস্ত্র পরিয়ে আমাদের কোনও উপকার করে নি।

১৭ তারিখ আমি টমাস কুকের কাছ থেকে চেক নিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম যে 'কাদম্বরী' ফিল্‌ম দেখানো হচ্ছে। 'বসন্তসেনা' এবং 'শকুন্তলা' আগেই দেখেছিলাম। শূদ্রক এবং কালিদাসের উপর কিভাবে ছোরা চালানো হয়েছে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলাম। ভাবলাম, যাই 'কাদম্বরী'ও দেখে নিই। দেখবার পর আমি ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'শকুন্তলা, কাদম্বরী ও বসন্তসেনা তিনজনকেই সিনেমার লোকেরা খুন করেছে এবং খুবই নিষ্ঠুরভাবে, এদের মধ্যে কাদম্বরীর দুর্গতি হয়েছে আরও বেশি।...'বাগীশ্বরম্ হন্ত ভজেঅভিনন্দম অর্থেশ্বরম্ বাক্‌পতিরাজমীডে। রসেশ্বরং স্তৌমি চ কালিদাসং বাণং তু সর্বেশ্বরমানতো অস্মি॥'[১] এই ব্যবহার সর্বেশ্বর বাণের সঙ্গে, যিনি ছায়াচিত্রের জন্যই যেন কাদম্বরীর অনেক জায়গায় সঙ্কেত করেছেন। তারপর তার থেকে স্বাধীনতা নিয়ে দেবতা, মানুষ, ঘোড়া, বাঁদর, পাখির যোনিতে গত বাণকে অনুনয়! ধরে নাও বাণ আজ ভারতের ৪০ কোটির মধ্যে নেই। মহাশ্বেতা (বনমালা)-র অভিনয় সুন্দর, কিন্তু আততায়ীরা তাকে দাসীর মতন বানিয়ে ফেলেছে। কাদম্বরীর মধ্যে স্বপ্নে প্রেম জাগানো হয়েছে। আচ্ছোদ সরোবরের চিহ্নমাত্র নেই। পুণ্ডরীকের অবস্থার কোনও বর্ণনা নেই, কপিঞ্জলের সৌহার্দ্য কই। তর্জনা মদগর্বিত। গন্ধর্বকুল যেন বেশ্যাকুল, সেজন্য কামদেব হল কুলদেবতা। হায়! কাদম্বরীকে কিছু বোঝেনি। কাজে ব্যস্ত পরিচালক যা ঠাণ্ডর করেছেন! লোকোত্তর কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়নি (বাণের অপূর্ব শিল্পসৃষ্টিতে

[১] 'বাক্‌দেবতাকে সম্ভ্রম, বাকপতিরাজ অর্থেশ্বরকে আমি ভজনা করি। সকল রসের অধীশ্বরকেই আমি সর্বেশ্বর বলে স্তুতি করি। কালিদাস এবং বাণকেও আমি স্তুতি করি।'—স.ম.

অবশ্যই কালি লেপে দেওয়া হয়েছে)। আচ্ছোদ সরোবর বা চন্দ্রাপীড়ের জন্ম থেকে শুরু করা যেত। কাদম্বরীর দূতের সঙ্গে মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে নিয়ে যেত। আশ্চর্যের বিষয় হল যে চন্দ্রাপীড় (যে অভিনেতা সেজেছে) অশ্বারোহণ জানে না। (বাণের ইন্দ্রায়ুধের বদলে একটি) মৃতপ্রায় ঘোড়া ছিল। (এদের) দৈব-রাজার ভয় ছিল না। পয়সা ধর্ম, টাকা পন্থা, তোদের অনিষ্ট হোক! ভিড়ই যদি সাফল্যের কষ্টিপাথর হয় তাহলে বেশ্যানৃত্য করাও, কোকশাস্ত্রের ছবি দেখাও! রাম-কৃষ্ণের চরিত্রের মত স্বাধীনতা অশ্বঘোষ-কালিদাস-ভাস-ভবভূতি-বাণ-এর থেকে নেওয়া সম্ভব নয়। জগতে লুটপাট করে খাওয়ার আরও অনেক জায়গা আছে। হৃদয়বান লোকেদের, এই অনধিকারচর্চা এবং বলাৎকারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকা উচিত নয়। আজ সিনেমা আমাদের হাতে নয়, ধনীদের হাতে রয়েছে। তবে এটা ভাবা উচিত নয় যে কালও এরকমই থাকবে। এই টাকা-পন্থীদের নগ্ন করে দেওয়া উচিত। তারা মৃত শবের উপর নয়, চল্লিশ কোটি জীবিত মানুষের উপর প্রহার করছে।'

৫ মে আমি 'পৃথ্বীসিংহ' লেখা শেষ করেছিলাম, তাও কয়েকদিন ওখানে এই অপেক্ষায় থাকলাম যে ভিসা এসে যাবে। কিন্তু তার কোনও পাত্তা ছিল না। সেজন্য আমি 'হিন্দি কাব্যধারা'য় হাত লাগাতে চাইলাম। মুনি জিনবিজয়জীর পরিশ্রমের ফলে ভারতীয় বিদ্যাভবনে পুরনো হিন্দি অপভ্রংশের পর্যাপ্ত সাহিত্য জমেছিল, সেজন্য আমি ১৮ মে ওখানেই গেলাম। 'হিন্দি কাব্যধারা'র সিদ্ধ-সামন্ত যুগের জন্য বিষয়-বস্তু জোগাড় করতে আরম্ভ করলাম।

২৫ মে সি· আই· ডি·-র টেলিফোন এল। তাতে এটাও বলা হল, 'দেড় টাকা স্ট্যাম্পের দলিলের কাগজ নিয়ে আসবেন।' আমরা খুব মাথা ঘামাতে লাগলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। সি· আই· ডি·-র সামান্য ইঙ্গিতেই তো অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলে পুরে দেয়া যায়, তাহলে আর দেড়টাকার দলিলের কাগজের কি প্রয়োজন? হ্যাঁ, আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল যে, সি· আই· ডি·-র এটা 'নিজের কাজ নয়।' যদি নিজের কাজ হত, তা হলে কেউ একজন এখানে স্বয়ং উপস্থিত হত। যাক, আমি দেড় টাকার কাগজ তো নিলাম না। কিন্তু বন্ধু মহেন্দ্রজীকে সঙ্গে নিলাম যাতে দরকার পড়লে কাগজ আনা যায়। সি· আই· ডি· অফিসার ভারতীয় বা ইংরেজ যাই হোন, খুব ভদ্র হয়ে থাকেন—কারণ ওঁদের মিষ্টি করে ফাঁসি দিতে হয়।

ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম, আমি যে বৌ-বাচ্চাদের ডেকে পাঠাচ্ছি তাদের খরচপত্র—এখানে থাকবার এবং বাইরে পাঠাবার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। সেই জন্যই দেড় টাকার কাগজের উপর দলিল লিখতে হবে। আমি সই করে দিলাম এবং নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম।

প্রাচীন কবিদের কীর্তিগুলো দেখতে দেখতে আমি অষ্টম শতাব্দীর মহান কবি স্বয়ম্ভূর রামায়ণ (প উ ম-চ রি উ) পড়তে আরম্ভ করলাম। পড়তে পড়তে আমার খুব বিস্ময় এবং ক্ষোভ হতে লাগল। অবাক হলাম যে এত বড় একজন মহান কবিকে আমি জানতাম না—গত তেরোশো বছরের হিন্দি কাব্যজগতে স্বয়ম্ভূর উপযুক্ত সমকক্ষ কোনও কবি হয়

নি—সুরদাস এবং তুলসীদাসকে ধরলেও। আমি তো মনে করি, ভারতীয় সাহিত্যে বায়োজন কবি-সূর্যের মধ্যে স্বয়ম্ভু একজন। ধীরে ধীরে আমি ৭৬০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৫ জনের অধিক কবি পেলাম। কিন্তু তাঁদের ভাষা এত প্রাচীন যে বুঝতে সাহায্য না করলে পাঠকদের পক্ষে বোঝা কঠিন হবে। ৮৪ সিদ্ধের দোঁহাগুলোর সম্পাদনার কথা আমি আগেও একবার ভেবেছিলাম, প্রাকৃতে যে রকম সংস্কৃতের ছায়া দেওয়ার প্রচলন আছে, সেরকমই অপভ্রংশ কবিতাগুলোকে হিন্দির ছায়া দিলে ভালো হয়—অনুবাদ নয় কেবল ছায়া, শুধুমাত্র তদ্‌ভব শব্দগুলোর জায়গায় তৎসম শব্দ ব্যবহার করে। ছায়া রচনা করার সময় আমি এও জানতে পারলাম যে এই অপভ্রংশ যে-ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি সেটা হল কৌসলী (অওধী)—সৌরসেনীর রূঢ় ধারণা আমার ভুল মনে হল।

জুনের মাঝামাঝি পেটের গণ্ডগোল আরম্ভ হল এবং ব্যথা মৃদু থেকে বাড়তে বাড়তে ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠল। বোম্বাইর বিরুদ্ধে আমার বরাবরই নালিশ আছে। আগে তো সে কেবল জ্বর আর মাথাব্যথা পাঠাতো। এবার সে পেটে ছুরি মারল। এক-আধজন ডাক্তারের ওষুধ খেলাম। কিন্তু কোনো লাভ হল না। জানতে পারলাম যে উত্তর থেকে আসা সমস্ত বুদ্ধিজীবীকেই এই রোগ বিরক্ত করে। কখনও কখনও রুগীও খুব সিদ্ধহস্ত বৈদ্যরূপে প্রমাণিত হয়ে থাকে। এক বন্ধু এক বিলিতি লবণ (এণ্ডরু লিভার সল্ট)-এর কথা বলল। এটা রোগকে নির্মূল করে না কিন্তু ব্যথার সময়ে জলে গুলে খেলে কয়েক ঘণ্টার জন্য ব্যথার উপশম হয়ে থাকে। মুম্বাদেবী তো হামলা করেছিল, তবে আমিও ওষুধ পেয়ে গেলাম। আমি বোম্বাইতে থাকতে চাইছিলাম না কিন্তু 'কাব্যধারা'র কাজটা শেষ করা খুব দরকার ছিল। এর পরের দুসপ্তাহ এই লবণের জোরেই বোম্বাইতে কাটালাম। তখন জানতাম না যে এটা মধুমেহর ঘণ্টা।)

যদিও আমরা জাতীয় প্রগতির পথে একই জায়গায় অবস্থান করছিলাম, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তিসম্পন্নদের পরাজয়ের পর পরাজয় দেখতে হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা ইউরোপে জার্মানির বিরুদ্ধে অন্য মোর্চা না খোলার জন্য নানারকমের চেষ্টা করল, কিন্তু যখন দেখল যে লাল সৈন্য জার্মানির সীমান্তে পৌঁছে গেছে, তখন ভয় পেয়ে গেল—আমরা মাঝখানে না ঝাঁপিয়ে পড়লে লালফৌজ যদি হিটলারকে আছড়ে দেয়, তাহলে আমরা আর কোনওখানে থাকব না। সেজন্য ৬ জুন ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যরা ফ্রান্সের তীরে হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মোর্চা খুলে ফেলল। এখন পিছিয়ে যাবার কোনও প্রশ্ন ছিল না। মুখ লুকিয়ে এক জায়গায় বসে থাকার উপায়ও ছিল না।

৩ দিন পর খবর পাওয়া গেল যে বোদোগলিও এবং ইতালির বাদশাও বিদায় হয়েছেন। এই শৃগালেরা গায়ের চামড়া রঙ করে নিজেদের জুয়োখেলাটা ইতালিয়ান জনগণের উপর চাপাতে চেয়েছিল। চার্চিলও এঁদের সমর্থক ছিলেন। কারণ পুঁজিপতিদের ভয় ছিল—যদি এটা না করা হয় তবে ইতালি থেকেও পুঁজিপতিদের তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। যুগোস্লাভিয়ায় বিলিতি ধনীদের নীতি নিষ্ফল হয়েছিল, এখন ইতালিতেও সেটা অসফল হল।

অন্ধ্রতে/১৬১

১১ জুন এমন একটা কথা শুনলাম যা শুনে আমি আশ্চর্যও হলাম, এবং সেই সঙ্গে এই ধারণাটাও পাল্টাতে হল যে, পৃথিবীতে মাঝে মধ্যে কোনো ব্রহ্মচারী পাওয়া যেতে পারে। আমি ভাবতাম, শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম নাও হয়েও হয়ত কোনও লোক যৌন সংসর্গে রুচি না রাখতে পারে, খাদ্যতালিকায়ও এরকম অনেক জিনিস আছে, সেগুলো কোনও কোনও লোক পছন্দ করে না। কিন্তু এখন এই ব্যতিক্রম ত্যাগ করার দরকার হল। আমি সেদিন নিজের ডায়েরিতে লিখলাম—'আমার পক্ষে এই কথাগুলো আশ্চর্যজনক নয়। (তাও আমি বলব যে) সহজযানী সিদ্ধ বেশি সৎ ছিলেন, যদিও ওঁর দুর্বলতা ছিল দিব্যমন্ত্রের ছল।' চুরাশিজন সিদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সহজ সম্পর্ক চাইতেন অথচ উনি ব্রহ্মচর্যের ঢোল পেটাতেন না। এটা চূড়ান্ত বেহায়াপনা যে লোকে কথায় কথায় ব্রহ্মচর্যের শপথ নেয়, তারপর বইয়ের পর বই লেখে কিন্তু তাও প্রদীপের তলায় অন্ধকার থেকে যায়। হ্যাঁ, আমি মানছি যে ধর্মের ক্ষেত্রে এটা প্রত্যেক জায়গায়ই দেখা যায়।

প্রয়াগে, ১৯৪৪

কাব্যধারার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওষুধের জোরে আমি আর বোম্বাইতে থাকতে চাইলাম না। সেজন্য ১১ জুলাই ওখান থেকে কলকাতা মেল ধরলাম। যদিও ট্রেনটি এই স্টেশন থেকেই ছাড়ে। কিন্তু আজকাল আগে থেকেই ট্রেন ভর্তি হয়ে যায়। আমার বন্ধু ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন। উনি প্ল্যাটফর্মে আসা ট্রেনে বসেও পড়লেন, কিন্তু এর মধ্যে এত লোকে ভরে গেল যে আমার পক্ষে নিজের জায়গায় পৌছনো কঠিন হয়ে পড়ল। কোনোরকমে সেখানে পৌছে দেখলাম যে বাক্সটার কোনো চিহ্ন নেই। এই বাক্সেই 'কাব্যধারার' পাণ্ডুলিপি ছিল। সেজন্য অবশ্যই চিন্তা ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দ্বিতীয় পংক্তিতে কারও পায়ের তলায় পাওয়া গেল। এখন ২৬ ঘণ্টার জন্য আমাকে নিজের জায়গায় অচল থাকতে হল। জায়গার এত টানটানি ছিল যে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা শরীরে একটু ঢিলে দিলেই সেটা ভরে যেত, কিন্তু তারপর ঝগড়াঝাঁটি কে সামলাবে? আমি ২২, ২৩ ঘণ্টা পর্যন্ত খাওয়া দূরে থাক, চা পর্যন্ত না খেয়ে রইলাম। যখন ট্রেন মানিকপুরের কাছে পৌছল, তখন চা খেলাম আর কিছু আম খেলাম। ১২ জুলাই রাত্রি সাড়ে দশটায় প্রয়াগ পৌছলাম।

'জয় যৌধেয়'—ভারতে কখনও গণশক্তি ছিল, রাজা ছাড়াও শাসনকার্য চলত। এই কথাটা লোকেরা এত বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল যে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন কিছু ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বিদ্বানরা লিচ্ছবি (বৈশালী), মল্ল ইত্যাদি গণরাজ্যের (প্রজাতন্ত্রগুলোর) উল্লেখ করলেন, তাতে আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই চোখ গোল

গোল করে তাকাতে লাগলেন। তাঁদের মন বিশ্বাস করছিল না যে আমাদের এখানে কখনও রাজা বিনা রাজ্য চলত। তারপর ধীরে ধীরে ওদের একটু গর্ব অবশ্যই হতে লাগল। কারণ ওরা দেখল যে, যে-কারণে ইউরোপীয়রা গর্ব করে সেই গণস্বাধীনতা এখানেও কোনো এক সময় ছিল। গণরাজ্যের নাম মুদ্রায়, প্রাচীন শিলালিপিতে, পলি গ্রন্থগুলোতে এবং দু-চারটে অন্য গ্রন্থে থাকলেও, জীবিত জনগণের মধ্যে তার কোনো চিহ্ন ছিল না এবং ব্রাহ্মণদের বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য এ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর চুপচাপ ছিল। সিংহল যাওয়ার আগে আমি রিজ ডেভিড্স্-এর বইয়ে বৈশালী জনতা সম্পর্কে পড়েছিলাম। এক-আধ জায়গায় তার আরও উল্লেখ পেয়েছিলাম। সেই সঙ্গে রাশিয়ার লালবিপ্লবের দু-এক মাস পর থেকেই সোভিয়েত ব্যবস্থা আমার কাছে এক সর্বপ্রিয় আদর্শ হয়ে গিয়েছিল যা আমি আগেই লিখেছি। হ্যাঁ, এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি সেই সময় এইটুকুই জানতাম, 'সেখানে ধনীদের স্থান নেই। প্রতিটি মানুষই সমান, কাজ করা সকলের কর্তব্য এবং ভাত-কাপড় পাওয়াটা সবার অধিকার।' এরপর আমি দু বছর পর্যন্ত কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকলাম। জেলের বাইরে থাকলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখন আমার ধারণা আরও দৃঢ় হল যে, আমাদের এই ব্যবস্থা সরিয়ে একেবারে নতুন ধরনের ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। লংকায় যখন ত্রিপিটকের পুঁথির পর পুঁথি ওলটাতে লাগলাম তখন বুদ্ধের সময়কার গণরাজ্য আমার সামনে সাকাররূপে প্রকাশ পেল। আমি চাইলাম, এই গণ অন্যান্য ভারতীয়দের সম্মুখেও সাকাররূপে প্রতিভাত হোক, সেজন্যই ইতিহাসের এক বিরাট প্রতিভাশালী লিচ্ছবি (বৈশালী) গণশক্তি নিয়ে আমি দু'বছর আগে 'সিংহ সেনাপতি' উপন্যাস রচনা করলাম। কিন্তু তার আগে আমি যখন 'ভোলগাসে গঙ্গা'-র 'সুপর্ণ যৌধেয়' গল্প লিখতে শুরু করেছিলাম, সেই সময়ও মনে হয়েছিল যে ভারতের এই শেষ বৈভবশালী গণরাজ্য নিয়ে একটি উপন্যাস লেখা হোক। আমি উপন্যাসের জন্য নির্বাচিত করলাম সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের যুগ। সেই সময়ের সাহিত্যিক এবং পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর চর্চা করার সময় আমার সুপর্ণ যৌধেয়র কালের নিজস্ব ধারণাগুলো কিছুটা ভুল মনে হল, আমি সমুদ্রগুপ্তকে যৌধেয়গণের উচ্ছেদক মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি বুঝি যে, আসলে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রামদিত্যই এই মহান (!) কাজটি করেছিলেন।

মালমশলা সংগ্রহ করতে তো খানিকটা সময় লাগল। তারপর এখন একজন লেখক খুঁজে বার করার চিন্তা হল। যদিও জেলে আমি ছটা বই আর আটটা ছোট ছোট নাটক নিজেই লিখেছিলাম, কিন্তু সেখানে বাধ্যতা ছিল, দ্বিতীয়ত এও ঠিক যে নিজে লেখার থেকে অন্যকে বলে লেখানো অনেক দ্রুত হয়। যেখানে নিজে একদিনে একটা ফর্মা লেখা কঠিন হয়ে যায়, সেখানে অন্যকে বলে বলে লেখালে দেড় ফর্মা করে লেখা হতে পারে। আর লেখক দ্রুত হলে আমি মনে করি, 'জয় যৌধেয়'-র জন্য ২১ দিন (২৬ জুলাই-১৬ আগস্ট)-এর দরকার হয় না, সেটা চার-পাঁচ দিনেই শেষ হয়ে যায়। যাক, শ্রী সত্যনারায়ণ দুবে সেঠোয়ী ঘুরতে ঘুরতে প্রয়াগ পৌঁছে গেলেন আর উনি কলমের ভার নিলেন। আমি প্রথমে 'জয় যৌধেয়' লেখালাম। লেখাবার সময় বরাবর এই চিন্তা ছিল যে যখনই ভিসার

খবর আসবে তখনই রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হব।

১৬ তারিখ 'জয় যৌধেয়' শেষ হল। এবার আমি অন্য বই হাতে নিলাম।

'ভাগো নহী দুনিয়া কো বদলো'—পরদিন (১৭ আগস্ট) থেকে আমি 'ভাগো নহী দুনিয়াকো বদলো'তে হাত দিলাম। আমি মার্কসবাদ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর উপর কয়েকটা বই লিখেছিলাম কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই কাজে লাগত। মল্লিকা (ভোজপুরী) ভাষায় আটটি নাটকেও সহজ ভাষায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা প্রতিপাদন করা হয়েছে। কিন্তু তার থেকে কিছু সীমিত গোষ্ঠীর পাঠকই লাভবান হতে পারবেন। আমাদের এই সমাজটা বদলে এমন একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার ভিত ন্যায় এবং মানব ভ্রাতৃভাবের উপর থাকবে। এই কাজটা শিক্ষিত মার্জিত সম্প্রদায় করতে পারবে না। এই কাজ তারাই করতে পারে, যারা দিনরাত সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক অত্যাচারের শিকার হয়ে থাকেন। এঁরা হলো শ্রমিক ও কৃষক এবং কিছুটা শিক্ষিত নিম্নবর্গের লোক—যদি তাঁরা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু শ্রমিক এবং কৃষকদের বোঝাবার জন্য যে বই লেখা হবে, তার ভাষা বইয়ের ভাষা হওয়া উচিত নয়। সেইজন্য আমার এই বইয়ের ভাষাগত খাঁচাটা আমি হিন্দির রেখেই তার ক্রিয়া এবং বিভক্তিগুলি রেখেছি। কিন্তু শব্দের প্রয়োগের সময় আমি এটা খেয়াল রাখলাম যে. অশিক্ষিত নরনারীরা যে ভাষা বলে এটার ভাষা সে রকমই হবে। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও ওদের উচ্চারণকেই প্রামাণ্য মানলাম। প্রথমে কাজটা কঠিন মনে হলেও, অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পরে এটাই সহজ মনে হতে লাগল। এই বইটা লিখবার সময় আমি দেখলাম যে গ্রামীণ জনসাধারণ এরকম চার-পাঁচশো শব্দ ব্যবহার করে যেগুলি আরবী এবং ফারসী ভাষার। হ্যাঁ, তারা প্রত্যেক শব্দকে নিজস্ব উচ্চারণ দান করেছে। এই চার-পাঁচশো শব্দের জন্য যে সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলি হিন্দিতে ঘোড়ার কদমে ছুটতে থাকে, সেগুলি গ্রামের লোকেরা বোঝে না। আমি হিন্দি, উর্দুর জায়গায় একটি তৃতীয় কৃত্রিম ভাষা হিন্দুস্তানির পক্ষপাতী নই। আমি কোনো ভাষার প্রচারের জন্য নয়, বরং ভাবের প্রচারেরজন্য এই বইটা লিখেছিলাম। ১২ দিন (১৭-২৮ আগস্ট)-এর মধ্যে এই বইটাও শেষ হয়ে গেল।

'মেরী জীবন-যাত্রা'—এটা ১৯৪০-এ লেখা শুরু করেছিলাম।কিন্তু ডায়েরিগুলো না থাকায় পরে অসুবিধে হতে লাগল, আর সেজন্য ওটা তখন ছাড়তে হল। এখন আবার সময় পাওয়া গেল। ২৯ আগস্ট কি আজও (২৭ সেপ্টেম্বর ইরানী) ভিসার কোনো পাত্তা নেই। সেজন্য সত্যনারায়ণজী আবার কলম ধরলেন, আর বলতে আরম্ভ করলাম। জীবন-যাত্রার আজ পর্যন্ত (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) সমস্ত অংশ এখন আপনার সামনে রয়েছে।

ভিসার ঝামেলা— দু-দুটো তার এবং একাধিক চিঠি ইরান সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ৯ মে আমি দরখাস্ত করেছিলাম আর ভিসা আসল ১৯ সেপ্টেম্বর।

—১৯৪৪—

লোলার ১১ মার্চের (১৯৪৪) চিঠি এল, যাতে ও লিখেছিল—'…১৫ জানুয়ারি (১৯৪২) থেকে ইগর আমাদের বাড়ির কাছে সার্বজনিক শিশুনিকেতনে যায়। এই শিশুনিকেতনটি বেশ ভালো। আমি অনেক সময় আফশোশ করি যে তোমার কথা অনুযায়ী আমি আরও আগে কেন ওকে পাঠাইনি। এ ব্যবস্থা ইগর এবং আমার দুজনের পক্ষেই ভালো। ১৯৪২-এ এরই (শিশুনিকেতনের) সাহায্যে ইগর বেঁচে গিয়েছিল। তা না হলে ও জীবিত থাকত না। এই মুহূর্তে আমার বাসস্থানের তাপমাত্রা হল ১০° সেন্টিগ্রেড।…আশ্চর্য হচ্ছি, যে আমি বেঁচে রয়েছি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষাকেই এই বেঁচে থাকার কারণ মনে করি।… ১৯৪২-এর বসন্তকাল থেকে লেনিনগ্রাদের জীবন উন্নততর হয়ে উঠছে। আগে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রাচ্য বিভাগের ডাইরেক্টর ছিলাম। তারপর পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হলাম। আমি ইউনিভার্সিটিতে একটা আলাদা ঘর পেয়েছিলাম। এই ঘরে আসা সম্ভব ছিল না। সেই সময় ইগর ভ্যাসিলিয়েভ্‌স্‌কি ওস্তোভের সার্বজনীন শিশুনিকেতনে যেত।…ইগর কাশিতে অসুস্থ ছিল… পয়লা এপ্রিল থেকে আমি সার্বজনিক গ্রন্থাগারে কাজ করছি এবং নিজের পুরনো বাড়িতে থাকি। ইগরও প্রথম শিশুভবনে যাচ্ছে। ইগর লম্বা এবং রোগা শিশু, কিন্তু সুস্থ। এই শীতে ও অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। ইনফ্লুয়েঞ্জা। মাড়ি এবং ফসফুস ফুলে গিয়েছিল। কিন্তু তাও দুর্বল মনে হত না। সে খুবই সুন্দর। সেই সঙ্গে চালাক, গম্ভীর এবং চিত্তাকর্ষক শিশু। সে কতটা মন কাড়ে, হায়, তুমি যদি তা কল্পনা করতে পারতে! সে বাবাকে খুব ভালোবাসে এবং খুবই উৎসকুভাবে তোমার আসার প্রতীক্ষা করছে। সে রোজ জিজ্ঞেস করে, বাবা কবে আসবে?' যখন সে নিজের মাকে রাগতে দেখে, তখন বলে, 'আমি তোমাকে ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে যাবো, আর বাবাকে বলে দেবো, যে তুমি আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার কর।' তুমি চিন্তা করে দেখ যে সে নিজের সমস্ত খেলনা ভারতে নিয়ে যাবে। সে ভারতে যাওয়ার জন্য শিশুনিকেতনের ডাইরেক্টর এবং নার্সকেও নিমন্ত্রণ করে রেখেছে।… সারা দিন কাজ করে… আমি খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি। সন্ধেবেলা আমি ইগরকে শিশুভবন থেকে বাড়ি নিয়ে আসি, জামা-কাপড় ছাড়িয়ে ওকে স্নান করিয়ে দিই, তারপর শুইয়ে দিই। রোববার দিন ইগর নিজের সময় বাড়িতেই কাটায়। তখন সে বলে, 'আমি সময় মায়ের সঙ্গে কাটাতে এবং বিশ্রাম করতে চাই।' কিন্তু খুবই আফশোশ হয়, কারণ রোববারেও আমি খুবই কম সময় দিতে পারি। আমি আমার বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকি। কাজ হল, কাচা, পরিষ্কার করা ইত্যাদি। নভেম্বর থেকে আমার ভাগ্নী (বোনের মেয়ে) লোলা আমার সঙ্গে থাকছে কিন্তু আমাদের একে অন্যের সঙ্গে বেশি দেখা হয় না। কেননা আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, সেও সারাদিন কাজ করে। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটজনের খবরই পেয়েছি। তার নাম ইগর, এবং সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভ্ল্‌দিভোস্তকে থাকে।

'আমি খুবই উদগ্রীব হয়ে তোমার চিঠির অপেক্ষায় আছি। পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এর তোমার চিঠি বো-ক-স্‌ মারফৎ পেয়েছি। তুমি আমাকে তাসখন্দ যাওয়ার জন্য লিখেছ যাতে সেখানে আমরা মিলিত হতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি

লেনিনগ্রাদে এলেই ভাল হবে। লেনিনগ্রাদের ঘেরা শেষ হয়ে গেছে। আর প্রাচ্য প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় এখানে ফিরে আসছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাকে তার কোরো। …চিঠি আসতে আজকাল খুব সময় লাগে, এবং কখনও কখনও তা গন্তব্যস্থানে পৌঁছয় না। তুমি আমাকে অভিনন্দন জানাতে পার কারণ লেনিনগ্রাদ রক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমি পদক পেয়েছি। তোমার দ্বিতীয় তার আমি আজ (১২ মার্চ) পেয়েছি। আমি ভিসার জন্য আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। অনেক অনেক চুম্বনসহ—

তোমারই লোলা'।

তারপর ১০ সেপ্টেম্বর সে টেলিগ্রাম পাঠালো—'লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ভোজনেসেন্সকীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার জন্য আসবার ইচ্ছা এবং সোভিয়েত ভিসা পাঠাবার প্রয়োজনের জন্য টেলিগ্রাম কর' (Wire Leningrad University Rector Voznesensky desire come work University and necessity sending Soviet Visa)। আমি তারও পাঠিয়ে দিলাম।

বিলিতি পুঁজিপতি এখনও ভারতবর্ষকে তাদের কামধেনু বানিয়ে রাখতে চায় এবং তার বাঁধন ঢিলে করতে চায় না। পৃথিবীর জনগণ একে শান্তি নয়, যুদ্ধ এবং অশান্তির পথ মনে করে, আর এর জন্য সব জায়গা থেকেই চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চার্চিল, এমেরী এই বলছেন যে, ভারতবাসীরা একে অপরের শত্রু, আমরা সরলেই ওরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরবে। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে কথাবার্তা চলছে। যদি তাঁরা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে বোঝাপড়া করতে পারেন, তা হলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য এক দুর্দান্ত শক্তির জন্ম দেবেন, এবং তারপর রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছার সামনে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি এবং তাদের লেজুড়দের কোনো কথা চলবে না। যদি সমঝোতা না করতে পারেন, তাহলে এর অর্থ হবে, চার্চিল, এমেরীর (বিলিতি পুঁজিবাদ) হাতের ক্রীড়নক হওয়া। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম থামতে পারে না। সেটা তো সব অবস্থাতেই কার্যকর থাকবে। যদি পুরনো শক্তি বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে নবীন শক্তি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নামবে। নৈরাশ্যজনক খবর আসা সত্ত্বেও আমার মনে হয় না যে দেশের এই দুই নেতা কোনো পথ বের করার চেষ্টা করবেন না।

যুদ্ধ এখন জার্মানির সীমান্তে এবং তার ভিতরেও কোথাও কোথাও হচ্ছে। হিটলারের পতন নিশ্চিত। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং ফিনল্যান্ড এখন জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। লাল-সেনারা গ্রিক, চেকোস্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরীতে পৌঁছে গেছে। বল্কানে এখন ইংরেজ পুঁজিপতিরা নিরাশ হয়ে গেছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন যে ভবিষ্যতের বল্কান সোভিয়েতের জোরদার পক্ষপাতী হবে। ইটালির কাছে ওঁদের প্রত্যাশা বেশি নয়। ফ্রান্সেও ওঁদের মুঠি ঢিলে হয়ে পড়েছে। সম্ভবত ওঁরা এখন পশ্চিম ইউরোপের চার-পাঁচটা ছোট ছোট রাজ্য এবং ভবিষ্যতের গর্ভে লুকোনো জার্মানির প্রতি আশা করে আছেন।

জীবন-যাত্রার এ পর্যন্ত ১৯৪৪-এর শেষ অব্দি লিখে আমি ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে সম্পূর্ণ জীবন-যাত্রা বছরখানেকের মধ্যে পাঠকদের সম্মুখে হাজির হবে, কিন্তু সেটা হয়ে উঠল না।

—১৯৪৪—

সোভিয়েত দেশের উদ্দেশে প্রস্থান

প্রয়াগ থেকে যাত্রা করে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে আমার বোম্বাই পৌঁছবার কথা। ইরানের পথেই আমার রুশযাত্রার ভিসা পেয়েছিলাম। বোম্বাইতে কিছু জিনিস কেনার ছিল সেজন্য ওখানে হয়ে যাওয়াই স্থির করতে হল। ইরানে খরচ করার জন্য আমি পঁচিশ এবং সোভিয়েত দেশে মাত্র একশো পাউন্ড পেয়েছিলাম। আমি জানতাম, ইরানের জন্য পঁচিশ পাউন্ড নিতান্তই অপ্রতুল, যদি তৎক্ষণাৎ সোভিয়েতের ভিসা পাওয়াও যায়, তাহলেও (শান্তিকালীন আর গত দুটো যাত্রার অভিজ্ঞতা বলছিল যে, সেরকমটা হওয়ার নয়)। আমি চার-পাঁচ তোলা সোনা আংটি এবং ঘড়ির চেন রূপে বোম্বাই থেকে নিয়ে নিলাম, মালপত্র যতটা হাল্কা হওয়া সম্ভব ততটাই ছিল,কিন্তু কম করলেও বই-ই মণখানেক হয়ে গেল।

অক্টোবর (১৯৪৪)-এর তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাইতে সমস্ত প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিল, এই সময় পাতলা পায়খানা আরম্ভ হলো। আমি তো ভয় পেলাম যে কুড়ি বছরের বিস্মৃত আমাশার আবার আবির্ভাব ঘটল না তো! ডাক্তারদের তৎপরতা, বন্ধুদের সহায়তায় দুদিনেই চাপা পড়ে গেল এবং আমি দুর্বল থাকলেও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

যুদ্ধের সময় ট্রেনে জায়গা পাওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু ২৭ অক্টোবরের আমেদাবাদগামী গাড়িতে আমার জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন সংরক্ষিত ছিল। বোম্বাই (সেন্ট্রাল) থেকে ট্রেন রাত আটটার সময় রওনা হল। বিদায় জানাতে অনেক বন্ধু স্টেশনে এসেছিলেন। তাঁদের লাল সেলাম এবং স্লোগানে যাত্রীরা চমকিত হয়ে দেখছিলেন।

২৮ তারিখ সকালেই ট্রেন আমেদাবাদে পৌঁছে গেল। সেখানেও কয়েকশো বন্ধু স্বাগত ও বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন। আমার শরীর খুব দুর্বল ছিল। কঠোরভাবে পথ্য পালন করে চলছিলাম।

আমেদাবাদে ছোট লাইনের ট্রেন ধরতে হল, যেটা সোজা হায়দ্রাবাদ (সিন্ধ) যাওয়ার কথা। মাঝে মাঝে থেমে যাওয়া কয়েকটা স্টেশনে আমার নামের সঙ্গে পরিচিত কয়েকজন বন্ধু দেখা করতে এলেন। আবুরোডে আগত এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গুজরাটের সীমানা কোথায় আরম্ভ হয়?' তাঁরা আবুরোডের কিছুটা পরে কোনো একটা স্টেশনের নাম বললেন। সেসময় কে জানত যে সর্দার প্যাটেল ওই সীমানাটা ধাক্কা দিয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং আবুর ঠাণ্ডা পাহাড়ী স্থানটিকে গুজরাটের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত করবেন। কিন্তু সর্দারের এই অন্যায়পূর্ণ কাজ কতদিন চলতে থাকবে? শেষ পর্যন্ত তো সেই সীমানাই মানতে হবে যেটা বাস্তবসম্মত—যেটা বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্থির করবে।

মারওয়াড় জংশনের কাছে বিজলীবাতিতে ঝলমল করা এক আধুনিক বিশাল কারখানা দেখলাম। বুঝলাম যে এটা আয়কর ফাঁকি দেওয়া পুঁজির কেরামতি। সামন্ততন্ত্রী রাজস্থানে পুঁজিপতিরা বেশি কর থেকে মুক্ত এবং শোষণের জন্য স্বাধীন। আমি লিখলাম—'যত্র

বৈশ্যশ্চ ক্ষত্রংচ সম্যংচৌ চরতঃ সহ'—সামন্তদের ছত্রছায়ায় থেকে বৈশ্যবর্গ এখানে আধুনিক শক্তিগুলি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত মনে করে, যদিও কিছুকাল আগেও সামন্তদের এই দুর্গে ওদের পদে পদে অপমানিত হওয়ার ভয় ছিল।

সারারাত ট্রেন মারওয়াড়ের মরুভূমিতে চলতে থাকল। দিনের বেলা চললে অবশ্যই বেশি কষ্ট হত। সকালে আমরা সিন্ধে পৌঁছলাম। এখানে ঝোপ দেখা গেল এবং বালির টিলাও। খালও দেখতে পেলাম কিন্তু চাষাবাদ কম হওয়ার জন্য খালের পুরো লাভ উসুল করতে দেখা গেল না। হ্যাঁ, সিন্ধুনদের যত কাছাকাছি পৌঁছচ্ছিলাম, ততই নতুন নতুন বসতি, মিশরীয় কার্পাসের খেত বেশি বেশি দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের ট্রেন হায়দ্রাবাদ পৌঁছল দুপুর একটার পর। এখানে বড় লাইনের ট্রেন ধরার কথা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার কোনো পাত্তা ছিল না। কোনো রকমে চলন্ত ট্রেনে ইন্টার ক্লাসে ঢুকতে পারলাম। বিশাল খাল, সিমেন্টের পাহাড়ের মধ্যে ডালমিয়ার কারখানা চোখের উপর দিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যে ছটায় রোহড়ী স্টেশন এল। .

কোয়েটার ট্রেন তিন ঘণ্টা বাদে ছাড়ার কথা কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসন সংরক্ষিত করার টেলিগ্রামে কোনো লাভ হবে বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কোয়েটার পর থেকে ইরানের ট্রেন প্রতিদিন যায় না, সেজন্য কোনো রাস্তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। এক বাবু বললেন, 'তিন টাকা দিয়ে দিন আমি এক্ষুণি আসন সংরক্ষিত করিয়ে দিচ্ছি।' তাই করতে হল।

সিন্ধুর পুল পার হবার সময় রাতের উজ্জ্বল আলোয় সিন্ধুর বিশাল বাঁধের কিছুটা আভাস পেলাম। সে সময় কে জানত যে ভারতবর্ষে আবার ফিরে আসবার সময় এই জায়গাটা ভারতের সীমানারেখার বাইরে চলে যাবে।

৩০ অক্টোবর (মঙ্গলবার) আমাদের ট্রেন ন্যাড়া পাহাড়গুলোর মাঝে ছুটছিল। বোলান উপত্যকা পার হয়ে এবং স্পেজন্দ হয়ে বেলা দেড়টার সময় কোয়েটা (৫,৫০০ ফুট) পৌঁছলাম। দু মণের বেশি মাল ছিল কিন্তু বালুচী[১] ভারবাহক সমস্তই তুলে নিল। 'স্টেশনভিউ হোটেল' বেশি দূরে ছিল না এবং থাকা-খাওয়ার রোজ সাতটাকাও বেশি ছিল না। পাসপোর্ট হাতে পেয়ে যাওয়ায় ভেবেছিলাম যে কেল্লা ফতে করে ফেলেছি; কিন্তু এখনও আমরা ব্রিটিশ সীমানার বাইরে পৌঁছই নি।

কাস্টম অফিসে গেলাম। বিদেশী বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রক (কন্ট্রোলার)-কে মামলাও দেখতে হত। আজ তার সঙ্গে দেখা হয়ে উঠল না। আগামীকালই সেই ট্রেনটি যাওয়ার কথা যেটি সপ্তাহে একদিন যায়। কার্যালয়ের বাবুরা জিনিসপত্রের লিস্টের সঙ্গে আবেদনপত্র দিতে বলল। আবার সেই লালফিতে! কালকের ট্রেন না পেলে সপ্তাহখানেক এখানেই থাকবার উপক্রম হল। ওঁরা এও বললেন যে গ্রামোফোন, ক্যামেরা ইত্যাদি জিনিসগুলো সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি পাওয়া কঠিন। এখন আবার চিন্তা হল যে ঐ জিনিসগুলো কার কাছে রাখবো। ১০ বছর ধরে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা রোলিফ্লেক্স ক্যামেরাটা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না।ভারতীজীর নাম মনে ছিল, কিন্তু উনি বর্তমানে কোয়েটার বাইরে গেছেন। ওঁর

[১] বেলুচিস্তানের অধিবাসী।—স·ম·

বাড়িতেই ইঞ্জিনিয়ার শ্রীচাওলাকে পেলাম। পঞ্চাশ বা একশো টাকা দামের জিনিসগুলো বিক্রি করে বালিকা-বিদ্যালয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য সমর্পণ করলাম। কিন্তু ক্যামেরাটা আমার বন্ধু সর্দার পৃথ্বীসিংহের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলাম। ক্যামেরা আর ফিরে এল না। আর চাওলা মশাই সর্দারের চিঠিগুলোর জবাব দেওয়াটাও পছন্দ করলেন না। সেই সময় ক্যামেরার দাম খুব চড়া ছিল, আমার সেটা খেয়াল হয়নি। খেয়ালে শুধু এটাই ছিল যে একবার বাদে বাকি সবকটি তিব্বতযাত্রায় ওটা আমার সঙ্গে ছিল। জাপান, চীন এবং দুবার করে রাশিয়াও ঘুরে এসেছিল।

কিছু জিনিস কেনাকাটার দরকার ছিল, কিন্তু যতক্ষণ না যাওয়ার দিন ঠিক হচ্ছে ওগুলো কিনে টাকা ফাঁসানোর দরকারটা কি?

৩১ অক্টোবর (মঙ্গলবার) সাড়ে দশটায় কন্ট্রোলারের কাছে গেলাম। উনি ইংরেজ অফিসার হলেও খুবই সজ্জন ছিলেন। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হয়ে যাবার কথাতেও তিনি প্রভাবিত হলেন। ক্যামেরার ফিল্ম, হ্যান্ডব্যাগ, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফাউন্টেন পেন ছাড়া বাকি জিনিসের অনুমতি পাওয়া গেল। ওই সব জিনিসগুলো চাওলা সাহেবের কাছে গচ্ছিত রেখে এলাম।

এখনও আমার কাছে কিছু টাকা ছিল। যার খুব সামান্যই নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার ছিল। সেজন্য শীতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ৭৫ টাকা দিয়ে একটা পশমের কোট এবং অন্যান্য জিনিস কিনলাম। খাওয়া-দাওয়া করে বেলা দুটোর সময়ে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। সপ্তাহে এই একটি মাত্র ট্রেনই ইরানের দিকে যায়, তাই ভিড়ের ব্যাপারে অভিযোগ করার কি থাকতে পারে? আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর সিট রিজার্ভ ছিল। কাস্টম-এর লোকেরা সবার মালপত্র খুলিয়ে দেখছিল কিন্তু আমায় কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। গোয়েন্দা পুলিশ এবং কাস্টমের লোকেদের গাঁটছড়া বাঁধা থাকে এবং পুলিশের চর আমার নিরন্তর সহচর ছিল, এটা তার লাভের ফল। যুদ্ধের দরুন কাপড়-চোপড়, জুতো ইত্যাদির দাম ভারতবর্ষে যত না বৃদ্ধি পেয়েছিল, ইরানে তার থেকে বেশি বেড়ে গিয়েছিল। সেজন্যই প্রতিটি ট্রেনে শ'য়ে শ'য়ে লোক জিনিসপত্র সীমান্ত পার করার জন্য নিযুক্ত ছিল। কাস্টমের লোকেরা খুব সতর্ক ছিল, কিন্তু গণ্ডী পার করাবার লোকেরাও কম হুঁশিয়ার ছিল না। অনেকেই নতুন তৈরি দামী পোশাক এবং বুটজুতো হাঁকিয়েছিল। এই ছোকরাদের পক্ষে এত দামী পোশাক পরা কখনও সম্ভব নয় এটা জানা সত্ত্বেও কাস্টমের লোকেরা ওদের শরীরের বেমানান পোশাকগুলো খোলাতে পারত না।

চারটের সময় ট্রেনটি ন্যাড়া পাহাড় আর শুকনো উপত্যকাগুলো পেরিয়ে এগোতে লাগল। স্পেজন্দ থেকে অগ্রসর হওয়ার পর সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আমিও এখন প্রায় নিশ্চিন্ত হলাম যে ভারত থেকে বেরোবার যে প্রশ্ন ছিল তার সমাধান হয়ে গেল। মাসের শুরু ছিল। ট্রেনটা জল এবং রসদ দেওয়া ছাড়া মাইনেও দিতে দিতে যাচ্ছিল। তাই তাড়াহুড়ো করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

পয়লা নভেম্বরের সকাল। ট্রেনটি এখনও দালবন্দী স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। দুপুর আড়াইটের সময় নৌককুণ্ডি এল। এখন কাছেই একটি গন্ধকের খনিতে কাজ হচ্ছিল।

—১৯৪৪—

শুকনো মাঠে লরিগুলো গন্ধক নিয়ে এসে জমা হচ্ছিল, যার গন্ধ ভালো লাগছিল না।

কাস্টমের লোকেদের কন্ট্রোলারের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। আমার তো কাজ হয়ে গেল। না কেউ মালপত্র দেখতে চাইল, আর না জিজ্ঞেস করল যে আপনার কাছে কতটা ভারতীয় মুদ্রা আছে। একজন সহযাত্রী বলল হাজার-দুহাজার টাকা নিয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। নোককুণ্ডী এই দেখাদেখির শেষ জায়গা ছিল। সেজন্য গাড়ি ওখানে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। কাস্টমের চোখে ধুলো দেওয়ার মত এক সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী ট্রেনটায় ভর্তি ছিল। সীমানার দুধারে বালুচী ভাষাভাষীরা থাকে। সীমানাও ছোট ছোট নগ্ন পাহাড় এবং শুকনো নির্জন স্থান, ভয় যদি কিছু থাকে তো শুকনো মরুভূমিকে ভয়। তাহলে এরকম জায়গায় পাসপোর্টের নিয়ম কি করে চালু করা সম্ভব? নিয়ম লঙ্ঘন করলে দু-এক মাসের সাজা হতো। যেখানে পঞ্চাশ টাকার মাল আড়াইশো টাকার হয়ে যায়, সেখানে এই সাজার কে তোয়াক্কা করে? কাস্টমের লোকেরা এই কামরায় তল্লাসীর জন্য ঢুকলে চোখে-ধুলো দেওয়ার লোকেরা অন্য কামরায় চলে যেত। পাহারা খুব কড়া হওয়ার জন্য ওদের মধ্যে যারা চড়তে পারে না তারা পরে ঢিমেতালে চলা চলন্ত গাড়িতে জায়গা করে নেয়।

সাত বছর আগেকার নোককুণ্ডী গ্রাম এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি বেশিরভাগই সরকারি। এখন এখানে অনেকগুলো সিন্ধী হিন্দুদের দোকান ছিল। তখন কে জানত যে চৌত্রিশ মাস পর স্বদেশে ফেরার সময় এটা বিদেশ হয়ে যাবে আর এখানে হিন্দুদের দর্শন দুর্লভ হয়ে পড়বে।

ট্রেন থামতে থামতে মন্দগতিতে চলতে থাকল। রাত এগারোটার সময় আমরা সীমানা পার হয়ে ইরানের স্টেশন মীরজাবায় পৌঁছে গেলাম।

সপ্তম পর্ব

রাশিয়ায়

১৯৪৪-১৯৪৭

ইরানে

ভিন দেশে খালি হাত

১৯৪৪-এর অক্টোবরের শেষে যেন-তেন প্রকারে পাসপোর্ট পেয়ে আমি রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। ওই সময়ে স্থলপথে যাত্রা ছিল নিরাপদের ও কম খরচের। তাই আমি ইরানের পথে পা বাড়ালাম। সত্যি বলতে কি, কখনই আমার কোনো যাত্রা টাকার বলের ওপর ভরসা করে হয় নি। কিন্তু তাতে অবশ্য 'যতটা লম্বা চাদর ততটাই পা বাড়ানো'র সুবিধে ছিল। যুদ্ধের কারণে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। যেটুকু পাওয়া যেত তাও খরচ করতে দেশের নাম-নির্দেশের প্রয়োজন হতো। আমি সোয়াশো পাউন্ড মুদ্রা বিনিময় পেয়েছিলাম। রাশিয়ায় খরচা বাবদ একশো আর ইরানে পঁচিশ। ভেবেছিলাম পাঁচ-দশ দিন তেহরানে কাটাতে হবে, এর জন্যে পঁচিশ পাউন্ড যথেষ্ট। তারপর তো ভিসা নিয়ে সোভিয়েত দেশে পদার্পণ, যেখানে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

ওই সময়ে কোয়েটা থেকে ট্রেন সোজা ইরান সীমার ভেতরে জাহিদান (পুরনো নাম দুজ্‌দাবপানীচোর) অব্দি যেত। রজাশাহ্ জার্মান নাৎসিদের বিজয়ের পর বিজয় দেখে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু জার্মানের হাত ইরান পর্যন্ত পৌঁছনোর মত লম্বা ছিল না। রজাশাহ্ ধরা পড়ল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন নজরবন্দী থাকার পরে আল্লামিয়াঁ সে বেচারাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। ওঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হলো। ইরানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ইংরেজ, মার্কিন এবং রাশিয়ার সেনাবা নিয়ন্ত্রণ করছিল। জার্মান সেনার বিজয়-যাত্রা পর্যবসিত হলো পরাজয়-যাত্রায়। এই সময়ে ২ নভেম্বর (১৯৪৪) সকাল ছটায় আমাদের ট্রেন জাহিদানে পৌঁছলো। আমি ভাবলাম, আগের দুটি যাত্রার মতন এবারও কাস্টম-এর অফিসারদের হাতে বেশ নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু রাজ্যের আসল লাগাম যখন ভিনদেশীর হাতে, তখন ইরানী অফিসারদের বেশি ঝুট-ঝামেলায় কি প্রয়োজন? আমি যখন কষ্ট-পরীক্ষার জন্য প্রতীক্ষারত, সেই সময় এক সহযাত্রী ভাই বলল, 'ওটা তো মীরজাবাতেই (স্টেশন) শেষ হয়েছে।' লরি স্টেশন থেকে শহরে পৌঁছে দিল। ১৬৩৭-এর তুলনায় জাহিদান এখন যুদ্ধের কল্যাণে অনেক বড় হয়ে

গিয়েছিল। ভারত থেকেও প্রচুর জিনিস এই পথ দিয়ে রাশিয়ায় পাঠানো হচ্ছিল।

লরি এসে থামল প্রায় খোলা একটা গ্যারেজে। এরকম স্থানে মাল গচ্ছিত রেখে পাসপোর্ট, বাসের টিকিট ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে এদিক-ওদিক দৌড়-ঝাঁপ করতে যাওয়া খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। পূর্ব্ব-পরিচিত ভেবে আমি সরদার মেহর সিংহ (চকবাল)-এর বাড়ি গেলাম। অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। দিনটি ছিল ওঁর পুত্রের পাকা দেখা। দুটো ঘরে ফল আর মিষ্টিতে ভরা বড় বড় থালা সাজানো ছিল। 'মানো না মানো আমি তোমার অতিথি' হতে তো চাইছিলাম না, কিন্তু সুরক্ষিত স্থানে মাল রাখার আর কোনো উপায়ও ছিল না।

ভারতে জিনিসের দাম বেড়েছিল বটে, কিন্তু এখানে আমাদের দেশের কুড়ি টাকার এক জোড়া বুট বিক্রি হচ্ছিল একশো টাকায়। জিনিসপত্রের দাম ভারতের থেকে চার-পাঁচগুণ বেশি ছিল, তা ছাড়া 'ঝোপ বুঝে কোপ মারা'[১] তো ছিলই। সেই দিনই আমি মসহদের উদ্দেশে রওনা হতে চাইছিলাম। দুপুর পর্যন্ত শহরবানী পুলিশ স্টেশনে অনেকবার গেলাম কিন্তু পাসপোর্টের কোনো হদিশ পেলাম না। বলা হলো, এখনও কোয়ারনটীন থেকে এসে পৌঁছোয় ন। কোয়ারনটীনের ডাক্তার গরবী বললেন, 'না পেলে লরি ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে এস, আমি তোমার পাসপোর্ট দিয়ে দেব।' কিন্তু কাজটা অতটা সোজা ছিল না। জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে সরদার লালসিং-এর ঠিকানা পেলাম। উনি ৫০ তুমান দিয়ে (১ তুমান = একটাকা, যদিও ইরানী ব্যাঙ্ক তাকে একটাকার একটু বেশি মূল্য ধার্য করতো) লরির টিকিট কিনে দিলেন।

পরের দিনও (৩ নভেম্বর) সরদার লাল সিং-এর প্রচুর দৌড়-ঝাঁপের ফলে দশটায় পাসপোর্ট হাতে এলো। ওটা ছাড়া জাহিদানের পরে আর এগোনো সম্ভব হতো না। মানুষ অতীতের উদ্বেগকে চট করে ভুলে যায়, কিন্তু ইরানের বাস অথবা লরির পুরোপুরি যন্ত্রণাদায়ক সফর ভোলার নয়। গাড়ির চালক যাত্রীদের জান এবং মালের বাদশাহ। যখন মর্জি চলতে শুরু করে, আবার যখন মর্জি দাঁড়িয়ে পড়ে। রজাশাহের আমলে কড়াকড়ি ছিল না, তাই রাস্তাঘাটে আবার বোরখা (পর্দা) সাধারণ ভাবেই চোখে পড়ছিল। পাগড়ি বাঁধা লোকও দেখা যাচ্ছিল, যদিও হ্যাট তখনও পুরোপুরি উঠে যায় নি।

লরি রাত আটটায় ছাড়লো। আমাদের লরিতে ৩১ জন বল্‌তী (কাশ্মীর) তীর্থযাত্রীও ছিল। তারা শুধু তিব্বতী ভাষা জানতো। আমাকে মাঝে মাঝে দোভাষীর কাজও করতে হচ্ছিল। ওরা নিজেদের প্রভাবের দরুন ২৩ তুমানেই লরির টিকিট পেয়েছিল। এই কষ্টও অনেক বেশি দামে কিনতে হয়েছিল। গাছপালাহীন পাহাড়ের শুকনো ভূমি ছিল বর্ষার জল থেকে বঞ্চিত। রাস্তা বানানোর জিনিসপত্র সর্বত্র মজুত ছিল। রাস্তার ভাগ্য যুদ্ধই খুলে ছিল। রাত চারটে অব্দি লরি চলতে লাগল। তারপর দুঘন্টার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো। আমরা বসে বসে ঝিমোলাম। সূর্যোদয়ের সময় ফেরার যাত্রা শুরু। শুধু চায়ের পিপাসা মেটাতে এক-আধ জায়গায় একটুক্ষণ থামতো। বেলা একটায় বিরজন্দ পৌঁছলাম।

[১] এক্ষেত্রে মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত লোককথাটি *জোঙ্গরাম সোঙ্গরাম*।—স·ম·

এক-দেড় মাইল যেতেই লরি গেল বিগড়ে। একবার তো হতাশা ছেয়ে ফেললো। তারপর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আবার সব ঠিক। রাতে-রাতেই মসহদ পৌঁছনোর কথা ছিল, কিন্তু চালকের চোখে নিদ্রা নেমে এলো। যখন চালক গুনাবাদে বিশ্রাম নেবে ঠিক করলো, তখন আমরা ভেবে অস্থির। সকাল দশটা অব্দি ও ঘুমিয়ে রইল। তারপর সেই বলতী যাত্রীদের কাছে বাকি ভাড়ার জন্যে ঝঞ্ঝাট শুরু হয়ে গেল। ওরা কিছু শুনে থাকবে। বলে-কয়ে ২৭ জন দুপুর পর্যন্ত ভাড়া চুকালো, লরি চলতে শুরু করলো। লরিতে এটা তৃতীয় দিন ছিল। একেকবার খেতে সাড়ে তিনটাকা খরচ হচ্ছিল।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। দূরে মসহদ শহরের আলো দেখা যাচ্ছিল। চালক যাত্রীদের দেখিয়ে বলল, 'শাগির্দ (ক্লিনর)-কে আলো দেখানোর দক্ষিণা দাও।' চালক একাধারে যেন পাণ্ডাও ছিল। কিন্তু বেচারা গরিব বলতীরা কষ্টের রোজগারের কিছু বাঁচিয়ে মশহদশরীফে ইমাম রজার সমাধি দর্শন করতে এই যাত্রা করেছিল। জিনিসপত্রের দামও ছিল বেশি। তাহলে ওরা কেমন করে সব জায়গায় দক্ষিণা দিয়ে বেড়াবে? দিতে রাজি না হওয়াতে চালক ওদের 'জংলী, অসভ্য, জানোয়ার' কত সব উপাধি দিতে লাগল। এক জায়গায় রুশ সৈনিক লাল আলো দেখিয়ে গাড়ি দাঁড় করালো, তারপরে হেঁটে আমরা রাত নটায় মশ্‌হদ-শরীফ পৌঁছলাম। আরও পনের তুমান দিতে হলো মালের জন্য। দু-এক জায়গায় ঘোরার পর যখন হোটেলে জায়গা পাওয়া গেল না, তখন পাণ্ডা মুসা সাহেবের প্রস্তাবকে স্বীকার করতে হলো। দুরেস্কী (ফিটন) চার তুমান আর মজুর দু তুমান নিয়ে গলিতে পাণ্ডাজীর বাড়িতে পৌঁছে দিল। সব জায়গার পাণ্ডাদের মতই এই পাণ্ডারাও অতিথিদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে খেয়াল রাখে এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত সোনার ডিমগুলো বের করার কথা না বলেও যতটা সম্ভব বেশি দক্ষিণা পাবার চেষ্টা করে। আমি বলে দিলাম, 'যথা শক্তি তথা ভক্তি।'

সকালে (৬ নভেম্বর) রুশ কন্‌সালের কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম অশখাবাদ[১] হয়ে যাবার ভিসা যদি এখান থেকেই পাই তা হলে অনেক ঝামেলার সমাধান হবে। কিন্তু তা হবার নয়। টাকা হিসেবে যে মুদ্রা আমি এনেছিলাম তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন ইরানে খরচ করার জন্যে বরাদ্দ পঁচিশ পাউন্ডে হাত দিতে হতো। দশ পাউন্ডের চেক ভাঙিয়ে 'ব্যাঙ্ক শাহশাহী' থেকে ১২৮ তুমান পাওয়া গেল যার থেকে ৭৫ তুমান তো গেল তেহরানের বাস ভাড়ায়। তিন তুমান দিতে হলো মুসা সাহেবকে, আর সাড়ে চার তুমান মজুরদের। টাকার পাখা গজিয়েছিল, উড়ে যেতে সময় লাগছিল না।

সূর্যাস্তের সময় বাস রওনা হলো। ৭ নভেম্বরে সারা দিন আর রাত বাস চলতে থাকল। রাত বারোটায় অক্তারী গ্রামে বিশ্রামের জন্যে থামলো। দুই তুমান (টাকা) লাগল একটা উতাক (কামরা) ভাড়া করতে, কিন্তু পোকা-মাকড়ের কাছে পরাস্ত হয়ে বাইরে এসে শুতে হলো।

সকাল হতেই আবার যাত্রা শুরু। সমনান-এর কুঁড়েঘরগুলো নজরে পড়ছিল না।

[১] ইরানের উত্তরে তুর্কমেন (সোভিয়েত রাশিয়া)-এ অবস্থিত। —স·ম·

ওখানে এখন সবই বড় বড় পাকা ঘর দাঁড়িয়েছিল। মাটির নীচে যে পেট্রোল পাওয়া গেছে! রেলপথও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের বাসেই তেহরান পৌঁছতে হবে। দুপুরের পর হাজিয়াবাদে রুশ পুলিশ চৌকি দেখা গেল। সোভিয়েত কন্‌সালের দেওয়া পাস এখানে দিয়ে দিলাম। যে রুশ সৈনিক আমাদের পাস নিল সে ছিল অতি রুক্ষ। যদিও এই একই কথা ওর এশীয় বন্ধুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আমাদের বাসের বেশির ভাগ যাত্রী ছিল তাব্রিজী তুর্কী[১]। তাদের মধ্যে টুপিধারীর থেকে পাগড়িধারী বেশি ছিল। সঙ্গে ছিলেন এক কার্তুজ মালাধারী সরকারি অফিসার বাবু যিনি দেখিয়ে দেখিয়ে তিরিয়াক (অফিম) খেতে খুব পছন্দ করছিলেন —তিনি যে আইনের বাবা ছিলেন! তেহরান যখন আর মাত্র ৩০-৩২ কিলোমিটার দূরে, তখন ওর আফিম ধরা পড়লো। প্রথমে সে রোয়াব দেখাতে চাইলো কিন্তু তাতে কিছু হবার ছিল না। বাস থেমে থাকলো। কার্তুজের মালা পরা অহঙ্কারীমূর্তি তিরিয়াকী (আফিমখোর) সাহেব যখন ৫০০ তুমান জরিমানা গুনে দিল আর সেই সঙ্গে তাঁর সব আফিম বাজেয়াপ্ত হলো, তখন সে গেল ছাড়া পেলো। সন্ধে সাতটায় ইরানের রাজধানী তেহরানে পৌঁছলাম।

প্রথমে তো কোথাও পা রাখার জায়গার খোঁজ করার ছিল, তারপর সোভিয়েত ভিসার জন্য চেষ্টা করা। চিরাগবর্ক রাস্তায় 'মুসাফিরখানা তেহরান'-এ রোজ ৫ বলে ৬ তুমান ভাড়ায় এক কামরা যোগাড় হলো। সেই রাতেই বুঝলাম, এখানে রোজের খরচা ২০ তুমানের কমে হবে না। আর আমার কাছে ছিল মাত্র ১৫ পাউন্ড মানে ১৯২ তুমান অর্থাৎ মাত্র দশদিনের খরচা। বাস থেকে এখানে পৌঁছে যাওয়া এক সহযাত্রী আরো পাবার আশায় ছিল। পরের দিন পাঁচ তুমান দিয়ে তাকে বিদায় দিলাম।

পরের দিন হম্মাম কোরবীর কাছে কুচা-উঙ্গরীতে আমার পূর্ব-পরিচিত আগা আমীর আলী দীমিয়াদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ছ বছরেই তাকে ভীষণ বুড়ো দেখাচ্ছিল! তারপরে সোভিয়েত কন্‌সালের কাছে গেলাম। ওখানে বলা হলো, 'আগে ইংরেজ দূতাবাসের সুপারিশ করা চিঠি আনো, তারপরে কথা বলো।' বিষণ্ণ মনে ইংরেজ দূতাবাসে গেলাম এবং ভারতীয় বিভাগের প্রধান মেজর নকবীর সহায়ক রিজবী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। রিজ্‌বী প্রয়াগের (শাহগঞ্জ) লোক। প্রদেশভাই আর নগরভাই হিসেবে খুব অন্তরঙ্গতার সঙ্গে দেখা করলেন পরবর্তী সাতমাস পর্যন্ত তাঁর ওই রকম সৌহার্দ বজায় ছিল। উনি জানালেন, সোভিয়েত ভিসা পাওয়া সহজ হবে না।

আমার সামনে ছিল কঠিন সমস্যা — ১৯২ তুমান আর রোজের খরচ ২০ তুমান! ওখানেই আব্বাসী ওরফে বোস মশাই বসে ছিলেন। ওঁর সঙ্গেও পরিচয় হলো। উনি তাঁর স্ত্রী-কন্যা (ইরানী) নিয়ে যেতে এসেছিলেন। কয়েক মাস কেটে যাওয়া সত্ত্বেও কোনো কূল কিনারা দেখতে পাচ্ছিলেন না। আমার চিন্তা দেখে তিনি যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করলেন। যেতে যেতে উনি নিজের ৩০ তুমান মাসিক ভাড়ার কামরা আমাকে দেবার প্রস্তাব জানালেন। আমি ভাবলাম। ১৫০-এর বদলে কামরা বাবদ ৩০ তুমান দাঁড়ালো।

[১] ইরানের তাব্রিজে বসবাসকারী তুর্কি। —স·ম·

ওঁর সঙ্গেই ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আমি খয়াবান-ফরিস্তার ওই বাড়িতে এসে উঠলাম। সুখের বিষয় দীমিয়াদ সাহেবের বাড়ি পাশেই ছিল, যদিও ১৯২ তুমান-এর ১৫ পাউন্ড-এর চেক আর আগামী অনিশ্চিত হৃৎস্পন্দন দূর হয় নি। কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে এখন ২০ তুমানের কমে হয়তো ১০ তুমানেই প্রতিদিনের খরচ চলে যাবে। ৯ নভেম্বরের রাতে খুব নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম। আব্বাসী শ্বশুরবাড়িতেই থাকছিলেন, তাই তিনি সেখানে চলে গেলন।

পরের দিন যখন শুনলাম আব্বাসী দুমাসের ভাড়া বাড়িউলিকে দেননি, তখন চিন্তা বাড়লো দ্বিগুণ। তবুও 'আশাই বাঁচিয়ে রাখে জগৎ-সংসার।' আমি ভেবে দেখলাম—রোজ দেড় তুমান রুটি মাখন খেজুর খেয়ে বেঁচে থাকা আর ভবিষ্যতের ভরসায় নিজকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই!' রোজ চার তুমানের বেশি খরচ করা চলবে না! ১৬০ তুমানে ডিসেম্বরের ১০ তারিখ অব্দি চলে যাবে। এ সব করেও ৩১ তুমান বেঁচে যাবে। আংটি আর রিস্টওয়াচের চেনের তিন তোলা সোনা দিয়ে তিন মাস আরও চালিয়ে নেওয়া যাবে। ১০ ফেব্রুয়ারি অব্দি এখানে অপেক্ষা করা যাবে। ভিসা যদি না পাওয়া যায়? ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

পরের দিন (১১ নভেম্বর) ১০ পাউন্ড ভাঙানো জরুরি ছিল। আব্বাসীর ১৫ তুমান ধার ছিল! ভাঙিয়ে ১২৮ থেকে আব্বাসীকে যখন ১৫ দিতে যাচ্ছি, তখন উনি আরো ৫০ তুমান কি এক জরুরি কাজের জন্যে চেয়ে নিলেন, এবং আমিও অতি সহজেই তা দিয়ে দিলাম। এখন হাতে রইল শুধু ৬৩ তুমান আর পাঁচ পাউন্ডের চেক। ভিসার জন্য দৌড়-ঝাঁপের পর ওই দিনের ডায়েরিতে লিখতে হলো—'নিজের ব্যাপারে এখন কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।'

দেড় তুমানে তো রোজ চালাবো স্থির করেছিলাম কিন্তু ১২ নভেম্বর তিন তুমান দিতে হলো শুধু গরমাবা (স্নানাগার)-এর জন্য। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আব্বাসীর সঙ্গে পরিচয়ের মাত্র চার দিন কেটেছে। এরই মধ্যে ওঁর দোষগুণ কিছু কিছু জানা হয়ে গিয়েছিল। ওঁকে দেওয়া পঞ্চাশ তুমান ফেরত পাবার কোনো আশা ছিল না, উপরন্তু দুমাসের বাকি ভাড়ার জন্য ৬০ তুমানের ঋণীও তিনি হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আব্বাসীর আরেক দিকও ছিল যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি এক সত্যিকারের মানবপুত্র। তিনি কথা খুব বলতেন না, আবার খুব যে স্বল্পভাষী ছিলেন তাও নয়। 'ন হ্যে কম্ অপি সত্যম্ স্যাত্, পুরুষে বহুভাষিণী' অনুসারে ওঁর কথায় যে কিছু সত্যেরও অংশ থাকত না, তা ঠিক নয়। তাও সেই জঙ্গল থেকে সত্য খুঁজে বের করা মুশকিল ছিল। ৯ নভেম্বরে আব্বাসীর সঙ্গে পরিচয়, তার পরে আগা দীমিয়াদের এখানে দ্বিতীয় মানবপুত্র মির্জা মহম্মদ ইস্ফানীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

তেহরানে

১৯৪৪-এর শীতে আমি তেহরান পৌঁছলাম। সোভিয়েতের উদ্দেশে পাড়ি দেবার আশায়

রাহুল-৩/ফর্মা-১২

—১৯৪৪—

৭ নভেম্বর (১৯৪৪) থেকে ২ জুন পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেলাম। যদিও এই প্রতীক্ষা জরুরি এবং কষ্টসাধ্য ছিল, তা ছাড়া আমি কি-ই বা করতাম? ইওরোপে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা আর জর্মানির অস্ত্র-সম্বরণ এই দুই-এর পরেই আমি সোভিয়েত ভিসা পেলাম। তবুও এই সাত মাসের প্রতীক্ষাকে পুরোপুরি নিষ্ফলও বলা চলে না। তেহরান তখন শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক আখড়া ছিল না, তা রাজনৈতিক ও সৈনিক আখড়াও ছিল। অবশ্য তখন রাজনৈতিক আখড়া ঠিক বলা যেত না, কারণ ইরান তখন পুরোপুরি আমেরিকার হাতের পুতুল ছিল। তাই খেলা ঠিক সমানে সমানে হচ্ছিল না।

দেখতে দেখতে তেহরান এক বড় শহরে পরিণত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সে ছিল লাখ খানেকের চেয়ে কিছু বেশি জনসংখ্যার এক পুরনো নগর। ওর গলিগুলো ছিল সংকীর্ণ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে কোনো চওড়া চলার পথকেই বলা হতো রাস্তা। তখন পাকা রাস্তার চিহ্ন ছিল না কোথাও। ১৯৩৫ সালে আমি যখন সর্ব্বপ্রথম তেহরানে পৌঁছলাম তখন তেহরান শহরের জনসংখ্যা ছিল দুলাখের কিছু বেশি। তখন পথঘাট সোজা, পাকা এবং প্রশস্ত রূপ ধারণ করেছিল। রাস্তার ধারে বিশেষ করে প্রধান প্রধান জায়গাগুলোতে আধুনিক ঢঙের অট্টালিকা দাঁড়িয়ে ছিল।

১৯৩৭-এর দ্বিতীয় যাত্রায় শহরের আকার বেশ বেড়ে উঠেছিল। ভারত ফেরত আমার ইরানী বন্ধু আগা দীমিয়াদ নিজের বাড়ি শহরের প্রান্তে বানিয়েছিলেন, সেখানে আশেপাশে অনেক খালি জায়গা পড়ে ছিল। সাত বছর বাদে তৃতীয় যাত্রায় ওর বাড়ি ঘনবসতির ভেতরে আর জনসংখ্যা সাত-আট লাখের বেশি হয়ে উঠেছিল, যা মিত্রশক্তির সেনারা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। যদিও ইংরেজ, আমেরিকান, রুশ সেনাদের থাকার জন্যে আলাদা আলাদা স্থান নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু তাও সেনাদের শহরের সঙ্গে সম্বন্ধ তা ছিলই। সাধারণ অথবা অসাধারণ শখের জিনিস কিনতে সেনাদের সেখানে যেতে হতো। সিনেমা এবং অন্যান্য মনোরঞ্জনের সামগ্রীও ওখানেই ছিল। রাস্তায় রাস্তায় নিজের নিজের দেশের উর্দি পরা সেনারা ঘুরে বেড়াতো।

উচ্চ মার্গের রাজনীতি তো ছিল এটাই যে, রজাশাহ—যাকে নতুন ইরানের নির্মাতা বলা হয়—জার্মান নাৎসিদের পক্ষপাতী ছিল। সে মৌলবীদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ইরানের জাতীয় অহঙ্কারকে দাঁড় করিয়েছিল। প্রত্যেক রজাশাহী ইরানী যুবক আরবদের এবং আরবী সংস্কৃতিকে চার লাথি মেরে নিজেকে কৌরোশ ও দারযোশ-এর আর্যত্বর উত্তরাধিকারী মনে করতে লাগল। হিটলারের আর্যত্বর প্রচারের আগেই রজাশাহ নিজের দেশে তার ধ্বজা পুঁতেছিল। এই জন্য এটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার না যদি হিটলারের নীতির সঙ্গে ইরানও নিজের নীতিকে জুড়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু এই নীতি কেবল আর্যত্বর চিন্তধারার জন্য হয় নি। জার্মানি যেভাবে ইওরোপের প্রায় পুরোটাই আত্মসাৎ করে আফ্রিকার দিকে পা বাড়িয়ে ছিল, তাতে রজাশাহেব বিশ্বাস হয়েছিল যে এবার জার্মানির বিজয় হবে। এই জন্য সে উদিত সূর্যকে নমস্কার করতে চেয়েছিল। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা এখন আফ্রিকায় হিটলারের বাড়াবাড়ি রুখতে পারুক বা না পারুক, কিন্তু রজাশাহকে রক্ষা করতে হিটলারের বাহু এখন অতটা লম্বা ছিল না। সেই কারণে একই

ঝোঁকে মিত্রশক্তির সেনা ইরানকে নিজের অধীনে করে নিল। রজাশাহকে বন্দী করে ওকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিল। রজাশাহ এক সাধারণ তুর্কী পরিবারে বড়ো হয়ে এক রাজবংশের স্থাপন করেছিল, তাই তার পক্ষে গদি থেকে বঞ্চিত হওয়াটা কিছু বড় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তার ছেলে (বর্তমান শাহ) তো ছিল রাজপুত্র। হিটলারকে হারানোর জন্য রুশ সাহায্যর খুবই প্রয়োজন ছিল কিন্তু ইংল্যান্ডে আর আমেরিকা, রুশ রাজ্য-ব্যবস্থাকে সংক্রামকে অসুখ বলে মনে করতো। যে সময়ে জার্মান সেনা রাশিয়ার ভেতরে এগিয়ে যাচ্ছিল সে সময় রাশিয়া এমন পরিস্থিতিতে ছিল না যে সে নিজের কোনো ব্যাপারে জেদ করে। ব্রিটিশ তথা আমেরিকন সাম্রাজ্যবাদী শুধু ওই সময়ের যুদ্ধ জেতার চিন্তায় ছিল না, বরং যুদ্ধের পরে নিজেদের সাম্রাজ্যেরও চিন্তা করছিল। সেইজন্যেও তারা কোনো বড় রকমের হেরফের হতে দিতে চাইছিল না। এইভাবে রজাশাহ হয়ে গেল যুদ্ধের উপঢৌকন কিন্তু তার রাজবংশকে বাঁচিয়ে দেওয়া হলো।

তেহরানের রাস্তায় প্রচুর সংখ্যায় বিদেশী সৈনিক ঘুরে বেড়াতে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, যে ইরান নিজের বশে নেই। শাসনভার ইরানীদের হাতেই ছিল। রজাশাহের হুকুম ছিল এক অত্যাচারী শাসক বা অভিজাত শাসকের হুকুম। তাতে সাধারণ জনতা বা বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের গলার আওয়াজ উঁচু করার কোনো অধিকার অথবা সুযোগ ছিল না। সারা দেশে গুপ্তচরের জাল বিছানো ছিল। ইরানী স্ত্রী-পুরুষ দেশের ভেতরেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে গিয়ে গ্রেফতার হতো, যদি তাদের কাছে ছবিসহ জাবাজ পাসপোর্ট না থাকতো। এইভাবে রজাশাহ একদিকে সারা দেশকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল, তাতে ওর শত্রু সর্বপ্রকারে নির্মূলও হয়ে যায় নি, অন্যদিকে সে মাঝে মাঝে নিজের নির্ভীকতাও দেখাতে চাইতো।

১৯৩৭-এ একবার আমি সরকারি সচিবালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই সময় একটি কাপড়ের হুডঅলা সাধারণ মোটর গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসা একটি লোককে যেতে দেখলাম। ছবি দেখেছিলাম বলে চেহারা পরিচিত ছিল, তাই আমার সন্দেহ হলো। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ রইল না যখন দেখলাম আশেপাশের আরো কত লোক ওদিকে মন দিয়ে দেখছে আর 'আল্লা হজরত'-এর নাম নিয়ে ইশারা করছে। এখনও জাবাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে রজাশাহর আইনই পালন করা হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধ অনেক বাঁধা হাতের মুঠো খুলে দিয়েছিল। কুড়ি বছর পর্যন্ত জেলে পচা অনেক দেশভক্ত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সোভিয়েত সেনা পাশেই মজুত ছিল। যার জন্যে মজুর আর বুদ্ধিজীবীদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল। ওদের সংগঠন 'তুদে' (জনতা) বেশ মজবুত হচ্ছিল। বুদ্ধিজীবীদের ওপর তার প্রভাব ছিল। এখন-তুদে অবৈধ সংস্থা। সাম্যবাদীর প্রভাব বাড়তে দেখেও অ্যাংলো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ওকে দাবিয়ে রাখার জন্য সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল কিন্তু সোভিয়েতের কারণে তাদের সাহসে কুলোচ্ছিল না। ইরানী আজারবাইজান—ককেশাস পর্ব্বতমালা ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে অবস্থিত বৃহৎ আজারবাইজানেরই এক অংশ। এর উত্তর দিকে অর্থাৎ সোভিয়েত আজারবাইজান এক স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের রীতিতে ব্যাপক চাষবাস এবং

শিল্প-বণিজ্যসম্পন্ন সুশিক্ষিত রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল, যখন ইরানী আজারবাইজান সব রকমভাবে পিছিয়ে থাকা প্রদেশ ছিল। যুদ্ধের সময় সোভিয়েত নাগরিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠলো। সে দেখল যে সোভিয়েত সেনাদলের মধ্যে কিরকম করে আজারবাইজানী, তুর্কমান, উজবেক, কাজার, রুশ বা উক্রৈনী সবাই সমানভাবে পুরোপুরি বন্ধুত্বের সঙ্গে থাকে। এদের প্রভাব তার ওপর পড়তে বাধ্য। ইরানী আজারবাইজান স্বাধীনতার দাবি করে নি, বরং নিজেদের স্বায়ত্ত শাসন স্থাপিত করেছিল, যাকে আমেরিকার মদদ নিয়ে ইরানী সরকার অত্যন্ত বিশ্রীভাবে দাবিয়ে দিয়েছিল। যখন দেখল যে সোভিয়েত রাষ্ট্র যুদ্ধকে বাড়িয়ে তোলার কারণ হতে পারে না, তখন আমেরিকার দলে ভিড়ে গিয়ে ইরানী সরকার সব রকমের বামপন্থী সংগঠনগুলোকে নষ্ট করার সংকল্প করেছিল। আজ যে সব সংগঠনগুলো লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজ করার সুবিধে পায়, তখন তাদের মধ্যে প্রাণ ছিল।

মিত্রশক্তির সেনাদের সম্বন্ধে ইরানীদের কি মনোভাব ছিল সেই ব্যাপারে এক ইরানী ভদ্রমহিলার কথা শোনাচ্ছি। বাবা কয়েক বছর ধরেই ভারতে বসবাস করছিলেন এবং হয়তো এখনও করছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় ভদ্রমহিলাকে আধা-ভারতীয় বলা যেতে পারে। উনি বলছিলেন, 'যে ফুটপাত দিয়ে আমি হাঁটছি যদি সেই ফুটপাতে সামনে দিয়ে আমেরিকন বা ব্রিটিশ সেনাকে আসতে দেখি, তাহলে আমি আগেই সেই ফুটপাত ছেড়ে অন্য ফুটপাতে চলতে আরম্ভ করবো। কিন্তু সামনে দিয়ে যদি কোনো রুশ সেনা আসে তো আমি একটুও সরবো না।' আমি বললাম, 'তাহলে তো আপনি তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাবেন।' মহিলা হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ, একেবারে ঠিক বলেছেন। ধাক্কা লেগে গেলেও ভয়ের কিছু নেই।' রুশ সেনাদের নামে নানা রকমের জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। একদিন ভারত-ফেরত অন্য এক ইরানী বিদ্বানের বৃদ্ধা পত্নী বলছিল, 'আমরা মজন্দরানের বাসিন্দা, যা রাশিয়ার সীমারেখার পাশে। ওখানে রুশ সেনারা ছাউনি করে রয়েছে। এখুনি ওদের সম্বন্ধে একটা কথা শুনলাম। জনৈক রুশ সৈনিক কোনো একটা বাগান থেকে জিজ্ঞেস না করে দাম না দিয়ে একটা আপেল পেড়ে নিয়েছিল যার জন্য তার সাজা হয়েছিল প্রকাশ্য বাজারে বেত্রাঘাত। এটা কি খুব বাড়াবাড়ি নয়?' আমি এই ঘটনার সত্যতা-অসত্যতার কি জানতাম যে জবাব দেব? কিন্তু লোকে রুশ সেনাদের পক্ষে ভ্রষ্ট হওয়াটা ওদের সীমার বাইরে বলে মনে করতো। আমেরিকান সৈনিক দুহাতে পয়সা লুঠতো। ইরানীরা এবং তার থেকেও বেশি রুশ বিপ্লবের পলায়নরত সাদা চামড়ার রুশরা ভাবতো যে ওদের কাছে সোনার খনি আছে। প্রথম দু-মাস আমি যে বাড়িতে থাকতাম তার পাশের ঘরে এক সাদা চামড়ার রুশ বৃদ্ধা তার তরুণী কন্যার সঙ্গে থাকতো। ওদের বাড়িতে যখন-তখন কোনো কোনো অমেরিকান সেনা আসা-যাওয়া করতো। তার ইচ্ছে ছিল, 'আমার মেয়ে যদি কোনো আমেরিকানকে বিয়ে করার সৌভাগ্য লাভ করে, তাহলে ভাগ্য খুলে যায়।'

তেহরানে ভারতীয় সেনাও ছিল কয়েক হাজার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ইরানের জায়গায় জায়গায় ভারতীয় সেনা ছিল, কিন্তু তখন ভারতীয়রা কেবল সেপাই ছিল। এখন

তো অনেকে ক্যাপ্টেন, মেজর আর কর্নেল ছিল কিন্তু এখন ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের গোলাম। তাই ভারতীয় সেনাদের প্রতি কারো কোনো ভাব-দুর্ভাব ছিল না। তাদের বেতন ছিল কম, সেই কারণে পয়সা খরচ করতে এতটা মুক্তহস্ত দেখাতে পারতো না, যা ইংরেজ এবং আমেরিকান সেনারা পারতো।

যুদ্ধের জন্যে সর্ব্বত্র জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতেও টাকায় দুসের আটা হয়ে গিয়েছিল, ১০ টাকার জুতো ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু তেহরানে সেই জুতো তো একশো টাকাতেও পাওয়া যেত না। ওখানে সব জিনিসেরই খুব দাম ছিল। ১৯৩৫-এ দু আনা বা ছ পয়সা সেরে ভালো আঙুর বিক্রি হতো আর সেটা এখনও সেই দামে বিক্রি হচ্ছিল, যে দাম বোম্বাই আর লাহোরে। খাবার-দাবারের জিনিসের খুব চড়া দাম ছিল। বিদেশী সেনা নিজের দেশ থেকে টাকা-পয়সা আনিয়ে এখানে খরচ করছিল, এই কারণে টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। রোজগারেরও অভাব ছিল না। সেনাদের ব্যবহারেরও প্রচুর জিনিস বাজারে চলে আসছিল। ওখানে ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, ভারতীয় সব দেশেরই সিগরেট পাওয়া যেত। সিনেমা হল খোলার জন্য এই দেশগুলোর মধ্যে একটার সঙ্গে আরেকটার যেন রেষারেষি চলতো। কত সিনেমা হল মার্কিনরা ভাড়া করেছিল যেখানে ওদের নিজেদের ফিল্ম দেখানো হতো। দু-তিনটে সিনেমাও চলতো। রুশরাও তাদের সিনেমা হল খুলেছিল। ভারত নিজেদের কোনো সিনেমা হল খোলে নি কারণ ভারতের সম্মানই বা কি ছিল? কিন্তু আমাদের দেশের ফিল্ম তেহরানের অনেক সিনেমা হলেই দেখানো হতো। আর সেগুলো বেশির ভাগ ছিল 'পিস্তলওয়ালা' আর 'হান্টারওয়ালা' টাইপের। যদিও এই ধরনের ফিল্ম দেখতে অন্যান্য জায়গার থেকে বেশি ভিড় হতো কিন্তু ভারতের পক্ষে সেটা গৌরবের ব্যাপার ছিল না।

অকৃত্রিম বন্ধু

৮ নভেম্বর ১৯৪৪-এর সন্ধেয় একরকম খালি হাতেই আমি ইরানের রাজধানী তেহরানে খুব আশা নিয়ে পৌঁছেছিলাম। ভেবেছিলাম শিগ্‌গির সোভিয়েত ভিসা পেয়ে যাবো আর আমি লেনিনগ্রাদ পৌঁছে যাবো। তখন কি আমি জানতাম যে জুন ১৯৪৫-এ প্রায় সাতমাস বাদে আমি তেহরান থেকে বেরোতে পারবো?

তেহরানে প্রথম যে ভারতীয় বন্ধুকে পেয়েছিলাম, তাঁর আসল নাম তো ছিল অভয়চরণ, কিন্তু নিজেকে তিনি বানিয়েছিলেন আবদুল্লা বা সুকরুল্লাহ আব্বাসী। ওই সংকটময় সময়ে হাতের অবশিষ্ট কিছু তুমানের থেকেও অনেকগুলো এটা-সেটা বলে ঠকিয়ে নিলেও ওঁর সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করে বসা খুব ভুল হবে। ওঁর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। কখনও তিনি ষোলকলা পূর্ণ দেবতার রূপ নিতেন আবার কখনও তাঁর রূপ কুটিল শয়তানের মতো মনে হতো। ওঁর ব্যাপারে পরে বলবো। আগের যাত্রায় পরিচিত বৃদ্ধ আগা আমীর আলী দীমিয়াদ আমার সেই বাড়ির কাছেই থাকতেন যেখানে আব্বাসী আমাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন আর যেটার

সম্বন্ধে পরে জানতে পেরেছিলাম যে কয়েক মাসের বকেয়া ভাড়া আমাকেই মেটাতে হবে।

৯ তারিখেই দৌড়-ঝাঁপ করে বুঝতে পারলাম, ভিসা এত শিগ্‌গির পাওয়া সম্ভব হবে না। ওই দিনই দীমিয়াদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এলাম। ১০ নভেম্বরে ৪৮ ঘন্টা তেহরানে থাকার পর এখন নিজের আর্থিক দুরবস্থা মনে হলো আমার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাবড়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই, কিন্তু কোথাও থেকে কোনো আশার কিরণ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি ১০ নভেম্বরের সকালে দীমিয়াদ সাহেবের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানে এক হাসিমুখ-প্রৌঢ় তথা ফর্সা মুখের লোকের সঙ্গে দেখা হলো। ওর কালো চোখে এক বিশেষ চমক দেখা যাচ্ছিল, যার থেকে বুদ্ধি-ভালোবাসা দুটোরই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। দীমিয়াদ সাহেব, তার মেয়ে তাহিরা এবং উক্ত সজ্জন (মির্জা মহমুদ ইস্ফাহানী)-এর সঙ্গে দুঘন্টা পর্যন্ত কথাবার্তা বলে অমার সমস্ত চিন্তা ভুলে গেলাম। ওঁরই সঙ্গে আমি সৈয়দ মুহম্মদ আলী 'দাইউল ইসলাম'-এর বাড়ি গেলাম। দাইউল ইসলাম কয়েক বছর যাবৎ হায়দ্রাবাদে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি 'ফরহংগে নিজাম' নাম দিয়ে একটি ফারসী অভিধান লিখেছিলেন। তাঁর তিন মেয়ে যদিও ইরানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে নিজের পিতৃদেশে এসে বসবাস করছিল, কিন্তু ওদের মধ্যে ভারতীয় গন্ধ এত বেশি ছিল যে ওরা ইরানী হয়ে যেতে রাজি ছিল না। বড় দুই মেয়ের মধ্যে একজন ছিল এম·এ· আর একজন এম·এস·সি। ছোট ছিল জুনিয়ার কেমব্রিজ পাস। হায়দ্রাবাদেও বাবার বাড়ি ছিল কিন্তু তিনি চাইছিলেন ইরানীদের সঙ্গে তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিতে। মির্জা মহমুদ ছিলেন ইরানী ভারতীয়, সে কারণে তিনি জামাই হবার যোগ্য ছিলেন। তাঁর ভারতীয় স্ত্রী মারা গিয়েছিল বলে তিনি বিয়ে করতে চাইছিলেন কিন্তু ওরকম মেয়ের সঙ্গে নয় যাকে বন্ধুরা পুরোপুরি গো-বেচারি বলে থাকে। ওরকম সদা নমাজ পড়া রোজা রাখা সাদাসিধে এবং রূপেও কিছু কম মেয়েকে মহমুদের কেন পছন্দ হবে? বাকি দুজনের একজনকে তিনি বিয়ে করতে রাজি ছিলেন কিন্তু বাবা বড় মেয়েকে কুমারী রেখে অন্য মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। শেষে তাঁকে মেজ মেয়ের বিয়ে আগে দিতে হলো আর মহমুদকেও ইচ্ছে হোক বা অনিচ্ছেয় হোক নিজের সৎ মায়ের ছোট বোনকে নিকাহ[১] করতে হলো।

সেই দিন আমরা দুজন আট-দশ ঘন্টা এক সঙ্গে ছিলাম। আট-দশ ঘন্টা মানুষ চেনার জন্যে যথেষ্ট নয়। কিন্তু মনে হলো খোলাখুলি কথাবার্তা বলে একে অপরজনকে বিশ্বাস করার ভূমিকা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মহমুদের বাবা ছিলেন এক বড় ব্যবসায়ী। কলকাতার 'ইস্ফাহানী ব্রাদার্স'-এর মালিক এবং তিনি—এই দুজন আপন ভাই ছিলেন, দুজনের কারবারও অনেক দিন অব্দি অংশীদারিতে ছিল। তাঁদের কারবার বিলেত পর্যন্ত ছিল। টাকা রোজগার এবং ওড়ানোতে দুজনের মধ্যে তিনি বেশি বাহাদুর ছিলেন। মদিরা ও মদিরেক্ষণার অনন্য সাধক ছিলেন, যার জন্যে অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান মনে করে বুড়ো বয়সে

[১] মুসলমান শাস্ত্রানুসারে বিধবা-বিবাহ।—স·ম·

তিনি তেহরানে বসবাস করতে লাগলেন। টাকা উড়িয়েও তিনি মারা যাবার সময় (১৯৪৩) চার-পাঁচ লাখের ওপর জমি-জায়গা তেহরান নগরে রেখে গিয়েছিলেন। লড়াই-এর সময় চিনির দাম খুব বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে ইরানে তো চিনি সোনার দামে কিনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বুড়ো সৌদাগরের কাছে এর আভাস আগেই পৌছেছিল। তিনি আরও দশ হাজার বস্তা চিনি ভারত থেকে আনালেন, যার থেকে তাঁর লাভ হলো তের-চোদ্দ লক্ষ টাকা। চিনির বস্তা ভারতের সীমা (নোককুন্ডী)-তে এসে আটকে রয়েছিল, সেখান থেকে বার করতে বাবা কলকাতা থেকে মহমুদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মহমুদ চিনি পার করালেন, বলছিলেন, 'যদি সেই চিনি আজও থাকতো তাহলে লাভের অংশ হতো এক কোটি টাকা।' মহমুদ তেহরান পৌছনোর পাঁচ মাস বাদেই ওঁর বাবার মৃত্যু হলো। এখন সম্পত্তি বিক্রি করা আর তাঁর থেকে নিজের ভাগ নেওয়ার সমস্যা মহমুদের সামনে উপস্থিত। তাঁর সৎ ভাই-বোনদের সংখ্যা অনেক, তাদের কয়েকজন ছিল ভারতে আর কয়েকজন ইরানে।

১৭ নভেম্বর অব্দি আমাদের দুজনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। মহমুদ খোলা মনের লোক ছিলেন, যার অর্থ এই নয় যে তাঁর বোধশক্তির অভাব ছিল। আমার মধ্যেও তিনি কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন আর এটা বুঝতেও তাঁর অসুবিধে হয় নি যে আমি কি সমস্যায় পড়ে আছি। আমার কাছে তো ছিল দু-তিন তোলা সোনা এবং অন্য দুটো-একটা জিনিস। আমি এগুলো বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছিলাম, এই সময় মহমুদ বললেন, 'চলো ফকিরের কুটিরে, সঙ্কোচ করো না।' ওঁর ফকিরী স্বভাবের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই তিনতলাতে তিনি দুটো ঘর নিয়ে রেখেছিলেন।' খুব সাধারণ কিছু জিনিসপত্র ছিল। একটি ঝি (রুকৈয়া) ছিল রান্না করার জন্য। মহমুদ নটায় অফিস চলে যেতেন, তিনি এক ইরানী সৌদাগরের সঙ্গে কারবার শুরু করেছিলেন। আমি হয় ভিসার চেষ্টায় ব্রিটিশ তথা সোভিয়েত দূতাবাসে যাওয়া-আসা করতাম, নয়তো কিছু বইপত্র যোগাড় করে পড়তাম। মহমুদ আসার পর কখনও আমি দীমিয়াদ সাহেবের কাছে যেতাম, কিংবা কখনও দাইউল ইসলামের কাছে যেতাম। সে সময় যুদ্ধের কারণে তেহরানে প্রচুর ভারতীয় সেনাও ছিল, তাই মাঝে মাঝে ভারতীয়দের সঙ্গেও দেখা করতে চলে যেতাম। তেহরানে মার্কিন, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ আর রুশ শুধু নয়, কিছু হিন্দি ফিল্মও দেখানো হতো। হিন্দি ফিল্মের মধ্যে 'পিস্তল ওয়ালী'র মত নিচু জাতের ছবিই বেশি ছিল।

দু-এক সপ্তাহ তো আমার খুব খারাপ লাগতো যে আমি কেন বন্ধুর ওপর আমার ভার দিচ্ছি, কিন্তু পরে ওঁর স্বভাবের সঙ্গে বেশ পরিচিত হবার পরে এই সঙ্কোচ চলে গেল। দাইউল ইসলামের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহিরা একদিন তার উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ· ক্লাসের নিজের প্রবন্ধ শুনিয়েছিল। মোল্লা-ফোল্লা বা পুরনো পণ্ডিতদের মত ছিল—অশোক একেশ্বরবাদী। সে ইরানের অখামনী (দারা) বংশে জন্মেছিল। ও পরসেপোলিসের কারিগর ডেকে ভারতবর্ষে বাড়ি বানিয়েছিল। অশোকের দাদা চন্দ্রগুপ্ত ইরানের শহর মুরু থেকে পালিয়ে এসেছিল যা নাকি পরসেপোলিসের (তখ্তেজম্শীদ)-ই

আরেক নাম ছিল। অশোক বৌদ্ধ ছিল না। অজন্তার গুহাগুলো বৌদ্ধ বিহার ছিল না, সেগুলো পুলকেশী এবং অন্য দক্ষিণী রাজাদের চিত্রশালা ছিল, যেখানে ওদের প্রকৃত জীবনী ও ইতিহাস লেখা আছে। তাদের সঙ্গে বুদ্ধ আর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কোনো সম্বন্ধ নেই। বুদ্ধ তো চিত্র ও মূর্তি বানাতে বারণ করেছিল। তবুও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এইসব কি করে বানাতে পারত? এই সব শৃঙ্গার রসের মূর্তি আর চিত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বানানো কখনো হতে পারে না। আমি অনেক ধৈর্য ধরে জাহিরা খানমের নিবন্ধ শুনলাম। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রফেসরের কথা ভেবে, যার তত্ত্বাবধানে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল।

দাইউল ইসলাম সাহেব শুধু আরবী-ফারসী না, সংস্কৃতও ভালো জানতেন। তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াতে পারতেন। কিন্তু কথায় বলে—'ধোপা দিগম্বরদের গাঁয়ে বাসা বেঁধে কি করবে?' তাঁর যথেষ্ঠ সময়ও ছিল, আমারও কোনো কাজ ছিল না, আর মহমুদেরও কাজ কমই ছিল। তাই দু-তিন দিন অন্তরই আমরা দাইউল-ইসলাম-এর বাড়ি পৌঁছে যেতাম। এখনও মহমুদের ওপর লোক নিরাশ হয় নি। মহমুদের বউ মারা গিয়েছিল কিন্তু ওর ছেলে ছিল কলকাতায়, যার প্রতি বাবার গভীর ভালোবাসা ছিল। সে বিয়ে করার জন্যে প্রথমে এক পরীর দৃষ্টির শিকার হয়েছিল। সেও ক-মাস ওকে প্রেমপাশে বেঁধে রাখে কিন্তু তার মা-বাবা রাজি হয় নি। নিরুপায় হয়ে তাকে তাদের আদেশের সামনে নত হতে হয়েছিল। এখন মহমুদের সামনে পাঁচটি মেয়ে ছিল। তাহিরাকে তিনি বেশি পছন্দ করতেন কিন্তু আমি আসার পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে সে স্বতন্ত্র প্রকৃতির নারী, তাকে দিয়ে কাজ হবে না। জাহিরাকে তিনি বলতেন, 'এ একটা গাছের গুঁড়ি। এর নমাজ পড়ারই ফুরসত থাকে না।' আমার তার প্রতি সমবেদনা ছিল কারণ তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। তার এক ইরানী খুড়তুতো ভাই ছুতোর মিস্ত্রি ছিল, সে তাকে বিয়ের জন্য তৈরি ছিল, কিন্তু জাহিরা ওকে প্রত্যাখান করেছিল। মেজ বোন সিদ্দীকা (এম·এস·সি·) চাইছিল একজন সাদা চামড়ার খাঁটি রক্তর ইরানী আর বাবা তো অজুহাত দিচ্ছিল 'বড়ো মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ওর বিয়ে কেমন করে দিই?' সৎ মায়ের ছোট বোন লেখাপড়া জানত না, কিন্তু আঠারো বছর বয়সের ফর্সা সুন্দরী ছিল। মহমুদের নজর ওর দিকে যেত না, কারণ সৎ মায়ের পরিবারের ওপর ওঁর বিশ্বাস ছিল না, বিয়াল্লিশ এবং আঠারো বছরের তফাতের কথাও মনে হতো। আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'আদর্শ পত্নী তো জাহিরাই একমাত্র হতে পারবে।' কিন্তু যতক্ষণ অন্য তরুণীরা আছে ততক্ষণ এই শুষ্ক তরুণীকে পোঁছে কে? দাউল ইসলাম-এর পাশের বাড়িতে আর এক সুশিক্ষিত মার্জিত মহিলা ছিল যাকে মনুশ্রাবিণী কাব্যময়ী সুন্দরী বলা যেত। কিন্তু ওর সম্বন্ধ হয়েছিল এরকম একটা লোকের সঙ্গে যাকে দেখে মহমুদ আশ্চর্য হতেন। আমি বললাম, 'আল্লামিয়াঁ তার গাধাদের সামনে আঙুর ছোঁড়ে, এতে তোমার আমার কি এসে যায়?'

আমি আসার কয়েক মাস বাদে মহমুদের সৎমায়ের সঙ্গে তাঁর মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। যদিও মহমুদ চাইছিলেন ভাইদের সাহায্য করতে, কিন্তু তারা সম্পত্তি নিয়ে নানা চাল চালাচ্ছিল। তাহলে তাঁর কি এসে যায় খামোকা বিদেশে এসে ঝগড়া কাঁধে নেবার?

মিটমাট করিয়ে নেবার উদ্দেশ্য ছিল—বিয়েটা যাতে এখন সম্মানের সঙ্গে হয়। তিনি মনে করতেন যে ও এক সুন্দরী তরুণী, শিক্ষিত না হলেও ওর মধ্যে আরো অনেক গুণ আছে তবে তিনি শীরাজ-এর নিজের খানদানের ওপর বিশ্বাস করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু ওঁর বাবা আগা হাশিম ইস্ফাহানীও তো ওই খানাদানে বিয়ে করেছিলেন।

ডিসেম্বরের শেষ অব্দি আর্থিক দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। আমার বন্ধু সরদার পৃথ্বীসিংহ বোম্বাই থেকে হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওদিকে প্রকাশকের থেকেও ৫০০ টাকা এসে গিয়েছিল, দরকার হলে আরো টাকা পাবার সম্ভাবনা ছিল। যখন মিটমাট হয়ে গেল এবং ছোটোবোনের সঙ্গে বিয়ের কথাও প্রায় ঠিকঠাক, তখন সৎমা জোর দিতে লাগল, 'এখানেই চলে এসো। কেন আলাদা থেকে নিজের খরচ বাড়াচ্ছো?'

১৯ ডিসম্বরে চারদিকে বরফ পড়েছিল। আটটা-নটা পর্যন্ত হিমবর্ষা চলতে থাকলো। ওই দিনই এগারোটায় জিনিসপত্র ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে আমরা নাজিমুত্তুজ্জার আগা হাশিম আলী ইস্ফাহানীর বাড়ি চলে এলাম। এখন থেকে পাঁচ মাসের জন্য ইস্মত খানসের এই বাড়ি আমার বাসস্থান হয়ে গেল। মহমুদ একা থাকতেন, তখন তো তাঁর স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাওয়ায় সঙ্কোচের কারণ ছিল না. কিন্তু এখানে আমার সামনে আবার এক সমস্যা হাজির—অনিশ্চিত কালের জন্যে কি করে অতিথি হয়ে থাকি? আমার কাছে এখন টাকা-পয়সাও ছিল, কিন্তু ভারতীয় শিষ্টাচার অনুসারে টাকা পয়সা নিয়ে অতিথি রাখা সেখানেও সম্ভ্রম-বিরুদ্ধ বলে মনে করা হয়। ভবিতব্য মনে করে শির নত করতে হলো। আমি ইস্মত খানমের আতিথেয়তার শোধ টাকা দিয়ে করতে পারবো না। বস্তুত অল্পদিনের মধ্যেই ওই বাড়ি আমার বাড়ি হয়ে গেল। বাড়ির সবার সম্বন্ধে তো বলা যাবে না, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার খুবই ভদ্র এবং মধুর ছিল। এই পাঁচমাসে আমি এক মধ্যবিত্ত ইরানী পরিবারে চব্বিশ ঘন্টা থেকে তাদের খুব কাছ থেকে দেখতে পেলাম। ইস্মত খানম্ খুব ভালো সেতার বাজাতো, তাই প্রায় রোজ রাতে খাবার পরে আমাদের মনোরঞ্জন হতো। এদিকে মহমুদ যখন সম্মানের সঙ্গে বিয়ে করতে তৈরি, তখন তাঁর বড় বোন লেনদেন শুরু করলো। এটাকে কিছু খারাপ বলা যাবে না। যে দেশে পুরুষ যে কোনো সময় স্ত্রীকে তলাক দিতে পারে, সেখানে যদি আর্থিক সুরক্ষার কথা চিন্তা করা হয় তাতে আর আশ্চর্যের কি?

ডিসেম্বরে মহরমের পবিত্র মাস এসে গেল। ইরান শিয়াদের দেশ। সেখানে ইমাম হুসেন শহাদত[১] (বীরগতি)-এর জন্য খুবই মরণ-শোক পালন কর হয়। ২৫ ডিসেম্বর ওই বছরের ইমাম হুসেনের 'রোজেকৎল' আর যীশুর জন্মদিন ছিল। নবীন ইরানে এখন মহরমের জন্য মেয়েদের 'গিরিয়া' (রোদন) এবং পুরুষদের 'সীনাজনী' (ছাতি পেটানো) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খানম্ এর বাড়িতে এক দিন এক মৌলবী ১৫ মিনিটের জন্যে এসেছিল। সে কয়েকটা মর্সিয়া গাইল আর খানম্ কাপড়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদলো।

এখন আমার দিনচর্যা। সকালে সাতটা সাড়ে সাতটায় উঠে হাত মুখ ধোওয়া ও দাড়ি

[১] দেশ বা ধর্মের জন্য মৃত্যুবরণ।—স·ম·

কামানোর থেকে রেহাই, তারপর পরিবারের সঙ্গে পনির-মাখন-রুটি আর তিন গেলাস বিনা দুধের মিষ্টি-চা খাওয়া। আটটা-নটার মধ্যে আমি সেই কামরায় পৌঁছে যেতাম, যেখানে 'কুর্সি'র নীচে পরিবারে লোক বসে থাকতো। শীতের মধ্যে বাড়ি গরম করার দরকার পড়তো। কিন্তু মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান এবং ইরানে কাঠ পাওয়া দুর্লভ, তাই মানুষ 'কুর্সি'র পদ্ধতি বার করেছিল। এক গজ লম্বা, এক গজ চওড়া, এক হাত উঁচু চৌকি হল 'কুর্সি', যার ওপরে চৌকি থেকে দুহাত মাপের লেপ বাইরে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। চৌকির নীচে উনুনে কয়লার আগুন জ্বালানো থাকে যা দিয়ে কুর্সি গরম হয়ে যায়। সবাই ওই চৌকির চারধারে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে বুক অব্দি শরীর লেপের নীচে ঢুকিয়ে দিত। খুব কম খরচে গরম রাখার এটা সুন্দর উপায়। কুর্সির নীচে বসে বসে পড়া বা গল্প করা, এই ছিল কাজ। আমার তো এই গল্পেও খুব লাভ হতো, কেননা সেখানে কেবল ফারসীতেই কথাবার্তা বলা যেত। একটার সময় রাঁধুনি খাবার তৈরি করে আনতো, তাতে মূলত থাকতো তন্দুরের মোটা রুটি, চালের পোলাও, মাংস বা তরকারি, কিছু শাক, ভিনিগার বা ভিনিগারে ডোবানো পেঁয়াজ। কোথাও বাইরে যদি না যাবার থাকতো তাহলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার সেই পড়া, শোওয়া বা গল্প করা। তিনটে-চারটের সময় ফের দু-তিন গেলাস মিষ্টি-চা পাওয়া যেত। সন্ধে সাতটা-আটটায় রাতের খাওয়া হতো, তাতে প্রধানত থাকতো ভাত-মাংস-সবজি, ভিনিগার, রুটি কলবাসা (সসেজ)। খাওয়ার পর পোর্তগাল (মুসম্বী) বা অন্য কিছু ফলও থাকতো। তারপর রাত এগারোটা-বারোটা অব্দি গান-গল্পগুজব চলতো। মহমুদ এবং আমি যে পরস্পরের চিত্তবিনোদনই করতাম তা নয়, আমরা একে অপরের চিন্তার সহায়কও ছিলাম। ধারের লেনদেন মাঝে মধ্যে কড়া চেহারা ধারণ করতো, সে সময় মহমুদ খুব ঘাবড়ে যেত।

জানুয়ারির শেষেও শীত বেশ ছিল। ইরানী শিশু সূর্যদেবীর কাছে প্রার্থনা করতো—

খুর্শোদখানম্ আফতাব কুন্। যক্সের বিরঞ্জ তুয়ে—আব কুন্।

(সূর্যদেবী রোদ দাও। এক সের ভাত জলে ঢালো)

মা বচ্চহয়ে—গুর্গ এম্। অজ-সরমায় মী-মুরেম।

(আমরা নেকড়ের বাচ্চা। ঠান্ডায় মরে যাচ্ছি)

কিন্তু খুর্শীদ খানমের এখন অত শক্তি ছিল না যে বাচ্চাদের আফতাব (রোদ) দেয়। ২ মার্চেও চিনার, সবেদা, আঙুর ইত্যাদি গাছে পাতার কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। ৬ এপ্রিলে সবেদার গাছে এখন পাতা কুঁড়ির মত বেরোচ্ছিল। হ্যাঁ, অন্য কিছু গাছে সবুজ পাতা বেরিয়েছিল।

একদিন ইস্মতখানম্ মহমুদ যে নমাজ পড়ে না তার নলিশ করছিল, 'গুনাহ্ অস্ত, বরায় হর মুসলমান নমাজ লাজিম অস্ত (এটা পাপ, প্রত্যেক মুসলমানের নমাজ পড়া কর্ত্তব্য)।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'হর কসে কি শরাব ন মীখুরদ, বরায় উন নমাজ মাফ অস্ত'। (যারা মদ পান করে নি, তাদের জন্যে নমাজে মাফ)।' আমি জানতাম না যে আমি খানমের কোনো মর্মস্থানে আঘাত দিয়েছি। সে বেশ উত্তেজিত স্বরে বলল, 'তু পৈগম্বর হস্তা' (তুই কি পৈগম্বর?)' সেই সময়ে ৩৪-৩৫ বছরের সুন্দরীর রেগে লাল হয়ে যাওয়া

মুখ দেখার মত ছিল। এখন সকালের চা খাওয়ার সময় ছিল, ঠোঁটে বাজে রঙ চড়ানো ছিল না, গালেও পাউডার আর রুজ তাদের প্রভাব ফেলতে পারে নি। গরম লোহা দিয়ে কোঁকড়ান চুল এখন চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হয় নি আর না ছিল মুক্তোর দু ছড়া হার আর না ছিল বুকে হীরের গুচ্ছাকার সেফটিপিন। মুখ তো ফিকে দেখাবেই কারণ তাকে চকচকে বানানোর জন্য আকাঙ্ক্ষিত অলঙ্করণ ও শৃঙ্গার চা পানের পরের কাজ। খানম্-এর জলাপ্লুত বড়ো বড়ো চোখে লালিমা নেমে এসেছিল। তাঁর উত্তেজিত স্বরে রাগেরও কিছু আভাস ছিল। তার বলা উচিত ছিল, 'শুভা (আপ)।' আর আমি ভগবান নই, কারণ নমাজ মাফ করার কাজ শুধু ভগবানেরই। তারপর সামলিয়ে নিয়ে নম্র গলায় বলল,' 'জগতে ইসলাম সব চাইতে উৎকৃষ্ট আর অন্তিম ধর্ম।' তবে কি খুদা আর ইসলামের উপদেশ দেবে এবার? মহমুদ আর আগা দীমিয়াদ জানতেন যে আমি পুরো নাস্তিক কিন্তু খানম্ সেটা জানতো না। সে জানতো আমি মদ খেতাম না, বৌদ্ধ ধর্ম মানি। বৌদ্ধ ধর্ম কি সেটা ও জানতো না। আমার তো নিজের অসাবধানতার জন্য আফশোশ হচ্ছিল। বিলাসপ্রিয় ইস্মত খানম্-এর মদের খুব শখ ছিল কিন্তু নমাজ দিনে দু-একবার পড়তোই। নমাজ যারা পড়ে তাদের মদ খাওয়া মাফ, যদি তাই বলতাম তাহলে সে খুশি হতো। এমনিতে ও অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মহিলা ছিল। ইমাম হুসেনের সম্বন্ধে মর্সিয়া শুনে ও কান্নাকাটি করতো। যখন আমি শেষমেশ অন্য কোথাও থাকা ঠিক করলাম এবং পাঁচ মাস থাকার পরেও যখন ভিসা পাবার কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না, তখন ও বেশ চিন্তায় পড়ে গেল আর আমার একটু জ্বর আসতেই ও নিজের দাসীকে আমার সেবায় পাঠিয়ে দিল।

দুই বন্ধু

দুই বন্ধুর মানে এই নয় যে ওরা দুজন পরস্পরের বন্ধু ছিল। হয়তো আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে দুজনে একে অপরজনকে দেখেও নি। দুজনেরই বাঙলায় জন্ম, একজনের কলকাতায় আর অন্য জনের তিন-চার পুরুষের কবর হুগলীর কোনো স্থানে আছে।

যোল-সতেরো বছর ধরে ক্যামেরা আমার অভিন্ন সহচর হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ১৯৪৪-এর অক্টোবরে যখন ভারতের সীমা পার হচ্ছিলাম তখন ক্যামেরা কোয়েটাতেই রেখে যেতে হয়েছিল। তাই আমি এই তৃতীয়বার ইরানে ক্যামেরা ছাড়াই এসেছিলাম এবং আমার এই দুই বন্ধুর ছবি নিতে পারি নি—

(১) দীমিয়াদ—দুজনের একজন সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছচ্ছিল আর দ্বিতীয় জন তিরিশ বছরের কিছু ওপরে। বুড়ো আগা আমীর আলী দীমিয়াদ সৌজন্য আর সরলতার প্রত্যক্ষ মূর্তি ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে খানিকটা আদর্শবাদী ধরনের লোকও ছিলেন, যার বুড়ো বয়সে ভারত ছেড়ে তাঁকে ইরান যেতে হলো। মানছি যে তিনি মূলত ইরানী ছিলেন, তবে এই নয় যে, তাঁর খানদানে ইরানী ভাবকে জাগিয়ে রাখার জন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। বলা যায় না ভারতে ওঁর বাড়িতে ফারসী বলা হতো কি না। দীমিয়াদ সাহেব নিজে ফারসী এমন বলতেন যেন ওটা তাঁর মাতৃভাষা। পত্নী বেগম দীমিয়াদকে বয়সে ওঁর

থেকে কুড়ি-বাইশ বছরের ছোট বলে মনে হতো। হতে পারে দুজনের বয়সের মধ্যে ততটা তফাৎ নেই এবং খানম্ দীমিয়াদকে তার শারীরিক গড়নের জন্য কম বয়সের বলে মনে হয়। সেও ভারতে জন্মেছিল। আমি যখন তার বাড়ি যেতাম, তখন সে চেষ্টা করতো আমাকে কোনো ভারতীয় রান্না খাওয়াতে। একদিন হাসতে হাসতে বলছিল, 'আমার তো অযোধ্যার এক তালুকদারের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল।' তরুণী অবস্থায় ও নিশ্চয় খুব সুন্দরী ছিল। দীমিয়াদ দম্পতীর সন্তান-সন্ততি বলতে ছিল একটি পুত্র এবং একটি কন্যা, যাদের শিরায় মা-বাবার রক্তের থেকে বেশি ইরানী রক্তের আবেগ ছিল। যখন ওরা শুনলো এবং পড়লো যে রজাশাহ্ পহলবী নতুন ইরান নির্মাণ করছে, সাসানি আর আখামিদের ইরানে আবার উদ্ভব ঘটছে, তখন তারা ভারতে থাকাটা পছন্দ করলো না। সন্তানের আগ্রহে দীমিয়াদ সাহেব নিজের সম্পত্তি বেচে তেহরানে চলে গেলেন। তিনি খুব বৈষয়িক ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তবে তেহরানে নিজের জন্যে একটা বাড়ি বানিয়ে তিনি ভালোই করেছিলেন। আমার প্রথম ইরান যাত্রায় (১৯৩৫) যখন আমার সঙ্গে দেখা হলো তখন বাড়িটা সম্পূর্ণ হয় নি। তখন বাড়ির আশপাশ ছিল নির্জন। কিন্তু ন বছর পর এখন তেহরান খুব বড় হয়ে উঠেছিল। এখানে একটা সুন্দর পাড়া গড়ে উঠেছিল। এখন এই জগতে আগা দীমিয়াদের বেঁচে থাকার কথা নয়। যদি তাঁর খোদা সত্যিই আছে তাহলে তাঁকে তার বেহেস্তে কোনো এক ভালো বাড়িতে পাওয়া যাবে, যা তাঁর তেহরানের বাড়ি থেকে খারাপ হবে না। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের দুজনের মতামতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। ওঁকে তো কট্টর মুসলমান বলা উচিত না, কারণ ওঁর মধ্যে অসহিষ্ণুতার লেশ মাত্র ছিল না, বরং তিনি ছিলেন এক সাচ্চা খোদার বান্দা। বুড়ো বয়সে ওঁর চলাফেরা করাটা সহজ কাজ ছিল না, তবুও নমাজ পড়ায় কামাই কমই হতো। ওদিকে আমি তো খোদাকে সোজা তিরস্কার করতাম। তিনি জানতেন যে যদি খেদার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়ে যায়, তাহলে আমি তার মুখের ওপরই দু-চার কথা না শুনিয়ে ছাড়ব না। তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে একান্ত আপন মনে করতেন। যখন আমি সাত মাসের প্রতীক্ষার পর রাশিয়া যাচ্ছিলাম তখন তিনি একটা খাম আমার হাতে নিঃশব্দে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে ছিল ইংরেজিতে লেখা একটা কবিতা, যেটা দীমিয়াদ সাহেব নিজে লিখেছিলেন, তাতে আমার মিছিমিছি প্রশংসা করা হয়েছিল।

দীমিয়াদ সাহেব ছিলেন ভালো পাঠক এবং সংস্কৃতিবান পুরুষ। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নামকরা ডাক্তার, ভালো সরকারি চাকরি করতেন। ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন সেখান থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসবে বলে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর মাঝপথে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে চলে আসতে হলো। তাঁর সম্পর্ক মূলত ছিল কলকাতার সঙ্গে, কিন্তু শেষ অব্দি তিনি লক্ষ্ণৌ চলে এসেছিলেন। ফারসী তো ছিল ওঁর ঘরের ভাষা। লক্ষ্ণৌ শিয়া কলেজে থাকাকালীন খেয়াল হল উর্দু ভাষায় এম· এ· করার। কিন্তু লক্ষ্ণৌ অথবা আগ্রা ইউনিভার্সিটি থেকে এম· এ· করা মুশকিল ছিল। দীমিয়াদ সাহেব বললেন, 'আমি ভাবলাম কলকাতা ভালোই হবে। পড়েছিলাম সামান্যই কিছু, কিন্তু

পরীক্ষার্থী কম ছিল। অধ্যাপকের কাজ ছিল ওদের উৎসাহ বাড়ানো, অন্যথায় পরীক্ষার্থীর অভাবে ওদের নিজেদের মাথায় বিপদ না ঘনিয়ে আসে।' যাইহোক, দীমিয়াদ সাহেব পাস করে গেলেন, তাও কলেজ ছাড়ার কুড়ি বছর বাদে। একদিন বলছিলেন, 'কামরূপ ট্রেনটা ধোঁকা দিল, না তো ব্যারিস্টর না হলেও পি· এচ· ডি· তো হয়ে যেতাম।' জার্মানি না হল্যাণ্ড কোনো এক শহরের নাম বলছিল যেখানে পি· এইচ· ডি· ডিগ্রি ডাক-টিকিটের মত সুলভ ছিল।

ন বছর আগে যখন দেখা হয়েছিল, তখন দীমিয়াদ সাহেবের মধ্যে পুরো কর্মশক্তি ছিল। ওই সময় আমি তাঁর বাড়ি থেকে দুমাইলের মধ্যে থাকতাম আর তিনি সেখান থেকে আমার কাছে সংস্কৃত পড়তে আসতেন। বাংলা খুব ভাল বলতেন, স্কুলে কখনও সংস্কৃতও অল্পস্বল্প শিখেছিলেন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় ভেবেছিল যে সংস্কৃত ভাষাকেও পাঠ্যবিষয় করা হোক। সেই সূত্রেই দীমিয়াদ সাহেবের একটুখানি সংস্কৃত শেখার শখ হলো। কিন্তু তিনি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বয়সের ছাপ চোখেও পড়েছিল। স্মৃতিশক্তিও লোপ পাচ্ছিল, ইন্দ্রিয় ছিল শিথিল, এমন কি প্রস্রাবের বেগ সামলানোটাও নিজের হাতের মধ্যে ছিল না। তেহরানে যুদ্ধ চলাকালীন তিনি এমন দেশে ছিলেন যেখানে জিনিসের দাম ছিল প্রচণ্ড। কিভাবে সেখানে তিনি জীবন কাটিয়েছেন তা বোঝাও খুব মুশকিল ছিল। ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজি পড়ার দরুন তিনি অ্যাংলো ইরানীয়ান পেট্রোল কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিলেন, যা দিয়ে কোনোভাবে দিন কাটাতেন আর বাবার কাছ থেকে দূরে কোথাও থাকতেন। মেয়ে তাহিরা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি· এ· পাস করেছিল, কিন্তু তেহরান গিয়ে ওকে ফের পড়তে হয়েছিল, কেননা সেখানে সব কিছু ফারসীতে পড়ানো হতো। বাবা এদিকে নাস্তিক রাহুলের জন্যে কবিতা লিখে ছিলেন, ওদিকে মেয়ে শৈশবের সুপরিচিতা 'রুদগোমতী' (গোমতী নদী)-কে নিয়ে ফারসী ভাষায় একটা কবিতা করেছিল, যা আমি ওখানকার এক ইরানী পত্রিকায় পড়েছিলাম। বাবাকে জোর করে ইরান পাঠিয়ে দেবার মূলে ছেলেমেয়ের খুব হাত ছিল। যাকগে, ছেলে তো এখন ওখানে বিয়ে করে ইরানেরই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাহিরা ইরানে দশ বছরেব কাছাকাছি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিল—'আমি ইরানে বিয়ে কখনও করবো না।' আমি ওখানে থাকতেই হায়দ্রাবাদের এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই আমার চিন্তা হতো আগা দীমিয়াদকে নিয়ে। তাঁর জীবন ছোটবেলা থেকে প্রৌঢ়াবস্থা অব্দি কত সুখের ছিল, যদিও তার মানে এই নয় যে তিনি বিলাসপ্রিয় ছিলেন। আজ জীবনের সন্ধ্যায় নিজেকে তাঁর অসহায় মনে হচ্ছিল। স্ত্রীকে উপেক্ষা করার দোষ ওঁকে ঠিক দেওয়া যেত না, কিন্তু যখন প্রাচুর্যের জীবনে বড় হওয়া এক মহিলাকে ধর্মকর্ম-রান্না-জল আনা-পশুপালন সব কাজ করতে হয়, তখন তো কিছুটা নীরস ভাব এসেই যায়।

দীমিয়াদ সাহেবের কোনো ভালো পোশাক ছিল না। সারা জীবন তিনি বড় আত্মসম্মানওলা ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে এমনই বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইছিলেন যারা তাঁর পোশাককে নয়, হৃদয়কে দেখবে।

(২) আব্বাসী—তিনি আমার আরেক বন্ধু, যাঁর সঙ্গে তেহরান পৌঁছনোর দ্বিতীয় দিনেই (৯ নভেম্বর ১৯৪৪) পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ দূতবাসে রিজবী মশায় আব্বাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমরা দুজনে এক সঙ্গে বাইরে বেরোলাম। না তাঁর কোনো কাজ ছিল, না আমার। তাই কথা বলতে বলতে কিছু দূর গেলাম আর তার মধ্যেই আব্বসী আমার গভীর বন্ধু হয়ে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, 'স্ত্রী তার নিজের মায়ের কাছে থাকে আর আজকাল আমিও সেখানেই থাকি। এই ঘরটা খালি পড়ে আছে, যার ভাড়া মাসিক তিরিশ টাকা।' হোটেল-মালিককে রাত কাটানোর জন্য ১৩ টাকা (সেই সময় ইরানী তুমান আর টাকার একই মূল্য ছিল।) ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র নিয়ে খায়াবান ফরিস্তার সেই বাড়িতে চলে এলাম। ঘরটা খারাপ বলা যাবে না। আমি স্বস্তির নিশ্বাস নিলাম। তৃতীয় দিন থেকে আমি নিজের খরচ কমিয়ে ফেললাম। শুকনো রুটি পনির আর অল্প একটু মখন দিয়ে কাজ চালাতে চাইছিলাম। কিন্তু সেদিনই ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে আনা ১২৮ তুমান থেকে ৫০ তুমান ধার শোধ দিতে আর ১৫ তুমান নিজে ধার নিয়ে নিল। আমার কাছে রইল ৬৩ তুমান। সেই সময়ে জনতাম না যে আমার পকেটে ৬৩ তুমান আর সামনে ৭ মাস পড়ে আছে। এক-দুদিন বাদেই জানতে পারলাম, আব্বাসী ভাড়াও বাকি রেখেছে। আমার হাসিও পাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে রাগও হচ্ছিল—রোজা ভাঙতে গেলাম আর নমাজ চেপে বসল। আব্বাসীর ওপর রাগ দেখলাম, কিন্তু অল্পই, কেননা যদি আব্বাসী ৫০ তুমান নাও নিত, তাহলেও আমার সামনের অন্ধকার আলোকিত হতো না।

আব্বাসীর এই রূপ সেই সময় খুব ভালো লাগে নি।

আব্বাসীকে লোকে কখনও সত্যিসত্যিই পাক্কা শয়তান বলতে পারত। কারণ তিনি অন্ধকারে লাফাতে পারেন, এমন তরুণ ছিলেন। যে সময় লাফ দেবার তালে থাকতেন, সেই সময় তাঁর খেয়ালও থাকতো না যে তাঁর ধাক্কায় আরেকজনও অন্ধকার গর্তে পড়ে যাচ্ছে। এখন তার বয়স ৩০-৩২ এর বেশি হবে না, কিন্তু এই ক বছরের তাঁর জীবনী যদি তিনি লিখে ফেলেন তাহলে সেটা খুব রোমাঞ্চকর হবে। হ্যাঁ, আব্বাসীর কথায় কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে তা জানা মানুষের পক্ষে কষ্টকর ছিল, তবুও যদি ছ-সাত মাস পর্যন্ত সম্পর্ক থাকে, তাহলে সত্যি-মিথ্যের পরখ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাঁর শয়তান হওয়া ছবির একটাই দিক ছিল, অন্যদিকে তিনি পুরোপুরি দেবতাও ছিলেন। পয়সাকড়ির লোভ তাঁকে ছোঁয় নি। যদি তিনি 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ঠবত্'[১] ছিলেন, তাহলে নিজের ধনকেও খুব বড়ো করে দেখতেন না। আর কষ্ট ও অসুখে পড়া নিজের পরিচিত বা বন্ধুর সেবায় একপায়ে খাড়া হয়ে থাকতে পারতেন। তিনি ছিলেন বোস (বাঙালী)। ফৌজে ভর্তি হয়ে হাসপাতালের সেনার সঙ্গে জমাদার হয়ে তেহরানে চলে গিয়েছিলন। সেই সময় লড়াই-এর জমানায় লক্ষ্মী বহে যাচ্ছিল, শুধু হাত বাড়িয়ে সংগ্রহ করার বুদ্ধির দরকার ছিল। হাসপালের ওষুধ চোরা বাজারে সোনার দামে বিক্রি হচ্ছিল। মাল কিনতে

[১] 'অন্যের দ্রব্য মৃত্তিকা পিণ্ডের ন্যায়।'—স·ম

বানিয়াদের কাছ থেকে মোটা টাকা পাওয়া যেত। আব্বাসী যে এই প্রথা চালু করেছিল তা না। তিনি তো সেই সমস্ত মেশিনে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, যার একটা অঙ্গ ছিল ওটা। আব্বাসী কয়েক হাজার কামিয়েছিলেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করলে সে টাকা এক লাখের কিছু কম হবে। কিন্তু দশ-কুড়ি হাজার তো তিনি অবশ্যই রোজগার করেছিলেন আর তা সেইভাবেই উদারহস্তে তেহরানে খরচ করেছেন। সেই সময়েই তেহরানের কোনো এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রেম হয়। আব্বাসী তার নামে একট বাড়িও কিনে দেন, আরো কিছু টাকাও দিয়ে দেন। কিন্তু এইভাবে বেশি দিন চলে নি। ফল এই হলো যে সেনা থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হলো, আর তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে কলকাতা চলে এলেন।

কলকাতায় বসে বসে আবার মাথা ব্যথা শুরু হল, কারণ তাঁর একটা মেয়ে হয়েছিল, আর বউও প্রেমের শপথ বাক্য শোনাচ্ছিল। আব্বাসী ঠিক করলেন যে, ইরানে গিয়ে বউ-মেয়েকে নিয়ে আসবেন, কিন্তু বোস হবার দরুন তিনি নিজের বিয়েকে বৈধ করাতে পারছিলেন না। কলকাতায় তিনি মুসলমান হলেন, মুসলমান হবার বার্তা গেজেটে ছাপালেন। নাম হলো আব্বাসী। সেই নামে তিনি ফের পাসপোর্ট বানালেন আর পাঁচ-সাতশো টাকা, কিছু কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে তেহরান পৌঁছলেন। ইরানী পত্নী কখনও যাওয়ার কথা বলছিল, আবার কখনও তা অস্বীকার করছিল। এই রৌদ্র-ছায়ায় তাঁর তিন-চার মাস কেটে গেল। সঙ্গে যা টাকা ছিল খরচ হয়ে গিয়েছিল, কাপড়-চোপড় বেচে বেচে কোনো রকমে কাজ চালাচ্ছিলেন। বেচারা বাড়ি ভাড়া কোথা থেকে দেবেন? এই সময় আমি ভাগ্য দোষে তেহরানে এসে ফেঁসে গেলাম।

এবার আব্বাসীর জীবনের পেছনদিকটা দেখা যাক। আমি যা বললাম, আব্বাসীর কথার মিথ্যে থেকে সত্যকে আলাদা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন তো অবশ্যই ছিল। তাই এ কথা বলা যাবে না যে, সত্য ভেবে যা আমি লিখলাম, ওর মধ্যে মিথ্যের অংশ একটুও নেই। বোস ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার কোনো একটি কলেজে পড়তেন, কিন্তু তাঁর আমোদপ্রিয় শরীর বই-এর পাতায় মন লাগাতে দেয় নি। খাওয়া-পরা ঘরের ছেলে। বাড়ির থেকে কিছু টাকা উড়িয়ে সিঙ্গাপুর গিয়ে পৌঁছলেন। শারীরিক পরিশ্রমের কাজের জন্যে আব্বাসী অতটা তৈরি ছিলেন না, কিন্তু কোনো কাজই তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। আব্বাসীকে কেউ মৌনী বলতে পারবে না, আবার তিনি খুব বেশি কথাও বলতেন না। তাঁর মুখের মধ্যে একটা সাদাসিধে ভাব ছিল। বিরাট উদারতা প্রদর্শনের ফলে যদি তাঁর কোনো বাধা আসতো, সে বাধা ছিল হাত খালি থাকার বাধা।

সিঙ্গাপুরে কয়েক মাস থাকার পর তিনি সামনের পথ ধরলেন এবং সিন্দাবাদ নাবিকের মত দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় চক্কর মারতে লাগলেন। জাভাতেও গিয়েছিলেন, ফিলিপাইন, হংকং এবং সাংহাইও গিয়েছিলেন আর হয়তো ইন্দোচীন এবং শ্যাম দেশও। কখনও কোনো দোকানে সেলসম্যানের কাজ করেছেন, কখনও ফেরিওলার কাজ, কখনও কোথাও কেরানিগিরিও করেছেন। যখন উদার-হস্ত থাকেন আর ভালোমন্দ বন্ধুর সংখ্যাও যথেষ্ট থাকে, তখন খরচ করার জন্যে বৈধ নিয়মে রোজগার করা পয়সায় কেমন করে চলে? সেলসম্যান থাকাকালীন তিনি দু জায়গার থেকে মোটা টাকা সরিয়ে ছিলেন এবং

কিছু দিনের মধ্যেই তা খরচও করে ফেলেছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগের পাঁচ-সাত বছর যখন তিনি সিন্দাবাদ নাবিক হয়েছিলেন, তখন কতবার হাজার হাজার টাকা তাঁর হাতে আসতো আর খরচ হয়ে যেত। জগতের তিক্ত-মধুর অনুভব তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল।

যুদ্ধ শুরু হতেই প্রায় খালি হাতে তিনি কলকাতা ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি কি এক জায়গায় থাকার মানুষ? ফৌজে লোকের খুব চাহিদা ছিল। তাতে ভর্তি হয়ে লক্ষ্ণৌ চলে এলেন, সেখানে কিছুদিন যুদ্ধের নিয়মনীতি ও প্যারেড শেখার পরে তাঁকে তেহরান পাঠানো হলো।

আমি যখন আব্বাসীর গল্প শুনলাম, তখন ভাবতে লাগলাম এই মজনুর লায়লাও কোনো সাধারণ নারী হবে না, সে অবশ্যই কোহেকাফ[১]-এর কোনো পরী হবে।

আব্বাসীর সঙ্গে পরিচয় হবার হপ্তা খানেকের মধ্যেই একদিন খানম্ আব্বাসীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আব্বাসী পরিচয় করিয়ে দিল। আমি বিস্মিত হলাম—পঁচিশ ঘাটের জল খাওয়া মজনু এমন কুৎসিত মহিলার প্রেমে পড়লো! খানমের মুখ তার শরীরের অপেক্ষায় বড় আর তেল রাখা চামড়ার পাত্রের মত ফোলা। তার ওপরে বসন্তের দাগ ওকে মশলা বাঁটা শিলের নোড়ার মত করে ছেড়েছিল। গায়ের রঙ ফর্সা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভাড়া বাকি থাকার খবরটা শোনার পরই আব্বাসীর কৃপায় পাওয়া বাড়ি ছাড়ার জন্যে আমি উতলা হলাম আর মনে করুন এটা আমার সৌভাগ্য যে দু-তিন দিন বাদেই আমি নিজের নতুন পাওয়া ছল-ছুতোহীন বন্ধু মহমুদ-এর বাড়িতে চলে গেলাম। আব্বাসীর ওপর আমার কোনো অভিযোগ ছিল না, তিনি বরাবর যখন-তখন আমার সঙ্গে দেখা করতেন। আমার এটা ভাবতে কষ্ট হতো যে, আমার তেহরান ছাড়ার সাত মাস বাদেও তিনি সেই অনিশ্চিত অবস্থায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। এখনও তাঁর আশা ছিল যে হয়তো তাঁর স্ত্রী যাবার জন্যে রাজি হবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস ছিল না। আব্বাসী কলম পেশা বাঙালী পরিবারের ছেলে ছিলেন, তাই বেচাকেনার কাজ তাঁর প্রকৃতির অনুকূল ছিল না, তা না হলে তেহরানে না খেতে পেয়ে মরার কোনো দরকার ছিল না। তেহরান-প্রবাসের অন্তিম সপ্তাহে আমি আমার বন্ধুর শ্বশুর বাড়ির পাশে এক হোটেলে থাকতে লাগলাম- এখন ভারত থেকে আমার কাছে টাকা এসে গিয়েছিল। সেখানে আমি একটু একটু জ্বরে পড়লাম। দেখাশোনার ব্যবস্থা না হওয়াতে আব্বাসী আমাকে নিজের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে তুললেন। একটাই ঘর ছিল, যার মধ্যে ওঁর স্ত্রী, শাশুড়ি আর এক শালী এক সঙ্গে থাকতো। আমি না না করা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ওখানে নিয়ে গেলেন। সেই সময় রোগীকে শুশ্রূষা করার রূপ তাঁর দেখার মত ছিল। আমিও একটি অত্যন্ত গরিব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারকে একদম কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। তাঁর এক শালীর বিয়ে কয়েক হপ্তা আগেই হয়েছিল, তাতে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। আব্বাসী তাঁর শাশুড়িকে খুব মানা করেছিলেন যাতে এই ধরনের আফিমখোরের সঙ্গে বিয়ে না দেওয়া হয়। কিন্তু

[১]ককেশাস পাহাড়, যার সৌন্দর্য প্রসিদ্ধ।—স·ম·

শাশুড়ি বেচারিই বা কি করে? যা হোক করে একটি মেয়ের বোঝা তো মাথার থেকে নামছিল। মেহরী খানমের (আব্বাসীর শালী) বিয়ে দুমাসও হয় নি, এমন সময় আফিমখোর স্বামী গালাগাল আর মার শুরু করলো।

৩ জুন ১৯৪৫-এ যখন আমি তেহরান ছাড়লাম তখন মেহরী খানম্‌কে তালাক দেবার সময় হয়ে গিয়েছিল। আব্বাসী ৫০ তুমান সেই সময় নিয়েছিলেন, যখন আমি একরকম উপবাস নিয়ে আনন্দে আছি। তখন এটা আমার মোটেও ভালো লাগে নি কিন্তু আমি স্বীকার করি, আব্বাসীর সৌহার্দ এবং সেবার মনোভাবের দাম তার থেকেও বেশি।

ইরানী বিয়ে

১৯৪৪-৪৫-এর শীতে আমাকে সাত মাস ইরানের রাজধানী তেহরানে থাকতে হয়। ওখানে আমার দেশভাই কিন্তু ইরান জাতীয় প্রকৃত বন্ধু মির্জা মহমুদের সঙ্গে দেখা হলো, যার উপকার কোনো মতেই আমি চুকিয়ে দিতে পারবো না। তখনকার বেশির ভাগ সময়টাই আমি এক ইরানী মধ্যবিত্ত পরিবারে বসবাস করি যার গৃহকর্ত্রী ছিল মহমুদের সৎমা। যার বোন মহমুদের ভাবী পত্নী হতে যাচ্ছিল। মহমুদের সঙ্গে সম্বন্ধের কারণে আমিও ওই পরিবারের প্রায় একজন হয়ে গেলাম। খানম্‌ তেহরানের সুন্দরীদের মধ্যে একজন ছিল। বয়স চল্লিশের কাছে হওয়া সত্ত্বেও তার সৌন্দর্য খুব মলিন হয় নি। ওর খুব ইচ্ছে ছিল যে ছোট বোন ইজ্জতের বিয়ে মহমুদের সঙ্গে হোক। শর্ত বড্ড কড়া ছিল। কখনও দেখা গেল বিয়ে একেবারে ঠিক, আবার হঠাৎ কোনো এক শর্ত তা একেবারে ভেঙে দিচ্ছে। ৯ মার্চ (১৯৪৫)-এ বিয়ে পুরোপুরি পাকা, নিমন্ত্রণপত্রও ছেপে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু বিকেল চারটেয় যখন আমি বেড়িয়ে ফিরলাম তখন জানতে পারলাম যে বিয়ে ভেঙে গেছে। শর্তগুলোর মধ্যে দুটো ছিল—ইজ্জতকে অন্য দেশে (ভারতবর্ষ) নিয়ে যাওয়া চলবে না, আর ছ মাস পর্যন্ত খরচ-খরচা না দিলে আপনিই বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার জন্মে যাবে। মহমুদের বাবা ইস্ফাহান কোনো সৌদাগর বংশের ছিলেন, যে বংশ কয়েক পুরুষ ধরে ভারতে বসবাস করছিল, তাহলেও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ভেঙে যায় নি। মহমুদ ভারতেই জন্মেছিলেন, ভারতীয় মায়ের সন্তান, তিনি নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই জন্য কবালায় (বিবাহ-পত্র) এইরকম শর্ত লিখতে রাজি ছিলেন না। পরের দিন মহমুদের আগ্রহ দেখে খানম্‌কে আরো নীচে নামতে হলো। মহমুদ এই শর্ত মেনে নিলেন যে, ইজ্জতের অমতে তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে না। ১৩ মার্চ বিবাহের দিন স্থির হলো।

ভারতের মধ্যবিত্ত পরিবারের মত ইরানেও বিয়েবাড়িতে টাকা নষ্ট করাটা হোলিখেলার মত। খুব জাঁকজমক করে বিয়েটা হোক, এর ওপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছিল। মহমুদ কঞ্জুষ একেবারেই ছিলেন না, তবে বাজে খরচ করতেও পছন্দ করতেন না। কিন্তু এখন তো হাঁড়িকাঠে মাথা পড়ে গেছে।

বিয়ের আসর—এখানে একদিকে বরবধুর জন্যে দুটো সাধারণ চেয়ার রাখা ছিল, একটি টেবিলের ওপর ছিল সুগন্ধ দ্রব্য, ব্রাস, আয়না আর ড্রয়ারে গয়নার বাক্স। চেয়ারের সামনে টেবিলে কোরানের একটি গ্রন্থ, তস্বীহ (মালা) নমাজ পড়ার মোহর, দেবদারুর সবুজ পাতা আর ফুল রাখা ছিল। ডানদিকে প্লেটে একটা শীরীনী (বিট)। এখানেই কাঠের একটি লম্বা রেকাবি (তস্তরী) ছিল, যেটা বিশেষভাবে সাজানো। এর চারদিকে মোমবাতি জ্বালানোর জন্যে চারটে মানুষের দীপাধার ছিল আর তার পাশেই কাঁচের ফুলদানিতে ছিল দেবদারুর সবুজ পাতা। বিয়ের সময় ইরানে দেবদারু পাতার অতটাই গুরুত্ব যতটা আমাদের এখানে আমপাতার। বিয়েতে দর্পণ-দানও খুব শুভ বলে মানা হয়। চেয়ারের সামনে টেবিলে রূপোয় মোড়া ফ্রেমে একটি বড় আয়না রাখা ছিল, যার দুদিকে মোমবাতির মত দেখতে বিজলীর দীপাধার রাখা ছিল। এখানেই ডানদিকে মুসলমান হবার আগের ইরানের বিবাহ-প্রথার সবশেষ স্বরূপ কাঠের নৌকোয় খড়্গাকার দেড় হাত লম্বা কেক রাখা ছিল। কেকের ওপর ভালো নক্সা কাটা ছিল। ফুল পাতা আর অক্ষর ছিল সবুজ রঙের এবং জমি ছিল লাল। শ্যামলিমাকেও জীবনের মূল (মায়া-জিন্দগী) বলে ধরা হয়। কেকের নীচে আর ওপরের ভাগে দেবদারু বৃক্ষকে আঁকার চেষ্টা হয়েছে, যার মধ্যে তিন ভাগে নীচের কথাগুলো লেখা—

শুক্র ইজদ কি বখ্‌ত-য়ার আমদ
(ধন্য ভগবান, বন্ধুর ভাগ্য ফিরল)
মুবারক বাশদ (মঙ্গল হোক!)

জোহা বা মুশ্‌তরী কনার আমদ (শুক্রদেবী বৃহস্পতির কাছে এলো)

দ্বিতীয় ঘরটি ছিল বরবধু আর তাদের নির্বাচিত বন্ধুদের ভোজনের জন্যে। এখানে টেবিলে দশজনের চামচ, কাঁটা, প্লেট ইত্যাদির সঙ্গে মদিরার পেয়ালাও সাজিয়ে রাখা ছিল। তৃতীয় ঘরটি ছিল ফুলশয্যার (জলওয়া): দরজায় টাঙানো ছিল সুন্দর রেশমী পর্দা। নতুন খাট-তোষক-বালিশ, রেশমী লেপ ইত্যাদি দিয়ে খুব করে সাজানো হয়েছিল।

চতুর্থ ঘরে অতিথি আপ্যায়নের জন্যে চেয়ার রাখা হয়েছিল।

১৩ মার্চ। এখনও শীত চলে যায় নি। এই বছর বেশ কবার হিমবর্ষা হয়েছিল যার জন্যে জাঁকিয়ে শীত নেমেছিল।

আমাদের দেশের মত ইরানেও বিয়ের নাচ-গান বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। এটা মূলত মেয়েদের কাজ যদিও ইরানে এখন পর্দা না থাকায় পুরুষদেরও এই আনন্দ গ্রহণে কোনো বাধা নেই। বাজনার মধ্যে বড় খঞ্জনী আর কলসির মুখের মত একদিক খোলা চামড়ায় মোড়া ঢোল ব্যবহার করা হয়। ইরানী মেয়েদের গলা কোকিল-কণ্ঠ নয়—এটা বলা যাবে না, কিন্তু ওদের সঙ্গীত ভারতীয় কানের জন্যে নিশ্চয় একটু কর্কশই মনে হয়। গানের কথা আমাদের এখানের মতই ছিল সরল, কখনও কখনও দুটো দলে ভাগ হয়ে গাওয়া হয়। একটি গানের প্রথম পদ ছিল—

খানম্‌ অরুসে। মগ না মীদুনী কী এ?
(শ্রীমতী কনে, আমি জানি না সে কে?)

পরের পঙ্‌ক্তিগুলো ছিল—

জুজা খরুমে।	মগ না মীদুনী কী এ?	(মুরগির বাচ্চা)
আগা দামাদে	”	(শ্রীমান বর)
শাখে শমশাদে	”	(দেবদারুর শাখা)
আগা সরহংগে	”	(শ্রীমান মেজর)
রইসে হংগে।	”	(যুদ্ধের সরদার)
আগা সরগুর্দে।	”	(শ্রীমান কর্নেল)
দিলে-মা বুর্দে।	”	(আমার মন চুরি করে নিয়ে গেল)

মেজর বরের ভগ্নীপতি আর কর্নেল সম্বন্ধী। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই ভাবেই বর-বধুর যত আত্মীয়-স্বজন ছিল ওরা সবাই মিলে জুড়ে জুড়ে গানটাকে বড় করে চলেছিল। একটুক্ষণ গান হয়ে তারপর শুধু বাজনা বাজতো আর দশ-বারো বছরের মেয়েরা নিজেরা নেচে দেখাতো, যার মধ্যে বরের ছোট বোন শামশীর নাচ খুব ভালো হচ্ছিল। গান শেষ করার সময় মেয়েরা মুখে হাত দিয়ে তিলী-লী-লী আওয়াজ করতো। বাঙালীদের বিয়ের সময় উলুধ্বনি দেওয়া হয়। শুভকাজের সময় ভূত-প্রেতকে ঘরের আশেপাশে আসতে না দেওয়ার জন্যই এই ধ্বনির প্রয়োজন।

বিয়ের দিনের মুখ্য কাজ শুরু হয় স্নান থেকে। কনের জন্যে স্নানাগারে (হম্মাম) বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইরানীরা সাধারণত বেশি ফর্সা হয়, তার মধ্যে আবার ১৮ বছরের কনের রং তো সত্যিই গোলাপী, যা সদ্যস্নাতা কেশ আরো বিকশিত করেছিল। বিবাহ বাসরে নিয়ে যাবার জন্যে আজও ওকে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু শয়নঘরে নিয়ে গিয়ে সাজানোর কাজ পরের দিনের সেই সময়ের জন্যে রেখে দেওয়া হলো—যখন বিরাট ভোজ আর বিবাহ মহোৎসব উদ্‌যাপিত হবার কথা। আজ বিয়ের সময় কনে (অরুস) সাদা রেশমীর লম্বা চোগা পরেছিল আর মাথায় ছিল ফুলের অর্ধ চন্দ্রাকার তাজ। জামাই (বর) কালো সুট পরেছিলেন। মাথা খোলা থাকায় টাক ঢাকবার কোনো উপায় ছিল না। দুজনকে চেয়ারে বসাবার আগে আস্পন্দ (ধূপ) বধুর মাথায় উৎসর্গ করে আগুনে ফেলা হলো। এটাও ভূত-প্রেত তাড়ানোর জন্য আবশ্যক ছিল। দুজনেই চেয়ারে বসার পর মেয়েরা নাচগান শুরু করলো, আর মহিলারা তালি বাজাতে লাগল। 'আগা দামাদওলা গানটা অনেক বার গাওয়া তো ছিল সাধারণ ব্যাপার। আজ আরো কিছু লোকগীত শুনতে পেলাম।

চিরা তু তর্কে আশনাই কর দী? বমন বগো চিরা জুদাই কর দী?
(কেন তুই বন্ধুত্ব ছেড়ে দিলি? আমায় বল কেন বিয়োগ ঘটালি?)
নমুদী খ্‌বারে তু এ দিলদারম্‌। বরো কি তর্ক তু সিতমগর করদম্‌?
(তুই নষ্ট করলি প্রিয় আমার। চলে যা, তোর মত নিষ্ঠুরকে আমি ছেড়ে দিলাম।)
বরো কি ফিক্রে—ইয়ারে-দীগর করদম। বিয়া কনারম্‌ তু এ দিলদারম্‌।
(চলে যা আমি অন্য বন্ধুর কথা ভাবছি। আয় আমার কোলে ও আমার উদার প্রেমিক।)

চি রোজহা কি মন ব-য়াদ-তু বুদম। অনীসে মন বুদী ন তাহা বুদম।
(কিভাবে আমি বহু দিন ধরে তোর চিন্তায় ছিলাম। তুই আমার বন্ধু ছিলি, আমি একলা ছিলাম না।)
আজীগত দরম্ তু এ দিলদারম। বদামে-ইশ্‌ক-তু আঁচিনাঁ দরবন্দম।
(আমার প্রণয়ী, তোকে প্রিয় বলে জানি। তোর প্রেমের ফাঁস কতখানি বেঁধেছে আমায়।)
বলে অর্জী শিকঞ্জে মন্ খুর্সন্দম্। নমুদী খার অম তু এ দিলদারম।
(কিন্তু এই বন্ধনে আমি খুশি। তুই ধ্বংস করে দিয়েছিস, তবু আমি প্রেম করি।)
বাদা বাদা বাদা। ইন্‌শা অল্লা মুবারকবাদা।
(হবে হবে হবে। ভগবান চাইলেই মঙ্গল হবে।)
বিয়া বেরবীম্ অজীং বলায়ত মন্ ব তু। দস্তে মরা বগীর ব মন্ দামনে তু।
(আয় এই দেশ থেকে আমি আর তুই চলে যাই। তুই আমার হাত ধর আর আমি তোর আঁচল।)
(বিয়া বখুরিম্ শরাবে-অঙ্গুরে সিয়াহ। এ ইয়ার, মুবারকবাদা। বাদা ইনশা···
(আয়, কালো আঙুরের সুরা পান করি। হে বন্ধু, মঙ্গল হবে, হবে ভগবান চাইলেই···)
ইন হয়াতো উন হয়াত। বে পাচীম্ নুক্রো নবাত্
(এই জীবন আর ওই জীবন। আনন্দ নে···)
বরসরে অরুসো দুমাদ। এ ইয়ার···
(বর-বধুর মাথার ওপর, ও বন্ধু মঙ্গল হোক)
গুল দর আমদ অজু হমাম। সুঁবুরল দরআমদ অজ হমুম।
(ফুল স্নানাগার থেকে এলো। সুঁবুল ও সবের মধ্যে থেকে এলো।)
চাহে দামাদরা বেবী অরুসদর আমদ অজ হমাম। এ ইয়ার···
(জামাই রাজাকে দেখ, কনে স্নানাগার থেকে এলো। হে বন্ধু, মঙ্গল হোক···)
অরুসেমা বচ্চা—সালে সরেশব খওয়াবশ মিয়ায়দ। এ ইয়ার···
(আমার নববিবাহিতা বধূ অল্পবয়স্কা, রাতে ওর ঘুম আসে। হে বন্ধু মঙ্গল হোক)।
গানের মধ্যে একটা ছিল—
দুখ্‌তরে শীরাজী জানম্, জানম্, শীরাজী। অব্রু-তু বমা বেনুমা তাশবম্ রাজী।
(শীরাজের মেয়ে, আমার পেয়ারের শীরাজী, তোর ভ্রূ জোড়া দেখা যাতে আমি খুশি হই।)
অব্রুম্ মীখওয়াহী, চি কুনী বেহয়া পিসর। কমাঁ দরবাজার ন দীদী।
(আমার ভ্রূ জোড়া কেন চাস, নির্লজ্জ ছেলে? বাজারে ধনুক কখনও দেখিস নি কি?)
ইন্থম্ মিশ্ল-উ এ, বলেকিন্ নির্খশ গিরান্-এ।
(এ ও সেইরকমই, কিন্তু এর দাম অনেক।)
শব্ ক্যা নেস্তম্ খানা রোজ বয়া তুয়—বালাখানা।
(রাতে এলে, আমি বাড়ি নেই, দিনের বেলায় আমি ওপরের ঘরে।)

—১৯৪৫—

দুখ্তরে শীরাজী জানম্, জানম্,. শীরাজী। চশ্‌মতু বমা বেনুমা তাশবম্ রাজী।
(শীরাজ-এর মেয়ে, আমার প্রিয়া শীরাজী, তোর চোখ জোড়া আমায় দেখা, আমি খুশি হই)

চশ্‌মম্ মীখওয়াহী, চি কুনী বেহয়া পিসর। নর্গিস দরবাজার ন দীদী।

(আমরা চোখ জোড়া কেন চাস নির্লজ্জ ছেলে? নার্গিস-কে বাজারে দেখিস নি কি?)

এইভাবে দ্বৈতকণ্ঠের গানে কথা জোড়া হচ্ছিল—

দুখ্তর শীরাজী ○ সুরতত্ বমা বেনুমা ○ মখমল দরবাজার ○। মূয়ত্, বমা বেনুমা ○ হল্কা দরবাজার ○ দমত্ ○ কলম দরবাজার ○ লবত্ ○ গুঞ্চা দরবাজার ○ (ঠোঁট তোর, বাজারে কোরক ○)। ○। দনদানত্ ○। সদফ দরবাজার ○। (দাঁত তোর, মুক্ত বাজারে ○)

এর পরে আপাদমস্তক এই ধরনেরই উপমা দিয়ে গাওয়া হয়েছে।

বিবাহ-বিধি—বিকেল সাড়ে চারটেয় পুরোহিত (অখুন) নিজের সাহায্যকারীকে নিয়ে উপস্থিত। যদিও ইরানের নরনারী এখন ইউরোপীয় পোশাক পরে কিন্তু মৌলবী-পুরোহিত পুরনো পোশাক বজায় রেখেছে। অখুনের গায়ে ছিল কালো চোগা আর কালো পাগড়ি। দাড়ি যদিও কামানো ছিল না কিন্তু বেশ ছোট করে ছাঁটা ছিল। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সে বর-বধূর পাসপোর্ট (জাবাজ) দেখলো, তারপর দুটো ছাপা বিবাহের রেজিস্টারে লেখা শুরু করলো। অখুন বিবাহের শর্তগুলো পড়ে শোনালো—'একশো চল্লিশ হাজার রিয়াল মোহর আছে, যার মধ্যে তিরিশ হাজার রিয়াল (তিন হাজার টাকা)-এর গলাবন্ধ (হাঁর) ও দশ হাজার রিয়াল কাঁচের দীপাধারের দাম এবং পঞ্চাশ রিয়াল কলাম্‌মজীদ (কুরান গ্রন্থ)-এর। ইরানের বাইরে বরাবর থাকা বধূর মর্জিতেই সম্ভবপর।' জিয়া ইমামি, নকী এজদি আর সরহংগ আলী আকবর জহাঁগীরী সাক্ষী রইল। বরের স্বীকৃতির পর পুরোহিত দরজার বাইরে থেকেই তিনবার বধূকে শুধালো, 'অরুসখানম্, কবুল দারী?' (বধূ দেবী কবুল করছে?) বধূ খুব আস্তে 'বালে' (হ্যাঁ) বলল। হাফিজের জন্মভূমি শীরাজে যদি বিয়ে হতো, তাহলে মৌলবী জিজ্ঞেস করতো, 'অরুসখানম্, কবুল কেরী?' (দুল্‌হন দেবী কবুল করছো?)।

মৌলবী দক্ষিণা গ্রহণ করে মুখ মিষ্টি করে চলে গেল এবং স্ত্রীলোকেরা ফের ঢোল আর খঞ্জনী নিয়ে 'মুবারকবাদা' আর 'মগনামিদুনী' গান আরম্ভ করলো। চেয়ারে বর-বধূ বসে। লাল-হলুদ রঙের কাগজের গোল গোল টুকরো বর-বধূর ওপর বর্ষাণো হলো। বর-বধূ পরস্পরকে মিষ্টি খাওয়ালো। এইভাবে বিবাহ-বিধি সমাপ্ত হলো।

তারপর একটি ঘরে প্রবল নাচগানের আসর বসলো। দুই বৃদ্ধা—বধূর মা খানম্-বুর্জুস (জ্যেষ্ঠ নারী) এবং খানম্ জমশেদী হুঁকো খেতে লাগল। তিনজন জমশেদী কুমারী ফ্যাশনে পুরো আপ-টু-ডেট ছিল, সেই সঙ্গে নাচে গানেও। তাদের জন্য আসর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তেহরানের প্রসিদ্ধ গায়ক আলীরজীর গান এবং তারচী শাহবাজীর সেতার আরম্ভ হলো। ওস্তাদী গানে আলাপ থাকাটা অনিবার্য। এক তো ইরানী কর্কশ আলাপ আর

তার ওপর আবার পুরুষ কণ্ঠে, আমার তো অসহ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু হাফিজ আর খৈয়ামের গান খুব ভালো করে গাওয়া হচ্ছিল। ঘরে যত লোকের বসা সম্ভব তার তিনগুণ বসে ছিল, উপরন্তু স্পঞ্জের ধূপের তেজ ছিল তীব্র, তাতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। গানের পর ওখানেই খাওয়া-দাওয়া হলো। এখনকার নাচে বর-বধূও শামিল হলো।

আজ ছিল ইরানী বছরের শেষ বুধবার। সন্ধের সময় ছেলেরা প্রাচীন ইরানের হোলি উৎসব পালন করছিল। আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর দিয়ে লাফ দিতে দিতে বাচ্চা ছেলেরা বলছিল—'জর্দিএ মন্ অজ তু। সুর্খি-এ তু অজনম্। (আমার হলুদ বর্ণ তোর থেকে। তোর লালিমা আমার থেকে।)

বিবাহের অন্তিম নিয়ম ছিল 'দস্ত-বদস্ত' (পাণিগ্রহণ)। রাতে বাসর ঘরে নিয়ে গিয়ে সরহংগ সাড়ু বর-বধূর হাত একত্রে রাখলো। আমাদের দেশের মত ইরানেও নতুন আলোয় আলোকিত মানুষ অনেক রীতি-রেওয়াজ ছেড়ে দিয়েছে। আগে হনাবন্দী (মেহেদি) ইত্যাদি কত রকমের নিয়ম মানা হতো।

পরের দিন (১৪ মার্চ) খুব বড় রকমের খাওয়া-দাওয়া হলো। কাজার রাজ বংশের পুরনো বাগানে, যাকে বরের বাবা হাশিম ইস্ফাহানি কিনে নিয়েছিল এবং যে বাগান নাচগানের বহু বর্ণাঢ্য আসর দেখেছিল, সে বহুবছরের উদাসীনতার পর আজ আবার ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। ছবি, ফুলের টব, বিজলীর ঝাড়লণ্ঠন আর সুন্দর ইরানী কার্পেট দিয়ে সাজসজ্জা করা হয়েছিল। আজ গান-বাজনার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তেহরান রেডিয়োর নামকরা গায়িকা রুহন্গীজকে বিশেষভাবে ডাকা হয়েছিল। একটি নামকরা নর্তকীও হাজির ছিল। নিমন্ত্রিত একশোজন স্ত্রী-পুরুষ অতিথি খাওয়া-দাওয়ায় যোগ দিয়েছিল। যদিও তিনটের থেকেই মজলিস শুরু হয়েছিল তবে বর-বধূর বাড়ি থেকে আসতে সাড়ে ছটা বেজে গেল। খাওয়া-দাওয়া আর নাচগান চলল সাতটা অব্দি। বধূ (ইজ্জত খানম্)-কে সমস্ত মেয়েদের থেকে বেশি সুন্দর মনে হচ্ছিল। তাতে অবশ্য সাজানোরও যথেষ্ট হাত ছিল। বধূর নাচ লোকেরা খুব পছন্দ করছিল। বর-বধূকে উপহার দিয়ে ও শুভ কামনা জানিয়ে লোকজন নিজের নিজের ঘরে চলে যেতে লাগল। এই পঙ্‌ক্তিগুলোর লেখক তো ছিল বরের কৌতুক-সচিব, যার অভিমতের কদর দু'ঘরেই ছিল।

রাশিয়ায় প্রবেশ

তৃতীয়বার রাশিয়ায় যাবার সিদ্ধান্ত আমি ১৯৪৩ সালেই নিয়েছিলাম, কিন্তু ইংরেজ সরকার পাসপোর্ট দিতে আজ-নয়-কাল করে এক বছর কাটিয়ে দিল। এরপর আবার ইরানের ভিসা পেতে কয়েক মাস লেগে গেল। শেষ অব্দি যে করে হোক ভারত ছেড়ে

—১৯৪৫—

৮ নভেম্বর ১৯৪৪-এ আমি ইরানের রাজধানী তেহরান পৌঁছলাম। তেহরান পৌঁছতে পৌঁছতে হাতের টাকা-পয়সা প্রায় শেষ। যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম এমনিতেই খুব বেশি ছিল, অথচ আমি ইরানের রাজধানীতে একরকম খালি হাতেই পৌঁছলাম, এতো আগেই বলেছি। কিন্তু দেখা যায় মানবতা সব জায়গায় মানুষকে সাহায্য করতে তৈরি থাকে। মির্জা মহমুদ ইস্ফাহানীর সঙ্গে ওখানে পরিচয় হয়ে গেল এবং আমার আর কোনো কষ্ট রইল না। এর কিছু পরেই ভারত থেকেও টাকা-পয়সা আসতে থাকলো। কিন্তু তবু মির্জা মেহমুদ যে অকপট বন্ধুত্ব দেখালেন আর যে ধরনের ভদ্র ব্যবহার তাঁর সৎমা খানম্ ইস্মত নাজিমী করলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক ভবঘুরে নিজের প্রতি উপকারের প্রতিদান কিভাবে দিতে পারে? দিতে না পারলেও কৃতজ্ঞতার মধুর স্মৃতি তো সারা জীবন রাখতে পারে?

আট নভেম্বর ১৯৪৪ থেকে ৩ জুন ১৯৪৫ আমাকে যে পরিস্থিতিতে দিন কাটাতে হলো, সেটা অসহনীয় প্রতীক্ষাই বলা যেতে পারে। কখন কখনও ভারতে ফিরে আসতে ইচ্ছে করতো, তখন আমার ভারতীয় বন্ধুবর্গ চিঠি দিয়ে আমাকে আরো থাকতে বলতো। আর ওদিকে সোভিয়েত দূতাবাসের চৌকাঠ রগড়াতে রগড়াতে বিরক্তি এসে গিয়েছিল তবু বুঝতে পারছিলাম না--ভিসা পাওয়া যাবে কি না। যুদ্ধের সময় চিঠিপত্রের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আমার বন্ধু সরদার পৃথ্বীসিংহ-এর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এর চিঠি ২৪ মে পেলাম অর্থাৎ বম্বে থেকে তেহরান ৩ মাসের রাস্তা। হ্যাঁ, টেলিগ্রাম সহজেই পাওয়া যেত, কিন্তু তাতে বেশি কথা লেখা যেত না।

৩ মে (১৯৪৫) হিটলার আর গোয়েবল-এর আত্মহত্যারও খবর এসে গেল। ৮ মে জার্মানি বিনা শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করার জন্য কাগজে হস্তাক্ষরও করে দিয়েছিল, কিন্তু আমি এখনও অনিশ্চিত অবস্থাতেই ছিলাম। তবে পরে দূতাবাসের লোকজনদের কথানুসারে আশা একটু হয়েছিল। তেহরানে থাকাও সহজ ছিল না। খরচা ছাড়াও ওখানকার সরকারের অনুমতি নিয়ে চলা ছিল জরুরি।

২৬ মে সোভিয়েত কন্‌সালের কাছে গেলাম। খবর পেলাম ভিসা এসে গেছে। আজকেই আমার পাসপোর্টে সিলমোহরের ছাপও দেওয়া হয়ে গেছে। ইন্তুরিস্ত (সোভিয়েত যাত্রা এজেন্সী)-কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম মস্কো অব্দি উড়ো জাহাজের ভাড়া ৬৬০ তুমান (১ টাকা = ১ তুমান) লাগবে। আর ১৬ কিলোগ্রাম (২০ সের)-এর পর কিলোগ্রাম প্রতি ৬ তুমান মালপত্রের জন্যে লাগবে। আন্দাজ করলাম ৯০০ তুমান খরচ হবে। আমি তো এখন ভাবলাম, কেল্লা ফতে! এবার ২৯ মে ইরানী দফতরে রপ্তানির ভিসা নিতে গেলাম। সেখানে বলা হলো, 'মাল-বিভাগের প্রমাণপত্র আনুন যে আপনি এখানে এতদিন থেকে যা কিছু কামিয়েছেন, তার ট্যাক্স চুকিয়েছেন।' মাল-বিভাগে গেলে বলা হলো, 'দরখাস্ত করুন, খোঁজ-খবর নেওয়া হবে।' আমি তো সোভিয়েত যাত্রা এজেন্সী (ইন্তুরিস্ত) থেকে টিকিটও কিনে ফেলেছিলাম, ৩১ মে এখান থেকে যাবার জন্যে তৈরি ছিলাম। সাধারণত আমলাতন্ত্রর মেশিন সর্বত্র খুব ঢিমেতালে চলে, তার মধ্যে ইরানী মেশিনের তো কোনো তুলনাই নেই।

ওদিকে আমার থাকার ভিসার মেয়াদ আর মাত্র তেরোদিন ছিল। যদি এর পরও থাকতে হয় তাহলে ফের ভিসা নেবার ঝামেলা পোয়াতে হবে। বৃটিশ দূতাবাসে যেতে রিজবী সাহেব কন্‌সালের তরফ থেকে প্রমাণপত্র দিয়ে দিলেন যে আমি এখানে কোনো ব্যবসা করি নি। কিন্তু এটা এখন ফারসীতে অনুবাদ করে ওদের দেবার কথা।

পরের দিন অনুবাদ নিয়ে ফের ইরানী দফতরে গেলাম। খুব দৌড়-ঝাঁপ একাই করতে হলো। সাত মাস তেহ্‌রানে থাকার ফলে ভাষা বোঝার ঝামেলা চুকে গিয়েছিল। তিন-তিনটে অফিসে যাওয়া-আসা করতে হলো। বেলা একটায় যখন কাগজে ঠিক ঠিক সই হয়ে গেল, তখন অফিসওলারা বলল, 'কন্‌সালের শীলমোহরের ছাপ যথেষ্ট নয়, এর ওপরেও সই করে আনুন।' যাকগে, তবুও সেদিন বেলা চারটে নাগাদ সব বাধা-বিপত্তি থেকে ছাড়া পেয়ে খুব খুশি হলাম। ভাড়ার বাঁচা পয়সা রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া বেকার। রাশিয়ায় খরচ করার জন্য একশো পাউন্ডের চেক আলাদাই ছিল, তাই বাকি টাকায় চামড়ার ওভারকোট এবং অন্যান্য জিনিস কিনলাম।

পরের দিন (৩১ মে) ফের আরো কয়েকটা অফিসের ধুলো মাড়াতে হলো, সেসব কাজ দুপুর নাগাদ শেষ হলো।

উড়ো জাহাজ রোববারে (৩ জুন) ছাড়ার কথা ছিল, তাই মালপত্র তোলা আর অন্যান্য কাজকর্ম দুদিন আগেই (১ জুন) চুকিয়ে ফেলার দরকার ছিল। ১৬ কিলোগ্রাম বাদ দিয়ে ৫১ কিলোগ্রাম আরো মালপত্র আমার কাছে ছিল, যার জন্যে ৩২১ তুমান দিতে হলো। মালপত্রে অর্ধেক এমন জিনিস ছিল যা আমি আগে জানলে সঙ্গে নিতাম না। বিমান ২ জুনেই যাবার কথা, কিন্তু পয়লা জুনে জানানো হলো যে আবহাওয়া খারাপ থাকার দরুন কাল বিমান যাবে না। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন তুমান আমার কাছে রয়ে গিয়েছিল, আরো একদিন থাকার মানে তার থেকে আরো খরচ করা, কিন্তু আমি তো মেঘ দেখেই কলসি ভেঙে ফেলেছিলাম।

২ তারিখে খবর নিয়ে জানলাম যে কালকের যাওয়া নিশ্চিত। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যে আমি নিজের সঙ্গে কিছু রেকর্ড নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোয়েটাতে সেগুলো আটকে দেওয়া হলো। তেহরানে যুদ্ধের সময় অনেক ভারতীয় ছিল, যাদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সেই সূত্রে দুটো রেকর্ডও পেয়েছিলাম।

প্রস্থান—৩ জুনের ভোর উপস্থিত। তখনও অন্ধকার কাটে নি—পৌনে চারটের সময় ইন্তুরিস্তের মোটর আমার কাছে এলো। ঘর থেকে মালপত্র আব্বাসী মশাই মোটরে তুললেন। আব্বাসীর সঙ্গে আমার সাত মাসের পরিচয়, আর বোস পদবী তথা আব্বাসী নামের সাহসী তরুণের গুণ ও দোষ সবই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর দোষের থেকে গুণই বেশি দেখতে পেয়েছিলাম, তাই বিদায়বেলায় দুজনেরই আফশোশ হলো।

বিমানবন্দর শহর থেকে দূরে ছিল, যেখানে আমরা চারটে সাড়ে চারটেয় পৌঁছলাম। এজেন্সির পক্ষ থেকে চা খেতে পেলাম। তারপর মালপত্র বিমানে রাখা হলো। সেটা যাত্রীবাহী বিমান ছিল না। ফৌজী বিমান এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে, সেই বিমান

যাত্রী এবং মালপত্র দুই বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটা ছিল আমার প্রথম বিমান-যাত্রা। এই বিমান-যাত্রা সম্বন্ধে আমি বহু ভালোমন্দ কথা শুনেছিলাম। বিমানের দুদিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে কাঠের বেঞ্চি পাতা ছিল, যার ওপর আমরা পনেরো জন যাত্রী চড়ে বসলাম। কি প্রচণ্ড শব্দ! কান ফেটে যাচ্ছিল। আমাদের পাশে কাঁচের জানলা ছিল. যা দিয়ে নীচের মাটি দেখা যাচ্ছিল। যদিও বিমানে তিরিশজন যাত্রীর জায়গা ছিল, কিন্তু যাত্রী যখন এত তপস্যা করার পর ভিসা পায়, তখন সব স্থান কি করেই বা ভরে? অধিকাংশ যাত্রী ছিল মস্কোর বিদেশী দূতাবাসের কর্মচারী। ওদের কাছে যথেষ্ট মালপত্র ছিল, তাই আমি মনে করি বিমান তার পুরো বোঝা নিয়েই নিয়েছিল। গোলাকার ছাদ ছিল মাঝখানে, আমার মাথার এক হাত উঁচুতে। আমার তো বিমানটাকে সোভিয়েত দেশের সরলতার প্রতীক বলে মনে হলো। সিটের আর পায়ের নীচে গালিচা বিছানো নেই তো কি? কিন্তু যেসব বিদেশী যাত্রী ছিল, তারা এই দৈন্য দেখে নাক সিঁটকাচ্ছিল।

বিমানে তোলার আগে ইস্তুরিস্তের লোক আমাদের পাসপোর্ট দেখে নিল—কেউ সেটা আনতে ভুলে যায় নি তো। সকাল পাঁচটা দশ মিনিটে বিমান নিজের তিন চাকায় গমগম আওয়াজ করে মাটি ছেড়ে উঠতে লাগল। প্রথমে তো তরঙ্গিত সমুদ্রে জাহাজের ওঠা-নামার মতোই মনে হতে লাগল। হিমালয় থেকে যেমন নীচে দূরের খেত দেখা যায়, সেরকমই এখানেও নীচে কোথাও কোথাও খেত ছিল। কিন্তু হিমালয় তো সবুজে সবুজ। ইরানী পাহাড় নগ্ন, ভূমিও নগ্ন। মানুষ কোথাও কোথাও পরিশ্রম করে ঝিল তৈরি করে খেত সবুজ করেছে। তারই পাশে পাশে খেলাঘরের মতো ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়ছিল। সম্ভবত এই বিমান আমেরিকার তৈরি, কেননা এতে সব নির্দেশ ইংরেজিতে লেখা ছিল! যুদ্ধের সময় হয়তো মালপত্র আর সৈনিক সরবরাহ করতো।

বিমান উড়ছিল। এখন ককেশাস পর্বতমালার দিকে বিমান অগ্রসর হচ্ছিল, তাই ওপরে উঠছিল, যদিও থেমে থেমে। কোথাও কোথাও নদী দেখা যাচ্ছিল, যেগুলোকে ছোট ছোট নালা মনে হচ্ছিল। পাহাড়কে তো পুকুরের পাড়ের মত দেখাচ্ছিল। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড ঘড় ঘড় আওয়াজ কানে বাজছিল। অন্য কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। আমার সহযাত্রিণী এক মহিলার কান থেকে রক্তও বেরলো, আরেকজনের পেট ব্যথা হলো। জানলাম যে সমুদ্র-পীড়ার মত আকাশ-পীড়া নামেও কোনো বস্তু আছে। অধিকাংশ যাত্রী ছিল নিদ্রামগ্ন—তারা একে অপরের কাঁধ আর শরীরের পরোয়া করছে না, ঠিক ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীদের মত। মৃত্যুচিন্তা কেন আসছে? বিমানে মৃত্যু তো যোগীদের মৃত্যু—মৃত্যুর সম্বন্ধে চিন্তা করারও সময় পাওয়া যায় না।

বিমান খুব ওপরে উঠে গিয়েছিল। মাটির সঙ্গে মেশানো খেলাঘরের মত ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। আমাদের বেশ কিছু নীচে উলটো গতিতে মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছিল। বিমানের লেজের দিকে মূত্রস্থান বানানো হয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে ইংরেজ, আমেরিকান আর রুশই বেশি ছিল। এশিয়া আর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম আমি একলা।

মেঘ কম ছিল। কোথাও কোথাও তা হিমক্ষেত্রর মতন মনে হচ্ছিল। কখনও আমি মানুষের শক্তির কথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম আবার কখনও কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরেটা

দেখার চেষ্টা করছিলাম। যখন বিমান ওপর-নীচ খুব বেগে ওঠা-নামা করছিল, তখন শুধু পেটই না, হৃৎপিণ্ডও মনে হচ্ছিল যেন দুলছে। জুনের প্রথমেই উত্তর গোলার্ধে ঠাণ্ডা পড়ার সময় তো নয়, কিন্তু আমরা দশ হাজার ফুট উঁচুতে উড়ছিলাম। কাজেই শীত কেনই বা লাগবে না? এমনিতে আমি গরম জামা পরে ছিলাম। কোথাও কোথাও মেঘের ভেতর থেকে পাহাড়ের দৃশ্য খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওই দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সামনে থাকছিল, যার থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে বিমান খুব ধীর গতিতে চলছে বা দাঁড়িয়ে আছে।

ছটা বাজছিল, যখন আমরা কাস্পিয়ান সমুদ্রের ওপর পৌছলাম। কাস্পিয়ান গ্রিক ঐতিহাসিক-কাল থেকে এই নামেই পরিচিত, যদিও ইসলামিক দেশে একে 'খিজ্র[১] সমুদ্র' বলা হয়। খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এর পশ্চিম তটে স্বামী হূনবংশী খাজারেরা (কাজার) থাকতো, যার জন্য আরবরা এই সমুদ্রর নাম 'বহরে-খাজার' রেখে ছিল, কিন্তু পণ্ডিতম্মন্য মূর্খরা তাকে খাজার জাতি থেকে আলাদা করে খিজ্র দেবদূতের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। সমুদ্রের নীল জলে আমাদের নীচে যেখানে সেখানে মেঘের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল। বাঁদিকে হিমাচ্ছাদিত ককেশাস পর্বতমালা দূর অব্দি চলে গিয়েছিল। ডানদিকে অনেক দূর শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। বিমান সমুদ্র-তটের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

সমুদ্রতল সমতলের মত মনে হচ্ছিল, যার ওপর ঢেউগুলো গজ-চর্মের রেখার মত দেখাচ্ছিল। পৌনে আটটায় বাকুনগর আর তার পাশের মাইলের পর মাইল তেলকূপের কাঠামোর জঙ্গল নজরে পড়ছিল। আটটা বাজতে মাত্র দশ মিনিটি বাকি ছিল যখন আমরা বাকুর বাইরের বিমানবন্দরে পৌছলাম।

বিমান-ভূমি একদম কাঁচা ছিল। সোভিয়েতবাসীরা জানতো যে যতক্ষণ বিনা শ্রম আর খরচায় কাজ চালানো যায়, ততক্ষণ, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় বিমানবন্দরের পেছনে লাখ লাখ মণ সিমেন্ট ঢেলে কি লাভ? বিমান মাটিতে নামল। এখানে বিমান পাল্টানোর কথা ছিল। আমাদের সব জিনিসপত্র শুল্ক দফতরে গেল। জমা হলো। জিনিসপত্র খুব বেশি ঘাঁটা হলো না। তারপর চার রুবলে এক পেয়ালা চা আর দুটো করে রুটি খেতে পেলাম।

দশটা বেজে পাঁচ মিনিটে আমরা আবার আকাশে উড়লাম। বাকুর ছোট ছোট বাড়ি আর তেলকূপগুলোকে পেছনে ফেলে এলাম। প্রথমে কত দূর অব্দি কাস্পিয়ানের পশ্চিম দিকেই উড়তে থাকলাম, তারপর ভোলগার দক্ষিণ তটে এল। এখানেও ভূমি অনেক স্থানে আবাদহীন। এ ছিল সেই ভূমি যে জার্মানসেনাদের ধ্বংসলীলা কিছুদিন আগেই দেখেছে। এখন কোথাও কোথাও সবুজ পঞ্চায়েতী খেত এবং তার সুবিশাল প্রাঙ্গণ চোখ পড়ছিল। আড়াইটে নাগাদ আমরা স্তালিনগ্রাদ পৌছলাম।

স্তালিনগ্রাদ—স্তালিনগ্রাদ সারা বিশ্বের কাছে এক পবিত্র ঐতিহাসিক স্থান। সারা বিশ্বে জার্মান জাতির বিজয়ী পতাকার সঙ্গে দাসত্বের পতাকাও পোঁতার জন্যে এগিয়েছিল

[১] দীর্ঘায়ু দেবদূত অথবা এমন এক অমর পয়গম্বর, যাঁর অধিকারে বনভূমি এবং যিনি পথহারাদের পথ বলে দেন।—স·ম·

—১৯৪৫—

অপরাজেয় জার্মান ফ্যাসিস্ট। এই স্থানেই তাদের সর্বপ্রথম কড়া শর্তে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এমন প্রচণ্ড পরাজয় যে, তারপর ও পেছনে পালাতে লাগল, কোথাও জিরোবার অবসরও পেল না। স্তালিনগ্রাদে দেখার কি ছিল? ওটাতো একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

জার্মানির পরাজয়ের একমাসও কাটে নি। এখন বস্তুত নগরে বসবাসের কাজ হচ্ছিল না। হ্যাঁ, বসবাসের ব্যাপারে নগর-নির্মাণকারীদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ ঘর ধরাশায়ী হয়েছিল, কারো কারো কাঠামোগুলো শুধু দেখা যাচ্ছিল। দূর অব্দি হাজার হাজার বিধ্বস্ত মোটর আর বিমান জড়ো করা ছিল। প্রায় সবগুলোই ছিল জার্মান বিমান। একটি বিমানের লেজ ভেঙে আলাদা হয়ে পড়েছিল। এর থেকে সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল, যখন এই বিমান নিজে এবং অন্য সঙ্গীদের নিয়ে স্তালিনগ্রাদে মৃত্যু বর্ষণ করছিল। ওই সময়ে জনৈক সাহসী সোভিয়েত বিমানচালক তাদের মধ্যে একটি বিমানের লেজ ভেঙে দিয়ে নিজেকে পড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। স্তালিনগ্রাদে আমাদের নীচে নামার জমি কাঁচা ছিল। আশেপাশে ঘাসে ঢাকা প্রচুর শ্যামলিমা অর্থাৎ ভূমি সরস ছিল। এটা তার বানস্পতিক বৈভব বলে দিচ্ছিল। এখানে কোথাও পর্বত ছিল না। কোথাও কোথাও এক-আধখানা কারখানা আহত ও সুপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। ওদের চিমনিগুলো নির্জীব ছিল। শুধু একটা বড়ো ফ্যাক্টরির চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। এটা আংশিক ভাবে চালু হয়ে গিয়েছিল। পাশে আর একটি কারখানা নিষ্ক্রিয় পড়েছিল। নগর-পত্তনকারীরা ছোট ছোট বাড়িগুলোকে একটু-আধটু মেরামত করে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আমরা যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করলাম। কেউ কেউ এদিক-ওদিক ঘুরে দেখেও এলো। এখন পর্যটকদের ভ্রমণের ঠিকঠাক ব্যবস্থা কি করে হতে পারে? কিন্তু স্তালিনগ্রাদের অজেয় ভূমিতে পা রেখে এটা কি করে সম্ভব, যে আমি কল্পনা জগতে পৌঁছে যাব না? সোভিয়েত দেশ এমন একটা জায়গা, যার ব্যাপারে দুনিয়ায় শুধু দুটো পক্ষ আছে—হয় তার সমর্থক বা প্রশংসাকারী আর নয় তো তার কট্টর শত্রু। মধ্যপথ শুধু কোনো নিরেট মূঢ় ব্যক্তির পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। আমি সদা সোভিয়েতদের প্রশংসাকারী, বরং বলতে পারি, যে সময় ঘোর নিদ্রার পর আমার রাজনৈতিক চোখ অল্প অল্প খোলার অবসর পেলাম, ঠিক ওই সময় আমি বিরোধীদের ঘনঘোর প্রচারের মাধ্যমে রুশ বিপ্লবের খবর শুনলাম, যা আমার মনে নতুন আলো এনে দিয়ে এই দেশের প্রতি এতটা আকর্ষণ উৎপন্ন করলো বা মন কেড়ে নিল, যে ওই জবরদস্তির জন্য আমার কখনও আফশোশ রইল না। আমি বহু বছর ওই দেশে থেকেছি। ওখানকার লোকদের আর সরকারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তেঁতো, মিষ্টি সবরকমেরই অনুভূতি পেয়েছি। ওর গুণগুলো জানি, সেইসঙ্গে ওর দোষগুলোর সঙ্গেও অপরিচিত নই। কিন্তু আমি ওই দোষগুলোর পায়া কখনোও তেমন ভারি পাই নি। সোভিয়েত দেশের প্রতি যে অনুরাগ আর আশা আমি মানবতার জন্যে পোষণ করেছি তাতে কোনোরকমে বাধা আসে নি। ইতিহাস মানে এবং সবসময়ই মানবে যে মানবতার প্রগতিতে সব থেকে বড় এক প্রতিবন্ধক-শক্তি হিটলারের ফ্যাসিজমের রূপে জন্ম নিয়েছিল, তাকে শেষ করার সব চাইতে বেশি

—১৯৪৫—

মঙ্গলজনক কাজ সোভিয়েত জনতা করেছে। আজ (১৯৫১) ছ বছর বাদেও মানবতার প্রগতির রাস্তায় আবার প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানবতাও অনেক দূর এগিয়ে গেছে, খুব সবল হয়ে উঠেছে। ওই সময় জার্মানির পরাজয়ের পর স্তালিনগ্রাদে ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে অনেক রকমের কল্পনা এসেছিল। এই মহান বিজয়ের পর সাম্যবাদের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার পুরো সম্ভাবনা ছিল। আজ আমরা স্বাধীন চীনের নবনির্মাণ দেখছি। এবং তার প্রগতির বেগ দেখে দাঁত দিয়ে আঙুল কামড়াতে হচ্ছে। কিন্তু স্তালিনগ্রাদ যদি নিজের কৃতিত্ব না দেখাতো তাহলে কি এরকমটা সম্ভব হতো?

মস্কোর দিকে—পনেরোটা বেজে কুড়ি মিনিটে আমরা আবার উড়লাম। কাস্পিয়ানের কুল থেকে এই পর্যন্ত ভোলগাকে আমরা আমাদের পথ-প্রদর্শক করে আনছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের পুষ্পক বিমান বাঁ দিকে ঘুরলো। নীচে গাঁয়ের বিশাল খেত শতরঞ্চির মত বিছানো। কোথাও কোথাও রাস্তায় যদি মেঘ এসে পড়তো, তাহলে বিমান তার ওপর দিয়ে যাবার চেষ্টা করতো এবং কিছু সময়ের জন্যে পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্যে চোখ জুড়োত।

পাঁচটার পর আমরা এমন জায়গায় এসে পৌছলাম, যেখানে দেবদারুর জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ধানের সবুজ খেত। ককেশাসের বড় বড় পাহাড়ই যখন ছোট টিলার মত মনে হচ্ছিল, তখন আর এখানকার ছোট ছোট পাহাড়গুলো সম্বন্ধে কি বলতে পারি? গ্রামের ঘরগুলো এখন লম্বা রাজপথের ধারে সারি সারি দেখা যাচ্ছিল।

রাজপথ হয়তো বেশ চওড়াই ছিল, কিন্তু ওপর থেকে আমাদের চোখে সরল রেখা বলে মনে হচ্ছিল। বড় বড় জলাশয় ওপর থেকে ছোট ডোবার মতো দেখাচ্ছিল। সদ্য চাষ করা আর ফসলে ভরা খেতগুলো তাদের রঙ দেখেই পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল। নদী সাপের মতো দেখাচ্ছিল। নীচে চলন্ত ট্রেনকে মনে হচ্ছিল যেন বড় সাপ যাচ্ছে। এক জায়গায় অনেকদূর পর্যন্ত বৃষ্টি-বাদলার ভেতর দিয়ে যেতে হলো। আমাদের বিমানের পাখার ওপর তার ছিটেও পড়েছিল। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মফস্বল শহর এলো।

দেবদারুর জঙ্গল আরো ঘন হলো। সন্ধে সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটে আমাদের কাছে মস্কোর বিশাল প্রাসাদও প্রথমে খেলাঘরের মত মনে হলো, কিন্তু বিমান যত নীচে নামছিল ততই তার সৌন্দর্য এবং বিশালতা বাড়ছিল।

আজকের উড়ান তেহরান থেকে বাকু ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে, বাকু থেকে স্তালিনগ্রাদ ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে, স্তালিনগ্রাদ থেকে মস্কো ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে অর্থাৎ সবশুদ্ধু ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট হলো। বিমান বাকুতে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট আর স্তালিনগ্রাদে ৫০ মিনিট দাঁড়ালো।

বিমান ঘাঁটিতে নামবার সময় আশা ছিল যে তেহরান থেকে ইন্তুরিস্ত লিখে থাকবে, তাহলে মস্কোয় তাদের লোক হয়তো নিতে আসবে, কিন্তু এখানে কারো পাত্তা ছিল না।

ভাষাগত অসুবিধে ছিল। কারণ এর আগের যাত্রায় যা কিছু শিখেছিলাম তাও প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। তেহ্‌রানে থাকার সময়টা রুশ ভাষা শেখার কাজে লাগাতে পারতাম কিন্তু সেখানে দ্বিধায় পড়েছিলাম। কোনো রকমে মালপত্র বিশ্রামাগারে পৌছে দিলাম।

ইন্তুরিস্তকে ফোন করতে চাইলাম, কিন্তু কেউই তাদের ঠিকানা জানতো না। বস্তুত যুদ্ধর কারণে পর্যটকদের যাত্রার ব্যবস্থা করার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাই গত দুবার ইন্তুরিস্তের যা সুব্যবস্থা দেখেছিলাম তা এবার পেলাম না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ওখানে কোনো একজনের প্রাইভেট কার পাওয়া গেল যার ড্রাইভার দুশো রুবলে (প্রায় সওয়াশো টাকায়) হোটেল অব্দি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল। দু-এক জায়গায় জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে ইন্তুরিস্তের হোটেলে পৌঁছনো গেল। 'কামরা খালি নেই। ইংরেজ দূতাবাসে চলে যান।' বলা হলো। ওই সময় ভারতীয় দূতাবাস ছিল না, ইংরেজ দূতাবাসে কোন পরিচয়ের বলে আমি যেতাম? যাকগে, কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটা কামরা খালি পাওয়া গেল।

জিনিসপত্রের দাম প্রচুর। তবে সেইসব জিনিসের যেগুলো রেশনে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি ভেবেছিলাম রাজধানীর নর-নারীর ওপর যুদ্ধের খুব খারাপ প্রভাব পড়ে থাকবে। কিন্তু রাস্তাঘাটের ভিড়ে আমি কারো গায়ে ছেঁড়া জামাকাপড় দেখি নি। কারো চেহারায় চিন্তার ছাপও ছিল না। নিজের ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলাম। একশো পাউণ্ডের চেক নিয়ে আমি এসেছি, যার মধ্যে আট পাউন্ড তো মোটরেই বেরিয়ে গেল। জিনিসপত্রের যেরকম দাম ছিল, যদি আমার পাউন্ডের ভরসায় থাকতে হতো, তাহলে কি হতো?

রাতে থাকার জন্যে যে কামরা পেলাম সেটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। তাতে তিনটে বাতি ছিল, কাঁচের আলমারি, দুটো খাট, তিনটে চেয়ার, দুটো টেবিল, নীচে ভালো গালিচা বিছানো। হ্যাঁ, একটা লেপ অবশ্য একটু পুরনো ছিল। দেওয়ালে একটা সুন্দর ছবিও টাঙানো ছিল। সংক্ষেপে স্বচ্ছতা ও আরামের কোনো ঘাটতি ছিল না। আমি পরের দিন (৪ জুন) স্ত্রেলা (শর) ডাকগাড়িতে যাওয়া স্থির করে আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

লেনিনগ্রাদে

মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদের একটা খুব সোজা রেলপথ আছে, যার ওপর দিয়ে দ্রুতগামী ডাকগাড়িটির নাম স্ত্রেলা। এই ট্রেন ৬৫১ কিলোমিটারের পথ ১৭ ঘণ্টায় যায়। ৩০১ রুবল-এ (প্রায় ২০০ টাকা) দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট পাওয়া গিয়েছিল। আমি লেনিনগ্রাদে টেলিগ্রাম করলাম না, কিন্তু ইন্তুরিস্তের লোকেরা আশ্বাস দিল যে ওরা অফিসে ফোন করে দেবে। এর আগের যাত্রায় আমি শীতের সময় এই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে ছিলাম। সে সময় সব জায়গায় শুধু বরফ আর বরফ ছিল এবং দেবদারু গাছগুলো সবুজ দেখাচ্ছিল। এখন আমি গরমকালে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এই গরমের সঙ্গে আমাদের গরমের কোনো সম্পর্ক নেই। এই গরম হিমালয়ের বদ্রীনাথ-কেদারনাথের মত স্থানের গরম। বরফ কোথাও ছিল না। চারিদিকে শুধু শ্যামলিমাই নজরে আসছিল। না দেখলে

বিশ্বাস করা মুশকিল যে রাশিয়ার উত্তর দিক এত সবুজ। রাত এগারোটাও রাত ছিল না। লেনিনগ্রাদের তিন মাসের সাদা রাত এখন চলছিল। মস্কোর ওপর জার্মানি বোম ফেলেছিল, কিন্তু তবু সেটা ওদের দখলে যায় নি। মস্কো থেকে মাত্র কয়েক মাইল যাবার পরই যুদ্ধের ধ্বংসলীলা চোখে পড়তে লাগল। কালিনি (ত্বের) নগরের বাড়ি ধ্বংস ও কারখানা পরাস্ত হয়ে পড়েছিল। সেগুলোর নির্মাণকার্য এখন দ্রুততালে হচ্ছিল না। ত্বের-এর নাম দেখেই আমার এখানকার এক প্রাচীন নাগরিক নিকিতিনের কথা মনে পড়লো, যে আগে ইউরোপীয় ছিল, যে ভারতকে দেখেছে, সেখানে দু বছর (১৪৬৬-৯২) থেকে ছিল আর তার ওপর একটা বই লিখেছিল।

সোভিয়েতের রেলগাড়ি বিশেষ করে দূরপাল্লার ট্রেন খুব আরামের। এখানকার সব রেল লাইনই খুব চওড়া, আর কামরা বেশ উঁচু। শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয় নরম, তৃতীয় শক্ত। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী খুব কম। তৃতীয় শ্রেণীর গদি আমাদের এখানের ইন্টার ক্লাসের মত কিন্তু আরামের দিক দিয়ে আমাদের এখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ে ভালো। এমনিতে শক্ত তৃতীয় শ্রেণী আমাদের ইন্টার ক্লাসের চেয়ে ভালো, তাতে বাইরে থেকে তোষক পাওয়া যায়। রাতের জন্যে গায়ে দেবার চাদর-বালিশও পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, যাত্রীদের লম্বা সফরে ভিড়ের ঠেলায় অস্থির হতে হয় না। প্রত্যেক কমপার্টমেন্টে দুটো নীচে আর দুটো ওপরে সিট হয়। একটা সিট একজন টিকিট নিলেই রিজার্ভ হয়ে যায়। কারণ রেলের টিকিটে ট্রেনের নম্বর, কম্পার্টমেন্ট নম্বর আর সিট নম্বর এবং শ্রেণী লেখা থাকে। যে সিটের টিকিট যে নিয়ে নিয়েছে কেউ আর সেখানে আসতে পারবে না। প্রত্যেক কামরায় এক-একজন কন্ডাক্টর থাকে, সে শুধু টিকিট নিয়ে জায়গাই বলে দেয় না, উপরন্তু কামরা পরিষ্কার করে আর চাও বানিয়ে খাওয়ায়। আমার কম্পার্টমেন্টে আমি নিয়ে চারজন ছিলাম, যাদের মধ্যে সাইবেরিয়ার এক রুশ মেয়ে নিজের বান্ধবীর সঙ্গে ছুটিতে দেখা করতে লেনিনগ্রাদ যাচ্ছিল। সে মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। এখন আমি এই ভাষার কয়েক ডজন শব্দই শুধু জানতাম, তাই সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কি আর বেশি কথা বলব? রুশরা সাধারণত মেলামেশা করতে খুব ভালোবাসে। ওরা ইংরেজদের মতন অপরিচিতদের সঙ্গে মুখ হাঁড়ি করে যাত্রা করে না।

এখন অব্দি বাজার-দর টের পায় নি, তাহলে জানতে পারতাম যে রেশন-কার্ডে পাওয়া আর কার্ড ছাড়া পাওয়া জিনিসের দামে ফারাক আছে। এক বোতল লেমোনেডের জন্যে যখন ষোল রুবল (দশ টাকা) দিতে হলো, তখন যে কি মনে হলো!

রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে চারটের সময় উঠে মনে হলো কে জানে কখন ভোর হয়েছিল। এখন লেনিনগ্রাদের আরো ছ'ঘণ্টা রাস্তা বাকি ছিল। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য এত বছর বাদও দেখা যাচ্ছিল। গ্রাম বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। যেখানে-সেখানে এখনও দুর্গের চারপাশে পরিখা খনন করা ছিল। যেখানে কোনোকালে হয়তো দেবদারুর জঙ্গল ছিল, সেখানে আজ কত মাথা-মুড়নো গাছ দেখা যাচ্ছিল। এই দেবদারুর নিজের স্বাভাবিক রূপে ফিরে আসতে আরো বছরের পর বছর লাগবে।

ট্রেন লেনিনগ্রাদের শহরতলিতে গিয়ে পৌঁছোল। যুদ্ধের আগে লেনিনগ্রাদ তিরিশ

লাখের বেশি বসতিপূর্ণ এক বিশাল নগর ছিল, ওর শহরতলি বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে ছিল। প্রায় নশো দিন ধরে জার্মান সেনারা এই নগরকে ঘিরে রেখেছিল আর এমন বোমা বর্ষণ তথা পথরোধ করেছিল যে, যদি অন্য কোনো নগর হতো তাহলে সে কবেই আত্মসমর্পণ করতো। শহরতলি সত্যিসত্যিই পুরো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। খুব কম দেওয়াল কয়েক হাত উঁচু পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। দেয়াল যদি দেখাও যেত তো সেগুলো ছিল পুরোপুরি ছাদবিহীন। অধিকাংশ বাড়ি মাটিতে মিশে গিয়েছিল। রেল লাইনের আশেপাশে উল্টে যাওয়া মালগাড়ি, বা তাদের কামরা পড়েছিল। জায়গায় জায়গায় কত অস্ত্রশস্ত্রের লোহাও রাখা ছিল।

শেষ অব্দি দশটায় ট্রেন লেনিনগ্রাদ নগরে পৌঁছোল। ওই সময় আকাশ মেঘে ঢেকে ছিল। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে এখানেও বোধ হয় ইন্তুরিস্তের লোক আসে নি, তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে। কিন্তু ট্রেন প্ল্যাটফর্মে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইন্তুরিস্তের লোক আমার কামরার সামনে উপস্থিত। সে আমার মালপত্র নিজের টেক্সিতে তুলে দিল আর সোজা অস্তোরিয়া হোটেলের ১১০ নম্বর কামরায় পৌঁছে দিল। জারের জমানায় এটা একটা খুবই উঁচু দরের হোটেল ছিল, যেখানে সামন্ত আর জারের অতিথিরাই থাকতো। এখনও সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এর আগের বারে আমি যখন লেনিনগ্রাদে এসেছিলাম, তখন ইন্তুরিস্তের দফতর ইউরোপা হোটেলে ছিল। শারীরিক আর মানসিক শ্রমের আয় ছাড়া আর কোনো আয়ই বৈধ বলে স্বীকৃত না হওয়ার জন্য, এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, এখানে শুধু দোকানই নয় হোটেলও কোনো ব্যক্তির বা ব্যাবসায়িক কোম্পানির সম্পত্তি নয়। ইন্তুরিস্ত এক মালদার সরকারি এজেন্সি, যার কাছে শহরের বড় বড় হোটেল, শত শত বাস ও কার এবং কয়েক হাজার কর্মচারী রয়েছে।

হোটেলে নিজের কামরায় পৌঁছে এখন আমি অনিশ্চিত অবস্থা থেকে নিশ্চিত অবস্থায় পৌঁছে গেলাম। লোলা উপস্থিত ছিল। আমি শুধু এই খবরটা তেহরান থেকে দিয়েছিলাম যে আমি এখন আসতে পারি। তারিখ যখন ঠিক ঠিক জানতে পারলাম তখন টেলিগ্রাম করতে পারলাম না। হোটেল থেকে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (চ্যান্সলর)-এর কাছে আমার আসার খবর ফোনে দিলাম। আবার ভাবলাম, প্রতীক্ষা করার চেয়ে লোলার বাড়ি ঘুরে আসাটাই ভালো।

খাওয়া সেরে ইন্তুরিস্তের কার নিলাম আর ত্কাচেই পাড়ায় খুঁজতে খুঁজতে ওই বাড়িতে পৌঁছলাম। ভয় ছিল যে আজ মঙ্গলবার, লোলা হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে বেরিয়ে থাকতে পারে। ওর গৃহ-নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে খোঁজ করলাম। জানতে পারলাম ইগর শিশু-উদ্যানে আছে। ইন্তুরিস্তের দোভাষী মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ইগরকে চেন?' সে হাসতে হাসতে ঠাট্টার ছলে বলল, 'ওকে কে না চিনবে, এইরকমই কালো যার বাপ?' সত্যিই আমাদের ভারতবর্ষে যাকে ফর্সা বলা হয়, তাকেও এই ফর্সাদের সমুদ্রে এসে কালো মনে হচ্ছে। আমরা শিশু-উদ্যান দেখা জরুরি মনে করলাম না এবং তিনটের সময় হোটেলে ফিরে এলাম। ততক্ষণে লোলা খবর পেয়ে গিয়েছিল। সে হোটেলে এসে

আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। আমরা মালপত্র ওখানে রেখে দিলাম আর ট্রামে ত্কাচেই-এর রাস্তা ধরলাম। একঘণ্টার পথ ছিল। ট্রামের আলাদা আলাদা নম্বর থাকে, যদি নির্দিষ্ট ট্রাম না ধরতাম, তাহলে অনেক জায়গায় ট্রাম পাল্টাতে হতো।

প্রথমে আমরা দুজনে শিশু-উদ্যানে গেলাম। ইগর তার সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছিল। রাশিয়ায় ছেলে হোক বা বুড়ো হোক, তাদের মধ্যে বর্ণ-বিদ্বেষের ভাবনা থাকে না। এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা একদিন বলছিল যে একটি ইউরোপীয় স্কুলে শিক্ষিকা থাকাকালীন তার কি রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ছেলেরা তাকে 'কালো মেয়ে' বলে ঠাট্টা করতো। একটি বাচ্চামত ছেলে বুঝতে পারছিল না, যে আমাদের শিক্ষিকা যখন আমাদেরই মত ইংরেজি বলে, তখন তার রঙ আলাদা হয় কি করে? সে তার হাতে আঙুল ঘষে দেখছিল—রঙটা পাছে ওপর থেকে লেপে দেওয়া হয় নি তো! শুধু তাই নয়, ইংরেজ বাচ্চারা ওকে কালো বলে নিজেদের মধ্যে পরিহাস করতো। সোভিয়েতে এই ধরনের হীনতার অবকাশ না বড়দের মধ্যে আছে, না ছোটদের মধ্যে। ইগরের শিশু-উদ্যানে সোয়াশো ছেলের মধ্যে শুধু ওর একার চুল ছিল কালো। তার গায়ের রঙ অন্যদের থেকে আলাদা ছিল। রোমনীরা (জিপ্সি) বহু শতাব্দী আগে ভারত থেকে গিয়েছিল, তাও ওদের চুল কালো এবং রঙ প্রায় আমাদেরই এখানকার ফর্সা লোকদের মত। ছেলেরা ইগরকে সিগান (রোমনী) বলতো, সেটা ও অস্বীকার করে নিজেকে 'ইন্দুস' (হিন্দু) বলতো। ইগর নিজের সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে সব চাইতে লম্বা ছিল। যদিও ততটা মোটা ও চনমনে ছিল না। আমি কথা কি বলব, আমার এখন ভাষার পুঁজি তো খুবই কম, কিন্তু স্নেহ দেখাতে কোনো ভাষার প্রয়োজন হয় না।

লোলা এখন সে-লোলা ছিল না, যাকে আমি সাত বছর আগে দেখেছিলাম। লেনিনগ্রাদে নশো দিনের ঘেরাও-এর প্রভাব পুরনো পরিচিত প্রায় সব মুখেই দেখা যাচ্ছিল। লোলাকে বুড়ি দেখাচ্ছিল। সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যে ফুলের মত ফোটা দত্ত ভাই-এর স্ত্রী ল্যুবারও এই দশা। নগরের দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘেরাও কি জিনিস, তা অন্য লোকের পক্ষে অনুমান করা মুশকিল। ১৯৪১-৪২-এর শীতে ঘেরাও ভীষণ রূপ নিয়েছিল। ওই সময়ের রেশন-কার্ড-এর চার্ট থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সেপ্টেম্বরে প্রত্যেক মানুষ ৩০০ গ্রাম রুটি পেয়েছিল। অক্টোবরে ২০০ গ্রাম, নভেম্বরে ১৫০ গ্রাম এবং পরে ১২৫ গ্রাম। যেখানে মানুষের অন্য সব শস্যের সঙ্গে হাজার-বারোশো গ্রাম রুটির প্রয়োজন, সেখানে সোয়াশো গ্রামে কি করে চলে? কিন্তু যেভাবে হোক প্রাণ বাঁচাতে হতো। লোলা বলছিল, 'রেশনে পাওয়া রুটির টুকরো এনে আমি রোজ সেটা টেবিলে ফেলে ছুরি দিয়ে কাটতাম। বড় টুকরোটা ইগরকে দিতাম আর ছোটটাও রেখে দিতাম। কাটার সময় রুটির কণা টেবিলে পড়ে যেত। ইগর সেটাও আঙুল জিভে ভিজিয়ে নিয়ে খুঁটে খুঁটে খেয়ে নিত।' লোকজন জুতোর তলা সেদ্ধ করে খেত। সিরিশ আঠাও বাঁচতো না। এক মহিলা বহুদিন অব্দি বার্নিশ ফুটিয়ে খেয়েছিল যার ফলে ওর অন্ত্র চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। ওই সময় লেনিনগ্রাদে এমন কোনো বাড়ি ছিল না, যাদের অনেক লোক মারা যায় নি। লোলার বোন না খেতে পেয়ে মারা গেছে। ওর ভগ্নীপতিও খিদের জ্বালায় মারা গেছে।

যদিও শহরতলিতে যতটা প্রলয়লীলা দেখেছিলাম, নগরের ভেতরে ততটা নয়। তাও ঘনবসতিপূর্ণ মহল্লায় কত বাড়ি-ঘর ভগ্ন, আধপোড়া আর ছাদহীন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। ত্‌কাইচে-র আঠাশ নম্বর গৃহশ্রেণীতে আমি থাকছিলাম। আমাদের পেছনে বেশ কিছু একর জমি খালি পড়েছিল, যেখানে কোনো সময় কাঁচা দেওয়ালের দোতলা বাড়ি ছিল—বোমা বর্ষণের ফলে সব জ্বলে গিয়েছিল। লন্ডনে হলে, এই জমি খালি পড়ে থাকতো কিন্তু রাশিয়ায় তা সম্ভব না। সমস্ত জমি লোকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছিল।

তকাচেই নাম শুনলে মনে হয় তাঁতিদের (ত্‌কাচ) পাড়া কিন্তু এখানে তাঁতিরাই শুধু থাকে না। বেশ কিছু সংখ্যক থাকে মজদুর এবং ওদেরই কাছাকাছিতে প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ক্লার্ক ইত্যাদি সব ধরনের লোক থাকে। যে যে আগে নগরে পৌঁছেছে সে সে জমির এক এক টুকরো করে নিয়ে নিয়েছে। লোলার কাছেও একটা ছোট অংশ জমি ছিল, যেখানে কিছু পেঁয়াজ আর গাজর লাগানো ছিল। দেড় মণ আলুর আশা বিফল হয় নি। প্রত্যেক দিন নিজের বাগানে ঘণ্টাখানেক সময় দেওয়া কারো পক্ষেই অসুবিধের ব্যাপার ছিল না।

আমার এখন ভাষা শেখার ভাবনা ছিল। ইউনিভার্সিটি তথা অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এখন হয় বন্ধ ছিল নয় বন্ধ হতে চলেছিল। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পয়লা সেপ্টেম্বরে খোলার কথা। আমার কাছে তিন মাস সময় ছিল, সেই সময়ের মধ্যে আমি আমার রুশ ভাষার জ্ঞান বাড়িয়ে নিতে চাইছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে ছাত্র পড়াতে হলে রুশ ভাষা ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই।

৯ জুনে ইউনিভার্সিটির রেক্টরের কাছে আবেদনপত্র দিলাম। সবই ভালো কিন্তু ইউনিভার্সিটি আমার থাকার জায়গা থেকে পাঁচ-ছ মাইলের কম দূরে ছিল না। রোজ যাতায়াতে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা ট্রামে লেগে যাচ্ছিল। সকাল এবং সন্ধেয় তাতে এত ভিড় হতো যে ভেতরে ঢুকতে পারলেও বসার জায়গা পাওয়া মুশকিল ছিল। বিশ ঘণ্টার রাত আর চার ঘণ্টার দিন তো আমি এর আগের যাত্রাতেও দেখে গেছি, কিন্তু এইবার যা দেখছি, তাতে বিশ ঘণ্টার দিন আর চার ঘণ্টার রাতও ঠিক বলা যায় না। কারণ চার ঘণ্টার রাতকেও গোধূলি আর ঊষা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। দিন লম্বা হলেও গরম লাগা বা ঘাম হওয়ার কোনো ব্যাপার ছিল না। দিন এত বড় হলেও আমার তো খুবই ছোট মনে হতো। আমার বেশির ভাগ বাড়িতেই কাটতো। কখনো-সখনো বাইরে বেরোতাম। যুদ্ধের প্রভাব শুধু যে ঘরেই পড়েছিল তা না, বরং ওই কারণেই পুরুষদের থেকে মেয়েদেরই সংখ্যা ছিল বেশি।

ইউনিভার্সিটি এখনও বন্ধ হয় নি। ওখানে তো এখন বিশ শতাংশ ছেলেও ছিল না। ট্রামচালক মহিলারা ছিল। টিকিট বিক্রি করতো মহিলারা, মহিলারা দোকানে-দফতরে কাজ করতো। এমন কি চৌরাস্তায় রাস্তা দেখিয়ে দেবার পুলিশের মধ্যেও পুরুষ খুবই কম চোখে পড়তো। শুধু কালো চামড়া নয় কালো চুলওলা লোকদেরও দেখা পাওয়া ভার ছিল। রুশদের চুলের রঙ হলদে বা মেটে রঙের। ওদের মুখের রূপরঙ্গও ওদের নিজস্ব ধরনের—নাক ছোটো আর তার অগ্রভাগ কিছুটা ওঠানো, মুখ চওড়া ও গোলাকার।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাকে পড়াতে ডেকেছিল, কিন্তু নিয়োগের জন্যে বহু কাগজে লেখালেখি করতে হলো, তাতে সুস্থতার ডাক্তারি সার্টিফিকেটও দিতে হল—যাতে ছোঁয়াচে রোগ যে নেই তা বোঝা যায়।

২৭ জুনে লেনিনগ্রাদ পৌঁছনো আমার ২৩ দিন হয়ে গেল। এখন আমি একে নিজের শহর বলে মনে করতে লাগলাম। একদিন শুনতে পেলাম ডাক্তার মেঘনাথ সাহা এসেছেন এবং আমাকে খুঁজছেন। আমি চারটের সময় এও জানতে পারলাম যে পাঁচটায় তিনি লেনিনগ্রাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। দৌড়ে দৌড়ে অস্তোরিয়া হোটেলে পৌঁছলাম, যেখানে ওঁর দেখা পেলাম। অনেক কিছু বলার সময় ছিল না। ডাক্তার সাহা দু হপ্তার জন্যে রাশিয়ায় এসেছিলেন, আর দেখা করার জন্যে এই সময়টুকু পর্যাপ্ত ছিল না। সোভিয়েত সায়েন্স অকাদেমির ২২০তম বছরপূর্তির উৎসব ছিল। এই মহোৎসবে যোগ দেবার জন্যে সাহা সারা পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় বিজ্ঞানীদের মত নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

আমার কাছে এখন কোনো রেডিও ছিল না। ভারতের খবর পাবার কোনো উপায় ছিল না। রুশ কাগজে কখনো-সখনো দু-এক লাইন দেখতে পাওয়া যেত। এমনিতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২০-২১ ঘণ্টা একটানা বলে যাওয়া রেডিও লেনিনগ্রাদের হাজার হাজার বাড়ির মত আমাদের বাড়িতেও লাগানো ছিল, কিন্তু তাতে ভারতের খবর জানার কৌতূহল মিটতো না। ডাক্তার সাহা বললেন, 'কংগ্রেসী নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যখন আমি ভারত ছেড়ে এসেছি, তখন কংগ্রেসী নেতারা ভাইসরয়ের সঙ্গে সিমলায় কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল।' ইংরেজরা যে কৌশলে সমঝোতা করার জন্যে কথাবার্তা আরম্ভ করেছিল, আর যা যা শর্ত দিয়েছিল, সেগুলো উল্লেখ করে ডাক্তার সাহা বললেন, 'পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়?'

বিভিন্ন দেশের যে বিদ্বানরা অকাদেমির জুবলিতে শামিল হতে এসেছিলেন, তাঁরা নিজের নিজের দেশের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তার সাহার আগে সেটা খেয়াল হয় নি। এখানে আসার পর যখন তাঁকে বার্তা পেশ করতে বলা হলো, তখন তিনি একটি বার্তা তৈরি করলেন। সেইসব ভারতীয় বুদ্ধিহীনদের মধ্যে ডাক্তার সাহাকে ফেলা যায় না, যারা অন্য দেশে গিয়ে ইংরেজি ভাষাকে সর্বেসর্বা মানতে গিয়ে জাতীয় অপমানের কথা খেয়াল করে না। তিনি ইংরাজিতে লেখা তাঁর বার্তার খাতাটি আমায় দিয়ে বললেন, 'আমি চাই না যে আমার বার্তা ইংরেজি ভাষায় যাক। এটা আমাদের ভারতীয় ভাষায় হওয়া দরকার—তা সে হিন্দিতেই হোক কি বাংলায়, তবে আমি চাই এটা সংস্কৃততে হোক।' তিনি এটা সংস্কৃততে অনুবাদ করে ভালো করে ছাপিয়ে দিতে বললেন।

অনুবাদ তো আমি করে দিলাম, কিন্তু ফারসী অক্ষরের অত সুন্দর ছাপার ব্যবস্থা এখানে সম্ভব ছিল না, তাই ওটা আমি ডক্টর সাহার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর বার্তা নিম্ন প্রকার ছিল—

ভারতের অভিনন্দন

'ভারতের জনগণ, একশো একষট্টি বছর আগে স্থাপিত বেঙ্গল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষদ আর সভাসমূহের সংঘরূপে স্থিত জাতীয়

বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান-এর দিক থেকে সোভিয়েত সমাজবাদী গণরাজ্য সংঘের বিজ্ঞান অকাদেমির অস্তিত্বের দুশো কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিপ্লবের আগেও বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অকাদেমি যে সাফল্য অর্জন করেছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশ প্রতিভার অদ্বিতীয় অবদান রাথ এবং বোথলিংকের মহান বৈদিক কোষ, যা লেনিনগ্রাদে প্রায় সত্তর বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে, ভারত খুবই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণ করছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রের মহান বিদ্বান, অকাদেমিক শ্চেরবাৎসকীর, যিনি দু'বছর আগে নির্বাণ লাভ করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ অবদানকেও ভারত অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে।

'বিপ্লবের পরে অকাদেমিকে যে ক্ষমতা আর উত্তরদায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার জন্যে রাশিয়ায় সে মহান টেকনোলজিক্যাল বিপ্লব সংঘটিত করার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। গত পঁচিশ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়া যে মহত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছে, তা ভারতকে মহৎ প্রেরণা দেয়। আমাদের মনে এই ব্যাপারে রাশিয়া নতুন আশা এবং প্রেরণা দেয় যে আমাদের তিন শত্রু দারিদ্র, রোগ আর নিরন্তর খাদ্যাভাব-এর সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করি। সোভিয়েত সমাজবাদী গণরাজ্য সংঘের গৌরবময় ও সফলতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত তথা রাজনীতিক, আর্থিক, টেকনোলজিক্যাল এবং ধর্মীয়—এই চার প্রকারের বিপ্লবে সোভিয়েত সমাজবাদী গণরাজ্য সংঘের গৌরবময় প্রচেষ্টার জন্যে সাধুবাদ দিতে ভারত জগতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আছে।'

সাত মাসের তপস্যার পর লেনিনগ্রাদে পৌঁছে পুরনো বন্ধু কলিয়ানোফ বিস্ক্রোব্‌নী, সুলেকিন এঁদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমার খুশি হবার কথা, কিন্তু একটা ব্যাপারে দুঃখ হচ্ছিল যে, অকাদেমিক শ্চেরবাৎস্কীর সেই প্রসন্ন মুখ এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা আর পাওয়া যাবে না। সোভিয়েত দেশে আমার দ্বিতীয় যাত্রা আমি তাঁরই নিমন্ত্রণে করেছিলাম। ওই সময় আমি কয়েক মাস মাত্র থাকতে পেরেছিলাম, কিন্তু ওইটুকু সময়েই আমাদের ঘনিষ্ঠতা অতখানি হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল, আমরা যুগ যুগ ধরে একে অন্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রেখে আসছি। আমার ভারতে ফিরে আসার পরও তিনি বার বার অনুরোধ করছিলেন যে আমি যেন এবার দীর্ঘকালের জন্যে লেনিনগ্রাদ যাই। তার জন্য তিনি চেষ্টাও করছিলেন, আর এর মধ্যেই মহাযুদ্ধ লেগে গেল। হিটলার রাশিয়াকেও আক্রমণ করলো। লেনিনগ্রাদ ঘেরাও হলো। ওই সময় সোভিয়েত সরকার নিজের অন্য অনেক কলা তথা বিদ্যাসম্বন্ধীয় নিধিদের সঙ্গে ডক্টর শ্চেরবাৎস্কীদের মতন প্রতিভা-নিধিদেরও উড়োজাহাজে করে দূরে পাঠিয়ে দিল আর বছর ঘুরতে না ঘুরতে উত্তর কাজাকস্তানের রম্যস্থান বরোবাতে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হলো।

আমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর নিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভাষার প্রস্তুতি আর অন্য কাজে কাটানো দরকার ছিল। প্রফেসরের কাছে আশা করা হয় যে তিনি নিজের অনুসন্ধানের কাজও করবেন, যার জন্যে সময়ের প্রয়োজন, তাই সময় দিতে গিয়ে এদিকটা খেয়াল রাখা হয়। হপ্তায় আমার বারো ঘণ্টা পড়ানোর কথা। তাও এমনভাবে দেওয়া হয়েছিল যাতে মাত্র তিনদিন ইউনিভার্সিটি যাবার প্রয়োজন হয়।

রোববার তো সাধারণ ছুটির দিন ছিলই।

ডঃ শ্চেরবাৎস্কীর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক ছিল, তার জন্য ডঃ বরান্নিকোফের আমার প্রতি খুব একটা ভালো মনোভাব ছিল না। ওঁর এবং ডঃ শ্চেরবাৎস্কীর মধ্যে কিছু খটমট ছিল। তিনি জানতেন না যে আমি তাঁর কাজকে খুব গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখি। যদিও বরান্নিকোফ সংস্কৃত এবং পশ্চিমের অন্য পুরনো ভাষারও বড় পণ্ডিত, কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণা অধিকতর আধুনিক ভারতীয় ভাষা—রোমনী, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার ব্যাপারে করেছেন। পশ্চিম দেশে সংস্কৃতের মত পুরনো ও মৃত ভাষার গবেষণাকেই উচ্চশ্রেণীর গবেষণা বলে গণ্য করা হয়। তাই ডঃ বরান্নিকোফের গবেষণাকে প্রাচীনপন্থী বিদ্বানরা অতটা গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আজকাল জীবিত ভাষাগুলোরও ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজশাস্ত্রের গবেষণার খুব গুরুত্ব আছে। আমি স্বয়ং হিন্দি সাহিত্যের একজন লেখক, আমার পক্ষে কি করে সম্ভব যে আমি ডঃ বরান্নিকোফের কাজের গুরুত্ব দেব না? কিন্তু তিনি ভাবতেন যে ডঃ শ্চেরবাৎস্কীর মতো বন্ধু, সংস্কৃতের পণ্ডিত এবং সংস্কৃত বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত লোক তিব্বতী আর পালি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ হলে তাঁর প্রতি আমার ধারণাও ওরকমই হবে। ডঃ বরান্নিকোফ একজন প্রতিভাশালী বিদ্বান, সেই সঙ্গে খুব পরিশ্রমীও। তারুণ্যে যখন তাঁর রোমনী ভাষা শেখার শখ হলো, তখন কতদিন তিনি রোমনীদের ডেরায় কাটিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই লাজুক প্রকৃতির। অনেক সময় মনে হতো তাঁর মুখে কোনো উত্তর থাকে না। আমি আগে তাঁর কিছু রচনা পড়েছিলাম আর এখন তো আরও পড়ার এবং সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম. তাই আমি তাঁর প্রশংসাকারী হয়ে থেকেছি।

পৌনে তিন মাস ধরে এই ছুটিতে রুশ ভাষা শেখা আর অন্যান্য বই পড়া ছাড়াও একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো, লেনিনগ্রাদের বিভিন্ন স্থান দর্শন করা এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করাই ছিল কাজ। জুলাই-আগস্টে যদিও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অধ্যাকপদের এবং ছাত্রছাত্রীদের ছুটির মধ্যেও বই-এর দরকার হতে পারে, এইজন্যে ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য ও অন্য বিভাগের গ্রন্থাগার বরাবর খোলা থাকতো। তাতে বই পাওয়া খুব সহজ ছিল। ইউনিভার্সিটির একটা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছিল, তারপর আবার তার বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা গ্রন্থাগারও ছিল। তার মধ্যে আমাদের প্রাচ্য-বিভাগের গ্রন্থাগারে চার লাখের বেশি বই ছিল। একে তুলনা করুন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সঙ্গে। তার বই-এর সংখ্যা বড় জোর আধ লাখ। বই-এর ব্যাপারে আমি প্রায়ই প্রাচ্য গ্রন্থাগারে যেতাম। সারা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্ত্রী-রাজ্য। যখন ছাত্রদের মধ্যে ছেলের সংখ্যা পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ, তখন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কি বলব—গ্রন্থাগারকে তো বিশেষ করে মহিলা-বিভাগ বলেই মনে করা হতো।

৩০ জুলাই আমি গ্রন্থাগারে ছিলাম। ওখানকার মহিলারা পত্রিকায় ছাপা একটি গল্প খুব মন দিয়ে পড়ছিল। ওরা অতি আগ্রহের সঙ্গে লোলাকেও সেটা পড়তে বলল। আমিও দু মাসে একটু একটু করে পড়া শুরু করেছিলাম, আর অন্যরাও কিছুটা সাহায্য করেছিল, এই জন্যে গল্পের সারাংশ বুঝেছিলাম। গল্পের নায়ক এক সৈনিক অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল।

সেখানে সে কোনো এক তরুণীর প্রেমে পড়েছিল। যুদ্ধ চলা পর্যন্ত দুই প্রেমিক দেখা-সাক্ষাৎ করছিল। যুদ্ধ শেষ হলো। সৈনিকরাও ঘরে ফিরে আসতে লাগল। অফিসর বাড়ি পৌঁছোল। তরুণী আশা করেছিল যে ওর প্রেমিক অবশ্যই ওর কাছে আসবে, কিন্তু অনেক প্রতীক্ষার পরও যখন প্রেমিক এলো না তখন সে ওর বাড়ি গেল। দেখল সেখানে অফিসারের ৪৫ বর্ষীয়া প্রৌঢ়া পত্নী আছে। ও খুব নিরাশ হলো আর ওর পূর্ব-প্রেম স্মরণ করিয়ে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। কিন্তু অফিসার নিজের প্রৌঢ়া পত্নীকে ছাড়তে রাজি হলো না। লেনিনগ্রাদ ঘেরাও-এর সময় ওর দুটো বাচ্চা মারা গিয়েছিল কিন্তু একটি মেয়ে বেঁচে গিয়েছিল। অফিসার স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তাকে অসহায় করে দিতে চাইছিল না। সাবধান থাকার শিক্ষা তরুণী পেল। পুরুষের নিষ্ঠুরতাকে গালাগালি দিতে দিতে সে ঘরে ফিরে এলো।

সব মহিলারা এত আগ্রহের সঙ্গে ওই গল্প কেন পড়ছিল? চার বছরের খুনী যুদ্ধে স্ত্রী-পুরুষ একে অপরের থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। অনেক সৈনিকদের পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়া তো দূরে থাক, চিঠিপত্রও পাওয়া মুশকিল ছিল। কত স্ত্রীই ধরে নিয়েছিল যে তাদের স্বামীরা আর বেঁচে নেই। উক্ত গল্পের মত ঘটনা প্রতিটি জায়গাতেই ঘটতো। বের্থার সৈনিক-স্বামী লামে গিয়ে অন্য তরুণীর সঙ্গে প্রেম করলো আর ও বেচারি অপেক্ষা করেই রইল। জেনিয়ার স্বামীও নতুন প্রেমে বাঁধা পড়ে কে জানে কোথায় চলে গেল। আন্নার স্বামী কয়েক মাস ধরে কোনো চিঠিপত্র লিখছিল না। তাই ও একটু চিন্তায় পড়েছিল। এই গল্পে এই ধরনের অভাগী পত্নীদের সমর্থন করা হয়েছিল, তাই এই গল্প এত মনোযোগ দিয়ে ওরা পড়েছিল।

আগস্টের পয়লা হপ্তাতেই আমাদের বাড়ির পেছনের বাগান খুব সবুজ হয়ে উঠেছিল। যদিও চাষীদের মধ্যে কিছু লোক খেতে শুধু প্রচণ্ড পরিশ্রমই করে নি, তার সঙ্গে ভালো সার এবং বুদ্ধিও প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু লোলা তো যেমন-তেমন করে খুরপি দিয়ে জমি খুঁড়ে ওই ভাবেই আলু পুঁতে ঢেকে দিয়েছিল, যেরকম বন্যার জল সরে গেলে বঢ়েয়া টালের (মুংগের জেলা) চাষা বছরে একবারই লাঙল নিয়ে গিয়ে বীজ ছড়িয়ে আসে এবং শুধু কাটার আগে তা মনে পড়ে। যদিও বাড়ির সিমেন্টের গুঁড়ো আর অন্যান্য জিনিসও আমাদের জমিতে পড়েছিল। জমি এমনিতেই উর্বর ছিল, তাই আলু ইতিমধ্যেই দু-তিন তোলা ওজনের হয়ে গিয়েছিল।

৮ আগস্ট সন্ধের সময় এগারোটার রেডিওতে বলল, 'এখন আমরা মস্কো থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দেব।' লোলা জিজ্ঞেস করল, 'কি গুরুত্বপূর্ণ খবর হতে পারে?' আমি কিছুমাত্র বিলম্ব না করে বলে দিলাম, 'জাপানের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা।' দু-মিনিট বাদেই মস্কো রেডিওকে যুদ্ধঘোষণা করতে শুনে লোলা খুব আশ্চর্য হলো। জিজ্ঞেস করল, 'কি করে তুমি বুঝলে?' আমি বললাম, 'ইন্দুস (হিন্দু) হবার কি সুবিধে, যদি আমি এতটুকুও না বলতে পারি?'

'না না, সত্যি বলো।'

আমি বললাম, 'এটি কোনো জ্যোতিষীর অলৌকিক ক্রিয়া নয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এরকমই, বার্লিনে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিরা স্তালিনের দাবির সমর্থন করেছে। ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক নীতিতেও পরিবর্তন হয়েছে। চীনের প্রধান মন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রী দুবার করে মস্কো ঘুরে গেছে। মোঙ্গলিয়ার প্রধানমন্ত্রী সবে মস্কো আগমন করেছে। হিটলারের পরাজয়ের পর জাপানের পরাজয় নিশ্চিত। পূর্ব-ইউরোপে রাশিয়া যেভাবে নিজের প্রভাব বাড়িয়েছে, যদি পূর্ব-এশিয়াতেও সে তার প্রভাব ওই রকমভাবেই বাড়াতে চায় তাহলে চীনকে ভাগিয়ে দিয়ে জাপানের সঙ্গে জোট বাঁধার জন্য রাশিয়ার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা জরুরি।

এই সময় বাইরের জগতের খবর জানার আমার একমাত্র উপায় ছিল কেবল স্থানীয় রেডিও আর রুশ দৈনিক। ভাষার অসুবিধের কারণে খুব মাথা ঘামিয়েও পঞ্চাশটির বেশি প্রতিশব্দ আমি বুঝতে পারতাম না।

নুন তেল কাঠ

নুন, তেল আর কাঠের সমস্যা মানুষের সব চেয়ে বড় সমস্যা। দেবতা তাই জন্যে মানুষের থেকে বড়, কারণ ওঁর নুন, তেল, কাঠের চিন্তা নেই। ভারতে তো আজ (১৯৫১-এর শেষে) যুদ্ধের ছ'বছর বাদেও এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। রেশনে পর্যাপ্ত জিনিস পাওয়া যায় না। মনে হয় এবার এই দেশ থেকে অতিথিসেবা, ধর্ম উঠে যাবে। জিনিস সবই পাওয়া যায়, যদি কেউ দুগুণ-তিনগুণ দাম দিতে রাজি থাকে। খাবার-দাবারের জিনিসের শুদ্ধতার কোনো বালাই নেই। আমি এর আগের রাশিয়া যাত্রা থেকে ফেরার সময় আফগানিস্তান এবং রাশিয়ার সীমানায় বক্ষু নদীর দক্ষিণ কিনারে অবস্থিত তেরমিজ নগরে থেকে ছিলাম। বাণিজ্যের খাতিরে কিছু আফগানীও ওই সরাই-তে উঠেছিল। বেচারা হালাল-হারাম-এর বিচার করে মাংস এবং আরো অনেক কিছু খাবার জিনিস নিজের সঙ্গে এনেছিল, কারণ ওরা জানতো যে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় যদিও এখনও আব্দুল্লা, রহীম আর করীম নাম শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ওখানে এখন হালাল করা পশুর মাংস পাওয়া মুশকিল। কিন্তু বাড়ি থেকে আনা মাংস কতদিন চলবে? যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন ওরা চিন্তায় পড়লো। ওরা এমন দেশের বাসিন্দা যেখানকার মানুষ এখনও পুরোপুরি 'ঘাসখোর'[১] হয়ে যায় নি। সরাইয়ের চৌকিদারকে মিনতি করলে সে তৎক্ষণাৎ বলল, 'হ্যাঁ, কলখোজ থেকে আমরা তাজা মাংস এনে দিচ্ছি।' আমি হেসে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বন্ধু, তুমি কলখোজ থেকে হালাল-মাংস এনে দেবে?'

ও হেসে বলল, 'বেকুব! পশুকে কষ্ট দিয়ে মেরে যে মাংস তৈরি হয় তাকে হালাল

[১] শাক-সবজি ভক্ষণকারী বা নিরামিষাশী।—স·ম·

বলে। এখন এইভাবে মারার কসাই আমাদের দেশে সামান্যই আছে।' এইরকম আমাদের দেশেও এখনো কিছু লোক আছে যারা 'শুদ্ধ' ঘি-এর কথা বলে এবং শুদ্ধ ঘি-এর নামে ওরা পায় অশুদ্ধ বনস্পতি। হিমালয়ের জৌনসার আর জৌনপুরের মত সিধেসাদা পাহাড়ীরা টিনে টিনে ডালডা এই অভিপ্রায়ে বয়ে নিয়ে যায় যে দুধে তাকে মিলিয়ে মাখন বার করে ঘি বানাবে আর শুদ্ধ ঘি-এর নামে দ্বিগুণ দামে বাবুদের বেচবে। তাহলে আমাদের সমতলের খুব চালাক নাগরিক ও গ্রামবাসীদের সম্পর্কে আর বলার কি আছে? আমি তো বলব—যদি ডালডাই খেতে হয়, তবে তা বোকার মত ঘি-এর নামে খাওয়ার কি দরকার?

জার্মানির লড়াই শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই আমি রাশিয়ায় পৌঁছেছিলাম। রাশিয়ার অন্নদাত্রী ভূমির একটা বড় অংশ জার্মানদের হাতে চলে গিয়েছিল। এখন তাদের হাত থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ধ্বংসলীলার জন্যে তার আর সে অবস্থা ছিল না যে আগের অর্ধেকও অন্ন দেয়। কিন্তু রুশরা 'অধিক শস্য ফলাও' বলে ঠাট্টা করে প্রোপাগাণ্ডাতে কোটি কোটি টাকা বেকার খরচা করে নি, বরং ওরা শস্য উৎপাদনের জন্যে ঝিলের জল আর সারের দরকার বুঝে ওইদিকে পুরো মনোযোগ দিয়েছিল। বাবরের জন্মভূমি ফরগানার কৃষকরা বলল, 'আমরা নিজেদের জাঙ্গর (শারীরিক পরিশ্রম) দেবার জন্যে তৈরি। আমাদের ইঞ্জিনিয়র আর সিমেন্ট লোহা ইত্যাদি সামগ্রী সরকার যদি দেয় তাহলে আমরা এখানে বড় একটা নালা কেটে ফেলতে পারি।' সরকার কেবল ইঞ্জিনিয়র আর সিমেন্ট লোহা কাঠেরই ব্যবস্থা করে দেয় নি, উপরন্তু দেশের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ঝুলে থাকার কালে সে বিদ্যা ও কলার মহত্বকে নিজের চোখের সামনে থেকে সরে যেতে দেয় নি। সরকার কয়েকজন ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্ববিদও ওখানে পাঠিয়ে দিল, কৃষকদের বোঝানোর জন্যে ওদের মাতৃভাষাতে ছোট ছোট পেমফ্লেট ছেপে বিলি করে দিল, যেখানে বলা হল— 'বন্ধুগণ, মনে রেখো যে এই ঝিল ওই ভূমি দিয়ে যাচ্ছে, যেখান দিয়ে চীন থেকে ইউরোপ যাবার রেশমী-পথ দেড় হাজার বছর ধরে চলেছে। ওই সময়ে এখানে ভালো ভালো নগর ছিল, যা এই আগের যুদ্ধে বিধস্ত হয়ে গেছে। এখানে এমন ঐতিহাসিক আর পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাওয়া যায় যার দ্বারা আমাদের ইতিহাসের ওপর নতুন আলো পড়বে। তাই খনন করার সময় মনে রাখবে যাতে এখান থেকে বেরোনো কোনো ইঁট, মৃৎপাত্র, মূর্তি বা অন্য কোনো জিনিস খুরপি-কোদালে ভেঙে না যায়।' শুধু তাই নয়, সরকার এখান থেকে পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী সংগ্রহ করবার জন্যে বাইশটা লরি জমা করে রেখে দিয়েছিল, এরা জিনিসগুলোকে সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দিচ্ছিল। ফরগানার মত আরো কত খাল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাষ্ট্র বানিয়ে ছিল, যার ফলে ওখানে শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর খুব সুবিধে পাওয়া গিয়েছিল। রেশন ব্যবস্থা এত ভালো ছিল যে মানুষের দরকারী জিনিস সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। জুলাই-এর যে রেশন কার্ড আমরা পেয়েছিলাম, তাতে সারা মাসে নিম্ন পরিমাণ জিনিসপত্র পাওয়া যেত— চিনি ৯০০ গ্রাম (৫০ গ্রামের ১৮ টুকরো), কুপা (খিচুড়ি বানাবার গম বা ছোলা) ১৯৬০ গ্রাম, মাছ-মাংস ১৮০০ গ্রাম, মাখন ৮০০ গ্রাম, রুটি (কালো) ১২৪০০ গ্রাম (৪০০

গ্রামের একত্রিশ টুকরো), রুটি (সাদা) ৬২০০ গ্রাম।

এটা ছিল আমাদের মত বয়স্ক লোকদের জন্যে। ইগরের মত পাঁচ-ছ বছরের ছেলেদের জন্যে জিনিস নিম্ন পরিমাণ পাওয়া যেত—

কুপা ১২০০ গ্রাম, মাখন ৪০০ গ্রাম, রুটি (কালো) ৬২০০ গ্রাম, রুটি (সাদা) ৬২০০ গ্রাম, চিনি ৫০০ গ্রাম।

বড়দের প্রতিমাসে ২১—২২ কিলোগ্রাম রুটি পাওয়া যেত। আর বাচ্চাদের ২৪ কিলোগ্রাম— এক কিলোগ্রাম হাজার গ্রাম বা প্রায় সোয়া সেরের সমান। ওখানে চোরা-বাজারীর নামগন্ধ ছিল না, কারণ নিজের উৎপাদিত বস্তুর বাইরে অন্যদের জিনিস কিনে নিয়ে যে বেশি লাভ রেখে বিক্রি করে তাকে (বানিয়া) অপরাধী বলে ধরা হয়। রেশনে জিনিস সস্তায় পাওয়া যেত, কিন্তু যদি কেউ রেশনের থেকে বেশি কিনতে চাইতো, তাহলে তার জন্যে সরকার রেশনের দোকান ছাড়াও বিনা রেশনের অনেকগুলো দোকান খুলে রেখেছিল, যেখানে লোকে দশগুণ-বিশগুণ বেশি দামে যত ইচ্ছে জিনিস কিনতে পারতো। এইভাবেই যদি কেউ নিজের রেশনের জিনিস বেচে তার বদলে অন্য জিনিস কিনতে চাইতো তাতে কোনো বাধা ছিল না। আপনি সিগারেট চান আর একজন চিনি চায়। আপনি হাটে গিয়ে আপনার সিগারেট কুড়িগুণ দামে কাউকে দিন আর নিজে চিনি রাখতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে কুড়ি-পঁচিশগুণ বেশি দাম দিয়ে চিনি কিনে নিন। জিনিসপত্রে ভেজাল দেওয়া ওখানে সম্ভব ছিল না, কারণ জনতার খাদ্যে ভেজাল দেওয়া গভীর অপরাধ বলে ধরা হতো, যার দণ্ড থেকে মানুষ নিজেকে কোনো মতেই বাঁচাতে পারতো না। রেশনের দোকানের জিনিস আর হাট (রীনক) অথবা কলখোজ (যৌথ খামার)-এর জিনিসের দামে যে কত তফাৎ ছিল তা আমি ২০ জুলাই ১৯৪৫-এর ডায়েরি থেকে তুলে দিচ্ছি—

জিনিস	পরিমাণ	রেশন	রীনক/কলখোজ
মাংস	১ কিলো	১২ (রুবল)	২৫০ (রুবল)
মাছ	"	১২	...
মাখন	"	২৭	৪০০
পনির (আমেরিকান)	"	৩৫	..
পনির (দেশী)	"	৩১	...
চিনি	"	৫	২০০
ডিম (ডজন)	"	৬·৫০	৯৬
রুটি (সাদা)	"	২·১২	৫০
রুটি (কালো)	"	১·১০	২৫
ক্রুপা	"	২	...
চাল	"	৬·৫০	১০০
আলু	"	২	৬০
কপুস্তা (টক গোমি)	"	১·৫০	৩০
চর্বীন (সয়া)	"	৪·৬০	৫০
মন্না (যব চুর্ণ)	"	৪·৪০	৮০

এইভাবে কাপড়ও ছিল রেশনের এবং রেশন-বহির্ভূত—

মেয়েদের পোশাক (রেশম)	৩০০	১০০০
মেয়েদের পোশাক (সুতি)	৬০	
গোলোস (বুট)	২৫	১০০
মোজা (রেশমী)	১০	১৫০
মোজা (সুতি)	৫	৫০

ওখানে যাদের বেতন সবচেয়ে কম তারা আড়াই-তিনশো রুবল মাসে পেত আর প্রত্যেক ঘরে ঘরে কম করে দুজন রোজগেরে ছিল এবং সেই সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানের খরচও সরকার বহন করতো। যুদ্ধের সময়ের অস্বাভাবিক অবস্থায় রেশনের কার্ড দেখে মনে হবে যে মানুষের খাওয়া-পরার মত অত্যাবশ্যক জিনিসের দাম খুব সস্তা রাখা হয়েছিল। ওখানকার শাসক খুব ভালো করেই জানতো যে রেশনে যা পাওয়া যায় ঠিক ওই টুকুতে অনেক লোকই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যার কাছে বেশি পয়সা আছে সে আরো জিনিস কিনতে চাইবে। যদি সরকার তাদের বাড়তি ইচ্ছে আর অতিরিক্ত টাকার কোনো সঠিক ব্যবস্থা না করে তাহলে চোরা-বাজারের রাস্তা খুলে যাবে। তাই সরকার নিজেই বিনা রেশনের দোকানও খুলেছিল। যদি আপনি অতিরিক্ত টাকা-পয়সা খরচ করতে চান, তাহলে চলে আসুন এই বিনা রেশনের দোকানে দশ-কুড়িগুণ দাম দিয়ে নিজের মনোমত জিনিস নিয়ে যান। হয়তো কিছু লোক এই বিনা রেশনের দোকান সম্বন্ধে ঝট করে বলে উঠবেন— এ তো দেখছি সরকার স্বয়ং চোরা-বাজারী কারবার ফেঁদেছে। কিন্তু সরকার এই দশ-কুড়িগুণ দাম দিয়ে জিনিস কিনতে না আপনাকে জোর করছে আর না তার দাম কোনো চোরা-বাজারী শেঠের পকেটে ঢুকছে। এই লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হয়ে সরকারের বড় বড় আর্থিক যোজনায় খরচ হচ্ছে, তাতে সারা দেশের সম্পতি বাড়বে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে জিনিসের দাম কমবে এবং পুরো লাভটা নেওয়ার সুযোগ লোকে পাবে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা লোকেরা নিজের বাড়িতে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলর মহিলাকেও আপনি রোজ তাঁর রন্ধনশাস্ত্রের পরিচয় দিতে দেখবেন। তাও এইরকম ব্যবস্থা আছে— যদি আপনি কোনো-কোনোদিন বা বরাবরের জন্যে বাড়িতে রান্না না করতে চান, তাহলে আপনি আপনার কার্ড দেখিয়ে সস্তা এবং পুষ্টিকারক খাবার পাবেন। এর জন্যে প্রত্যেক পাড়ায় সামূহিক ভোজনালয় আছে। কারখানা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সংস্থাতেও নিজের নিজের সামূহিক ভোজনশালা তথা বুফেত (উপহারগৃহ) আছে। জুন (১৯৪৫)-এ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনালয়ের খটরস চাখবো ঠিক করলাম। সোয়া রুবলে (বারো আনা) সুপ আর কাসা (মাখনের সঙ্গে চিনির খিচুড়ি) ভরপেট পেলাম। যেখানে আমরা বারো আনায় রেশনের টিকিটে পেট ভরে খেতে পারতাম, সেখানে বিনা রেশনে সোয়া সের মাংসের জন্যে ২৫০ রুবল, সোয়া সের মাখনের জন্যে ৪০০ রুবল, সোয়া সের চর্বি ৩০০ রুবল, সোয়া সের চিনি ২০০ রুবল দিতে হতো। এই দু-রকমের দাম দেখে আমার মাথাও প্রথমে ঘুরে গিয়েছিল, কিন্তু যখন আমি দেখলাম রেশন কার্ডে লোক আড়াই রুবলে দুবার পেট ভরে খেতে পারে অর্থাৎ

৩৮-৪০ টাকায় সারা মাস খেতে পারে, তখন আর কোনো সন্দেহই রইল না।

ওখানে কেউ বেকার ছিল না, শুধু তাই নয়, বরং কাজের জন্যে যত লোকের দরকার ছিল তা পাওয়া যেত না।

১৯৪৬-এর কথা। পূর্ব-পশ্চিম দু তরফেরই লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর সোভিয়েত জনগণ তাদের নিজেদের পুনর্নির্মাণের কাজে খুব জোর লেগে পড়েছিল। হিসেব করে দেখা গেল যে বেশ কয়েক লাখ মহিলা আছে, যারা নিজেরা কাজ না করে নিজের স্বামী বা অন্য কারো রোজগারে বেঁচে থাকে। যদি সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ অকর্মণ্য মহিলাদের কাজে লাগানো যায়, তাহলে চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ পুরুষদের হাল্কা কাজ থেকে আরো বেশি পরিশ্রমের কাজে দেওয়া যায়। এই ভেবে সরকার নিয়ম করে দিয়েছে এখন থেকে এরকম লোকই রেশন কার্ড পাবে যে রাষ্ট্র-নির্মাণের কোনো কাজে রত, অথবা স্বাস্থ্য, বার্ধক্য ইত্যাদি কারণে কাজ করতে অক্ষম। আমার পাড়ায় এক জার-এর আমলের মধ্যবিত্ত প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন। পুরনো সংস্কার ছিল, তাই কাজ করার বদলে সাজগোজ করে উপন্যাস পড়তেই তিনি বেশি ভালোবাসতেন। এই নিয়ম চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাজ করতে বাধ্য হলেন, কারণ এখন স্বামীর রোজগারে পনেরো-কুড়িগুণ দাম দিয়ে রুটি-মাখন কেনার সাধ্য ছিল না। হাজার গালাগালি দিতে দিতে বেচারিকে কাজ করতে যেতে হলো। কাজও এমন কিছু ভারি না। কোনো দফতরে লেখালিখি বা কোনো রেশন কিংবা রেশন-বহির্ভূত দোকানে বিক্রি করার জন্যে কয়েক ঘণ্টা দেওয়াই যথেষ্ট ছিল।

প্রোফেসরি

এবার লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে সংস্কৃত পড়ানোর জন্যে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৩৫-এ জাপান থেকে ফেরার পথে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই আমি দ্রুত রাশিয়া ঘুরে এসেছিলাম। সেই সময় আমার ওখানকার বিদ্বানদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠে নি, কারণ মস্কোতে আমি এক-দুদিনের বেশি থাকতে পারি নি। ফ্রান্সে থাকার সময় (১৯৩২) প্রফেসর সেলবন লেবী, ডঃ সর্জ ওল্দনবুর্গের নামে একটি পরিচয়-পত্র দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ওই সময় রাশিয়া যেতে পারি নি। ডঃ শ্চেরবাৎস্কীর বই-এর সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম, তাই আমাদের কেবল পত্রদ্বারা পরিচয়ই নয়, ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। ১৯৩৫-এ আমি মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ যেতে না পারায়, উনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। উনি ১৯৩৭-এ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অকাদেমির পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করে আমায় ডেকেছিলেন কিন্তু নানান কারণেই আমি ওখানে মাত্র কয়েক মাস থাকতে পেরেছিলাম। এখন যুদ্ধের সময় তৃতীয় বার আবার আমার যাওয়া ঠিক হলো আর ডক্টর

শ্চেরবাৎস্কীর আগের চেষ্টার ফলে লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটি আমাকে সংস্কৃত পড়াতে ডেকেছিল।

অধ্যাপনার কাজ আমি খুব কমই করেছিল। ভারতে এখানে-ওখানে এক-আধ বছর সংস্কৃত পড়ানো ছাড়া লংকায় আমি অবশ্য দেড়বছরের ওপর সংস্কৃত পড়িয়েছি। কিন্তু এখানে আমি ইউরোপের এক সুপ্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটির আধুনিক রীতিতে সংস্কৃত পড়তে আগ্রহী ছাত্রদের অধ্যাপক হয়েছিলাম। তাও আবার পড়াবার মাধ্যম আমি না করতে পেরেছিলাম সংস্কৃতকে—কেননা ছাত্রদের এখন সংস্কৃতের মাধ্যমে পড়ালে বুঝতে পারবে না—আর না করতে পারছিলাম ইংরেজিকে। যদিও ইংরেজি সবাই কিছু কিছু পড়েছিল কিন্তু ওদের জ্ঞান অত্যন্ত কম ছিল। আমি সাধারণ ছাত্রদের ছাড়াও ওখানকার অধ্যাপকদেরও দর্শন বা কাব্যের উঁচুমানের গ্রন্থ পড়াতাম, যেখানে সংস্কৃত অবশ্যই সাহায্য করতো। মাধ্যমের অসুবিধে প্রথম বছরে অবশ্যই ছিল, কিন্তু সেটা এমন কিছু ছিল না যার জন্যে ছাত্রদের লোকসান হয়। আমার ভাষা শুদ্ধ ছিল না, কোথাও কোথাও তা খিচুড়ি হয়ে যেত। সেখানে আমি কিছু ইংরেজি আর সাধারণ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে বলতাম। ছাত্রদের বোঝার ব্যাপারে তাতে কোনো অসুবিধে হয় নি। প্রথম বছর আমি প্রথম বর্ষদের প্রায় নিই নি। পরের বছর তাদেরও পড়াতে লাগলাম। ছাত্র বলা ভুল হবে, কারণ পুরো ইউনিভার্সিটিতে দুশো ছেলের উল্লেখ আমার ডায়েরিতে আছে। সম্ভবত কুড়িতে একটা ফুটকি বাদ পড়েছে। তাও আবার পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে চারটে মেয়ে। তার থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর যুদ্ধের কি প্রভাব পড়েছিল। প্রথম বছরে তো পঞ্চম বর্ষের কোনো ছাত্র ছিল না। চতুর্থ বর্ষতে দুটি মাত্র মেয়ে ছিল। তৃতীয়তেও মেয়েদের সংখ্যা বেশি ছিল।

সোভিয়েত শিক্ষা-প্রণালীতে সাত বছর নিজের মাতৃভাষায় পড়াশুনো করা সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের অনিবার্য। অনিবার্য শিক্ষা চোদ্দর বছরের পর শেষ হয়। আবার তিন বছর শিক্ষার পর হাইস্কুলের পড়ার সমাপ্তি, যদিও আমাদের এখানকার মত ওখানেও দশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয়। কিন্তু দুটোর মধ্যে জ্ঞানের অনেক তফাৎ। সোভিয়েতের সাত বছরের পড়াশুনায় ছাত্রছাত্রীদের বিষয়-জ্ঞান আমাদের এখানকার হাইস্কুলের মত আর হাইস্কুলের দশ বৎসরের পড়াশুনো তো আমাদের এখানকার কলেজের তৃতীয়-চতুর্থ বর্ষের কাছাকাছি। এর কারণ হচ্ছে যে, ওখানে পুরো শিক্ষাই মাতৃভাষায়। নিজের মাতৃভাষা অর্থাৎ যে ভাষাকে বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে বলে আসছে। তাই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পড়তে ছাত্রকে যে সময় ওই ভাষায় দখল আনতে লাগে, সে সময়টা বেঁচে যায়। তার মানে এই নয় যে বিদেশী ভাষা ওখানে পড়ানো হয় না। প্রত্যেক রুশ বালককে নিজের মাতৃভাষা ছাড়া ইউরোপের আধুনিক তিনটি ভাষার (জার্মান, ফ্রান্স ও ইংলিশ) যে কোনো একটা নিতে হয়। সোভিয়েত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার অর্থ মুখস্থ বিদ্যে নয়। ওখানে মুখস্থ করা বা বারে বারে বলে পড়ার ওপর জোর দেওয়া হয় না। আমাদের এখানকার মত পরীক্ষা ওখানে যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয় না, যাতে অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ ছাত্রকে বধ করা হয়। ওখানে পরীক্ষার জন্যে না প্রশ্নপত্র ছাপা হয়, আর না খরচ হয় হাজার

হাজার মণ উত্তর লেখার কাগজ। হোক না কেন প্রারম্ভিক ক্লাশ, বা হাইস্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়, সব পরীক্ষাই যার যার নিজের অধ্যাপকরা নেন, প্রশ্নও মুখে মুখে। উত্তর দেবার জন্যে ছাত্র নিজের সব বই কাছে রাখতে পারে। আসলে যে ছাত্র ক্লাসে খুব বেশি অনুপস্থিত থাকে না, তার ফেল করা ওখানে সম্ভবই নয়।

হাইস্কুল (দশম শ্রেণী) পাস করার পর ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে বা মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা টেকনিক্যাল কলেজে যেতে পারে। প্রত্যেক জায়গায় পাঁচ বছরের কোর্স। আমার ক্লাশে যে ছাত্ররা পড়তে এসেছিল ওরা সবাই হাইস্কুল পাস করে এসেছিল। সংস্কৃত কোনো হাইস্কুলে দ্বিতীয় ভাষা ছিল না। আজকের জীবিত ভাষাগুলোর মধ্যে ব্যাকরণের দৃষ্টি থেকে সংস্কৃতের সব চাইতে কাছে রুশ ভাষা, তাই রুশ ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃত পড়তে কিছু সুবিধে অবশ্যই হতো। যখন ছাত্র প্রথম প্রথম দেখে যে ওদের ভাষার চশ (পেয়ালা), ব্রাত (ভ্রাতা), মাত (মাতা) ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃততেও আছে, তখন ওদের আশ্চর্য লাগে আর কৌতূহলও হয়। কিন্তু হাইস্কুল পাস করার পর কোন ছাত্রর কোন বিষয় নিয়ে আগে পড়া উচিত, সেটা ওর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আমাদের এখানে হাইস্কুল অব্দি গরিবদের পক্ষে পৌঁছনো মুশকিল। আরো এগোনো তো অসম্ভব। কিন্তু ওখানকার ছাত্রদের এসব কোনো চিন্তা নেই। ইউনিভার্সিটি বা কলেজের ছাত্ররা শতকরা নব্বইভাগ ছাত্রবৃত্তিতে পড়ে। শতকরা দশজন ছেলে তারাই যাদের মা-বাবারা ভালো বেতন পায়। এইভাবে যার আরো পড়ার ইচ্ছে তার রাস্তায় কোনো আর্থিক প্রতিবন্ধকতা নেই। এর পরিণাম অবশ্য এমনও দাঁড়ায় যে নাবালক ছেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যায়। আমি পয়লা সেপ্টেম্বরে (১৯৪৬) বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সময় প্রথম বর্ষের বাইশ-তেইশজন ছেলে-মেয়েদের দেখলাম, তাতে খুব প্রসন্ন হলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারলাম যে ওদের মধ্যে অনেকেই শুধু শুধু পড়তে এসেছে। ওদের সংস্কৃতের মতো রুক্ষ বিষয়ে কোনো রুচি নেই আর ভাষা শেখারও কোনো শখ নেই। আগে থেকে কোনো প্রস্তুতি তো ছিলই না। আমি ভাবতাম—সরকার কেন এত টাকা এইসব ছাত্রদের পিছনে বরবাদ করে। আমি অধ্যাপক বন্ধুদের জিজ্ঞেসও করতাম। কিন্তু কয়েক মাস বাদে দেখলাম, ক্লাশ থেকে সাত-আটটি ছাত্র এখান থেকে ছেড়ে অন্য বিষয়ে চলে গেল। যদিও কিছু টাকার অপব্যয় অবশ্যই হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষা না করা হলে জানা যাবেই বা কেমন করে যে কোন ছাত্র ভারতীয় বিদ্যা বা ভাষাতত্ত্বের দিকে এগোতে পারবে?

রুশ বিশ্ববিদ্যালয়েও আলাদা আলাদা বিষয়ের আলাদা আলাদা বিভাগ (ফাকুলতাত, ফেকাল্টি) আছে। যার মধ্যে একটা ফেকাল্টি প্রাচ্য-বিদ্যার। এই ফেকাল্টিতে মিশর থেকে জাপান অব্দি ভাষা ও তাদের সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা আছে। রুশ বিদ্বান সর্বপ্রথম তিব্বতী সাহিত্যের দ্বারা ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাশিয়া বাড়তে বাড়তে সাইবেরিয়ার ভেতর পৌঁছে গেল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশদের বৌদ্ধধর্মীয় মোঙ্গলদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যাদের ধর্মগ্রন্থ প্রায়শ তিব্বতী ভাষায় হতো। এইভাবে তিব্বতী ভাষার সঙ্গে রুশ বিদ্বানদের পরিচয় হলো আর পরে ওরা

জানতে পারলো যে তিব্বতী ভাষার বিশাল সাহিত্যের বেশ একটা বড় অংশ সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হয়ে এসেছে। তখন আবার ওদের মনোযোগ সংস্কৃতের দিকে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিম ইউরোপের বিদ্বানরা জানতে পারলো যে সংস্কৃত ভারতের একটি প্রাচীন ভাষা, যা সেই বংশেরই ভাষা যার বংশধর এখনকার ইউরোপীয়রা। বাঁপ আর অন্যান্য ভাষাতত্ত্ববিদরাও তাঁদের গবেষণায় এই বিষয়টিকে নিঃসন্দেহাতীতভাবে বিচার করে দিলেন যে সংস্কৃত ও ভারতের আরো সংস্কৃত বংশীয় আধুনিক ভাষার মূল স্রোত হলো সেটাই যা গ্রিক, লাতিন আর আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার স্রোত। এই আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে একটা তুমুল হইচই শুরু হয়ে গেল এবং ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজের নিজের জায়গায় সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা করতে লাগল। এইকথা যখন রুশরা জানতে পারলো তখন ওরাও নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে চাইল। ওই সময় লেনিনগ্রাদের নাম পিটারবুর্গ ছিল, আর ওটাই ছিল রাশিয়ার রাজধানী। তিব্বতী আর মোঙ্গল ভাষার সঙ্গে পরিচয় রুশদের অনেক আগে থেকেই ছিল। আর ওই সাহিত্যের দ্বারাই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচয় করে ওরা বৌদ্ধধর্মের ওপর বইও লিখেছিল। এটাও ওরা জানতে পেরেছিল যে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে এসেছে এবং ওখানকারের প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সর্বপ্রথম ত্বের (আধুনিক কালিনিন) নগরের নিবাসী অথানিউন নিকিতিন ইরান হয়ে সমুদ্রপথ দিয়ে দিব (কাঠিয়াওয়াড়)-কে উত্তরে রেখে ১৪৬৬ খ্রীস্টাব্দে বিদর (বাহমনী রাজধানী)-তে পৌঁছেছিল আর ছ বছর ওখানে ছিল। যদিও নিকিতিন নিজের যাত্রা সম্বন্ধে একটা বইও লিখেছে, কিন্তু সে কোনো ভাষাবিদ ছিল না, তাই ভাষার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় দিতে সফল হয়নি। কিন্তু গেরাসীম লেবেদোফ নামে এক রুশ গায়ক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে লন্ডনের রুশ দূতাবাসে চাকর হয়ে গিয়েছিল। ও ইংরেজদের থেকে জানতে পারলো যে ভারতে পগোড়া গাছ হয়, যেটা একটু নাড়ালেই তার থেকে সোনার মোহর ঝরে। আরো অনেক ইংরেজ তরুণদের মত গেরাসীমও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্লার্ক হয়ে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম (কলকাতা) পৌঁছোল। কিন্তু পগোড়া গাছ ও কোথায় পাবে? জীবিকার সন্ধানে ও কলকাতায় একটা নাট্যশালার স্থাপনা করলো। ওখানে নাট্যশালায় বোধহয় ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্যে ইংরেজি নাটকও দেখানো হতো, যাতে নিকিতা অংশগ্রহণ করতো, কিন্তু ও এইটুকুতে সন্তুষ্ট রইল না। কলকাতায় থেকে ও বাংলা এবং সংস্কৃতও শিখল, বিদেশী নাটক বাংলায় অনুবাদ করে দেখানোর চেষ্টা করলো। নিকিতা পনেরো-ষোল বছর ভারতে ছিল। ও নিজের সঙ্গে মোহর তো নিয়ে যায় নি কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃতর জ্ঞান অবশ্যই নিয়ে গেল। লন্ডনে পৌঁছে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ও ভারতীয় ভাষার একটি ব্যাকরণ লিখে ছাপিয়েছিল। পিটারবুর্গে তাকে এখন খুব প্রয়োজন ছিল, তাই ও নিজের জন্মভূমিতে ফিরে গেল। আজ থেকে ১৪৩ বছর আগে ও সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আজ্ঞায় ১৮০৫ সালে ছাঁচে ঢেলে দেবনাগরীর টাইপ বানালো। আজও গেরাসীমের বানানো ওই টাইপ রাশিয়ায় ব্যবহার করা হয়, যদিও আজকের টাইপের দৃষ্টিতে তা বিশ্রী মনে হয়। গেরাসীম হিন্দুধর্মের ওপরও রুশ ভাষায় বই প্রকাশ করেছে।

—১৯৪৬—

রুশ সরকার শুধু সংস্কৃতের মহিমা শুনে সন্তুষ্ট থাকতে রাজি ছিল না। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঝটপট সংস্কৃতের আসন স্থাপন করে যাচ্ছিল, তাহলে পিটারবুর্গই বা কেন পিছিয়ে থাকে? রুশ সরকারও রাবর্ত লেঞ্জ (১৮০৮-৩৬)-কে সংস্কৃত পড়তে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিল, ও প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক বাঁপের কাছে বার্লিনে সংস্কৃত পড়েছিল। স্বদেশে ফিরে পিটারবুর্গ (লেনিনগ্রাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের আসন তৈরি অবস্থায় পেয়েছিল। ১৮৩৫-এ ও সংস্কৃতের জন্য প্রথম প্রফেসর নিযুক্ত হলো। যদিও তরুণ লেঞ্জ ২৮ বৎসরেই মারা গেল, কিন্তু তার পরম্পরা নষ্ট হয় নি। পেত্রোফ (মৃত্যু ১৮৩৬), কোলোবিস্ক (১৮৭২), শিফ্‌নর (১৮১৭-৭৯), বোথিলিক (১৮১৫-১৯০৫), মিনিয়েফ (১৮৪০-৯০), ওল্‌দনবুর্গ (১৮৬৩-১৯৩৪) শ্চেরবাৎস্কী (১৮৬৬-১৯৪৩) থেকে নিয়ে আজ বরান্নিকোফ পর্যন্ত সংস্কৃত প্রফেসরদের পরম্পরা চলে আসছে। প্রথম সংস্কৃত প্রফেসর লেঞ্জের ১১০ বছর বাদে আমি ওখানে একজন ভারতীয় প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছিলাম। লেঞ্জ আমার চাইতে নিজের ছাত্রদের ভালোভাবে বোঝাতে পারতো, কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রফেসরের কথা কম মনোযোগ এবং আগ্রহ নিয়ে শুনতো।

এখন ভারতে সব স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকরা শিক্ষার্থীদের ওপর বিরক্ত। ওইদিন এক তরুণ বিদ্বানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অধ্যাপনার কথা বলাতে সে কান ধরে বলল, 'না, ছাত্রদের সামনে টেঁকা আমার পক্ষে মুশকিল।' বস্তুত, আমাদের ছাত্রদের বুদ্ধিতে মড়ক লেগেছে কিংবা তারা স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছৃঙ্খল—এই ব্যাপারটা আমি মানতে পারি না। দশ বছর হাইস্কুলে পড়ে আসা ছাত্র নিজেকে নিরেট বোকা ভাবতে পারে না। আমাদের এখানে ছ বছরেই পড়াশুনো আরম্ভ করা হয়। তাই হয়তো কোনো ছাত্র ষোল বছরের কমেই কলেজে পড়তে আসে। এ হেন ছাত্রকে দুগ্ধপোষ্য শিশু মনে করে ওর সঙ্গে তেমন ব্যবহার করাই আসলে এই ঝগড়ার মূল। প্রাচীন ভারতীয়রা এই তথ্যকে বুঝতেন, তাইতো ওঁরা বলেছিলেন, 'প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রত্ব মাচরেত।'[১] নিজের ছাত্রকে যদি অধ্যাপক বাচ্চা না ভেবে নিজের বন্ধু বলে মানে, তাহলে অনেকটা ঝামেলা দূর হতে পারে। কিন্তু রুশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তো অনুশাসন কায়েম রাখার সব চাইতে বড় উপায় হলো, ছাত্রদের নিজেদের সংস্থা ছাত্র সঙ্ঘ (তরুণ কম্যুনিস্ট সংঘ), যে নিজেদের সদস্যদের ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। ছাত্ররা নিজেদের স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধিকে প্রকাশ করতে একটুও দ্বিধা করে না। প্রত্যেক বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষার শেষে অধ্যাপকদের এবং ছাত্র-প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়, যাতে আগের তিনমাসের বা বার্ষিক পড়াশুনোর গুণ ও দোষ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়। তখন ছাত্র-প্রতিনিধিও তাদের অধ্যাপকদের দুর্বলতার কথা অকপটে বলে।

প্রাচ্য-বিভাগে (ফেকাল্টি) দেশ ও ভাষা অনুসারে আলাদা আলাদা উপবিভাগ আছে। আরবী উপবিভাগ ছিল, জাপানী আর চৈনিকও ছিল। এই ধরনেরই একটা উপবিভাগ (কাফেদ্রল) ছিল ইন্দো-তিব্বতী। তাতে সংস্কৃত, ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহ তথা

[১] ছেলে যখন ষোল বছরের হয়ে যায়, তখন তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা উচিত।—স·ম·

তিব্বতী ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা রুশদের ভারতের বিষয়ে জ্ঞান হয়েছিল, তাই আলাদা আলাদা বংশের হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত এবং তিব্বতীকে একসঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ছাত্রদের এক উপবিভাগে ভর্তি হয়ে শুধু ভাষাই পড়তে হতো না, উপরন্তু ওই দেশের সব কিছু জানবার জন্যে আরো জরুরি বিষয়েরও ভালো ধারণা করতে হতো। উদাহরণস্বরূপ আমাদের উপবিভাগের ছাত্রদের যেখানে পাঁচ বছর অব্দি সংস্কৃত হিন্দি পড়া অনিবার্য ছিল, সেখানে তার সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ভারতের দু-একটি প্রাদেশিক ভাষাও পড়তে হতো। ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় ধর্মই নয়, বরং ভারতীয় নৃতত্ত্ব এবং ভারতীয় অর্থশাস্ত্রও ছিল অনিবার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্নাতক সোভিয়েত রাশিয়া আর ভারতের মধ্যে রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি সম্পর্ক স্থাপন করতে মুখ্য ভূমিকা নেবে, তাই ওদের জন্যে ভারত ও ভারতীয়দের সম্বন্ধে পুরো জ্ঞান আবশ্যক মনে করে ওই রকমই শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রফেসর হওয়ার জন্যে আমাকে হপ্তায় বারো ঘণ্টা পড়াতে হতো। আমি মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবারে পড়াতে যেতাম। প্রথম বছর আমাকে সংস্কৃত আর হিন্দি পড়াতে হতো, দ্বিতীয় বছরে তিব্বতীও। আমাদের বিভাগে ১৯৪৭-এর আরম্ভে চল্লিশটির কাছাকাছি ছাত্র-ছাত্রী ছিল আর অধ্যাপিকাদের সংখ্যা সাত-আট। অকাদেমিক বরান্নিকোফ ছিলেন উপবিভাগের অধ্যক্ষ আর আমি প্রফেসর। বাকি সব লেকচারার (দোৎসেন্ত)—শ্রী কলিয়ানোফ সংস্কৃতের, শ্রীবিস্ক্রোবনী আর শ্রীমতী দীনা গোল্‌দমান হিন্দির। এছাড়াও বাংলা ভাষারও অধ্যাপক ছিল। শ্রীসুলেকিন রাজনীতি আর অর্থশাস্ত্র পড়াতেন।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে কিছু নতুনত্ব অবশ্যই বোঝা গিয়েছিল, তারপর তো জীবন অতি সরল হয়ে গিয়েছিল। আমার উঁচু ক্লাশে (চতুর্থ বর্ষ) দুটি মেয়ে ছিল, যার মধ্যে একজন (বের্থা) সাধারণ শিক্ষিতা মধ্যবিত্ত পরিবারের ইহুদী মেয়ে আর দ্বিতীয় (তান্যা) পুরনো সামন্তবংশের। ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা সঙ্কোচে কথাবার্তা বললে এবং মেলামেশা করলে রাশিয়ার নাগরিক জীবনের অনেক কিছু জানা যেত। ওই সময় যুদ্ধের কারণে অনেক বাড়ি ধসে পড়ে গিয়েছিল, যদিও সেগুলোর পুনর্নির্মাণে খুব তৎপরতা ছিল, কিন্তু ছু-মন্তরে তো আর বাড়ি দাঁড়িয়ে যেত না। লোকেদের বাড়ির কষ্ট অবশ্যই ছিল। কষ্ট এই অর্থে যে সবার যথেষ্ট ঘর পাওয়া যেত না। আমি ছিলাম প্রফেসর। আমার খুব কম করেও তিনটে ঘর তো পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার ছিল মাত্র দুটো। রেক্টর এবং অন্যেরা চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এই অসুবিধে এত তাড়াতাড়ি থোড়াই দূর হওয়া সম্ভব ছিল? আমি তো দুটোতেই সন্তুষ্ট। একদিন ঘরের এই অসুবিধে নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। আমি বললাম, 'একটা ঘর দুজনের পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট।' সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরাও এতে কোনো আপত্তি তুললো না, কিন্তু দ্বিতীয় তরুণীটি বলতে লাগল, 'আমার তো পাঁচখানা ঘর চাই।' আমি বললাম, 'পাঁচখানা ঘর নিয়ে তো তুমি তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেই মারা পড়বে?' ও বলল, 'আমি পরিষ্কার করে নেব।'

রাশিয়া সাম্যবাদী দেশ। সাম্যবাদী অর্থনীতি মেনে ওখানে চলতে হয়। আর ব্যবহারেও

সাম্য দেখানো শিষ্টাচার বলে মানা হয়। শীতে ইউনিভার্সিটির ঘরগুলো গরম করার জন্যে আগুন জ্বালাতে হতো। ইউনিভার্সিটির আমাদের বিভাগের পাকা বাড়িটা তো আজ থেকে একশো-দেড়শো বছর আগে হয়েছিল। ওই সময় কেন্দ্রীয় তাপ আবিষ্কৃত হয় নি, কাঠ জ্বালিয়ে বাড়ি গরম করা হতো। আমার ঘরটা কাঠ জ্বালিয়ে গরম করতো যে মেয়েটি সে আমাদের দেশের মজুরনীর মত ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গেও প্রফেসর হোক কিংবা অকাদেমিক বরান্নিকোফ হোক, সমান সমান ব্যবহার করে হাতে হাত মেলানো, ওর সামনে টুপি নামিয়ে শিষ্টাচার প্রদর্শন করা কর্তব্য বলে ধরা হতো। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীর সমান বেতনভুক্ত প্রফেসরেরও ইন্ধনের জন্যে কাঠ কাটা, বাসন মাজা, ঝাড়পোঁছ করে বাড়ি পরিষ্কার রাখা এবং অনেক কাপড় কাচাও করণীয় ছিল। কাঠ কাটার কাজ তো আমাকে করতে হয় নি, সে ব্যাপারে লোলা উপযুক্ত ছিল। আমার ভয় হতো পায়ের ওপরে ও না কুড়ুল চালায়! কিন্তু বাসন মাজা তো আমার ডিউটি ছিল। শীতে এই কাজে খুব কষ্ট হতো। চল্লিশ ডিগ্রি (ফার্ন·) তাপে হাত কুঁকড়ে দেবার মতো জলে বাসন ধুতে হতো। লোলা গরম জল করে রেখে দিত, কিন্তু আমার কলের জলে বাসন ধুলে সময় বাঁচে বলে মনে হতো, তাই ছুঁচ ফোটানো জলে বাসন ধুতে চাইতাম। বাড়ির জন্যে চাকর রাখতে পারতাম আর চাকর পাওয়াও যেত; কিন্তু যে অন্য জায়গায় তিনশো রুবল পেত, সে ছশো চাইতো। শেষের দিকে আমি এক বছর চাকর রেখেও ছিলাম, কিন্তু এত পর্যাপ্ত জিনিস রেশনে পেতাম না যা দিয়ে চাকরেরও চলে যায় এবং অতিথিদেরও, তাই ওকে ছাড়িয়ে দিতে হলো। বলা বাহুল্য, ওখানকার চাকর আর অন্য কোনো পুঁজিবাদী দেশের চাকরের মধ্যে তফাৎ আছে। এমনিতে ইংলন্ডেও বাড়ির চাকর সময় মত আসে ও কাজ করে। আমার চাকরানী মান্যা সময় মত আসতো। বড় ভালোমানুষ ছিল, দরকারে বেশি সময়ও দিত। রোববার চাকরের ছুটি থাকতো আর মালিক-মালকিনদের বাড়ির সমস্ত কাজ নিজের হাতে করতে হতো। খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসার ব্যাপারে প্রফেসর আর তার চাকরে কোনো তফাৎ ছিল না।

শুধু বাসন-কোসনই কেন, রেশনের দোকান থেকে বিশ-পঁচিশ সের জিনিস পিঠে বয়ে আনাও প্রফেসরের ইজ্জতহানির ব্যাপার ছিল না। আসলে ওখানে খুব কম ঘরেই চাকর ছিল। কাউকে অস্থায়ীভাবে কাজে রাখলে মজুরি বেশি দিতে হতো। দেড়-দু মণ কাঠ চেরাই-এর জন্যে যখন পঁচিশ-তিরিশ টাকা দিতে হয়, তখন তো নিজের হাতে কাঠ চেরাই করা সুবিধে মনে হয়। একইভাবে ভারবাহককে দু'ঘণ্টার কাজে যদি পঁচিশ-তিরিশ টাকা দিতে হয়, তাহলে আপনি শারীরিক পরিশ্রমের মূল্য বুঝতে পারবেন এবং নিজে কাজ করতে চাইবেন।

এই যাত্রায় রাশিয়ায় আমার দেখা জীবনগুলোর সম্বন্ধে আরো কথা পরে আসবে। এখানে এই বলে শেষ করতে চাই যে রুশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাবরণ আমাদের এখানকার বাতাবরণের থেকে একদম অন্যরকম। ওখানে প্রথম শ্রেণীর মস্তিষ্কদের বেশি বেতনের লোভে অন্য সরকারি চাকরির পেছনে দৌড়তে হতো না। যেখানে প্রফেসর আর মিনিস্টারের মাইনে এক, মিনিস্টারির বড় বড় অফিসারের থেকেও প্রফেসর বেশি বেতন

আর সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারেন, সেখানে প্রতিভাশালী বিদ্বান কিসের জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবেন?

আমার থাকার জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় যেতে-আসতে ট্রামে তিন ঘণ্টা লাগতো। ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষরা মোটর গাড়ি দিতে চাইছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রভাবের কারণে জিপই পাওয়া যেত। দু-একদিন জিপ আমাকে নিতেও এসেছিল, কিন্তু আমি সময় মত ক্লাশে পৌঁছতে চাইতাম অথচ ড্রাইভারের সেদিকে কোনো চিন্তা ছিল না, তাই ট্রামে যাওয়াই আমি পছন্দ করলাম।

কোনো কোনো সময় আমি বই-এর খোঁজে ছেঁড়া কাগজের দোকানের ধুলো ঘেঁটে সারা রাস্তা হেঁটেও আসতাম। সোভিয়েতে বই-এর আকাল বলে মনে হয়। সব লোক শিক্ষিত এবং তাদের হাত খালি না হওয়ায় বই-এর খদ্দের ওখানে অনেক। ৫০ হাজার বা ১ লাখের সংস্করণও হাতে হাতে বিক্রি হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ নতুন বই-এর খবর আগেই বেরিয়ে যায়। লেনিনগ্রাদের মত বড় বড় শহরে নাম রেজিস্ট্রি করার অফিস আছে। যদি কেউ নাম লিখিয়ে নেয় তাহলে বই পেয়ে যাবে। কিন্তু এক বছর বা ছ মাস পরে। আবার যদি সে বই মধ্য-এশিয়ার সম্পর্কিত ইতিহাস বই হয়, তবে তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেখানে নাম লেখানোর জন্য খুব তাড়াহুড়ো করতে হয়, না হলে তালিকা বন্ধ হয়ে যায়। লেনিনগ্রাদের সব চাইতে বড় রাস্তা নেবস্কী-র পথে আধ ডজন এই ধরনের দোকান আছে যেখানে পুরনো বই বিক্রি হয়। এই দোকান কোনো রদ্দি মাল বিক্রেতার দোকান নয়, তা সরকারি বা আধা সরকারি সংস্থার। দু'চারবার যাবার পর যখন কাজের বই পেয়ে গেলাম তখন ওইগুলো দেখাতে আমার নেশা লেগে গেল। 'মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস'[১]-এর অধিকাংশ বই এই দোকানগুলো থেকেই আমি সংগ্রহ করে ভারতে এনেছিলাম।

১৮ সেপ্টেম্বরে আমি পড়ানোর জন্যে ইউনিভার্সিটি গেলাম। একটা থেকে পাঁচটা অব্দি দুটো ক্লাশে হিন্দি আর উর্দু পড়াতে হলো। প্রথম দু'ঘণ্টা দ্বিতীয় বর্ষের একটি ছাত্র আর পাঁচটি ছাত্রীর জন্যে দিতে হলো। ফের দু'ঘণ্টা চতুর্থ বর্ষের দুটি ছাত্রী বের্থা আর তাঞ্জার জন্যে। নিয়ম ছিল—পঞ্চাশ মিনিট পড়ানো ফের দশ মিনিট বিশ্রাম, ফের (সময়ের) দশ মিনিট আগেই ছুটি।

স্কুলের পড়াশুনো দশ বছরে শেষ, তখন বয়স ১৭ বছরের ওপরে হয়ে যায়। আবার পাঁচ বছর ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েট হবার জন্যে দিতে হয়। আবার তিন বছর এস্পেরান্ত-এর জন্যে। এই দুই পরীক্ষাতেই প্রমাণপত্র পাওয়া যায়, ডিগ্রি নয়। এস্পেরান্তের পরে, তিন বা তার বেশি বছরে ডক্টরেট-এর জন্যে নিবন্ধ লিখতে হয়, তবেই ডক্টরেট উপাধি পাওয়া যায়। ২৮ বছরের আগে কেউ ডক্টরেট হতে পারে না। স্কুলের পড়াশুনোয় একটি বিদেশী ভাষা জার্মান, ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজি নিতে হয়, যা অনেক ছেলেই

[১] ১৯৫২ সালে লেখা লেখকের এটি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। পাটনায় অবস্থিত রাষ্ট্রীয় ভাষা পরিষদ গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৯৫৮ সালে এই গ্রন্থের জন্য লেখক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান।—স·ম·

পরে ভুলে যায়।... ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য বিভাগের পড়ার বিষয় হলো—প্রথম বছর সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, পরের বছর আবার ওর সঙ্গে বাংলা, মারাঠী, ফারসী ইত্যাদিও নিতে হয়। ভাষার এতটা প্রাচুর্য আমার পছন্দ নয়। কিন্তু ইউনিভার্সিটির পাঠক্রম বহু বছর ধরে এরকমই চলে আসছে। দ্বিতীয় বছরের ছাত্রদের দেখে আমার মনে হলো যে এক বছরেই ওরা হিন্দি আর উর্দুর পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছে।

২০ সেপ্টেম্বর (১৯৪৫)-এ আমি আমার ডায়েরিতে লিখলাম—'আজ এগারোটা থেকে তিনটে অব্দি প্রথম ও চতুর্থ বর্ষের পড়ানো হলো। প্রথম বর্ষে (১৯টি মেয়ে ৩টি ছেলে) সর্বসাকুল্যে ২২টি ছাত্র। বেশির ভাগ ছাত্র লেনিনগ্রাদের কিন্তু একটি ছাত্র বাকুর আর তিনটি ছাত্রী অল্মাঅতা, বোরোনেজ এবং রস্তোফের। সবাই রুশ। আজ ক-খ পড়ালাম। সব কিছু রুশ ভাষায় বলতে হয়। একটার থেকে তিনটে অব্দি চতুর্থ বর্ষকে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়াতে হলো।'

ওই দিন ছটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত অধ্যাপকদের বৈঠক হয়েছিল। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ভাষণ দিয়েছিলেন। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ছাত্র ছিল। সাড়ে তিন হাজার অধ্যাপকদের মধ্যে চল্লিশের বেশি অকাদেমিক বা উপ-অকাদেমিক ছিলেন। পাঁচ হাজার ছাত্রের জন্যে সাড়ে তিন হাজার অধ্যাপক নিঃসন্দেহে বেশি। আসলে ছাত্রের সংখ্যা যুদ্ধের কারণে কম ছিল আর এখন তা প্রতি বছর বাড়ছিল। তবু এতে সন্দেহ নেই যে সাত-আট হাজার ছাত্রের জন্যেও সাড়ে তিন হাজার অধ্যাপক বেশি। কিন্তু সোভিয়েত শিক্ষা-প্রণালীতে এই কথা মনে রাখা হয় যে অধ্যাপক যেন ছাত্রদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে এবং তাহলেই ওদের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা পূর্ণ করতে পারবে। এই সেমিনার-প্রথায় বেশি অধ্যাপক থাকা আবশ্যক। শিক্ষা-সংস্থাগুলোর জন্যে বাজেটে টাকা-পয়সার অভাব হয় না। আমাদের এখানে এখনও সেমিনার-প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া সোজা নয়।

মধ্যবিত্তের মনোবৃত্তি

পুঁজিবাদী পত্রপত্রিকা আর লেখকরা এত জোর প্রচার চালাচ্ছে যার ফলে অনেক সত্যনিষ্ঠ লোক মাঝে-মধ্যে এই ভুলের শিকার হচ্ছে যে সত্যিই সোভিয়েত রাশিয়ায় বাক্-স্বাধীনতা নেই। ওরা ভাবে যে ওখানকার লোকদের গলা টিপে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। বাক্-স্বাধীনতার অর্থ বলতে ও লিখতে পারার স্বাধীনতা মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পুরনো স্বার্থের প্রতিনিধিদের জন্যে সংবাদপত্রের দরজা এমনিই খোলা নেই, যেরকম বিড়লার মত লোকেদের সংবাদপত্রের আমাদের মত স্বাধীনচেতা লেখকদের স্থান নেই। এটুকু তফাৎ অবশ্যই আছে যে এখানকার পত্রপত্রিকার দশ-পাঁচটা

ক্রোড়পতি নিজের হাতে করে স্বাধীনতার গলা টিপে রেখেছে, কিন্তু রাশিয়ায় বিরোধী প্রোপাগাণ্ডার জায়গা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে সেটা কোনো ক্রোড়পতি মালিকের জন্যে নয়। ওখানকার দৈনিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক কাগজ, হয় 'ইজবেস্তিয়া'র মত সরকারের মুখপত্র, নয় তো 'প্রাভদা'র মত কম্যুনিস্ট পার্টির, অথবা কোনো নগরপালিকা, ইউনিভার্সিটি, মজদুর সংগঠন, সৈনিক সংগঠন বা ছাত্র-সংগঠনের দিক থেকে বেরোয়। পত্রিকার এত আধিক্য যে, অনেক কলখোজও (যৌথ চাষাবাদের গ্রাম) চার পাতার কাগজ বার করে। এটা ঠিক যে, যে সংগঠনগুলো এই সব কাগজ বার করে, সেগুলো নিজেদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে সাহায্য করবে না। ঠিক একই ব্যাপার ভাষণ-মঞ্চেও হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভাষণ-মঞ্চ কোনো না কোনো এরকম সংস্থার সঙ্গে জড়িত, যে নাকি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষ যদি তার মতামতকে কয়েকশো তথা কয়েক হাজারের মধ্যে প্রচার করতে না পারে, তাহলে অন্তত বিশ-জনের কাছেও সে পৌঁছতে পারবে না। এটা বোঝা উচিত যে, সোভিয়েত-শাসনের আর্থিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রে যে সফলতা জুটেছে, তা কেবল অভূতপূর্বই নয়, বরং মাত্রায় তা এত বেশি যে নিরানব্বই শতাংশ সাধারণ মানুষ তাতে লাভবান। ওরা নিজেদের চোখের সামনে ওই লাভ দিন দিন বাড়তে দেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জেতার পর সোভিয়েত-শাসন লোকের মনে নিজেদের গৌরব আরো দৃঢ় করেছিল। এই কারণে সোভিয়েত জনগণের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুই জন সোভিয়েত-শাসনের অন্ধ ভক্ত। স্তালিন তো তাদের কাছে জাগ্রত ভগবান, যাঁর বিরুদ্ধে ওরা একটি কথাও শুনতে রাজি নয়। এ হেন অবস্থায় ভাষণ-মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সোভিয়েত-শাসন বা স্তালিনকে গালি দেবার সাহসই বা কার হতে পারে? কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিরোধীমত প্রকাশ করার লোক ওখানে নেই, ফলে সে নিজের ভিন্নমত জানাতে পারে না। নিজেদের বন্ধুমহলে সবাই নিজেদের মতকে খোলাখুলি আলোচনা করে। ভিন্নমত পোষণকারীরাও খুব কমই সোভিয়েত-বিরোধী হয়। বেশির ভাগ তো শুধু অসন্তোষ জানাতে চায়। এই ধরনের অসন্তোষ পোষণ করা নরনারী, পুরনো উচ্চ বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে পাওয়া যায়, যারা নিজেরা না শুনলেও মা-বাবার মুখে শুনে সর্বদা মুখস্থ করতে থাকে—

'তে হি নো দিবসা গতঃ।'[১]

এই ধরনের উদাহরণ আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দিচ্ছি। এক পুরনোপন্থী মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মহিলা নিজের ছেলেকে বাইরে কোনো স্কুলে পাঠানোর বিরোধিতা করছিল এই কারণে যে, তার মনে হয় ওখানে গুণ্ডা ছেলেতে ভর্তি। আমি বললাম, 'তাহলে তো বাড়িতে রেখেই পড়াশুনো করানো উচিত।' খাটো গলায় উত্তর পেলাম, 'হ্যাঁ।' আরেকজন মহিলা বলছিল, 'কম্যুনিস্টরা ধাপ্পাবাজ নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। সোভিয়েত মানুষকে ভিখিরি করেছে। আগে সবই সুখের ছিল।' এতে কোনো সন্দেহ নেই যে উক্ত মহিলার 'সব' বলতে—পয়সাওলা আর উচ্চশ্রেণী। নয় তো সোভিয়েত-শাসনে এখন

[১]'আমাদের সেইসব দিন চলে গেল!'—স·ম·

কোথাও গরিব ভিখিরি দেখতে পাওয়া যায় না। উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত মহিলারা আগে যে কোনো কাজ করাই পাপ বলে মনে করতো। এখন তাদের পরিশ্রম করে রুজি-রোজগার করতে হয়, তাহলে ওরা আর কি করে এই জীবন পছন্দ করবে?

নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে ওখানে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। স্কুলে যাবার আগের পর্যায়ে সাত বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য শিশু-নিকেতন আর শিশু-উদ্যান এত বেশি গড়ে উঠেছে যে রাষ্ট্রের সমস্ত ছেলেমেয়েদের সেগুলোতে রাখা সম্ভব। এটাও মেনে চলা হয় যে বাচ্চাদের শারীরিক দণ্ড দেওয়া ভালো না।

২৪ জুনে আমি বাবুস্কিন নামে বিশাল এক উদ্যানে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের চার বছর উপেক্ষিত থাকার জন্যে জায়গাটা অবশ্যই কিছুটা ম্লান হয়ে ছিল, তবুও বাগানটা খুবই ভালো ছিল। পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে সেখানে মেরামতের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের পাড়া থেকে এই উদ্যান খুব বেশি দূরে ছিল না, তাই আমরা ওখানে প্রায় যেতাম। আমরা ফিরছিলাম। রাস্তায় দেখলাম যে একটি মা তার পাঁচ বছরের শিশু-সন্তানকে খুব পেটাচ্ছে। বেশ জোরে আওয়াজ আসছিল, আর ছেলেটাও খুব চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু চোট লাগার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কেননা ছেলেটা তুলোর কোট পরে ছিল এবং মায়ের হাতে রাস্তা থেকে উপড়ে তোলা একটা নরম সবুজ ডাল ছিল। দোষ এই করেছিল যে ছেলেটা তিন বছরের বোনকেও সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিল। আর মা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। মা জানতো ভাইবোন মিলে বাবুস্কিনের দিকেই গিয়ে থাকবে, তাও খুঁজতে তার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ভাইয়ের মুখটি বড়ই দুঃখী বলে মনে হচ্ছিল এবং প্রায় কাঁদো কাঁদো। দুজনের গোলাপী গাল সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক, যদিও গাল ময়লা ছিল। এক মধ্যবিত্ত মহিলা চট করে মন্তব্য করে বসলো, 'বলশেভিক গাধাকে পিটিয়ে থোড়াই ঘোড়া বানাতে পারে?' বাচ্চা দুটো এবং ওদের মা ছিল মজদুর শ্রেণীর। ওদের পোশাকেও মধ্যবিত্তর সুরুচির নমুনা ছিল না, তাই এমন মন্তব্য করা হলো।

বাড়িতে পায়খানার ফ্লাশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অনেক বলার পর পায়খানার দেখাশুনো করে যে মহিলা সে তার বান্ধবীর সঙ্গে এলো। ও গৃহিণীর কাছে জবাব চাইল, 'পায়খানা যখন খারাপ হয়ে গেছে, তখন তাকে কেন ব্যবহার করেছ?'

'ব্যবহার করব না তো কি রাস্তায় বসে পড়ব?'

'নিজেই কেন ঠিক করে নাও নি?'

'যন্ত্রপাতি কোথায়, আর তাছাড়া তোমরা কি বারিন (ভদ্রলোক) হয়ে বসে থাকবার জন্যে? কাজ না করে থাকতে চাও?'

মেরামতকারিণী খুব অহঙ্কারের সঙ্গে জোর দিয়ে বলল, 'আমি বারিন নই, আমি মজুরশ্রেণীর।'

দুই শ্রেণীর মহিলাদেরই মনোভাব এই বার্তালাপে ভালোমত প্রকাশ পাচ্ছে, পুরনো মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত যদিও এখন উৎপীড়িত-অপমানিত নয়, কিন্তু ওরা জানে যে রাশিয়ায় এখন সমস্ত শক্তি মজদুর শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত, তাও কখনও কখনও তাদের

ভেতরের মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এই মনোভাব যদিও এখনও দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তা মূর্খতাপূর্ণ পুরনো অভ্যাস ছাড়া আর কিছু না। এই মনোভাবের দিগ্‌দর্শন একটি সোভিয়েত নাটক 'ক্রেমলিনের ঘড়ি'-তে ভালো করে দেখানো হয়েছে, যেটা আমি ১৫ জুলাই ১৯৪৫-তে মস্কোর গোর্কী আর্ট থিয়েটারে দেখেছি। ১৯৪২ সালে নাটকটি লেখা হয়েছে; কিন্তু তাতে ১৯২০-এর শ্রেণীভেদের ছবি ছিল। তাতে সব দৃশ্যই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পর্দাগুলো খুলে নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার থেকেও বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল চাকার ওপর রাখা বড় বড় প্রাকৃতিক তথা অন্যান্য দৃশ্যের ফলক, যেগুলোকে অতি সহজেই সরিয়ে দৃশ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছিল। প্রথম দৃশ্যে নগরের স্ত্রী-পুরুষেরা নিজেদের জিনিসপত্র বেচাকেনা করছিল, ভিখিরি ভিক্ষে করছিল। এই সময়ে এক বেকার ইঞ্জিনিয়ার কাউকে বলছিল, 'ক্রেমলিনের ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।' অর্থ ছিল—সোভিয়েত-শাসনের গাড়ি থেমে গেছে অথবা সোভিয়েত-শাসন শেষ হয়ে আসছে। ওই সময়ের ধনী আর শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেদের নতুন শাসন-ব্যবস্থার প্রতি এরকম মনোভাবই ছিল। দ্বিতীয় সিনে ছিল এক নৌবাহিনীর সৈনিক রিবাকোফ ও তার প্রেমিকা মশিনকার প্রেমাভিনয়। মশিনকা ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে ছিল। নৌ-সৈনিক রিবাকোফ নতুন শাসন-ব্যবস্থার পক্ষপাতী। মশিনকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে দোনামনায় ছিল। এর পরের দৃশ্যে লেনিনকে দেখানো হয়েছিল, যাকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে শিকারীরা পাহারা দিচ্ছিল। লেনিনের সঙ্গে ওই শিকারীদের বেশভূষাব বা মেলামেশায় কোনো ভেদাভেদ বোঝা যাচ্ছিল না। লেনিন এক শিকারীর বাড়ি যায় আর ছেলেদের সঙ্গে খুনসুটি করে ওদের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। মেয়েটি মনোযোগ দিয়ে লেনিনের দিকে তাকিয়ে দেখছে। ছেলেটা একটু বুদ্ধিমান। সে আগন্তুক শিকারীকে একটা ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। তাও তার সন্দেহ যাচ্ছে না। তখন লেনিন তার টেকো মাথার থেকে টুপি খুলে ফেললো। ছেলেটা নিশ্চিত জানলো যে, ওদের সঙ্গে আছে খেলার সাথী শিকারী মহান লেনিন।

একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল—ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গ্রাফ (কাউন্ট), গ্রাফীনা আর অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক এবং মহিলারা সোভিয়েত শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কড়া কড়া টিপ্পনী কাটছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও পাচ্ছিল। এই সময়ে মতরোশ (জামাই) রিবাকোফ নৌ-সৈনিকের পোশাক পরে ভেতরে ঢোকে। সব ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা নবাগতর মুখোমুখি হয়। তারা ভয় পায়—'এ তো সোভিয়েত সরকারের সৈনিক। যদি রেগে যায় তো আমাদের সর্বনাশ।' এখানে এটাও বলে দিই, এই নাটকে মশিনকার পার্ট যে মহিলা করছিল, সে ওই হোটেলেরই পরিচারিকা যে হোটেলে আমি ছিলাম। সেই সময় সরকারের তরফ থেকে ইঞ্জিনিয়ারের ডাক আসে। ইঞ্জিনিয়ার একটি ছোট পুঁটলি বেঁধে জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার স্ত্রী কাঁদে, ভাবে বলশেভিক ওকে জেলে পাঠাচ্ছে, এখন আর সে জ্যান্ত ফিরবে না।

ইঞ্জিনিয়ারকে ক্রেমলিনের ভেতরে পৌঁছে দেওয়া হলো। লেনিন, স্তালিন আর জেরজিনস্কী তার সঙ্গে কথা বলে। ইঞ্জিনিয়ার বলশেভিকদের সোস্যালিজমের ওপর ঘৃণা

প্রকাশ করে। লেনিন সে কথায় কান না দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার কথা শুরু করে এবং তার সামনে যোজনার একটি নকশা রাখে। ইঞ্জিনিয়ার সমস্ত ঘৃণার কথা ভুলে যায়। একবার তো স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তার আঙুল নকশার ওপর চলে যায়, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয়। স্তালিন জিজ্ঞেস করে, 'তোমার রাজনীতির সঙ্গে কি সম্বন্ধ? তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার, নিজের দক্ষতা দেখাও।' বধ্য ইঞ্জিনিয়ারের যৌবনের উৎসাহ প্রবল হয়ে ওঠে। সেও বড় বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার। একদিন সে বড় বড় বিদ্যুৎ কারখানা বানানোর স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু জারের সরকারে তার কথা শোনার লোক কে ছিল? তার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যেই চাপা পড়ে থেকে গিয়েছিল আর এখন বুড়ো বয়সে রাজ্যের হর্তাকর্তা স্বয়ং তাকে ডেকে সেই স্বপ্নকে জাগ্রত করছে। ইঞ্জিনিয়ারকে চিন্তা করে জবাব দেবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, আর গাড়িতে করে তাকে তার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরিবার এইভাবে ইঞ্জিনিয়ারকে পেয়ে আনন্দাশ্রু ফেলে। ইঞ্জিনিয়ারের চোখ খুলে যায়। সে লেনিনের তারিফ করে। যৌবনকালে লেখা নিজের বই ফের বার করে দেখায়। সে মশিনকাকে ওপর ওপর রাগ দেখিয়ে প্রেমের ভাষায় বলল, 'বেকুব মেয়ে, তুমি কোনো ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করো নি কেন?'

মশিনকা—'জার-এর ক্যাপ্টেনকে? তাহলে তো তুমি এই মুহূর্তে প্যারিসে থাকতে।'

এইভাবেই এক নামকরা ঘড়ি মেরামতকারীকেও ক্রেমলিন নিয়ে যাওয়া হয়। জেরজিন্‌স্কীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভয়ে কাঁপতে থাকে।

জেরজিন্‌স্কী যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েতের গৃহরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ছিল। কোনো লোক সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে ওর কবল থেকে বাঁচতে পারতো না। লেনিন কথা বলে ঘড়ি মেরামতকারীর মনও খুলে দিল এবং ওর দক্ষতার প্রশংসা করলে ঘড়ি মেরামতকারী বলল, 'আমি এই ঘড়ি মেরামত করতে পারি।' লেনিন বলল, 'শুধু মেরামত করলেই হবে না। ক্রেমলিনের ঘড়িকে এইভাবে বানিয়ে দাও যে সেটা ঘণ্টা বাজানোর সময় আন্তর্জাতিক গান গাইবে।' এর মধ্যে চা এসে গেল। লেনিনের সঙ্গে চা খেয়ে ঘড়ি মেরামতকারীর মন পুরোপুরি খুলে যায় আর সে তখুনি ঘড়ি দেখার জন্যে উতলা হয়ে পড়ে।

আর একদিকের দৃশ্যে রিবাকোফ-এর যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া দেখানো হয়। রিবাকোফ কমিসর (রাজনৈতিক পরামর্শদাতা) রূপে কোল্‌চকের বিরুদ্ধে লড়াইকারী সেনার সঙ্গে যাচ্ছে। যুদ্ধে যাওয়া পতির পত্নীর কাছ থেকে বিদায়ের খুব করুণ দৃশ্য উপস্থাপিত করা হয়েছিল। মশিনকা আগে যেতে দিতে চাইছিল না, তারপর চুমু খেয়ে তাকে বিদায় দিল। পতি বাইরে চলে যায়। মশিনকার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে সৈনিক বিভাগ থেকে টেলিফোন আসে। মশিনকা চোখে জল নিয়ে গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, 'কমিসর উয়েখাল' (কমিসর চলে গেছে)। ইঞ্জিনিয়ার নিজের যোজনা লিখে নিয়ে গিয়ে লেনিনের কাছে পেশ করলো। লেনিন তা স্বীকার করে বলল, 'টাকাপয়সা আর জিনিসপত্রের চিন্তা করো না, তুমি নিজের কাজে লেগে যাও।' ইঞ্জিনিয়ারের আনন্দের সীমা রইল না। ঘড়ি মেরামতকারী ক্রেমলিনের ঘড়ি চালু করে দেয় এবং তাতে

ইন্টারন্যাশনাল গান শোনা যায়।

এই নাটকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরনো মনোভাব বদলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সোভিয়েত নেতারা নাটক আর সিনেমার গুরুত্ব খুব ভালোভাবে বোঝে। ওরা ভাবে যে এটা একটা খুব বড় শক্তি, যার দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোভাব অল্প সময়েই বদলানো যায়।

মনোভাব অবশ্যই বদলেছে, কিন্তু বংশগত মনোভাব বদলাতে বেশ দেরি হয়। আমার পরিচিতদের মধ্যে জার্-এর জেনারেলের মেয়ে এক প্রৌঢ়া মহিলা ছিল। উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে সে ছিল পুরোপুরি দীক্ষিত। বাবা জেনারেল থাক্যকালীন পরিচারিকাদের হাতে সে খেলে বেড়াতো, কাজ করার অভ্যাস ছিল না। রুশ ছাড়াও আরো ইউরোপীয় ভাষা জানতো। ওর কাজ ছিল সারা দিন শুধু সাজগোজ পাল্টানো, নাচ-থিয়েটারের পেছনে দৌড়নো বা উপন্যাস পড়া। চারবার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, যুদ্ধের সময় এক মোটর মেকানিককে বিয়ে করেছিল। বর্গ আর শ্রেণী ভেদাভেদ আর্থিক কাঠামো বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি বদলেছিল, যে ভদ্র মহিলার মোটর ড্রাইভার-এর সঙ্গে বিয়ের কোনো কানাকানি হয় নি। এই সময় সে স্বামীর রোজগারের টাকায় নয়, নিজের রোজগারের টাকায় খাচ্ছিল। কোনো এক কারখানায় লেখালিখি গোছের কোনো কাজ করছিল আর মাসে চারশো রুবল (২৫০ টাকা) পাচ্ছিল। সে নিজে তিন কামরার বাড়িতে থাকতো, তাই মাসিক একশো রুবল তিনটে কামরার পেছনে ব্যয় হতো। বাকি তিনশো রুবলে নিজের আর নিজের ছেলের খরচা চালাতো। জেনারেলের মেয়ে কি করেই বা এই জীবনে সন্তুষ্ট থাকে, যেখানে এত ভেবেচিন্তে খরচ করতে হতো আর বাড়ির সমস্ত কাজ আগের সেই মাখনের মতো মোলায়েম হাতে করতে হতো?

আর এক ভদ্র মহিলা রুপোর চামচে দেখিয়ে বলছিল, 'দেখো না এর দাম চারশো রুবল, কি করে লোক কিনবে?'

আমি বললাম, 'যদি চার রুবলে দেওয়া হয়, তাহলে সোভিয়েত দেশের পাঁচ কোটি পরিবারের মধ্যে কত পরিবার আছে, যারা দশটা চামচের থেকে কম কিনতে চাইবে? আবার এত রুপো কেনার জন্যে, এখানকার গম, মাংস, পোস্তিন আমেরিকা আর মেক্সিকো পাঠানো হোক তা কি তুমি চাই?

মহিলা বলল, 'আমাদের এখানে কি রুপো হয় না নাকি?'

আমি বললাম, 'না, তার জন্যে তোমার কাছে যা সোনা আছে সেটা তোমায় পাঠাতে হবে। ক্ষতিপূরণের দরুন জার্মানি থেকে সোনা পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সোভিয়েত সরকার তা নিতে অস্বীকার করেছে।'

—'নেওয়া দরকার ছিল।'

আমি বললাম, 'জার্মানি থেকে সোনার বদলে সোভিয়েত সরকার সেখান থেকে মেশিন আর অন্যান্য জিনিস নেবে, যা কিনতে আমেরিকা আর ইংলন্ডকে দ্বিগুণ-তিনগুণ দাম দিতে হচ্ছিল। তোমার ভালো লাগতো যদি জার্মানির পুরো সোনা চলে আসতো আর লেনার খনির সোনাও গয়না হয়ে তোমার গলায় ও কানে ঝুলতো।'

পুরনো সামন্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্তের মনোবৃত্তিতে আগের প্রভাব এখনও দেখা যেত। যাদের ১৯১৭-এর বিপ্লবের সময় চৈতন্য হয়েছিল ওদের তো কথাই নেই। যারা বিপ্লবের পরে ওই শ্রেণীতে জন্মেছে তাদের মধ্যেও অনেকে 'তে হি নো দিবসা গতাঃ' বলে আফশোশ করতো। জার-এর এক জেনারেলের মেয়ে সর্গিয়েবার (আধুনিক চেকোস্পকী) রাস্তায় এক তিনতলা বিশাল সুন্দর বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'আমার বাবা এখানেই থাকতো, ওর জন্যে এগারোখানা ঘর ছিল।' সর্গিয়েবা আগে সামন্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের পাড়া ছিল। এর রাস্তাঘাট খুব সুন্দর, যার দুধারে বৃক্ষ আর সবুজ ঘাস লাগানো। আগে এই সব পাড়ায় দেবতাদের বাস ছিল। আর এখন 'সব ধান বাঈস পসেরী'[১]। জেনারেল, গ্রাফ এবং রাজকুমারদের পাড়ায় এখন ধূলি-ধূসরিত ও বিশ্রী ঢঙে শাড়ি পরা বহু মজদুর পরিবার থাকে।

একদিন (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫) আমাদের পরিচিত পিসির পুত্রবধূ নিজের ছেলের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল। ছেলে ১৫ বছরের, সে শরীর আর মাথা দুটোতেই ছিল দুর্বল। মা কানে কম শুনতো। ছেলে ছাত্রবৃত্তি পেত ও ফটোগ্রাফি শিখত। মাও কাজ পেয়েছিল, যার জন্যে খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট ছিল না। এইরকম সুবিধেজনক স্থিতি দেখে মানুষের খুশি হবার কথা। যদি উচ্চ-মধ্যবিত্তের কোনো পরিবারের দেউলে হয়ে যাবার কথা রটে যেত, বাজে খরচায় যদি তার-জমি জায়গা বিক্রি হয়ে যেত, তাহলে তার পরিবার এই সুবিধে জার-এর আমলে কখনই পেত না। কিন্তু উক্ত মহিলা কি এর জন্যে বর্তমান শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে রাজি ছিল? তার তো মনে পড়ছিল সেই দিনগুলোর কথা যখন তার বাবার পরিবারে আধ ডজন চাকর-বাকর ইশারা পেয়েই সব কাজ করতে প্রস্তুত থাকতো। এখন বেচারিকে নিজেকেই সব কাজ করতে হতো—রান্না করতে হতো, বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া নিজের হাতে করতে হতো, পয়সা বাঁচাতে কাপড় ধোওয়া, রেশনের দোকানের জিনিসপত্রও বয়ে আনতে হতো। উক্ত মহিলা বিপ্লবের সময় যুবতী ছিল, সেজন্যে সে নিজের ওই অবস্থাকে ভুলতে পারছিল না।

এই পুরনো মনোবৃত্তির আরেকটা উদাহরণ দিই। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যদিও অধিকাংশই ছিল মজদুর এবং কৃষক শ্রেণীর, কারণ দেশে তাদের সংখ্যা ছিল খুব বেশি, কিন্তু আগের উচ্চশ্রেণীর সন্তানরা শিক্ষা সংস্থাগুলোর থেকে কম লাভ আদায় করতো না। একসময় ওদের প্রতি ভালোই বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু এখন তা বহু বছরের পুরনো ঘটনা হয়ে গেছে। পড়ার ইচ্ছে হওয়া চাই, সবার ছেলেরাই উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে। আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাশে তিনজন ছাত্র ছিল, যার মধ্যে একজন মজদুরের ছেলে। সোভিয়েতের যুদ্ধের পরে যে সব জিনিসের অভাব ছিল, তার জন্য লোকেরা কখনো-সখনো টিপ্পনী কাটতো। কিন্তু সে এই হরেক রকম অভাবের ব্যাখ্যা করতে চাইতো। সে বলতো, 'সোভিয়েত সরকার যথেষ্ট করছে। যুদ্ধ থেকে দেশ সবে ছাড়া পেয়েছে। তাই সব জিনিস একদিনেই তৈরি হয়ে যাবে না।' ওই সমঝদার ছেলে ভালোই জানতো যে

[১]এই লোক কথাটির ভাবার্থ—'এখন আর কোনো ভেদাভেদ নেই'—স·ম·

সোভিয়েত-শাসন যদি না হতো, তাহলে আজ সে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ কখনোই পেত না। তাই কিছু কিছু ঘাটতি দেখে সে অন্যান্য গুণগুলো ভুলতে চাইছিল না।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় যা প্রচার হয়েছে, তা থেকে কিছু লোক ভাবে যে যুদ্ধের পরের দিন থেকেই উচ্চবিত্তের সব পরিবারের হাতেই ঝাড়ু, ঝুড়ি আর কোদাল তুলে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, এই কথা মূর্খরাই বলতে পারে। কারণ সোভিয়েত দেশের নবনির্মাণ ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাগুরু, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার—এদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না। এদের যদি ঝাড়ু আর কোদাল ধরিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে দেশের নবনির্মাণের জন্যে বিশেষজ্ঞ কোথায় পাওয়া যেত? তাই চাষীদের আর মজুরদের বেশি সুযোগ দেবার অর্থ এই ছিল না, যে আগে থেকেই যারা শিক্ষিত তাদের আর তাদের সন্তানদের পেছনে ঠেলে দেওয়া হোক। এক ভদ্রমহিলার বক্তব্য ছিল, 'কিছু লোক ঝাড়ু দেবার কাজ ছাড়া অন্য যে কোনো কাজে অযোগ্য। ওদের বাড়ি বাড়ি কাজ করতে দেওয়া উচিত।' এই কথা শোনার সময় আমার সেই বধির ভদ্রমহিলাকে মনে হচ্ছিল, যার ছেলে শরীর আর মনের দিক থেকে সত্যিই এত অযোগ্য ছিল যে ও ফটোগ্রাফি নয়, ঝাড়ু দেবার কাজই ভালো করে করতে পারতো কিন্তু এই কুলপুত্রী কি সেই শুনে তাকে ঝাড়ু-ফাড়ু দেবার কাজ করতে দিতে চাইতো?

মধ্যবিত্তের মধ্যে এখনও পুরনো মনোবৃত্তির লোকের অভাব নেই। হয়তো সেই মনোবৃত্তি যেতে আরো সময় লাগবে। লোকে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে না, তা নয়। এটা সত্যি যে পত্র-পত্রিকাগুলো কোনো ব্যক্তির নয়, তারা সব বিভিন্ন সংস্থার, যাদের নীতির বিরুদ্ধে লেখা সেগুলোতে ছাপা যেত না। কিন্তু নিজেদের গোষ্ঠী (বন্ধুমহল)-তে নিজেদের ভাবধারাকে প্রকাশ করতে কেউ দ্বিধা করতো না। অপরিচিত লোকের সামনেও নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কতবার সুযোগ পাওয়া যায়। সোভিয়েতের রঙ্গমঞ্চ (তিয়াত্র) জার-এর আমলেও খুব উন্নতমানের ছিল, ওদের ব্যালে (মূক) নাট্য, আগেও পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বলে গণ্য হতো। জারের সরকার আর সেই সময়কার সামন্তশ্রেণী যত টাকা নিজেদের নাট্যশালায় খরচ করতে পারতো অতটা দুনিয়ার কোনো দেশই খরচ করতে পারতো না। তাই আজ থেকে একশো-সোওয়াশো বছর আগেই রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চ খুব উন্নত ছিল। সোভিয়েত-কালে সেই উন্নতি চরম সীমায় পৌঁছেছিল। আগের দেড় শতাব্দীর প্রভাবশালী অভিনেতা ও নাট্যকাররা যে যে নাটক মস্কো এবং পিটারবুর্গের রঙ্গমঞ্চে দেখিয়েছে, সেগুলো আজও খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়। আগের ভুল-ত্রুটিগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। যথার্থবাদ ওখানে সর্বক্ষেত্রেই মূল মন্ত্র, তাই কোনো নাটককে রঙ্গমঞ্চে আনার আগে তার স্থান-কাল আর পাত্রের দিকে নজর রাখা হয়। যখন কোনো রাজা বা সম্রাটের দরবার এবং তার বিলাসিতাপূর্ণ জীবনের চিত্র আঁকা হয়, তখন তাতে মহার্ঘ বস্ত্র, হীরামোতি আর সোনা-রুপোর জিনিস খুব উদারতার সঙ্গে কাজে লাগানো হয়। একদিন আমি নাটক দেখছিলাম। পুরনো রাজকীয় দৃশ্য দেখেই এক অপরিচিতা ভদ্রমহিলা বলে উঠল, 'সৌন্দর্য একেই বলে।' ওর বলার উদ্দেশ্য ছিল যে

বলশেভিকরা জীবন থেকে সৌন্দর্যকে মুছে ফেলেছিল, কারণ সৌন্দর্যের সব চাইতে বড় প্রতীক জার, জারিনা, আর ওদের দরবারের লোককে এখন চিরদিনের জন্যে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মস্কোতে এক পক্ষ

লেনিনগ্রাদে আসা মাত্র একমাস হয়েছিল। এই সময়েই মস্কো যাবার সুযোগ পেলাম। আসার সময় আমার খুব তাড়া ছিল, তাই মস্কোকে আমি ঠিকভাবে দেখতে পারিনি। এখন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছে ছিল। ৪ জুলাই (১৯৪৫) সন্ধে পাঁচটার সময় স্ত্রেলা ট্রেনে উঠে রওনা হলাম। জুলাই-এর আরম্ভ ছিল। পড়ানোর কাজ এখনো দুমাস বাদে শুরু হবার কথা। আমার এর মধ্যেই ভাষাটাকে আরো ভালোভাবে শেখাটা জরুরি ছিল। তাতে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতো না। ভাষা শেখার সব চাইতে ভালো সুযোগ তখনই পাওয়া যায় যখন মানুষ নিজের পূর্ব-পরিচিত ভাষাগুলোর মধ্যে কোনোটাই কাজে লাগাতে পারে না। এখানে রুশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা হতো না। হোটেলগুলোর মধ্যেও যদি সেটা ইন্তুরিস্তের না হয়, তাহলে সেখানে কোনো ইংরেজি বা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষা জানা লোক পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই।

লেনিনগ্রাদ থেকে রওনা হবার সময় ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল কিন্তু নগর ছাড়িয়ে যেতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। চারদিক সবুজ আর সবুজ। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার অবশেষগুলিতেও এই শ্যামলিমা ছেয়ে ছিল। রাতের অন্ধকার থাকতে আমি ভোল্গার সামনে দিয়ে পেরোলাম। ভোল্গার উৎস এখানেই কাছাকাছি কোথাও, তাই এখানে তার মহানদী-রূপ দেখা যায় না।

পরের দিন দশটার সময় ট্রেন মস্কো পৌছল। আমার সঙ্গে আরেক ভদ্রলোকও ছিলেন, তাই কি ভাবে যাব, কোথায় উঠব, এই নিয়ে কোনো অসুবিধে হলো না। রেলস্টেশনে নেমে পাশেই ছিল ভূগর্ভ (মেট্রো) রেলস্টেশন, যেখানে গাড়িতে গিয়ে চতুর্থ স্টেশনে নেমে গেলাম। মস্কো হোটেল তার লাগোয়া ছিল। এই হোটেল শুধু মস্কোরই নয়, সমস্ত সোভিয়েত দেশের সব চাইতে বড় হোটেল। তের তলা। যার মধ্যে সাতটা তলা তো পুরোটাই হোটেল আর কিছুটা অংশে আরো ছটা তলা আছে। বাড়িটির নীচের ভাগে লাল মার্বেল পাথরের মতো চকমকে পাথর বসানো। সোভিয়েত সময়ের বাড়ি হওয়ায় এবং তাও আবার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতার সময়কার বলে মস্কো হোটেলকে খুবই সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্নভাবে বানানো হয়েছিল। এতে কয়েক হাজার কামরা। কিন্তু পেতে আমাদের আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের কামরায় ছিল দুটো টেবিল, সাতটা চেয়ার, একটা সোফা, একটা টেলিফোন আর একটা রেডিও। শোবার ঘর

আলাদা ছিল, যাতে ছিল জোড়া খাট, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, আর দুটো কাপবোর্ড। একটা বড় কাঁচের আলমারি ছাড়াও দেয়ালেও দুটো আলমারি ছিল। স্নানঘরও সঙ্গেই লাগানো ছিল। অনেকগুলো ল্যাম্প ছিল। মস্কো হোটেলের অধিকাংশ কামরাই এই ধাঁচের। আমার কামরা সাত তলায়, যার পেছনে ছিল খোলা এক বিশাল ছাত। এখানেই সন্ধের সময় রেস্তোরাঁ (ভোজনশালা) বসত, যেখানে বাজনাও থাকত—খেতে খেতে নরনারী রাত একটা অব্দি আনন্দ ফুর্তি করত। সে-সময় হোটেলটা খুব দামী ছিল। যদি রেশন কার্ড না থাকত, তাহলে একদিনের খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে ২৫০ রুবল লাগত, অর্থাৎ প্রায় ৮০ টাকা।

বন্ধুরা বলাতে বুঝতে পারলাম যে আমি এক পক্ষ এখানে থাকতে পারি। ১৭ জুলাই-এর সন্ধেতে ফের লেনিনগ্রাদে ফিরে আসতে পারলাম। এখানে থাকতে থাকতে আমি ভাবলাম যত বেশি সম্ভব মস্কোর দর্শনীয় স্থানগুলো দেখব। ভাষার অসুবিধে এখনও দূর হয়নি, যদিও গত একমাসে রুশ ভাষা শেখার ব্যাপারে আমার কম উন্নতি হয়নি। বিদেশীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ রক্ষাকারী সোভিয়েত সংস্থা—ভোক্‌স একটি পথ-প্রদর্শিকার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু ও কিছুক্ষণের জন্যেই শুধু সঙ্গে থাকত, বাকি পর্যটন আমাকে স্বাবলম্বী হয়েই করতে হতো।

৬ জুলাই আমি লেনিন মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। লেনিনের জীবন আর ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্যে এখানে সমস্ত উপকরণ একত্রিত করা হয়েছিল। জীবনের প্রতিটি দশায় তোলা ফটো এবং শিল্পীদের আঁকা ছবি লেনিনের জীবনকে সাকার রূপ দিয়েছিল। লেনিনের বই এবং বিভিন্ন ভাষায় তাদের অনুবাদেরও এখানে সুন্দর সংগ্রহ রয়েছে। আমি খুঁজতে লাগলাম—দেখি ভারতীয় ভাষায় লেনিন সম্বন্ধীয় সাহিত্যের কি কি বই আছে। উর্দু আর গুরমুখীতে লেখা কিছু ছোট ছোট বই পেলাম, যা মস্কোতে ছাপা হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে রুশের কূটনীতিক সম্বন্ধ ভেঙে যাবার কারণে আমাদের এখানের জিনিস সংগ্রহ করতে সোভিয়েতবাসীদের কিছু অসুবিধে ছিল, তাহলেও আরো কিছু বই ভারতে পাওয়া যেত। লেনিনের পালন-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা আর বিপ্লবী-জীবন কি ভাবে কাটল, তা শুধু ছবির দ্বারাই নয়, ঘর আর খেলাঘরের দ্বারাও অঙ্কিত করা হয়েছে। যে ঘরে লেনিনের জন্ম হয়েছিল, তার নমুনা জিনিসপত্রের সঙ্গে এখানে রাখা ছিল। কারাগারের জীবনও এইভাবে সাকাররূপে দেখানো হয়েছে। ফেব্রুয়ারির বিপ্লব (১৯১৭)-এর পর লেনিন পেত্রোগ্রাদ সফলতার সঙ্গে পৌঁছতে পেরেছেন। বলশেভিকদের বাড়ন্ত প্রভাব দেখে কারেন্‌স্কী সরকারের ভয় হতে লাগল। তারা লেনিনকে গুপ্তহত্যা করতে উঠে পড়ে লাগল। সেই সময় লেনিনকে অজ্ঞাতবাসের জন্যে জঙ্গলে পাঠানো হলো। জঙ্গলে যেরকম কুঠিতে লেনিন থাকতেন, তার নমুনাও এখানে রাখা ছিল। পুঁজিবাদী দেশগুলো লেনিনকে নিজেদের রাস্তায় একটা বড় পাথর বলে মনে করত। তাদের বোধগম্য হলো, যে যদি সাম্যবাদী বিপ্লব নিশ্চিত হয়ে যায় তাহলে তাদের দেশেও শান্তি থাকবে না। তারা কাপ্লান নামের একটি স্ত্রী-লোককে হত্যা করতে নিযুক্ত করে। আজকে পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে স্তালিনের বরাবর পর্দার আড়ালে থাকাকে দোষ আরোপ করা হয়। কিন্তু

স্তালিনকে যদি এতটা সাবধানতার সঙ্গে রাখা না হতো তাহলে তাঁর দেশী এবং বিদেশী শত্রু এখন অব্দি তাঁকে বেঁচে থাকতে দিত? কাপ্লান যে পিস্তল দিয়ে লেনিনের বুকে গুলি চালিয়েছিল সেই পিস্তলও এখানে মিউজিয়মে রাখা ছিল। গুলি খাওয়ার সময় যে ওভারকোর্ট লেনিন পরেছিলেন, যেটা ওঁর রক্তে ভরে গিয়েছিল, সেটাও ওখানে রাখা ছিল। লেনিনের ব্যক্তিত্ব শোষিত শ্রেণীর উত্থান আর মানবতার প্রগতির জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বলার প্রয়োজন নেই। এই মিউজিয়ম লেনিনকে বুঝতে খুব সাহায্য করে। সব সময় এখানে লোকের ভিড় লেগেই থাকে। লেনিন-সমাধি দর্শনের বিশেষ সময় আছে, আর বেশ মুশকিল হয়, কিন্তু লেনিন মিউজিয়মে সব কিছু সহজেই দেখা যায়। বস্তুত দর্শকদের পক্ষে এটাই ভালো, যে প্রথমে সে লেনিন মিউজিয়ম দেখুক, তারপর লেনিন-সমাধির ভেতরে গিয়ে ওই মহাপুরুষের শব দর্শন করুক। লেনিন মিউজিয়মের পাশেই লাল ময়দান, যা আশেপাশের উঁচু ইমরাতের জন্যে ছোট বলে মনে হয়, কিন্তু মহোৎসবের দিনগুলোতে ওখানে কয়েক লাখ লোক দাঁড়াতে পারে। লেনিন-সমাধির পেছনে ক্রেমল (ক্রেমলিন দুর্গ)-এর দেয়াল। এখন সেখানে দেবদারু লাগানো হয়েছে, যা কয়েক বছর বাদে এই মনুষ্যরচিত বাস্তুকে নিজের সৌন্দর্য প্রদান করবে। ক্রেমলিনের দেয়ালে দেশের সম্মানীয় পুরুষদের অস্থি ছোট ছোট ছিদ্রতে রাখা হয়। যদিও কবরের রেওয়াজ এখনও যায় নি, তাহলেও মৃতদের জ্বালানোর প্রচার খুব বেড়ে চলেছে, তাই চিতাবশেষ অস্থির কিছুটা ছোট একটু জায়গায় রাখা যায়।

টলস্টয়ের অমরকীর্তি 'আন্না কারেনিনা' আমি ২৫ বছর আগে পড়েছিলাম। ৭ জুলাই আমি তা রঙ্গমঞ্চে দেখার সুযোগ পেলাম। নাটক সাড়ে সাতটা থেকে রাত এগারোটা অব্দি হতে থাকল। কথোপকথন বোঝার মত সম্পূর্ণ শব্দ-শক্তি ছিল না, কিন্তু আমি সেটা ব্যালে মনে করে নিলাম। অভিনয় খুব সুন্দর ছিল, বিশেষ করে আন্নার, কারেনিনা আর আন্নার প্রেমিকের পার্ট খুবই নিরীহ রূপে করা হয়েছিল। দৃশ্য শুধু সাধারণ পর্দা দ্বারাই দেখানো হয়নি বরং ওখানে সব কিছুই বাস্তবিক রূপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যখন আন্না ট্রেনের তলায় আত্মহত্যা করতে গেল, ওই সময়, ইঞ্জিন, লণ্ঠন, আওয়াজ সব কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল, যে একটা ট্রেন আসছে। ভোক্স-এর কৃপায় নাটকের টিকিট খুব সহজেই পাওয়া গিয়েছিল, আর রঙ্গমঞ্চের চতুর্থ লাইনে বসার কারণে আমি সব কিছুই ভালোভাবে দেখতে-শুনতে পাচ্ছিলাম। নাট্যশালায় যে খুব ভিড় ছিল তা বলা যাবে না, কারণ টিকিট ঠিক ততগুলোই দেওয়া হয় যতগুলো সিট আছে, কোনো জায়গা খালি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সোভিয়েত নাট্যশালার টিকিটের বন্দোবস্ত দু-তিন হপ্তা আগে যদি না করা হয়, তাহলে তা পাওয়াই যায় না—বিদেশী অতিথিদের জন্যে কিছু সিট খালি রাখা হয়। অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় ছিল—দর্শকরা তখন বাইরের হল-এ ঘুরছিল আর নাট্যশালার প্রদর্শনী দেখে বেড়াচ্ছিল। নাটক দেখতে নরনারী নিজের সব চাইতে সুন্দর বেশভূষায় যায়। মহিলারা ওই দিন কেশ-সজ্জা (কোয়ফুর) করতে ভোলে না। নাট্যশালার প্রদর্শনীতে পুরনো ও নতুন নাট্যকারদের এবং অভিনেতাদের কয়েকশো ফটো রাখা ছিল।

দ্বিতীয় যাত্রায় ভাই প্রমথনাথ দত্ত (বা দাউদ আলী দত্ত) লেনিনগ্রাদেই থাকতেন, এখন তিনি যুদ্ধের পর মস্কো চলে এসেছিলেন। ওঁর সাহসিকতাপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে পরে লিখছি। ৮ জুলাই সাড়ে দশটার সময় আমি হোটেল থেকে রওনা হলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ঠিকানা, মোটর, বাস আর অন্যান্য যানবাহনের ব্যাপারে সব নোট করে নিয়েছিলাম। সারা মাসের জমানো রুশ পুঁজি নিয়ে রওনা হলাম। ময়দানের এক কোণে বাসের আস্তানা, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি বাস নেই। ২৫ নম্বর ট্রাম পেলাম, যেটা যাচ্ছিল রোস্ত্রোকিনস্কী পেয়েজ্‌দ-এর দিকে। আধ ঘন্টা যাবার পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, স্থান এখন বহুদূর। এক ঘন্টা যাত্রা করার পর উপনগরের সেই স্থানে পৌছলাম যেখানে কৃষক স্ত্রী আর মজুর পুরুষদের দুটো সংযুক্ত বিশাল মূর্তি স্থাপিত। জিজ্ঞেস করতে করতে উপনগরের বাইরে আলুর খেতগুলোতে চলে গেলাম। এদিক থেকে ওদিক ঘুরতে ঘুরতে, চড়াই-উৎরাইয়ের পথ ডিঙিয়ে একটি রেল লাইন পার করে এক-দু মাইল আরো এগোলাম। জুলাই মাস। নিরভ্র আকাশ থেকে মধ্যাহ্নের সূর্যের কিরণ তার প্রভাব বিস্তার করছিল। আমি জল তেষ্টায় খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। যাহোক করে মস্কোর প্রাচ্য প্রতিষ্ঠানে পৌছলাম। এই থেকে পাঠকদের এ কথা মনে হতে পারে, যে রুশরা প্রত্যেক বিদেশীদের পেছনে গোয়েন্দা পাঠায় না, যদি পাঠাতো তাহলে এই যাত্রায় আমাকে কৃতজ্ঞ হতে হতো।

গেট খুলতেই দেখি একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ধূসর রঙের চুল, রোগা দুর্বল চেহারা দেখে কি করে বুঝি যে এই দত্ত ভাই-এর পুত্র। আমি তবারিশ দত্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। ইগর সঙ্গে আসতে বলল এবং আমাকে তিনতলায় দত্ত ভাই-এর কাছে নিয়ে গেল। এই সময় হিন্দুস্তানী ক্লাশের পরীক্ষা হচ্ছিল। রাশিয়ায় হিন্দি আর উর্দু দুটোর জন্যই সম্মিলিত শব্দ 'হিন্দুস্তানী' ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীদের দুটো ভাষার দুটো লিপিই শেখানো হয়। দত্ত ভাই তাঁর হিন্দুস্তানী পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। ১৫-১৬ বছরের দু-তিন জন মাত্র তরুণ, বাকি সব তরুণী। এখানকার লোকদের এটা ভুল ধারণা যে উর্দুই ভারতের বহুল প্রচলিত ভাষা। দ্বিতীয় যাত্রায় আমার পরিচিত এবং ডঃ রিশ্চের্বাৎস্কীর শিষ্য সংস্কৃত প্রফেসর সিরায়েফও এখন এখানেই উর্দু পড়াতেন। পরীক্ষাস্থলে কিছু সময় বসে এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে শিষ্টাচার প্রদর্শন করার পর দত্তভাই আমাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন। একটা পা অচল হবার কারণে তিনি বগলে লাঠি ভর দিয়ে আসছিলেন। মাত্র সাত বছর আগে আমি দত্ত বৌদিকে সুন্দরী যুবতীরূপে দেখেছি আর এখন কেমন বুড়িয়ে গিয়েছিলেন। মুখে কিরকম ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল। দত্তভাই কথা বলতে লাগলেন আর বৌদি চা বানাতে গেলেন। তিনি ভারত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, আর আমি করছিলাম আমার পূর্ব-পরিচিতদের সম্বন্ধে। উনি বললেন, 'মস্কোতেই চলে আসছেন না কেন, এখানে পড়ানোর কাজ পাওয়া যেতে পারে।'

সাড়ে সাতটা বাজে। এখনও সন্ধে হতে বেশ দেরি ছিল কিন্তু আমাকে তো না জানি কত মাইল অপরিচিত ট্রাম রাস্তায় গিয়ে আমার হোটেলে পৌছতে হবে। বৌদি ট্রাম ডিপো অব্দি পৌছতে এলেন। বললেন, 'এখান থেকে ৪ নম্বর ট্রাম ওখানে যান। লেনিনগ্রাদ বা

মস্কোয় ট্রামের টিকিট ১৫ কোপেক (প্রায় পাঁচ পয়সা)। টিকিট কিনে বসে যান।'

পাঁচ স্টপ-এর পর আমি মেট্রো স্টেশনে পৌঁছলাম। রাস্তায় দেবদারুর উপবন। ঘাসের শ্যামলিমা চারদিকে দেখা যাচ্ছিল। রোববার হবার দরুন ছুটিতে বহু লোক এই উপবন আর সরোবরে আনন্দ উপভোগ করতে এসেছিল। ট্রাম থেকে নেমে স্কোল্‌ন-এর মেট্রো স্টেশনে অখোত্নিকীয়ার্দের টিকিট নিলাম। মেট্রো এখান থেকেই শুরু হয়, তাই জায়গা পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি, কিন্তু পরে খুব ভিড় হল—বেড়িয়ে বেড়িয়ে লোকেরা সন্ধেবেলায় ফিরছিল। পাঁচটা বড় স্টেশন পরেই অখোত্নিকীয়ার্দের ছোট স্টেশনে নামলাম, যেটা মস্কো হোটেলের নীচেই, আমি আগে জানতাম না, তাহলে খুব আরামে চলে যেতে পারতাম। এখন রাস্তা খুবই সোজা বলে মনে হচ্ছিল। হোটেলে পৌঁছবার সময় আমার মনে পড়ছিল আলুর খেতে দেখা বুড়িকে। ওর কাপড়-চোপড় ছিল অতি আটপৌরে। আমি যখন রাস্তা জিজ্ঞেস করলাম ও ফর-ফর করে ফ্রেঞ্চ বলতে লাগল। অভিজাত শ্রেণীর মেয়ে হবে, যাদের জন্যে জারের জমানার সংস্কৃত-শিক্ষিত আর সম্ভ্রান্ত প্রমাণ করতে ফ্রেঞ্চ-এ দখল রাখা জরুরি ছিল। এদের সংখ্যা সম্ভবত এত বেশি ছিল যে সবাই বিদেশী ভাষা শেখানোর কাজ পেত না।

৯ জুলাই সূর্যগ্রহণ ছিল। আকাশে কোথাও কোথাও মেঘ ছিল, তাই সূর্য বার বার মেঘে ঢাকা পড়ছিল। আমাদের দেশে হলে পুরনোপন্থী লোকেরা স্নানের জন্যে তৈরি হতো, বেনারসের দিকে ট্রেনের পর ট্রেন ছুটত। আজ থেকে আট শতাব্দী আগে রুশদের পূর্বপুরুষ সূর্যের পূজারী ছিল। সূর্যই ওদের সব চাইতে বড় দেবতা ছিল। খ্রীস্টধর্মই ওদের ওই দেবতার হাত থেকে ছাড়িয়েছে। কি জানি সেই সময় লোক সূর্য গ্রহণের সময় কি করত। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিশ্চয় করত। কিন্তু আজকের রুশরাও সূর্যগ্রহণকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে না। বিকেল চারটের সময় কালো করা কাঁচ বা অন্য কোনো দেখার সরঞ্জাম হাতে নিয়ে সূর্য দেখছিল।

দেশ-ছাড়া এখন প্রায় দশ মাস হতে যাচ্ছিল। ইরানে থাকতে ইংরেজি কাগজ পেতাম, আর কোনো কোনো সময় সৈনিক বা ব্যাপারীদের কাছে ভারতের সংবাদ-পত্রও দেখতে পেতাম, কিন্তু এখানে খবর পাবার কোনো উপায় ছিল না। কিছু ইংরেজি কাগজ আন্তর্জাতিক ঘটনার ওপর তাদের ভাবনা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে অবশ্য বেরতো, যদিও ওগুলোতে ভারতের ব্যাপারে কখনো-সখনো কিছু থাকত। পত্র-পত্রিকা বা বই পাওয়া অতটা সোজা ছিল না। 'নিউ টাইমস'-এর তিনটে সংখ্যা যখন পেলাম তখন আমার খুবই আনন্দ হলো।

সূর্যগ্রহণ শেষ হলে সেদিন খুব বৃষ্টি হলো। কড়কড় শব্দে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বর্ষার এই দৃশ্য দেখে ভারতের বর্ষাকালের কথা আমার মনে পড়ছিল—ওখানকার জুলাই-আগস্ট ঘনঘোর বর্ষার সময়। যে ঘরে আমার আশ্রয় হয়েছিল, সেটা এমন জায়গায় ছিল যেখানে খুব রোদ আসত, তাতে ঘরটা খুব গরম হয়ে যেত, তাই আজ আমি ৭২৬ নম্বর কামরাটা নিয়ে নিলাম। এই কামরাটা ভালো ছিল। এখানে স্নানের টব ছিল না, সেই জায়গায় 'বর্ষাস্নান'-এর ব্যবস্থা ছিল। কামরাটা একটু বেশি বড়ো ছিল এবং সোফা ইত্যাদি ঐ একই

ঘরে ছিল। টেলিফোন সচল ছিল, কিন্তু রেডিওটা ছিল খারাপ। সেটার অবশ্য আমার দরকারও ছিল না, কারণ এখন আমার অপর্যাপ্ত ভাষার জ্ঞান। মস্কো রেডিও থেকে যিনি হিন্দি প্রোগ্রাম প্রচার করেন সেই ভদ্রলোকও এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, 'ভারতে তা ভালোভাবে শুনতে পাওয়া যায় না, যদিও মস্কোর অন্যান্য প্রোগ্রাম স্পষ্ট শোনা যায়।' তিনি বললেন, 'তাসখন্দ-এর সঙ্গে জুড়লে হয়তো পরিষ্কার শোনা যাবে।' আমি আবার বললাম, 'যে হিন্দি বা হিন্দুস্তানীতে মস্কো থেকে খবর প্রচার করা হয়, সে ভাষা যারা বলে তারা তো নয়ই বরঞ্চ ভাষা-তাত্ত্বিকরাই কেবল বুঝতে পারবে।' এই কাজের একটা অসুবিধেও ছিল, কোনো হিন্দি বা উর্দু ভাষাভাষী ওখানে উপস্থিত ছিল না। দত্তভাই খুব ভালো হিন্দি-উর্দু-বাংলা বলতে পারতেন, কিন্তু হয়তো পায়ের ব্যাপারে অক্ষম হবার কারণে তাঁর দ্বারা ওই কাজটা নেওয়া সম্ভব ছিল না। যারা বলত তারা রুশ, তাদের উচ্চারণ ভুল হতো আর যারা লিখত তারাও কেউ হিন্দুস্তানী ভাষা ভালোভাবে জানত না, তাদের ভাষা কোথাও কোথাও ডিকশনারি থেকে তুলে নিয়ে বানিয়েছে বলে মনে হতো। এখন ১৯৫১ সালেও মস্কোর হিন্দুস্তানী প্রোগ্রামের প্রায় ওই একই হাল। হ্যাঁ, এখন রুশ মুখের জায়গায় ভারতীয় (বাঙালী) মুখ ব্যবহার করা হয়, যার বাঙলার মত করেই হিন্দুস্তানী বলা অভ্যেস। ভাষা লেখার লোকও ওই দেশেরই হয়তো কেউ হবে, যার জন্য ভাষা একদম বেমানান বলে মনে হয়। ভাষাও হিন্দি আর উর্দুওলাদের জন্যে একটাই ব্যবহার হতো, যাতে ভুল উচ্চারণ-এর সঙ্গে আরবী-ফারসীর আধিক্য থাকতো। কেউ বুঝুক আর না বুঝুক ব্রডকাস্ট করে দেওয়াটাই উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। (সম্প্রতি বিহারে এক বুড়ো কর্মঠ কম্যুনিস্ট নেতা মস্কোর হিন্দুস্তানী ব্রডকাস্ট-এর ভাষা শুনে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।) আমি তাঁকে বললাম, 'ভারতের শ্রোতাদের বেশি ভালো লাগবে যদি আপনি মধ্য-এশিয়ার লোকেদের জীবনের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেন।'

বিদেশী বিপ্লবীদের রাশিয়ায় লুকিয়ে থাকার কারণে নাম বদলাতে হতো, তাই কোনো কোনো সময় অতি পরিচিত লোককেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হতো। মস্কোয় এক তরুণী নিজের ভারতীয় পিতার সম্বন্ধে জানবার জন্যে কৌতূহলী ছিল, কিন্তু যে নাম ও বলছিল তা এক মালাবারীর। পরে জানতে পারলাম যে ও আমার পরিচিত চক্রবর্তী মশাইয়ের মেয়ে। আমি কমরেড চক্রবর্তীকে ভালোভাবে চিনতাম, কিন্তু নাম বদলে দেবার জন্যে ওর মেয়েকে কোনো আনন্দ-সংবাদ দিতে পারলাম না। এইরকম এক জাভার বিপ্লবী কুড়ি বছর ধরে নাম পালটে রাশিয়ায় বসবাস করছিলেন। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় তেহরানে হয়েছিল। যেখানে আমি তাঁকে আদিল খাঁ বলে জানতাম। পরে জানলাম তাঁর নাম শামাউন, যদিও এটাও তাঁর জাভার নাম নয়। আদিল খাঁ আর আমি তেহরানে কিছুদিন একই হোটেলে ছিলাম। আর এটা তো জানাই যে আমি বেশির ভাগ সময় মির্জা মহম্মদের সঙ্গে থাকতাম। আদিল খাঁর সঙ্গে আগেও সব সময়ই দেখা হয়ে যেত এবং জাভা আর ভারতের সম্বন্ধে প্রাণখোলা আলোচনা হতো। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর দৃঢ়চেতা বিপ্লবী ছিলেন। তিনি যেকোনোভাবে জাভা ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করছিলেন। কিন্তু কোনো রাস্তাই দেখতে না পেয়ে আমার তেহরান থেকে রওনা হবার কিছু আগে তিনি মস্কো ফিরে

গেলেন। ওঁর একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তাই ১২ জুলাই সোয়া তিনটের সময় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে মস্কোর পাশে একটি গ্রাম উদেল্‌নায়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। এই গ্রামের দূরত্ব ৩০ মাইলের কম হবে না। প্রথমে চার স্টেশন মেট্রোতে গেলাম, তারপর কাজান্‌স্কী স্টেশন থেকে ইলেকট্রিক ট্রেন ধরলাম। পুরো একঘণ্টার যাত্রা। আমি একলা ছিলাম। আর ভাঙা-ভাঙা রুশ ভাষা ছিল একমাত্র সম্বল। এই যাত্রায়ও এই কথা মিথ্যে প্রমাণিত হলো, যে রুশরা প্রত্যেক-টি লোকের পেছনে গোয়েন্দা লাগায়।

ট্রেন মস্কো থেকে একেবারে বাইরে চলে এলো। এখন এখানে গ্রামীণ দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু বস্তিগুলো ছিল মফস্বল শহরের মত। এখানকার বেশির ভাগ লোক মস্কোয় কাজ করত। আমি ভেবেছিলাম, রাস্তায় দেবদারুর ঘন জঙ্গল পড়বে, কিন্তু তা নামমাত্র কোথাও কখনো দেখা যাচ্ছিল। মস্কোতে এসব জিনিসের খুব চাহিদা। কোথাও কোথাও জার্মান বোমাবাজীর চিহ্ন ছিল কিন্তু সেটা খুব কম। শেষমেশ উদেলন্‌পয়া স্টেশন এসে গেল। ছোট স্টেশন, বসতিও খুব বেশি না, আলাদা আলাদা বাড়ি। আমি খুঁজতে খুঁজতে কাঠের বাড়িতে পৌঁছলাম। আমার রঙ কালো—আমাদের দেশের পরিষ্কার রঙওলাদের ওই সাদা-সাগরে কালোই দেখায়। আমাকে দেখেই একটি স্ত্রীলোক বলল, 'আমি জানি।' আদিল খাঁ জাভার লোক হবার দরুন মোঙ্গলদের মত মুখাবয়ব, কিন্তু তাঁরও গায়ের রঙ আমারই মতন। স্ত্রীলোকটি আমাকে নিজের বাড়ি অব্দি নিয়ে গিয়ে তার মেয়েকে আমার সঙ্গে দিল। বাড়ি তো পেয়ে গেলাম কিন্তু আদিল দম্পতির কেউ বাড়ি ছিলেন না। জিজ্ঞেস করতেই বাড়ির একটি মহিলা বলল, 'জানি না কখন ফিরবে।' গরমের সময় মস্কোর লোক অনেক সময় নগরের আশেপাশের গ্রামে-গঞ্জে চলে যায়। বিজলীতে চলা ট্রেন তো আছেই। তাই আসতে-যেতে এক-দেড় ঘণ্টাকে কোনো অসুবিধে বলে মনেই হয় না। বেশি প্রতীক্ষা না করে নিজের কার্ড রেখে দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হলাম। এখানকার বাড়ি ঘেরা উঠোনের ভেতরে ছিল। উঠোনে দেবদারু ও অন্যান্য গাছ লাগান ছিল। এই উপবনের মধ্যে কাঠের একতলা-দোতলা বাড়ি বানানো ছিল, যেখানে নাগরিকরা কুটিরের আনন্দ উপভোগ করতে আসত। বাড়িগুলো দূরে দূরে হবার দরুন উদেল্‌নয়ার বসতি দূর অব্দি ছড়ানো-ছেটানো। স্টেশনে ফিরে এলাম। একটুক্ষণ অপেক্ষার পরই গাড়ি পেয়ে গেলাম এবং সাড়ে সাতটার সময় মস্কো পৌঁছে গেলাম।

আমার কার্ড পেয়ে গিয়েছিলেন তাই কমরেড আদিল দেখা করতে চলে এসেছিলেন। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হতে থাকল। তিনিও বলছিলেন আমি যদি মস্কোয় থাকতাম তাহলে ভালো হতো। আমার যদিও আলাদা কিছু মনে হচ্ছিল না।

১৪ জুলাই মস্কোর মহান গোর্কী-সংস্কৃতি-উদ্যান দেখতে গেলাম। প্রথম যাত্রায়ও দুবার এই উদ্যান দেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সময় তো এখানে আর এক জবরদস্ত আকর্ষণ ছিল। যুদ্ধে পাওয়া উপহারের প্রদর্শনী। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের সময় যত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল, সে সবের নমুনা এখানে রাখা ছিল। অনেক দূর পর্যন্ত নানা রকমের তোপ রাখা ছিল। যার মধ্যে কিছু ছিল দূরে মারার ট্যাঙ্ক, কিছু হালকা ধরনের তোপ, ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার তোপ। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, ইটালি সব দেশেরই

বানানো তোপ জার্মানি কাজে লাগিয়েছিল। নানা রকমের ট্যাঙ্কও রাখা ছিল। দুই ইঞ্চি মোটা লোহার টুকরোওলা 'চিতা' ট্যাঙ্ক ছিল, ব্যাঘ্র আর রাজব্যাঘ্র ট্যাঙ্ক রাখা ছিল, যা জলেও চলত। দু ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের পাতকেও তোপের গোলা এমনভাবে ভেঙে দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন কেউ ভিজে মাটির বাসনকে কাঠ দিয়ে বিদ্ধ করেছে। সোভিয়েত তোপের এমনই কেরামতি। রুশরা সব সময়ই তোপে তাদের কীর্তি দেখিয়েছে। সোভিয়েত-শাসন তাকে বিলুপ্ত হতে দেয়নি। হেঙ্কাল, মেসার্স স্মিথ, ইউঙ্কর, ফোকউল্ফ-এর মত নানা প্রকারের বোমাবর্ষকও দেখলাম। এক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের বিমানের লাইন ছিল। বড়-বড় যুদ্ধ-যন্ত্র বাইরে আকাশের নীচে রাখা ছিল। কত জিনিস ঘরের ভেতরেও সাজানো ছিল। এক জায়গায় ছিল নানারকমের ওষুধের নমুনা। অন্য জায়গায় ছোট ছোট অস্ত্র-শস্ত্র। এক জায়গায় খবর পাঠানোর রেডিওর প্রদর্শনী ছিল। প্রদর্শনাগারে নানারকমের জার্মান সৈনিকদের পোশাকও ছিল। এক জায়গায় জার্মান পদকগুলি জড়ো করা ছিল। হিটলার ভেবেছিল মস্কো বিজয়ের পর হাজার নয় লাখ-লাখ পদক নিশ্চয় পাওয়া যাবে। হিটলারের সেপাইদের ভাগ্যে পদক ছিল না কারণ হিটলার বিজয়ী হয়নি, বিজয়ী হয়েছিল ওর প্রতিদ্বন্দ্বীরা। কাপড়ের ঘাটতির জন্যে জার্মানি নকল কাপড় এবং অন্যান্য জিনিস তৈরি করেছিল, যেগুলোকে জার্মান ভাষায় 'এর্সাঞ্জ' বলা হতো। এখানে অনেকরকম এর্সাঞ্জের পোশাক আর এর্সাঞ্জের বুট মজুদ ছিল। রাশিয়ায় এগুলো দরকার হয়নি, আর না এখানে ঠাণ্ডায় এগুলো কাজে আসত। রাইফেল, মেশিনগান এবং অন্য সব মেশিনেরও খুব ভালো সংগ্রহ ছিল।

আজ আমার সঙ্গে ভোক্সের মহিলা পথ-প্রদর্শিকা ছিল। ওখান থেকে বেরিয়েই আমরা পাশেই 'দোম সুযুজ'-তে মিশ্র সংগীত শুনতে চলে গেলাম। ওখানে গণ-নৃত্য আর গণ-সংগীতের সব চাইতে ভালো নমুনা পেলাম। মস্কোর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত রেজান জেলার দুটো গণ-সংগীত গাওয়া হয়েছিল, যা লোকেরা আগ্রহ করে বার বার শুনল। আমার আশ্চর্য লাগছিল যে আমাদের পূর্ব উত্তরপ্রদেশের অহীরদের বিরহা কি করে মস্কো এসে পৌঁছল। ভাষা অবশ্যই রুশ ছিল, কিন্তু রাগ একেবারে বিরহার মত। অহীরও তো শকদেরই গোত্রের একজন, যে শকদের বংশধর আজকের রুশ। এই জন্যে রেজানের গণ-সংগীতে বিরহার আসা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু অহীরদের ভারতে এসে পৌঁছনো দু হাজার বছর হয়ে গিয়েছিল। গণ-সংগীতের সুর কি এত চিরস্থায়ী? অবশ্য গণ-সংগীতের সুর ভাষার থেকে বেশি দীর্ঘজীবী হয়। এই নাট্যদলে একশো থেকে কম শিল্পী ছিল না। সবই জনসাধারণের জিনিস দেখানো, শোনানো হচ্ছিল। হলো ঠাসাঠাসি হয়ে ভরে ছিল। মাঝে পনেরো মিনিটের বিশ্রাম দিয়ে আটটা থেকে দশটা অব্দি প্রোগ্রাম চলল। আমার যেখানে নৃত্য আর সংগীতের আনন্দ হচ্ছিল, সেখানে আমি এও ভাবছিলাম, যে এটা সেখানেই সম্ভব যেখানে কাজ করা মানুষের হাতে রাজশক্তি চলে এসেছে। শিল্পীদের সম্মান দেখে ঈর্ষা হচ্ছিল। ওরা কোনো বৈজ্ঞানিক বা প্রফেসরের থেকে কম সম্মানিত নয়। আমার মনে পড়ল, আমার নিজের দেশের বিশ্রামও বিরহা বানিয়েছিল। করুণ-রসে সিক্ত গণ-কবিতা ও নির্মাণ করেছিল আর যৌবনেই বিরহ

নিয়ে মারা গিয়েছিল। ও শুধু কবিতা লেখার জন্যে কবিতা লিখত না, ওর হৃদয়ে ছিল চিরস্থায়ী হবার আকাঙ্ক্ষা। যখন মনে কোনো ব্যথা অনুভূত হতো, ভাব উৎপন্ন হতো, তখন ও একটি বিরহা রচনা করত এবং সেটা গুনগুন করে করে গাইত। কাগজে তুলে নেবার কোনো প্রশ্নই নেই। বিশ্রাম নিছক এক গ্রামীণ গণ-কবি। আমি ওর কিছু বিরহা পড়েছিলাম। আমি ভাবতাম, বিশ্রামের বিরহাগুলো নিশ্চয় কিছু লোক বড় ভালোবাসার সঙ্গে সংগ্রহ করেছে। ফিরে এসে জানতে পারলাম বিশ্রাম আর এই দুনিয়ায় নেই আর ওর পনেরো, ষোলটার বেশি বিরহা লিখে রাখা সম্ভব হয়নি। সোভিয়েত দেশে এইভাবে কোনো বিশ্রামের বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

চিত্রশালা—লেনিনগ্রাদে একাধিক চিত্র-সংগ্রহালয় আছে। মস্কোর ত্রেত্যাকোফ চিত্রশালা বিশ্বের চিত্রশালাগুলির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ১৬ জুলাই-এ আমি সেটা দেখতে গেলাম। মস্কোর এক ধনী-মানী নাগরিক ত্রেত্যাকোফের চিত্র সংগ্রহ করার শখ ছিল। সে অনেক সংগ্রহ করার পর চিত্রশালার বাড়ি সহ নগর-সভাকে তা অর্পণ করেছিল। এটা ছিল জারের আমলের কথা। নগর-সভার হাতে আসার পর ত্রেত্যাকোফ চিত্রশালার অতটা উন্নতি হয়নি, যতটা উন্নতি হয়েছিল সোভিয়েত শাসনকালে। যদিও ত্রেত্যাকোফ ছিল শোষক শ্রেণীভুক্ত কিন্তু ওর সৎ চেষ্টা দেখে বলশেভিকরাও এই চিত্রশালার নাম ত্রেত্যাকোফই রেখে দিল। ত্রেত্যাকোফের সময় সমস্ত ছবির সংগ্রহ হয়তো পাঁচ-ছটা ঘরে ছিল. কিন্তু আজ পঞ্চাশেরও বেশি ঘর। একদিনে কেউ ওটা দেখে উঠতে পারে না। ছবি একাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে রুশ চিত্রকলার এক হাজার বছরের ইতিহাস সামনে রাখা আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছবিগুলোতে ধর্মীয় ভাবের প্রাধান্য রয়েছে, সেইসঙ্গে মূলত বিজন্তীয় এবং কিঞ্চিত মধ্য-এশিয়ার চীনের প্রভাব আছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় প্রভাব শুরু হয়ে যায়। যেটা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণতা পায়। ইউরোপীয় প্রভাবের সঙ্গেই ব্যক্তি (পোর্টরেট) চিত্রণ শুরু হয়। পোর্টরেট—চিত্রণের আমাদের দেশেও সর্বদা অভাব আছে। গ্রিক চিত্রকলা দ্বারা প্রেরিত পশ্চিম ইউরোপ এই মহান কলাকে বিকশিত করেছিল। পুরনো রাশিয়ায় কিয়েফ, ত্বের (কালনিন), নবোগ্রাদ প্রভৃতি কলাকেন্দ্র ছিল। ইভানোফের আঁকা একটি বিশাল চিত্রফলক এখানে রাখা ছিল, যেটা পৃথিবীর বিস্ময়কর ছবিগুলোর মধ্যে পড়ে। ইভানোফ এই ছবিটি যীশুর জীবনকে নিয়ে বানিয়েছেন। এই অদ্ভুত ছবিটির সামগ্রী জোটাতে ইভানোফ কয়েক বছর যীশুর জন্মভূমিতে কাটিয়েছিলেন আর সেখানকার নরনারীদের, ভূমি-পাহাড়, পশু-বনস্পতির অনেক ছবি এঁকে ছিলেন যার ভিত্তিতে আবার এই ছবি নির্মিত হয়েছিল। চিত্রশালায় কিছু ছবি ত্রিপার্শ্বীয়, যার মধ্যে থাম, চেয়ার-মানুষ অথবা অন্য জিনিস একে অপর জনের থেকে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছিল। সোভিয়েত-কালে এমন মহান শিল্পী জন্মায়নি, যা জন্মেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু পুশকিন আর কালিদাস প্রতি অর্ধশতাব্দীতে জন্মায় না।

১৭ জুলাই পাঁচটার সময় ফের ট্রেন ধরলাম আর লেনিনগ্রাদের দিকে রওনা হলাম।

—১৯৪৬—

রাস্তায় স্টেশনে স্ট্রবেরি বিক্রি হচ্ছিল। পাঁচ রুবলে (তিন টাকা) এক পাতা ভর্তি স্ট্রবেরি।

দত্তভাই—এপ্রিল ১৯৪৬[১] দ্বিতীয়বার মস্কো আসবার সুযোগ পেলাম। এবার দত্ত ভাই-এর সঙ্গে দেখা হলে ওঁর জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম। ২৯ এপ্রিলে যখন ওঁর বাড়ি গেলাম, তিনি তখন শহরের বাড়িতে ছিলেন, তাই আলুর খেতে আর ছাই ঘাঁটার দরকার হলো না। দত্তভাই-এর নাম প্রমথনাথ দত্ত। ওঁর পিতা মন্মথনাথ দত্ত টার্নার মরিসন কোম্পানির পেশকার ছিলেন। ওঁর মায়ের নাম ছিল স্বর্ণকুমারী। তিনি মাতাপিতার কনিষ্ঠ পুত্র। দুই বড় ভাই নরেন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথ। সুকিয়া স্ট্রিটে (কলকাতা) এঁদের পৈতৃক বাড়ি। ওঁর জন্মসাল ভালোভাবে জানা নেই। তবে সেটা ১৮৮৮-এর কাছাকাছি হবে। প্রাথমিক স্কুলের পড়াশুনো শেষ করে, ট্রেনিং অকাদেমি থেকে ১৯০৬-এর কাছাকাছি তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন, তারপর জেনারেল এসেম্বলিতে আই· এ·-তে পড়তে থাকেন। বঙ্গভঙ্গের সময় ছিল। বাঙলাকে দু-টুকরো করার কারণে বাঙালীদের মধ্যে উগ্র ভাবনা জেগে উঠেছিল। প্রমথনাথ তাতে প্রভাবিত না হয়ে কিভাবে থাকতে পারতেন? আর শুধু অসন্তুষ্ট হয়ে মনে ব্যথা পেলে তো চলত না। দেশকে যারা গোলাম বানিয়েছে, আর যারা প্রদেশকে দু'টুকরো করেছে তাদের কিছু শিক্ষা দিতে হতো। বাঙলায় বিপ্লবীদের মধ্যে ওই সময় অনুশীলন আর যুগান্তর দুই দল ছিল। দুজনের লক্ষ্য ছিল অস্ত্রের জোরে ইংরেজদের ভাগিয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করা। তরুণ প্রমথনাথ যুগান্তর দলে যোগ দিলেন। আগে সিটি কলেজে আই· এ·-র দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছিলেন। তিন বছর তিনি পার্টিতে ছিলেন। এই সময় মির্জা আব্বাস (হায়দ্রাবাদ-নিবাসী) এবং এক দাস-কানুনগো প্যারিস থেকে শিখে এসে সর্বপ্রথম বোমা তৈরি করে। প্রমথনাথেরও ইচ্ছে হলো যে বোমা তৈরি করি এবং সৈনিক হবার শিক্ষা নিই। দেশে তাঁর কোনো সুবিধে নেই দেখে তিনি বিদেশ যাওয়া ঠিক করলেন। ডাঃ কার্তিক বোসের ভাই শ্রীচারুচন্দ্র বোস টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন। ওই সময় তখন পাসপোর্টের অসুবিধে ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরেজরা পাসপোর্টের কড়াকড়ি করে দেয়। এখন কেউ সরকারের কাছ থেকে পাসপোর্ট না নিয়ে ভারতের সীমা থেকে বাইরে যেতে পারবে না। ১৯০৮-এ প্রমথনাথ লন্ডন পৌঁছলেন। তাঁর তখন বয়স ২০ বছরের কাছাকাছি। প্রসিদ্ধ দেশভক্ত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ভারতীয় বিপ্লবী তরুণদের জন্যে লন্ডনে 'ইন্ডিয়া হাউস' খুলে ছিলেন। প্রমথনাথ তাতে যোগ দিয়ে ওখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে ভর্তি হলেন। কিন্তু এটা তো ছিল লন্ডনে থাকার ভাঁওতা মাত্র। এই সময় সাবরকর মদনলাল ধীগড়া, গৌরীশঙ্কর (আজমীঢ়ের) ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হলো। প্রমথ মাস খানেকের বেশি ওখানে টিকতে পারেননি। এটা জানাই যে মদনলাল ধীগড়া এক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ (কর্জন বায়লী)-কে গুলির নিশানা বানিয়েছিল যার জন্যে পুরো ইংল্যান্ডে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। প্রমথনাথ লন্ডন থেকে পালিয়ে গিয়ে নিউ ইয়র্ক পৌঁছলেন। নিউ ইয়র্ক ওঁর বর্কতুল্লা প্রায়

[১]মুদ্রণ-ত্রুটি হেতু মূলগ্রন্থে এই সালটি ১৯৬৪ ছাপা হয়েছে।—স·ম·

যোশী (বরোদা)-এর মত বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আর ওঁরা সবাই মিলে ওখানে ভারতীয় এসোশিয়েশন গড়েছিলেন। এখন প্রমথনাথ কোনো কারখানায় মজদুরের কাজ করতেন এবং আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার সহায়ক আয়রিশ লিগের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতেন। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা এক বোয়র (দক্ষিণ-আফ্রিকার) ওঁকে বোমা বানানো শিখিয়েছিল। এর সাহায্যে প্রমথনাথের ফ্রীমানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ফ্রীমান তার পত্রিকা 'গৈলিক আমেরিকান'-এ ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধেও লিখত।

প্রায় বছর খানেক থাকার পর প্রমথনাথ প্যারিস চলে এলেন। এখন তাঁর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে বিধিবদ্ধভাবে সৈনিক হবার শিক্ষা নেওয়ার ছিল। রণবিদ্যা ছাড়া ইংরেজদের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করবেন? ফ্রান্সে তিনি ফ্রেঞ্চ বিদেশী সেনাবাহিনীতে (ফোরেন লিজিয়ন) ভর্তি হয়ে গেলেন। এই সেনাবাহিনীতে জার্মান, ইংরেজ ইত্যাদি সব জাতের লোকই ছিল। মার্সেই-এ ছ মাস রেখে ওঁকে সমর-শিক্ষা দেওয়া হলো, ফের ওঁকে ফ্রান্সের অধীনস্থ দেশ অলজীয়রের ওরান নগরে পাঠানো হলো, যেখানে প্রায় দুবছর থাকলেন। কিন্তু ভারত থেকে দূরে আফ্রিকায় থাকলে সময় হলে দেশে কিভাবে তাড়াতাড়ি পৌঁছবেন? তাই ভারতের কাছাকাছি থাকার জন্যে তাঁর মন গেল ইন্দোচীনের দিকে এবং লিজিয়নের এক ছোট অফিসর হয়ে হেনোই চলে গেলেন। কিছুদিন বাদেই ওঁকে আবার ফেরত আসতে হলো, যখন এটা জানতে পারলেন যে ফ্রেঞ্চদের অধীনে থেকে তিনি কোনো কাজ করতে পারবেন না। ফ্রান্সে পৌঁছে তিনি মাদাম কামা-র কাগজ 'বন্দেমাতরম'-এ কাজ করতে লাগলেন। এখানে অন্য এক ভারতীয় স্বাধীনতা-প্রেমিক রানার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সংকেত ইউরোপে দেখা দিতে লাগল। প্রমথ ভাই-এর আবার মনে হলো যে ভারতের কাছাকাছি কোথাও যায়। তাই ১৯১৩ সালে তিনি তুর্কির রাজধানী কস্তুন্তুনিয়ায় এলেন। নৌজওয়ান তুর্কিদল তুর্কিতে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিল। ওদের নেতা আনোয়ার পাশা এখন শুধু সুলতানের রাজদ্রোহীই নয় বরং রইসুল্বজরা (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন। প্রমথনাথ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, ওঁর ভারতীয়তা ঢাকতে গিয়ে নাম হলো দাউদ আলী। কিন্তু যখন ভর্তি করার সুযোগ এলো, তখন ইংরেজের গোয়েন্দা সন্দেহে ওঁকে ভর্তি করা হলো না।

হায়দ্রাবাদ থেকে আব্দুল কিউম বেগ ফৈজ (তুর্কী) টুপি বানানো শিখতে গিয়েছিল। ভারতে লম্বা ঝুঁটিওলা তুর্কি টুপির খুব চল হয়েছিল। মূল স্থান ফৈজ-এর নামে ওগুলোকে 'ফৈজ' বলা হতো। দাউদ আলীও বেগের সান্নিধ্যে এসে ফৈজ বানানো শিখতে শুরু করে দিলেন। অবুসইদের 'জহানে ইসলাম' (ইসলাম জগৎ) খবরের কাগজ বেরতো। দাউদ আলী তার জন্যে ইংরেজি থেকে উর্দুতে লেখা অনুবাদ করে দিতেন। এই পত্রিকার লেখা আরবী, ফারসী এবং কিছু উর্দুতেও থাকত। এই সময় দাউদ আলী মুহব্বত আলীর 'কমরেড' কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় দাউদ আলী কস্তুন্তুনিয়াতেই ছিলেন। এখন তুর্কি নবযুবকেরা ওঁর ওপর বিশ্বাস করতে লাগল। আস্তে আস্তে দাউদ আলী ভারতের দিকে

ঝুঁকতে লাগলেন। বাগদাদে এসে ছ'মাস রইলেন। ফের আফগানিস্তানের দিকে এগোবার ইচ্ছেয় ইরানের ভেতর ইংরেজদের বিরুদ্ধ প্রচার করার জন্যে তুর্কি নবযুবকরা ওঁকে ১৯১৬ সালে ইরান পাঠাল। বুশহর আর সীরাজ হয়ে যজ্‌দ-এ পৌঁছলেন। বিদেশী ভাষাগুলোর মধ্যে ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি ছাড়া তুর্কির ভালো জ্ঞান ওঁর হয়েছিল আর এখন ফারসীর ক্ষেত্রে চলে এসেছিলেন। ওখানে খান খোজে আর মোহম্মদ কোকনীর সঙ্গে দেখা হলো। প্রসিদ্ধ দেশভক্ত সুফী অম্বাপ্রসাদ ওই সময় সীরাজে ছিলেন। উনি একটি মাদ্রাসা খুলেছিলেন। সেখানে তিনি বৃহত্তর ইসলামের বিষয়ে লেকচার দিতেন। গণতান্ত্রিক দলের প্রচারক লুলার সঙ্গেও প্রমথনাথের পরিচয় হয়েছিল। এই সব ভারতীয়রা ওখানে জমা হয়েছিলেন, ইরানীদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে এবং সুযোগ পেলেই স্বাধীনতার পতাকা পুঁততে ভারতে পৌঁছনোর জন্য। ১৯১৭-এর মাঝখানে ইংরেজ কুটনীতিজ্ঞ সাইক্স ওখানে পৌঁছে গেল। ইরানের বজীর আজম কবামুস্‌সল্‌তনত (পিতা) ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিল। সে ভারতীয়দের ধড়পাকড় করতে লাগল। সুফী অম্বাপ্রসাদ ভয় পেয়ে গেলেন যে সে যদি তাঁকে ধরে ইংরেজদের হাতে দিয়ে দেয় তাহলে ওঁকে খুব খারাপভাবে মারা হবে, তাই তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। দাউদ আলী, মোহম্মদ আলী খানখোজে পালিয়ে গিয়ে কশকাই দলের শরণার্থী হলেন। কেউ এই দলের সর্দারের সঙ্গে এঁদের পরিচয় করে দিয়েছিল। এঁরা তাঁবুতে থাকতেন আর নামাজ পড়তেন। সর্দার বলে দিয়েছিল যে, এরা মূর্খ এবং সন্দেহ যেন না হয় সেজন্যে তাঁরা যেন নিজেদের পাকা মুসলমান রূপে দেখান। বছর খানেকের কাছাকাছি ওঁরা কশকাইদের সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনা ১৯১৯-এ সরে যায় তখন দাউদ আলী তেহরান পৌঁছলেন। ওখানে দারুত্‌ফনুন নামের সংস্থায় ইংরেজি পড়াতে লাগলেন। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ জার্মান, তুর্কি, ফারসী ভালো করে জানতেন। এখন দাউদ আলী নাম বদলে আব্দুল রহমান হয়ে গেলেন।

১৯০২ সালে টেলিগ্রাম পেয়ে দাউদ আলী মস্কো পৌঁছলেন। ওই সময় মস্কোয় ভারতীয় বিপ্লবীদের আড্ডা মতন জমেছিল। চট্টোপাধ্যায়, আচার্য অবনী মুখার্জি ইত্যাদি আরো কত ভারতীয় বিপ্লবীরা জমা হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউই কম্যুনিস্ট শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে বেরোননি, তাই সবার মনোবৃত্তি ছিল মধ্যবৃত্তদের মত, আর সবাই নিজের নিজের নেতৃত্বের জন্যে নিজেদের মধ্যে লড়াই করত। ভারত থেকে হিজরত করে আসা অনেক লোক এখানে পাওয়া গেল। পুরনো পরিচিত বর্কতুল্লাও এখন এখানেই ছিলেন। দাউদ আলীর ইচ্ছে ছিল ভারতের কাছে থাকার জন্যে ইন্দোচীন যাবার, কিন্তু অন্যরা ইরানে পাঠাতে চাইছিল। এদিকে ভারতীয়দের ভেতরে ভেতরে কলহ দেখে দাউদ আলীর দুঃখ হতে লাগল। এই সময় প্রসিদ্ধ ইন্ডলোজিস্ট ডক্টর ওলদেনবুর্গ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তিনি বললেন, 'এই সব ঝগড়া ছাড়, চলো শিক্ষার কাজ করো।' ওলদেনবুর্গ ১৯২২-এ ওঁকে লেনিনগ্রাদে ডেকে নিলেন আর প্রাচ্য প্রতিষ্ঠানে ফারসী আর বাংলা, পরে উর্দূ পড়ানোর কাজ দিলেন। এখন তিনি প্রায় ৩৬ বছরের, এই সময় ১৯২৪-এ পড়ে গিয়ে পায়ে খুব চোট পেলেন। ডাক্তর বেঁধে দিল, যার ফলে ওঁর ডান পা চিরদিনের জন্যে

বেকার হয়ে গেল। স্যানিটোরিয়মে থাকলে হয়তো কিছু সুবিধে হবে, তাই ১৯২৭-১৯২৮-এ তিনি কৃষ্ণসাগরের কূলে গেলেন। ওখানেই ওঁর লুবোব অলেক্সেস্রোভনার সঙ্গে পরিচয় এবং প্রেম হলো। দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। যে সময় (এপ্রিল ১৯৪৬) ওঁর সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছিলাম, ওই সময় ওঁর শিক্ষকতার ২৩ বছর হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪১-এ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আরো বহু নামীদামী লোকেদের মত প্রমথনাথ দত্তকেও উড়োজাহাজে কজান পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে তিনি ছ'মাস রইলেন। ফের আগস্ট ১৯৪৩-এ মধ্য-এশিয়ায় ফরগানার উপত্যকায় চলে গেলেন। ওখানে ম্যালেরিয়ায় ধরল। তখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি—নভেম্বর ১৯৪৩-এ তিনি মস্কো প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে চলে এলেন আর তখন থেকে এখানেই থাকছেন।

প্রথম তিন মাস

জুন-জুলাই-আগস্ট রাশিয়ায় গরম আর বর্ষার দিন। গরম শুধু ভদ্রতা করেই বলা যায়, কেননা লেনিনগ্রাদ সম্বন্ধে এইটুকুই কেবল বলা চলে, যে এই সময় কোনো সপ্তাহই এরকম হয় না, যখন দিন-রাতের মধ্যে কোনো কোনো সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে পৌছয় না। তাও এই সময় শ্যামলিমা দেখা যায়। মস্কোতে তো ঘাম হবারও সময় হয়েছিল, কিন্তু লেনিনগ্রাদে বর্ষার সময়, হাওয়া বেগে বয়ে যাবার জন্যে শীত বেড়ে যায়। আমাদের আগে জার্মান উড়ো জাহাজের আক্রমণের কারণে পড়ে যাওয়া বাড়িগুলোর জায়গায় বেশ কয়েক একর খালি জমি বেরিয়ে এসেছিল, যা আমি আগে বলেছি, লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে নিয়েছিল। জুলাই-এর শেষ সপ্তাহে ওখানে খুব শ্যামলিমা দেখা যাচ্ছিল। আলুর চাষ হয়ে গিয়েছিল, স্যালাড-পেঁয়াজ খাওয়া হচ্ছিল। আগস্টের শেষ পর্যন্ত আমার দিনচর্যা ছিল—বেশির ভাগ সময় বাড়িতে থেকে বই পড়া, কখনো-সখনো সিনেমা বা নাটক দেখতে যাওয়া। ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য গ্রন্থাগার থেকে কাজের বই যথেচ্ছ পাওয়া যায়। এখানে এসেই স্থির করেছিলাম যে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া নিয়ে এমন একটা গ্রন্থ লিখি, যার থেকে ওদের অতীত আর বর্তমান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হতে পারে। বর্তমান নিয়ে বেশি কিছু সমস্যা ছিল না, কারণ সে-সম্বন্ধে সামগ্রী সহজলভ্য ছিল। ভারতে পৌছেই প্রথম ভাগের (১৯৪৭) শেষেই আমি সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার নামে তা লিখেও ফেললাম, কিন্তু মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস অতটা সহজ ছিল না। যখন আমি ওর সম্বন্ধে বই পড়তে লাগলাম এবং জানতে পারলাম যে ইউরোপের সমুন্নত ভাষা—ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান আর রুশেও কোনো সুসম্বদ্ধ ইতিহাস লেখা হয়নি।

ডক্টর বরান্নিকোফ সংস্কৃত আর ভারতীয় ভাষার শুধু পণ্ডিত নন, সেই সঙ্গে রোমনী (সিগান) ভাষাও উনি বিশেষ ভাবে পড়াশুনো করেছেন। আমি ওঁর বইপত্র দেখলাম এবং রোমনী ভাষার উত্থান সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রোম বস্তুত 'ডোম' শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ। এই ঘুরে বেড়ানো ডোমরা কোনো সময় ভারত থেকে পশ্চিম দিকে চলে যায়। লোলী নামে পরিচিত এই লোকেদের ইরান আর মধ্য-এশিয়ায় দেখা যায়, কিন্তু ইউরোপে ওরা এখন অব্দি নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। এদের ভাষায় ভোজপুরী বুন্দেলখণ্ডী, ব্রজ আর অবধীর বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়। আমি জানতাম যে মুসলিম সনের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে (খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দী) অধিকাংশ রোম (ডোম) লোকদের সম্বন্ধ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ভবঘুরে হবার জন্যে ওদের বিচরণভূমি খুব বিস্তৃত ছিল। বর্তমানকালে ভারতে যাতায়াতের এতটা কড়াকড়ি হওয়া সত্বেও আমরা পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন আর হরিদ্বার থেকে মাদ্রাজ অব্দি এদের মাথায় শরের আচ্ছাদন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখি। যখন রাজনৈতিক বন্ধনের অতটা কড়াকড়ি ছিল না, তখন হয়তো ভারত থেকে মধ্য-এশিয়া, ইরান পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত। কোনো সময় রাজনৈতিক তোলপাড়ের জন্যে ওদের ভারতে ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে ওরা ভারতের সঙ্গে ফের সম্বন্ধ জুড়তে পারল না এবং পশ্চিমের থেকে আরো পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল। বাঁদর-ভালুক নাচানো, হাত দেখা ইত্যাদির সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে ঘোড়ার পালন-পোষণ আর বেচাকেনার পেশাও গ্রহণ করল। পশ্চিমে গিয়ে ওরা মোষ, গাধা বা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর বদলে গাড়ি ব্যবহার করতে লাগল।

পড়াশুনো আর ঘরের কাজ সামলানো—এই দুটোতে বিরোধ আছে, এটা ২৪ জুলাই (১৯৪০) জানতে পারলাম। বৈদ্যুতিক কেটলিতে জল গরম হতে দিয়ে আমি লেখাপড়া করতে গেলাম। দু ঘণ্টা পরে হুঁশ এল, তখন দেখি সমস্ত জল শুকিয়ে গেছে, বাসনের রঙ ধুয়ে গেছে। আর তারও পুড়তে শুরু করে দিয়েছে। কেটলি নষ্ট হলো। ৩০০ রুবলের চড় খেলাম।

লেনিনগ্রাদ দুই শতাব্দী ধরে রাশিয়ার রাজধানী ছিল—ওই সময় তার নাম ছিল পিটারবুর্গ। সেজন্য রাজধানীর মত বহু সংস্থা সেখানে গড়ে উঠেছিল, যেগুলো মস্কোকে রাজধানী বানানোর পরও হাটানো যায়নি। কিন্তু এদিকে কিছু সংস্থা যুদ্ধের কারণে এমনভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সেগুলো ফের জমতে দেরি হবে।

২৯ জুলাই আমরা প্রাণী-উদ্যান (জুসদ) দেখতে গেলাম। কোনো সময় এখানে নিশ্চয় সব রকমের জন্তু-জানোয়ার ছিল, কিন্তু এখন দু-তিনটে ভালুক, দুটো বাঁদর, শেয়াল, পেঁচা, বাজপাখি, শকুন, খরগোস, নীল গাই ইত্যাদি রয়ে গেছে। জুসদ-এর অনেক বাড়ি বোমাবর্ষণে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাও রোববারে ছেলেদের ভিড় জমে যায়। ওখান থেকে আমি পার্ক-কুল্‌তুরে (সংস্কৃতি-উদ্যান) গেলাম। ভেতরে প্রবেশ করতে দু রুবল দিতে হয়। এটা একটা বিশাল উপবন, যা দেবদারু আর অন্যান্য গাছপালায় সবুজ হয়ে আছে। ঘাসের মখমলের বিছানা এবং সেই সঙ্গে আঁকাবাঁকা জলধারায় নৌকোবিহারের আনন্দ

উপভোগ করা যায়। উদ্যানে যেখানে-সেখানে সিনেমা, নাট্যগৃহ, নৃত্যের আখড়া আছে। এক জায়গায় অনেক নারীপুরুষ নাচছিল। উদ্যানের ব্যান্ড বাজছিল। নদীতে নৌকোর ওপর চারজন কুমারী জোরে দৌড়চ্ছিল। উদ্যানের কিনারা দিয়ে একটা বড় নদীও বইছিল, যার বালুকাময় চরের ওপর লোকেদের বড় মেলা বসেছিল—তরুণ, তরুণী, বাচ্চা-বুড়ো স্নান করছিল। জুলাই-এর মধ্যাহ্নে জল এখন অত ঠাণ্ডা ছিল না। আমিও নামলাম আর চাইলাম নদী পার হতে, লোলার ভয় লাগল যে আমি মাঝখানেই না থেকে যাই। তা অর্ধেকের বেশি আমি সাঁতরে পার হয়েছিলাম, যেখান থেকে ফেরা মানে পুরো নদী পার হওয়া।

খাওয়া-দাওয়ার জিনিস জায়গায় জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল। যদি আপনি রেশনের টিকিট দিতে পারেন তাহলে দু টাকার মাল একআনা-দেড়আনায় পাওয়া যায়, না হলে রেশনের বাইরের দামে নিতে হবে। এক খুরি আইসক্রিমের দাম ৬ রুবল (প্রায় পৌনে চার টাকা)। বিনা-রেশনের জিনিসের খুব দাম। বিখ্যাত পীটার পল দুর্গ সামনে দেখা যাচ্ছিল। এখানকার সৈনিকদের বলশেভিক আন্দোলনে খুব হাত ছিল। ফেরার সময় আমরা উদ্যানের বাইরে কিন্তু পাশেই অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির হয়ে গেলাম। এটা পাথরের খুব মজবুত ও সুন্দর একটি ইমারত। তিব্বতী মন্দিরের ঢঙে তৈরি। এখন এখানে কোনো পূজারি ছিল না, তাই মূল্যবান মূর্তি আর চিত্রপট কোনো সংগ্রহালয়ে রাখা হয়েছিল। মন্দিরের ঘরগুলো যদি বিধ্বস্ত নগরের নাগরিকরা তাদের থাকার জন্যে ব্যবহার করে, তাতে কোনো দোষ নেই। আমার সামনেই মঙ্গোল জনপ্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ছোয়-বল্‌সান্ আরো কয়েকজন মন্ত্রীদের সঙ্গে মস্কো হয়ে লেনিনগ্রাদেও এসেছিলেন এবং মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। এটা শুধু পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রোপাগাণ্ডা যে কম্যুনিস্টরা ধর্মকে নিজের দেশ থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ায় রোববার ধর্মস্থান আর গির্জাগুলো যতখানিব ভরে থাকে, তার চতুর্থাংশ ভক্তও পশ্চিমী ইউরোপের গির্জায় দেখা যায় না। বস্তুত সংস্কৃতি, সাহিত্য ও কলার ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম দেশের যতটা সেবা করে, তার শিকড়ও সেই দেশে ততটাই মজবুত হয়। এই কারণেই মঙ্গোলরা বৌদ্ধধর্মকে সেইরকমই নিজের জাতীয় ধর্ম ভাবে, যেরকমটি ভাবে রুশরা তাদের গ্রিক চার্চকে। মোঙ্গল প্রধানমন্ত্রী এই মন্দির দেখে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন যে এখানে ফের কিছু ভিক্ষু রেখে বসবাসযোগ্য করা হবে।

৩০ জুলাই বৃষ্টি পড়তে লাগল। যার ফলে শীতও বেড়ে গেল। লোকেরা বলছিল, এখন শরৎকাল (পাতাঝরা) শুরু হয়ে গেছে, এখন বরাবর এইরকমই বর্ষা বাদল আর শীত থাকবে, সূর্য-দর্শন মাঝে-মধ্যে হবে। সেপ্টেম্বরে বর্ষা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার সঙ্গেই শীতও বেড়ে যায়। লেনিনগ্রাদ শহরে গ্যাস লাগানোর যোজনা কাজে লাগানো হচ্ছিল। পাশের এলাকার পিটের কয়লা দিয়ে বানানো গ্যাস এনে শহরের কাজে লাগিয়ে দেবার পর ইন্ধনের খরচ খুব বেঁচে যাচ্ছিল। এই জন্যেই গ্যাস-যোজনা বানানো হয়েছিল। এক মধ্যবিত্ত মহিলা বলছিল যে এই যোজনা দশ বছরে সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু আমি থাকতে থাকতেই অনেক পাড়ায় মিউনিসিপ্যালিটির দিক থেকে গ্যাসের উনুনও লেগে যেতে

দেখলাম। মিউনিসিপ্যালিটির শুধু গ্যাসের পাইপই নয়, প্রত্যেক বাড়িতে উনুনও লাগিয়ে দেবার কথা, যার জন্যে সামান্য ভাড়া অবশ্যই দিতে হতো। ৩০ লাখ জনবসতির শহরের পক্ষে এটা কত বড় কাজ সেটা বলার প্রয়োজন নেই। বাইরের বহু লোক ভাবে, যে সোভিয়েত দেশের নাগরিক তো এখন হোটেলের খাবার খায়, তাদের ঘরে উনুনের দরকার নেই। এতে সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক পাড়ায় যৌথ রান্নাঘরও আছে, কিন্তু তার ব্যবহার লোকেরা সময়-অসময়ে করে। আমি ২৫ মাস লেনিনগ্রাদে থাকলাম, আমি নিজের পাড়ায় যৌথ রান্নাঘরের মুখ শুধু বাইরের রাস্তার থেকেই দেখলাম।

যত সময় কাটতে লাগল, ততই আমার ভারতের খবর জানবার উৎসুকতাও বাড়তে থাকল। চিঠিপত্র সংক্ষিপ্ত হতো, তাও আবার বহুদিন বাদে বাদে পেতাম। আমাদের কামরায় রেডিও লাগানো ছিল, কিন্তু সেটা স্থানীয়। সোভিয়েতের প্রায় ছোট ছোট নগরেও বড় রেডিও স্টেশনের প্রোগ্রাম শুনে টেলিফোনের মতো পুনঃ প্রচারিত করা হয়। এর যন্ত্র দু'চার টাকায় পাওয়া যায়। এইরকম যন্ত্র নেই এমন বাড়ি খুব কমই থাকে। ভাড়াও কম লাগে এবং অহোরাত্র কুড়ি-একুশ ঘণ্টা সেটা বলতেই থাকে। জাপানে পাঁচ মিনিট ইংরেজির জন্যেও দিত, কিন্তু এখানে তাও ছিল না। সঙ্গীতের প্রাচুর্য যদিও সোভিয়েত দেশের ফিল্মে আর নাটকে থাকে না, কিন্তু এই রেডিওতে তার জন্যে অনেক সময় দেওয়া হতো। ক্লাসিক্যাল (ওস্তাদী) সঙ্গীত সারা দুনিয়ায় মনে হয় একই ধাঁচে তৈরি। যেরকম ভারতের ওস্তাদদের সঙ্গীত শোনার জন্যে খুব ধৈর্যের দরকার, সেই একই কথা এখানকার সম্বন্ধেও বলা চলে। গলা চড়ানোই উচ্চ-সঙ্গীত, তা মানতে আমি রাজি নই। সংস্কৃতে বলে, 'গদ্যং কবীনাং নিকর্ষং বদন্তী', ওইভাবেই পশ্চিমের লোক অপেরা অর্থাৎ পদ্যময় নাটককে নাট্যকলার চরম সীমা মনে করে। কিন্তু ওস্তাদী সঙ্গীতের মতনই অপেরাকে শোনার সময়ও আমার কান পূর্ণতা পেতে থাকে। পরম্পরা কিভাবে মানুষকে বেকুব বানায়, এই দুটো উদাহরণ তারই প্রমাণ। পুরুষদের সঙ্গীত বিদ্যায় হাত দেওয়া উচিত না, তা আমি বলছি না। তবে এটা অবশ্যই বলব যে পুরুষ সঙ্গীত-শিক্ষক আর সঙ্গীত-শাস্ত্রীই হতে পারে। ওদের কাছে মধুর স্বরের জন্ম দেবার কণ্ঠ নেই। অধিকাংশ পুরুষ-গায়ক, বস্তুত স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে অনধিকার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ওস্তাদী সঙ্গীতে স্ত্রীলোকরাও পুরুষের কান কম কাটে না, বিশেষ করে যখন ওরা বেসুরো কাঁদুনি শুরু করে, অথবা কোকিল বা অন্য কোনো পাখির স্বর নিজের কণ্ঠ দিয়ে বার করার চেষ্টা করে। আমি জবরদস্তি কখনও কখনও স্থানীয় প্রোগ্রাম শুনতে বাধ্য হতাম, কেননা বাড়িতে 'গুণগ্রাহক' মজুদ ছিল। ওই সময় এই ধরনের খেয়াল আমার মাথায় ঘুরত। ভারতের খবর জানার জন্য আমার সবচেয়ে বেশি ব্যাকুলতা ছিল। ধীরে ধীরে আমায় ঠিক করতে হলো যে বিদেশী খবর বলা একটা রেডিও কিনতে হবে। এখন এই যন্ত্র কমই তৈরি করা হতো, তাই ওর দাম ছিল খুব বেশি। আমার বন্ধু বলছিলেন কয়েক মাস আরো থেকে গেলে হয়তো সস্তায় পাওয়া যাবে।

৫ আগস্ট রোববার ছিল তাই সেটা ছুটির দিন। আমার জন্যে তো পয়লা সেপ্টেম্বরেই কাজ শুরু হবার কথা। আজ রোদ ছিল। সন্ধেবেলায় একটু একটু বৃষ্টিও হয়েছিল। লোলার

পদরুগা (সখী) সোফি বাসিলিয়েভনা (বাসিলীয়েফ-পুত্রী সোফি) আমাদের পাড়ার পাশেই থাকত। ও ছিল জারের আমলের এক জেকর জেনারেলের মেয়ে, অতএব সংস্কৃতিসম্পন্ন মধ্যমবিত্ত ঘরের কন্যা। ওর অনেকগুলো বিয়ে হয়েছিল, যার মধ্যে সব শেষেরটা হচ্ছে যুদ্ধের সময় এক শোফরের সঙ্গে। কিন্তু শোফর (মোটর ড্রাইভার) মানে এই নয়, যে ও আমাদের এখানকার ড্রাইভরদের মতো ছিল। ও সেই সঙ্গে মোটর-ইঞ্জিনিয়ার এবং বেশ সুসংস্কৃতিসম্পন্নও। ওর মা-বাবা বোধহয় রাশিয়ায় প্রবাসকারী জার্মান। সোফিকে এখন তার নিজের রোজগারের ওপর ভরসা করতে হতো, যার জন্যে ও একটা কারখানায় কাজ করতে যেত, আর চারশো রুবল মাসিক পেত। ও তিনটি কামরা নিয়ে রেখেছিল, যার ভাড়া বাবদ একশো রুবল চলে যেত। তিনশো রুবলে ও কি করে দুই ছেলের আর নিজের খরচা চালাত, এটা বোঝা অবশ্যই একটু মুশকিল ছিল, কিন্তু ওর কাছে তিন-তিনটে রেশন কার্ডও ছিল। আমাদের বাড়ির সঙ্গে সোফির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাই যে কোনো উৎসবে বা পরবের দিনে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ অবশ্যই করা হতো। কখনও কখনও যখন পরব উপলক্ষে মদ্যপানের পালা চলত তখন আমার খুব অসুবিধে হতো। পরে সবাই জেনে গিয়েছিল যে মদ না খাওয়ার ব্যাপারে আমি খুব কড়া নিয়ম পালন করি। ওরা এর অর্থ বুঝত না কেননা ওদের দেশে মদকে জলের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই নালিশ করা হতো। আমি কাউকে মদ খেতে দেখলে ঘৃণা করতাম না, কিন্তু জীবনে একটি জিনিসকে যখন কখনও ছুঁইনি, তখন তার রেকর্ড রাখার লোভ অবশ্যই ছিল।

৬ আগস্ট আমরা এখানকার একটি রীনক (হাট) দেখতে গেলাম। কাঠের তৈরি ছোট ছোট স্টল দেওয়া এই হাট আমাদের এখানকার হাটের অনেকটা বিকশিত রূপ। তফাৎ শুধু এটাই যে এখানে পেশাদার দোকানি ছিল না। আশেপাশে গাঁয়ের লোক নিজেদের বাড়িতে চাষ করা জিনিস—শাক-সবজি, ফল, ডিম ইত্যাদি নিয়ে আসত, তেমনি যার নিজের কোনো প্রিয় জিনিস কেনবার ইচ্ছে হতো, সেও আসত। রেশনকার্ডের এখানে দরকার হতো না, তাই সব জিনিস দশগুণ দাম দিয়ে পাওয়া যেত। কেউ নিজের মাখন এই জন্যে বেচে দিত যাতে সেই জায়গায় সিগারেট নিতে পারে, কেউ আবার সিগারেটও অন্য কোনো জিনিসের জন্যে বিক্রি করতে চাইত—সোজাসুজি অদল-বদল হতো না। জুতোও পাওয়া যেত, কোট আর কাপড়ও পাওয়া যেত। আমি তো এই ভেবে গিয়েছিলাম, যে যদি কোনো পুরনো রেডিও পেয়ে যাই তাহলে নিয়ে আসব, কিন্তু ওখানে তার কোনো নামগন্ধ ছিল না। লোলার এক আত্মীয়ার কাছে একটি রেডিও ছিল, কিন্তু সেটা ছিল দীর্ঘ তরঙ্গের। তাতে ভারত বা ইংল্যান্ড শোনা যেত না।

সাত আগস্টে খাবার সময় খুব আনন্দ হলো, যখন নিজের হাতে চাষ করা আলু সুপের মধ্যে পেলাম। এখন সেগুলো দু-তিন তোলা ওজনের হয়েছিল। বুঝতে পারলাম এখানকার মাটি আলুর পক্ষে খুব অনুকূল।

৯ আগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এখন রুশ খবর আমি বুঝতে পারছিলাম কিন্তু ভারতের একটা খবরও না সোভিয়েত রেডিওতে শুনতে

পাচ্ছিলাম, না খবরের কাগজে।

১৩ আগস্ট সোমবার ছিল। আজ বিশ্রাম-দিনের টিকিট পেয়েছিলাম। সংস্কৃতি-উদ্যান তথা অন্যান্য বিশ্রাম-স্থানগুলোর এরকম টিকিট সব কার্যালয়েই পাওয়া যেত। ইউনিভার্সিটি, কলেজ, দোকান, কারখানা, অফিস, সব জায়গায় কাজের লোকেরা এর থেকে সুবিধে নিত। টিকিটের দাম ৩০ রুবল (প্রায় ২০ টাকা), যার মধ্যে ৯ রুবল শুধু নিজের দিতে হতো, বাকি মজদুর সংঘ দিত। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে প্রফেসর হও বা চাপরাশী হও, দোকানে বস বা কারখানার ম্যানেজার হও, মাথার বা শারীরিক কাজ করা স্ত্রী-পুরুষ সবাই মজদুর-সংঘের সদস্য এবং তাদের বেতন থেকে সংঘের শুল্ক কাটা হয়। সংঘ সেই পয়সায় নিজেদের সদস্যদের চিত্ত-বিনোদন, স্বাস্থ্য, বেকারি ইত্যাদির ব্যবস্থা করত। এই এক দিনের ছুটির ব্যবস্থা আমাদের মজদুর সংঘের তরফ থেকে ছিল। আমরা সেটা কাটাতে কিরোফ-পার্ক-কুল্‌তুরে গেলাম, যার সম্বন্ধে আমি আগেও বলেছি। নাট্যশালার আজ ছুটির দিন, নয়তো তার টিকিটও আমাদের টিকিটের মধ্যেই ছিল। সিনেমা দেরিতে শুরু হবার কথা ছিল আর উদ্যান থেকে আমাদের বাড়ি দেড় ঘণ্টার ট্রামের রাস্তায়, তাই দুটো দেখার ইচ্ছে ছাড়তে হলো। একটার সময় সকালেই আমরা রওনা হলাম আর সাড়ে দশটায় উদ্যানে পৌছলাম। বিশ্রাম-প্রার্থীদের পরেই একটা কার্যালয় ছিল, যাকে 'বাজা অদনা দিনেব্‌নী অত্‌দিখা' (একদিন-বিশ্রামকেন্দ্র) বলা হয়। কার্যালয় টিকিটের অর্ধেক নিয়ে আমার নাম লিখে নিল। আরো কত স্ত্রী-পুরুষ এসেছিল, যার মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যাই ছিল ছিল। আজ রোববার নয় তাই আগের মত ভিড় দেখা গেল না। নীচে ওপরে দোতলা বাড়িতে আটখানা ঘর ছিল, যাতে নাচ-গান, পড়া আর খেলার ঘরে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বিশ্রাম প্রার্থীরা ঘরে বসে থাকতে এখানে আসে না, তারা প্রকৃতির সুন্দর কোলের আনন্দ উপভোগ করতে চায়।

এগারোটার সময় জলখাবার তৈরি হলো। রুটি নিজের রেশন-টিকিটে নিতে হলো, আর বাকি জিনিস বিশ্রাম-টিকিটের মধ্যেই ছিল। খাবার জিনিসের মধ্যে লপ্‌সিও ছিল, যার আমাদের লপ্‌সির সঙ্গে নামে মিল আছে, কিন্তু সেটা ছিল নোনতা সেমুই। মাছ, আর সঙ্গে এক গেলাস মিষ্টি চা—ব্যস এই ছিল প্রাতরাশ। রুশরা মিষ্টি চা, তাও আবার পেয়ালায় নয় কাঁচের গেলাসে, খেত। ওতে তারা দুধ দেওয়া নিরর্থক মনে করে। হ্যাঁ, যদি পাওয়া যায় তো কাগজী লেবু টাকার মাপে গোল করে কেটে দেওয়া খুব পছন্দ করে।

মধ্যাহ্নভোজন হলো একটার কাছাকাছি। এতে একজাতীয় বরবটি আর কোনো একরকম শাকের সুপ (রসা) প্রথমে দেওয়া হলো, তারপরে টিনের মাংস সেদ্ধ করা বড় বিনের সঙ্গে, আর সব শেষে কম্পোত পরিবেশন করা হলো, যার মধ্যে পাতলা মিষ্টি শরবতে খুবানি দেওয়া ছিল। জিনিসগুলো খুব সুস্বাদু ছিল না, কিন্তু অবশ্যই পুষ্টিকারক ছিল। সান্ধ্যভোজন রেজকা (মুলোর পাতলা টুকরো) ভাত পুর দেওয়া কচুরি (পেরগসরীসম) আর গেলাস ভর্তি মিষ্টি চা।

'সর্বে সত্ত্বা আহারস্থিতিকা :'[১] এই বুদ্ধ-বচন অনুসারে প্রাণী মাত্রেরই সব চাইতে কঠিন

[১] 'সব প্রাণীরই আহার অত্যাবশ্যক।'—স.ম.

আর অনিবার্য আবশ্যকতা হলো আহারের, যার সম্বন্ধে আগে বলা জরুরি ছিল। কিন্তু যে ১০-১১ ঘণ্টা আমরা উদ্যানে কাটালাম তা কেবল খেয়েদেয়েই কাটিয়ে দিইনি। প্রাতরাশের পরে আমরা স্নান করতে নদীতটে গেলাম। ওখানে একটা বেশ ভালো মেলা বসেছিল, যেখানে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশি হওয়াটা আমাদের দেশে খুব একটা বড় ব্যাপার নয়। বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের শিক্ষিকাদের সঙ্গে এসেছিল। পুরুষরা জাঙ্গিয়া বা স্নানের পোশাক পরে স্নান করছিল, বেশিরভাগ স্ত্রীলোকের স্নানের পোশাক ছিল স্তনবন্ধ আর জাঙ্গিয়া। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ন্যাংটো হয়েই নাইছিল। নাওয়া, সাঁতরানো, ফের বালিতে শুয়ে শুয়ে রোদ পোহানো, তারপরে ফের নাওয়া আর সাঁতরানো। দু'বার আমিও অর্ধেকটা অব্দি সাঁতার কাটতে গেলাম। রোদ পোহানো এখানকার লোক খুব পছন্দ করে, আর হপ্তার পর হপ্তা রোদ পোহানোর পর যখন এদের রঙ কিছুটা তাম্রবর্ণ হয়ে যায়, সেটা ওরা খুব পছন্দ করে, সুস্থ শরীরের চিহ্ন বলে মানে। স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশায় পার্থক্য না থাকার কারণে অর্ধনগ্ন-সৌন্দর্যের দিকেও মানুষ একেবারে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখত। নেয়ে-ধুয়ে, ঘুরে-ঘেমে একটার সময় ভোজনালয়ে ফিরে এলাম। দুটোর সময় মধ্যাহ্ন ভোজন হলো। ওখানে কাপড়ের আরাম কেদারা পাওয়া গেল। সেগুলো নিয়ে আমরা নদীতটে গাছের নীচে গিয়ে বসলাম। আমাদের পায়ের নীচেও সবুজ সবুজ ঘাস ছিল। কত লোক এখানকার গ্রন্থাগার থেকে উপন্যাস বা অন্য কোনো বইও এনে পড়ছিল। কিছু লোক চেয়ারে বসে বসে ঘুমোচ্ছিল, আর কিছু ঝিলের নৌকো-বিহার দেখছিল। নৌকো-বিহার দেখে আমার কাশ্মীরের কথা মনে পড়ছিল। জারের আমলে এই উদ্যান রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং রাজবংশের লোক আর তাদের অনুচরেরা ছাড়া অন্য কেউ ভেতরে আসতে পারত না। কিন্তু আজ মজদুররা তাদের পা দিয়ে একে পিষ্ট করে দিচ্ছিল। মহল আজও আছে, তাতে যুদ্ধের সময় গ্রামীণ-অর্থনীতিবিদরা স্কুল খুলেছিল। কিছুক্ষণ আমিও চৈনিক অন্টা খেলা খেললাম. তারপর গান শুনলাম আর ঘুরে বেড়ালাম। লেনিনগ্রাদ মহানগর, সেখানে উপকারী বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন একে অপরের থেকে দূরে থাকে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করা সোজা কাজ নয়। এখানে কখনও-সখনও তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। লোলার সখী ভ্যালেন্তিনা তার মায়ের সঙ্গে এসেছিল। ও কোনো এক গ্রন্থাগারে কাজ করত। লোলার কথানুসারে ও খুব ভালো গায়িকা। সুন্দরীও ছিল। আমি বললাম, 'তাহলে নাট্যমঞ্চে যায়নি কেন?' ওখানে আমার গান শোনার সুযোগ হয়নি।

ট্রামডিপোয় এলাম। ভিড় এত ছিল, যে আধঘণ্টার মধ্যেও ট্রামে জায়গা পাওয়া গেল না। তারপর কোনোমতে ট্রামে চড়ে সাড়ে নটার সময় বাড়ি পৌঁছলাম। কিন্তু আগস্টের সাড়ে নটায় কেন, সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত গোধূলীই থাকে।

বাইরেই শুধু মনোরঞ্জন আর চিত্তবিনোদনের জিনিস মেলে না, ঘরের ভেতরেও তার যথেষ্ট উপকরণ জমা ছিল। লোলার নিজের একমাত্র পুত্রের ওপর অসাধারণ ভালোবাসা হওয়া স্বাভাবিক, যে পুত্রকে ও লেনিনগ্রাদের হাজার দিনের ঘেরাও-এর সময় প্রাণ দিয়ে লালন-পালন করেছিল। যখন রেশন ছটাক-দেড় ছটাকে নেমে গিয়েছিল, তখন ও নিজের

খাবার ওকে দিয়ে দিত আর নিজে খিদে সহ্য করত। একবার ও এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল আর মাথা ফেটে শুকনো শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছিল। তারপরও কতবার ওর ভালোবাসা আমার অন্ধ বলে মনে হয়েছে। ছেলে জানত যে, ওর মা ওর কোনো কথা নাকচ করতে পারবে না, তাই জেদ করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সকাল হলে লোলা তার ইগরকে ডাকত, 'জামাকাপড় পর, ইগরুস্কা, মোই, কিশিঙ্কা' (জামা কাপড় পর ইগর সোনা, আমার প্রিয়)। দুঘণ্টা বেলা উঠে গেলেও ইগর পড়ে পড়ে ঘুমোত। আবার একটুপরে মায়ের খেয়াল ওদিকে যেত, তখনও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওই একই কথা দ্বিতীয়বার বলত। ইগর ওদিকে মনও দিত না। ও নিজের মনকে জানত।

যদিও শিশু-উদ্যানে গেলেই ভালো প্রাতরাশ পাওয়া যেত, তারপর ভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু লোলা নিজের কিশিঙ্কাকে কিছু না খাইয়ে কি করে যেতে দেয়? এক গেলাস দুধ খেতে কিশিঙ্কা ১৫ মিনিট লাগাতো। কথা না শুনলে মাঝে মাঝে লোলার চেঁচামেচি বজায় থাকত। এ'বছর পয়লা সেপ্টেম্বরে ইগর স্কুল যাবার উপযুক্ত হয়ে গেল, কারণ সাত বছর হতে ওর আর চারদিনই বাকি ছিল, কিন্তু লোলা চাইছিল না যে স্কুলে গিয়ে ও মজদুরদের ছেলেদের পাল্লায় পড়ে বয়ে যাক। শিশু-উদ্যানেও অধিকাংশ মজদুরদের ছেলেমেয়েরাই ছিল। ওখানে বুদ্ধিবাদের কি প্রয়োজন? লোলা বলছিল, 'একটার সময় ইস্কুল থেকে ছুটি হয়ে যাবে, আমি বাড়ি থাকব না, তারপর গোটা পাড়ার গুণ্ডা ছেলেদের মধ্যে পড়ে ও গুণ্ডা হয়ে যাবে।' তাই সাত বছর থেকে চারদিন কম হওয়ার অজুহাতে ওকে আরো একবছর স্কুলে পাঠালো না।

১৭ আগস্টে আমরা 'ঘেরাও লেনিনগ্রাদের বীরত্ব' নামের সংগ্রহালয় দেখতে গেলাম। এই নতুন সংগ্রহালয় রিনেচনা রাস্তায় একটা বড় বাড়িতে ছিল। এই পাড়াটা আগে রুশ ধনীদের ছিল। এই সংগ্রহালয়ে ১৯৪১-১৯৪৪ অব্দি ঘেরাও-এর প্রদর্শনী ছিল। যুদ্ধের আগে সোভিয়েতের সমস্ত শিল্প-উৎপাদনের ১০·৫ শতাংশ লেনিনগ্রাদে উৎপন্ন হতো, এইজন্য রাজধানী না থাকলেও লেনিনগ্রাদের গুরুত্ব বোঝা যাবে। এই পাড়াতেই পুশ্‌কিন, চেকোভস্‌কীর মতো শিল্পীরা ছিলেন। ওখানে রাখা জিনিসের মধ্যে এক জায়গায় একটি ছোট মেয়ের পেন্সিলে লেখা ডায়েরির কিছু পাতা রাখা ছিল। একদিনের পাতায় সে লিখেছিল—বাবা মরে গেছে,··· মা··· তারপর পাতা খালি। যে লিখেছিল সে এখন মৃত।

১৮ আগস্টে কয়েকদিনের রোদের পর সকালে অল্প বৃষ্টি হলো। ছারপোকা আর মাছির জ্বালায় আমি আগে থেকেই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, এখন মশাও (কমারোফ) উঠে পড়ে লাগল। আমাদের পাড়া শহরের এক প্রান্তে থাকায় ওর দিকে ব্যবস্থাপকদের নজর যায় সবার পরে। তাই লড়াই-এর দিনে জন্ম নেওয়া ছারপোকা আর মাছি এখনও এখান থেকে হটানো হয়নি। আমি চাইছিলাম যদি কোথাও ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি বাড়ি পাওয়া যায় তো ভালো, কিন্তু বাড়ির প্রাচুর্য ছিল না। প্রফেসর বলে আমার চার-পাঁচটা ঘর পাবার কথা, কিন্তু যদি দুটো ঘরও পাওয়া যায় তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট। ইউনিভার্সিটির রেক্টর (চ্যান্সলর) বাড়ির ব্যবস্থাপককে বিশেষভাবে চিঠি লিখলেন কিন্তু বাড়ির সমস্যা

তো তখনই সমাধান হবে যখন বাড়ি বানানোর যোজনা সম্পূর্ণ হবে।

ওই দিন ৬ রুবল কিলো শসা বিনা রেশন কার্ডে পাওয়া যাচ্ছিল। লোলা দশ কিলো শসা কিনে আনল। বলল স্যালাড বানাবে, আচার বানাবে। শসার আচারের রাশিয়ায় খুব চল। জলের মধ্যে শসাকে নুন দিয়ে রাখে, পনেরো-বিশ দিন পরে ওর মধ্যে একটু টক টক ভাব আসে—আচার তৈরি হয়ে গেল।

২০ আগস্টে আমার একটা দাঁত ব্যথা করতে লাগল। ২১ তারিখে এই ব্যথা বাড়তে লাগল। সোভিয়েত-শাসন যা বড় বড় কাজ করেছে, তার মধ্যে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ব্যবস্থাও একটা। আমারই উদাহরণ নিন। আমি আমার পাড়ার চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা করতে পারতাম। ডাক্তারদের কিছুই দিতে হতো না। হ্যাঁ, যদি অসুস্থ হয়েও হাসপাতাল যেতে না চাইত তাহলে ওষুধের দাম দিতে হতো। তির্যকীতে ইউনিভার্সিটির স্যানিটোরিয়াম ছিল, ওখানেও বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। এই দুটো হাসপাতাল ছাড়াও ইউনিভার্সিটির ভেতরেও একটি বড় চিকিৎসালয় ছিল যাতে কয়েক ডজন ডাক্তার কাজ করতেন। আমি দাঁতের ব্যথায় অস্থির হয়ে ইউনিভার্সিটির ডাক্তারের কাছে গেলাম। একজন মহিলা ডাক্তার ছিলেন। উনি দেখে বললেন যে দাঁতে গর্ত হয়ে গেছে, স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেছে। দাঁতকে উনি ঘষে দিলেন আর ঘা পরিষ্কার করে দিলেন। বিজলীতে চলা দাঁত সম্বন্ধীয় সব রকমের আধুনিক যন্ত্র ওখানে মজুত ছিল। আমার এত ব্যথা করছিল যে মনে হচ্ছিল দাঁতটা যদি তুলে দেওয়া হয় তো ভালো হয়। মহিলা ডাক্তার বললেন, 'না, আপনার দাঁত খুব ভালো অবস্থায় আছে। বানানো দাঁত অত ভালো হবে না আর একটা দাঁত তুলে ফেললে অন্য দাঁতগুলোর জোর কমে যাবে।' তারপর বললেন, 'আমি পোরসিলিন ভরে ঠিক করে দেব, কিন্তু তার আগে ভেতরের ঘা শুকিয়ে যাওয়া দরকার।' উনি দাঁতকে ভালো করে পরিষ্কার করে অস্থায়ী পদ্ধতিতে পোরসিলিন ভরে দিলেন।

২২ আগস্ট সারা দিন দাঁত ভালো থাকল, কিন্তু রাত্রে ফের ব্যথা বাড়তে লাগল। আমি একদম ঘুমোতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল যে যদি হনুমানবাহুকের বই হতো, তাহলেও আমি তুলসীদাসের শব্দ থেকে 'বাহুপীড়'-এর জায়গায় 'দাঁতপীড়' বদলে দিয়ে বজরঙ্গবলীর দোহাই দিতাম। জানতে পারলাম যে দাঁতের ভেতর এখনও পুঁজ আছে।

২৩ আগস্টে ফের বারোটার সময় ডাক্তারের কাছে গেলাম। সারা রাস্তায় মর্মান্তিক ব্যথা হচ্ছিল, দাঁতের গর্ত খুলতেই সেটা কিছু কমল। ডাক্তার ভেতরটা পরিষ্কার করে কিছু ওষুধ ভরে দিলেন। আমি গর্তের মুখ বন্ধ করতে বারণ করলাম, কারণ তাতে ব্যথা আরো বেড়ে যাচ্ছিল। ওই দিন সন্ধেবেলা জ্বরও এসে গেল। মাঝেমধ্যে এখন আমার ডাক্তারের সেবায় আসা জরুরি হয়ে পড়ল। এদিকে পেটেরও একটু গণ্ডগোল হয়েছিল, অন্য ডাক্তারের কাছে পেটের অসুখের ব্যাপারে দেখালাম। রক্তের চাপ নর্মাল মনে হলো।

পয়লা সেপ্টেম্বরে ইউনিভার্সিটি খুলল। আমি আগে ডাক্তারকে দাঁত দেখালাম। উনি তা অস্থায়ীভাবে ভরার আগে রোন্তেগিন (এক্স-রে) ফটো আর পরীক্ষা করতে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইন্দুস (ভারতীয়) জেনে সবার কৌতূহল বেড়ে যেত। এক্সরে বিশেষজ্ঞ দাঁতের ছবি তুললেন এবং তা ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন বলে জানালেন।

জাপান বিজয়—৩ সেপ্টেম্বর (সোমবার) জাপান জয়ের উপলক্ষে ছুটি হলো। ২ সেপ্টেম্বর টোকিয়োর বন্দরে অবস্থিত আমেরিকান নৌসৈনিক জাহাজ মিসৌরীর ওপর মেকার্থরের সামনে জাপানী মিকাডোর প্রতিনিধির বিদেশ-মন্ত্রী আর সেনাপতি নিজের হার স্বীকার করে হস্তাক্ষর করেছে। টোকিও রেডিও আমেরিকার হাতে চলে গেছে। আমি ৩ সেপ্টেম্বরে আমার ডায়েরিতে লিখলাম—'এই সময় দুনিয়ায় আমেরিকার পাল্লা ভারি। শুধু সম্পদশালী বলে নয়, সৈন্য-বিজ্ঞানের শক্তির কারণেও—আণবিক বোমার আবিষ্কার আমেরিকা করেছে। আমেরিকা পুঁজিবাদী জগতের প্রধান নেতা। সে জার্মানির মতো জাতি-সিদ্ধান্তকে সামনে আনবে না কিন্তু পুঁজিবাদী গোলামিকে সমস্ত পৃথিবীর মাথায় চাপানোর জন্য সে এমনও চেষ্টা করবে যেরকম জার্মানি বংশগত সামন্ত শাসন চাপানোর জন্য করেছে··· কথায় কাজ না হলে সৈনিকশক্তি প্রয়োগও করবে। আমেরিকা দুনিয়ার সব প্রতিগামী স্বার্থের সমর্থন পুঁজিবাদী দৃষ্টি দিয়ে করবে। গ্রিসে করছে। বুলগেরিয়ায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয় সন্দেহে সে পার্লামেন্ট নির্বাচন স্থগিত রেখেছে। হল্যান্ড আর বেলজিয়ামে ওর জন্য নিষ্কণ্টক ক্ষেত্র। ফ্রান্স আর ইটালির জনতার রাস্তায় আমেরিকা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে কি তৃতীয় যুদ্ধ আনবিক বোমা আর বোমার পক্ষপাতীদের হবে?

৫ সেপ্টেম্বরে ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরবার পথে আমি শিশু-উদ্যানে গেলাম। জন্মাবার পর তিন বছরের জন্যে এই য়সলী (শিশু-নিকেতন) বানানো হয়েছিল, চার থেকে সাত বছরের জন্যে অচাক (শিশু-উদ্যান) আছে। ঘরগুলোতে বাচ্চাদের শোবার জন্যে লাইন করে খাট পাতা ছিল, বিছানা পরিষ্কারভাবে পাতা ছিল। তিন বছর থেকে সাত বছরের বাচ্চাই ছিল, কিন্তু ওদের পায়খানা পরিষ্কার ছিল। হাত-মুখ ধোবার জন্য ছোট ছোট কল লাগানো ছিল, আর কুকুর-বেড়াল ইত্যাদি পশুদের ছবিওলা তোয়ালে আলাদা আলাদা খুঁটিতে ঝোলানো ছিল। জিনিসপত্র রাখার ছোট ছোট আলমারিও ওদের দেওয়া হয়েছিল, যার ওপরে জন্তু জানোয়ারের ছবি ছিল। গল্প শোনার, খেলার, খেলনা রাখার ঘর আলাদা আলাদা ছিল। একটা হলও ছিল। বাড়ির বাইরে খেলার এবং চিত্তবিনোদনের উদ্যান ছিল। আমি আসার আগে ইগরের জন্য সত্তর রুবল মাসিক দিতে হতো, কিন্তু আমি আসার পর ১৪০ হয়ে গেল। সব ছেলেদের খাওয়া-থাকা একই রকম, কিন্তু ফিজ্-এর বেলায় এটা মনে রাখা হতো যে কে কতটা সইতে পারবে। কম বেতনওলা মাতা-পিতাকে কম পয়সা দিতে হতো, অনেকগুলো ছেলে হলে ফিজ্ মাফ করা হতো। ছেলেরা ন'টার সময় শিশু-উদ্যান যেত আর পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরত। এর মধ্যেকার সময়ের সমস্ত খাওয়ার ব্যবস্থা শিশু-উদ্যানের তরফ থেকে হতো। শিশু-উদ্যানে ছেলেমেয়ে দুজনই এক সঙ্গে থাকত। বয়স অনুযায়ী ওদের চারটে ভাগ ছিল। এখানে বই পড়ানো হতো না, নটি অক্ষর শেখানো হতো। ওদের স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দেওয়া হতো। ওরা নিজেরাই নিজেদের বিছানা ঠিক করে পাতত। যদিও রান্নাঘরে সাহায্য করা ছেলেদের কাজ নয়, কিন্তু শিশু-উদ্যানের বোন (চাচী)-দের সঙ্গে ওদের এত ভাব-ভালোবাসা হয়ে যেত যে ওরা না ডাকলেও সাহায্য করতে চলে যেত। শিশু-উদ্যানের চাচীদের সঙ্গে ছেলেদের কতো মধুর সম্বন্ধ হয়ে যেত সেটা এর থেকে

জানা যাবে যে ইগর যখন শিশু-উদ্যান থেকে বেরিয়ে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেল, তখনও ও নিজের চাচীদের সঙ্গে দেখা করতে যেত এবং ওখানে খাবার আর চায়ের সময় হলে, খেয়েদেয়েই আসত। আমরা খুব রেগে বলতাম, 'যদি খাবার খেয়ে আসো, তাহলে আর কখনও যেতে দেব না।' কিন্তু সেটা কি আর হচ্ছিল। এসে বলত, 'কী করি, চাচী তানিয়া কিছুতেই মানল না।'

বাচ্চাদের শিক্ষা আর সেবা-শুশ্রূষার ওপর সোভিয়েত সরকারের যে সবচেয়ে বেশি নজর ছিল, এটা বলার দরকার হয় না। শিশু-উদ্যানের লক্ষ কি, এই ব্যাপারে এক সোভিয়েত শিক্ষাবিদের নীচে লেখা বাক্য পঠনীয়—'শিশু-উদ্যান তিন থেকে সাত বছর অব্দি চার শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য। এখানে বাচ্চারা ১০-১২ ঘণ্টা থাকে। কিছু কিছু শিশু-উদ্যানে রোববার বাদে বাকি হপ্তা বাচ্চারা থাকতে পারে। শিশু-উদ্যান স্থাপন করার উদ্দেশ্য হলো বাচ্চাদের ভালোভাবে লালন-পালন আর মাকে কাজ করতে দেবার ছুটি। বালকের শারীরিক আর মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য এখানে খেলাটাই মুখ্য উপায় হিসেবে রাখা হয়েছে। বালক নিজের জীবনের চারদিকের পরিস্থিতিগুলোয় সক্রিয় অংশ নেয় এবং এইভাবে নিজের শারীরিক বিকাশ বাড়ায়। বাচ্চাদের যে সব খেলা খেলানো হয়, যা সহজ-সরল মৌখিক পাঠ করানো হয়, সেটা এক নিশ্চিত ব্যবস্থার অনুসারে হয়, কিন্তু তাতে শুষ্কতার চিহ্ন নেই, যা ফ্রেবেল আর মন্টেসরি প্রণালীতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত শিক্ষাপ্রণালী ছেলেদের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মনোবৈজ্ঞানিক বিশেষত্বগুলো মনে রেখে তৈরি করা। ওতে এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যে খেলায় বাচ্চাদের আকর্ষণ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়, আর ওরা সব জিনিসকে সাকার রূপে বোঝার চেষ্টা করে।... খেলা বাছার ব্যাপারে ছেলেদের স্বাধীনতা বজায় রাখা হয়। সোভিয়েত শিশু-উদ্যানে শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা বাচ্চাদের নিম্নলিখিত সত্তাগুলো জাগানো হয়—স্বাধীনতা-প্রেম, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, পরিশ্রমশীলতা, জিনিসপত্রের সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো করা, বড়দের প্রতি সম্মান দেখানো আর মার্জিত ব্যবহার। এই সব হলো শিশু-উদ্যানের কাজের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক ২৫ জন ছেলে পিছু, বা তার কম হলেও, একটি করে শিক্ষিকা থাকে। ওরা ছেলেদের চাচী, যার ভালোবাসা ছেলেরা শিশু-উদ্যান ছাড়লেও ভুলতে পারে না। সোভিয়েত শিক্ষা-প্রণালীই শুধু নয়, অন্য এই ধরনের আয়োজনেও কেবল প্রোপাগাণ্ডার দিকেই মন দেওয়া হতো না। তাই যদি করতে হতো তাহলে দশ-কুড়িটি শিশু-উদ্যান এবং শিশু-নিকেতনই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এইরকম লোকদেখানিতে মায়েদের কাজের জন্য সময় পাওয়া যেত না। যুদ্ধ শেষ হয়ে তখনও এক মাস হয়নি যখন ১ জুন ১৯৪২-এ ১৮ হাজার শিশু-উদ্যান ছিল, যার মধ্যে ২০ লাখ রুশ প্রজাতন্ত্রের বাচ্চারা পালন-পোষণের সুবিধে পাচ্ছিল। ১৯৪৫-এ রুশ সংঘ প্রজাতন্ত্রের ১৪,৩৩৫ শিশু-উদ্যানের মধ্যে ৭২,৩০,০০০ বাচ্চা থাকত। এ ছাড়াও গ্রীষ্মাবাসে ২০ লাখ বাচ্চা আলাদা রাখা হয়েছিল।

আমার নজর মধ্য-এশিয়ার দিকে বিশেষভাবে ছিল। আমি ভাবতাম ভারতের অবস্থা সেই রকম, যে রকমটি ছিল মধ্য-এশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের আগে। তাই সেখানে

সাম্যবাদ কতটা সফলতা পেয়েছিল, কত-কি পরিবর্তন এনেছিল, তা সতর্কতার সঙ্গে দেখলে খুব লাভদায়ক হবে। আমি এবার মধ্য-এশিয়ায় যেতে পারিনি, তাহলেও বই থেকে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা যায় করেছিলাম আর মধ্য-এশিয়ার ছাত্রদের এবং অন্যাদের কাছ থেকেও খবরা-খবর নিয়েছিলাম। আমি সামান্য অধ্যয়ন করেই বুঝলাম যে উপন্যাসকার সদরুদ্দীন এনীর গ্রন্থ, আমার কাজের বড় সহায়ক হবে। এনীর পুত্র কামাল আমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, যদিও আমাদের বিভাগের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না। এনীর 'দাখুন্দা', 'গুলামন', 'অদীনা', 'যতীম' আর 'সুদখোরের মৃত্যু'-এর হিন্দি অনুবাদ আমি করে ফেলেছিলাম। ওঁর দুটো বড় উপন্যাসের অনুবাদ তো ওখানে উর্দুতে করে ফেলেছিলাম। এনী তাঁর ভাষার প্রথম উপন্যাসকার। এনীর আগে তাজিক ভাষায় কোনো বই ছিল না। তাজিক ভাষা ফারসীরই উপভাষা। কিন্তু বিপ্লব তাকে শিক্ষার মাধ্যম বানিয়ে সাহিত্যিক-ভাষায় পরিণত করেছিল। যে কোনো ভাষায় প্রথমেই মৌলিক লেখার পথে যা যা অসুবিধে হয়, আর সেগুলোর জন্যে যা যা দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে, তা সবই এনীতে পাওয়া যায়। ওঁর দোষ হলো বিশৃংখলতা, পরিকল্পনাহীনতা, পাত্রদের অযোগ্য কথোপকথন। কিন্তু গুণ অনেকগুলো। এনী দৃশ্যের চিত্রণ খুবই সুন্দর আর স্বাভাবিক ঢঙে করতে জানেন। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। শ্রেণী প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারা লেখক তো এমনিতেই বিরল। এনী ছাড়াও গনি অব্দুলা, জালাল ইকরামী, লাহুতির মতো বহু অন্য তাজিক লেখকের বইও আমি পড়তাম। আমার আফশোশ এই ব্যাপারেই ছিল যে লেনিনগ্রাদের গ্রন্থাগারে সব বই পাওয়া যেত না। আমি সেগুলোর জন্য ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে, প্রাচ্য প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার এমনি অনেক গ্রন্থাগারের ধুলো ঘেঁটেছিলাম।

২১ সেপ্টেম্বরে লোলার বোনপো সের্গেই এল। লেনিনগ্রাদের ঘেরাও-এর দিনগুলোয় সের্গেইর মা-বাবা দুজনেই অনাহারে মারা গেছে। ও যে বাড়িতে থাকত, তার ওপরে বোমা বর্ষণের ফলে ওর চারটে ছাতেরই ভাঙন নীচে অব্দি চলে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে উক্ত বাড়িটা ভগ্নদশায় দাঁড়িয়েছিল। সের্গেই, যাকে রুশ প্রিয়ালাপ অনুসারে সির্য়োজা বানিয়ে দেওয়া হয়, ফৌজে রেডিও অপারেটরের কাজ করে। এখন সেনাবাহিনী ভেঙে ফেলা হচ্ছিল, তাই ও সেখান থেকে ছুটি পেয়ে গিয়েছিল। ও খুব উগ্র স্বভাবের যুবক। ওর না ছিল কাজের চিন্তা, না খাবার চিন্তা। টাকা হাতে এল তো দুদিন খেয়ে-খাইয়ে শেষ করে ফেলল। আবার কখনও মাসির বাড়ি, কখনও অন্য কোনো বন্ধুদের বাড়ি। কোনো কাজে লেগে থাকাও ওর পছন্দ নয়। এর আগের বছরও সাইবেরিয়ার এক রেললাইনে কাজ নিয়েছিল। কিন্তু শীত পড়তেই ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে লেনিনগ্রাদ চলে এল। লোকটা এমনিতে খুব ভালো ছিল। কোনো একটা কাজ হলেও বসে থাকতে চাইত না। আগের বছরও ও ফিনল্যান্ডের পুরনো জায়গায় একটা কাজ জুটিয়েছিল আর শীত শুরু হতে না হতেই ওখান থেকেও চলে গিয়েছিল। সঙ্গে একটি কেরেলিয়ন তরুণীকে ও নিয়ে এসেছিল। ও বেচারি যদি নিজের গ্রামে থাকত, তাহলে ওখানে খেত-খামারে কাজ করত, এখানে লেনিনগ্রাদ নগরে ওর করার মতো কোনো কাজ ছিল

না। সির্য়োজা আবার সোভিয়েতের অন্য কোনো প্রান্তে একলাই যাবার ব্যবস্থা করছিল। ও একধরনের সোভিয়েত-ভবঘুরে। সির্য়োজার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে এই প্রোপাগান্ডাটা কতটা মিথ্যে যে রাশিয়া প্রত্যেক মানুষের থেকে জবরদস্তি কাজ আদায় করে। সরকার কোনো জোর খাটায় না। নিজের ইচ্ছানুসারে মানুষ এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজ নিতে পারে। হ্যাঁ, দু-এক মাস আগে অবশ্য কাজ ছাড়ার খবর দিতে হয়, যাতে ব্যবস্থাপকরা অন্য আরেকজনকে নিযুক্ত করতে পারে। সির্য়োজার দৃষ্টান্ত থেকে এটাও জানা যাবে যে রাশিয়ায় এখন পশ্চিম ইউরোপের মতো কেবল বাবার খাই-খরচই দেয়না, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরও একসঙ্গে রাখতে চায় এবং পরস্পরকে সাহায্য করা কর্তব্য বলে মনে করে।

২২ সেপ্টেম্বর এখন একটু একটু শীতের ঠাণ্ডা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। শীতের টুপি ছাড়া লোককে এখন শীতের ওভারকোট আর পোশাক পরে রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল। শীতের টুপি ওখানে অনেক জায়গাতেই চামড়ার হয়। রুশ নাট্যমঞ্চ তাদের ব্যালের (মূকনাট্য) জন্য বিশ্ববিখ্যাত। আমি অপেরা ভালোবাসি না, কিন্তু নাটক খুব পছন্দ করি, আর সব চাইতে বেশি ভালো লাগে ব্যালে।

২৬ সেপ্টেম্বরে কিরোফ (পুরনো মরিন্সকী) থিয়েটারে প্রসিদ্ধ নাট্যকার চেকোস্কীর ব্যালে 'সুপ্তা সুন্দরী' (স্পেশ্চয়া ক্রসাবিত্‌সা) দেখতে গেলাম। নাচ সুন্দর ও দৃশ্য মনোহর ছিল। নাট্যশালার পাঁচটি তলা আর সামনের আসন ঠাসাঠাসি করে ভরা ছিল। প্রায় একশো অভিনেতা-অভিনেত্রী এই ব্যালেতে অংশ নিচ্ছিল। বাচ্চাদের গল্পের (পেরোকী) ভিত্তিতে চেকোস্কী এই ব্যালে আগের শতাব্দীতে রচনা করেছিল। এতে দু'শতাব্দী আগের সমাজকে নেওয়া হয়েছিল, তাই বেশভূষা আর দৃশ্যে সেদিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। ভালুক বেড়াল আর বাঁদরের নাচও ছিল। সোভিয়েত নাট্যমঞ্চ খুব পুরনো, তার দর্শকদের পরম্পরাও সেইরকমই পুরনো। জারের আমলে মহিলারা তাদের সবচাইতে ভালো অলংকার, বস্ত্র আর সাজ-সজ্জা করে আসত। আজও নাটক দেখার সময় সোভিয়েত নারী নিজেকে অত্যন্ত সুন্দর রূপে সাজিয়ে ওখানে যায়। বিশ্রামের সময় বড় হলে যখন হাতে হাত মিলিয়ে মন্দগতিতে একে অপরের পেছনে পায়চারি করে, তখন সেখানে একেবারে হাল ফ্যাশন আর সর্বশ্রেষ্ঠ খোঁপার সৌন্দর্যরাশি সবাই দেখতে পেতে পারে। ওখানে পুরুষ দর্শকদের চেয়ে মহিলা দর্শকদের সংখ্যা বেশি। পুরুষ দর্শকদের মধ্যেও বেশির ভাগ সৈনিক। ওরা সবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে এসেছিল, তাই সৈনিক সাজসজ্জার আধিক্য দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। অন্য দেশে নিজেদের সৈনিক-বেশ বা তকমা দেখানোর অত শখ নেই। তকমা আর পদকের জায়গায় কেবল সেগুলোর ফিতেগুলো কোটের ওপর ঝুলিয়ে নেওয়া যথেষ্ট মনে করে, কিন্তু সোভিয়েত সৈনিক পনের-কুড়িটা পদকও বুকে ঝোলানো দরকার মনে করে। এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। লোলা ঘেরাও-এর সময় লেনিনগ্রাদে থেকে কাজকর্ম করতে লাগল। ও তার গ্রন্থাগার বোমার হাত থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে কাজ করেছিল, সেই কারণে লোলাও দুটো পদক পেয়েছিল, কিন্তু আমি ওকে ওগুলো ঝোলাতে দেখিনি।

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শীত খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। বাড়ির ভেতরেও শীত ছিল। বাড়ি গরম হবার সম্ভাবনাও কম মনে হচ্ছিল। যুদ্ধের পর নতুন ব্যবস্থা করতে সময় লাগেই, তারপর বাড়ি যদি এক-আধ মাস গরম না হয় তাহলে জিনিসের উৎপাদনে তো তাতে কম হতে পারে না। মানুষ একটু অসুবিধে অনুভব করবে। কিন্তু সেসব তো যুদ্ধকাল থেকেই ওদের হয়ে আসছে, যখন পুরো শীতকালটায় বাড়ি গরম করা সম্ভব হতো না। ঘরের কার্যালয় থেকে জানা গেল যে এ বছর হয়তো নভেম্বরে বাড়ি গরম করা হবে, কেননা কয়লার খরচের ব্যাপারে আগে কারখানাগুলো দেখতে হতো। ইউনিভার্সিটিতেও কাঠ তো যথেষ্ট রাখা ছিল, কিন্তু বাড়ি গরম করতে চাকর পাওয়া যাচ্ছিল না। মজুরদের প্রচুর চাহিদা ছিল, আবার ওরা সেখানেই যেতে চাইত যেখানে মাইনে-পত্র ভালো। ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ বাড়ি একশো-দেড়শো বছরের পুরনো। তখন কেন্দ্রীয় তাপ আবিষ্কৃত হয়নি এবং কাঠ জ্বালিয়ে বাড়ি গরম করা হতো। কেন্দ্রীয় তাপে খুব সুবিধে হয়। শত শত কামরার জন্য এক জায়গায় জল গরম হয় এবং সেই জল চ্যাপ্টা ও চওড়া যন্ত্রাংশের মাধ্যমে প্রত্যেক কামরায় নিয়ে গিয়ে কামরার হাওয়া গরম করে দেওয়া হয়। ওতে না এত বেশি লোকেরও দরকার হয় আর না কাঠ কেটে ওপরে পৌঁছনোর দরকার হয়। আমাদের পড়াবার কামরা বিষয় বা ক্লাস অনুসারে ভাগ করা ছিল না। এক ডজনেরও বেশি কামরা তো আমি দেখতামই না যদি অধ্যাপক বা ক্লাশের কথা মনে রেখে কামরা ভাগ করা হতো, তাহলে বাড়ি গরম রাখতে সুবিধে হতো। ছাত্রদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশি। সোভিয়েত নর-নারী শারীরিক শ্রমকে খারাপ চোখে দেখে না। ওরা নীচে জমা করে রাখা কাঠ স্তূপাকার করে উঠিয়ে আনে আর ঘর গরম করার চেষ্টা করে। কয়েক দিন পরে দেখি, আঙ্গিনায় একটা কাঠ চেরাই-এর ইলেকট্রিক মেশিন লাগানো হয়েছে। তাতে কাঠ চেরা এবং টুকরো করার সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। তাও ছাত্র যখন একটা কামরা গরম করে অন্য কামরায় চলে যায়, তখন সে জায়গাটা আবার গরম করার দরকার পড়ত। ২৫০ রুবলে কাজ করার লোক কোথায় পাওয়া যেত? আমাদের বিভাগে একটি কি দুটি কাজের মহিলা পাওয়া গিয়েছিল, তারা কোনো কোনো কামরা গরম রাখত। সোভিয়েত দেশে মানুষের সাম্যের উদাহরণ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোক কাঠ জ্বালানোর কাজ করছে। সে মাসে দুশো আড়াইশো রুবল পায়। ওই জায়গায় একজন অকাদেমিক প্রফেসর পড়াতে আসেন। অকাদেমিক হবার জন্য মাসিক ৬ হাজার রুবল পেন্‌সন সাম্মানিক হিসেবে পান, প্রোফেসর হবার জন্য তার ওপরে আরো সাড়ে চার হাজার মাসিক বেতন পান। অন্যান্য কাজের রোজগার মিলিয়ে তিনি মাসে চোদ্দ-পনেরো হাজারের বেশি রুবল পান। কিন্তু কাঠ জ্বালানো স্ত্রী-লোকের সামনে গেলে অকাদেমিক প্রোফেসর নিজের টুপি নামিয়ে ওকে অভিবাদন জানান। যদি ওর হাতে কালি-ঝুলি না মাখানো থাকে তাহলে ওর হাতে হাত মেলান। যদি তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন, তাহলে একসঙ্গে টেবিলে বসে চা খান। এইভাবে স্ত্রীলোকটি তার শিক্ষা আর যোগ্যতার অভাবকেই তার কম বেতনের কারণ বলে ধরে নেয়, কিন্তু মানুষের

সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে, ও সেখানে নিজেকে অকাদেমিকের সমান ভাবে। শুধু তাই নয়, যদি ওই স্ত্রীলোকটির ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে তাদের ইউনিভার্সিটি অব্দি পড়াশুনো করতে কোনো বাধা নেই। কেননা পড়াশুনো মায়ের পকেটের ক্ষমতাব ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে ছেলেমেয়ের ইচ্ছের ওপর। যেখানে ৯০ শতাংশ ছাত্র সরকারি ছাত্রবৃত্তি পায়, সেখানে দারিদ্রের কারণে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবার কারো সম্ভাবনা নেই।

আমি সর্বদা এগারোটার সময় আমার বাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি যেতাম, আর তিনটের সময়ই ওখান থেকে চলে আসার চেষ্টা করতাম, যদি পড়াশুনোর জন্য থেকে যাওয়া জরুরি না হতো। সকাল নটায় আর বিকেল পাঁচটায় ট্রামে খুব ভিড় হতো। ওই সময় তো ওঠা মুশকিল হতো। আমি পরে একটা বুদ্ধি খাটালাম। আমি দেখলাম যে নগরের কেন্দ্রীয় স্থানের দিকের ট্রাম যে সময় ভর্তি থাকে, ওই একই সময় অন্য দিক দিয়ে যাবার ট্রাম বেশির ভাগই খালি থাকতো। চার-পাঁচ পয়সা (পনেরো কোপেক) আর কয়েক মিনিটের ব্যাপার। আমি খালি ট্রামে উল্টো দিকে চলে যেতাম, পরে কেন্দ্রের দিকে যাওয়া অনেকটা খালি ট্রামে উঠে পড়তাম। কেন্দ্রে পৌঁছনোর পর ভিড় তো হতোই, কিন্তু বসার জায়গা আগে থেকেই পেয়ে যেতাম। বস্তুত যুদ্ধের কারণে লেনিনগ্রাদের জন্য ট্রামের যতগুলো কামরা দরকার ততগুলো ছিল না, এই জন্য এত ভিড় হতো।

১১ অক্টোবর শীত এখন নিজের যৌবন কালের দিকে এগোচ্ছিল। রাতে জল জমে যেতে আরম্ভ করেছিল। বাইরে গেলে আমার কান ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এখন বহু গাছ ন্যাড়া হয়ে গিয়েছিল আর কতগুলোর পাতা হলদে হয়ে গিয়েছিল। দেবদারুর ঝাড়কে কখনও পাতাঝরার সম্মুখীন হতে হয়নি। সেরকমই আরো কিছু হিমজীবী গাছ ছিল, যাদের পাতা এখন সবুজই ছিল।

স্নানের ঘর—এখন অব্দি স্নান নিজের বাড়িতেই করতাম. কিন্তু এখন শীতের আগমনে গরম স্নানাগারের দরকার ছিল। লেনিনগ্রাদের পাড়ায়-পাড়ায় এরকম স্নানাগার আছে। ১২ অক্টোবর আমি সর্বপ্রথম সার্বজনিক স্নানাগারে গেলাম। ১ রুবল দিয়ে টিকিট কিনতে হলো। স্নানাগারের ভেতরে দুজন ব্যবস্থাপনা করার স্ত্রীলোক ছিল। যার টিকিট হয়ে গেছে, সে সেটা নিয়ে গিয়ে পরিচারিকাকে দিয়ে দিত, যে ওকে একটা ধাতুর টুকরো দিয়ে আলমারির তালা খুলে দিত। লোকেরা নিজেদের সব জামাকাপড় ওই আলমারিতে রেখে দিত। হ্যাঁ, সমস্ত জামাকাপড়ের একটা সুতোও ওর শরীরে থাকবে না। ওখানে সবাই পুরুষ, স্ত্রীলোক বলতে শুধু ওই দুই পরিচারিকা। লোকেরা নিঃসঙ্কোচে একেবারে উলঙ্গ হতো। আমার আফশোশ হচ্ছিল, যে কেন এখানে ফাঁসলাম। বাড়িতেই গরম জল বানিয়ে স্নান করে নিতাম। কিন্তু এখন তো এসে পড়েছি। দেখাদেখি কোট প্যান্ট-খুলেও ফেলেছি। সব খুলে ফেলা সত্ত্বেও জাঙ্গিয়া খোলার সাহস হয়নি। পরিচারিকারা বাবা আদমের খাস পুত্রদের মাঝে বেশ খোলাখুলিভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর আমি এদিকে লজ্জায় মাটিতে নুয়ে পড়ছিলাম। শেষ অব্দি জাঙ্গিয়া পরেই আমি আলমারিওলা ঘর থেকে নাইবার ঘরে গেলাম। ওখানে অনেকগুলো লাইন করে বেঞ্চ

রাখা ছিল, ঠাণ্ডা আর গরম জলের কল জায়গায় জায়গায় লাগানো ছিল। অনেক লোহার গোল বাসন (এক বালতি জল ভরার মত) রাখা ছিল। লোকেরা দুটো বাসনে নিজের ইচ্ছানুসারে গরম জল ভরে বেঞ্চের ওপর বসে নাইছিল। অনেকে শরীর রগড়াতে একে অপরজনকে সাহায্য করছিল। আমি নিজের নৌকো একলাই চালাচ্ছিলাম। যখন আমি আধঘণ্টা ধরে স্নান করছি, পা রগড়ে রগড়ে ধুচ্ছি, তখন আশেপাশের অন্যান্য আদমপুত্রদের দেখলাম এবং আমার নিজের বোকামিতে অবাক হলাম। আমি ভাবলাম, হয়তো এরা ভাবছে, 'এই লোকটার কোনো অসুখ আছে। তাই ও জাঙ্গিয়া পরে আছে।' আমি ওই মুহূর্তে কান মললাম আর ঠিক করলাম যে এরপর থেকে আর এরকম বোকামি করব না। এখন তো প্রত্যেক হপ্তায় নাইতে আসতে হতো। দেখলাম শনিবার খুব ভিড় থাকে। বোববারে তার থেকেও কম আর সব চাইতে কম ভিড় থাকে সোমবারে, তাই আমার নাইবার দিন সোমবার ঠিক করে নিলাম। স্নানাগারে বর্ষা-স্নানের (ডুস) ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তার কলটা খারাপ ছিল। আমার পঁচিশ মাস থাকার পরও তা ঠিক হয়নি। হয়তো নতুন স্নানাগার বানানো হচ্ছিল, যার জন্য মেরামত করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হচ্ছিল না। স্নানগার থেকে স্নান করে লোকেরা ওই রকমই জল চুঁইতে চুঁইতে আলমারির কাছে আসত আর তোয়ালে দিয়ে নিজের গা মুছতো। যদি কেউ চায়, তো ওইটুকু সময়ে নিজের কাপড়-চোপড় পরিচারিকাদের দিয়ে ইস্ত্রিও করাতে পারত। দু'এক রুবল দিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যেত। বিনা রেশনে নিলে আমাদের এখানের চার-পাঁচ আনার সাবানের পিসের দাম পঞ্চাশ-ষাট রুবল। পামোলিভের মতো সাবানের দাম একশো রুবল (পঁয়ষট্টি টাকা)। সাবানের বাক্সও এখানে ষাট রুবলের কম নয়। আমি নিজের পঁয়ষট্টি টাকার সাবান আর কুড়ি টাকার বাক্স ওখানেই ভুলে এলাম, সেটা কি আর ফিরে পাওয়া যায়? আমি খুশি হলাম যে বাক্স আর সাবান আমি ইরান এবং ভারত থেকে এনেছিলাম, সেখানে তার দাম এক টাকা, সোয়া এক টাকার বেশি ছিল না।

১৩ অক্টোবর আসল শীত ঋতুর আগমনের কথা আমি জানলাম, যখন সকাল আটটায় একটু একটু বরফ পড়তে দেখলাম। এখন আর বর্ষার ভয় ছিল না। পাতা খুব কম সবুজ ছিল। পরের দিন তো বরফ তুলোর বড় বড় গোলার মত পড়ছিল। এখনও সমস্ত মাটি তাতে ঢেকে যায়নি। দেবদারুর ওপরে-নীচে পড়ে থাকা বরফ কি সুন্দর লাগছে! দুপুরের পর সদ্য পড়া বরফ গলে গেল তারপর কাঁচা জায়গায় কাদা লাফাতে থাকল। লোকেরা বলল এখন তিন-চার সপ্তাহ কাদার দুনিয়ায় থাকতে হবে, তারপর জমি রুপোলি কার্পেটের মত হয়ে যাবে। এই সময়টা সত্যিই খুব ভালো বলে মনে হয় না। ওপরে নরম বরফ পড়ে রয়েছে, কিন্তু হতে পারে নীচে শুধু জল আর কাদা আছে। আমার তো এখন শীত করছিল। চামড়ার কানঢাকা টুপি না পরেই বাইরে বেরোচ্ছিলাম, কিন্তু লোকে এখন খালি হাতে কাজ করছিল আর বহু লোক তো সারা শীতটাই কান ঢাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝত না, ওদের এমনি সহ্যশক্তি হয়ে গিয়েছিল।

১ অক্টোবরের সকালে রোদ উঠল। যেখানে শাক-সবজির খেত হাওয়ায় খেলছিল, সেখানে এখন সাদা বরফের চাদর পড়ে। শীত খুব ছিল আর বাড়িও ঠাণ্ডা। কাপড়

শুকোবার জন্য বাইরে মেলেছিলাম। সন্ধে অব্দি কিছু শুকিয়ে গেল আর যেগুলো ভিজে ছিল সেগুলো বরফে পরিণত হলো। একদিনে দড়িতে কাপড় টাঙানো হয়েছিল। দড়িতে এত বরফ হয়ে গিয়েছিল যে আমরা হাত দিয়ে সেটা খুলতে পারিনি। নগ্ন হাতে খুলতে গেলেও পারা যাচ্ছিল না। শেষে খোলার বদলে দড়ি কেটে ফেলাই ভালো মনে হলো।

২১ অক্টোবরের বেলা দুটোর থেকে খুব জোরে বরফ পড়তে লাগল। তুলোর গোলা আকাশ থেকে নাচতে নাচতে মাটির দিকে এল। এখন সমস্ত খোলা জায়গা বরফে ঢেকে গেল। পাঁচ মাস অব্দি হয়তো এখন সে জায়গা ছাড়বে না। ছেলেরা বরফ নিয়ে খেলা করতে লাগল। কেউ কেউ পায়ে বাঁধা স্কি পরে দৌড়চ্ছিল, কেউ স্কেটিং খেলতে ব্যস্ত। ছোট ছোট ছেলেরা তাদের বিনা চাকার গাড়ি (সানি) নিয়ে কোনো বন্ধুকে খুঁজতে ব্যস্ত। সে কোনো উঁচু জায়গা দেখে সানিতে ছেলেকে বসিয়ে ছেড়ে দিত আর সানি গড়াতে গড়াতে নীচে চলে যেত।

২৪ অক্টোবর বাড়ির ভেতরেও তাপমাত্রা ৫ সেন্টিগ্রেড ছিল। ২৫ তারিখ সেটা ৭° হয়ে গেল—শূন্যতে এলে হিমাঙ্ক হয়। এখন অব্দি কয়েকদিন ধরেই তাপমাত্রা শূন্য বিন্দুর ওপর, তাই বরফ জমে বসেছিল। সাত ডিগ্রির ওপর তাপমাত্রা পৌঁছতেই সমস্ত বরফ গলে গেল, যেখানে সেখানে শুধু জল আর জলই দেখা যাচ্ছিল।

২৬ অক্টোবরের সকালে বরফের চাদর সর্বত্র পড়েছিল। কিন্তু শীত ততটা বেশি ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। বরফ যখন ভালো মত পড়ে, আর হাওয়া চলে না, তখন শীত সত্যিই কমে যায়।

২৭ অক্টোবরে আবার বরফ গলতে দেখা গেল। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে বরফ আর জলের লুকোচুরি খেলা হয়তো এক-আধ হপ্তা এইভাবেই চলবে।

আমার এই লুকোচুরি ভালো লাগছিল না। কারণ কাদা থেকে বাঁচা মুশকিল ছিল। এমনিতে তো বরফে ঢাকা পৃথিবী আর দেবদারুতে ভরা বন দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। সে সময়ও এসেই যাবে, সেই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু যখন খুব সাবধানতা সত্ত্বেও শীতে দু'তিনবার পিছলে গিয়ে জমিতে শায়িত হতে হয়েছিল, তখন ভালো লাগেনি। শুধু লোকে হাসতে পারে বলে নয়, হঠাৎ পড়ে গেলে একটু আঘাতও লাগে। ওই সময় বুঝলাম যে শীতের দেশের লোকেদের স্কেটিং জানা কত জরুরি।

৩০ অক্টোবর আবার আমি ব্যালে দেখলাম। সমস্ত লেনিনগ্রাদের লোকেদের টিকিট পাবার অসুবিধে হতে পারে, কিন্তু আমি রোজ টিকিট নিতে পারতাম। ইস্তুরিস্ত-এর কাজ বিদেশী অতিথিদের সবরকমের সাহায্য করা। আমি বিদেশী প্রফেসর, আর গত তিন-চার মাস ধরে অফিসে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাও আমি নাটক বেশি দেখতে যেতাম না। ওইদিন চেকোব্স্কী-র মূক নাট্য 'হংস সরোবর' (লেবেদনোয়ে ওজেরো) ছিল, চেকোব্স্কী আমার ওপর রেগে ছিল, যদিও ওর ওস্তাদি সঙ্গীত বোঝার আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু ব্যালে আমি খুব পছন্দ করতাম। সেই মরিন্স্কী থিয়েটারে আমার যাবার ছিল। নাটক সাড়ে সাতটা থেকে এগারোটা অব্দি হয়েছিল। দুটো টিকিটের জন্য আমাকে ছাপ্পান্ন রুবল (প্রায় ৩৬ টাকা) দিতে হলো। একে সস্তাই বলা চলে। থিয়েটারের একটা সিটও

খালি ছিল না। লোকেরা দু-সপ্তাহ আগে থেকেই বোধহয় টিকিট নেবার জন্য মারামারি করেছে। অভিনেত্রীদের মধ্যে গ· ন· কিরিল্লোবা রুশসংঘ-প্রজাতন্ত্রের গণশিল্পীর পদবী দ্বারা বিভূষিত, অন্য অভিনেত্রী ব· ক· ইভানোভাও ওই পদবীতে বিভূষিত। অভিনেতা অ· ন· সোল্যান্নিকোও নামকরা শিল্পী ছিলেন। রাজকুমার জিদফ্রিদকার পার্ট শিল্পী উখোফ করেছিল। প্রথম দৃশ্যে একটি বড় ভোজ দেখানো হয়েছিল। রাজকুমার ভোজের আয়োজন করেছিল, যাতে বহু নরনারী এক সঙ্গে হয়েছিল। ব্যালে হচ্ছে, যাতে কথাকে পরিপূর্ণরূপে পরিহার করা হয়। তাই নির্বাক সংকেত দ্বারা সমস্ত কাজ চলছিল। বলা যায়, যে-ভাষায় এখানে অভিনয় হচ্ছিল সেটা ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা। ব্যালের সাফল্যের একটাই প্রমাণ যে মানুষ কথার প্রয়োগ ছাড়াও সমস্ত কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে। ব্যালে তার নৃত্য-কৌশলের জন্যও প্রসিদ্ধ বলে মানা হয়। রাজকুমার জিদফ্রিদ তীর দ্বারা উড়ন্ত হাঁসকে মারল। ওই সময় সামনে সরোবরের দৃশ্য যেরকম ছিল, তা দেখে কেউ বলতে পারবে না যে সে নাটক দেখছে। সত্যি সত্যি সেখানে সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা এক বিশাল সরোবর ছিল, যাতে জলে ঢেউও উঠছিল, আর তার ক্ষীণ আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। ওই সরোবর দিয়ে হাঁস উড়ে যাচ্ছিল, যাকে রাজকুমার বাণ দিয়ে বিঁধেছিল। আগে ২৪ জন বলেরিনা (নর্তকী) এবং অতগুলোই নর্তক খুব সুন্দর নাচ করল। দ্বিতীয় দৃশ্যে সরোবর তরঙ্গিত ছিল, যার ওপর হাঁস লাইনে লাইনে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটছিল। রাজকুমারের পার্টকরা উলোফ নিজের নৃত্যে লোকদের মুগ্ধ করে দিল। তৃতীয় দৃশ্যে রাজার দরবার। রাজা-রানী সিংহাসনে আসীন। এটা রাজকুমারের জন্মোৎসবের উপলক্ষে হচ্ছিল। রাজকুমার ওখানেই এক নটীর প্রতি মুগ্ধ হলো। তারপর নিজের প্রিয়তমাকে খুঁজে বার করতে রাজকুমারকে কত দেশে দেশে ঘুরতে হলো। সে সব দেশের বিশেষত্ব সেখানকার নাচের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল। এতে স্পেনের নাচও ছিল, পোল্যান্ডেরও ছিল। চতুর্থ দৃশ্যে অনেকগুলো সুন্দর নাচ ছিল।

মারীন্সকী-থিয়েটারের দরোজার কাছেই ট্রামডিপো। নাট্যশালার ভেতর থেকে নরনারী যখন বেরোলো তখন, ট্রামে জায়গা পেতে অনেক সময় লেগে গেল। সুবিধে এই ছিল যে সব লোক একদিকে যাচ্ছিল না। সবাই নিজের নিজের নম্বরের ট্রামের খোঁজে ছিল। আমরা রাত বারোটার সময় ওই দিন বাড়ি পৌঁছলাম। চামড়ার ওভারকোট পরার জন্য এখন শীত অতটা করছিল না। বস্তুত, লেনিনগ্রাদের শীতে খুব মোটা উলের কোটও বড় একটা সহায়ক হয় না, যদি না সেটা চামড়া দিয়ে বানানো হয়।

বিপ্লব মহোৎসব—বলশেভিক বিপ্লবকে এখন রাশিয়ায় অক্টোবরের বিপ্লব বলে। পুরনো প্রামাণ্য অনুসারে বিপ্লব অক্টোবরে হয়েছিল, যদিও মহোৎসব এখন ৭ নভেম্বর পালন করা হয়। রাশিয়ায় এটা সব চাইতে বড় মহোৎসবের দিন (দিনা প্রাদ্নিক)। হপ্তাখানেক আগে থেকেই নগর আর গ্রামে প্রস্তুতি চলতে থাকে। ইউনিভার্সিটিতে ৪ নভেম্বরই দেখলে বোঝা যেত, যে মহোৎসব কাছাকাছি। ৭ নভেম্বরের দিন শোভাযাত্রার জন-সমুদ্র উপচে পড়ত। তাতে ছোট ছোট সংস্থাগুলোর কথা কে মনে রাখে? ওরা তাই নিজের

প্রোগ্রাম আগে থেকে আরম্ভ করে দেয়।

৫ নভেম্বরে আমাদের পাশের শিশু-উদ্যান তাদের মহোৎসব পালন করেছিল। যাদের যাদের বাচ্চা এই শিশু-উদ্যানে থাকত তাদের মা-বাবা নিমন্ত্রিত ছিল আর প্রায় সবাই সম্মিলিতও হয়েছিল। বাইরেও ছেলেদের কিছু প্রস্তুতি ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ কর্মকাণ্ড শিশু-উদ্যানের হলে সম্পন্ন হলো। আর জানাই আছে চার এবং সাত বছরের বাচ্চারা শিশু-উদ্যানে থাকে। মা-বাবা আজ ভালো ভালো কাপড় পরিয়ে তাদের ছেলেদের পাঠিয়েছিল। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে দু লাইনে মিছিল বার করল, শিশু-উদ্যানের সব ছেলেমেয়েরাই হলে ফিরল, পরে বাজনা সংযোগে কিছু গান গাওয়া হলো। গান গাওয়া হয়ে গেলে 'উরা' (হুর্রা) ধ্বনি দেওয়া হলো, তারপর নাচ। এইভাবে আজ প্রায় দশটা থেকে সন্ধে চারটে-পাঁচটা অব্দি ওদের কোনো না কোনো প্রোগ্রাম চলতে থাকল।

৭ নভেম্বরে রাস্তায় চলা সহজ ছিল না। ট্রাম নগরের কেন্দ্র (পুরনো হেমন্ত-প্রাসাদের ময়দান) অব্দি যেত না। নগরের মুখ্য রাস্তা নেবস্কী দিয়ে চলাও ছিল মুশকিল। রাস্তায় না-জানি কত মিছিল ঝাণ্ডা, পতাকা আর নেতাদের ছবির সঙ্গে চলছিল। আমরা সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। এই সময়েও ওখানে ভিড় দেখা যাচ্ছিল। হোটেল ইউরোপার চৌরাস্তা অব্দিই যাওয়া যাচ্ছিল, অন্য রাস্তাতেও এই ধরনের বাধা ছিল। আগে ওরাই যেতে পারবে যাদের কাছে পাস আছে। আমি জানতাম না, না তো পাস পাওয়া কিছু কঠিন ছিল না, তাই চক্কর কাটতে বাধ্য হলাম। প্রাসাদের ওপর দিক থেকে আরেকটা পুল দিয়ে নেবা নদী পার করলাম। সারা নগর শোভাময় মনে হচ্ছিল, যেখানে-সেখানে সৈনিকদেরও শোভাযাত্রা ছিল। বরফের বদলে তুষারকণা যখন-তখনই পড়ছিল, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, যার জন্য শীত খুব বেড়ে গিয়েছিল। মহোৎসবের দিন! কাজেই মদ না খেয়ে কি করে কাটবে? কত লোক ভাবল—সন্ধের জায়গায় সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাক—'শুভস্য শীঘ্রম'। তাও মাইলের পর মাইল চলার পর এক-আধজন মদখোরেরই দেখা মিলল, যদিও তারা নর্দমায় হড়কে পড়েনি। আমরা মিছিলের সমাপ্তির সময় অব্দি রাস্তায় থাকতে পারিনি, তবে সাড়ে আটটা থেকে চারটে পর্যন্ত পুরো সাড়ে সাতঘণ্টা চলছিলামই। যেখানে-সেখানে মিষ্টি আর খাদ্যবস্তু দিয়ে সাজানো লরি চলমান দোকানের মত যাওয়া-আসা করছিল; সবকটার ওপরে নিজের নিজের ফ্যাকট্রির নাম ছিল। ছেলেদের জন্য খেলনা আর মিষ্টির পুরো হাট বসে গিয়েছিল। জিনিসের দাম সাধারণ রেশনবিহীন দোকানের থেকে কিছু কম অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাও এতটা কম ছিল না যে মানুষ ঝুড়ি ঝুড়ি জিনিস কিনে আনে। সারা শহরে বরফের কোনো নামই ছিল না। প্রকৃতি নিজের এমন নিয়ম করে রেখেছে যে নিশ্চিত তাপমাত্রা পৌঁছলেই যেমন আগের থেকে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ জল বাষ্প হয়, তেমনি এক নিশ্চিত বিন্দু অব্দি তাপমাত্রা নামলে বরফ তৈরি হয়ে যায়। নভেম্বরের পরেও কখনও কখনও তাপমাত্রার লুকোচুরি খেলা দেখা যেত। ওই সময় বরফ গললে চারিদিক শুধু জল আর জল চোখে পড়ত। হ্যাঁ, গাছের বা বাড়ির ছায়ায় সূর্যকিরণ খুব কম পড়লে বরফ গলে না। এই বছর বরফ কম পড়াতে খুব অভিযোগ ছিল।

৯ নভেম্বরে এখনও বাড়ি গরম হচ্ছিল না। শীত খুব ছিল, তাতে লিখতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। বিদ্যুতের উনুন জ্বালানো হলো, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। ১২ নভেম্বর থেকে যখন বাড়ি কেন্দ্রীয় তাপের সাহায্যে গরম করা শুরু হলো, তখন বাড়ির ভেতরের তাপমাত্রা ১০° বা ১২° সেন্টিগ্রেড হলো এবং বাড়ির ভেতর আরামে কাজ করা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আরেকটা অসুবিধে উপস্থিত হলো, গরম করা মেশিন দিনরাত ঘড় ঘড় শব্দ করে চলছিল, যেটা কানে খুব খারাপ লাগছিল।

১৩ নভেম্বরে যখন এগারোটার সময় পড়ানোর জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম তখন নেবা নদীতে সকালে প্রচুর বরফ ছিল, কিন্তু সন্ধেবেলায় সব গলে গিয়েছিল। ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ বাড়ি নেবার ডান তটে অবস্থিত, যেখান থেকে পৃথিবীর সব চাইতে বিশাল দুটো গির্জার একটি ইসাই-কী-সবোর সামনে নজরে আসছিল। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, যে এখন সব সময়ের জন্য বাড়ি অহোরাত্র গরমই থাকবে! কিন্তু ১৬ নভেম্বরে মেশিন খারাপ হয়ে গেল। আর বাড়ি আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল! মেশিন-বিরোধীরা বলতে পারে, যে মেশিন-যুগের অর্থই অসুবিধে আর দুর্ভাবনা। কিন্তু কি করা যায়, মেশিন-যুগের বাইরে যাওয়া যায় না। ওই সময় ঘর গরম করা খুব খরচের ছিল নিশ্চয়, যার থেকে তার সুবিধেটুকু অল্প লোকই নিতে পারত। এই ঠিক যে এখন সরকার এবং নাগরিক সংস্থাগুলোর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ ছিল বাড়ি বানানো অথবা মেরামত করার দিকে। অনেক জায়গায় তাড়াতাড়ি করার জন্য, যেই দোতলা-তিনতলা বাড়ি ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মতি অনুসারে মজবুত মনে হচ্ছিল, অমনি ওগুলোর ওপরেই এক-দু'তলা আরো বাড়াতে শুরু করেছিল। তাতে ভিত থেকে বাড়ি বানানো আর বাড়ির ওপর এক-আধ তলা বাড়ানোর শ্রম ও সামগ্রী খুব বেঁচে যাচ্ছিল, তাই এরকমটা করা হচ্ছিল। অনেক এরকম বাড়ি ছিল, যার কাঠেব সমস্ত জিনিস জ্বলে গিয়েছিল আর তিন-চারতলা উঁচু দেওয়ালগুলো মজবুত দাঁড়িয়ে ছিল। এরকম বাড়িগুলো প্রথমে হাতে নেওয়া হয়েছিল, কেননা সেগুলো তাড়াতাড়ি বানানো হয়ে যাবে। বাড়ির মেরামত ও বানানোর কাজ খুব দ্রুত হচ্ছিল, কারণ নগরপালিকা লোকেদের কষ্ট বুঝতে পারছিল। সবচেয়ে বেশি লোকজনদের ওই দিকে টানা হয়েছিল! এর একটা প্রভাব মস্কো, লেনিনগ্রাদের মত নগরের পুলিশের ওপর পড়েছিল। এখন ওখানে একশোর মধ্যে নব্বই জন সেপাই ছিল স্ত্রীলোক। চৌরাস্তায় স্ত্রীলোকদেরই হাত দেখা যেত। ট্রামের কন্ডাক্টরদের মধ্যে বোধ হয় আগে থেকেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি ছিল, কিন্তু এখন তো ড্রাইভারদের মধ্যেও পুরুষ ছিল না। দোকান আর অফিসে আগে থেকেই স্ত্রীরাজ্য ছিল। সোভিয়েতবাসীরা ভাবত যে পুরুষদের ভারি কাজে পাঠানো উচিত। হাল্কা কাজ তো স্ত্রীলোকেরা করতে পারে। আগে তো গৃহনির্মাণ বিভাগ চব্বিশ ঘণ্টা নাগাড়ে কাজ করে যেত। প্রতি আট ঘণ্টার ব্যবধানে নতুন কাজের লোক কাজে যোগ দিচ্ছিল। রাতের আঁধার দূর করতে আলো বিজলী থেকে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু হিমাঙ্ক থেকে নীচের তাপমাত্রায় গোলানো সীমেন্ট—সেকেন্ডের মধ্যে বরফ হয়ে যেত। এর সমাধান ওরা পাইপে ভরা বাষ্পের দ্বারা করে নিয়েছিল।

২৪ নভেম্বর ভারতের খবর পেলাম। জানতে পারলাম, ছাত্র ও জনতার ওপর কলকাতা পুলিশ প্রকাশ্যে গুলি চালিয়েছে। ২১-২২ নভেম্বর দুদিনই হরতাল হয়েছে। ২৫ তারিখে কলকাতার হরতালের খবর রুশ খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। জানতে পারলাম, দুদিন গুলি চলেছে। হরতালে দোকানদাররাও যোগ দিয়েছিল। এতবড় খবরও যখন দু-তিন দিন বাদে পড়ার সুযোগ পেলাম তখন সহজেই আন্দাজ করা যায় যে ভারতের খবর ওখানে কতটা দুর্লভ। আসলে খবর তো পাঠকদের জন্য ছাপা হয়। রুশ পাঠকদের মধ্যে কতজন আছে, যারা ভারতের খবর জানতে উৎসুক? সুতরাং আমার বিরক্ত হবার দরকার ছিল না।

২৭ নভেম্বরে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা অসহযোগের সময়কার সহকর্মীর ছেলের চিঠি ভারত থেকে এল। যখন আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করতাম, তখন বন্ধুর এই ছেলেটি বাচ্চা ছিল। খুব খুশি হলাম। কিন্তু পদবীতে কুমার লেখায় একটু সন্দেহের গন্ধ পেলাম। তবু ডাক্তারের ডিগ্রিতে বিভূষিত দেখে সন্তুষ্ট হলাম। অনেক বছর বাদে জানতে পারলাম, যে ও গ্র্যাজুয়েট তো হয়ে গেছে, কিন্তু বাড়ির উচ্ছন্নে যাওয়া যুবক। আমি সম্প্রতি 'ধরতী কী ওর' নামের একটি কন্নড় উপন্যাসের হিন্দি অনুবাদের সংশোধন করেছি, ওতে একটি পাত্র এইরকমই ছিল। সেও গ্র্যাজুয়েট, আর সে নিজের সমস্ত সম্পত্তি ও সম্মান বেচে খেয়েছিল। মাঝে মাঝে ঔপন্যাসিকের কল্পনাগুলোর অস্তিত্ব এক ব্যক্তিতেও খুব আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায়। আমাদের 'কুমার সাহেব' বাবা মারা যাবার পর একমাত্র পুত্র হবার দরুন একলাই বাড়ির মালিক হলো। স্বভাব আগেই বিগড়েছিল। অত্যধিক আহ্লাদে ভালোবাসায় আর কুসঙ্গে মানুষের খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে কিন্তু কিছু লোকের ভেতরে এই রোগ প্রায় বংশগত বলে মনে হয়। তার অর্থ এই নয় যে এটা মা-বাবার থেকেই পেয়েছে। তার তো খুব লম্বা বাহু হয়। যা কেবল সম্বন্ধের কারণে বিগড়োয়, ওর শুধরে যাবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু যে কোনো সময়েই ও পাল্টা খেতে পারে। আমি জানতাম না যে 'কুমার সাহেব' কি ধরনের রোগী। ও নিজের বাবার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছিল। বাবার আপন কাকাও নিঃসন্তান, ওঁর জীবিত থাকা কালে তো 'কুমার সাহেব' কিছুটা সঙ্কোচ নিয়ে ছিল, কিন্তু ওঁর চোখ মুদার দু'বছর না হতেই, ওই সম্পত্তি হাওয়া হয়ে গেল। গ্রামের একটি লোক মন্দিরে নিজের সম্পত্তি দিয়ে ট্রাস্ট বানিয়েছিল। ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত তার দাদা মারা যাবার পর 'কুমার সাহেব'—'মানো না মানো আমি তোমার অতিথি' হয়ে গিয়েছিল। আর তার থেকে ও যা কিছু বার করতে পেরেছিল, তা উড়িয়ে দিয়েছিল। 'ধরতি কী ওর'-এর নায়ক বা উপনায়ক লচ্চা নিজের সম্পত্তি শেষ করার আগেই গ্রাম ছেড়েছিল, তাই ওর বোঝা বড় বড় নগরের ওপর পড়েছিল। আমাদের 'কুমার সাহেব' গ্রামেই রয়ে গেছে, ভালো মানুষের এখন নাজেহাল অবস্থা! মানুষদের মধ্যে ঝগড়া করানোই ওর একমাত্র জীবিকার উপায় হয়ে গিয়েছিল। যে-সময় আমি ওর চিঠি পেলাম, সে-সময় এই সব গুণ জানা ছিল না, ও বাড়ির ওপর অসন্তুষ্ট ছিল, রাশিয়ায় চলে আসতে চাইছিল। কিন্তু রাশিয়াবাসীরা যদি এইভাবে লোকেদের আসার সুবিধে করে দেয়, তবে তো লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছেড়ে সেখানে

যাবার জন্য তৈরি হবে। অসন্তুষ্ট শিক্ষিতদের ভারত থেকে রাশিয়ার ডাকে সাম্যবাদের ততটা লাভ থোড়াই হতে পারে, যতটা হতে পারে ওরা ভারতে থাকলে?

২ ডিসেম্বরের দিন উপস্থিত। গরম করার মেশিন এখনও খারাপ হয়ে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে তাপমাত্রা হিমাঙ্কর থেকেও ১৩° সেন্টিগ্রেড নীচে।

৪ ডিসেম্বর মেঘে ঘিরে ছিল। শীতও যথেষ্ট ছিল, যখন আমি ইউনিভার্সিটি গেলাম। সব ছাত্রছাত্রীরা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা আর নাগরিকরা শীতের পুরো পোশাক পরা। স্ত্রীলোকরা নিজেদের তাদের পায়ের গুলির সৌন্দর্য দেখানোর জন্য রেশমী মোজা পরে আছে দেখে খুব আশ্চর্য লাগত। কি করে ওরা এত শীতে অত পাতলা মোজা বরদাস্ত করে? কেউ এই বলে সমাধান করে দিল, 'চোখ মুখের ওপর কেউ চামড়ার পোস্তীন পরে?'

আজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো ছিল না। আমাদের ভারতীয় বিভাগের মাসিক বৈঠক ছিল। বিভাগাধ্যক্ষ বরান্নিকোফ আর অন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদেরও কিছু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। ছাত্রদের পড়াশুনোর আলোচনা হলো—সেখানে কিছু ব্যাপারে যেমন প্রশংসা করা হলো, তেমনি কিছু কিছু দায়িত্বহীনতারও নালিশ হলো। ছাত্ররাও তাদের অধ্যাপকদের ত্রুটি বলছিল। বস্তুত লেনিনগ্রাদ বা সোভিয়েতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কোনো সমস্যাই নেই। আমাদের এখানকার ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা আর অনুশাসনহীনতার নালিশ করতে করতে অধ্যাপক ক্লান্ত হয়ে যায় না। জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে এদের ঠিক রাখা যায়?' আমার ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, তাই ওই ব্যাপারে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। ছোট-বড় অন্যান্য শিক্ষা সংস্থাগুলোর মধ্যেও ওখানে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো সমস্যা নেই। তার কারণ ওখানকার সামাজিক ব্যবস্থা আর শিক্ষণ সংস্থাগুলোর সংগঠন, ইউনিভার্সিটীর প্রায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী তরুণ কম্যুনিস্ট সভার সদস্য, যার অনুশাসন সবচেয়ে কড়া। ওদের অনুশাসনের উলঙ্ঘন ছাত্র কোনো অবস্থাতেই করার সাহস রাখে না, কারণ এটা আত্মানুশাসন— অনুশাসন বাইরে থেকে চাপানো হয়নি, ভেতর থেকে প্রকাশ করা হয়। কোনো ছাত্রছাত্রী এরকম কাজ করার সাহস কি করে রাখে, যাতে নিজের দেশ নিজের সমাজ-সংগঠনের দৃষ্টিতে তাকে খারাপ মনে হয়? সেই সঙ্গে অধ্যাপক আর তাঁদের ছাত্রদের সম্বন্ধ মালিক আর দাসের, ঢেঙা আর বামনের নয়। ১৭ বছর পুরো করে ছাত্রছাত্রী ইউনির্ভাসিটির চৌকাঠের ভেতরে পা বাড়ায়, যার সম্বন্ধে ওখানকার অধ্যাপক আমাদের পূর্বজদের নীতি 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রত্ব মাচরেত্' পালন করে। এইজন্যই ওখানে না ছাত্রদের উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়, না অধ্যাপকদের।

যেখানে জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে দিনের কোনো পাত্তাই ছিল না, গোধূলি আর উষাতেই মিলেমিশে দু-তিন ঘণ্টার রাত শেষ হয়ে যেত, সেখানে ৬ ডিসেম্বরে দেখলাম চারটের আগেই অন্ধকার হয়ে গেল। টাটকা বরফ ভালো হয়। একটু কঠিন হলেই ওর ওপর হাঁটলে চুর চুর আওয়াজের সঙ্গে মনে হয় নিজের কোমল হাত দিয়ে পা টিপে দিচ্ছে। পুরনো হয়ে যাবার পরেও যতক্ষণ অব্দি তা ছোঁয়া না হয় এবং সাদা দানা দানা

থাকে, ততক্ষণ অব্দি কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যখন তা পাথর হয়ে একটু একটু স্ফটিকের মত হয়ে যায়, তখন আমাদের মত লোকেদের বিপদ ঘনিয়ে আসে। ৬ ডিসেম্বরে খুব নিশ্চিন্তে পা ফেলে হেমন্তপ্রাসাদের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পা পিছলে গেল আর দড়াম করে ধরাশায়ী হলাম। এদিক-ওদিক উঁকি মেরে দেখার দরকার ছিল না। ওদিকে লোকজনের অভাব ছিল না. কিন্তু ওই দেশের পক্ষে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয় তাই কেউ এত বিশেষ মনোযোগ দেয়নি, অথবা লোকেদের সাংস্কৃতিক স্তর এতটা উঁচু হয়ে গেছে যে কাউকে পড়তে দেখে হাসা পছন্দ করে না। আমি শিক্ষা পেয়েছি. কিন্তু অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও পাঁচ মাসের শীতে দু-তিনবার পড়া অনিবার্য ছিল। এইরকম প্রবঞ্চক বরফে আমি সামলে সামলে চলতাম, অথচ অন্যদিকে দেখতাম, তরুণ-তরুণীরা পিছলে পড়ার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য ভালো বরফকেও পেছল বানিয়ে চলত। ছোটবেলা থেকে ওদের স্কেটিং-এ অভ্যাস আছে। তাই ওরা নিজের শরীরকে সামলে নেয়। আমি এই অবস্থায় ওটা শেখার সাহস করতে পারি না।

৮ ডিসেম্বর নেবার ধারা মধ্যিখানে ছোট করে বয়ে যাচ্ছিল, বাকি সমস্তটা জমে ছিল।

৯ ডিসেম্বর তাপযন্ত্র মেরামতের কথা এখনও হচ্ছিল না। যাইহোক, আমাদের বাড়িতে একটা বিদ্যুতের উনুন এসে গেছে। যা দিয়ে কামরার ভেতরের তাপমাত্রা ১২ সেন্টিগ্রেড হয়ে রইল, এটা একটা কামরাকে আরামদায়ক বানিয়ে দিল।

১০ ডিসেম্বরে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার ছিল না। সোমবার বলে সেটা স্নানের দিন ছিল। লোলা কাজে গিয়েছিল। আমি ইগরকে বাড়িতে ছেড়ে স্নানঘরে গেলাম। ফিরে এলাম, দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। খুব কড়া নাড়লাম, কিন্তু কেউ শুনছিল না। হেরে গেলাম, তারপর জানলার দিকে গিয়ে হাঁক দিলাম। তাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঘণ্টাখানেক ধরে চেষ্টা চালালাম। তারপর নানা রকমের চিন্তা মাথায় আসতে লাগল। প্রত্যেক বাড়ির একটা কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণকারী) কার্যালয় ছিল। আমাদের কন্ট্রোল আমাদের বাড়ির দিকের দরজার অন্যদিকে ছিল, গিয়ে আমি ওখানকার বুড়িকে বললাম। ও এসে জোরে জোরে ধাক্কা লাগাল, তখন হজরতের ঘুম ভাঙল আর এসে তিনি দরজা খুললেন। আমি বললাম, 'তোমার মাকে বলে দেবো, এই বাঁদর খুব খারাপ, একে হাটে বেচে দুটো ছোট ছোট বাঁদর আনবে, তারা এত ঝামেলা করবে না।' তারপর আর কি! হাতে-পায়ে ধরতে থাকল। আমি এটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম, 'তোমার মা ছোটবেলায় এক বাঁদরওলা থেকে তোমায় কিনে এনেছে।' তখন ও বলল, 'না আমি তো মামার ছেলে।' তখন আমি বললাম, 'তোমার মনে নেই। তোমারও লেজ ছিল। আম্মা সেটা ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছে। তারপর ওষুধ দিয়ে অনেকদিন ধরে জোরে জোরে মালিশ করেছে, তোমার শরীরের চুলও উড়ে গেছে, তখন তুমি মানুষের বাচ্চার মত থাকতে লাগলে. কিন্তু কান এখনও ওইরকমেরই আছে।'

ইগরের কান গান্ধীর মত। আদর-আল্লাদের ছেলে। তিন-চার বছরের ছেলেরা বরফে বেধড়ক পিছলে পড়ত। কিন্তু ইগরের একটুও সাহস হতো না, কোনো সাহসের খেলা ও খেলতে রাজি ছিল না। আমি নেবার ঘাটে দেখেছি—এক মা নিজের চার-পাঁচ বছরের

বাচ্চাকে স্যানিতে (চাকাবিহীন গাড়ি) বসিয়ে ওপর থেকে ৩০ গজ নীচের দিকে ঠেলে দিল আর ও খুব বেগের সঙ্গে নীচের দিকে সাঁ করে গড়িয়ে চলল। সাহস বাড়ানোর রাস্তা এইটাই। কিন্তু ক্যাঙ্গারু-মা কি কখনও নিজের বাচ্চার সঙ্গে এরকম করতে পারে?

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে নেবা পুরোপুরি বরফ হয়ে গিয়েছিল, ওপরে দানাদার চিনির মত সাদা হিমের আস্তরণ পড়েছিল। আগে আমাকে হেমন্ত প্রাসাদের কাছের পুল থেকে নেবা পার করতে অনেকটা চক্কর লাগাতে হতো কিন্তু এখন আমি প্রাচ্য-বিভাগের দরজা দিয়ে বেরিয়েই নেবায় গিয়ে পড়তাম আর নাক বরাবর হেঁটে ইসাই-কী-স'বোর পৌঁছোতাম। এখানেই ট্রামস্টপ ছিল। চৌরাস্তা আর কেন্দ্রীয় রাজপথ থেকে আলাদা হবার জন্য এখানে খালি ট্রাম পাওয়া যেত। আমি খুব মজায় ওতে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হতাম! যদি ইন্তুরিস্তকে দিয়ে কাজ হতো—ইংরেজি খবরের কাগজগুলোর লোভে কাজ থাকতই—তাহলে একটু গেলেই ইন্তুরিস্তের কার্যালয়ও ছিল অস্তোরিয়া হোটেলে।

বরফ আর শীতের প্রভাব ট্রাম গাড়িগুলোতেও পড়ত। যেই শূন্য বিন্দুর কাছে তাপমাত্রা পৌঁছয়, অমনি মানুষের শ্বাসের জায়গায় বাষ্প বেরোয়। লোকজনে ভরা ট্রামে ভাপ জমে যেত, যা কাঁচে জমে ওর ওপর একটা বেশ পুরু বরফের আস্তরণ লেপে দিত। বিশেষ করে রাত্রে ট্রামে চড়ার অসুবিধে ছিল এই যে, নামার স্টপকে বোঝা যেত না। লোকেরা নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে জানালার কাঁচে কিছু জায়গা বানিয়ে নিত। সেখান দিয়ে বাইরের দিকে দেখত। তাপমাত্রা ওপরে উঠতেই এই বরফ নিজে থেকেই গলে পড়ে যেত। ২২ ডিসেম্বরে এইরকমই হয়েছিল।

ক্রিসমাস—২৫ ডিসেম্বর খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। কিন্তু সোভিয়েত দেশে কোনো ধর্মীয় উৎসব-দিনের ছুটি হতো না। ওখানকার লোকেরা রাষ্ট্রের দিক থেকে ধর্মের প্রদর্শন করত না। আমাদের এখানে তো এই ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলো অতিষ্ঠ করে তোলে। হিন্দুদের তো তিনশো পঁয়শট্টি দিনই ধর্মীয় উৎসব। আলাদা আলাদা সম্প্রদায় নিজের নিজের উৎসবের দিনে ছুটি চায়। ইংরেজদের চালানো পরম্পরা এখনও চলছে। হ্যাঁ, নতুন-পুরনো উৎসবের দিন চোখ বুঁজে পালন করে যে সরকার, সে ভারতের সবচেয়ে মহান ঐতিহাসিক পুরুষ বুদ্ধের জন্ম আর নির্বাণ দিবসের জন্য একদিনও ছুটি দেওয়া পছন্দ করে না।

সরকারি ছুটি না থাকলেও, সরকার একেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, ওখানকারের জনতা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। আজও রুশ গির্জা রোববারে ভক্তে ভরা থাকে। ক্রিসমাসের জন্য সবুজ দেবদারু শাখা খুব বিক্রি হয়, আর খুব কমই এরকম বাড়ি আছে যাতে ক্রিসমাস-বৃক্ষ নেই। বাপ-ঠাকুর্দারা ছোটবেলা থেকেই ক্রিসমাস-কল্পবৃক্ষে সুপরিচিত হয়ে আসছে। সুন্দর সবুজ রঙের দেবদারু শাখায় নানা রকমের খেলনা ঝোলায়, বাতি জ্বালায়, আসল ফল বা সুস্বাদু মিষ্টান্নের ফল ঝোলায়। খেলনা আর মিষ্টি বাচ্চারা কি করে ভোলে? তাই ক্রিসমাসের গুরুত্ব বাচ্চাদের কাছে খুব বেশি। যদিও রুশ নেতারা ক্রিসমাসের উৎসবকে কালান্তরিত করে শিশু-দিবস আর নববর্ষের দিবসে পরিণত

করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এর ফল এই হয়েছে যে এখন ২৫ ডিসেম্বরের জায়গায় ছেলেদের উৎসব ২৫ থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতেও ক্রিসমাসের কল্পবৃক্ষ পোঁতা হয়েছিল। তার জন্য খাবার টেবিল একদিকে করতে হলো। রঙিন বিজলির লাট্টু ঝোলানো তারও শাখাগুলোয় লাগানো হয়েছিল। কিছু ছোট ছোট খেলনাও ঝোলানো হয়েছিল। ছেলেদের জন্য এমনিতেই খেলনার একটি আলমারি ভরা ছিল, কিন্তু তাও ১ ডজন নতুন খেলনা জরুরি মনে হলো। এর মধ্যে ইগরের স্কোল্পিক হয়ে যাবার কথা, কিন্তু ওই যে আগে বলেছি, চার দিনের কমের জন্য ওকে এখনও শিশু-উদ্যানেই রাখা হয়েছিল। এটা ছিল ছেলেদের সপ্তাহ। সবাই তাদের আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুদের এনে নিজেদের কল্পবৃক্ষ দেখায় এবং তারা খেলনা, মিষ্টি আর বিজলি-লাট্টুর সম্বন্ধে নিজের গুরুগম্ভীর রায় দেয়।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৫-এর ক্রিসমাসে খুব শীত ছিল। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ২৭° সেন্টিগ্রেড (বা ৫০° ফারেনহাইট) নীচে ছিল। তাপমাত্রা উঁচু হবার অভিজ্ঞতা আমাদের ভারতীয়দের আছে। যখন ১০০° ফারেনহাইট তাপমাত্রা হয়, তখন শরীর দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ে। ১০৪° হলে ব্যাকুলতা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের এখানে এরকম স্থানও আছে যেখানে তাপমাত্রা ১১৬° অব্দি পৌঁছয়। তখন বাড়ির ভেতরে অসহ্য গরম হয়; শরীর আঠালো হয়ে যায়, কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয় না। এইরকম তাপমাত্রার অভিজ্ঞতা রুশদের হওয়া সম্ভব না। তার জায়গায় ওদের অভিজ্ঞতা আছে হিমাঙ্ক থেকে ৫০°, ৬০° অব্দি তাপমাত্রা নীচে নামার। সারা পৃথিবীতে বহু গণিত সম্বন্ধীয় ব্যাপার একইরকম মনে করা হয়, কিন্তু ইংরেজরা নিজেদের মথুরাকে তিনটে লোকে পৃথকই রাখতে চেয়েছে। ইংল্যান্ড আর ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্য বাদে সারা পৃথিবীর মানুষ রাস্তাঘাটে ডান দিকে চলে, কিন্তু ইংরেজ 'বাঁদিকে চলো' কথাটা মানে। যে সময় ভারত গণরাজ্য ঘোষিত হতে যাচ্ছিল, তার একদিন কি দুদিন আগে আমি নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে বললাম, 'ইংরেজদের অন্ততপক্ষে এই বড় কলঙ্ককে তো দূরে করে দিন—২৬ জানুয়ারি (১৯৫০)-কে গণরাজ্যের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঘোষিত করা হোক যে আজ থেকে আমাদের এখানে ডানদিকে চলা হবে। ইরান, আফগানিস্তান, চীনের মত আমাদের পাশের ছোট-বড় রাজ্য ডানদিকে চলা মানে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের সমস্ত দেশগুলো ডানদিকে চলাই শ্রেয় মনে করে, তাহলে ভারত কেন ইংরেজদের পেছনে বামমার্গী হয়ে থাকে?' কথাটা রাষ্ট্রপতির পছন্দ হলো, কিন্তু তিনি নিজেকে অসমর্থ মনে করলেন। বললেন, 'নেহরুজীকে বল।' ভালো কথা! কিন্তু নেহরুজীর খোপড়িতে এই কথাটা কি কখনো ঢুকতো?

মাপেও সারা পৃথিবী শতের মাপ কে মানে। সেন্টিমিটার, ডেসিমিটার, মিটার, কিলোমিটার আফগানিস্তান আর ইরান অব্দি চলে। সারা পৃথিবী এই বৈজ্ঞানিক মানকে মেনে চলে। দশোত্তর বৃদ্ধির হিসেব এতে খুব সোজা হয়। কিন্তু ইংরেজ ১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট, ৩ ফুটে এক গজ আর ১৭৬০ গজে এক মাইল এখনো মেনে যাচ্ছে। থার্মোমিটারেও পৃথিবী শূন্য ডিগ্রিকে হিমাঙ্ক এবং একশো ডিগ্রিকে স্ফুটনাঙ্ক মেনে

সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ব্যবহার করে। কিন্তু ইংরেজ সেই থার্মোমিটারকে স্বীকার করে যাতে ৩৩ ডিগ্রিকে হিমাঙ্ক মানা হয়। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় যতই বড় বড় গবেষণা ইংরেজরা করে থাকুক না কেন কিন্তু জাতির দিক থেকে তারা মস্ত অবৈজ্ঞানিক। ওদের সঙ্গে থেকে আমরাও আমাদের এই মূঢ়তার পরিচয় ইংরেজ ভিন্ন অন্য লোকদের সামনে দেখাচ্ছি।

হ্যাঁ, তো -২৭° (ঋণাত্মক) তাপমাত্রা বলা যতটা সহজ, সহ্য করাটা ততটা সহজ নয়। হিমাঙ্কর থেকে ২৪° অব্দি তাপমাত্রার নীচে গেলে আমার বিশেষ কিছু অসুবিধে হয় না। এমনিতে শীতেও লোকেদের কান খোলা আছে দেখা যায়। কিন্তু আমি কেবল চোখ, নাক আর মুখই খোলা রাখার পক্ষপাতী ছিলাম। যখন -২৫°-এর নীচে তাপমাত্রা নামত, তখন তার ফল নিঃশ্বাস নেবার সময় বুকে বোঝা যেত। এই সময় নাক দিয়ে বেরোনো শ্বাসের ভাপ গোঁফওলা লোকেদের ঠোঁটের ওপর জমে যায়, ভুরুতেও সাদা লেগে যেত, আর মহিলাদের সামনে বেরিয়ে থাকা অংশকেও রুপোলি বানিয়ে দিত। এতটা হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে অসহ্যবলে অনুভব করতাম না। আসলে মানুষ যতটা নিম্ন তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, অতটা উচ্চ তাপমাত্রাকে পারে না। যদি হিমাঙ্কর থেকে ৫০° ডিগ্রি নীচে তাপমাত্রা চলে যায়, তাহলে প্রচুর গরম কাপড়ের প্রয়োজন হবে। সারা শরীরকে আপনি চামড়ার প্যান্ট, চামড়ার কোট আর ওভারকোট, চামড়ার টুপি এবং চামড়ার হাত-মোজা পরে গরম রাখতে পারেন। আমার দ্বিতীয় যাত্রায় এই সব জিনিস ইরান থেকে নিজের সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন কেবল টুপি আর চামড়ার ওভারকোট নিয়ে গিয়েছিলাম। চামড়ার ওভারকোট পরে নিশ্চয় অতি কঠোর শীতও জয় করা যায় কিন্তু আমাদের এখানকার ১১০°, ১১২° ডিগ্রির গরম আপনি কি করে নিয়ন্ত্রণ করবেন? মাটির নীচের ঠাণ্ডা কুঠরিতে বসার রেওয়াজ আমাদের বহু পুরনো। জল ছেটানো খসখসের চিকও খুব সাহায্য করে, আর এখন দিল্লীর দেবতাদের কৃপায় অন্তত পক্ষে ওদের বাড়িতে বায়ু-নিয়ন্ত্রিত (এয়ার কন্ডিশন্ড) বাতাবরণ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এই সব উপায়ই খরচসাপেক্ষ আর সঙ্গে সঙ্গে এইরকম যে আপনার ক্রিয়াশীলতা ও গতির প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারবে না। এর বদলে খুব শীতের দেশেও আপনি নিজের শরীরকে ভালো করে ঢেকে চলা-ফেরা করতে পারবেন। সব কাজ করতে পারবেন।

হিমাঙ্কর নীচে ২৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ছিল, অথচ তাপন-যন্ত্রের মেরামত কোনো পাত্তা নেই। ঘরে-ঘরে ক্রিসমাসের ঐতিহ্যমণ্ডিত মিষ্টি (পুডিং) তৈরি করা হয়েছিল। ছানা, ডিম, চিনি আরো কি কি জিনিস মিলিয়ে এই রুশ পুডিং তৈরি হয়। ওর চৌকো পিণ্ডের চারদিকে ক্রসের (সলেও) চিহ্ন আঁকার ছাঁচ প্রায় সব ঘরেই থাকে। এই মিষ্টি খুব সুস্বাদু, আর প্রভু যীশুর প্রসাদ মনে করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে খাওয়া হয়। ক্রিসমাসের দিনে যে আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু, আত্মীয় বাড়িতে দেখা করতে আসে, তারা এই প্রসাদ থেকে অল্প একটু অবশ্যই পায়। প্রথম ক্রিসমাসের কথা তো আমার মনে নেই। কিন্তু ১৯৪৬-এর ক্রিসমাসের দিনটা ভালোভাবে মনে আছে বাড়িতে মিঠাই বানিয়ে চুপচাপ খেয়ে নেওয়া হয় না, সেটা গির্জায় পাঠাতে হয়, যেখানে কুশের মতন এক রকমের ঘাস দিয়ে গাড়ুতে রাখা পবিত্র জল ছিটিয়ে দিয়ে পুরোহিত ভোগ দেয়। সেটা বাড়িতে এনে খাওয়া হয়।

আমাদের ওখানে রথযাত্রা আর অন্য সব ক্ষেত্রেও ভক্তরা এইরকমই ভোগ দেবার জন্য নিজের নিজের জিনিস নিয়ে আসে। রামলীলাতে যা অর্পিত করা হয় তার অর্ধ-পাত্র খালি করে নেবার পরও আমাদের এখানের পুজারিরা সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু রুশ পুজারি শুধু পবিত্র জল একটু ছিটিয়ে দেওয়াই নিজের কর্তব্য মনে করে। পাশের গির্জায় ইগর ঝি-এর সঙ্গে ভোগ দিতে নিজের মিঠাই নিয়ে গিয়েছিল। ওর ফিরতে দু ঘণ্টার ওপর লাগল। জানা গেল গির্জার হলেই শুধু নয়, ওর বাইরে পাকদণ্ডীর ওপরেও বহু দূর অব্দি ভক্তের দুটো লাইনে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল। সবার কাছে পৌঁছতে পুরোহিতের অনেক সময় লাগল। তাই এত দেরি।

কমিউনিজমের দর্শন ঈশ্বর আর ধর্মের বিরোধী হলেও লোকেদের পক্ষে ধর্ম ছেড়ে দেওয়া কিন্তু অত সোজা না। সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই জানতে পারা যায়। যীশুকে ঈশ্বর বলে যাদের বিশ্বাস নেই, সেও যখন নিজের কলা, সংস্কৃতি আর ইতিহাস দেখে, তখন আগের সাত-আটশো বছর ধরে যীশুখ্রীস্টের ধর্মের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ খুঁজে পায়। সব মানুষের নিজের পরম্পরার প্রতি সহানুভূতি ও অনুরাগ থাকে। ছোটবেলার সংস্কার মানুষের মন থেকে সহজে মুছে যাবার নয়। ক্রিসমাসের কথাই ভাবা যাক, এর সঙ্গে সঙ্গে কত পুরনো সম্বন্ধ মনে পড়ে। এখন পঞ্জিকা বদলে গেছে, কিন্তু আমার ১৯৬৭-র ক্রিসমাস মনে আছে। ডঃ শ্চেরবাৎস্কী তাঁর ক্রিসমাস পুরনো পঞ্জিকা অনুসারে পালন করেছিলেন।

মানুষ যে পরিস্থিতিতে থাকে, সেই অনুসারেই নিজের আত্মরক্ষা আর সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। রাশিয়ার লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে হাঁটু অব্দি লম্বা বুট পরে আসছে। আজকাল সেটা বেশিরভাগ চামড়ার হয়। কিন্তু পূর্বজদের পশমের বুটও লুপ্ত হয়ে যায়নি। এটা সেই বুট, যা শকদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল সেখানকার সূর্য-প্রতিমাদের পায়ে তা আজও দেখা যায়। পুরুষেদের নিজের কোটের ওপর কান ঢাকা মত শীতের টুপি পরে থাকতে হতো, যেটা দরকার হলে খুলে কান আর ঘাড় ঢাকা যেত, কিংবা ওপরে করে সেটাকে গোল টুপির মত বানানো হতো। বেশিরভাগ টুপি পোস্তীন বা কৃষ্ণসার হরিণের চামড়াব হয়। স্ত্রীলোকেরা এই ধরনের কান ঢাকাওলা টুপি পরে না, তার জায়গায় ওদের ওভারকোটের কলার বেশ বড় হয়। যাতে এমনি চামড়া বা ওই হরিণের চামড়া দিয়েও মোড়া থাকত। সেটা তুলে দিলে মাথা কান আর ঘাড় ঢেকে যেত।

২৭ ডিসেম্বর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। ওখানে মধ্য-এশিয়ার এক প্রোফেসরের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তুর্কমানী ভাষার পণ্ডিত তথা অশখাবাদে ২২ বছর ধরে অধ্যাপনা করছেন। এখন আমার মাথায় মধ্য-এশিয়া যাবার ক্ষেপ চড়ল। গত ছ মাসে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস আর আধুনিক মধ্য-এশিয়াকে জানার জন্য অনেক বই পড়েছিলাম। এত দিনে এটা তো বুঝে গিয়েছিলাম যে এখানে থেকে আমি বই লিখতে পারব না। লিখলেও দ্বিতীয়বার সেন্সরের জন্য তা ভারত পৌঁছনো সন্দেহের ব্যাপার। আবার হারিয়ে যাবার ভয়ে দুটো করে কপি করা আমার পোষাবে না। মন বলছিল, 'চলো তৃতীয়বারও সোভিয়েত-দর্শন করে নেওয়া যাক।' যদি মধ্য-এশিয়া দেখার সুযোগ পাই তাহলে এবার

গরমে ওখানে চলে যাব, আর তা না হলে দেশের রাস্তা দেখাই ভালো।

ভারতের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। চিঠি যেতেও প্রায় ছ মাস লেগে যাচ্ছিল। তুর্কমানিয়ার প্রফেসরের কাছে জানতে পারলাম, মস্কো থেকে অশখাবাদের বিমানের ভাড়া ৭০০ রুবল। একার জন্য রেশন কার্ডের ওপর ২০ রুবলে হোটেলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওঁর কথায় আমি বুঝে গেলাম যে যদি যাবার অনুমতি পাই তো আমি নিজের টাকার বলেও ওখানে চার মাস ঘুরে আসতে পারি। প্রোফেসর বললেন, যে জিনিসের দাম এখানকার মতই, শুধু মরসুমে কিসমিস কিছুটা সস্তা। বলছিলেন, 'ওখানে খুব গরম পড়ে, তাই ঠিক গরমের মাসগুলোয় (মে, জুন, জুলাই) যাওয়া উচিত না।' কিন্তু তিনি কি জানেন যে ভারতে কতটা গরম পড়ে? তিনি বললেন যে তুর্কমানিয়াতেও আরবী ভাষাভাষী কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। উজবেকিস্তানে আরো পাওয়া যাবে। তাঁর বলায় এটাও জানলাম যে তুর্কমানিয়ায় বালুচী আর আরবী বলা লোকেদের কিছু গ্রাম আছে।

সন্ধেবেলা যখন ঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম বাড়ি গরম। যন্ত্র মেরামত করা হয়েছে।

২৯ ডিসম্বরে বাড়ির ভেতর তাপমাত্রা —১২° আর ১৫° ছিল। কিন্তু শীত বেশি টের পাওয়া যাচ্ছিল না। ছাত্ররা অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল, তাই নতুন পাঠ চলছিল না।

৩০ ডিসেম্বর থেকে নব বর্ষের প্রস্তুতি চলতে লাগল। লাল ঝাণ্ডা এবং অন্য সব জিনিস দিয়ে সংস্থার বাড়িগুলোকে সাজানো হচ্ছিল।

৩১ ডিসেম্বরও এল। ১৯৪৫-এর সাল বিদায় নিল আর ১৯৪৬ আসন্ন হলো। আজ নিজের সারা বছরের কাজের যখন হিসেব-নিকেশ করতে আরম্ভ করলাম, তখন দেখলাম যে এই বছরে কিছু লিখতে পারিনি। 'মধুর স্বপ্ন' আর 'মধ্য-এশিয়া'র সামগ্রী অবশ্য জমা করেছি, কিন্তু জানি না সে সব কবে লেখার সুযোগ পাব। পরের বছরও যদি এইভাবেই কাটে তা হলে খুব বাজে হবে।

আজ সোফির বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল। ওর স্বামী ৩ বছর বাদে ফিরেছে। পান করা নিমন্ত্রণের অনিবার্য অঙ্গ, তারপরে নাচও। আমি দুটোতেই আনাড়ি। সোফি খুব চাইল যে যদি নাও পান করি অন্তত একটু নাচি। কিন্তু জীবনে যখন শিখিনিই তখন আজ নাচব কি করে?

রাত দুটো অব্দি নেমন্তন্ন চলল। অতিথিরা কিছুটা হুঁশে আর কিছুটা টলমলে পা নিয়ে তাদের বাড়ির পথে এগোলো। আসছে বছরের জন্য এইটুকুই ভাবলাম যে যদি মধ্য-এশিয়াকে ভালো ভাবে দেখার সুযোগ পাই তাহলে আগামী ৩৬৫ দিন এখানে অর্পণ করতে আমি প্রস্তুত।

বসন্তের প্রতীক্ষা

শীতকে দু বছরে ভাগ করাটা একেবারে বোকামি মনে হয়—নভেম্বর- ডিসেম্বর ১৯৪৫-এ আর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ। বসন্তের আরম্ভ হতেই সারা বৎসরের আরম্ভ ঠিকই, কিন্তু জগৎ এতটা পরম্পরার পেছনে পড়ে আছে, যে সে নিজের পঞ্জিকায় এই সাধারণ জিনিস শোধরাতেও রাজি নয়, হোক না এর জন্যে আয়-ব্যয় পেশ করার সময় এক বছরের জায়গায় ১৯৪৫-১৯৪৬ লিখতে। রাশিয়ার মত ঠাণ্ডা দেশে বসন্তের প্রতীক্ষা যত উৎকণ্ঠার সঙ্গে করা হয়, অতটা আমাদের দেশে সম্ভব না। ছেলেদের একটি রুশ কবিতায় শুনেছিলাম—

আয় আয় বসন্ত আমার বোন/জানালায় বসে তোর প্রতীক্ষা করছি।

ছোট্টমত বোন (সেস্ক্রুচ্‌কা) না, বরং জোয়ান-বুড়ো সবাই বসন্তের প্রতীক্ষা করে, কিন্তু লেনিনগ্রাদে ওর পৌঁছতে এখনও পুরো চারমাস দেরি ছিল। পয়লা জানুয়ারি তাপমাত্রা ১২° থেকে ১৫° হয়েছিল।

৩ জানুয়ারিতে ইউনির্ভাসিটি গেলাম। প্রথম বছরের ছাত্রদের কিছু পড়ালাম, তারপর অধ্যাপক তথা চতুর্থ বর্ষের ছাত্ররা পাঠ্য পুস্তক থেকে 'মৃচ্ছকটিক' নাটক শুরু করল। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা শেষ হতেই কিছুদিনের ছুটি ছিল। তাই ১০ ফেব্রুয়ারি অব্দি আমার ইউনির্ভাসিটিতে কোনো কাজ ছিল না। আমি এখন বেশির ভাগ সময় বাড়িতে থেকেই বই পড়তাম আর তার থেকে নোট নিতাম।

৮ জানুয়ারিতে প্রথম দেখলাম যে ৫০ জনের মত জার্মান বন্দী আমার জানালার ধার দিয়ে যাচ্ছে। এর পরে তো রোজ দশটার সময় ওদের কাজে যেতে দেখতাম আর চারটের সময় ডেরায় ফিরতে। ওদের দেখাশোনার জন্য কখনো-কখনো তো বন্দুকধারী একটি মহিলা-সেপাই যেত। বন্দীদের মুখ বিষণ্ণ আর শ্রীহীন যদি হয় তো আর আশ্চর্যের কি? হিটলার বিশ্ব-বিজয়ের জন্য ওদের পৃথিবীর দেশে দেশে পাঠিয়েছিল। হিটলার তো অন্য লোক জয় করতে চলে গেল। কিন্তু ও বেচারাদের নিজের দেশের থেকে দূরে রাশিয়ার জাঁকালো শীতে কাজ করতে ছেড়ে দিয়ে গেছে। ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালো ছিল, এটা ওদের সুস্থ শরীর দেখে বোঝা যাচ্ছিল। হ্যাঁ, ওদের জামাকাপড় ছিল নিজেদের পুরনো ফৌজের, যা একটু বেশি অপরিষ্কার ছিল।

১৪ জানুয়ারি ইউনির্ভাসিটি গেলাম। চতুর্থ বর্ষের দুজন ছাত্রী সংস্কৃতে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'মেঘদূত' থেকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সোভিয়েতের বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য কাগজ-কালি কিচ্ছু খরচ করার দরকার পড়ে না। মৌখিক পরীক্ষা হয় আর পরীক্ষক হয়ে নিজেরাই অধ্যাপকদের তিনটে চেয়ারে এসে বসে পড়ে। পূর্ণসংখ্যা থাকে পাঁচ।

ছাত্রছাত্রীরা উত্তর দিয়ে বাইরে যাবার পর তানিয়াকে আমি দু নম্বর দেবার জন্য

বললাম। তাতে আমার সহকর্মীরা বলল, 'এর মানে তো ফেল।' মনে হচ্ছে 'ফেল' কথাটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই শুধু বর্জিত নয়, অধ্যাপক আর পরীক্ষকদের মধ্যেও তা বর্জিত। পর্যাপ্ত সংখ্যক দিন যে উপস্থিত ছিল, সোভিয়েত শিক্ষা-সংস্থায় তার ফেল হবার সম্ভাবনা নেই। প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নিজের সমস্ত বইপত্র সঙ্গে রাখা যায়, কেননা স্মৃতির পরীক্ষা নয়, বোঝার ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হয়।

আমাদের বাড়িতে এখন কোনো চাকর ছিল না। বাড়ির কলের ঠাণ্ডা জলে ধোবার পর এক মিনিটেই ব্যথার চোটে হাত আর মন দুটোই অন্ধকার হয়ে আসত। আমার মতে, এই শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা করার দরকার নেই, কিন্তু ওতে এত সময় লাগানো উচিত নয় যাতে লেখাপড়া করার সময়ে কম পড়ে। মালকিনের চিন্তা একটু অন্যরকম ছিল। আমি বসে বসে রাত্তিরে একটা-দুটো অব্দি পড়তাম আর নোট নিতাম, যাকে ও বাজে কাজ ভাবত।

২৪ জানুয়ারিতে জার্মান বন্দী রাস্তার বরফ ফেলছিল। বাড়ির কাজকে এই সময় বন্ধ রাখা হয়েছিল, কিন্তু আগের শীতে সেটা ২৪ ঘণ্টা নাগাড়ে চলতে থাকল। শহরের সর্বত্র বরফ, তাহলে ফেলবে কোথায়? ছোটো ছোটো রাস্তা আর গলিগুলোর বরফ বসন্ত আরম্ভ হবার পরই গলে পরিষ্কার হয়ে যেত, কিন্তু বড় রাস্তায় সব সময় বরফ সরানোর কাজে লেগে থাকতে হতো, না হলে ট্রাম আর মোটরের আসা-যাওয়া থেমে যেত, কারণ বরফের ওপরে চললে উঁচু-নিচু হয়ে যায়। তার ফলে ওর ওপরে কোনো যানের চলা খুব সহজ হয় না।

এখনও ভারতে কি হচ্ছে, সেটা জানার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। আমার সবচেয়ে জরুরি মনে হচ্ছিল—একটা রেডিও কেনার, যাতে দেশ-বিদেশের খবর জানতে পারি, কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণ হতে এখনও চার-সাড়ে চার মাস দেরি।

২৩ জানুয়ারির রাতে রেডিও থেকে জানতে পারলাম যে দিল্লী অ্যাসেম্বলি জাতীয় সরকারের কৈফিয়ত দাবি করেছে। জাভায় ওখানকার স্বাধীনতা-প্রেমীদের দাবিয়ে আবার ডাচদের রাজ্য কায়েম করতে ইংরেজ সেনা যখন অস্বীকার করল, তখন ইংরেজরা ওখানে ভারতীয় সেনা পাঠাল। বলতে গেলে বিলেতে এখন মজদুর দলের শাসন, যে নিজেকে সমাজবাদী বলে গর্ব করে। কিন্তু বিলেতের মজদুর-পার্টিও সাম্রাজ্যবাদের অন্ধানুসরণে নিজেদের ট্যোরি-ভাইদের থেকে পিছিয়ে নেই। এখন সে ভারতীয় সেনাকে জাভায় ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। দিল্লীর অ্যাসেম্বলি এরও বিরোধিতা করেছিল। 'প্রাভদা' সোভিয়েতের সবচেয়ে বেশি ছাপা হয় যে দুটি রুশ খবরের কাগজ তার মধ্যে একটি। কিছু স্থানীয় খবরের সঙ্গে মস্কোর 'প্রাভদা'র লেনিনগ্রাদীয় সংস্করণও বেরোত, যাতে আন্তর্জাতিক খবর আর কিছু লেখাও থাকত। হয়তো খবরের দু-চার লাইনই কখনও কখনও বেরোতো, কিন্তু ওই থেকে বোঝা যাচ্ছিল, যে যুদ্ধের পরের ভারত চুপচাপ ইংরেজদের জোয়ালকে বহন করতে পারছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ নেতাদের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি ২৬ জানুয়ারির (১৯৪৬) ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'বৃদ্ধ নেতা হচ্ছে সব কাজ পাথর দিয়ে আটকানোর লোক,

রাজনীতিতে আরো যুবকদের নেতা হওয়া দরকার। বৃদ্ধরা নিজেদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা থেকে পরামর্শ দিতে পারে। ভারতীয় হিন্দু রাজনীতিক বুড়োদের এটা মাথায়ই আসে না, যে সেই সময় আসন্ন যখন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে খান-পান এবং বিয়ে-শাদির সীমাও মুছে যাবে। আমাদের বুড়ো নেতা তো অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমঝোতা করতে চাইছে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এমন ভীষণ নরসংহারের সঙ্গে, যা 'ন ভুতো ন ভবিষ্যতি' ,—সোভিয়েত রাশিয়ার সত্তর লাখ মানুষের বলি দিতে হলো। কিন্তু ২৭ জানুয়ারিতে আমি দেখছিলাম, যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফের চাপা উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল। রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে সোভিয়েত প্রতিনিধি জাভায় ইংরেজ তথা ওর সহায়ক জাপানী সেনাকে ব্যবহার করার বিরোধিতা করে চিঠি দিল। ইউক্রেন-এর প্রতিনিধি গ্রিসে ইংরেজ সেনার ফ্যাসিজম্-পোশাক-এর নীতির বিরোধিতা করল। ইরানী প্রতিনিধি ইরানের ভেতর হস্তক্ষেপ করার অপরাধ রাশিয়াকে দিল। কোরিয়াতে সোভিয়েত আর আমেরিকা দড়ি টানাটানি করছিল। আমেরিকা অল্পসংখ্যক ধনীদের পক্ষে ছিল এবং সেখানের বহু সংখ্যক পীড়িত জনতা সোভিয়েতের পক্ষে।

২ ফেব্রুয়ারিতে লোলার ভাই-এর মেয়ে মায়া এল। ও মস্কোয় কলেজের তৃতীয় বর্ষে পড়ত। এখনও আরো দু বছর বাকি ছিল। মায়ার নাম থেকে এটা বোঝায় না যে ওর নামের ওপর বুদ্ধির মায়ার কোনো প্রভাব আছে। রাশিয়ায় এখন হাজার হাজার সংখ্যায় মায়া নামধারিণী মেয়ে মিলবে। 'মায়া' হলো মে মাস। মে মাসের প্রথম দিনে দুনিয়ার মজদুরদের পবিত্র দিন, তাই যে মেয়ে মে মাসে জন্ম নেয়, তার নাম মায়া রাখার চেষ্টা করা হয়। মায়া খুব বুঝদার মেয়ে। বেচারির মা মারা গিয়েছিল, আর তার অত্যন্ত প্রতিভাশালী বাবা ছিলেন জেলে। তিনি সবচেয়ে তরুণ সোভিয়েত জেনারেল। তাঁর দাদাও জারের আমলের এক যোগ্য জেনারেল তথা সৈনিক কলেজে গণিতের অধ্যাপক। মায়ার বাবা তোপের ওপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার সিদ্ধান্তগুলো পরে পাঠ্যক্রমে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি যে জেলেই থাকুন না কেন, নিজের দেশের জন্য লড়তে নিশ্চয় খুব ছটফট করেছিলেন। কিছু লোক তো এতদূর গুজব রটিয়েছিল যে নাম বদলে তিনি ফিনল্যান্ডের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন—কিছু লোক এর জন্য দিব্যি কাটতেও তৈরি ছিল। কিন্তু যদি তিনি যুদ্ধে সোজাসুজি অংশ নেবার সুযোগ পেতেন, তাহলে যুদ্ধের শেষে ওঁর জেলে থাকার দরকার হতো না। হ্যাঁ, এতে সন্দেহ নেই যে সোভিয়েতবাসীরা নিজেদের রাজবন্দীদের প্রতিভা কাজে লাগাতে খুব ভালো করেই জানে, তাই নিজের এই প্রতিভাশালী জেনারেলের প্রতিভা অবশ্যই কাজে লাগাত। জেনারেল জাংকুল্যা একেবারে নিরপরাধ ছিলেন। যখন ১৯৩৭-এ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলে তৎকালীন সোভিয়েত মার্শাল তুখাচেপস্কী তথা অন্য ফৌজী অফিসাররা ষড়যন্ত্র করে সোভিয়েত-শাসনকে উল্টে দিতে চাইল, ঠিক সেই সময় যবের সঙ্গে পেষণযোগ্য কাষ্ঠকীটের মত জেনরেল জাংকুল্যাকেও ধরে ফেলা হলো। তুখাচেপস্কী সবচেয়ে বড় সেনাপতি হওয়ায় পদস্থ অফিসার মহলে প্রভাব ছিল।

ও বড় অফিসারদের বৈঠকে ডাকল, যাতে জেনারেল জাংকুল্যাও চলে গেলেন। উপস্থিতির খাতায় হয়তো তিনি হস্তাক্ষরও করেছিলেন। দু-চার মিনিট কথাবার্তা শুনতেই তিনি উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন আর বৈঠক থেকে উঠে চলে গেলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের ধরার সময় জাংকুল্যাও ধরা পড়লেন। এখন তিনি সাজা পেয়ে জেলে ছিলেন। মায়া খুব জানবার চেষ্টা করল। ওকে বলা হলো, 'তোমার বাবা সুস্থ আছে, খুশিতেই আছে। আর এক-দেড় বছরের মধ্যে সে বাইরে চলে আসবে।'

জেনারেল জাংকুল্যার মতোই যবের সঙ্গে হয়তো আরো কিছু কাষ্ঠকীট বাঁটা হয়ে গেছে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সোভিয়েত-শাসনের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার প্রথম সমাজবাদী সরকারের বিরুদ্ধে তথা শারীরিক-মানসিক শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ-এর বিরুদ্ধে ওই সময় এক ভীষণ ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল, যাতে-জাপান আর জার্মানি পুরো সাহায্য করেছিল। তারা এইরকম ব্যবস্থা করেছিল যাতে সোভিয়েত-শাসনকে খতম করে ওখানে ফের পুঁজিপতিদের স্বেচ্ছাচারিতা কায়েম করা যায়। জেনারেল জাংকুল্যার বাবা জার-শাসনের জেনারেল ছিলেন, কিন্তু ওঁর পরিবার শুদ্ধ ও শিক্ষিতশ্রেণীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখত, তাই জার-শাসনের প্রতি ওঁর সহানুভূতি থাকতে পারে না। বিপ্লবের পর তিনি বলশেভিকদের সঙ্গ দিয়েছিলেন। জাংকুল্যা তো জ্ঞান হতেই লেনিনের পাক্কা ভক্ত। কিন্তু যেখানে এত বেশি বিপদ সেখানে যবের সঙ্গে কাষ্ঠকীটের মত পিস্ট হবার ভয় সর্বদাই আছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর অপরাধীদেরও মৃত্যুদণ্ড দিতে সোভিয়েত-শাসক খুব সঙ্কোচ বোধ করে, এটা ওদের শত্রুরাও জানে। ভালো হতো যদি এই ধরনের ঘটনা একেবারেই না হতো। লোলার ভাই ছিল বলে জাংকুল্যার সম্বন্ধে আমি যতটা জানতে পারতাম, অতটা ওপরওলারা কিভাবে জানতে পারতো?

মায়া পড়ার জন্য মস্কোয় ভর্তি হয়েছিল। মাঝপথে পড়াশুনো ছাড়তে চাইছিল না। আমাদের ইচ্ছে ছিল যে ও এখানে থাকুক, তাহলে ভাল হয়। ও নিজের ছুটি কাটাতে ফিনল্যান্ডের খাড়ির এক বিশ্রামালয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে ফেরার সময় সে তার পিসির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

শীতের দিনও কতটা নীরস হয়! যদি দু-এক হপ্তার ব্যাপার হতো, তাহলে এতে কোনো সন্দেহ থাকত না যে, রজত-রাশির মত যেখানে-সেখানে ছড়ানো বরফ এবং চারদিকের নিঃশব্দ শান্তি খুব মোহ সৃষ্টিকারী বলে মনে হত; কিন্তু যখন অক্টোবর থেকে এপ্রিলের শেষ অব্দি একই দৃশ্য সামনে থাকত, তখন কি করে আর আকর্ষণ থাকে? তখন শ্যামলিমার জন্য চোখ ব্যাকুল হতো। যদি কোথায় কোনো দেবদারুর গাছ দেখা যেত, তাহলে চোখের একটু বিশ্রাম হতো, আর তা না হলে সবুজের কোনো নাম-গন্ধ ছিল না। এমন কি পাখি পর্যন্ত ছিল না। কেবল বাড়িতে কুঁকড়ে থাকা চড়ুই পাখি কখনও কখনও লাফিয়ে চলতে দেখা যেত। নানান রকমের পাখি, যারা গরমে কলরব করত, তারা সব গরম এলাকা খুঁজতে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছিল। যখন-যখন তাপমাত্রা নামতো, তখন-তখনই পাখিরা দক্ষিণের উদ্দেশে পাড়ি দিত। বলতে শুনেছি যে কাকও নাকি ছ'মাসের জন্য ঘুমিয়ে পড়ত; কিন্তু আমি কোনো কাককে ঘুমোতে দেখিনি।

সংসদের নির্বাচন—মহাযুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় তথা প্রজাতন্ত্রী সোভিয়েত সংসদের (পার্লামেন্ট) নির্বাচন হতে চলেছিল। একই সূচিতে সব ব্যক্তিদের ভোট দেবার কথা। কোনো বিরোধী প্রার্থী দাঁড়ায়নি। তাও নির্বাচনের জন্য যতটা প্রচার আর তৎপরতা রাশিয়ায় দেখা যায় তা কোনো দেশের নির্বাচনের চাইতে কম নয়। শহরের বড় বড় বাড়ির দেয়ালে প্রার্থীদের বড় বড় ফটো ঝোলানো ছিল। হাজার হাজার সিনেমা হলে নির্বাচনের স্লাইড দেখানো হচ্ছিল। বক্তৃতাও ওইরকমই হাঁকডাক করে হচ্ছিল। কোথাও কোথাও তো ভ্রাম্যমান সিনেমা কোনো দেয়ালকেই রুপোলি পর্দা বানিয়ে দেখানো হচ্ছিল। নির্বাচন ঠিকভাবে হোক এই জন্যে নিরীক্ষক সমিতিগুলোকে বাছা হয়েছিল। আমাদের নির্বাচন ক্ষেত্রের নিরীক্ষক সমিতিতে লোলাও যোগদান করেছিল।

১০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন উপস্থিত। রোববার বলে এমনিতেই সেদিন ছুটি ছিল। সকাল ছটা থেকেই লোকেরা ভোট দিতে যেতে শুরু করল। প্রচারকরা ভাবত যে আমিও ভোটার। কিন্তু ওরা নিরাশ হলো, আমি বললাম যে আমি সোভিয়েত নাগরিক নই। তখন অব্দি স্থানীয় প্রচারক তিনবার আমাদের বাড়ি ঘুরে গেছে—যখন একটার সময় লোলা নিজের ভোট দিতে ১৪ নম্বর নির্বাচন-স্থানে গেল, যেটা পাশের স্কুলেই ছিল। রাস্তায় রাস্তায় পথ দেখানোর জন্য রঙিন কাঠের প্লেট ঝোলানো ছিল। নির্বাচন-স্থানে আরো ঝাণ্ডা ও পতাকা লাগানো ছিল। বর্ণানুক্রমিক নাম-সূচি নিয়ে চার-পাঁচটা টেবিলে লোক বসেছিল। নাম বলল, রেজিস্টারের ওপর চিহ্ন দেওয়া হলো, ভোটের কাগজ খামের সঙ্গে দেওয়া হলো। কেননা এই স্থানে কলিনিন আর জ্যানোফ দুজন প্রার্থী সংসদের দুটো উঁচু সংস্থার জন্য দাঁড়িয়েছিল, তাই প্রত্যেক ভোটারকে দুটো রঙের কাগজের টুকরো দেওয়া হয়েছিল। যদি কেউ নিজের কাগজে কিছু লিখতে চায়, তো লাল পর্দায় ঘেরা জায়গায় আলাদা আলাদা ছোট ছোট ডেস্ক রাখা ছিল, সেখানে গিয়ে সে লিখতে পারত। কে কাকে ভোট দিল, সেটা জানার ওখানে কোনো উপায় ছিল না। ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল, তাই খুব বেশি ভিড় ছিল না। যদিও ভোটারদের মধ্যে ৯৫-৯৬ শতাংশের থেকেও বেশি ভোট দিতে গিয়েছিল। নির্বাচন-মহোৎসবে গান, বাজনা, নাচকে কি করে ভুলে যাওয়া যায়?

রেডিও আর একটা ক্যামেরা এই দুটো জিনিসের প্রয়োজনীয়তা আমি নিজের জন্য খুব বুঝতাম। ক্যামেরা আমি আমার ভারতের সীমার বাইরে আনতে পারিনি, সেটা কোয়েটায় ফেলে এলাম। ক্যামেরারও আগে আমার রেডিও দরকার ছিল। কিন্তু রেডিও কেনার এখন পরিস্থিতি ছিল না। এখন দাম খুব বেশি ছিল। লোকেরা বলছিল—কারখানা এখন রেডিও তৈরি করতে শুরু করেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাজারে প্রচুর পাওয়া যাবে, তখন দাম কমে যাবে এবং মেশিনও ভালো পাওয়া যাবে।

সোভিয়েত শহরে পুরনো জিনিস বেচার খুবই ভালো ব্যবস্থা ছিল। পুরনো বই-এর দোকান এক ডজনের কাছাকাছি তো আমার রাস্তার ওপরেই ছিল, যেখানে চক্কর কাটা আমি নিজের জন্য অনিবার্য ভাবতাম। ওই রকমই অন্যান্য পুরনো জিনিসের দোকানও ছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারিতে আমি এমনই একটা দোকানে গেলাম, যেখানে লাইকা-র ঢঙের

সোভিয়েতের 'ফেদ' ক্যামেরা দেখলাম। লেন্স ৩·৫ শক্তির ছিল আর দাম ১১০০ রুবল। যদিও ওখানে আসল লাইকা ক্যামেরাও ছিল। কিন্তু দাম ছিল ৩ হাজার রুবল (২ হাজার টাকা)। রুবলের যে মূল্য আমার চোখে ছিল, তার মানের থেকে দাম বেশি ছিল না, কিন্তু তাও আমি এটা চাইছিলাম না যে কেউ আমাকে অমিতব্যয়ী বলুক, তাই আমি ফেদটাই নিয়ে নিলাম। সোভিয়েতে থাকার সময় ওটা দিয়ে অজস্র ছবিও তুললাম, যদিও লেখা তৈরি করতে না পারায় সেগুলো কাজে লাগানো যায়নি।

১৪ ফেব্রুয়ারিতে নৃতত্ত্ব-মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। লেনিনগ্রাদে মিউজিয়মের সংখ্যা ৪ ডজনেরও বেশি এবং প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা গুরুত্ব আছে। এই মিউজিয়মে আমি সাইবেরিয়ার নানা জাতির বিশেষ প্রদর্শনী দেখলাম, যা তখন হচ্ছিল। চুকচী, তুঙ্গুস, যাকুত্, কমস্চত আর সখালীনের মত জন-জাতির শিল্প-কলার এখানে খুব ভালো সংগ্রহ ছিল। সাইবেরিয়ার এই জাতিদের আদিম জীবন থেকে আধুনিক জীবনে আনার যখন দরকার হলো, তখন সবার আগে জরুরি কাজ ছিল, ওদের মধ্যে থেকে নিরক্ষরতা দূর করা। ওদের মধ্যে লেখাপড়ার কোনো রেওয়াজ ছিল না, তাই শিক্ষক কোথায় পাবে? রুশ বা অন্যান্য ভাষাভাষী শিক্ষক পাওয়া যেত, কিন্তু সোভিয়েত নীতি হল—প্রত্যেককে নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া। এখানে কেবল নীতির প্রশ্নই ছিল না, বরং কার্যতও এটাই লক্ষ্যে পৌঁছতে সবচেয়ে ছোট উপায় হতে পারতো। ওই সময় এটা জরুরি বলে মনে হলো, যে অল্পবিস্তর ভাষা জানাওলা রুশ বা অন্যান্য লোকেদেরও ওদের মধ্যে পাঠানো হোক, কিন্তু যখন শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হলো, তখন নিয়মানুসারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তৈরি করতে লেনিনগ্রাদে স্কুল খোলা হলো। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেরুপ্রদেশের লোকেদের পক্ষে মস্কোও গরম, যার খারাপ প্রভাব পড়ল ওদের স্বাস্থ্যের ওপর। তাই লেনিনগ্রাদকে উপযুক্ত মনে করা হলো। এখন হয়তো স্কুলও নেই। লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটিতে এদের কিছু ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষাতেও বেশ এগিয়েছিল।

মিউজিয়মের ডাইরেক্টর ভারতীয় সামগ্রী দেখাতেও খুব উৎসুকতা প্রকাশ করলেন, কিন্তু এখন সে বিভাগ খোলা ছিল না। উনি সাইবেরিয়ার জাতিদের প্রদর্শনী স্বয়ং দেখালেন। ওখানে ওদের নিজেদের হাতে বানানো অনেক শৈল্পিক জিনিস রাখা ছিল—পোশাক, খেলনা, ঘরসংসারের বাসন, শিকারের জিনিসপত্র ইত্যাদি। সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া সবচেয়ে পুরনো খুলির (তেকিশতাশ মানুষ)ও নমুনা এবং ওই খুলির আধারে বানানো দেহও ওখানে দেখতে পাওয়া গেল। খুলি দেখে আসল মূর্তি বানানোর কাজে গিরাসিমোফকে খুব সিদ্ধহস্ত শিল্পী বলে মনে করা হয়। সে তৈমুরের খুলি থেকে যে আকৃতি বানিয়েছে, সেটা তৈমুরের সমকালীন চিত্রের সঙ্গে একদম মিলে যায়। আসলে, মুখের ব্যাপারে হাড় হচ্ছে নির্ণায়ক। খুলির ওপর চামড়া, কিছুটা স্নায়ু আর কিছু চর্বিই তো লাগে। অতটা মোটা পরত জমিয়ে আমরা খুলিকে আসল মুখের রূপ দিতে পারি। এখানকার গ্রন্থাগারে কয়েকটি ভাষার যথেষ্ট বই আছে। আমার সামনে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসে শকদের সমস্যা ছিল। আমি কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, কিন্তু যতক্ষণ অব্দি অন্য বিশেষজ্ঞরা ওর সঙ্গে সহমত না হন, ততক্ষণ অব্দি অধিক আত্মবিশ্বাস ভালো নয়,

এটা আমি মানি। আমি মিউজিয়মের ডাইরেক্টরের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেছি। উনি বললেন যে ডাক্তার বের্নস্তাম এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আমি এই নিশ্চয়তায় পৌঁছেছিলাম যে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে শকরা কাস্পিয়ানের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমে যতদূর পর্যন্ত দানিয়ূব তট ছড়িয়ে ছিল, ওখান থেকেই ওরা দরবন্দ (ককেশাস) আর সিরদরিয়ার উত্তর হয়ে সামনের দিকে চলে গিয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের সময়ে ওরা সির থেকে দানিয়ূবের মধ্যে ছিল। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সপ্তনদের নীলাভ চোখ তথা লাল চুলওলা বুসুনরাও শক ছিল। ওই সময় তরিম উপত্যকায়ও এই জাতিই থাকত। পরে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হুনদের ওপর প্রহারের কারণে পুব থেকে ওদের ধীরে ধীরে দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে পালাতে হলো। ২ ফেব্রুয়ারিতে 'মস্কো নিউজ'-এ শকদের সম্বন্ধে একটা লেখা পড়লাম, যার থেকে জানতে পারলাম যে কৃষ্ণসাগরের উত্তর-পূর্বে শক রাজ্য চতুর্থ খ্রীস্টাব্দ অব্দি ছিল। এই জায়গাতে এখন সোভিয়েত পুরাতত্ত্ব বিভাগ খুব বড় রকম খোদাই-এর কাজ করছিল। ক্রিমিয়ায় নিয়োপোলিস ছিল শকদের রাজধানী, যার সম্বন্ধে পুরনো লেখকরা লিখেছেন। খোদাই থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে এই জায়গায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে শকদের এক নগর ছিল, যার চারদিকে মোটা দেয়াল ছিল। বাড়ির ঘরগুলো বড় বড় ছিল। বাড়ির আঙিনায় সাদা পাথরের পেয়ালা পাওয়া গেছে, কিছু গ্রিক মাটির পাত্রও পাওয়া গেছে, আর অন্যদিক থেকেও জানা গেল যে এই শকদের ওপর গ্রিক সংস্কৃতির বড় রকমের প্রভাব পড়েছিল। ওদের বাড়িঘর আর বাসনপত্র সাজানো, অলংকরণ করার ঢঙ ওই ধরনের ছিল। যার প্রভাব এখনও ইউক্রেনের পুরনো পুরনো বাড়িতে দেখা যায়। গয়নাগাঁটি দেখলে বোঝা যায় যে ওর প্রভাব বহুদিন ধরে আছে। ছাদ আর খেলনা অলংকৃত করতে রুশ এখনও ওই ঢঙই অনুসরণ করে আসছে। এই সাংস্কৃতিক চিহ্ন যা থেকে শকদের (সিথিয়ন) সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানা যায়, তা কৃষ্ণসাগরের সমস্ত উত্তর তট থেকে দানিয়ূবের কিনারা অব্দি দেখা যায়।

ওদিকে আমাদের পঠন-পাঠন আর নোট নেওয়াও চলছিল। বাসন-কোসন মাজার সময় শীতের নালিশও করতে হতো। মাঝে মাঝে রেডিওতে দু-চারটি কথায় ভারতের খবর দিত। যার ফলে মন আর কল্পনা অন্যদিকে ছুটে যেত।

১৫ ফেব্রুয়ারিতে জানতে পারলাম যে কলকাতায় বড় রকমের হরতাল হয়েছিল। ট্যাঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে সাদা চামড়ার সেপাইদের ডাকা হয়েছিল, গুলি দিয়ে ডজন ডজন মানুষ মারা হয়েছিল—ইতালি সরকার চার্চিলের থেকে কেন পেছনে পড়ে থাকছে? কিন্তু এটা তো সত্যিই, যে তোপ আর ট্যাঙ্কের সাহায্যে ভারতে রাজ্য চালানো যাবে না।

রুশ কথাকলি (ব্যালে) তো অনেকগুলো দেখেছিলাম, আরমানী কথাকলী 'গয়ানে'-র চারদিকে খুব আলোচনা শুনেছি। ভাবলাম এও দেখে নিতে হবে। আরমানী দেশ কথাকলির জন প্রসিদ্ধ নয়, কিন্তু রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত ব্যালের পথ-প্রদর্শন যখন ও পেল, তখন ও কি করে পিছনে পড়ে থাকে? মারিন্স্কী নাট্যাশালায় ১৭ ফেব্রুয়ারিতে সেটা দেখতে গেলাম। সত্যিই খুব সুন্দর নাট্য। সোভিয়েতের প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে আরমানী খচতুর্য়ান নামে একজন এই ব্যালেকে রূপ দিয়েছিল। ব্যালেতে যখন ভাষা

পুরোপুরি বর্জিত, তখন তাকে রুশ বা আরমানী বলার কোনো মানেই হয় না। দেশ, কাল ও পাত্রকে সাজানোর ব্যাপারে রাশিয়া আজ পরম যথার্থবাদী। যদি সে শকুন্তলার ব্যালে তৈরি করে, তাহলে তাতে কালিদাসের ভারতকে অঙ্কিত করার চেষ্টা করবে। শকুন্তলার ব্যালে তো তৈরি হয়নি তবে নাটকের রূপে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' সোভিয়েত-কালেও বেশ ক-বার দেখানো হয়েছে। 'গয়ানে'র সব নটনটী রাশিয়ার। নাচ ভীষণই সুন্দর ছিল, দৃশ্য খুবই মনোহর, বেশভূষা আকর্ষণীয় আর ভাবের কোমলতার সম্বন্ধে কি বা বলা যায়? যবনিকাতে তৈরি দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক, বিশদ আর বিশাল। সুর সম্ভবত আরমানী। ওতে আরমানী অভিনয় আর নাচের ভাবগত কোমলতা খুব চোখে পড়ে। কিন্তু ইউক্রেনী আর রুশ নৃত্য যা এই ব্যালেতে দেখানো হয়েছে ওর মধ্যে দলগত মানবিক নিষ্ঠুরতার স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। মনে হয় গজের মতন চলা এশিয়াবাসী নারীদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রয়োগযোগ্য, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চলার ইউরোপীয় নারীরা সত্যি গজগমনের কি জানে? কিন্তু 'গয়ানে'-তে নট-নটীরা রুশ হলেও ওরা এশীয় নারীদের হাবভাব খুবই সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে।

১৮ ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা হিমাঙ্ক থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেড নীচে ছিল। আমি এখন শীতে অভ্যস্ত। নেবা জমেছিল, আর আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার সময় ওকে সোজা পার করে ইসাই-এর সবোরে ট্রাম ধরতাম।

লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য-বিভাগের দেকন (ডিন) প্রোফেসর স্তাইন অর্থশাস্ত্র আর রাজনীতির এক মানী পণ্ডিত। চীনে একবার তিনি পরামর্শদাতা হয়ে ছিলেন। ভারতের সম্বন্ধেও তার অধ্যয়ন ছিল খুব গভীর। তিনি চীনের রাজনীতি এবং কৌটিল্যের ওপর অতি সম্প্রতি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে চীন আর ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দেওয়া-নেওয়ার বিষয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। বৌদ্ধধর্ম আর দর্শনের আদান প্রদানের সম্বন্ধে আমিও কিছু জানতাম, কিন্তু ভারত আর চীনের দু হাজার বছর আগে আরম্ভ হওয়া সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাজনৈতিক আদান-প্রদান কতটা হয়েছিল, তা জানা ছিল না। আমি যা কিছু জানতাম সেটা বলতে থাকলাম, কিন্তু আমার জ্ঞান কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে বেশি ছিল না। ওই দিন (২০ ফেব্রুয়ারি) যখন আমি পুরনো জিনিসের দোকানে বই-এর খোঁজে বেরিয়েছিলাম, তখন আমার সঙ্গে হিন্দির লেকচারার দীনা মারকোবনা গোগুমানও ছিল। সে বলল যে আমাদের থাকার জায়গার পাশে লিতনী-তে অকাদেমির একটা ভালো দোকান আছে। আমি ওর সঙ্গে গিয়ে ওখান থেকে তিনশো তিরিশ রুবলে পুরাতত্ত্ব এবং মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধীয় অনেকগুলো বই কিনলাম। যেরকম অন্যান্য জিনিস রেশনহীন দোকানে চড়া দামে পাওয়া যায়, বই-এর সেই হাল নয়, তাই বহু লোকের প্রিয় বই এই দোকানগুলোতে এলেও পড়ে থাকতো না। এখানে আমার নজরে এল ১৯০৪—১৯০৫-এর ছাপা পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত বই।

২৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের সম্বন্ধে ছোট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর রেডিওতে শুনলাম। বম্বেতে ভারতীয় নৌসেনা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। মার্কস যা বলেছিলেন তা সিদ্ধ হতে চলেছিল। আধুনিক সৈনিক-বিদ্যায় শিক্ষিত-দীক্ষিত ভারতীয় নিজেদের বন্দুক

সদা ইংরেজদের বিরুদ্ধেই ওঠাবে না, বরং কখনও সখনও নিজেদের স্বাধীনতার জন্যেও ওঠাবে। আজ সেই বন্দুক ইংরেজদের বিরুদ্ধে উঠেছে।

পশ্চিমের সমৃদ্ধ আর সমুন্নত দেশগুলোতেও বহু জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো হাজারে একজনেরও ব্যবহারে লাগে না। সোভিয়েতে শারীরিক, সাংস্কৃতিক ও প্রজ্ঞার বিকাশের উপায় এত বেশি রয়েছে যে তার থেকে সমস্ত লোকই সুবিধে নেয়। যেখানে শিশু-নিকেতন থাকে, সেখানে দেড় মাস থেকে তিন বছরের সোভিয়েতের সব বাচ্চাদের রাখার এবং লালন-পালনের ব্যবস্থা আছে। যেখানে শিশু-উদ্যান থাকে—এগুলো এত বেশি থাকে যে ওতে চতুর্থ বছর থেকে সাত বছরের শেষ অব্দি সোভিয়েত দেশের সমস্ত ছেলেদের রাখা সম্ভব। এগুলো খুব ব্যয়বহুল জিনিস। ইগরের মত ১৪০ রুবল মাসিক দিতে পারা মা-বাবারা দেয় না, কিন্তু সবার জন্য ওখানে আলাদা আলাদা চারপাই, তোষক, বালিশ, চাদর, লেপ, তোয়ালে, বাসন, চেয়ার, টেবিল, খেলার জিনিস, সবই জমা আছে। শিশু-উদ্যানে খেলার ছলে অনেক জিনিস আর তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির উপায় হিসেবে কুকুর, শুয়োর, ভেড়া, ছাগল, মুর্গী আর পাখিও রাখা হয়। ফুলের তো একটা খুব ভালো উদ্যান প্রত্যেক শিশু-উদ্যানের সঙ্গে লাগানো। এ ছাড়াও চাচীরা তাদের বাচ্চাদের সবাইকে নিয়ে নগরের দর্শনীয় মিউজিয়ম, উদ্যান, চিড়িয়াখানা এবং আরো কত ঐতিহাসিক স্থান তথা প্রাকৃত সৌন্দর্যের জায়গা দেখাতে নিয়ে যায়। ছেলেদের জন্য নিজেদের সিনেমা হলও আছে। সেখানে ওদের বোঝার মত বিষয়কেই দেখানো হয়। এক সময় ভূত-প্রেতের গল্প মিথ্যে বিশ্বাসের জন্ম দেবে ভেবে এই সব বই ছাপানো বন্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু পরে জানতে পারল যে মিথ্যে বিশ্বাস থেকে চোখ বন্ধ করলে কাজ চলবে না। সেটার সামনে গিয়ে লড়াই করাটা জরুরি, আর সেই লড়াই পরিজ্ঞান দ্বারাই সম্ভব। এখন ওখানে পঞ্চতন্ত্রের মত পশু-পক্ষীর গল্প বলে ছোটদের মনোরঞ্জন ও জ্ঞানবর্ধন করা হয়। ওখানে ভূত-প্রেতেদের গল্প বলতেও সংযম রাখা হয় না। বাচ্চাদের মনোরঞ্জন আর জ্ঞানবর্ধনের আরো একটা মাধ্যম আছে—সোভিয়েতের পুতুল-নাটক (কুকল্যো থিয়েটার)।

২৪ ফেব্রুয়ারি ইগরের সঙ্গে আমি পুতুল-নাটক দেখতে গেলাম। দেখানো হচ্ছিল আলাদ্দীন ও তার প্রদীপ। নাট্যশালা দর্শকে ভরা, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ বাচ্চা ছিল, আর ২০ শতাংশ ছিল ওদের সঙ্গে যাওয়া অভিভাবক। আমরা লিতনীর পেছন দিকের নাট্যশালায় গিয়েছিলাম—নেবস্কীর পথেও একটা পুতল-নাট্যশালা ছিল। অভিনয় ছটা থেকে আটটার কাছাকাছি পর্যন্ত হয়েছিল। ছেলেরা তো দেখতে দেখতে হেসে হুটোপাটি খাচ্ছিল। আলাদীনের প্রদীপে এরকম কোনো কথোপকথন দেওয়া হয়নি যেটা ৮-৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে না। সিনেমাই হোক আর নাটকই হোক, কিংবা হোক না শিশু বা বয়স্কদের মনোরঞ্জনের বস্তু, প্রত্যেক জায়গায় সোভিয়েতের নির্মাতা ও শিল্পী নিজের সফলতা নিজেকে দিয়ে নয়, বরং নিজের দর্শকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে মাপে। নানা ধরনের এইরকম নির্মিত বস্তু আগে দর্শকদের সামনে পরীক্ষামূলক ভাবে উপস্থাপিত করা হয়, আর ওদের মনোভাব দেখে বহু সংশোধনের পর সেটা

জনসাধারণের সামনে আনা হয়। এটা বলার দরকার নেই যে 'আলাদীনের প্রদীপ' দেখে বাচ্চাদের খুব মনোরঞ্জন হয়েছে। আর বয়স্কদের হয়েছে ভালোরকম চিত্তবিনোদন।

২৬ ফেব্রুয়ারি আমার চতুর্থ বৎসরের ছাত্রী বের্থা খুব খুশি। বলল, 'আজ চিনির দাম বিনা কার্ডে ১২০ রুবল (আশি টাকা) কিলোগ্রাম হয়ে গেছে।' ও আর ওর বান্ধবীরা এই খবর শুনেই বিনা রেশনের দোকানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বলছিল যে অনেক লোক হয়েছিল তাই আধ কিলোগ্রাম শুধু চিনি পাওয়া গেছে। চৌষট্টি টাকা সের বা চার টাকা ছটাক চিনি আমাদের দেশের লোকেদের পক্ষে তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হবে এবং কারো ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার হবে না। কিন্তু ওখানে ওই দিন সত্যিই খুব আনন্দ করা হয়েছিল। এর মানে এই নয় যে ওরা চিনি পেতোই না। রেশনে চিনি সবাই পর্যাপ্ত পেত, যা দিয়ে প্রতিদিনের চা ছাড়াও হপ্তায় একটিবার মিষ্টি পুডিংও বানানো যেত। কিন্তু আমাদের এখানকার মত রুশদের মিঠে খাবারদাবারের খুব সখ কিন্তু ওরা হাত খুলে চিনি ব্যবহার করতে পারত না। এখন ওরা সুযোগ পেয়েছিল। রেশনের চিনি খুব সস্তা ছিল। এর আগে বিনা রেশনের চিনি ১৬০ রুবল কিলো ছিল। প্রতি কিলোতে ৪০ রুবল কম খুবই খুশির কথা। পুঁজিবাদী অর্থনীতি জানা লোকেরা বা অন্ততপক্ষে ওখানকার সাধারণ শিক্ষিতরা বিনা রেশনের দোকানগুলোকে চোরাবাজারীর দোকান বলে ভুল করতে পারে। কিন্তু বিনা রেশনের দোকানে যেসব বাড়তি জিনিসপত্র ১০ গুণ, ২০ গুণ চড়া দামে বেচা হতো, তার টাকা কোনো চোরাবাজারী শেঠের হাতে যেত না, সেটা সরকারি খাজনায় গিয়ে নবনির্মাণের যোজনায় ব্যবহার করা হতো। আর যেমন যেমন ভাঙা কারখানার পুনর্নির্মাণ হতো এবং নতুন কারখানা গড়ে উঠত, তেমন তেমন উৎপাদন বাড়ত। আর সেই অনুসারে দাম কমানো হতো। এরই ফলস্বরূপ ১৬০ রুবল থেকে চিনির দাম ১২০ রুবলে পৌঁছেছিল। আমরা ওর বিশেষত্ব বুঝতে পারছিলাম না, কেননা প্রোফেসর হওয়ায় আমি বিশেষ রেশন কার্ড পেয়েছিলাম যাতে চিনি, মাখন, মাংস, দুধ, ডিম, বিস্কুট ইত্যাদি জিনিস রেশনের দামে এতটা পাওয়া যেত যে রেশনের দোকানের দিকে তাকাবার দরকার হতো না, আর খরচেরও ভয় করতে হতো না।

সোভিয়েতের ফিল্ম দেখলে আমার অতটা বৈরাগ্য হতো না, যতটা হতো ভারতের ফিল্ম দেখলে। এখানে তো বছরে কখনও একবার খুব জোর-জবরদস্তি করলে যদি যাইও, তো বিরক্ত হয়ে মধ্যিখানেই চলে আসার ইচ্ছে হতো। সোভিয়েতের ফিল্ম শুধু যৌন আকর্ষণকে নিয়ে হয় না। তার মানে এই নয় যে সেগুলোতে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্ককে লুকোনোর চেষ্টা হতো। তা অতটাই থাকত, যতটা ডালে নুন থাকে। সোভিয়েত ফিল্মের মধ্যেও আমি বেশির ভাগ দেখতাম এশীয় ফিল্ম—উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, আজারবাইজান, মঙ্গোল ইত্যাদি দেশের ফিল্ম। নতুন এশীয় তরুণ শিল্পী এখন নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও রুশ ভাষাও খুব ভালো বলতে পারে, তাই ভালো এশীয় ফিল্মগুলোকে রুশ ভাষাতেও বানানো হয়। এখন আমার ভাষা বোঝার আর তেমন অসুবিধে ছিল না।

২ মার্চে আমি উজবেক ফিল্ম 'তাহির ঔর জোহরা' দেখতে গেলাম। এটা ছিল আজারবাইজানী ফিল্ম। তাহির আর জোহরা ওই সময় হয়েছিল, যখন বারুদের আবির্ভাব

হয়নি এবং তীর-ধনুক চলত। একজন খান (রাজা) তার সেনাপতির প্রতি খুব প্রসন্ন। খানের মেয়ে জোহরা আর সেনাপতির ছেলে তাহির। খান তাহিরকে ছেলের মত মনে করে। ছোটবেলা থেকেই তাহির আর জোহরা এক সঙ্গে খেলাধুলো করে। পরে কোনো সময় নিরঙ্কুশ খান তার সেনাপতির ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে যায়, আর সে খানের নির্দেশে জঙ্গলে গিয়ে শিকারের সময় তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তাহির নিজের বাবার নির্মম হত্যার খবর পেয়ে যায়—খানের নিষ্ঠুরতা আর অন্যায়ে বাবাই শুধু মরেনি, জনতাও ত্রাহিরব করছিল। নিজের বাবার খুনের বদলা নেওয়া তাহিরের অবশ্যই করণীয়, আর ওদিকে জোহরার প্রেমও সে ছাড়তে পারছিল না। খান সেটা জানতে পারল। সে তাহিরকে খুন করার চেষ্টায় ছিল। এক সময় তাহির ওর হাতের মুঠোয় এসে গেল। খান তাকে সিন্দুকে বন্ধ করে নদীতে ফেলে দিল। পরে কোনো খানজাদী সিন্ধুকটা বার করিয়ে নিল। সে এই সুন্দর তরুণের প্রেমে পড়ে গেল। তাহিরের প্রাণ বাঁচিয়ে সে খুব বড় উপকার করেছিল, কিন্তু তাহির নিজের প্রেয়সী জোহরাকে ছাড়তে রাজি ছিল না। সে অসমর্থতা প্রকাশ করল। খানজাদী রেগে গেল। উটের পেছনে ওকে বেঁধে ভাগিয়ে দিল। কোনো এক বন্ধু রাস্তায় বেহুঁশ অবস্থায় তাহিরকে ওঠায়। তাহির আবার জোহরার কাছে পৌছয়। আবার সে তার বাবার হত্যাকারীর মুখোমুখি হলো। তাহির ওকে মেরে বাবার খুনের বদলা নিতে গেল, কিন্তু ধরা পড়ল। খানের হুকুমে ওকে বেঁধে সেই স্থানে নিয়ে গেল। ওকে ছাড়াতে ওর বন্ধু এল, কিন্তু চারুদত্তের মত যথাসময়ে নয়, ততক্ষণে তাহিরের হৃৎপিণ্ড বর্ষা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে বাবা জোহরাকেও গলা টিপে মেরেছিল। দুজনেই একই খাটে গোরস্থানে গেল। ছোটগল্প আর অভিনয়ের দিক দিয়ে ফিল্মটি খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ফিল্মে যে বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, তা এতে ছিল না—না ছিল সেই অনন্ত অরণ্য আর পর্বতমালা, না নদীর বিস্তৃত উপত্যকা, না নগরের প্রত্যেক অংশের প্রদর্শন।

এশীয় ফিল্ম যদি রোজ রোজও নতুন-নতুন পাওয়া যেত তাহলেও আমি দেখতে রাজি। পরের দিন (৩ মার্চ) 'অবায় কে গীত' (পীষনে অবায়েফ) কাজাক ফিলম্ দেখানো হচ্ছিল। আমি সেটা দেখতে চলে গেলাম।

কাজাকস্তান মধ্য-এশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ধনী প্রজাতন্ত্র। কিন্তু এখানকার লোকেদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো বা আধা ঘুরে বেড়ানো পশুপালক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এখানকার প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদ পৃথিবীর গর্ভে না-ছোঁওয়া অবস্থায় পড়ে ছিল। কাজাক নর-নারী লেখাপড়ার সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত ছিল। খুবই কম মোল্লা আর সর্দার—তাদের মধ্যেও শুধু পুরুষরাই লিখতে পড়তে জানত, তাও আবার আরবী-ফারসী ভাষায়। অবায়েফ কোনো কল্পিত নাম নয়। ওকে কাজাক ভাষার মহান সাহিত্যিক তথা সাহিত্য-পিতা বলে মান্য করা হয়। সে গত শতাব্দীর উত্তরার্ধে জন্মেছিল। অবায়েফের বিদ্যানুরাগ পরম্পরায় চলে আসা মোল্লা আর সর্দারদের শিক্ষা-ক্ষেত্রেই ওকে সীমিত রাখেনি, বরং কাজাকাস্তানের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করা রুশদের সংস্পর্শে এসে সে রুশ ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন করেছিল।

•

এইভাবে কাজাক সাহিত্যের আরম্ভ করতেই সে নিজের অভিজ্ঞ লেখনী থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর পরিণত গ্রন্থগুলো নিজের জাতির সামনে রাখল। জীবনে তেমন সম্মান পায়নি, কেননা সে না ফারসী, আরবী আর না তুর্কি সাহিত্যের ভাষায় তার বই লিখেছিল। সে লেখনী চালিয়েছিল নিজের মাতৃভাষায়, যা সে সময় একটা কথ্যভাষা হিসেবে পরিচিত ছিল বলে হীনদৃষ্টিতে দেখা হতো। এই কারণ ছিল অবায়েফের জীবনে সম্মান না পাবার, যে সম্মান আজকের সোভিয়েত-কালে পাওয়া যাচ্ছে। আজ সে কাজাকাস্তানের বাল্মীকি ও অশ্বঘোষ, কালিদাস আর বান। 'পীস্নে অবায়েফ' এই অমর সাহিত্যিকের জীবন-সঙ্গীতকে নিয়ে বানানো হয়েছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর ছিল, যা দেখে ঘরে বসেই কাজাকাস্তানের ভ্রমণ হয়ে যেত। কাজাকরা যাযাবর। তাঁবুতে (কিবিতোঁ) থাকার সময় ঘোড়া ছাড়াও প্রচুর ভেড়াও লালন-পালন করত। ওদের কিবিতোঁর গ্রাম শুধু ভাঙা হতো আর গড়া হতো। আর ঘোড়া নতুন নতুন পশুচারণ ভূমিতে ঘুরে বেড়াত। পশুচারণ ভূমির খুব সুন্দর দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। কাজাকাস্তানের পাহাড় এবং নদীর উপত্যকাও ছিল মনোহারিণী। কোনো বিশাল জলাশয়ের কাছে কাজাকরা ডেরা বাঁধল। কাঠের গোল কাঠামো দাঁড় করানো হলো, ফের পশমী কম্বল আর কাপড় টাঙিয়ে তাঁবু বানানো হলো। বাইরের খোলকে যেখান-সেখান থেকে সরানো যেত। কাজাক বিচারালয়ের একটি দৃশ্য ছিল—বিচারালয় তো দূরের কথা যাযাবার কাজাকদের তো আলয়ই ছিল না। এক প্রান্তে উঁচু একটু আসনের ওপর গোষ্ঠীর সর্দার বসে ছিল। যার হাতে ন্যায়ের প্রতীক-দণ্ড ছিল। ওর ডাইনে-বাঁয়ে আরো কিছু সর্দার বসে ছিল। সাধারণ জনতা এই অভিজাত লোকেদের থেকে কিছু দূরে বসে ছিল। পাশেই অনেক অশ্বারোহী লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিল। কবি অবায়েফ আর ওর এক বন্ধুর ছেলেকে সেখানে আনা হলো। বন্ধুর ছেলেও কবি। সে কোনো এক কাজাক তরুণীর প্রেমে পড়েছিল। বড়দের আজ্ঞা বিনা তার প্রেম করার অধিকার ছিল না, তাই তাকে আদালতে আনা হয়েছিল। কবি অবায়েফ তার পক্ষে ভাষণ দিল। যার জন্য বিচারকদের রায় পাল্টাতে হলো। দুই প্রেমিকের বিবাহ হলো। সেখানে কাজাক বিবাহের বড় সুন্দর দৃশ্য দেখানো হলো। যাযাবরদের মধ্যে তাদের সর্দার খুব সুখে থাকত। মেয়ের জন্য বহু মূল্য বস্ত্র-ভূষণ প্রদান করা হলো। কাজাক ধনীরা সামন্ত রাজা ছিল। এই সময় কাজাক সঙ্গীত আর নৃত্যের আনন্দ নেবার সুযোগ পাওয়া গেল। গানের মধ্যে অনেকগুলো ছিল অবায়েফের রচনা। মেয়ের বাবা এই বিবাহকে পছন্দ করছিল না, কিন্তু পাঁচজনের রায়ের বিরুদ্ধে সে কি করে যায়? সে নিজের রাগটা অবায়েফের ওপর ঝাড়তে চাইল। ওর পানপাত্রের মধ্যে সে বিষ মিশিয়ে দিল। কিন্তু ভুল করে বিষের পাত্র নিজের ছেলেকে দিল। ছেলে নিজের প্রেয়সীর কোলে মাথা রেখে মারা গেল। প্রেয়সী একটি একটি করে গয়না খুলে নিয়ে ফেলতে লাগল। অবায়েফের শত্রু হায়দার ধর্মের নামে অবায়েফের ওপর মোকদ্দমা চালাল। তাতে অসফল হলে সে দল বেঁধে অবায়েফের ওপর আক্রমণ করতে লাগল। এই অস্ত্রশস্ত্রধারী হিংস্র লোকেদের ভেতর অবায়েফ নির্ভয়ে চলে গেল। হায়দারের সঙ্গে আসা লোকেরা তার কথা শুনেও না শোনার ভান করল, তখন হায়দার কাঁটাওলা গদা দিয়ে অবায়েফকে প্রহার করল। অবায়েফ প্রহারে ঘায়েল

হয়ে গেল। এই দেখে লোকেরা হায়দরের দলকে মেরে তাড়িয়ে দিল। ফিলম্‌টা খুবই সুন্দর আর আমার পক্ষে অত্যন্ত জ্ঞানবর্ধকও ছিল।

৬ মার্চ ইউনিভার্সিটি যাবার সময় রাস্তায় জল দেখা যাচ্ছিল—তাপমাত্রা পড়ে গিয়েছিল। আমি ভাবতে লাগলাম যে বসন্ত এসে গেছে। কিন্তু রাশিয়ায় বসন্ত এখনও দু মাস বাদে হবার কথা, মে মাসে এসে ন্যাড়া বৃক্ষ কোরকের মত করে তার নিজের পাতা দেখায়। ঋতুতে পরিবর্তন অবশ্যই হতো, কিন্তু আমাদের এখানকার প্রাচীন শৃঙ্খলার না ছয় ঋতু ওখানে দেখা যায়, আর না শীত, গরম, বর্ষার মত তিন ঋতুর স্পষ্ট তফাৎ আছে। মে মাসের শুরু থেকে লেনিনগ্রাদে বসন্তের শুরু সত্যিই হয়, কিন্তু যে ঘটনা লেনিনগ্রাদে আজ ঘটে, মস্কোয় তা এক হপ্তা আগেই ঘটতো। আর দক্ষিণে গেলে সেটা আরো আগে ঘটতো। বসন্ত, গ্রীষ্ম তথা বর্ষার ঋতু এক সঙ্গে মিলেমিশে আছে। নতুন ফুল আর নতুন পাতার কারণে মে-জুনকে আমরা বসন্ত বলে মনে করতে পারি, কিন্তু জুলাই থেকে আগস্টের শেষ অব্দি বলা মুশকিল যে এটা গরম না বর্ষা। উভয়েরই এটা এক মিশ্রীত সময়। কখনও কখনও দু-চারদিন যখন বর্ষা হয় না, আকাশ তখন নিরভ্র দেখায়। তাকে গ্রীষ্ম বলা বলে, কিন্তু গ্রীষ্মের নামে যে লু আর গরম আমাদের এখানে পড়ে, ওখানে তার নামই নেই। সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে যখন অব্দি জল বরফ না হয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মত পড়ে, কিন্তু শীত কিছু বেশি থাকায়, সবুজ গাছে তার কিছু প্রভাব পড়তে থাকে—এটাকে ওরা শরৎ বলে, তার পর চার-পাঁচ মাস ধরে শীত। এই ভাবে বসন্ত, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ আর হেমন্তে ওখানকার বছরকে ভাগ করা যায়। অথবা বসন্ত, গ্রীষ্ম আর হেমন্ত এই তিন ঋতুতে বিভাজন করা যায়। বসন্ত সবচেয়ে ছোট ঋতু। বর্ষা ওর থেকে বড় এবং হেমন্ত সবচেয়ে বড়। কিন্তু এখন মার্চে বসন্ত আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাপমাত্রার লুকোচুরিতে আমরা অনেকবার রাস্তায় জল ছড়িয়ে পড়তে দেখেছিলাম।

৮ মার্চ সোভিয়েত-কালের একটি নতুন উৎসবে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস পালন করা হচ্ছিল। সোভিয়েতেরই হোক বা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশের হোক, আজকের হোক বা প্রাচীন কালের হোক—মহিলারা সব সময় উৎসবপ্রিয় হয়ে থাকে। আমাদের প্রাচ্য-বিভাগেও এই দিবস পালন করা হলো। প্রাচ্য-বিভাগের দোকানগুলোতে (ডিনশালা) ভোজের প্রস্তুতি চলছিল। ভাষণ, ভোজ, গীত আর নৃত্য—উৎসবের এই চার অঙ্গ। সব বিভাগের অধ্যাপক তো এসেছিলেনই, ওখানে গোটা পঁচিশ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মহিলা। মোঙ্গল ভাষা বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধ অকাদেমিক কোজিন (দোকন বিভাগাধ্যক্ষ) ভাষণ দিলেন, ফের চীন ভাষা বিশেষজ্ঞ অকাদেমিক অলেক্সিয়েফ আর মিশ্রতত্ত্ববেত্তা অকাদেমিক স্ত্রুবেও উৎসবের গুরুত্বের বিষয়ে ভাষণ দিলেন। দু-তিন জন মহিলারাও বলল, তারপর পানের সঙ্গে ভোজ আরম্ভ হলো। বিস্মিল্লাই ভুল—আমি একলাই পান-বিরত ছিলাম। লোকেদের বোঝানোর জন্য ব্যাখ্যা করার চেয়ে বরং পেয়ালা মুখে ধরে জিভের ডগায় ভিজিয়ে নেওয়া ভালো, কিন্তু আমি তো নিজের জীবনের রেকর্ডকে স্থির রাখতে দৃঢ়চিত্ত ছিলাম। পান করতে খুব ইচ্ছে হলো, কিন্তু আমি দুর্বল সখা নই। লোকেদের কিছু অদ্ভুত নিশ্চয় লেগে থাকবে, কিন্তু কেউ

আমার নিয়মকে ভাঙার আগ্রহও দেখায়নি। রুটি, মাখন, পনির, কলবাসা (সসেজ), মাছের ডিম, বিস্কুট, কেক, মিষ্টি, চা আর কমলালেবু। এই সব ছিল আমার খাদ্য, আর ওখানে এসব প্রচুর না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ভোজের জন্য সবাই টাকা-পয়সা দিয়েছিল, হয়তো রেশন থেকেই বেশির ভাগ জিনিস নেওয়া হয়েছিল। খাওয়ার পর গান শুরু হলো। দুজন অধ্যাপিকা সুন্দর গান শোনালেন। লোকেরা তালি দিল। ফের নাচ আরম্ভ হলো। যেখানে বুড়ো-বুড়োরাও নাচের আখড়ায় নামতে ইতস্তত করছিল না, সেখানে জোয়ানের মত দেখতে কলাতে অনভিজ্ঞ আমি খুব জোরাজোরির পরও চুপচাপ বসে মিটমিট করে দেখেই যাচ্ছিলাম। নাচের জন্য মনে তো লোভ হচ্ছিল, কিন্তু এখন তো 'দিন পেরিয়ে গেছে'।[১] আমি তো সোভিয়েত সীমার ভেতর পা রাখতেই সিগারেটও ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওখানে পুরুষদের মধ্যে কেউই সিগারেট-ত্যাগী ছিল না. উপরন্তু কিছু স্ত্রীলোকও তার আনন্দ নিচ্ছিল। মহোৎসব থেকে ফিরে রাত দেড়টায় আমি বাড়ি পৌঁছলাম।

১০ মার্চে কামাল এনি সন্ধের সময় আমাদের বাড়ি এলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তাজিক উপন্যাসকার সদরুদ্দীন এনীর সুপুত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সমরখন্দে জন্ম হওয়ায় মাতৃভাষা তাজিক (ফারসী) হবার সঙ্গে সঙ্গে উজবেক ভাষাকেও মাতৃভাষার মতই বলতে পারতেন। নিজের নগরেও ওঁর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। স্তালিনগ্রাদে তাজিকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যার মাধ্যম ছিল তাজিক ভাষা। কিন্তু তিনি সমরখন্দ থেকে দূরে লেনিনগ্রাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলেন। হয়তো তাঁর লক্ষ্য তাজিক ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়নের প্রতি ছিল, তাহলে তো সংস্কৃত পড়ার দরকার ছিল। হয়তো তিনি চতুর্থ বা পঞ্চম বৎসরে তা পড়বেন। কামালের সঙ্গে তাঁর বাবা, পরিবার আর দেশের সম্বন্ধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা হলো। কামালের সমরখন্দ থেকে লেনিনগ্রাদ আসা কিছু অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। সোভিয়েতের সব কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়েই ৯০ শতাংশ ছেলে সরকারি ছাত্রবৃত্তি পায়, যা দিয়ে বাবা-মায়ের সাহায্য ছাড়াই পড়া সম্ভব। ছাত্রবৃত্তি সখালীন থেকে পোল্যান্ডের সীমা অব্দি আফগানিস্তান থেকে মেরুপ্রদেশ অব্দি বিস্তৃত ভূ-ভাগের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে যাওয়া সোজা ছিল, তাই কাশ্মীরের সীমান্তের ছাত্রের পক্ষেও মস্কো বা লেনিনগ্রাদে পড়াটা বোঝা হওয়ার কথাই নয়। হ্যাঁ, তফাৎ এটুকু অবশ্যই ছিল যে যখন আসতে-যেতে ট্রেনে দু হপ্তা লেগে যেত, তখন গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতেই শুধু বাড়ির মুখ দেখা যেত।

১২ মার্চে আমি ইউনিভার্সিটি গেলাম। সেদিন তিনটের সময় প্রাচ্য-বিভাগের মজদুর সভার বৈঠক হলো। লেকচারার (দোৎসেন্ত), প্রফেসর আর অকাদেমিক যে সভার সদস্য তাকে মজদুর সভা বলাটা কি হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়? আসলে মজদুর শব্দের মূল্য ওই দেশে খুব বেড়ে গেছে। ওটা অপমান না, সম্মানের পরিচায়ক। অধ্যাপকরা পড়ানোর

[১] *লেখক এখানে একটি প্রচলিত লোককথা (চিড়িয়াঁ খেত চুন গঈ থী) ব্যবহার করেছেন, যার আক্ষরিক অর্থ, পাখিরা খেতের শস্য খেয়ে গেছে।*—স·ম·

অসুবিধের ওপর ভাষণ দিলেন। তারপর কিছু প্রশ্নোত্তর চলল, পদাধিকারীদের নির্বাচন হলো এবং সভা ভেঙে দেওয়া হলো।

বছরের শেষ থেকেই এখন মধ্য-এশিয়া যাবার চিন্তায় ছিলাম। আমার মস্কোর বন্ধু এর জন্য চেষ্টা করছিলেন। কখনো ওঁর আশাব্যঞ্জক চিঠি আসে আবার কখনও নিরাশাব্যঞ্জক। এক বিদেশীর সোভিয়েতের এই দূরবর্তী অংশে যাবার অনুমতি দেওয়াটা বৈদেশিক মন্ত্রালয়ের হাতে। তুর্কমানিয়ার প্রফেসরের কথানুসারে আমি চাইছিলাম যে গরমের আগেই যাতে আমার যাত্রা শেষ হয়, তাই মার্চেই চলে যাব কিন্তু ১৩ মার্চ জানতে পারলাম যে এপ্রিলেই হয়তো যাত্রা করতে হবে।

১৭ মার্চের খবরের কাগজে পড়লাম, এখন থেকে সোভিয়েতের মন্ত্রীদের বলশেভিক বিপ্লবের সময় থেকে চলে আসা পদের নাম 'জন-কমীসর' না থেকে 'মন্ত্রী' (মিনিস্টার) হবে। মন্ত্রী শব্দ সারা দুনিয়ায় চলে, কিন্তু 'জন-কমীসর' বললে বাইরের লোকদের বুঝতে অসুবিধে হয়, তাই সোভিয়েত এই নতুন ব্যবস্থা করেছে।

তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি মস্কো যাওয়া ঠিক করলাম। ২৫ মার্চে গদিওলা সিটের ক্লাশের জন্য ২৫০ রুবল ইস্তুরিস্তকে দিয়ে এলাম। পাশেই আমি ভাবলাম ইসাই-কী-সবোর আছে, তাই আমি তাতে গিয়ে উঠলাম। সোভিয়েতের এটা সবচেয়ে বড় গির্জা যাকে মিউজিয়ম পরিণত করা হয়েছে। এর আগের যাত্রায় এর ভেতর ঢুকে দেখে ফেলেছিলাম। এখন দর্শকদের জন্য খোলা ছিল না, তাই উঁচু ছাদে চড়ে নগর পরিদর্শন করেই সন্তুষ্ট থাকলাম। ছাদে এসে আশেপাশের চারতলা অট্টালিকাও খুব নিচু বলে মনে হচ্ছিল। ছাদে আর রাস্তায় সাদা বরফের চাদর পড়ে ছিল। নেবাও সাদা চাদরে জড়িয়ে এঁকেবেঁকে শুয়ে ছিল। আমাদের বিভাগের সহাধ্যাপিকা দীনা মার্কোভনা ইস্তেরাস্ত (এম· এ·) ছিল। সে প্রেম চন্দের 'সপ্তরোজ' এর ওপর কন্দীদাতের (ডক্টরেট-প্রার্থী) জন্য নিবন্ধ লিখে ফেলতে চাইছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় বই ছিল না। বস্তুত, গত ২০ বছরে হয়তো কোনো হিন্দি বই-ই লেনিনগ্রাদে পৌঁছয়নি। সে 'সপ্তসরোজ'-কে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিল। প্রবচনপূর্ণ ভাষাকে শুধু শব্দকোষের সাহায্যে বোঝা যায় না, এর উদাহরণ ওর অনুবাদের কয়েক জায়গায় পাওয়া গেল। প্রশংসা করতে হয় যে ওটাকে ও ডক্টর বরান্নিকোফকেও দেখিয়েছিল।

মস্কোতে সওয়া মাস

২৬ মার্চে ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটির কাগজ পেয়ে গেলাম। খরচের জন্য কিছু অগ্রিম টাকা-পয়সা নিতে চাইছিলাম, কিন্তু কার্যালয়ে ভিড় ছিল, তাই না নিয়েই চলে গেলাম। ইস্তুরিস্ত লালতারা ট্রেনে সিট রিজার্ভ করে দিয়েছিল। না, গদিওলা সিট পাওয়া যায়নি।

১৭৫ রুবলে বিনা গদিওলা শক্ত সিট ছিল, যার ওপর পাতার জন্য চাদর আর গদি ওই পয়সা থেকেই দেওয়া হতো, তাই এতেও গদিওলা সিটের মতই আরাম ছিল। সওয়া পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরোলাম। লোলা কোনো কাজই ঠিক সময়ে করতে শেখেনি। আমার তো ভয় হচ্ছিল যে ট্রেন আবার না চলে যায়। বাড়ির পাশ থেকেই ট্রাম ধরলাম। তিনটে স্টপ যেতে না যেতেই ও থপ করে বসে গেল। ভাগ্যিস পাশ দিয়ে একটা মোটর-ট্রাক যাচ্ছিল। তার ড্রাইভার দয়া করে স্টেশন অব্দি পৌঁছে দিল। আমি আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেলাম। ট্রেন সাতটার সময় ছাড়ার কথা। জেনে নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নিলাম।

আমার কম্পার্টমেন্টে ইন্তুরিস্তের এক কর্মচারীও যাচ্ছিল। সে ইংরেজি জানত কিন্তু এখন ভাষার অতটা অসুবিধে ছিল না। ওর কাছে কিছু আমেরিকার খবরের কাগজ ছিল। আমি তো পুরো সময়টা ওই খবরের কাগজ বাছতে লাগলাম। এই শক্ত ক্লাসটাও নরম দ্বিতীয় ক্লাশের মতনই ছিল। গদি না থাকলেও লম্ফ আর অন্যান্য জিনিস ছিল। পুরো সিট পেলে সোভিয়েতে দূরপাল্লার যাত্রীদের ভিড়ের ভয় থাকে না।

২৭ মার্চ সকালে যখন আমি গাড়ির বাইরেটা দেখলাম, তখন সাদা বরফে ঢাকা উঁচু-নিচু জমিতে যেখানে-সেখানে সদা সবুজ দেবদারু দেখা যাচ্ছিল। ট্রেনের প্রত্যেক কামরায় একটা কন্ডাক্টর থাকে, যার কাজ বিছানা ঠিক করা আর কামরা সাফাই করাই শুধু যথেষ্ট নয়, বরং ও গরম চাও দেয়।

চা থেকে আমি নিবৃত্ত হয়েছি। ট্রেন ঠিক এগারোটায় মস্কো পৌঁছলো। ইন্তুরিস্তকে খবর দেওয়া হয়েছিল আর ভোক্স তো আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করতেই যাচ্ছিল। দুজনেরই লোক স্টেশনে নিতে এসেছিল। কিন্তু বিশাল স্টেশনে আমায় খুঁজে পায়নি। আমার কাছে সামান্য জিনিসপত্র ছিল, যার জন্য ভারবাহকের দরকার ছিল না, আর ভাষারও অসুবিধে মিটে গিয়েছিল। তার ওপর আগেও এক পক্ষ মস্কো থেকে গিয়েছিলাম। আমি মেট্রো (ভূগর্ভ রেল) ধরলাম আর মস্কো হোটেলের কাছে নেমে তার পাশেই একটা পুরনো ও ভালো ন্যাশনাল হোটেলে পৌঁছলাম। ন্যাশনাল হোটেল জারের রাজত্বের যুগেও খুব বিখ্যাত হোটেল ছিল। ক্রেমলিন ওর খুব কাছে। কামরার ব্যবস্থা করতে ইন্তুরিস্ত-এর লোকেদেরর বলা হয়নি। তাই তিন ঘণ্টা অফিসে বসে থাকতে হলো, তারপর ২৪০ নম্বর কামরা পাওয়া গেল। ভোক্স-এর লোকেরাও এসেছিল; ওরা বলল, 'যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করে দেব, শুধু বিদেশ মন্ত্রীর আজ্ঞাটুকু প্রয়োজন।' ঠিক হলো পরের দিন আবেদন-পত্র দেওয়া হবে। সেদিন তো এতটা আশান্বিত হলাম যে মনে হলো ১৫ এপ্রিলের মধ্যে আমরা অশখাবাদ পৌঁছে যাব।

ইন্তুরিস্তের অফিস থেকে ইংরেজি খবরের কাগজ পাওয়া গেল। জানতে পারলাম, লর্ড পৈথিক লরেন্স, স্টুফোর্ড ক্রিপস আর আলেকজান্ডার তিন ব্রিটিশ মন্ত্রী বোঝাপড়া করার জন্য ভারতে গিয়েছিল। কথাবার্তা চলছে, বোঝাপড়া হয়ে যাবার আশা আছে। লেনিনগ্রাদে বেশির ভাগ রুশ খবরের কাগজ। বিদেশী সংবাদের জন্য রেডিওর ওপরেই নির্ভর করতে হতো, তাতে ভারতের খবর কখনও কখনও হয়তো বেরতো। বোঝাপড়ার ব্যাপারকে ওখানকার লোক গুরুত্ব দিত না। ওখানকারের রাজনীতিকদেরও বিশ্বাস ছিল

যে ভারতের অবস্থার পরিবর্তন হবে না। মজদুর-পার্টি অতোটাই সাম্রাজ্যবাদী, যতটা ট্যোরি-পার্টি। ওদের মত আমি মনে করতাম, যে ইংরেজ খুশি হয়ে দানের রীতিতে ভারতকে স্বাধীনতা দান করবে না, কিন্তু আঙুলে ধরিয়ে দিলে ও যে পৌঁছে গেছে তাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ভারতে স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ যে শক্তির জন্ম হয়ে গেছে, সেগুলো ইংরেজদের উদ্দেশ্যকে সফল হতে দেবে না।

প্রথম কথাবার্তা থেকে এটুকু তো বোঝা গিয়েছিল, যে তিন হপ্তা মস্কোতে থাকতে হবে। এখানে কাজের ওই সব বইই নিঃসন্দেহে পাওয়া যেত, যেগুলো আমি নিজের চেষ্টায় খোঁজাখুঁজি করে যেখান-সেখান থেকে কিনতে পারতাম। তবে সংবাদপত্র সব রকমের পাওয়া যেত। ব্রিটিশ দূতবাসের সঙ্গে আমি বিশেষ যোগাযোগ রাখতে চাইতাম না। ব্রিটিশ প্রজা হবার কারণে ওদের খবরের কাগজও আমার কাছে পৌঁছতো আর আমার নাম ওখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। ওখান থেকেও কিছু টাটকা খবরের কাগজ পেতে পারতাম। একবারই দূতাবাসের এক কর্মচারী কিছু পাঠ্য-সামগ্রী দিয়েছিল, সেই কর্মচারী এই হোটেলেই থাকত।

২৮ মার্চে বসে থাকতে থাকতে আমি ভাবলাম—চলো, মস্কোও এখন ঘুরে আসি আর মায়ার সঙ্গে দেখাও করে আসি। মায়া খুব দূরে শহরের এক প্রান্তে থাকত। ওর কলেজ খুঁজে বার করতে বহু সময়ের দরকার ছিল। সকালে দত্তভাইকে খুঁজতে বেরোলাম, কিন্তু তাঁর জায়গাটা পাওয়া গেল না। ট্রামে আর হেঁটে ঘোরাফেরা করতে করতে অনেকক্ষণ বাদে শেষমেশ ওই ছাত্রাবাসে পৌঁছলাম, যেখানে মায়া থাকত। ও পড়তে গিয়েছিল, তাই আমার কার্ড আর ঠিকানা রেখে এলাম। লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কোয় শীত কম, সেটা আজকের ঘোরা-ফেরায় বুঝলাম। লেনিনগ্রাদের নেবা যেখানে সাদা চাদর ঢাকা নিয়ে এখন ওঠার নাম করে না, সেখানে মস্কো নদী মুক্ত প্রবাহে বহে চলছিল। নগরে যেখানে-সেখানে এখনো বরফ ছিল—তবে সেইসব জায়গায় যেখানে দিনে অনেকক্ষণ ধরে ছায়া থাকে।

ওই দিনের কথাবার্তা থেকে তো বুঝতে পারলাম, যে হয়তো পয়লা বা দোসরা এপ্রিলেই অশখাবাদ পৌঁছে যাব। আমাদের কাছে ওখানকার জন্য যথেষ্ট কাপড়-চোপড় ছিল না। ভোক্স বলল যে তারা এখান থেকেই তৈরি করিয়ে দেবে।

২৮ মার্চে কিছু বরফ পড়ল, পড়েই গলে গেল। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ সব বরফ গলে যাবারই সম্ভাবনা ছিল।

এবার দত্ত ভাই-এর বাড়িতে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করতে থাকলাম। সে এই সময় বাইরে ছিল না—নগরেই আমাদের কাছ থেকে চার-পাঁচ ফার্লং-এর মধ্যেই থাকত।

৩০ মার্চে 'লালসেনা সামূহিক নাট্য মন্দির'-এ গেলাম। মস্কোর এটা সবচেয়ে বড় রঙ্গশালা। খুব ভিড় ছিল। লোকেরা একটা টিকিটের জন্য ৩০ রুবল (২০ টাকা) দিতে হাসিমুখে রাজি ছিল। আজ প্রোগ্রাম ছিল গণসঙ্গীতের, কিন্তু সেটা পড়ে গিয়েছিল ওস্তাদদের হাতে, আর ওরা তার সর্বনাশ করছিল। তবে হ্যাঁ, রুশ আর কসাক নৃত্য খুব সুন্দর ছিল।

—১৯৪৬—

পরের দিন (৩১ মার্চ) লেনিনের সমাধি দেখতে গেলাম। সামনে দিয়ে তো না জানি কতবার গেছি, কিন্তু সময় নির্দিষ্ট এবং তাও আবার কম থাকায় আর দর্শনার্থীদের ভিড় দেখে লাইনে দাঁড়াবার সাহস হতো না। আজ মনস্থির করে ফেললাম যে দর্শন করেই যাব।

লাইন দুটো ছিল। আমাকে অনেকটা দূরে দাঁড়াতে হলো, কিন্তু দরজা খুলতেই লোকেরা তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল। দশ মিনিট বাদেই আমিও সমাধির ভেতর চলে গেলাম। সমাধি লাল পাথরের, পালিশের জন্য ঝকঝক করছিল। এটা লাল ময়দানের একদিকে। উৎসবের সময় তার ছাদ নেতাদের দাঁড়িয়ে থাকার মঞ্চের কাজ দেয়। সেটা বাইরে থেকে দেখলে খুব ছোট বলে মনে হয় কিন্তু তত ছোট নয়। আবার যতখানি মাটির থেকে ওপরে, নীচেও ওর থেকে কম নয়। লেনিনের শরীর একটা কাঁচের খোলের ভেতর রাখা আছে। কাঁচটা এত পরিষ্কার যে দৃষ্টি একটুও বাধা দেয় না। মাংস শুকিয়ে যাওয়ায় শরীর ছোট হয়ে গেছে—এমনিতে লেনিন বেঁটেও ছিলেন। মুখের রঙ আগের মতোই আছে, চোখ বসে গেছে, দাড়ি ওইরকম ছোট্ট একটু দেখা যায়। সামনে আসতেই লোকেরা টুপি খুলে ফেলে। লেনিন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। এতে কি কারো সন্দেহ আছে? যদি দুনিয়ার পরিবর্তন ধরে মহান পুরুষদের শক্তি মাপা যায়, তাহলে লেনিনের মত পরিবর্তন দুনিয়ায় আজ অব্দি কে করেছেন? এটা ঠিকই যে লেনিন নিজেকে মার্কস-এর শিষ্য বলেই মানতেন, আর এটাও নিশ্চিত যে রাস্তা দেখানো, সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করার একমাত্র লোক কার্ল মার্কসই ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের সিদ্ধান্তকে ব্যবহারযোগ্য করা আরো শক্ত, যাকে ব্যবহারে এনে লেনিন সাম্যবাদকে ভূ-পৃষ্ঠে সাকার রূপে দাঁড় করালেন। লেনিন সাম্যবাদকে নিজের চোখে ফুল-ফল ধরতে দেখেননি, কিন্তু সেটা তাঁর সময়েই দৃঢ় মূলবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার সমস্ত বড় শক্তি একসঙ্গে লেগে পড়ে তাকে উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চার বছর ধরে করতে থাকে কিন্তু সেটা উপড়ে আসার বদলে আরো মজবুত হতে থাকে। লেনিনের সম্বন্ধে বলা হয়, বিপ্লবের দুরূহ সমস্যা প্রবাহে তিনি ওই রকম সরলভাবেই সাঁতার কাটেন, যেরকম জলে সাঁতার কাটে মাছ। মানবতাব উৎকর্ষে যে মহাপুরুষের এত বড় হাত আছে, তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সময় আমার মনে বহু রকমের অদ্ভুত চিন্তা কেন-ই বা হবে না? সেইমৃত শরীর এখন নীরব, নিজের সিংহনাদে শত্রুর মনকে আর টলাতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি যে কাজ করেছেন এবং তাঁর লেখ মানবতার জন্য যে পথ দেখিয়েছে, তা এত মূল্যবান যে একজন ঘোর বস্তুবাদীও তাঁর সামনে গিয়ে শ্রদ্ধায় একেবারে গলে যায়। একরাস্তা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে আমিও লোকেদের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। সামনে লাল ময়দান খালি পড়ে ছিল।

২ এপ্রিল এল। আমি আজ মস্কো ইউনিভার্সিটির নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা দেখতে চাইলাম। এর 'ভাই'কে লেনিনগ্রাদে দেখা হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের কারণে প্রদর্শনীয় জিনিস সুরক্ষিত স্থানে পাঠানো হয়েছিল এবং এখন সেগুলোকে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে সাজানো হচ্ছিল। এখন মিউজিয়মের একটা ঘরই খোলা ছিল। তখন পর্যন্ত যুদ্ধ থামা ১১ মাসই হয়েছিল। আমি তো যুদ্ধ থামার ২৭ মাস বাদে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের একটা

হলঘরকে সাজানো অবস্থায় দেখেছিলাম। আর যে-গতিতে সাজানো হচ্ছিল, তাতে এখন বছর ঘুরতেই পুরো মিউজিয়ম খুলে যাবার আশা ছিল। এখানে নকশা টাঙানো ছিল, যার থেকে মনুষ্য জাতির বংশের ক্রমিক উত্তরণকে দেখা যেতো। মনুষ্যের মস্তিষ্কই সেই জিনিস, যার কারণে সে প্রাণী জগতে সবার থেকে উঁচুতে উঠেছিল। নিজের শরীরের অনুপাতে মানুষের যতটা মস্তিষ্ক আছে, অতটা কোনো জন্তুর নেই, সেটা নকশায় দেখানো হয়েছিল—মানুষের কপালে কতখানি ফাঁকা জায়গা আছে, তার পা এবং হাতের পাঞ্জায় অন্য প্রাণীদের থেকে কি তফাৎ, নেঅন্ডর্থল, ক্রোময়ো আর আজকের সপিয়ন মানুষের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে কি তফাৎ আছে। আমি ওখান থেকে প্রোফেসরের সঙ্গে শকসিথিয়ন জাতির সম্বন্ধে কথাবার্তা বললাম এবং নিজের মতামতও প্রকাশ করলাম। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন এবং বললেন যে ডাক্তার তালস্তোফ এখন এখানেই, যাকে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হয়।

সন্ধেবেলা 'রোমান তিয়াত্র'তে সিগানুচ্‌কা (রোমনী) নাটক দেখতে গেলাম। রোমনী হচ্ছে আমাদের এখানকার সেইসব যাযাবরদের বংশধর, যারা আজও তাদের ঘরের ছাউনি বা তাঁবু নিয়ে ভারতের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কাজেই বলা যায়, আমি আমার ভাই-বন্ধুদের নাট্যশালাতেই গিয়েছিলাম। এর জন্য সেখানে যাবার সময় আমার মনে যদি বিশেষ কোনো ভাবের উদ্রেক হয়ে থাকে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

এটা ছোট একটা নাট্যশালা, যা পনের বছর আগেই স্থাপিত হয়েছিল। তাই অভিনয় খুবই প্রভাবশালী ছিল, যা বললে পরে আমাকে আমার আত্মীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। আমার ইচ্ছেও ছিল যে সিগান ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু তারও আগে তো নাটকটা দেখার ছিল। যে রকম ছোটমত নাট্যশালা ছিল, ঠিক তেমনি ছোট ছিল তার রঙ্গমঞ্চ এবং নট-মণ্ডলীও। কিন্তু তাকে আমরা তার আকার-প্রকার দিয়ে মাপতে পারতাম না। গল্পটা ছিল—স্পেনের এক সামন্ত (ঠাকুর) একটি যুবতী সিগান মেয়ের প্রেমে পড়ল। নাচ-গান করাটাও সিগানদের একটা জীবিকা। সেইসূত্রে সিগানুচ্‌কা (সিগান-কন্যা)-র কলাতে নিপুণ হয়ে ওঠা কোনো অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। সে খুব সুন্দরী ছিল। সিগানুচকাও ঠাকুর যুবকের প্রেমের প্রতিদান দিতে রাজি ছিল। কিন্তু তখনই দেবে যখন সেও সিগান হয়ে যাবে। যুবক রাজি হয়ে গেল। তার সামন্তের পোশাক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, সিগানের ময়লা কোঁচকানো বাজে পোশাক ধারণ করল, আর সে তাঁবুর জীবন আরম্ভ করে এক নগর থেকে অন্য নগর, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরতে লাগল। ধীরে ধীরে যাযাবর হয়ে ঘোরা, নাচ, ঘোড়া বেচার ব্যবসাও শিখে গেল। সে এই ভাবেই ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিল। এবার অন্য এক সামন্ত-কন্যা যুবকের প্রেমে পড়ল। যুবক তাকে প্রত্যাখান করল। কন্যা তাঁর পুঁটলিতে জিনিস রেখে চুরির বদনাম দিল। প্রায় জেলে পাঠিয়ে দেবার উপক্রম। এমন সময় এক ক্যাপ্টেন এল। সিগানদের ইউরোপের দলিত-অচ্ছুত বলে মনে করা হয়, তাই যদি কখনও চারটে গালিও খায় তাতেও তারা খুশি থাকাই ভালো বলে মান করে। ক্যাপ্টেনও এই সিগান যুবককে ওই

রকমই ভেবেছিল। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাল। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ লড়তে অস্বীকার করা উনবিংশ খ্রীস্টাব্দের ইউরোপেও সবচেয়ে অপমানজনক বলে মনে করা হতো। একে বীরত্ব শিক্ষার সুন্দর পাঠ মনে করে ইউরোপের লোকেরা আজ অব্দি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সিগান যুবক ক্যাপ্টেনকে মেরে ফেলল। যুবকের ওপর হত্যার মোকদ্দমা চলল। বিচারপতি মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিল। সিগানুচ্‌কা নিজের প্রেমিকের জন্য বিচারপতির সামনে কাঁদতে থাকল। তার পত্নীর হাতে পায়ে পড়তে লাগল। পত্নীও অনুনয়-বিনয় করল, কিন্তু সিগান যুবক যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছিল! সে অভিজাত শ্রেণীর সামন্ত যুবককে মেরে ফেলেছিল। ওকে কি করে সাধারণ দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়? এই সময়েই এক সিগান বৃদ্ধা বাচ্চার একটা অলংকার সামনে রাখল। বিচারপতির পত্নী সেটা দেখে তখুনি চিনে ফেলল—'এ তো ১২ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া আমার মেয়ের গয়না!' পত্নী বলল, 'যদি তুই এই মেয়েকে আনিস, তাহলে আমি সিগান যুবককে মুক্ত করিয়ে দেব।' মেয়েকে আনা হলো, কিন্তু মেয়ে তার মাকে স্বীকার করতে চাইল না, অথচ গয়না তো বলেই দিয়েছিল। তাই মা-বাবা তাদের মেয়ের গলা জড়িয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগল। তাদের মেয়ের জীবনের ধনকে কিভাবে এখন ফাঁসি কাঠে ঝোলাবে? যুবককে মুক্ত করে দেওয়া হলো। কিন্তু বাবা-মা চাইছিল না যে ওদের মেয়ে সিগানদের জীবন কাটাক। ওরা এতেও রাজি ছিল না যে তাদের মেয়ের বিয়ে কোনো সিগানের সঙ্গে হোক। শেষে মেয়েটি পর্দা খুলে দেয়—আসলে সিগান নয়। দুপক্ষের মা-বাবা খুব খুশি। সিগান কিছুদিন অব্দি বিয়ের আনন্দে সব কিছু ভুলে যায় কিন্তু ওর তো কোনো এক জায়গায় না থাকার অভিশাপ আছে। সে নিজের ডেরা উপড়ে তুলে ফেলে। সিগানুচকা আর ওর পতি চোখের জল ফেলে। শুধু এতদিনকার বন্ধুদের বিচ্ছেদের জন্যেই নয়, সেইসঙ্গে সিগানদের মুক্ত জীবনও ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে।

নাট্যশালার পর্দার ওপরেও সিগানদের বিশেষ চিহ্ন টাকার মালা যেখানে-সেখানে লাগানো ছিল। নাটকের ভাষা ছিল রুশ, কিন্তু সমস্ত সজ্জা সিগানদের মত। মাঝে মাঝে সিগানদের বৈশিষ্ট্যকে দেখানোর জন্য কিছু কিছু রোমনী শব্দও এসে পড়ছিল, আর সঙ্গীত তো সম্পূর্ণই ছিল রোমনী। আমি বিশ্রামের সময় তিয়াত্র-এর সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা জানতে চাইলাম। নাটকের সমাপ্তির পর সেক্রেটারি অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। যদিও তারা সবাই সেক্রেটারির মত শিক্ষিত, কিন্তু ওদের মধ্যে খুব কম লোকই জানত যে, তারা হিন্দু। সেক্রেটারি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি।' সবাই আবার দেখা করার জন্য অনুরোধ করল। আমি বললাম, 'অন্য নাটক হবার সময় আমি আবার আসব।'

লেনিনগ্রাদে বইপত্রে ডুবে থাকতাম। এখানে তার অত সুবিধে ছিল না। আর আমি তা চাইতাম না। আমি বেশির ভাগ মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধীয় সাহিত্য পড়তে এবং স্থান ও সংস্থা পরিদর্শনের কাজে লেগে থাকতাম। ভোক্‌সের দিক থেকে কখনো খবর আসত যে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, আবার কখনো সন্দেহে প্রকাশ করা হতো। বস্তুত সোভিয়েত-শাসনে যদি কোনো বড় দোষ থাকে, তো সেটা হলো যে সন্দেহের মাত্রা

ওখানে চরম সীমা অব্দি পৌঁছেছে। আমার মধ্য-এশিয়া যাবার অনুজ্ঞাপত্র মেলেনি। এর কোনো কারণ ছিল না। সেখানকার পার্টির লোকেরা চাইছিল, ভোক্‌স সংস্থাও হরেক রকম সাহায্য দিতে তৈরি ছিল, কিন্তু বিদেশ-বিভাগ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছিল না।

আমার হোটেলের পাশেই একটা মিউজিয়ম ছিল, যার মধ্যে একটা ছিল ইতিহাস-মিউজিয়ম। এখানে পুরনো-প্রস্তর যুগ এবং নতুন-প্রস্তর যুগেরও সামগ্রী ছিল, হাতের লেখার খুব ভালো সংগ্রহ ছিল, শকদেরও কিছু জিনিস ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ছিল গ্রিক ভাষায়, যেটা নবম শতাব্দীতে চরম পত্রে লেখা ছিল। দেখতে সেটা হলুদ হয়ে যাওয়া সাদা কাগজের মত মনে হচ্ছিল। রুশ ভাষাতেও কত পুরনো বই ছিল, আর সবার আগে ছাপা বই-এরও ভালো সংগ্রহ ছিল, কিন্তু আমি তো জপ করছিলাম মধ্য-এশিয়ার মালা—লিখতে যদি হয় তো লিখব তার ইতিহাস আর দেখতে যদি হয় তো দেখব তার দেশ।

রাতে (৩ এপ্রিল) বোল্‌শোয় তিয়াত্র (মহানাট্যশালা)-তে ব্যালে দেখতে গেলাম। মারিন্সী থিয়েটারের মতই এরও ইমারত, কিন্তু এটা তার থেকেও বড়। ব্যালে খুব আকর্ষণীয় ছিল। গৃহকর্ত্রীর মেয়ে আর কিশোরী ঝি। ঝি ছিল বেশি সুন্দর নিপুণ। তাকে দেখে গৃহকর্ত্রীর নিজের মেয়ে হীনতা বোধ করত। তারপর সে চণ্ডিকা রূপ ধারণ করে ঝি-এর জীবন কষ্টকর করতে নেমে পড়ল। কিশোরী নিজের ভাগ্য আর জন্মকে দোষ দিয়ে দিন কাটাতে লাগল। একদিন বাড়িতে এক ভিখারিনী এল। সাধারণ ভিখারিনী খুশি হয়ে তার আসল রূপ দেখিয়ে দিল। সে তো পরীদের দেশের অপ্সরা ছিল। সে কিশোরীকে নিয়ে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর নাচ দেখাল। দেখে কিশোরীও বিহ্বল হয়ে গেল, সেও সুন্দর নাচ নাচল। কিছু দিন বাদে কিশোরীর প্রতি এক রাজপুত্রের প্রেম হলো, কিন্তু কিশোরী রাজপুত্র শ্রেণীর প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, তাই ও বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। রাজকুমার তাকে দেশে-বিদেশে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। ব্যালের মানে হলো, মূক-অভিনয়, তাই রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশেষত্ব দেখাতে সেখানকার বেশভূষা, বাদ্য আর নৃত্য ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। রাজকুমার এই ভ্রমণে উজবেক, আফ্রিকার বন্ধুদের দেশে আর না জানি কোন কোন জাতির দেশে গেল। শেষে কিশোরীকে তার পুরনো মালকিনের বাড়িতেই পাওয়া গেল। নাটকটি মিলনান্তক ছিল।

বলশয় থিয়েটার সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গশালা। এর নাম বলশেভিকরা দেয়নি, বরং রঙ্গশালা মহান হবার কারণেই তার এই নাম হয়েছিল। এর টিকিট পাওয়া দুর্লভ আর আমি তো জায়গাও পেয়েছিলাম—প্রথমসারিতে মঞ্চের একদম কাছে। অভিনেতা আর অভিনেত্রীরা প্রায় দুশোজন ছিল। তাদের অভিনয় আর নাচ অবাক করে দিয়েছিল। দৃশ্য রচনা আরো বেশি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। অন্ধকার রাতে তারা চমকাতে দেখে কারো সন্দেহ হতে পারে না যে এটা সত্যিকারের তারকাখচিত রাত নয়। রঙ্গমঞ্চের সীমিত জায়গায় ছিল মাইলকে মাইল জঙ্গল, পর্বতমালা, নদীর দৃশ্য। কিন্তু সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চে পুরনো কৌশলের সঙ্গে সঙ্গেই এখন আধুনিক কৌশলও ব্যবহার করা হয়, তার জন্য গোপনে কিছু যন্ত্রও কাজে লাগানো হয়।

পরের দিন (৪ এপ্রিল) দত্তভাই-এর বাড়ি গেলাম। সেখানে তার চতুর্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। এদের ইউনিভার্সিটির পড়া ছিল না, যেখানে চলে আসা পুরনো পরম্পরাকে মেনে চলতে সংস্কৃত পাঠ জরুরি ছিল। এই মেয়েরা কেবল উর্দু-হিন্দি পড়ত। এরা যথেষ্ট জ্ঞান রাখত। আমার বিশ্বাস, যদি ভারতে ৬ মাস থাকার সুযোগ পায়, তাহলে এরা শুদ্ধ ভাষা বলতে আরম্ভ করবে। হিন্দি বই আর খবরের কাগজের আকাল নিয়ে এদের অভিযোগ ছিল। আসলে যারা এই ব্যাপারে আগ্রহী, তারা তো লন্ডনে যায় না, তা না হলে ওখান থেকেও কত বই যোগাড় করতে পারত। ভারতের সঙ্গে গোয়েন্দা-নিয়োজনের সম্বন্ধ স্থাপিত হবার পর সে অভাব হবে না, এটা আমার বিশ্বাস।

সন্ধেবেলা কেন্দ্রীয় লাল সেনা থিয়েটারে 'কতুজোফ' ফিল্ম দেখতে গেলাম। বাস্তববাদে সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চ চরম সীমায় পৌঁছেছিল। কতুজোফ রুশ সেনাপতি ছিল, যে নেপোলিয়ানকে খুব দুর্গতির সঙ্গে রাশিয়ার বাইরে খেদিয়েছিল। এই নাটকে নেপোলিয়নের সমকালীন রাশিয়ার চিত্রণ ছিল। সৈনিক আর সেনাপতি, নাগরিক আর গ্রামীণদের ঠিক ওই সময়ের পোশাক, ওই সময়েরই অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। কোথাও ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক ভুল-ভ্রান্তি আসতে দেওয়া হয়নি। এমন কি সমকালীন ছবিগুলিতে নেপোলিয়ন আর কতুজোফের মুখ যেরকম দেখা যায়, তাদের পার্ট যে অভিনেতারা করছে তাদেরও ওইরকম চেহারা বানানো হয়েছিল। কতুজোফ এক চোখে কানা ছিল, তাই অভিনেতা নিজের অভিনয়ের সময়টা এক চোখ বন্ধ করে কানা হয়ে রইল। এই ফিল্মে একটাও স্ত্রী-চরিত্র ছিল না। হয়তো তাই এই বিশাল ঘরের ১০ শতাংশ সিট খালি ছিল। শীতের হিমাচ্ছাদিত ভূমি, পাহাড়, দূর দূর অব্দি অবস্থিত গ্রাম, দেবদারু আর ভূর্জবৃক্ষ শুধু নয়, উপরন্তু বড় বড় তুলোর গোলার মত পড়া বরফ, আর সাঁই-সাঁই করে ছোটা ঝড়-ঝঞ্ঝাকেও এই ফিল্মে দেখানো হয়েছে। কথোপকথনে আরো মাৎ করে ছিল। নেপোলিয়নের হয়রানি আর কষ্ট দেখানো হয়েছে, কিন্তু কোথাও তার অহংকারী চেহারাকে দীন হতে দেওয়া হয়নি। দর্শকদের মধ্যে লাল সৈনিকদের সংখ্যা অনেক ছিল।

৬ এপ্রিলে আবার বলশয় থিয়েটারে 'যুগে......ওনেগিন' অপেরা দেখতে গেলাম। বলশয় থিয়েটারে অভিনয়, মহান শিল্পী চেকোপস্কীর কৃতি আর তাঁর সাজ-সজ্জা ও প্রস্তুতির ব্যাপারে বলার কি আছে? কিন্তু এটা ছিল অপেরা, যাতে সমস্ত কথোপকথন পদ্যে হয় আর তার ওপর শ্রোতা যদি কণ্ঠস্বরে আগে থেকেই দীক্ষিত ও অভ্যস্ত না থাকে, তাহলে সে আমার মত কান ফাটানো চিৎকার ছাড়া অন্য কিছু বুঝবে না। দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর করে বানানো হয়েছিল। পোশাক দেশ-কাল ও পাত্রের উপযুক্ত ছিল। নাচ বা অন্যান্য ব্যাপার ত্রুটিহীন ছিল, কিন্তু সেই অস্বাভাবিক পদ্যময় বার্তালাপ আমাকে এমন অসহায় করল, যে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হতেই সেখান থেকে হাঁটা দিই। আজ আবার সামান্য একটু জ্বরও হয়েছিল, হয়তো এটাও কিছুটা অসহিষ্ণুতার কারণ হবে। আমি এই নাট্যশালার দুটো টিকিট পেয়েছিলাম, সেটা খুব সৌভাগ্য বলতে হবে। একটা টিকিট তো আমি আগেই নিজের হোটেলের একটি লোককে দিয়েছিলাম। অন্য টিকিটটা বাইরে

বেরিয়েই এক যুবককে দিয়ে দিলাম। অনেক টিকিট না পাওয়া লোক আশা নিয়ে বলশয় থিয়েটারের বাইরে ঘুরে বেড়ায়। যুবক কিছু টাকা দিতে চাইছিল, আমি বললাম, 'না, তুমি গিয়ে দেখো।'

মনে হচ্ছে, শরীরে আস্তে আস্তে একটু বৈগুণ্য দেখা দিচ্ছে, যা কোনো অসুখের রূপ নিতে চায়। হালকা জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা আর মাথা ঘোরা দেখে ১০ এপ্রিলে মনে হলো যে হাসপাতাল যাওয়া দরকার। এক ঢিলে দুই পাখি[১]—চিকিৎসাও হয়ে যাবে, আর সোভিয়েত চিকিৎসালয়ও দেখে নেব।

১১ এপ্রিল এক বৃদ্ধ ডাক্তার এসে দেখলেন। বিপ্লবের আগে তিনি ধনাঢ্য ও অভিজাত কুলীন পুরুষ ছিলেন। বলশেভিকদের তেজ সহ্য করার জন্য দরকারী আদর্শবাদ বড়বড় চুমুক দিয়ে খাননি, তাহলে তিনি কি করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? আজ তাঁর লেখা ওষুধ খেলাম, আর হাসপাতাল যেতে পারলাম না।

১২ এপ্রিলে তো জ্বর ছিল না কিন্তু পেটও পরিষ্কার ছিল না। অসুখ ছিল। আবার পড়াশুনোও ছাড়া যায় না। সন্ধেবেলা এক বিখ্যাত ডাক্তার এলেন। তিনি দেখলেন. আমিও কিছু বললাম, হাসপাতাল যাওয়া ঠিক হয়ে গেল।

সোভিয়েত হাসপাতালে

পরের দিন প্রায় একটা নাগাদ শহর থেকে দূরে এয়ারোড্রোমের কাছে মোটর আমাকে বলশেভিক হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেল। হাসপাতাল কি, একে একটা পুরো পাড়া বলা চলে। বোৎকিন নামে এক নামকরা ডাক্তার ছিলেন, যার নাম এই সংস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে আমি বলেছিলাম যে ১৯২৪-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বছরখানেক ধরে আমার ক্রনিক ডিসেন্ট্রি হয়েছিল. তারপর গত বছর ইরানে সন্দেহ হলো। এই সন্দেহেই আমায় ছোঁয়াচে অসুখের বাক্সে (ঘরে) রাখা হয়েছিল। ঘরটা ছোট ছিল, কিন্তু চারদিক দিয়ে পুরো দমে আলো আসার জন্য শুধু কাঁচই লাগানো ছিল। ঘরটা একতলা ছিল, যাতে লোহার একটা ছোট চারপাই ছিল। প্রত্যেক রুগীর ঘর আলাদা আলাদা ছিল। ডাক্তার আর পরিচারিকা ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ভেতরে আসতে পারত না। যাত্রার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার জন্য এক উচ্চপদস্থ বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। তিনি খুব চেষ্টা করলেন কিন্তু হাসপাতালের কর্মকর্তারা অনুমতি দিলেন না—ছোঁয়াচে রোগের ওয়ার্ডে আছে। সেখানে কেউ যেতে পারবে না। এমনকি আমার

[১]*এক্ষেত্রে মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত লোককথাটি, এক পন্থ দো কাজ।*—স·ম·

কোনো ছোঁয়াচে রোগ ছিল না। ডিসেন্ট্রিও ছিল না। শুধু পুরনো রোগের সম্বন্ধে ডাক্তারের সন্দেহ ছিল। শেষে উক্ত ভদ্রলোককে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়তে হলো। সোভিয়েতে তো রাম-শ্যামকে মন্ত্রী বানিয়ে কোনো বিভাগ ধরিয়ে দেওয়া হয় না। কোনো কোনো বিভাগের মন্ত্রী এমনই লোক হয়, যে সেই বিষয়ে প্রচুর জানে ও খবর রাখে। ভারত নয় যে রাজকুমারী অমৃত কাউরকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর মৌলানাকে শিক্ষামন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দেবে। সোভিয়েতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেই হতে পারবে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান জানে। মন্ত্রী যদি সেরকম না হতো তাহলে হয়তো হাসপাতালও তার কথার পরোয়া করত না। যা হোক, কয়েক মিনিটের জন্য ওই ভদ্রলোক অনুমতি পেলেন। তাঁকে হাসপাতালের সাদা কাপড় পরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে আনা হলো এবং তিনি কথা বলে চলে গেলেন। আমার জামাকাপড়ও পাল্টানো হয়েছিল। কাপড়চোপড় সাদা ছিল, কিন্তু খুব পরিষ্কার ছিল। এখানে এখন পরীক্ষার হিড়িক লেগে গিয়েছিল।

১৩ এপ্রিল নটার আগে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম, চারদিকে সবাই নিজের নিজের কাজে লেগে গেছে। গরম জলে আমার হাত মুখ ধোয়ানো হলো। তার আগে তো জ্বর দেখা হয়েছিল। ডাক্তার পেট, বুক, ফুসফুস ইত্যাদি পরীক্ষা করল। স্বাস্থ্যের ইতিহাস লেখা হতে লাগল—১৯২৪-এ ক্রনিক লাল-ডিসেন্ট্রি ছিল। জাপান, মাঞ্চুরিয়া, রাশিয়া হয়ে ভাবতে পৌঁছনোর পর ১৯৩৫-এ দু'হপ্তা টাইফয়েডের শিকার, যাতে এক সপ্তাহ বেহুঁশ, ১৯৪১-এ কিছু মাস ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত, ১৯৪৪-এ ডিসেন্ট্রি।

মুখ-হাত ধোয়া ও বিছানা তোলার পর প্রাতরাশ এল। টোস্ট, মাখন, দুটো ডিম, দুধের লসি আর কফি। এটা প্রাতরাশ কি, ভোজনই হয়ে গেল। আবার একজন প্রোফেসর-ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন। ডাক্তারের থেকে প্রফেসর-ডাক্তারের স্থান উঁচুতে। তিনিই কোনো মেডিকেল কলেজের প্রফেসর হন। সবাই নিজের-নিজের কাজ খুব সাবধানতা আর শিষ্টতার সঙ্গে করলেন। দুটোর সময় খাওয়া আর সাতটায় ফের চায়ের দরকার হলে তাও পাওয়া যায়। এখন সকাল-সন্ধে জ্বর দেখে লেখা হচ্ছিল। শরীরের উত্তাপ নর্মাল ছিল। ওষুধও দুবার খাওয়ানো হচ্ছিল। সেই দিন দুজন প্রফেসর-ডাক্তার আর দুজন ডাক্তার দেখলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও এই ওয়ার্ডে আসত, কিন্তু আমার কাছে আসেনি।

১৪ এপ্রিল রোববার সাধারণ ছুটির দিন ছিল, তাই শুধু আমার ডাক্তার মলেরিনা এলেন। রক্তের চাপ দেখে বললেন, 'যুবকের মত।' দিনে দুটো ইঞ্জেকশন কাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। একান্ত দরকার ছিল। সেটা দিতে মলেরিনা এবং তাঁর যুবতী সাহায্যকারিণী অন্য আরেক ডাক্তার এসে কিছুক্ষণ বসত। আমি নিজের সঙ্গে কিছু বইও এনেছিলাম। হাসপাতালে প্রত্যেক ঘরে দুজন করে লোক রাখা হয়, কিন্তু আমার ঘরে আমি একলা ছিলাম। হাসপাতালে খুব বেশি ভিড় ছিল না। মুখ্য নার্স (স্তাও সেস্ত্রা) মাত্রাতিরিক্ত মোটা ছিল। সে সব সময় এসে খোঁজ-খবর নিত, 'কোনো বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার জিনিস চাই?' আমি বলতাম, 'না, ধন্যবাদ।'

ডাক্তার মলেরিনার সঙ্গে অনেক কথা হতো। তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু বই পড়েছিলেন,

তাই ভারতের সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রশ্ন করতেন। আমি একটা ছোট কুঠরিতে বন্ধ ছিলাম, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে হতো, বোৎকিন হাসপাতাল (বোলিন্‌ৎসা বোৎকিনা)-এর প্রত্যেকটি অংশ দেখার। ১৫ তারিখ থেকে এখন অব্দি কোনো অসুবিধেও ছিল না। পায়খানা ঠিক ঠিক হতো। জ্বরও ছিল না।

১৬ এপ্রিলে দুপুর পর্যন্ত রোদ ছিল, ফের আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। সবার নালিশ ছিল এবছর বৃষ্টি-বাদল বারেবারে ঘুরে আসছে, হয়তো মে অব্দি বরফ গলবে না। আমার যেহেতু মধ্য-এশিয়া যাওয়ার ছিল আর ডিভাই-এর কাছ থেকে ফরগানার ম্যালেরিয়ার কথা শোনা হয়ে গিয়েছিল, তাই তার ইঞ্জেকশন নিয়ে নিতে চাইছিলাম। ডাক্তার বললেন, 'ম্যালেরিয়া আর ইনফ্লুয়েঞ্জার ইঞ্জেকশনের দরকার নেই, কলেরা আর টাইফয়েডের নিয়ে নিন।'

আমাকে জায়গায় জায়গায় পরীক্ষার জন্য যেতে হলো। এক জায়গায় রঞ্জনরশ্মির (এক্সরে) জন্য, আরেক জায়গায় অস্ত্র-পরীক্ষার জন্য। সব পরীক্ষকরাই এই বললেন, 'খুব ভাল। কোনো রোগের উপক্রম নেই। ফুসফুস, বুক সব সুস্থ আছে।' এখানকার চিকিৎসকরা ঘোর প্রত্যক্ষবাদী। শুধু চোখে দেখা কথা বিশ্বাস করে।

১২ এপ্রিল হাসপাতালে এসেছিলাম, আর ২০ এপ্রিলে তা ছাড়লাম। ছাড়ার সময় হাসপাতালের পক্ষ থেকে একটা সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়া হলো আর কি-কি করতে হবে, তার একটা নির্দেশও দিল। সোভিয়েত শাসনের সফলতার একটা বড় প্রমাণ চিকিৎসালয়গুলোর সুব্যবস্থা। নগর হোক বা গ্রাম, সব জায়গায় নাগরিকদের বিনা শুল্কে চিকিৎসা পাবার অধিকার আছে। শুরুতে ডাক্তারের অভাবের জন্য বহু গ্রাম হাসপাতাল থেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু এখন তো তেমন গ্রাম বিরল, যেখানে হাসপাতাল এবং ডাক্তার নেই। কিরগিজিস্তান আর কাজাকাস্তানে বিপ্লবের সময় পর্যন্ত প্রচুর লোক যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবরের জীবন কাটাতো। ভেড়া আর ঘোড়া পালন তাদের মুখ্য ব্যবসা ছিল। কিরগিজিস্তান আর কাজাকস্তানের ঘোড়া 'তুখারি ঘোড়া' নামে প্রাচীন ভারতেও বিখ্যাত ছিল। আজও তারা নিজের কীর্তি খুইয়ে বসেনি। সোভিয়েত-কালে তো ঘোড়ার দেখাশোনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বংশের ঘোড়া তাড়াতাড়ি ব্যাপক হারে জন্ম দিতে কৃত্রিম বীর্য-প্রয়োগের দ্বারা বড় রকমের সফলতা পাওয়া গেছে। আজ সেখানে খুব সুস্থ, শক্তিশালী আর সুন্দর জাতের ঘোড়া দেখা যায়। সেখানে হাজার, দু-হাজার ঘোড়ার পালের একটা জায়গা দেখতে পাওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। ঘোড়া অশ্বারোহী-সেনার জন্য প্রয়োজন। তার জন্যও সোভিয়েত সরকারকে সেদিকে বেশি করে মন দিতে হয়। এখন অব্দি কিরগিজ আর কাজাক লোকেরা নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ঘুরে ঘুরে অশ্বপালন করত। সব চারণভূমি একই সঙ্গে চরার উপযুক্ত হয় না, ত্যানশান আর উল্‌তাই-এর পর্বতমালায় উচ্চতা অনুসারে আগে পরে বরফ গলে আর সবুজ গাছ বেরিয়ে আসে, তাই প্রাচীন যাযাবররা কোন চারণভূমিতে কোন সময় যেতে হবে, তার একটি নিয়ম বানিয়ে রেখেছিল। এখনও তার থেকে পুরো সুবিধে আদায় করার চেষ্টা করা হয়।

অতীতের যাযাবরদের এখন ভালো ভালো গ্রাম স্থাপিত হয়েছে। সেখানে অধিকাংশ ঘরে কেরোসিন তেলের জায়গায় বৈদ্যুতিকবাতি জলে। এই সব গ্রামে এখন কেউ নিরক্ষর নেই। আর গ্রামের আশেপাশে কিছু শাক-সবজি ফলফুলও চাষ করা হয়, কিন্তু অশ্ব পালনকে তারা ছেড়ে দেয়নি। এখনও তারা নিজেদের পুরনো চারণভূমিতে প্রায় সেই সময়ে যায়, কিন্তু তখনকার থেকে এখন অনেক তফাৎ। এখন পাল যাবার রাস্তায় প্রত্যেকটি থাকার জায়গায় পশুখাদ্য ও লোকজনের থাকার ব্যবস্থাই শুধু থাকে না, সেই সঙ্গে খবর পাঠাবার রেডিও থাকে, মানুষ আর পশুর চিকিৎসক একসঙ্গেই থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চলমান করা পাঠশালাও আছে। অনেক জায়গায় স্থায়ী ঘর হয়ে গেছে, কিন্তু বেশির ভাগ চারণভূমিতে লোকেরা তাঁবুর ভেতরেই থাকে। সোভিয়েতের বিশাল রাজ্যে কোনো মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত যেন না হয়, তার এখন পুরোপুরি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগে বলেছি, পশুদের চিকিৎসারও এইরকম ব্যবস্থা আছে। বিনা পয়সার চিকিৎসায় মানুষের কত সুবিধে, এর গুরুত্বকে সোভিয়েতের লোক বোঝে না। হাওয়া পয়সা দিয়ে কেনার জিনিস নয়, কিন্তু অত্যন্ত সুলভ হবার কারণে আমরা তার গুরুত্ব বুঝি না। পুঁজিবাদী দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের অসুখের পেছনে বিক্রি হয়ে যেতে দেখা গেছে, তারা এর গুরুত্ব কি বুঝতে পারে? নগরগুলোয় প্রত্যেক মানুষের জন্য একটা না, তিন-তিন জায়গায় বিনা শুল্কে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আমার উদাহরণই নেওয়া যাক না কেন। ত্কাচেই পাড়ায় আলাদা ডাক্তার আছে, যে টেলিফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর কাছে পৌঁছে যেত, আমি কখনও তাকে পনেরো মিনিটের থেকে বেশি দেরি করে আসতে দেখিনি। যদি ডাক্তার বলে, 'হাসপাতালে চলো,' তাহলে ওখানে সমস্ত ব্যাপারটাই বিনা পয়সায়। যদি আমি আগ্রহ বশে বাড়ি থাকতে চাই, আর অসুখটা ছোঁয়াচে না হয়, তাহলে ডাক্তার জোর করে না। বাড়ি থাকলে সরকারি দোকান থেকে সস্তায় পাওয়া যায় যে ওষুধ তার দামটা কেবল দিতে হবে। ত্কাচেই ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়েও বিনা শুল্কে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল আর তৃতীয় ওইরকমই ব্যবস্থা ছিল তিরযোকীতে।

প্রতীক্ষা আর হতাশা

২০ এপ্রিলে ভোক্সের গাড়ি এলো। আর চারটের কাছাকাছি সময়ে ফের ন্যাশনাল হোটেলের সেই ২৪০ নম্বর ঘরে চলে এলোম। এতদিন অনুপস্থিত ছিলাম, কিন্তু ঘর রেখে দেওয়া হয়েছিল। এক জায়গায় থাকার ফলেই বোধহয় একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছিল। সেই রাতে একটু জ্বর-জ্বর লাগল। যা কিছু হোক না কেন, পড়াশুনো তো ছাড়তে পারি না। সন্ধেবেলা খিদে পায়নি, একটু সন্দেহ হতে লাগল, কিন্তু আবার হাসপাতাল যাচ্ছি না।

২১ এপ্রিলে কালকের সামান্য জ্বরের ভয়ে আমি বাইরে যাবার ইচ্ছে ছেড়ে দিলাম।

—১৯৪৬—

সন্ধেবেলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধু শামাউন এলেন। জাভাবাসী যে বন্ধুর মারফত আমি তেহরানে আদিল খানের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তার নামই কমরেড শামাউন। তাঁর সঙ্গে সন্ধেবেলা রোমন-থিয়েটারে 'ভট্টিকে বহু' নাটক দেখতে গেলাম ইউরোপে সিগানদের যেমন ভিক্ষা চাওয়া, হাত দেখা, ঘোড়া ফেরি করা ব্যবসা ছিল, তেমনি নাচগানও তারা করত— বিশেষ করে মদের ভাঁটির সামনে। মদ্যপায়ীদের এইরকম সস্তা মনোরঞ্জনের বন্দোবস্ত সিগানই করতে পারত। নাটকে এরকম এক বৌ-এর বর্ণনা ছিল। যাকে ভাঁটিখানা থেকে আনা হয়েছিল। সিগানদের যাযাবর জীবন খুবই আকর্ষক। রাশিয়ার কালিদাস কবি পুশকিনও এই জীবনের প্রেমে পড়েছিলেন। তিনি এর ওপর একটা সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। শুঁড়িখানায় নাচ-গান দেখালো। সিগান নর-নারী নিজেদের কলা প্রদর্শন করে পয়সা চাইছিল। একটি সিগান তরুণ আরেক সিগান তরুণীর প্রেমে পড়ল, তরুণ শুধু শিল্পীই ছিল। কন্যার পাণীপ্রার্থী আরো দুজন তরুণ ছিল, যারা মাতা-পিতার সামনে বড় বড় উপহার এনে হাজির করল! কিন্তু যারা নাচগান তথা সিগানদের অন্যান্য বিদ্যা জানত না 'তস্মৈ কন্যা ন দিয়তে'। পিতা-মাতা গুণ না দেখে গৃহ আর উপহারে ফয়সালা করে, এক বুড়োর হাতে তাদের কন্যাকে দিতে চাইল। মেয়ে তার বিরোধিতা করলে পিতা চাবুক মারল। প্রেমিক তরুণ আরেকবার চেষ্টা করল, মেয়েও খুব কান্নাকাটি আর বিলাপ করল, কিন্তু পিতার কাছে কারো কিছু চলল না। জবরদস্তি বিয়েই দিয়ে দিল। সিগান ধর্মের মত গোঁড়ামি কোথাও নেই। যেখানে যে ধর্মের প্রাধান্য ছিল, সেখানে সেটাই ওদের ধর্ম হতো। রাশিয়ায় ওরা গ্রিক চার্চকে গ্রহণ করল, কিন্তু সেটা ছিল লোক দেখানো। তা না হলে সিগানদের নিজেদের প্রথা সর্বত্র প্রায় একই ধরনের। ওদের খাওয়া, গান-নাচও একই ধরনের। মেয়ের বিয়ে হলো। তাতে সব নর-নারী তাতে অংশগ্রহণ করল। নববধূও প্রথা অনুসারে নাচতে বাধ্য, কিন্তু সে রোদন-নৃত্য নাচল। ঘোড়ার চারপায়া গাড়িতে চড়ানোর সময় তরুণ প্রেমিক ক্রিমিয়ার ভূতপূর্ব সুলতানের রূপে জাদুকর হয়ে এলো। সে চাদরের নীচ থেকে এক অনুপম সুন্দরীকে (পরী) বার করল, যে কয়েকটি ভবিষ্যৎ-বাণী করল। সুলতান ঘোড়া গাড়িতে ওকে অদৃশ্য করে দিল। বর-বধূ ওই গাড়িতে চড়েই বিদায় নিল। রাস্তায় পরী ডাইনী রূপ ধরে চড়ে পড়ল। সিগান বেচারারা ভূত প্রেতে খুব বিশ্বাসী। সবাই ভয় পেয়ে গেল—বরযাত্রী কোথায় পালিয়ে গেল, বরও পালাল। সুলতানের বেশ পাল্টে তরুণ নিজের প্রেয়সীর সঙ্গে মিলল। বুড়ো বর পাগল হয়ে গেল, যখন সে দুজনকে চুম্বন করতে দেখল। লোকেরা আবার ফিরে এলো। প্রেমিকের বন্ধু গাড়ির মধ্যে দুজনকে লুকিয়ে ফেলল, আর লোকেদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে অন্য আরেক দিকে খুঁজতে পাঠিয়ে দিল। শেষে দুজন প্রেমিক-প্রেমিক ধরা পড়ল। বুড়ো বর নিজের শ্বশুরের ওপর ভীষণ রাগ দেখাল। শ্বশুর রেগে গেল আর তার বৌ সব উপঢৌকন বার করে ফেলে দিল! সব শেষে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হলো। সমস্ত সিগান-মণ্ডলী তাদের স্বাগত জানাল। সিগানদের এত সুন্দর নাটক দেখে আমার আফশোশ হচ্ছিল, যে তাদেরকে মাটির নীচের কুঠরি দিয়ে কেন ছেড়ে দেওয়া হলো। ওদের জন্য তো একটা আসল অট্টালিকা চাই। এদের থিয়েটার সব সময় ভরা থাকে।

গ্রীষ্মের দিনে এদের দল অন্য শহরেও যায়। লেনিনগ্রাদে তো কতবার ওর টিকিট পাওয়া যেত না। যদি এখানে বড় নাট্যশালা থাকত, তাও সেটা খালি থাকত না।

যদিও অভিনেতা সবাই সিগান আর সিগানি ছিল, কিন্তু দর্শক প্রায় কেউই সিগান ছিল না, তাই রুশ ভাষা ছিল অনিবার্য। প্রৌঢ়া অভিনেত্রী বলল যে এখনও তারা নিজের ভাষাকে ভোলেনি। এটাও জানতে পারলাম যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সিগানদের শিক্ষা দেবারও চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সিগানদের না আছে কোনো দেশ আর না আছে কোনো গ্রাম। অন্যান্য লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার জন্য এরা সবাই দুটো ভাষা জানে, তাই কাজকর্মে এটা প্রয়োগ করা যায়নি।

এবারও মস্কো যাত্রায় আমি পুরোদমে নাটক দেখতে শুরু করে দিয়েছিলাম। ২৪ এপ্রিলেও য়ুরেই (ইহুদী) নাট্যশালায় এক সামাজিক নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গীত শুনে আমার মনে হলো, যে ভারতীয় ফিল্মে যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণ, সঙ্গীতের এত প্রাচুর্য তার কারণ এই য়ুরেই প্রভাব। রোমন থিয়েটারের মত এই নাট্যশালাও অল্পসংখ্যকের নাট্যশালা। ইউরোপে সবচেয়ে বেশি ইহুদী রাশিয়ায় বহু শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যেই হারিয়ে যায়নি। ইহুদীদের কঠোর জাত-পাতের মর্যাদাই শুধু এর কারণ নয়, সেইসঙ্গে খ্রীস্টানদেরও যিশুর প্রাণ নেওয়া বন্ধুদের প্রতি ঘৃণাও এক কারণ। বিপ্লবের আগে তো ওদের একধরনের অচ্ছুৎ জাত বলে মনে করা হতো। হয়তো রসুনের ব্যবহার ওরা খাবারে বেশি ব্যবহার করে, তাই রসুনখোর বলে রুশরা ওদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত। কোনো লোক নিজের মেয়েকে ইহুদীদের দিতে চাইত না। আর কোনো রুশও ইহুদী মেয়েকে বিয়ে করে নিজের শ্রেণী আর পরিবারে সম্মানিত হয়ে থাকতে পারত না। জন্মভূমি থেকে উপড়ে এসে শুকনো পাতার মত দুনিয়ায় ছড়ানো-ছিটানো ইহুদী হযতো সেটা চাইতও না, বা চাইলেও তাদের অবসর মেলেনি, তাই ওরা চাষ করতে লেগে পড়েনি। বানিয়া মহাজনের ব্যবসা বেশি লাভদায়ক ছিল। সে কারণে তারা ওই দিকেই আকৃষ্ট হলো এবং ইউরোপের দেশে মারওয়াড়ী হয়ে গেল। তাদের নিজেদের ভাষা ইরানী এখন শুধু লেখাপড়ার ভাষা হয়ে রইল, তাও তারা জার্মান-মিশ্রিত এক ধরনের ভাষায় (য়িদ্দিশ) নিজেদের মধ্যে কথা বলত। শিক্ষার দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা ওইদিকেও পা বাড়াল। ভালো ভালো উকিল, ডাক্তার, প্রফেসর আর ইঞ্জিনিয়ার ওদের মধ্যে থেকে হতে থাকল। ওদের ব্যবসা ছিল সীমিত, বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল সীমিত। তাই ওদের সামাজিক ক্ষেত্রও ছিল খুব সঙ্কুচিত। তারা জেন্তিল (অ-ইহুদী)-কে চুষে খাওয়া নিজের ধর্ম বলে জানত আর অন্যরা ওদের তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে আত্মসন্তোষ উপভোগ করত।

কিন্তু বিপ্লবের পর, যুগ-যুগ ধরে চলে আসা পক্ষপাতিত্বকে হাটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আজ সেই মানুষেরাই পুরনো অসদ্ভাবকে নিজের মনের ভেতর পুষে রেখেছে, যারা সোভিয়েত-শাসনকেও পছন্দ করে না। সোভিয়েত-শাসন ইহুদীদের পথের সব বাধা দূর করে দিয়েছে, তবু এখন ৭০ শতাংশ বিবাহ-সম্বন্ধ ওদের নিজেদেরই ধর্ম-ভাইদের সঙ্গে হয় এবং তারা নিজেদের নিয়ম-কানুন— স্তব-স্তুতি, মান ইত্যাদিকে বজায় রেখে

দিয়েছে। ইউরোপীয় রাশিয়ায় ওদের কোনো বিশেষ ভাষা না থাকার কারণে ওদিকে তো চেষ্টা করা হয়নি, কিন্তু মধ্য-এশিয়ার ইহুদীরা এক বিশেষ রকমের ফারসী বলে। এই ভাষায় ছাপা স্কুলের বই সাধারণ গ্রন্থাগারে (লেনিনগ্রাদ) আমি দেখেছি। কিন্তু এই পরীক্ষা ওই রকমই অসফল রইল, যেরকম রইল সিগানদেরকে তাদের ভাষায় শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা।

বস্তুত, যখন সব ইহুদীরাই তাদের গণতন্ত্রের ভাষাকে মাতৃভাষার মত বলে, তখন সে কেন নিজেদের ক্ষেত্রকে সীমিত করে, কিছু লোকের ভাষা পড়তে পছন্দ করবে? ইহুদীদের টিয়াপাখির মত নাক পশ্চিম ইউরোপের মত রাশিয়ায় বেশি দেখা যায় না, কিন্তু ওদের চুল সাধারণত দেখা যায় কালো।

এই নাট্যশালাটি ছোট ছিল না। এর হল ছিল বিশাল, যার ওপর-নীচে পাঁচশোরও বেশি দর্শক বসতে পারত। এখানকার গান আমার বেশি ভালো লাগত, কেননা এতে আরবী আর ভারতীয় গানের সুর মিলত। পোশাকও ছিল এশীয়-ইউরোপীয় মেশানো সেই শেরওয়ানী, তুর্কির পোশাক মনে করে মুসলমানরা ভারতে যার প্রচার করেছিল আর এখন মহাপুরুষ নেহরুর দ্বারা যাকে ভারতের জাতীয় পোশাকের পদে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। সংক্ষেপে বেশ, বাতাবরণ, সাজসজ্জা ইত্যাদিতে এই থিয়েটার ভারতের খুব কাছের ছিল।

নাটকের গল্পটি ছিল ঃ এক সনাতনী ধারার পুরোহিত ছিল। তার একমাত্র মেয়ে এক যুবক ছাত্রের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু পিতা নাস্তিক ছাত্রের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ কেমন করে দেয়? সে বর খুঁজতে এধার-ওধার ঘটক পাঠালো। ঘটকরা এক ধনী পরিবারের যুবককে পছন্দ করল, যে ল্যাংড়া, কানা আর তোতলাও ছিল। কিন্তু ছাত্র এত তাড়াতাড়ি নিজের দাবি ছাড়তে রাজি ছিল না। যখন বিবাহ-পত্র লেখা হচ্ছিল, তখন সে পুরোহিতকে ঘুষ দিয়ে নিজের নাম লিখিয়ে নিল আর যাতে পিতা ভাবে যে এ সেই ল্যাংড়া, কানা, তোতলা, তাই সেও নিজেকে সেইরকমই বানালো। লোকেরা ওর অভিনয় দেখে হেসেই কুটিপাটি হচ্ছিল। ওর চলাফেরা, কথা বলা সবই সেই ধনীপুত্রের মত। নাটকের ভাষা য়িদ্দিশ ছিল, কিন্তু অভিনয় এত ভালো ছিল, ভাষা না জানলেও মানুষ নাটকের আনন্দ উপভোগ করতে পারছিল। অন্যদের মত হাসতে হাসতে আমার পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল। যখন আসল ল্যাংড়া কোনো কাজের জন্য আসার প্রস্তুতি করে, ততক্ষণে নকল ল্যাংড়া এসে পড়ছিল, আর চেষ্টা চলছিল যাতে দুজনেই এক সঙ্গে না এসে পড়ে। য়িদ্দিশ ভাষা ব্যবহার করার জন্য এখানে অনেক সিট খালি ছিল। হয়তো রোমান থিয়েটারেও সিগান ভাষার প্রতি আগ্রহ দেখালে, সেখানেও এই অবস্থাই হতো।

২৫ এপ্রিলে এক দিকে মনমরা হয়ে অনুমতি পত্রের প্রতীক্ষায় ছিলাম, আর অন্যদিকে সন্ধেবেলায় হাঁটতে হাঁটতে শিশু-নাট্যশালার দিকে যাচ্ছিলাম। এই নাট্যশালা ১২ বছরের ওপরের বাচ্চাদের জন্য। নাটকটি ছিল 'নগরের দুই কুঁজো' বাচ্চাদের যে এটা মনোরঞ্জনের জিনিস ছিল, সেটা এই নাম থেকেই বোঝা যায়। ঝাড়ুদার কুঁজো যুবক করকাল খুব ভালো গায়ক, নগরের সব লোকদের প্রেমের পাত্র এবং বিশ্বাসী। নগরবাসী খানের (রাজা)

অত্যাচারে পীড়িত ছিল। খানের আমীরের এক মহামূর্খ ছেলে ছিল, যার শহরের সর্বসুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছিল তার বাবা। জানতে পেরে স্বয়ং খান বিয়ের প্রস্তাব দিল। ওদিকে দুষ্টজনেরা কুঁজো যুবকের কাজ শেষ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু নগরের প্রেমপাত্র কুঁজো গাড্ডায় না পড়ে মূর্খ যুবক আর রাজা দুজনেই ওর মধ্যে পড়ে গেল। যুবক কুঁজো গায়ক ওদের গাড্ডা থেকে বাইরে বার করল। আগে থেকেই ওর গানে মুগ্ধ জঙ্গলের ভালুক, সিংহ, খরগোশ দেখছিল। কিন্তু নিজেদের প্রাণ বাঁচানো কুঁজো যুবকের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে, খান তার ওপর দোষারোপ করল। নগরের ময়দানে বিচারালয় বসল। ওই মূর্খ যুবকের বাবা ছিল বিচারক। প্রত্যক্ষদর্শীদের ডাকা হলো কিন্তু একজন সাক্ষীও কুঁজো যুবকের বিরুদ্ধে বলতে রাজি হলো না। তখন বিচারক কয়েকজন বুড়োকে বিচারক নির্বাচন করল। স্বয়ং বাদী আর নিজের মূর্খ পুত্রকে সাক্ষী বানিয়ে অভিযোগ করল। যুবক অপরাধীকে সাক্ষীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে সে জঙ্গলবাসীদের সাক্ষীরূপে পেশ করতে চাইল। বিরোধীরা হেসে ফেলল। সাক্ষীদের ডাকার ঘণ্টা তিনবার বাজল, আর এর পরেই মৃত্যু দণ্ডকে কাজে পরিণত করার জন্য ভালো মানুষ কুঁজোকে যেই নিয়ে যাচ্ছিল, অমনি সিংহ, ভালুক, খরগোশ এসে পৌঁছল। লোকেরা বিস্মিত হলো। জঙ্গলবাসীদের সাক্ষীর জোরে কুঁজো করকালকে মুক্ত করা হলো। তখন খান স্বয়ং মোকদ্দমা করতে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে অপরাধী ওখান থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ওকে ফের ধরে আনার হুকুম হলো। অন্যদের হাত উঠছে না দেখে খান স্বয়ং ওকে ধরতে চাইল। টানা-হ্যাঁচড়ায় করতালের হাতে খান মারা গেল। তারপর খানের এক সেনাপতি উইলিয়ম জাদুর তলোয়ার দিয়ে করকালকে মারতে চাইল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। খানের লোককে মারা হলো, আর উইলিয়মও বন্দী হলো। এখন জাদুর তলোয়ার করকালের হাতে, ওর সঙ্গে লড়াই করে কে জিততে পারে? নগরের সর্বসুন্দরী কন্যা ওই কুঁজোকে বিয়ে করল—রূপের থেকে গুণকে তার বেশি পছন্দ ছিল। খানের অত্যাচার থেকে নগর মুক্ত ছিল। কোনো এক বুড়ির ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে করকালের কুঁজও মিলিয়ে গেল। এই নাটকে শ্রমিক-জনতার সততা এবং প্রভুবর্গের অত্যাচারের ছবি ভালো তোলা হয়েছে। ১৪ বছর অব্দি ছেলেদের জন্যই শুধু এটা যথেষ্ট মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ ছিল না, বরঞ্চ বয়স্করাও তার আনন্দ উপভোগ করছিল। অভিনেতারা সবাই দক্ষ ছিল। নাট্যশালার বাড়ি ভালো ছিল। অনেকগুলো ঘর ছিল। হলে ৭০০ লোক বসার জায়গা ছিল।

ডাক্তার তালস্তোফ সম্বন্ধে আমি আগেই শুনেছিলাম। এও জানতাম যে কয়েক বছর ধরে তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েত পুরাতাত্ত্বিক অভিযান মধ্য-এশিয়ার পরিত্যক্ত নগরগুলোতে অনুসন্ধানের জন্য যাচ্ছে। ২৬ এপ্রিল বেলা আড়াইটের সময় আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। করাকল্পক আর খ্বারেজ্‌ম-এর তাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দু'ঘণ্টা ধরে তিনি বলতে থাকলেন। যূচী আর শকরা মোঙ্গল নয়, তারা হিন্দু-ইউরোপীয় জাতের। এই ব্যাপারে তিনিও একমত। বলছিলেন যে তাদের সম্বন্ধ ছিল মেসাগিত (মহাশক) জাতের সঙ্গে। বো-সুনের দেশ (সপ্তনদ) অব্দিই নয়, দানীয়ুব থেকে তরিম উপত্যকা পর্যন্ত শক জাতর বসবাসের জায়গা ছিল। শক আর হিন্দু-ইরানী জাতির পরস্পরের প্রতি খুব নিকট

সম্বন্ধ ছিল। খ্রীস্টপূর্বের তৃতীয়-চতুর্থ সহস্রাব্দীর অরঞ্জিত মৃৎপাত্রের কালে হয়তো শক আর আর্য শাখা আলাদা হয়েছিল। ফিনো-উইগু আর মুণ্ডা-দ্রাবিড় জাতিরও সেই রকমেরই সম্বন্ধ ছিল। ভাষার নৈকট্য থেকে যা বোঝা যায়, খোদাইয়ে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। খ্‌বারেজ্‌ম আর ভারতের নতুন-প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রে সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু তখনকার মৃৎপাত্রগুলোর মধ্যে কিরকম সামঞ্জস্য সেটা খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে। আমি বললাম, 'ওরেল স্টাইন মকরানে যে মৃৎপাত্র পেয়েছেন, তা রঙিন ছিল। তার আগে বাঁকা রেখা দ্বারা অঙ্কিত পাত্র আমি দেখেছি।' প্রোফেসর বললেন, 'খ্‌বারেজ্‌মে কুষাণদের মুদ্রার পূর্বরূপ দেখতে পেলাম। ওদের নামও সেই দিকে সঙ্কেত দেখায়।' তালস্তোফের মতে অন্তর্বেদে (সির আর বক্ষু নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ) পৌঁছনোর পর যূচীদের সর্বপ্রথম রাজধানী খ্‌বারেজ্‌মে ছিল। সাদা হুনদের (হেফতাল) রাজধানী ওদের মতে সম্ভবত বরক্‌শায় ছিল, যার খোদাই ১৯৩৮-১৯৩৯-এ তাশখন্দের প্রোফেসর শিক্‌শিন করিয়েছেন। ওখানকার খোদাই-এ চতুর্থ-পঞ্চম খ্রীস্টাব্দের জিনিস আর ভিত্তিচিত্র পাওয়া গেছে।

মধ্য-এশিয়া থেকে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'ওর অনেকাংশ মস্কোয় আছে, আর অনেকাংশ আছে অশখাবাদ, সমরখন্দ, তাশখন্দ, তেরমিজ, স্তালিনবাদ, ফ্রুঞ্জে আল্মাঅতার মিউজিয়মে।' খোদাইয়ের সময় আর খননকারীদের সম্বন্ধে তাঁর থেকে জানতে পারলাম—

খননকারী	খনন-প্রদেশ	সাল	সংগ্রহশালা
ফ্রাইমান	পঞ্জকেন্ত (মূকগিরি) ১৯৩৪ মস্কো		
বের্নস্তাম	সপ্তনদ	১৯৩৬-৪৫	ফ্রুঞ্জে
তাল্‌স্তোফ	খ্‌বারেজ্‌ম	১৯২৭-৪৪	মস্কো কলা সংগ্রহ
শিক্‌শিন	বরক্‌শা (বুখারা)	১৯৩৮-৪৮	তাশখন্দ
তেরেতোশ্‌কিন	অফরাসিয়াব	১৯৪৩	"
মাসীব	ফরগানা নহর	১৯৩৯	"
"	মের্ব	১৯৩৯	অশ্‌খাবাদ

তাল্‌স্তোফ নিজের বিষয়ে ডক্টর শ্চেরবাৎস্কীর মতই বড় বিদ্বান, আর ওইরকমই প্রবল তাঁর অনুসন্ধিৎসা। দু'ঘণ্টার কথোপকথনের পরও আমার মত তিনিও অতৃপ্ত ছিলেন। আবার আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। এখনও সংগ্রহশালার জিনিসপত্র দেখাতে

পারেননি, কিন্তু বহু ফটো তিনি দেখালেন, সেইসঙ্গে ভারতে পুরাণ-পুরাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ কে কে আছেন তা জানার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি এর কি উত্তর দেব? আমাদের এখানে সর্বজ্ঞতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়, পুরাতত্ত্ব যে জানে সেই পুরাণ-পুরাতত্ত্বকেও বধ করে।

২৭ এপ্রিল জানতে পারলাম যে হয়তো বিদেশ-বিভাগ থেকে স্বীকৃতি নাও পেতে পারি কিন্তু আশার সুতো এখনও ছিঁড়ে যায়নি। সেই দিন আমি মস্কোর আরেক বড় মালী-থিয়েটারে 'প্রতিভার জন্য দুঃখ' (গরে অত্‌উমা) নাটক দেখতে গেলাম। এতে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের রুশ সামন্তবর্গের জীবন দেখানো হয়েছে।

বলশয় থিয়েটারের মত মালী-থিয়েটারও অনেক আগেই এক শতাব্দী অতিক্রম করেছে। তার নাট্যমঞ্চেও শত শত প্রতিভাশালী অভিনেতা-অভিনেত্রী তাদের কলার প্রদর্শনী করেছে। এই পুরনো নাট্যশালার নিজের সংগ্রহালয় আর শিক্ষণালয় আছে। এ কেবল রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চের জন্যই শিল্পী তৈরি করে না, সুদূর সাইবেরিয়া আর মধ্য-এশিয়ার বুরিয়ত, উজবেক, কাজাক ইত্যাদি যুবক-যুবতীরা এখান থেকে নাট্যকলা শিখে নিজের দেশে খুব সফলতার সঙ্গে তার প্রচার ও প্রসার করছে। সংগ্রহালয়ে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ নাটকের ঐতিহাসিক সামগ্রী দেখা যায়—নেপথ্যের নকশা, বেশ-ভূষার নমুনা, শিল্পীদের চিত্র বা ফটো।

নাটকের গল্পটা হচ্ছে—বৃদ্ধ গ্রাফের (কাউন্ট) একমাত্র ও অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে ছিল। গ্রাফ ভারাক্রান্ত ছিল, সে নিজের যুবতী ঝি—যে ওর প্রজার মেয়ে—ওকে ফাঁদে ফেলতে চাইছিল। সেই সময় রাশিয়ার কৃষক অর্ধদাস (সার্ফ) ছিল, জমিদারের হাতে কৃষকের প্রাণ-মান-পয়সাকড়ি সবকিছু ছিল। গ্রাফেরা রাজধানী তথা শহরে তাদের পাড়ায় খুব সুখে থাকত। কখনও কখনও মনোরঞ্জনের জন্য তাদের তালুকদারী মহলে চলে যেত, সেই সময় কৃষক যুবতীদের ইজ্জত কখনও রক্ষা পেত না। কত কৃষক কুমারী এই বিলাসীদের দ্বারা গর্ভবতী হতো, আর পরে তাদের খুব বাজে অবস্থায় নিজেদের গ্রামে থাকতে হতো বা নগরে গিয়ে বেশ্যা হতে হতো। বৃদ্ধগ্রাফের যুবতী-ঝি এই ঘনঘোর পরিণামের কথা জানত, তাই ও বুড়োকে ঘৃণা করত। গ্রাফের মেয়ের তিনটে প্রেমিক ছিল—একটা পঁয়তাল্লিশ বছরের কর্নেল—যার সৈনিক জুলুম মূর্খতার চরম সীমা অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল, দ্বিতীয় তোষামোদকারী যুবক—গ্রাফের মেয়ের থেকেও অনেক বেশি যুবতী চাকরানীর ওপর যার লাট্টু ছিল, আর তৃতীয় জন এক স্বাধীনতা-প্রেমী নবযুবক চাস্কি—যার সাহিত্য আর মানবতার ওপর খুব অনুরাগ ছিল এবং প্রেমিকার প্রতি যার পুরো হৃদয় জুড়ে প্রেম ছিল। বাবা কর্নেলকে জামাই বানাতে চাইছিল, কন্যা লম্পট যুবককে চাইছিল। সাহিত্য আর স্বাধীনতার প্রেমে পাগল যুবককে না চাইছিল বাবা, না মেয়ে।

বাবা ও মেয়ের সঙ্গে তিন প্রার্থী অনেকবার কথাবার্তা বলেছে। বুড়ো খুব বড় এক ভোজ দিল, যেখানে অনেক কন্যাজ (রাজুল), গ্রাফ (কাউন্ট) তাদের স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে এসেছিল। তাদের পোশাক খুব জমকালো ছিল, যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা

যেত। যেন মণিমুক্ত আর অলংকারের প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। পুরুষরা সম্মান দেখাতে মহিলাদের হস্ত-চুম্বন, কারো বা মুখ-চুম্বনও করছিল। স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা কোমরের কাছে ধরে একটু ঝুঁকে অভিবাদন করছিল। দেশ-কাল-পাত্রের ক্ষেত্রে যাতে কোনোরকম ত্রুটি না ঘটে, সে কথা সোভিয়েত নাট্যশালায় খুব মনে রাখা হয় এবং তার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। উচ্চ শ্রেণীর প্রত্যেক রুশ ব্যক্তির আলাদা আলাদা রুচি ছিল, যা অভিনয়ে খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছিল। স্ত্রী-লোকেরা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়া বা তরুণী, সবার ব্যবহার এত স্বাভাবিক, যে মনে হচ্ছিল এরা মানব-শরীর নয়, পুতুলগুলো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে, চতুর্থ তথা অন্তিম দৃশ্যে গ্রাফের দরজার প্রদর্শন করা হয়েছিল। শীতের সময় ছিল। পরিচারকরা নিজের নিজের মালিক-মালকিনের বহুমূল্য সামুরী ওভারকোট আর টুপি নিয়ে বাইরে প্রতীক্ষা করছিল। মালিক আর মালকিন এক এক করে বাইরে বেরিয়ে চাকরদের হাত থেকে নিজের কোট আর পোশাক নিয়ে গাড়িতে উঠতে লাগল। কর্নেলও বিদায় নিল। চাস্কী এসে চাকরদের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার কাছে কেউ ছিল না। প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। গ্রাফ কুমারী নিজের লম্পট প্রেমিককে ডাকল। পরিচারিকা তাকে আনতে গেল, কিন্তু প্রেমিক পরিচারিকার সঙ্গে প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল। কুমারী দেখে ফেলল। সে কুণ্ঠিত হয়ে বকেঝকে দিল আর তাকে ত্যাগ করল। এই সময়ে চাস্কী পৌঁছে গেল, সে মনে করিয়ে দিল, কিন্তু কুমারী মৌন থাকল। বাবা এসে দুজনকেই দেখতে পেল এবং সে সন্দেহ করল। দুজনের ওপর তার রাগ দেখাল। যুবক আগে কুমারীকে সম্বোধন করে ভালোমন্দ কথা শোনালো, সে তার শেষ সম্পর্ক ছিন্ন করল, আর শেষে বুড়ো বাবাকেও দু-চার কথা শুনিয়ে নিজের রাস্তা ধরল।

সোভিয়েতের নাটক কেবল সুন্দর কলা আর সুরুচিপূর্ণ মনোরঞ্জনেরই উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়, তা ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের সুন্দর পাঠশালার কাজও দেয়। যে সময়ের নাটক দেখার আপনি সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানে ওই সময়ের ইতিহাস আপনার সামনে একেবারে আসল রূপে এসে উপস্থিত হয়, আর এমনি রূপে যাকে আপনি চট করে ভুলতে পারবেন না। আমাদের এখানকার মত নয় যে অশোকের সময় সে বিক্রমশীলার ভিক্ষু এনে হাজির করবে, যে বিক্রমশীলা গড়ে উঠেছে অশোকের একাদশ শতাব্দী বাদে হয়েছে। রেডিও নাটকে কলিঙ্গ-বিজয়ের সময় বারুদের কলসির কথা বলা হয়, যে বারুদকে বাবর আসার আগে ভারতবর্ষের মানুষ জানত না। আমাদের দেশ কেন, এই বিষয়ে পশ্চিমী ইউরোপ এবং আমেরিকাও এখন সোভিয়েত-রাশিয়ার অনেক পেছনে। মালী আর বলশয় থিয়েটারের নাটকের পরম্পরা খুব পুরনো, আর আজও এই দুটোকে সর্বোত্তম থিয়েটার বলে মনে করা হয়। দেশের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা-অভিনেত্রী এইখানেই আছে। ওইসব অনেক নাটক এখনও দেখানো হয়, যেগুলো আজ থেকে এক শতাব্দী আগে মঞ্চস্থ হয়েছিল। হ্যাঁ, তার থেকে ত্রুটিগুলো দূর করে এবং অভিনয়ের মাত্রা ও সামগ্রী যোগ করে। সামন্ত যুগের সামাজিক বিলাসময় জীবন দেখাতে আজকের শাসক কোনো সঙ্কোচ করে না। তাতে ওদের কোনো বিপদ নেই। হ্যাঁ, এখনও পুরনো সামন্তবর্গের কিছু সন্তান

হীরে, রত্ন, রেশম আর সামুরের প্রদর্শন দেখে ঠাণ্ডা নিশ্বাস নিয়ে বলে ওঠে—'কলা তো এটাই। সৌন্দর্য তো এই।' এর মানে—'তে হি নো দিবসা গতঃ।'

বলশয়ের মত মালী-থিয়েটারের টিকিট পাওয়াও সৌভাগ্যের ব্যাপার। তার তিনটে তলা আর ফরাসের সিট পুরোটাই ভর্তি ছিল। আমি ফরাসের ওপর তৃতীয় লাইনে রঙ্গমঞ্চের একদম সামনে থাকার দরুন সবকিছু পরিষ্কার দেখতে-শুনতে পাচ্ছিলাম।

২৮ এপ্রিল এল। ভালো লাগছিল না। দ্বিধায় ছিলাম। যিনি যাত্রার ব্যবস্থাপনা করছিলেন, তিনি দেরি হচ্ছিল বলে অবশ্যই ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু এখনও আশা ছেড়ে বসেনি। সেইদিন মস্কোর ওপরেতো-থিয়েটারে ভয়ে ভয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম ওপরেতাও অপেরারই মত হবে এবং আমাকে মাথা ধরা অর্জন করতে হবে। কিন্তু এখানে ওপরেতার মানে নৃত্য-সঙ্গীতসহ সুখদায়ক নাটক, অর্থাৎ এইরকম নাটক যা ভারতীয় রুচিসর্বস্ব মানুষ বেশি পছন্দ করে। অপেরার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানকার সব গান, নৃত্য আর কথোপকথন স্বাভাবিক। ব্যালের উচ্চাঙ্গ নৃত্যও-এর মধ্যে যুক্ত ছিল। নাটকে আধুনিক সমাজকে চিত্রিত করে নৌসেনার প্রেমকে দেখানো হয়েছে। এতে বিনোদের মাত্রাও অনেক ছিল। অত্যন্ত স্থূলা অভিনেত্রী সাবিস্কয়ার অভিনয় খুব আনন্দদায়ক ছিল। নিকুলকীনা অভিনয়ে আর উজমিনা নৃত্যে খুবই দক্ষ।

২৮ এপ্রিল থেকেই চারদিকে মে-মহোৎসবের প্রস্তুতি চলছিল। বহু বাড়িঘরে নেতাদেরও ফটো লাগানো হয়েছিল, আলোর মালাও জেগে উঠেছিল। ৭ নভেম্বরের (বিপ্লব-দিবস) পরে সোভিয়েতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব মহান মে-দিবস।

লেনিনগ্রাদ ছাড়া মাস খানেক হয়েছে, তাই ওখানকার সম্বন্ধে কি বা বলতে পারি? কিন্তু মস্কোয় তো ২৯ এপ্রিলকে বসন্তের আগমনের মত মনে হচ্ছিল। পয়লা মে-র উৎসবের জন্য বসন্তারম্ভের থেকেও বেশি সুন্দর সময় আর কি হতে পারে? ওই দিন তিন-চার ঘণ্টা আমরা শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মাস্কভা নদীতে কোথাও বরফের নামও ছিল না, মুক্ত প্রবাহে বয়ে চলেছিল। ছাদে বা মাটিতেও বরফের চিহ্ন ছিল না, শুধু দত্তভাই-এর গলিতে এক-আধটা বাড়ির নিচু স্থানে হিম নয়, বরফ (যখ) দেখা যাচ্ছিল। মাস্কভার ওই পারে বাচ্চাদের হাট বসেছিল, যেখানে খেলনা, বিস্কুট, চকলেট ইত্যাদি বিক্রি করার সংস্থাগুলো নিজের নিজের ছোট ছোট দোকান খুলেছিল। দোকানগুলো ছিল কাঠের, কিন্তু সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত এবং কাঁচের গোল কেসের সঙ্গে। বৃষ্টির দিকে নজর রাখার দরকার ছিল, তাই বৃষ্টি আটকানোর মত ছাদ বানানো হয়েছিল। সারা বাজার চিত্রশালার মত দেখাচ্ছিল, আর চিত্রগুলোও ছিল বালকদের মন টানার মত। এখানে অনেকগুলো দোলনা আর কাঠের ঘোড়াও লাগানো হয়েছিল। মন্দিরের মত ছাদওলা স্থান বাজি-পটকার জন্য সুরক্ষিত ছিল। মালাই-বরফ বিক্রেতারা কত কত ঠেলা নিয়ে জড়ো হয়েছিল তবে এখনও দোকানে জিনিস সাজানো হয়নি। নগরের বড় বাড়িগুলোও সাজানো হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় লেনিন আর স্তালিন তথা অন্যান্য নেতাদেরও বিশাল ছবি টাঙানো ছিল। লেনিন গ্রন্থাগারের উপর লেনিন আর স্তালিনের ছবি এত উঁচু ছিল যে নীচ থেকে চারতলার ওপর অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল। কোনো জায়গা এরকম ছিল

না যেখানে স্তালিনের ছবি নেই। যেখানে সেখানে 'গ্লাবা বেলিকোম স্তালিন' (মহান স্তালিনের জয়) বড় বড় অক্ষরে টাঙানো ছিল। এক জায়গায় বর্তমান পঞ্চবার্ষিক যোজনার সংখ্যার রেখাচিত্রও টাঙানো ছিল।

এত দিন যখন রইলাম, মে-মহোৎসব না দেখে চলে যাওয়া ঠিক না, তাই ইন্তুরিস্ত-এর লোককে ২ মের জন্য লেনিনগ্রাদের ট্রেনে সিট রিজার্ভ করতে বললাম আর লেনিনগ্রাদে টেলিগ্রামও করে দিলাম। এখন আমার মন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার যাত্রাকে আমি খুব লালসার দৃষ্টিতে দেখছিলাম—সে ব্যাপারে পুরোপুরি জবাব পেয়ে গেলাম। উক্ত খবর শোনাতে এক উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক এলেন, তিনি বলতে ইতস্তত করছিলেন। আমি বললাম, 'চিন্তার কিছু নেই।' কিন্তু অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছিলাম। এখন আমার ভাবনা ছিল, যে কবে ভারতে ফিরব। শুধু পড়ানো আমার ভালো লাগতে পারে না। বই লেখার জন্য রসদ যথেষ্ট জমা করেছিলাম, কিন্তু লেখার জন্য কলম উঠছিল না, কেননা অনেকগুলো সেন্সরের মধ্য দিয়ে প্রেস কপি ভারতে প্রকাশকের কাছে পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিল।

২৯ এপ্রিল ফের প্রফেসর তাল্‌স্তোফের কাছে গিয়ে দু'ঘন্টা ধরে কথাবার্তা বললাম। আজ মূলত মধ্য-এশিয়ার মানবতত্ত্ব, পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর প্রাপ্তিস্থান, পুরনো-প্রস্তর-অস্ত্র, তেশিকতাশ (নেঅন্ডর্থল-মুস্তের) মানব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, 'পুরনো-প্রস্তর যুগের অবশেষ তেশিকতাশে পাওয়া গেছে।

মধ্য-প্রস্তর আর পুরনো-প্রস্তরোত্তর যুগের অবশেষ তেশিকতাশ-এর বাইসুন এলাকায় পাওয়া গেছে, যার খুলি ইন্দো-ইউরোপীয়, কপাল দীর্ঘ আর মুখ কৃশ।

নতুন-প্রস্তর যুগের আরম্ভ—এই যুগের শিকারের ছবি দরাউৎসাই-এ পাওয়া গেছে, যাতে মানুষ, পশু, ধনুক, চামড়ার পোশাক আঁকা হয়েছে। ছবি যারা বানিয়েছে তারা আগে রেখাগুলো পাথরে খোদাই করেছে, তারপর তাতে রঙ লাগিয়েছে। ওশের (মধ্য-এশিয়া) পাশের পর্বতে এই কালের ছবি পাওয়া গেছে। পাথরের অস্ত্র আর মৃৎপাত্র মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় পাওয়া গেছে।

দু'রকম সংস্কৃতি—প্রোফেসর জানালেন, 'মধ্য-এশিয়ায় প্রাগৈতিহাসিক কালে দুরকম সংস্কৃতি ছিল। তাতে দক্ষিণী সংস্কৃতির দুটো শাখা ছিল—(১) অনাউ-তেরমিজ-ফরগানায় নতুন-প্রস্তর যুগেও ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি ছিল। এখানকার লোকেরা কৃষিকাজ জানত। এদের মৃৎপাত্র রঙিন হয়। (২) অরাল-দ্রোনী নিম্ন-বক্ষুতে উত্তরদিকস্থ নতুন-প্রস্তর যুগের (৪০০০ খ্রীস্টপূর্ব) সংস্কৃতি ছিল। মানুষ শিকারি পশুপালক ছিল। এদের মৃৎপাত্র অরঞ্জিত আর উৎকীর্ণ হতো।

আদিম পিতল-যুগ—খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানকার লোক পশুপালনের সঙ্গে কৃষিকাজও করত। মৃৎপাত্র আগে লাল রঙের ছিল, পরে ওর ওপরে কালো রেখাচিত্রণ

শুরু হলো। দক্ষিণ আর উত্তর দুটোর সংস্কৃতির তফাৎ ছিল। এদের সঙ্গম-স্থল ছিল খ্বারেজ্ম।

মানব—এর ব্যাপারে তাঁর মত যে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় সহস্রাব্দতে আদিম পিতল-যুগে উত্তরে (কাজাকাস্তান) যে মানব থাকত, তার চেহারা কৃশ ধরনের ছিল। ওই প্রদেশেই খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পিতল-যুগে দীর্ঘ কপাল, চওড়া মুখওলা মানব থাকত, যাদের সঙ্গে ক্রোমিয় জাতির সম্বন্ধ ছিল। উত্তর হোক বা দক্ষিণ, সির-বক্ষু কোনো উপত্যকাতেই খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে হুনের আগে মোঙ্গল মানবের কোনো ঠিকানা ছিল না। খ্রীস্টপূর্ব ১০০০-৫০০-তে দক্ষিণ সাইবেরিয়া (খকাশিয়া) ওইরোদ, ক্রাস্নোযার্স্কে মোঙ্গল মানবের অবশেষ পাওয়া গেছে।

হূন—হূনদের আক্রমণ কাল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর প্রথম-প্রথম মোঙ্গল মানব অল্‌তাই থেকে পশ্চিমে দেখা যেত। ওই সময় অল্‌তাই—এনীসেই মোঙ্গল আর ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সীমারেখা ছিল। শুদ্ধ হূনের নিদর্শন আজকাল যাকুত আর তুংগূতদের মধ্যেই বেশির ভাগ পাওয়া যায়।

শ্বেত হূন—আমার ভাবনার সমর্থনে শ্বেত-হূন বা হৈফ্‌তালদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হল—গ্রিক লেখকও এই শব্দকে ভ্রম সৃষ্টিকারী বলে মনে করে। শ্বেত হূনদের চেহারা-আদোল ইন্দো-ইউরোপীয়দের মত। শ্বেত হূনদের ভাষার দু-একটি প্রত্যয় হূনদের সঙ্গে মেলে, যেমন মিহিরকুলে 'কুল' (কুল্লী, দাস)।

পশ্চিমে মোঙ্গল—প্রফেসর তাল্‌স্তোফ পশ্চিমে মোঙ্গলদের তিনটে ধারায় আসার কথা বললেন। (১) লাপ—এরা নতুন-প্রস্তর যুগে উত্তরমেরু প্রদেশ থেকে পশ্চিমে ফিনল্যান্ড আর নার্বে অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল। এদেরই বংশধর আজকের লাপরা।

(২) হূন—খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে হূন নিজেদের পুরনো ভূমি (হোয়াং-হো থেকে মোঙ্গলিয়া) ছেড়ে পশ্চিমদিকে গেল। এই ধারা অতিলার হূনদের রূপে চতুর্থ শতকে মধ্য-দানিয়ূব উপত্যকা (হুংরী) অব্দি পৌছল, যেখানে এখন ওদের ইউরোপীয় মিশ্রিত বংশধররা থাকে। এই ধারারই অবশেষ ভোলগার আশেপাশে চুবাশ, ভোলগার আর কাজার ছিল। চুবাশ আজও আছে, কিন্তু ওদের ভাষায় মোঙ্গল-প্রভাব খুব বেশি, শরীরের লক্ষণগুলোতে ওরা ইন্দো-ইউরোপীয় মিশ্রণের দ্বারা অধিক প্রভাবিত।

(৩) তুর্ক—এই ধারা ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাগমন করতে লাগল আর দ্রিয়েপর-এর তট অব্দি পৌছল। এর দুটো ভাগ ছিল। (ক) কিপচক, (খ) আগুজ। মোঙ্গলদের ভাষা-বিকাশ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে তুর্ক আগে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ হলো যারা সপ্তনদ (ইলী-চু-পরেস)-এ আগে এসেছিল। এদেরই বংশজ বর্তমান কাজাক আর কিরিগিজরা। কাজাকদের লিখিত সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর আগের কিছু

পাওয়া যায় না। তুর্কদের দ্বিতীয় শাখা সির-বক্ষু উপত্যকায় এসেছিল। এই শাখার প্রথম লেখক একাদশ শতাব্দীর মহমুদ কশগরী, যে নিজের সময়ের ভাষা আর জাতিদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা বলেছে। এটাই উজবেক-ভাষার মূলরূপ। উজবেক-ভাষায় ইরানী ভাষার খুব প্রভাব পড়েছে, শুধু ধার নেওয়া শব্দে নয়, ভাষার ধাঁচেও।

তুর্কিদের থেকে ভিন্ন গুজ (বা আগুজ) হুন শাখারই বংশধর বর্তমান তুর্কমান, আজারবাইজান আর উসমানী (তুর্কিস্তানের বাসিন্দা) তুর্ক।

তুর্কমানদের সম্বন্ধে তিনি বললেন যে এদের ওপর ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভাব বেশি, মোঙ্গল-প্রভাব কম। এদের ভাষা মোঙ্গল আর সংস্কৃতি ইরানী। উজবেকদেরও একই ব্যাপার। কাজাকদের মধ্যে যতই পশ্চিম দিকে যাওয়া যায় ততই ইন্দো-ইউরোপীয় অংশ বেশি হতে থাকে। এরা ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর তুর্কিদের বংশধর। কিরগিজদের মধ্যে মোঙ্গল রক্ত বেশি।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সপ্তনদ নিবাসী শক-বংশজ বুসুনরা আয়ত-কপালের ছিল।

ফিনিশ আর মুণ্ডা-দ্রাবিড় ভাষাগুলোর সাদৃশ্য ভাষাতত্ত্বর ওইরকমই এক সমস্যা। এই সাদৃশ্য বলে দেয় যে কোনো সময় উত্তরমেরুতে থাকা ফিন আর নিরক্ষ রেখার পাশে থাকা দ্রাবিড়দের বংশ এক ছিল। প্রফেসর তাল্‌স্তোফের বক্তব্য অনুসারে এই বংশের বিভাজন নতুন-প্রস্তর যুগে হয়েছিল—খ্‌বারেজ্‌ম আর ভারতের তৎকালীন প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের সাদৃশ্যও এই কথাই বলে, তবে মৃৎপাত্রকে এখনও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই বংশের একটা শাখা—ফিনো উইগুর, আর অন্যটা দ্রাবিড়। দ্রাবিড়-শাখাও দক্ষিণী, (মালায়ালম, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, তুলু) আর মুণ্ডা (কোল, গোন্‌ড়ী, মুণ্ডা, কুবী, কুরুখ, কুই, মল্‌তো)-তে বিভক্ত।

তাল্‌স্তোফের জ্ঞান খুবই বিশাল, তা বলার প্রয়োজন নেই। আমি যাবার সময় খুব কৃতজ্ঞতা জানালাম আর তিনি পুনরায় সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ জানালেন। ওই দিনই আমি দত্তভাই-এর জীবনীর জন্য নোটও নিলাম।

এখন আমি ভারতে ফেরার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আসার রাস্তা দিয়ে ফেরা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই ইরানের রাস্তা দিয়ে ফেরার কথা ভাবছিলাম না। এখন দুটো রাস্তা ছিল। সবচেয়ে কাছের রাস্তা ছিল আফগানিস্তান হয়ে। আমি আফগানিস্তানের সীমা অব্দি সহজেই পৌঁছতে পারতাম, তারপরের জন্য আমার কাছে পাউন্ডে চেক ছিল, সেটা দিয়ে যদি এখানে পাউন্ড পাওয়া যেত তো আমি নিশ্চিত থাকতে পারতাম, তা নয়তো আমুনদীর তট দিয়ে কাবুল অব্দি যাত্রাব্যয়ের ব্যবস্থা না করে যাওয়া ঠিক না। আমি ব্রিটিশ কন্‌সালের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'চেকের ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারব না, কিন্তু যদি তিরিশ পাউন্ডের রুবল জমা করে দেওয়া হয় তাহলে আমি আমাদের স্টকহোম দূতাবাসে বা কাবুলে টেলিগ্রাম করে দেব, সেখানে টাকা পেয়ে যাবেন।' তিনি পরামর্শ দিলেন, 'লেনিনগ্রাদ থেকে স্টকহোম ঘুরে লন্ডনে যাওয়াই ভালো, খরচা ৩০ পাউন্ডের বেশি পড়বে না।' আমার পাসপোর্টের ওপর সুইডেন আর আফগানিস্তানের নামও লিখে দেওয়া হলো। কাবুলের রাস্তা আমার পছন্দ ছিল। কিন্তু তেরমিজ থেকে কাবুল পৌঁছনোর

কোনো উপায় বার করতে পারছিলাম না। লন্ডনের রাস্তায় যাবার একটা সুবিধেও ছিল যে আমি রুবলে ভাড়া চুকিয়ে সোভিয়েত জাহাজে যেতে পারতাম। ওই সময় কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছিল যে দু-তিনমাসেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে করতেও পনেরো মাস আরো থেকে যেতে হলো।

রাত আটটায় সার্কাস দেখতে গেলাম। তেমন কোনো বিশেষত্ব ছিল না। অনেকগুলো সিংহ নিজেদের খেলা দেখাতে থাকল, যাদুকর শুধুমাত্র খবরের কাগজ থেকে অনেক কাগজের টুকরো বার করল, একটুখানির মধ্যে সেগুলো স্তূপাকার হয়ে গেল, তারপর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল। এক চৈনিক যাদুকর পেট থেকে চীনে-মাটির প্লেট বমি করে দেখাল।

আজও সন্ধেবেলায় শহরে আলোকমালা ছিল।

মে দিবস—লাল ময়দানে মে-মহোৎসব দেখতে যাবার ছিল। পাস ছাড়া ওখানে কেউ যেতে পারত না। ভোক্স পাসের ব্যবস্থা করে দিল। যদিও লাল ময়দান আমাদের হোটেল থেকে রাস্তা পার হয়ে কয়েক পা পরেই শুরু হচ্ছিল, কিন্তু আজকের রাস্তা অতটা সোজা ছিল না। চারদিকে জবরদস্ত সৈনিকদের ব্যবস্থা ছিল। কিছু জায়গায় গিয়ে তো এই জবাব পাওয়া গেল—'যাও, এখান দিয়ে যেতে দেব না।' আবার কেউ বলল, 'তৃতীয় ধার দিয়ে যাও।' এক ডজনের থেকেও বেশি বার পাস এবং পাসপোর্ট দুটোই দেখাতে হলো। লাল ময়দানে আজ খুব নামী-দামী লোক এসেছিল, পুঁজিপতিদের কোনো গুন্ডা এসে পিস্তল না চালিয়ে দেয়! তাই এত ব্যবস্থা। শেষে আধঘণ্টা চক্কর কেটে ময়দানে পৌছলাম।

নেতাদের দাঁড়াবার জায়গার ডানদিকে সিমেন্টের গ্যালারি বানিয়ে রেখেছিল, যার মধ্যে ১৪ নম্বরের গ্যালারিতে আমার স্থান পেছনের পংক্তিতে ছিল। সব লোকজন দাঁড়িয়েছিল, তাই আমাকেও দাঁড়াতে হলো। ময়দানের উল্টোদিকে পারে বিশাল বাড়ির একেবারে সবচেয়ে ওপরে মস্ত সোভিয়েত-প্রতীক লাগানো ছিল, যার নীচ মে-র অভিনন্দন এবং অন্য শ্লোগান লেখা ছিল। লেনিন আর স্তালিনের বিরাট ছবিও ওখানেই লাগানো ছিল। বাড়ির ওপরে সংঘের ষোলটি প্রজাতন্ত্রে নিজের নিজের প্রতীকের সঙ্গে ঝাণ্ডাগুলো উড়ছিল। ইতিহাস মিউজিয়মের বাড়ির ওপরেও শ্লোগান লাগানো ছিল, যার বাঁদিকে ছিল বিশাল কাস্তে, হাতুড়ি আর ডানদিকে ছিল তারা।

নটা বাজতেই জায়গা ভরতে আরম্ভ করল। ময়দানে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর সেনা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দশটায় নেতারা এলেন। সবচেয়ে আগে সৈনিক বেশে স্তালিন, মার্শাল রোকোসোবস্কী, তারপর মন্ত্রীরা, বহু মার্শাল আর জেনারেল। মার্শাল রোকোসোবস্কী আজকের প্যারেডের প্রধান ছিলেন। স্তালিনের বক্তব্য রোকোসোবস্কী পড়লেন। তারপর প্রদর্শন শুরু হলো। প্রথমে হেঁটে, ফের নৌবাহিনীর জওয়ান মার্চ করতে করতে বের হলো, তারপর সওয়ার এবং অন্যান্য সেনারা, ঘোড়সওয়ার তোপখানার সেনা, মোটর আর ট্যাঙ্কওলা সেনা। আকাশে ছটি বিমানের গুচ্ছ এই সময় দেখা গেল। দেড় ঘণ্টা কাটল সেনা প্রদর্শনে। দর্শকদের সামনে দিয়ে অসংখ্য সেনা গেল। নানা রকমের তোপ, একই

সঙ্গে পাঁচ-পাঁচ, সাত-সাত গোলার মালা ছোঁড়ার কার্তুজ, বিশাল তোপ, তারপর গেল প্যারাসুটওলা জওয়ানে ভরা লরি। আবহাওয়া খুব ভালো ছিল। দেশী-বিদেশী সংবাদদাতা আর ফিল্মের লোক ফটো তুলতে ব্যস্ত ছিল। সাড়ে এগারোটার সময় নাগরিকদের প্রদর্শন শুরু হলো। আমি শেষ অব্দি থাকতে পারিনি। প্রদর্শনের মাত্র দুঘণ্টা দেখলাম। অনেক দর্শক তো সেনা প্রদর্শনের পরেই ফিরে যেতে লাগল।

যদিও আমার হোটেল একদম কাছে ছিল, কিন্তু ফেরা সহজ ছিল না। ফেরার সময়ও বহু সৈনিকদের পঙ্‌ক্তিগুলোতে পাস দেখাতে হলো। ১০ শতাংশ সৈনিক রুক্ষও পেলাম, বাকি সবাই অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছিল। নাগরিক প্রদর্শন-পঙ্‌ক্তি দিয়ে সারা রাস্তা পূর্ণ ছিল। এই চলমান জন-সমুদ্রকে পার করা সোজা কাজ ছিল না। জানতে পারলাম যে নগরের কেন্দ্রের রাস্তা বন্ধ। ন্যাশনাল হোটেল নগরকেন্দ্রেই ছিল। তাহলে কি সন্ধে অব্দি হোটেলে যেতে পারব না? কিন্তু আধ ঘণ্টায় আমি নিজের হোটেলে পৌঁছে গেলাম। ভোজনের জন্য জাভা-নিবাসী বন্ধু শামাউনের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলাম, কমরেড শামাউনের ছেলে করীম নিতে এসেছিল। নটার পর আলোকমালা দেখতে গেলাম। কিন্তু এটা নগরের একটা প্রান্তে ছিল তাই ভালো আলোকমালা দেখতে পেলাম না এবং আতশবাজী থেকে তো একদমই বঞ্চিত থাকলাম। ভূগর্ভ রেলে এসে পুস্কিন-চৌরাস্তায় বাচ্চাদের বাজার দেখলাম। অত্যন্ত ভিড় ছিল। জানতে পারলাম, ছটার সময়ই সব রাস্তা খুলে গেছে। জায়গায় জায়গায় আলোকমালা ছিল, কিন্তু সবই তো আর বাড়িতে নয়। কেন্দ্রীয় তার-ঘরে জ্বলছে নিভছে রঙ-বেরঙের রোশনী। বড় ভালো দেখাচ্ছিল। আলোর অক্ষরে লেখা 'প্রথম মায়া', মধ্যিখানে ঘূর্ণায়মান ভূমণ্ডল, ঢেউ জ্বলছিল। আমাদের হোটেলের সামনের ময়দানে ডানপাশে নাগরিকরা গান আর ব্যায়াম দেখাতে মগ্ন ছিল। মে-র অপূর্ব মহোৎসব দেখে রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় আমি নিজের ঘরে পৌঁছলাম। আজই সবুজ-সবুজ পাতাও দেখলাম। বসন্ত এসে গেছে।

ফের লেনিনগ্রাদে

২ মে সাতটার সময় গাড়ি ধরলাম আর পরের দিন লেনিনগ্রাদ পৌঁছে গেলাম। ব্রিটিশ কন্‌সাল অনেক খবরের কাগজ দিয়ে দিয়েছিলেন, যেগুলো ট্রেনেও পড়ছিলাম আর এখানেও পড়ছি। লেনিনগ্রাদেও এখন গাছে কুঁড়ির মত পাতা বের হচ্ছিল। নেবার ধার মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও তাতে বরফের শিলা বহে যাচ্ছিল।

৬ মে গাছপালার অবস্থা দেখে বলতে হলো, গাছে এবার পাতা খুব ধীরে ধীরে বের হচ্ছে। শীত এখনও যায়নি। লদোগা নদী তার বরফের উপহার নেবার মাধ্যমে সমুদ্রে

পাঠাচ্ছিল, যা ৬ মে-তেও সেই ভাবেই বহে যাচ্ছিল। ১০ মে-র মধ্যে ঠিক করে নিলাম, যে আরেক বছর এখানেই থাকি। মধ্য-এশিয়া গেলাম না। মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস সামগ্রী এর মধ্যে আরো জমে যাবে। কিন্তু আবার এক বছর রেড়িও ছাড়া থাকা যাবে না, তাই ১০ মে-তেই সাড়ে তিন হাজার রুবলে একটা নতুন রেডিও কিনে আনলাম। আমার কাছে রেশনকার্ডের মত একটা কার্ড ছিল, যার জন্য ৭০০ রুবল কম দিতে হলো। আমার বন্ধু তথা ছাত্র বলছিল যে যদি ছ মাস অপেক্ষা করি তাহলে অর্ধেক দামে পাওয়া যাবে। ওর কথা সত্যিই প্রমাণিত হলো। ছ মাস বাদে রেডিও ১৬০০ রুবলে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আমি দ্বিগুণ দাম দিতে রাজি ছিলাম, কেননা আরো ছ'মাস দেশ-বিদেশের খবর থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারছিলাম না। রেডিও ছোট আর খুব সুন্দর ছিল। সেই দিনই দিল্লী শুনলাম। লন্ডন তো খুব পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। পেছনে তার বেঁধে দিলে দিল্লীও লন্ডনের মত শোনাচ্ছিল। মাদ্রাজ কখনো কখনো শোনা যেত। এটা বলার দরকার নেই, যে দূর থেকে লঘু তরঙ্গের কথাই শুনতে পাওয়া যেত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। আমাদের এখানকার নাটকও শুনতাম, গান আর সমাচারও শুনতাম। আমাদের বাড়িতে এই সব জিনিসে আনন্দ পাবার লোক আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কয়েক হপ্তা শোনার পর স্টেশন এবং সময়ের খবর জানা গেল। মনে মনে সন্তুষ্ট হলাম—যাক, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে আরো এক বছর থাকা যাবে।

নির্দিষ্ট সময়ানুসারে এখন আমি আবার ইউনিভার্সিটি যেতে লাগলাম। ছাত্ররা তো পড়ছিলই, অধ্যাপকরাও আমার উপস্থিতিকে কাজে লাগাতে চাইছিল। তারা কিছু মহাভাষ্য[১]-র ব্যাকরণও পড়ল। আরম্ভে আহ্নিক ততটা নীরস নয়, বিশেষ করে ভাষতত্ত্বে যারা রস আস্বাদন করতে পারে তাদের সেখানে পদে পদে ঔৎসুক্য ফুটে উঠছিল। একটু উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়ে কিছু শব্দ রুশ শব্দের মত দেখে ছাত্ররা খুব খুশি।

১২ মে শ্রীমতী শ্চেরবাৎস্কীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়া হলো। ডাক্তার শ্চেরবাৎস্কী বড়ই মধুর স্বভাবের ছিলেন। দ্বিতীয় যাত্রায় আমার তাড়াতাড়ি চলে আসাতে তাঁর খুব দুঃখ হয়েছিল। তিনি চেষ্টা করছিলেন, যাতে আমি বেশি সময়ের জন্য রাশিয়ায় আসি। সেই সময়ই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আর যুদ্ধের দিনে লেনিনগ্রাদ থেকে উত্তরের কাজাকাস্তানে গিয়ে তিনি নিজের দেহ-যাত্রা সমাপ্ত করলেন। ওই বাড়িতেই আজ গেলাম, যেখানে ১৯৩৭-এ না জানি কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের কথাবার্তা হতো। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বলেছিলেন, 'স্বাগতম্ ইদমাসনং উপবিশ্যতাম।'[২] এখনও ওই শব্দ আমার কানে বাজছিল। নিমন্ত্রণ খেতে সংস্কৃতাধ্যাপক কলিয়ানোফও সস্ত্রীক এসেছিলেন। দুটার সময় চলে আসার কথা ছিল; কিন্তু শ্রীমতী তৈরি হতে বাড়িতেই ছটা বেজে গেল। শ্চেরবাৎস্কীর রিক্ত স্থান দেখে মনে অনেক রকমের চিন্তা আসছিল, যাকে বৈরাগ্যের মধুর সংমিশ্রণও বলা যেতে পারে। শ্রীমতী শ্চেরবাৎস্কী জার্মান বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন। যখন তিনি শ্যামা

[১]পতঞ্জলিকৃত পাণিনিসূত্রের বৃহদ্‌ভাষ্যগ্রন্থ।—স·ম·

[২]'আসুন, এই আসন গ্রহণ করুন।'—স·ম·

(যুবতী) ছিলেন, তখনই শ্চেরবাৎস্কীর জমিদার বংশে পরিচারিকা হয়ে এসেছিলেন। তিনি পাকবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন। আচার্য শ্চেরবাৎস্কী মারা যাওয়া অব্দি তিনি তাঁর পাচিকা ছিলেন। বলশেভিক বিপ্লব শ্চেরবাৎস্কীর বিশাল জমিদারিকে শেষ করে দিল, কিন্তু 'বিদ্যা ধনং সর্বধন প্রধানম্।' শ্চেরবাৎস্কী প্রথমেই নিজের বিদ্যার বলে অকাদেমিক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের 'রাজাবাবু' বন্ধুদের মত পাগল হননি। তিনি রাজনীতিকে নিজের থেকে আলাদা রেখেছিলেন। আর বলশেভিকদের ব্যবহারে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওদের এখানে বিদ্যার কদর আগের চাইতেও বেশি হবে, তাই খুব একাগ্রতার সঙ্গে তিনি নিজের কাজে লেগে গেলেন। প্রথমে তাকে কিছু সময় জমিদারির কাজেও দেখতে হতো, কিন্তু এখন তাঁর সমস্ত চিন্তা সরকার নিয়েছিল। যে সময় শস্যের ভীষণ আকাল ছিল, সেই সময়ও সবার আগে অকাদেমিক-দেবতাদের দিকে সরকারের নজর গেল। শ্রীমতী ১৯৩৭-এ আমার এখানে আসার সময়ও তাঁর মালিকের পাচিকা মাত্র ছিলেন। পরে জানলাম যে ৭০ বছরের বর ৫৫ বছরের বধূকে বিয়ে করেছে।

আচার্য শ্চেরবাৎস্কী সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন। পারিবারিক ঝঞ্ঝাটকে তিনি শুধু নিজের মাতৃভক্তি দিয়ে সীমিত রেখেছিলেন—ওঁর মা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। মারা যাবার কাছাকাছি সময়ে পৌঁছে, শ্চেরবাৎস্কী ভাবলেন যে নিজের বৃদ্ধ পাচিকাকে যদি বিয়ে করেন, তাহলে অকাদেমিকের পেনশন জীবনভোর সে পাবে, তাই তিনি বিয়ে করলেন। অকাদেমি শিক্ষা সম্বন্ধীয় সোভিয়েতের সবচেয়ে বড় সংস্থা। কোনো বিদ্বানের সর্বোচ্চ সম্মান যা হতে পারে, তা হচ্ছে অকাদেমির সদস্য হওয়া অর্থাৎ অকাদেমিক হওয়া। নিজের বিষয়ের চূড়ান্ত বিদ্বান তথা নতুন জ্ঞান দিতে সক্ষম ব্যক্তিকেই অকাদেমিক বানানো হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় এখনও অকাদেমিকের সংখ্যা ১৫০-এর বেশি নয়। অকাদেমিক হলেই মানুষ জীবনভোর ৬০০ রুবল মাসিক পাবার অধিকারী হয়ে যায়। শ্রীমতী শ্চেরবাৎস্কী ওই বেতন পাচ্ছেন আর যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন অব্দি পাবেন। এ ছাড়াও শ্চেরবাৎস্কীর ছবি, বাজনা, বই, সোনা-রুপোর বাসন ইত্যাদি অনেক সম্পত্তি আছে। বই-এর বেশিটাই পঞ্চাশ হাজার রুবল দিয়ে ইউনির্ভাসিটি কিনেও ফেলেছে।

শ্রীমতী শ্চেরবাৎস্কীর পাকবিদ্যার বন্ধুমহলে বেশ খ্যাতি আছে। তাঁর নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর খুব শখও আছে। শেষমেশ টাকাও তো অনেক আসছে তাঁর। সেটা খরচ করারও তো কোনো ব্যবস্থা হওয়া দরকার? তিনি বেশ সুন্দর সুন্দর রান্না তৈরি করেছিলেন। ভারতীয় ঢঙেও একটা মাংস রান্না করেছিলেন। গুড়ো মশলার কৌটো দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন ভারতের এই জিনিসও আমার কাছে আছে।' খাওয়া আর কথাবার্তা বলতে বলতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওখানে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছিল—যদি ডঃ শ্চেরবাৎস্কী এই সময় থাকতেন! নটা পর্যন্ত দিনের আলো ছিল, এগারোটায় আমি বাড়ি পৌঁছলাম।

বলা যায়, মে মাসের মাঝামাঝি ছিল, কিন্তু এখন আমাদের এখানের পৌষ-মাঘের শীতকে হার মানিয়ে দেবার মত ঠাণ্ডা ছিল। ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি যাচ্ছিলাম। এই সময়

পুলিশ একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওখানে তো সব বাড়িতেই কাঁচের জানলা। কাঁচে পাথর ছুঁড়লে তার ভাঙার আওয়াজ কর্ণপ্রিয় মনে হয়, তাই ছেলেটা কাঁচ ভেঙে দিয়েছিল। সেজন্য পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ভুল এটুকুই করেছিল, সাধারণ কাঁচ না ভেঙে সে আগুন নেবানোর জন্য বিগ্রেডকে ডাকবার যে যন্ত্র, তার কাঁচ ভেঙে দিয়েছিল। ছেলেটা বেচারি খুব কাকুতি-মিনতি করছিল। পুলিশ উপহাস করে বলেছিল, 'না বাবা, চলো। তুমি খেলার ভালো ঢঙ শিখেছ।' আন্দাজ করা যাচ্ছে, দু-চার ঘণ্টা ভয় দেখিয়ে ধমকে ছেলেটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন ওর গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়াচ্ছিল।

রেডিও কেনার চমৎকারিতা এবং ফল তাড়াতাড়িই পাওয়া গেল। পনেরো মে-তে দিল্লী-রেডিও খবর দিল যে ভারতের নতুন জাতীয় সরকার হতে চলেছে। প্রদেশেও নতুন সরকার হয়েছে, যার মধ্যে বাঙলাকে ছেড়ে প্রায় সবই কংগ্রেসের। প্রদেশগুলোর মুখ্য মন্ত্রীদের নামও শুনলাম। ১৬ মে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের ভারত সম্বন্ধে বক্তব্য বের হলো, তাতে পাকিস্তানকে অবাস্তব এবং জাতীয় সরকার দৃঢ় করবার ব্যাপারে বহু রকম কথাই বলা হলো। একই দিনে পৈথিক লরেন্সের ভাষণও রেডিওতে হলো। এই সব খবর ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু এক মাস ধরে চলা এই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তার কোনো উল্লেখ মস্কো রেডিওতে ছিল না।

বহু যুগ পরে ১৮ মে-তে ২০ মার্চে কলকাতায় ফেলা আনন্দজীর চিঠি পেলাম, যার থেকে জানতে পারলাম যে আমাদের লংকার আচার্য শ্রীধর্মানন্দ মহাস্থবির এখন ইহজগতে আর নেই। আশির কাছাকাছি গিয়ে মারা গেছেন। তাই কালের দিক দিয়ে নালিশ থাকা উচিত নয়, কিন্তু তিনি ছেড়ে চলে গেলেন, তিনি তাঁর গুণের কথা মনে পড়ে দুঃখ হচ্ছে। মহাস্থবির খুবই সরল আর মধুর হৃদয়ের লোক ছিলেন। নিজের শিষ্যের ওপর আর আমার ওপর তিনি খুব স্নেহপরবশ ছিলেন। আমি প্রথম-যাত্রায় তিব্বতে ছিলাম। নেপাল আর তিব্বতে তখন যুদ্ধ প্রায় লেগে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে তিনি টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করলেন আর জানতে চাইলেন যে লাসায় উড়োজাহাজ যেতে পারে কিনা। সেই লড়াই শেষ হবার পর তাঁরই পাঠানো টাকায় বাইশটি খচ্চর বোঝাই বই আর অন্যান্য জিনিশ নিয়ে আমি সোয়া বছর বাদে তিব্বত থেকে ফিরে লংকায় চলে এলাম। যে সময় ভারতে ১৯৩০-৩১-এর সত্যাগ্রহ চলছিল, আমি খুব সঙ্কোচ করে কিছুদিনের চেষ্টার পর যখন তাঁর কাছে ভারতে যাবার অনুমতি চাইলাম, তিনি স্নেহ-পরবশে একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। আমাকে ওই সময় নিজের ইচ্ছে ত্যাগ করতে হয়েছিল। আমার ওপরেই তার এই অসাধারণ স্নেহ ছিল না, নিজের সব শিষ্যদের তিনি নিজের স্নেহ খুব উদারতার সঙ্গে বিতরণ করতেন। পালি[১] ভাষা আর ব্যাকরণের তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেকগুলো বই সম্পাদনা ও উদ্ধার করে ছিলেন। হতে পারে আরো কিছুদিন তাঁর নাম লোকে মনে রাখবে। কালের মহাসমুদ্রে হাজার দু হাজার বছরেরও তো কোনো

[১]মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষাবিশেষ, যে ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন বা প্রধানতঃ যে ভাষায় তাঁর উপদেশ রক্ষিত হয়েছে।—স.ম.

অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের হাত থেকে কাল কত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। যাকে আমি বাচ্চা দেখেছি সে আমার সামনেই জোয়ান হয়ে চুলও পাকিয়ে বসে আছে। আমার ছোটবেলাকার কত তরুণ আর বৃদ্ধ তো না জানি কবেই অনন্ত মৌনের কোলে লীন হয়ে গেছে। সবাইকে একদিন ওই রাস্তায় যেতে হবে। মরার পরও অমর হওয়ার যতই ইচ্ছে হোক না কেন, শেষমেশ কিন্তু সবাইকে বালির ওপরে পড়া পদচিহ্নের মত লুপ্ত হয়ে যেতে হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শরীর এবং জীবনকাল নিঃসার। তা তুচ্ছ, তা ঘৃণ্য, তা পরিত্যাজ্য। বস্তুত এই জীবনকালের মধ্যেই জীবনরূপ বহুমূল্য রত্নও আছে। তাকে তুচ্ছ বলা যায় না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি মুহূর্ত, যা কেবল বর্তমানই হতে পারে—তা অমূল্য, তা সত্য।

পরের দিনগুলোয় আমার রেডিও ভারতের অনেক খবর দিচ্ছিল। ত্‌কাচেই-এ আমার ঘরের বায়ুমণ্ডলে হিন্দি আর ভারতীয় সঙ্গীতের বরাবর প্রচার হচ্ছিল। দিল্লী রেডিওর ঘরে বসে গায়ক বা বক্তা কি করে জানবে যে তার আওয়াজ ৬ হাজার মাইল দূরে এই অজ্ঞাত নগরের, অজ্ঞাত এক ঘরের ভেতর ভেসে আসছে?

২২ মে কৌতূহলবশত আমি সোভিয়েত আদালত দেখতে গেলাম। আদালত, তা যদি সরকারি হয়ও, সবার রোয়াব সোভিয়েত-শাসন-প্রণালী শেষ করে দিয়েছে। এটা ছিল পাড়ার আদালত। আজ প্রধান জজ অসুস্থ থাকায় আমি কার্যকলাপ দেখতে পেলাম না। এখানকার প্রত্যেক আদালতে তিনজন জজ বসেন, যাদের জন্য লাল কাপড়ে ঢাকা টেবিলের পেছনে তিনটে চেয়ার এজলাসের মত করে একটু ওপরে রাখা ছিল। ছোটমত কামরা। জর্জ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচিত হন, যিনি কিছু দিনের জন্য ওই পদে থাকেন। উকিলদের সংখ্যা কমে গেছে। কেননা পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমা ওই দেশে খুব সঙ্কুচিত, তাও উকিল আছে আর সে প্র্যাকটিশও করে, কিন্তু বেশির ভাগ সরকারি বেতনভোগী কর্মচারীর নিয়মে। প্রত্যেক মোকদ্দমায় তাদের কষ্ট করার দরকারও হতো না। ওদের অফিসে সাইনবোর্ড লাগানো থাকে। যাকে আইনের পরামর্শ নিতে হতো, সে নির্ধারিত সময়ে সেখানে গিয়ে নিতে পারত। যতই হোক, জজকে দেখেই যদি নিশ্বাস না বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে কি আদালত বলা যায়? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম শুনেই যদি লোকের নিঃশ্বাস ওপরে না উঠে যায়, সেও কি তাহলে কোনো জেলা শাসক? সোভিয়েতে তো ওই একটা নমুনা আছে। গ্রামের ১৮ বছরের বেশি বয়সের লোকেরা মিলেমিশে ভোট দিয়ে গ্রাম শাসন করার জন্য নিজেদের সোভিয়েত (পঞ্চায়েত) নির্বাচন করে নেয়, যার একটা মুখিয়া সোভিয়েতরা নির্বাচন করে। গ্রামের মতই তহসীল (রায়েন) আর জেলারও সোভিয়েত নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কিন্তু জেলার সোভিয়েত সভাপতিকে, যাকে আমাদের এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট বলা উচিত, দেখে কারো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে না, বরং যে কেউ গিয়ে তার সঙ্গে কোনো লৌকিকতা ছাড়াই কথাবার্তা বলতে পারে। রোয়াব সত্যিই ওই দেশ থেকে উঠে গেছে। লেনিনগ্রাদের মত উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলর মহিলাকে ঘরের ঝাড়ুদারনী অথবা টাইপিস্ট-মেয়েদের সঙ্গে বসিয়ে দিলে আপনি চিনতে পারবেন না, যে তিনি একজন ভাইস-চ্যান্সলর। ছাত্ররা,

অধ্যাপকরাই শুধু নয়, সাধারণ চাকরবাকর অব্দি তাঁকে সম্বোধন করতে গিয়ে না খুব সেলাম-টেলাম করে আর না বাড়তি সম্মান দেখায়। কিন্তু তাই বলে ওখানে মুড়ি-মুড়কির একদর হয়ে যায়নি। যোগ্য স্থানে যোগ্য লোকই পৌঁছতে পারে।

২৬ মে দেখলাম আবার শ্বেতরাত্রি চলে এল। নটার সময় সন্ধে অব্দি রোদ ছিল। মনে হচ্ছে, যখন থেকে ১৮ ঘণ্টা দিন সে নিজের পকেটে ঢোকায়, তখন থেকে বাকি ছ ঘণ্টাও সে রাত্রির পেটে যেতে দেয় না। শ্বেতরাত্রিতে বাড়ির বাইরে বারোটার সময়ও আপনি খবরের কাগজ পড়তে পারেন! রাত্রি বড়দিনের মতো হয়। বড়দিনের মানে হলো সূর্য বেশি সময় জুড়ে তার আলো আর তাপকে চারদিকে ছড়িয়ে রাখে। কিন্তু শীত তো এখনো যায় নি। হ্যাঁ, নেবা এখনো মুক্ত ধারায় বয়ে চলেছিল। লেনিনগ্রাদেই নেবা সমুদ্রে মিশে যায়। এটা সামুদ্রিক মাছের ডিম পাড়ার সময়। তাই ডিম পাড়বে মনে করে কোটি কোটি মাছ নেবার থেকে ওপর দিকে উঠে এসেছিল। মাছওলাদের বিরাট সুযোগ। পাঁচটা আঙুল তাদের এখন ঘিয়ে চোবানো। লোকদেরও খুব সুবিধে হয়েছে। মাছ ৬০ রুবল (২০ টাকা) কিলোগ্রাম দরে পাওয়া যাচ্ছিল।

মস্কোয় নাটক দেখাটা আমার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। লেনিনগ্রাদে অত যেতে ইচ্ছে করত না। মস্কোর অপেরা দেখে এসেছিলাম। পয়লা জুনে (১৯৪৬) আমি এখানকার মালী অপেরা থিয়েটারে গেলাম, যেখানে 'কাল্পনিক রব' ব্যালে দেখানো হচ্ছিল। অপেরা থাকলে আমি যেতাম না, নতুবা গলা ধরলে তবেই যেতাম! কিন্তু ব্যালে তো আমি পছন্দ করতাম। অভিনয় আর নাচ খুব সুন্দর ছিল। এই নাট্যশালাও মারিন্সকীরই মত কিন্তু ছোট। এতে সাত-আটশো লোক বসতে পারে। বাইরে থেকে দেখলে তো একদম সাধারণ বাড়ির মত মনে হয়, কিন্তু ভেতরে যথেষ্ট জায়গা। দর্শকদের ভিড় ছিল। নাটকের গল্প ছিল—পারিবারিক বাধার কারণে তরুণ-তরুণী বিয়ে করতে পারছিল না। দুজনেই আলাদা আলাদা ভাবে পালিয়ে ইটালির কোনো শহরে অজ্ঞাতবাস করছিল। তরুণী পুরুষ বেশে পালিয়েছিল। এই অজ্ঞাতস্থানে তার অন্য আরেক তরুণীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। পিতা তাকে উপযুক্ত বর মনে করে নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য বাধ্য করতে লাগল। শুকোতে দেওয়া কাপড় থেকে পার্থক্য পরিষ্কার বোঝা গেল। চতুর ভৃত্য প্রেমিককে তার প্রিয়তমার মরার আর নব বিবাহিতাকে তার নবীন বরের মরার খবর দিয়ে দেয়। দুজনেই ছুরি নিয়ে আত্মহত্যা করতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু একে অন্যকে পেয়ে আনন্দ-পারাবারে ডুবে যায়। চতুর ভৃত্য দ্বিতীয় মেয়েটির পতি হয়ে যায়। এবং একই সময়ে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নৃত্যনাট্যের সুন্দর বৈশিষ্ট্য ছিল। দুজন নায়ক-নায়িকা আর তাদের বন্ধুরা এই কলায় খুব নিপুণ ছিল। ইটালির নাচের মধ্যে গণনৃত্য, শিশুনৃত্য এবং আরো বহু ধরনের নৃত্য ছিল। আমি তিনজনের টিকিট নিয়েছিলাম, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি আসেনি বলে ২৫ রুবল নষ্ট হলো।

৩ জুন ১৯৪৬-এ সোভিয়েত দেশে আসা আমার এক বছর হয়ে গেল। আজ লেখা-জোখার দিন। মধ্য-এশিয়া না যেতে পারার কারণে মন অবশ্যই খারাপ ছিল। আমি চাইছিলাম যে মধ্য-এশিয়া গিয়ে আমার নিজের চোখে দেখা সব কিছু নিয়ে একটা বই

লিখব; আর নিজের দেশের ভাইদের বলব, 'আগে আমাদের এইরকম পরিস্থিতি ছিল। মধ্য-এশিয়া কত তাড়াতাড়ি এগিয়েছে এবং আরো এগোচ্ছে।' কিন্তু তা আর হলো না। মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে আমি গত বছর থেকে খুব পড়াশুনো করেছি, অনেক নোট নিয়েছি। আশা করছি, সেই বলের ওপর ভরসা করে একটা বই লিখতে পারব।

৩ জুনে সারাদিন বৃষ্টি পড়তে লাগল। ৪ তারিখেও বৃষ্টি হয়ে চলল। ৩ তারিখে সোভিয়েতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি কালনিনের মৃত্যু হলো। ওই উপলক্ষে ৪ তারিখে সমস্ত নগরের মত ইউনির্ভাসিটিও শোক পালন করল। শোকসভা হলো। কালনিন বয়সের ভারে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর থেকে রাষ্ট্রপতির পদ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এক সাধারণ সহিস আর মজুর অবস্থা থেকে বাড়তে-বাড়তে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

জুনের প্রথম সপ্তাহের পর ইউনির্ভাসিটিতে আমার পড়ানোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই গ্রন্থাগারে বা অন্য জায়গায় কোনো কাজ থাকলেই আমি যেখানে যেতাম, তা না হলে বেশির ভাগ বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করতাম।

মধ্য-এশিয়া যাত্রার ভূত নেমে গিয়েছিল। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের ভূত মাথায় চড়েই ছিল। তাল্‌স্তোফের কাছ থেকে বহু জিনিস আমি জানতে পারলাম, আর বহু জিনিস নিজের কল্পনার সত্যতা থেকে জানতে পারলাম।

১৩ জুন আমি মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের আরেক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর বের্নস্তামের কাছে গেলাম। ঠিকানা ঠিক জানা ছিল না, আমি চেষ্টা করে কোনোরকমে তাঁর বাড়ি খুঁজে বার করলাম। যদি জায়গাটা আগে থেকে নিশ্চিত জানা থাকত, তাহলে খোঁজাখুঁজি করে নির্দিষ্ট সময়ের পৌনে ঘণ্টা পরে তাঁর কাছে পৌঁছনোর জন্য অপরাধী হতে হতো না। ডঃ বের্নস্তাম আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আড়াই ঘণ্টা ধরে কিরগিজিয়া আর কাজাকস্তানের সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে থাকল। তিনি বললেন যে সোভিয়েতকালে সেখানে অনেক জায়গায় খোদাই হয়েছে, আর অনেক ঐতিহাসিক জিনিস পাওয়া গেছে :

পুরনো-প্রস্তর যুগ—এই যুগের হৈডেলবর্গীয় (মুস্তের) মানবের অস্ত্র দক্ষিণ উজবেকিস্তান (তেশিকতাশ) ছাড়া সমরখন্দ আর কুদাই (ইর্তিশ-উপত্যকা)-তেও পাওয়া গেছে। পুরনো-প্রস্তর যুগের সলাতুর মদলিন মানবের অস্ত্র কোপিতদাগে (তুর্কমানিয়া) আর হিসারতাগে (উজবেকিস্তান) পাওয়া গেছে।

সূক্ষ্ম-প্রস্তর- (ম্যাক্রোলিথ) যুগ—এই যুগের যাযাবরদের অস্ত্র দক্ষিণ কাজাকাস্তানের তুর্কিস্তান শহর, অরালতট, সির উপত্যকা, করাতাউ, ম্যুনকম (জম্বুর পাশে), বেপ্তকদলা (ল্‌মাঅতার কাছে) পাওয়া গেছে।

নতুন-প্রস্তর যুগ—এই কালের ইন্দো-ইউরোপীয় মানবের কপাল আর অস্ত্র এলাতান

(ফরগানা), অনৌ (তুর্কমানিয়া) আর খ্‌বারেজ্‌মের সঙ্গে মিশেছে। তিনি এও বলেছেন যে খ্‌বারেজ্‌মের মত কপাল মধ্য-প্রস্তর যুগের যাযাবরদের এবং নতুন-প্রস্তর যুগের কৃষকদের মধ্যেও পাওয়া যায়।

সপ্তসিন্ধুর সপ্ত, জানা যায়, ইন্দো-ইউরোপীয় বা শকার্য-জাতির 'সপ্ত' শব্দ ও নদীর প্রেমকে বোঝায়। ভারতীয় আর্যদের দেশকে ইরানীরা সপ্তসিন্ধু বলত, যা সিন্ধু আর তার ছটি শাখানদীর আরেক নাম। মুসলমানরা সপ্তসিন্ধুকে 'পাঞ্জাব' নাম দিয়েছে, কিন্তু তার আগেই হয়তো তাজিকিস্তানের পাঞ্জাব ছিল, উত্তর মধ্য-এশিয়াতেও সপ্তসিন্ধু আছে, যার আরেক নাম তুর্কিতে কিছু একটা হবে, যার থেকে রুশরা তার অনুবাদ সেমীরেকে (সপ্তনদ) করেছে। আমিও আমার ইতিহাসে সপ্তসিন্ধুকে ভারতের জন্য ছেড়ে তার জায়গায় সপ্তনদ ব্যবহার করেছি। ডঃ বের্নস্তামের কথানুসারে এই সাত নদী হচ্ছে—অরিস, অতলস, চূ, ইলী, কোকসু-করাতাল, লেপসা আর যাগুজ। এই সব নামই তুর্কি, যার মধ্যে চূ আর সু জল ও নদীবাচক শব্দ। কোকসুর অর্থ হলো নীলনদ আর করাতালের অর্থ কৃষ্ণসাগর।

ষষ্ঠ শতক থেকে আরম্ভ করে দশম, একাদশ, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অনেক বৌদ্ধ-অবশেষ সপ্তনদে মিশে গেছে। চূ-উপত্যকায় ফুন্‌জের কাছে অস্মিকঅতাতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধদের নিবাসস্থল ছিল। এটা ওখানকার পুরাতাত্ত্বিক অবশেষে থেকে জানা যাচ্ছে। সারিগ (ক্রাসনয়ারেচ্‌কালোহিত নদী)-এর উপত্যকায়ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধভিত্তিচিত্র আর মানী ধর্মের ভিত্তিচিত্র মিলে গেছে। বলাশগুনেও বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া গেছে। তলস-এ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর মানী ধর্মের অবশেষ রয়েছে। সপ্তনদে নেস্তোরী খ্রীস্টানদের বহু রকমের সীলমোহর ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া গেছে। ডঃ বের্নস্তাম অনেক ফটো দেখালেন, তার মধ্যে সপ্তম-অষ্টম শতকের একটি বৌদ্ধ-মূর্তির ওপর খোদাই করা ছিল—'দেবধর্মোয় শ্রী...' পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল। তিনি বললেন যে আরো অভিলেখ ওখান থেকে পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ সামগ্রীর পরিচিতিতে তিনি চাইছিলেন যে আমি সাহায্য করি। আমিও আমার মধ্য-এশিয়া বিষয়ক অনুসন্ধান নিয়ে বললাম এবং আধুনিক জাতি কেমন করে প্রাচীন জাতিদের বিকাশ ও সংমিশ্রণ থেকে হয়েছে, তাও বললাম। তিনি তা যুক্তিযুক্ত বলে জানালেন। ডঃ তাল্‌স্তোফের মত ডঃ বের্নস্তামও বহুভাষাবিদ, বহুশ্রুত, বিদ্যাপ্রেমিক পণ্ডিত মানুষ। রুশ পণ্ডিতদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া খুব মুশকিল, যা ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশী ভাষায় ভাবনাকে প্রকাশ করতে পারে। আসলে কথা বলা অভ্যেস থেকে আসে কিন্তু এই সকল পণ্ডিত-ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ আর জার্মানের এতটাই জ্ঞান রাখেন যে নিজের বিষয়-সম্বন্ধীয় গবেষণা-পত্রিকা আর গ্রন্থ পড়তে পারেন।

১৪ জুন পুশকিন-থিয়েটারে বানার্ড শ-এর নাটক 'পিগমেলিয়ন' দেখতে গেলাম। রুশরা স্বদেশীদের প্রতি কোনো মনোমালিন্য না রেখে তাদের কলার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, শ-এর নাটকের এটা রুশ অনুবাদ ছিল, যা রঙ্গমঞ্চে দেখানো হলো। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। লোলার মত মহিলাদের নাটকটা তেমন পছন্দ হয়নি।

বুর্জোয়া সমাজের ওপর শ খুব ধারালো বাণ-বর্ষণ করেছিলেন, কাজেই ভূতপূর্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিচারধারার মানুষ তা কেমন করে পোষণ করে? ভিক্ষে করার জন্য ফুল-বিক্রেতা লণ্ডনের একটি মেয়েকে শিখিয়ে-পড়িয়ে লেডি বানানো হয়। এখন ওকে যেরকম জীবন কাটাতে হচ্ছে, তাকে অনুভব করার পর ও বলছে, 'আমি ফুল বেচতাম, কিন্তু নিজেকে তো বেচতাম না।' লেডি হয়ে যাবার পর সে নিজেকে না বেচে জীবন-তরী পার হতে পারছিল না।

নাটক আর অভিনয় দুটোই আমার খুব ভালো লেগেছিল।

১৫ জুনে আমার সাড়ে চারশো রুবলের বিশেষ রেশন কার্ডে আমাদের বিশেষ দোকানে জিনিস কিনতে গেলাম। সেখান থেকে অনেক জিনিসপত্র নিলাম। দোকান ট্রামের রাস্তা থেকে একশো গজের বেশি হবে না, কুলি নিলে অন্তত ১০-১৫ রুবল চলে যাবে, আর ফের ট্রাম না উঠলেও নিজের বাড়ি আসতে অতটা পয়সাই খরচ হতো। হয়তো পয়সার তেমন চিন্তা ছিল না। কিন্তু অন্যান্য প্রফেসর আর অধ্যাপকদের দেখলাম, তাঁরাও ২০-২৫ কিলোগ্রামের বোঝা নিয়ে আনন্দের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন, তাহলে আমি কি খড়ের মানুষ?

রাস্তায় মস্কোয় পরিচিত রোমন থিয়েটারের এক অভিনেতার সঙ্গে দেখা হলো। সে বলল যে এখন তাদের নাটকের দল এখনেই এসেছে। সে যাবার জন্য খুব অনুরোধ করল, তারা সবাই অস্তেরিয়া হোটেলে উঠেছে।

১৬ জুনে ভারতীয় বেতার থেকে ভাইসরয়ের ঘোষণা শুনলাম, যাতে তাতে বলা হলো যে তিনি তাঁর কার্যনির্বাহকদের (মন্ত্রীসভা) ভার কংগ্রেস, লিগ, শিখ, আর খ্রীস্টান প্রতিনিধিদের হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে—জহরলাল নেহেরু (উত্তর প্রদেশ), রাজগোপালাচার্য (মাদ্রাজ), বল্লভভাই প্যাটেল (বোম্বাই), ম· প· ইঞ্জিনিয়ার (বোম্বাই), রাজেন্দ্রপ্রসাদ (বিহার), জগজীবনরাম (বিহার), হরেকৃষ্ণ মহতাব (উড়িষ্যা) আর লিগের থেকে ছিল—মুহম্মদ আলী জিন্না, লিয়াকত আলী (উ· প·), মুহম্মদ ইস্মাইল (উ· প·), নজীমুদ্দীন (বাঙলা), অব্দুর্রব নস্তর (সী· প্রা·), শিখ প্রতিনিধি বলদেবসিংহ (পাঞ্জাব) আর খ্রীস্টান ছিল জন মথাই (মাদ্রাজ)।

মুসলিম লিগ পাকিস্তানের প্রশ্নে ঝুলেছিল। তাই ভাইসরয় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, যে যদি কোনো পার্টি রাজি না হয়, তাহলে তার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করা হবে।

জাতীয় মন্ত্রীসভা ভারতে সমাজবাদ স্থাপন করবে, না আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে. তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সাদা হাত থেকে যদি কালো হাতে শাসন চলে আসে তাহলে বিপ্লবী-শক্তিগুলোর সরাসরি যুদ্ধ লড়তে খুব সুবিধে হবে, তাই বিদেশী কাঁটা রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া ভালো, তা আমি মানি। ১৭ জুনের খবর থেকে মনে হলো যে কংগ্রেস আর লিগ এখন নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনি। মন স্থির করতে অনেক সময় লাগল, কিন্তু এটা তো জানা গেল, যে ইংরেজ শাসক যুদ্ধ-পূর্ব স্থিতিতে ফিরতে পারতো না।

২০ জুনে অস্তোরিয়া হোটেলে গেলাম। ওখান থেকে কিছু ইংরেজি খবরের কাগজ

নেওয়ার ছিল। কিছু চিঠি উড়োজাহাজে পাঠাতে চাইছিলাম, কিন্তু এখন উড়ো জাহাজের ডাকের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। উড়োজাহাজের ডাকেও তা লন্ডন হয়ে যেতে হতো আর দু-তিনবারের সেন্সরেও অনেক সময় নিত। ওখানেই আমার সিগান নাট্যদলের শিল্পী নিকোলায় নরোজ্‌নী, লীনা ইভানোভনা চীজেঙ্কো এবং অন্যান্যদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। ইতিমধ্যে আমি সিগান ভাষা সম্বন্ধে কিছু বই পড়ে ফেলেছিলাম, আর হিন্দি-সিগান সম্মিলিত প্রায় একশো শব্দ আমার জানা হয়েছিল। প্রথমে ওদের ধারণা ছিল না, যে ওদের ভারতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আছে। এখন ওরা দেখছিল, যে আমি আর ওরা একই রঙ-রূপের। যখন আমি ওই শব্দগুলো পড়ে শোনালাম যেগুলো রুশে নেই কিন্তু হিন্দির সঙ্গে হুবহু মেলে, তখন ওদেরও বিশ্বাস হয়ে গেল যে ওরাও ইন্দুস (হিঁন্দু)। পরে ওরা ভারতীয় সিগানদের সম্বন্ধে জানতে চাইল। ওদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পেশা, নৃত্য, সংগীত ইত্যাদির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাইল। আমি তো নিজের দেশে কখনো কখনো জেলে এখানকার সিগানদের সংস্পর্শে এসেছিলাম, কিন্তু আমি এই নিয়ে বিশেষ জানতে চাইনি। লীনা এক প্রৌঢ়া অভিনেত্রী। সিগান নাট্যদলের প্রতিষ্ঠায় তার বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং আজও তাকে দলের জ্যেষ্ঠা বলে মনে করা হতো। ওখানে তার সঙ্গে দুজন তরুণ অভিনেত্রীও ছিল। তাদের মধ্যে একজন অসাধারণ সুন্দরী। তার ভুরু, চুল, মুখে মধুর সৌন্দর্য ও খুব ফর্সা রঙ ভারতীয় মেয়ের মত মনে হচ্ছিল। ভারতের মাটির সঙ্গে ওর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—এই বিশ্বাস হয়ে যাবার পর সে ভারতীয় কলার বিষয়ে প্রশ্ন করল আর এটাও জানতে চাইল যে ভারতীয় শিল্পীরাও এখানে কেন আসে না? আমি বললাম, 'ইংরেজদের রাজ হঠে যেতে দিন, তখন ভারতীয় শিল্পীও এখানে আসবে আর আপনাদেরও তো যাওয়া উচিত।' লীনা নিজের পরমা সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে বলল, 'আমি তো চাইব নিজের মেয়েকে কোনো ইন্দুসের সঙ্গে বিয়ে দিতে।' আমি বললাম, 'আমাদের এখানে তো এখন অব্দি বিয়ে দেবার অধিকার বাবা-মায়েরই ওপর, এখানে কি এই সুন্দরী মেয়ে এই ধরনের কন্যাদান পছন্দ করবে?' এরপর মেয়েটি বলল?' 'হ্যাঁ, আমি ইন্দুসকে পছন্দ করব।'

বস্তুত, সিগানদের রঙ আর মুখাবয়বে এখনো ভারতীয়দের সঙ্গে এত মিল যে মাঝে-মধ্যে লোকেরা আমাকেও সিগান মনে করত। ইগরকে তো ওর ছেলে-মেয়ে বন্ধুরা কখনও সিগান না বললেও য়ূরেই (ইহুদী) বলত। ইগত সেটা সর্বদা প্রতিবাদ করে নিজেকে ইন্দুস বলত। একদিন আমি সাংস্কৃতিক উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেখানে দুজন সিগানের সঙ্গে দেখা। ওদের মধ্যে একজন বলল, 'হাত দেখান!' আমি বললাম 'রোমানীরা রোমেরও হাত দেখে?' ওর সখী বলল, 'হ্যাঁ, দেখছেন না, আমারা তো রোমই (ডোম)।' তারপর সে কত কথা জিজ্ঞেস করল আর ওর কথা থেকে মনে হল, যে এখনো ও হাত দেখাতে ইচ্ছুক লোককে পায়। প্রথমে সাংস্কৃতিক উদ্যানের পাশেই এক ছোটমত পাড়ায় বসবাস ছিল, সেখানে সে এদিক-ওদিক ঘুরে এসে থাকত, কিন্তু এখন সেই পাড়া উঠে গেছে। নবশিক্ষিত সিগান তরুণ-তরুণীরা এখন সোভিয়েতের সাধারণ জনসমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। যদি সেই পাড়া থাকত, তাহলে আমার অবশ্যই কাজে লাগত, আমি ওদের

ওখানে কিছু সময় দিয়ে অনেক কিছু জানতে পারতাম।

২৩ জুনে ইগর কোথা থেকে একটা ছোট বেড়াল ধরে আনল। সেটাকে ও তাড়াতাড়িই পোষ মানল। কিন্তু বেড়ালটা খেত কেবল মাংস। রুটি তো ও ছুঁতোও না। আচ্ছা, এইরকম দুর্মূল্যের বেড়াল কেউ রাখে? কিছুদিন বাদেই সে যার ছিল, তার কাছে চলে গেল।

সেদিন রোববার ছিল। আমার বন্ধু-অধ্যাপক ভ্লাদিমির ইয়ানোবিচ কলিয়ানোফের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল। ইগর আর লোলার সঙ্গে আমি সেখানে গেলাম। ভোজনের পর পেয়ালা দেওয়া হলো। এমনিতে ইগর তো বলে দিত, 'আমার পাপা পান করে না, তাই আমিও করি না' কিন্তু আজকের দলে সেও যোগ দিল। আর মদ্যপানের জন্য অনুরোধ করতে লাগল। যখন কুয়োতেই ভাঙ ঢালা আছে, বাচ্চা কি করে নিজেকে ঠেকাবে? কিন্তু কলিয়ানোফ লালরঙের শরবতকে মদের নাম করে ওর হাতে দিয়ে দিলেন। একটু পরেই সবাই বলতে লাগল, 'ইগর তোর চোখ লাল হয়ে গেছে!' সেও অনুভব করতে লাগল যে খুব নেশা হয়েছে।

রাত একটায় আমরা বাড়ি পৌঁছলাম। আসলে রাত এখন ছিল কোথায়। মাঝ রাতেও আমি লাল রঙকে দেখতে পেতাম। এখন শ্বেতরাত্রির মরশুম চলছিল।

২৫ জুনে এক দিনের বিশ্রাম-টিকিট নিয়ে আমি কিরোফ সংস্কৃতি উদ্যানে গেলাম। খাবারে এখনো কোনো দূরত্ব আসেনি, তবু একটু বিস্বাদ লাগত। সেই কালো রুটি, সেই কালো খিচুড়ি (কাসা) আর সেই জলো চা। এখন মস্কোর রোম (সিগান) নাট্যদল উদ্যানের থিয়েটারে তাদের নাটক দেখাচ্ছিল। নাটকের নাম ছিল 'গুরুসিঙকা'। আমাদের টিকিটের শ্রেণী রঙ্গমঞ্চ থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু সিগান দল তো নিজেদের, তাই অভিনেতারা আমাদের তিনজনকে প্রথম সারিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। ৩ ঘণ্টা নাটক দেখলাম। এগারোটা যখন বাজতে চলল, তখন বাড়ি যাবার খেয়াল হলো, তাই শেষ অব্দি না দেখেই ওখান থেকে রওনা হলাম। ইগরের তো তরুণ সিগানুচ্‌কারা(সিগান-কন্যারা) এত মোহ কেড়েছিল যে সেখান থেকে যাবার নামই করছিল না। এই নাটকেও সিগান জীবনই দেখানো হয়েছে। পুরনো ঢঙের সিগান স্ত্রীলোকদের পোশাক পশ্চিম উত্তর-প্রদেশের স্ত্রীলোকেদের ঘাঘরা-ব্লাউজের মত ছিল। রুপোর সীলমোহরের মালা শুধু গলায় নয়, মাথা থেকেও ঝুলছিল।

২৯ জুন এত বৃষ্টি হলো যে মনে হচ্ছিল ভারতের বর্ষার দিন এসে গেছে। আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানে লোকেরা শাক-সবজি লাগিয়ে ছিল। সন্ধেবেলায় সবাই নিজেদের বালতিতে জল ভরে, কোদাল হাতে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যেত। বর্ষা হয়ে যাবার পর এখন জল দেবার দরকার ছিল না। চারদিকে শাক-সবজির সবুজ রঙ দেখা যাচ্ছিল।

জুনের শেষে এখন গ্রীষ্মকালীন দু মাসের ছুটি পড়ে গিয়েছিল। এখন গরম কাটানোর জন্য আমি ইউনির্ভাসিটির বিশ্রামোপবন তিরযোকী যাওয়া ঠিক করলাম। এখন সেখানে অধিক সংখ্যক লোকেদের দেবার মত জায়গা ছিল না, কিন্তু সব অধ্যাপক বা ছাত্র তিরযোকী যেতেও চাইছিল না। অনেক ককেশাস এবং ক্রিমিয়া আর কিছু বাল্টিক সমুদ্র

—১৯৪৬—

তটে যাবার চেষ্টায় ছিল। ছাত্ররাও অনেকে নিজেদের বাড়ি পৌঁছে ছুটি কাটাতে চাইছিল। বিশেষ করে কামালের মত মধ্য-এশিয়া, সাইবেরিয়া, আর দূরবর্তী স্থানের ছাত্ররা দু মাসের ছুটি আপন লোকের মধ্যে কাটাতে বেশি পছন্দ করছিল। আমার আর লোলার তিরযোকীর টিকিট পেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্তু বাচ্চাদের এখন তিরযোকীতে জায়গা ছিল না। শেষে ব্যবস্থাপক রাজি হয়ে গেল যে আমরা নিজেদের সঙ্গে ওকে রাখতে পারি।

লোলার প্রত্যেকটা কাজ ঠিক যাবার সময় মনে পড়ত। আগে থেকে ইগরের জন্য ওভারকোট সেলাই করিয়ে রাখে নি। পয়লা জুলাই সারা রাত বসে সে ওভারকোট সেলাই করাল। রাশিয়ায় শীতের জন্যই শুধু নয়, গরমের জন্যও ওভারকোটের দরকার পড়ে, কেননা পৌষ-মাঘ মাস তো ওখানে সব সময়ই হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, গরমের ওভারকোট পাতলা হয়। আমি বলেছিলাম যে নিজের পরিচিত দর্জি মেয়েটিকে দিয়ে দাও। কিন্তু প্যারিসের ফ্যাসনের দিকে যে তার নজর ছিল! শেষে তাই করতে হলো। নিজে সারারাত জেগে রইল আর বেচারি জীনা কন্‌স্তান্তিনোভাকেও জাগিয়ে রেখে কোট সেলাই করাল।

আমাদের সাড়ে আটটার বাস (২ জুলাই) ধরার ছিল, যেটা সোজা তিরযোকী পৌঁছে দেবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তৈরি হতে পারত? বাসের আশা ছাড়তে হলো আর আমরা ফিনল্যান্ড স্টেশনে পৌঁছলাম। মস্কো আর লেননগ্রাদে গন্তব্য স্থানের ট্রেন দাঁড়ানোর স্থানকে এই নামে ডাকে। ফিনল্যান্ড স্টেশন থেকে পুরনো আমলে ফিনল্যান্ডের ট্রেন যেত। এখন ফিনল্যান্ড রাশিয়া থেকে আলাদা, হয়তো বা কোনো ট্রেন সোজা লেনিনগ্রাদ থেকে ফিনল্যান্ড যায়। কিন্তু তার সীমা অব্দিই যায়। গ্রীষ্মাবকাশের দিন ছিল। বিশ্রামমোপবনে প্রচুর লোক যাচ্ছিল। বাসও নিয়ে যাচ্ছিল, আর স্টেশনেও মেলা বসেছিল। কিন্তু টিকিট অনেক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল, তাই টিকিট পেতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি।

আমরা নিজেদের গাড়িতে চড়ে বসলাম। এটা দূরে যাবার গাড়ি নয়, তাই সব সিট রিজার্ভ করার প্রশ্নই ছিল না। গাড়ির কামরা গদি ছাড়া ছিল। গাড়িতে বসার পর কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হলো। তারপর একটার সময় গাড়ি রওনা হলো। আমাদের যাত্রা দু ঘণ্টার ছিল।

তিরযোকীতে

যুদ্ধের আগে তিরযোকী ফিনল্যান্ডের মাটিতে ছিল। ১৯৪০তে ফিনল্যান্ডের সীমা লেনিনগ্রাদ থেকে ১৪-১৫ মাইলের মধ্যে ছিল। যেটা আমাদের ট্রেন আধঘণ্টায় পার হয়ে

গেল। লেনিনগ্রাদ শহর থেকে এত কাছে এক অমিত্র সরকারের দেশ থাকা বিপজ্জনক, তাই রাশিয়া চেয়েছিল, দেশের বদলে দেড়গুণ ভূমি নিয়ে ফিনল্যাণ্ড নিজের সীমা কিছু দূরে সরিয়ে নিক। কিন্তু ফিনল্যান্ড তাতে রাজি হয় নি। জার্মানদের বিপদ সামনে দেখে রুশদের অস্ত্র ধারণ করতে হলো। তিরযোকী আর তারপরে বিপুরী পর্যন্ত যুদ্ধের ধ্বংসলীলার চিহ্ন এখনো খুব দেখা যাচ্ছিল। স্টেশন আর বসবাসের বাড়িগুলো বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। সেই সময়ের ভীষণ গোলাবর্ষণে প্রকৃতিকেও খুব ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সে নিজের সৌন্দর্যকে আবার স্থাপন করতে খুব দ্রুত কাজ করেছিল। লেনিনগ্রাদ শহর থেকে বেরোতেই প্রথমে কিছু খেত আর বসতি পড়ল। ফিনল্যান্ডের পুরনো সীমায় ঢুকতেই সেই দৃশ্য সামনে এল, যার জন্য ফিনল্যান্ড বিখ্যাত। চারদিকে দেবদারু আর ভূর্জপত্রের সবুজ জঙ্গল ছিল, ঘাসের শ্যামলিমাও ছড়ানো-ছেটানো ছিল, নানা রকমের সুন্দর ফুল ফুটেছিল। যেখানে-সেখানে জল আর ছোট ছোট নদী দেখা যাচ্ছিল। এই সৌন্দর্য লেনিনগ্রাদের বাইরে থেকে শুরু হয়েছিল আর পরে বাড়তে বাড়তে তার চরম অবস্থায় পৌছেছিল।

রেলের ভাড়া ২ রুবল ২০ কোপেক ছিল। বাচ্চাদের ভাড়া শুধু ৫৫ কোপেক। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমি শেষমেশ তিরযোকী স্টেশনে পৌছলাম। ওখানে ইউনিভার্সিটির বাস এসেছিল—বাস বলব কি, এতো খোলা লরি। তার ওপরে বেঞ্চি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন যুদ্ধের প্রভাব ছিল, কিন্তু আমাদের ফেরার সময় কিছু নতুন বাসও কাজে লাগছিল। ছিল তো ইউনিভার্সিটির বাস, তবু ভাড়া তো দিতেই হতো। ৫ রুবল করে দিয়ে আমরা আধঘণ্টায় স্টেশন থেকে আমাদের বিশ্রামোপবনে পৌছলাম,যা ওখান থেকে সাত-আট কিলোমিটার ছিল। এই মহাবন আদিকাল থেকে কখনো কাটা হয়নি। স্টেশনের পাশে বাজার ছিল। তারপর প্রায় বসতিহীন, আর টিলার মত উঁচু-নিচু জমির ওপর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছিল। সমুদ্রের ধারে ঘন দেবদারু বনগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা নিজেদের মধ্যে মাইলের পর মাইল ভাগ করে ওখানে তাদের বিশ্রামোপবন গড়েছিল। ইউনির্ভাসিটিও দশ হাজার একরের কাছাকাছি জঙ্গল ঘিরে রেখে ছিল। আমাদের পাশেই ইন্তুরিস্তও তাদের বিশ্রামোপবন স্থাপন করেছিল। আর ছেলে-মেয়েদের (প্যোনির, প্যোনিরকাদের) তো কয়েক ডজন স্যানেটোরিয়ম এখানে ছিল। লেনিনগ্রাদ বা বিপুরীর দিকে মাইলের পর মাইল চলে যান, দেখবেন জঙ্গলের মধ্যে ওই রকমের কত বিশ্রামোপবন রয়েছে।

ইউনিভার্সিটির বিশ্রামোপবন আসলে প্রাকৃতিক জঙ্গল। প্রকৃতির শোভা এখানে যতটা সম্ভব কম নষ্ট করা হয়েছে। এই বনেই যত্রতত্র ছোট-বড় কিছু বাড়ি ছিল, যার বেশির ভাগ ছিল কাষ্ঠনির্মিত এবং সোভিয়েত-কালের আগের অর্থাৎ ফিনদের বানানো। তিরযোকী জারের রাজত্বের সময়েও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাই ধনীরা এখানে নিজেদের জন্য বাগান-বাড়ি বানিয়ে রেখেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িগুলোও বেশির ভাগ ওই সময়েরই। নতুন বাড়ি বানানোর যোজনা তো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন নগরে কাজ বেশি হওয়ায় এখানে খুব কম কাজ শুরু করা হয়েছিল। আমরা প্রথমে ব্যবস্থাপনা

কার্যালয়ে গেলাম। জানতে পারলাম, লোলা বিনা অনুমতিপত্র নিয়েই ইগরকে নিজের সঙ্গে এনেছে। দীনা গোল্‌দমান নিজের ছেলের ব্যবস্থা শিশু-উদ্যানে করেছিল। শিশু-উদ্যান এইরকম সময়ে দিনরাত্রের জন্য ছেলেদের নিয়ে নেয়, কিন্তু লোলা বেচারি নিজের বাচ্চাকে চোখের থেকে দূরে যেতে দিতে চায় না, তাই অনুমোতি পাক বা না পাক সে নিজের সঙ্গে ওকে নিয়ে চলে এসেছে। আমি মনে মনে বললাম—ক্যাংগারু মাতার দায়িত্ব সে-ই জানে। আমার এটা জেনে একটু তো খারাপ লেগেছিল কিন্তু উপায় কি ছিল? ব্যবস্থাপকরা সঙ্গে থাকার অনুমোতি দিয়ে দিল কিন্তু বলল যে খাবার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে। লোলার দ্বারা এই কাজও হয়নি যে শহরে ঘোরার সময় কিছু খাবার জিনিস আর রুটি নিয়ে আসে। নাম লেখানো হলো, তারপর উপবনের ছোট একটুখানি চিকিৎসালয়ে ডাক্তারও পরীক্ষা করে ওজন ইত্যাদির সঙ্গে আরো কত কিছু রেজিস্টারে লিখল।

আমার তো এখানে গঙ্গোত্রীর জাড়গঙ্গার ধারে সেই রম্য দেবদারু বন মনে পড়ে যাচ্ছিল, যা আমি তিন বছর আগে দেখেছিলাম। ওইরকমই দেবদারুর ঘনছায়া ছিল। ওইরকমই দেবদারুর ভেজা ভেজা সুগন্ধ আসছিল, যদিও এখানে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ছিল না, বরং আমরা ফিনল্যান্ড খাড়ির সমুদ্রতটে ছিলাম। বৃক্ষের মধ্যে দেবদারুজাতীয় অনেক কেল্‌ (সরল) বৃক্ষ ছিল। ভূর্জও কাছাকাছি ছিল না। অফিসের কাজে ছুটি পেতে পেতে আমার জিনিসপত্র আমার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হলো। 'ঘর' বললে এই শব্দটার অপমান করা হবে। বস্তুত ওগুলো বড় বড় দেশলাই-এর দোতলা বাক্সের মত কাঠের পায়রা-খুপরি ছিল। সামলে না চললে মাথায় ঠুকে যাবার ভয় ছিল। উদ্যানে কিছু ভালো ভালো অট্টালিকাও ছিল। সেগুলোর ঘর বড় বড় ছিল কিন্তু সেগুলো একটা লোক থাকার জন্য দেওয়া হতো না। ওদের মধ্যে কিছু ভোজনশালায় পরিণত করা হয়েছিল, আর কতগুলোতে এক ডজন করে খাট রেখে বেশি সংখ্যক লোকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের আলাদা ঘর নেবার ছিল, সেই ঘর পেলাম। সেটা পাঁচ হাত লম্বা ৫ হাত চওড়া ছিল, তাতে সরু সরু দুটো লোহার খাট পাতা ছিল। তিনটে প্রাণীর জন্য। মাথার কাছে একটা ছোট টেবিল আর একটা চেয়ার রাখা ছিল। ঘরটা এতটা ছোট হলেও শীতে গরম করার ব্যবস্থা ছিল। তিরযোকীতে শীতেও লোকে আসা-যাওয়া করে। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও কিছু এখানে ডিসেম্বরে ছুটিতে কিছুদিনের জন্য এসেছিল। দেবদারু কাঠের বাড়ি তো খারাপ হয় না আর যদি বার্নিশ না করা হয় তো এক ধরনে সুগন্ধ আসে। আমরা ওপর তলায় ঘর পেয়েছিলাম। ঘরের দরজা এক চিলতে বারান্দার একটা দিকে খোলে। যার একদিকে নীচে নামার সিঁড়ি ছিল। ঘরের জানলা খুব বড় ছিল তাই হাওয়ার অভাব ছিল না। কিছু গাছের ফাঁকে, একদিকে, সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। এখানকার সমুদ্রের জল অতটা নোনতা ছিল না।

খাবার তিনবার দিত। আটটা থেকে দশটার মধ্যে প্রাতরাশের সময় ছিল। ভোজনশালায় সবাই একসঙ্গে বসতে পারত না। অনেকে দল বেঁধে নিজেদের চিহ্ন করা টেবিলে বসে যেত। মধ্যাহ্নোত্তর একটা থেকে তিনটে অব্দি মধ্যাহ্নভোজন আর সাতটা

থেকে নটা রাতের খাওয়া। রান্না সুস্বাদু নয়, সবারই এই নালিশ ছিল। যুদ্ধের সময় যে অভাব আর অব্যবস্থা হয়েছিল, তা এখনো পর্যন্ত ঠিক হয়নি। পাচিকারা বলত, তাদের আর সেরকম সামগ্রী দেওয়া হয় না। কিছু মহিলা বলত যে পাচিকারা নিজেরাই খেয়ে ফেলে।

মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ভালো ছিল। সমুদ্রে সাঁতার কাটা আর বালিতে রোদ পোয়ানো, দেবদারুর জঙ্গলে মাইলের পর মাইল ঘোরা—এসব তো ছিলই। এ ছাড়াও এখানে ক্লাবঘরে একশো চেয়ার পাতা যেত। ওখানে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা দিনের বেলা গিয়ে খবরের কাগজ আর বই পড়তে পারত, দাবা খেলতে পারত। ঘর সন্ধের পর নাচগানের আখড়ায় পরিণত হতো। আমাদের পাড়াতে অন্যান্য সংস্থারও অনেক উপবন ছিল। ভারতে যদি পুরীর সমুদ্র আর গঙ্গোত্রীর ভৈরবঘাটীকে এক সঙ্গে করে দেওয়া যায়, তাহলে এই প্রাকৃতিক সুষমা পাওয়া যেতে পারে।

দিনের বেলা অল্পক্ষণই শুতাম, রাতে তো অনেক ঘুমোতেই হতো, কিন্তু রাত ছিল কোথায়? এখানে রাত দশটা অব্দি সূর্যের হলদে-হলদে কিরণ দেবদারুর শিখরের ওপর ঝলমল করল, ফের গোধূলি বেচারা এল, সূর্যাস্ত হল; কিন্তু তার পরেই ঊষা এসে পৌঁছল।

৩ জুলাই তিরযোকী এসে এখন আমরা প্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। দুটি মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তা দিয়ে তিনজনের চালান মুশকিল ছিল, তাই একজনের খাবার খুঁজে আনা জরুরি ছিল। কেউ একজন আশা দিল, যে হয়ত বা রেশনের কালো রুটি পাওয়া যেতে পারে। কালো রুটি বলতে পাঠকদের এক ধরনের খারাপ স্বাদের রুটি মনে আসবে! হ্যাঁ, এরকম রুটিও আছে। কিন্তু রাশিয়ায় আরেক রকমও কয়লার মত কালো রুটি হয়, যা একবার খেলে মুখ থেকে স্বাদ যায় না, সেটা এতই সুমিষ্ট হয়। যা হোক, রুটির চিন্তা তো ছিলই আর তাও আমাদের নিজেদের ভুলে, কেননা বাড়তি রেশনকার্ডে আমাদের অনেক রুটি-মাখন, মাছ-মাংস আর অন্য জিনিস পেতাম, যা আমরা লেনিনগ্রাদ থেকে সঙ্গে আনতে পারতাম। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের লরিতে আসতাম, তাহলে এখানকার উপবনের দরজার ভেতর অব্দি ওরা পৌঁছে দিত। কিন্তু এখন তো তাহলে ওখানে ফিরে গিয়ে আনতে হতো।

আমাদের পশ্চিম দিকে সমুদ্র ছিল। যার আগে নদীর উঁচু পাড়ের মত ছিল, যার পরে এই দেবদারুর জঙ্গল ছিল খানিকটা সমতল ভূমির ওপর। ক্লাবঘর মোটামুটি সমুদ্র তটের ওপর ছিল। বালি ওর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল। এর পরে হাজার হাজার বছরের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে একটার পর একটা ছোট ছোট পাহাড় সমতল সিঁড়ির মত হয়ে গিয়েছিল, যার ওপর দেবদারুর জঙ্গল দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের গেটের বাইরেই লেনিনগ্রাদ যাবার রাস্তা ছিল। ইউনিভার্সিটির উপবন রাস্তার দুপাশে ছিল। রাস্তা দিয়ে চলা মুশকিল ছিল, কেননা এখনও রাস্তা পাকা করে পিচ ঢালা হয়নি, যার জন্য লরি ধুলো উড়িয়ে যেত। তাই রাস্তার ধার দিয়ে হাঁটা আর ধুলো খাওয়ার চেষ্টা করা একই ব্যাপার ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র-তট অব্দিও যাওয়া যেত। কিন্তু ওখানে রাস্তায় ডেলা আর পাথর অনেক ছিল, জমিও এবড়ো-খেবড়ো ছিল, তাই হাঁটা সুখের ছিল না। হ্যাঁ, রাস্তার ওপরের কম চলাচলের অন্য এক রাস্তা বেড়াবার পক্ষে খুব ভালো ছিল। বনে মলীনা (রাস্পবেরি) আর স্ট্রবেরির ফুল ফুটে ছিল, আরও গেলে এর টক-মিষ্টি ফল পাওয়া যাবে। খুম আর গুচ্ছি[১]-র ফসল আগস্টে হবার কথা, যখন আমরা এখান থেকে ফিরে গিয়ে থাকবো।

আমাদের বাসা থেকে সমুদ্রের দিকে তাকালে তার মধ্যে গন্ধর্ব নগরের মত দূরে ক্রোন্‌স্তাতের নামকরা সামুদ্রিক বিশ্রাম-স্থান ছিল। জার্মানি চারদিকে মারামারি করতে করতে হেরে গেল কিন্তু সে অজেয় ক্রোস্তান্‌স্তাকে নিতে পারল না। খাড়ি খুব উথলে উঠে ছিল, অনেকটা চলে গেলেও জল কোমর পর্যন্তই পাওয়া যেত, যার জন্যে সাঁতারুদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হতো। নিচে যদি বালি থাকত তাহলে এগিয়ে যেতে সুবিধে হতো, কিন্তু জলে পাথরের ডেলা এবড়ো-খেবড়ো ভাবে বিছানো ছিল। আমার কাজ ছিল দিনে দু-একবার সমুদ্রস্নান করা, কখনো ক্লাবের ছোট লাইব্রেরিতে গিয়ে খবরের কাগজ পড়া বা অন্যদের নাচ-গান করে চিত্তবিনোদন করতে দেখা। আমি খুব জানার চেষ্টা করলাম যে ফিনেরা এই সব বাড়ি কোন অভিপ্রায়ে বানিয়েছিল। কিন্তু ফিনল্যান্ডের যুদ্ধের সময়ই এখানে যত ফিন চাকর-বাকর বা আশপাশের বস্তির কৃষক ছিল, তারা সবাই নিজেদের সংকুচিত হয়ে যাওয়া দেশের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যবশত একটা চাকরানী ছিল, যে বারো মাসই এখানে থাকত, আর আমার ঘরের নিচে বাস করত। সেই যুগকেও সে দেখেছিল। তার থেকে জানতে পারলাম, যে আগে এখানে ফিন্‌দের একটা হোটেল আর রেস্তোরা ছিল। যে দেশলাই-এর খুপরিতে আমরা থাকছিলাম, সেখানে অতিথিদের জন্য বেশ্যা রাখা হতো। অতিথিরা আলাদা আলাদা বাংলোয় থাকত, মেইনরহাইম রাজ্যে এই উপবনের এই অবস্থা ছিল। এই প্রশ্নটাও উঠত, যে এখানকার বাড়িঘর যুদ্ধে কেন বিধ্বস্ত হয়নি। কিন্তু আশেপাশে ঘোরার পর বোঝা গেল, ঠিক তা নয়। এখনো কত জায়গায় নোটিশ ঝোলানো ছিল—'মাইন থেকে সাবধান'—অর্থাৎ শত্রুকে উড়িয়ে দেবার জন্য মাটির নীচে লুকোনো বারুদভরা মাইনগুলো বার করার পুরো চেষ্টা করা হয়েছিল, তাও কোথাও কোথাও ওগুলো থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভূতপূর্ব বেশ্যা রাখা হোটেলের ভোল পাল্টে গেছে দেখে আমার মনে নানারকমের চিন্তা এল। কিছু বছর পরেই যখন এখানকার গৃহনির্মাণ যোজনা কার্যে পরিণত হবে, খাবার-দাবারের ভোজনের ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে যাবে, তখন এই জায়গা কত সুন্দর আর সুখদায়ক হবে!

৪ জুলাই সমুদ্রস্নানে গেলাম। জল নোনতা ছিল না। আসলে এটা তো সমুদ্রও নয়, সমুদ্রের এক ল্যাজ বেরিয়েছিল, যাতে অনেক অনেক নদী-নালা মিষ্টি জল এনে ফেলছিল। অনেকটা ভেতর পর্যন্ত গেলাম। জল প্রথমে হাঁটু অব্দি, তারপর উরু অব্দি হলো। সাঁতার কাটার আনন্দ আর কোথায়? যদি অনেকটা নীচে অব্দি দেওয়াল গাঁথা হয়,

[১] *Truffle* বা মশলারূপে ব্যবহৃত কন্দজাতীয় ছত্রাকবিশেষ।—স·ম·

তাহলে অনেকটা শুকনো জমি সমুদ্রের ওপর থেকে বার করা সম্ভব, কিন্তু এই দেশে জমির অভাব খুবই কম, এখানে কোনো কিছু যদি কম থাকে সেটা হলো মানুষ। সন্ধেবেলা বেড়ানোর জন্য দু'ঘণ্টা 'পাহাড়ী' দিয়ে গেলাম। এই স্থান আরও রমণীয় ছিল। দেবদারু আর কেলু গাছ বেশি ছিল; যার থেকে বোঝা যাচ্ছিল, যে শীতের সময় এলেও খাড়ি আর জমি সবই শ্বেতহিমে ঢাকা থাকলেও দেবদারু গাছ এই রকমই সবুজে সবুজ থাকবে, অর্থাৎ সেই সময় লেনিনগ্রাদের মত এখানে সবুজের জন্য ব্যাকুল হবার দরকার হবে না। ঘরের অভাব অবশ্যই ছিল। স্থান জনাকীর্ণ বলে মনে হচ্ছিল। পায়খানা অপরিষ্কার ছিল। ফ্লাস্কের ব্যবস্থা ছিল না। এই সময় সমগ্র তিরযোকীতে সিউওরেজ পাইপ বসানো হচ্ছিল। এখন তো পায়খানা অবশ্যই খারাপ ছিল। পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মেয়েদের দিয়ে কোনোরকমে পায়খানা খাড়া করা হয়েছিল। তক্তার ওপর বসে পায়খানায় যেতে একদম ইচ্ছে করত না। যদিও কিছু ওষুধ ঢালা হতো, কিন্তু দুর্গন্ধ যেত না। আমাদের ঘরের ঠিক সামনে এবং কাছে থাকায় আমার তো কখনো কখনো দুর্গন্ধ ঘর অব্দি আসছে বলে মনে হতো, তার জন্য আমাদের বারান্দার জানলা আর ঘরের দরজা বন্ধ রাখতে হতো। বাঁচোয়া এইটুকুই যে আমি এমন দেশে ছিলাম না, যেখানে মানুষ মগে জল ভরে নিয়ে পায়খানায় যেত। তা না হলে না জানি গন্ধ কত দূর পর্যন্ত পৌঁছত। উপবনে বিজলি-বাতিও দু-একটি জায়গাতেই শুধু ছিল। খাবার জলের অসুবিধেও ছিল, পাহাড়ের ওপর তার জন্য কলও বসানো হচ্ছিল। জল আর পায়খানার অসুবিধে আসছে বছর শেষ হয়ে যাবে, এই কথা হাবে-ভাবে বোঝা যাচ্ছিল।

'পাহাড়ী' মানে, আমাদের কাছে, ওপর দিকে কিছুটা উঁচুতে দূর অব্দি চলে যাওয়া সমতলভূমি আর তাকে ঢেকে থাকা দেবদারুর বন। পাহাড়ের ওপর যেখানে-সেখানে ছোট ছোট কুঠি ছিল, যার পাশে শাক-সবজির খেত ছিল। আগে নিশ্চয় এই কুঠিতে ফিন কৃষক থাকত। এখন ওখানে ভূতপূর্ব রুশ সৈনিক এসে বসবাস করছিল। কিন্তু সে এখন অল্প জায়গাতেই আবাদ করতে পেরেছিল। এই অক্ষাংশে ভালো ভালো আপেল হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু শাক-সবজি আর আলু তো প্রচুর পরিমাণে হতে পারে। পাহাড়ে বেড়াবার সময় আমার মনে পড়ছিল, সিকিমে তিব্বত যাবার রাস্তায় ১০ হাজার ফুটের ওপরে গড়ে ওঠা লাছেন গ্রাম, যেখানে ফিন-জাতীর মিশনারি বুড়ি ডেরা বানিয়েছিল। যদি এখানে আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ত, তাহলে তার ফিনল্যান্ডের দেবদারু বনাচ্ছাদিত ভূমিকে মনে পড়ে থাকবে।

তিরযোকীতে আমার দিনচর্যা ছিল—সকাল সাড়ে আটটায় ওঠা, দাড়ি কামিয়ে হাত-মুখ ধোয়া। লোলাকে নিজের প্রসাধনে আর ইগরকে খাওয়াতে অনেক সময় দিতে হতো। প্রাতরাশের সময় আটটা থেকে দশটা অব্দি ছিল। কিন্তু দশটার আগে আমাদের ওখানে পৌঁছনো অসম্ভব ছিল। আমরা শেষের ব্যাচে ভোজনশালায় যেতাম। তিন-চারটে বড় বড় ঘর ভোজনশালার কাজে লাগছিল, যাতে এক-একটা ঘরে আটটা-নটা টেবিল এবং প্রত্যেক টেবিলে চার জনের বসার জায়গা ছিল। প্রাতরাশে টোস্ট, মাখন আর চা বা কফি পাওয়া যেত। চা কফিতে এতটুকুই চিনি দেওয়া হতো, যেটুকুতে শুধু দেওয়ার নাম

হয়, কিন্তু মিষ্টি হয় না। রান্না সুস্বাদু বানানোর জন্য লোকজনরা সঙ্গে জিনিস নিয়ে আসত। দুটো পর্যন্ত লেখাপড়াতে বা পাশের দেবদারু বনে অথবা সমদ্রের বালুকার ওপরে কাটত। তারপর মধ্যাহ্নভোজনে যেতাম। ঘাস-পাতের সুপ, কিছু রুটি, শোকলাত (চাকলাত বা চকোলেট) আর কম মিষ্টি দেওয়া অন্য কিছু। একটা রেকাবিতে মাংস থাকত। যতটা মাত্রা প্রয়োজন, তা থাকত, কিন্তু গুণ বাড়াতে নিজেদের সামগ্রী ব্যবহার করতে হতো। খারাপ রান্না করাতে এখানকার সুপকারিণীরা যে পারিতোষিক পাবার অধিকারিণী ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভোজনোপরান্তে ফের সমুদ্রের দিকে যেতাম, সেখানে কিছুক্ষণ ধরে স্নান করতাম, তারপর এসে লেখাপড়ায় লেগে যেতাম। সাতটা থেকে নটা অব্দি রাতের খাবার সময়, কিন্তু সূর্যদেবের দর্শন দশটা অব্দি থাকত—এটা ছিল জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ। বলার দরকার নেই যে এখন সম্পূর্ণ শ্বেতরাত্রি ছিল, তাই নিদ্রার আবাহনের জন্য অন্ধকারের সাহায্য পাওয়া যেত না। আমরা রাতের খাওয়া থেকে সাড়ে আটটার কাছাকাছি নিবৃত্ত হতাম। তারপর বেড়াতে 'পাহাড়ী' যেতাম। সমুদ্র-তটের পাথরের টুকরো দুঃখদায়ক ছিল,আর রাজপথের ওপর সারাক্ষণ আসা-যাওয়া করা মোটর গাড়ি ধুলো ওড়াতো।

৬ জুলাই— সমুদ্র আজও কালকের মত শান্ত ছিল। আমাদের ফ্যাকাল্টির ডিন প্রফেসর স্তাইনের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। ভারতে ইংরেজরা নতুন নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, যাতে শাসন আর শোষণে ওখানকার মধ্যবিত্তদের সামিল করতে চাইছিল। কিন্তু আরো অনেক অধ্যাপকের মত এই ব্যাপার তাঁরও বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি এখন ভারতকে বিশ্ব-রাজনীতিতে কোনো গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না।

স্টেশন যেতে কখনো-সখনো গাড়ি-ঘোড়া পাওয়া যেত, তাই লেনিনগ্রাদ যাত্রীদের পাঁচ মাইল হেঁটেই যেতে হতো। এমনিতে লেনিনগ্রাদের জন্যও কখনো কখনো বাস বা লরি পাওয়া যেত। মালটানা লরি তো সারাক্ষণই চলত, কিন্তু সেখানে ড্রাইভারের সঙ্গে চেনা না থাকলে বসার জায়গা পাওয়া মুশকিল ছিল। আজ লোলার রসদ আনতে লেনিনগ্রাদ যাবার ছিল। হেঁটে গেল, আমিও কিছু দূর অব্দি ধুলো খেতে খেতে পৌঁছে দিতে গেলাম।

মধ্যাহ্নভোজনের সময় আজ মালাই বরফের ঠেলা ভোজনশালার বাইরে এসে দাঁড়ালো। একশো-দেড়শো অতিথি যেখানে কিনতে ইচ্ছুক সেখানে লাইন কেনই বা না লাগবে? আমিও ৪·৮০ রুবলে ইগরের জন্য মালাই বিস্কুট কিনলাম। টাকার হিসেব কষলে তিন টাকা হয় কিন্তু বিনিময়ের এই হিসেব নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হতো না। জিনিস সস্তা হওয়ার প্রমাণ হিসেবে আমরা ধরতাম জিনিসের ওপরে খরিদ্দারদের ঝাঁপিয়ে পড়াকে। দেখতে দেখতেই ঠেলা খালি হয়ে গেল। ঠেলার আসাটা খুব শুভচিহ্ন ছিল। রেশন ছাড়া আর ভোজনশালার বাইরেও সুস্বাদু খাদ্যবস্তু তো কিনতে পাওয়া যেত?

রেডিও থেকে দূর থাকাতে মনে হচ্ছিল আমি যেন তিব্বতে এসে গিয়েছি। দু-একদিন পরে পরে লেনিনগ্রাদের 'প্রাভদা' চলে আসত। তিরযোকী থেকেও আমাদের সাপ্তাহিকের

আকারে দু-পাতার তিরযোকী পার্টির পত্রিকা বেরতো। কিন্তু সেখানে কেবল স্থানীয় কলখোজের (পঞ্চায়েতী চাষাবাদের গ্রাম) খবরে ভরা থাকত। আর বিদেশী দূরের কথা, স্বদেশী খবরও সেখানে পাওয়া যেত না। হ্যাঁ, খেতে কি ধরনের ফসল আছে, কি কাজ হচ্ছে, স্থানীয় পার্টি কি করছে এই সব খবরই ওতে থাকত। এইরকম দুপাতার খবরের কাগজ সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রামগুলো থেকে হামেশাই বের হতো। আর সেগুলো যে স্বাবলম্বী ছিল, সে কথা বলার দরকার নেই।

আজ রাতে মার্কিন ফিল্ম 'চোচকা চার্লী' দেখানো হলো। রাশিয়ার গ্রামেও ফিল্ম সর্বদা শেখানো হয়। এমন কোনো হপ্তা যায় না যে হপ্তায় গ্রামে সিনেমার লরি আসে না। লরিগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবস্থাও থাকে, তাই গ্রামটা যদি বিজলি-ছাড়া হয়, তাও ফিলম্ দেখাতে কোনো অসুবিধে হতো না। আমাদের এখানে প্রকৃত সিনেমার লরি আগে আসেনি। এখন খবর পেয়েই লোকজন চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল। ইগরেরও নেশা চেপেছিল, কিন্তু আমি কোনোপ্রকারে ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এগারোটার সময় গোধূলি ছিল। যখন ফিলম্ আরম্ভ হলো।

৭ জুলাই ছিল রোববার। কাল রাতে একটু বৃষ্টি হয়েছিল, যার জন্য বনের শোভা বিকশিত হয়েছিল। সাগর উচ্ছলিত ছিল, তিরযোকীর এই উপবন লেনিনগ্রাদ থেকে ৫৪ কিলোমিটার দূরে ছিল। উপবনে ডাক্তার আর কম্পাউন্ডারসহ চিকিৎসালয় ছিল। ক্লাবের সঙ্গে ছোট গ্রন্থাগারের হলে নাটক, নাচ আর গান হতো। রান্নাঘর আলাদা ছিল। এখন তো যেন-তেন প্রকারে দিন কাটাতে হতো, কেননা পাঁচ হাত লম্বা আর পাঁচ হাত চওড়া ঘরে দু-জন করে লোক ভরতি ছিল, কিন্তু মানুষ উপবনের যোজনা যেদিন কার্যে পরিণত হবে সেই দিনগুলোর আশায় ছিল, যখন বিশ্রাম-ইচ্ছুক প্রতিটি মানুষ এক-একটা করে ঘর পেয়ে যাবে। আজকে একটা ছোট নাটক আর উজবেক-নৃত্য হলো, যারা করল তারা আমাদের ছাত্র। বাচ্চা বয়স থেকে নাট্য-নৃত্য-সঙ্গীতের অভ্যাস থাকায় ছাত্রদের নিজের পার্ট করতে কিছুমাত্র দ্বিধা হচ্ছিল না, তাই এই মনোরঞ্জনকে নিম্নমানের বলা যায় না।

পরের দিনও ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছিল। রাতে তো বেশ বৃষ্টি হলো। চারপাশ সবুজ আর মনোহর হয়ে গেল। সাগরও উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল। উপবনে ভলিবল আর টেনিস খেলার ক্ষেত্র ছিল। আমরা কখনো-সখনো দেখতে চলে আসতাম। খেলোয়াড়দের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা কম আর মেয়েদের সংখ্যা বেশি ছিল। ভলিবলের অনেকগুলো ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। পাশেই লক্ষ্য টাঙিয়ে একটা বন্দুক রাখা ছিল। লোকেরা ওখানে টিপের অভ্যেস করত। এক রুবলে দশটা গুলি পাওয়া যেত—এগুলো আসলে গুলি না, ছোটমত তীর ছিল। লোকেদের লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করতে দেখে আমিও দু-এক রুবল খরচ করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্যভেদ করতে পারিনি। এই অভ্যাস খালি মনোরঞ্জনের জন্য নয়—দরকার পড়লে অভ্যাস করা লোকেদের বন্দুক নিয়ে রণক্ষেত্রে নামতে হবে। এমনিতে তো এটা মনোরঞ্জন ছাড়া তেমন কিছু দরকারী জিনিস ছিল না, কেননা সোভিয়েতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য দু-এক বছরের সৈনিক শিক্ষা অনিবার্য এবং স্কুল থেকেই ছেলেমেয়েদের ড্রিল-প্যারেড শেখানো হতো।

—১৯৪৬—

ইগর তার নিজের বন্ধু পেয়ে গিয়েছিল, সমবয়স্ক নয়—তারা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী এবং প্রৌঢ়া। তাদের কাছে ও গল্প শুনতো আর গান মুখস্থ করত। এই 'বন্ধু'-দের বক্তব্য ছিল যে এই ছেলেটা গায়ক আর অভিনেতা হবে। গায়ক হবে কি না সন্দেহ আছে, কিন্তু অভিনেতা হয়তো ভালোমন্দ একটা হয়ে যাবে, এটা আমিও মনে করতাম। ওর স্কুলের প্রথম বছর নষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু নতুন বন্ধুদের সংস্পর্শে আসার জন্য ওর অঙ্ক লেখার নেশা জন্মাল আর কিছুদিনের মধ্যেই ১০০-র ওপরে পৌঁছে গেল। অক্ষর আর নাম লিখতে ওর ইচ্ছে করত না। ও শুধু নিজের মনের মত কাজ করতে পছন্দ করত। সেদিন লোলার লেনিনগ্রাদ থেকে ফেরার কথা। রাত দশ-এগারোটা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে সে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। রাত দুটোর সময় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খাদ্যসামগ্রীর বোঝা-টোঝা নিয়ে চার-পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে লোলা রানী পৌঁছল। সময়ের কাজ সময়মত যদি করা অভ্যেস থাকত তাহলে, এতটা দেরি করতে হতো না। তবে রাত বারোটা মানে অন্ধকার নয়।

বেড়ানোর জন্য দু-এক মাইল গিয়ে ফিরে আসতাম। ২ জুলাই আমি পা কিছুটা আগে বাড়ালাম। নটায় বেরোলাম। অন্ধকারের ভয় ছিল না। তাই সারা রাত বেড়াতে পারতাম। তিন কিলোমিটারের বেশি সমুদ্রের পাশের রাস্তা দিয়ে গেলাম। কিলোমা স্টেশন পেলাম। বৃষ্টি পড়ার ফলে ধুলো-ময়লা উড়ছিল না, তাই আমি রাস্তায় বেড়ানোর সাহস করেছিলাম। লরি আর মোটর-গাড়ি অনবরতই চলছিল। এক জায়গায় মুখোমুখি আসা দুটো লরি ধাক্কা খেয়েছিল, যাতে একজন ড্রাইভার আর সহায়িকা আঘাত পেয়েছিল। পুলিশ বয়ান নিচ্ছিল। আগে বাঁ দিক দিয়ে পাহাড়ী রাস্তার দিকে ঘুরে গেলাম। 'পাহাড়ী'-র প্রবেশ-পথে মাচা বাঁধা ছিল, যার ওপর থেকে যুদ্ধের সময় হয়তো লুকিয়ে থাকা বন্দুকধারী শত্রুর ওপর নিশানা লাগাতে হতো। যেখানে-সেখানে পরিখা এখনো ওইভাবেই রয়েছিল। পাহাড়ী সমতল ভূমি ময়দানের মত ছিল। প্রথম বাড়িটার ঘেরা জায়গা ছিল বিশাল, তার কোনায় ছাতার মত ছিল, যেখানে বসে ফিন-দেবীরা সমুদ্রের ঢেউ গুনতো। আজ এটা লেনিনগ্রাদের লোকেদের বিশ্রামভূমি। যুদ্ধের আগে ফিন সামন্তরা আর ধনীরাও এটা কাজে লাগিয়েছিল। স্টেশন অব্দি গিয়ে ফিরে এলাম। একটা বিশাল প্রাসাদের চারদিকে কাঠ আর পাথরের উঁচু প্রাচীর ঘেরা ছিল। প্রথমে হয়তো এখানে মেইনরহাইমের আত্মীয়-স্বজনদের ভবন ছিল। কিন্তু এখন শকুনিদের কেন্দ্র। আজ কাগজ থেকে একটি যোজনা পৃথিবীতে নামতে দেখলাম—মাইলের পর মাইল ভিন্ন ভিন্ন সংস্থারের বিশ্রাম-নিবাস বানানো হচ্ছিল। মানুষও কাজ করছিল আর মেশিনও। তিযোকী, কিলোমা ইত্যাদি নামগুলো এখন ফিনদের অবশেষ হিসেবে রয়ে গেছে। লেনিনগ্রাদও আগে ফিনদেরই ছিল। তার নদী 'নেবা'র নাম ফিনিশ ছিল। এই দিকে এখন লেনিনগ্রাদ থেকে বিপুরীর রাস্তায় দূর অব্দি ভূমি বিশ্রাম-উপবনের জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছে। বারোটার সময় বেড়িয়ে ফিরলাম। তখন গাছের নীচে শুধু একটু একটু অন্ধকার দেখা যাচ্ছিল।

—১৯৪৬—

মেইনরহাইম দুর্গের সারি—ফিনল্যান্ড দেবদারুর বন, উঁচু-নিচু পাহাড়ী ভূমি আর তার হাজার হাজার ছোটবড় ঝিলের জন্য বিখ্যাত। ১০ জুলাই এগারোটার সময় লরি করে আমরা মেইনরহাইম দুর্গপঙ্‌ক্তি দেখতে গেলাম। খবরে কাগজে যুদ্ধের সময় মেইনরহাইম সারিকে জার্মানি 'সিগ্‌ফ্রিদ' আর ফ্রান্সের 'মগিনোঁ সারি'র ছোট ভাই বলা হতো। তাই যখন তা দেখার প্রস্তাব মহিলা-সঙ্গীরা করল, তখন আমি সেই উৎসুকতার সঙ্গেই ওদের সঙ্গ দিলাম। লেনিনগ্রাদ থেকে ৬৪ কিলোমিটারের মাথায় পাহাড় সমুদ্রের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। এখান থেকেই এই দুর্গপঙ্‌ক্তি শুরু হয় আর পূর্বদিকে লাদোগা মাহাসরোবর অব্দি চলে যায়। ট্যাঙ্ক আর অন্যান্য যুদ্ধের বাহনগুলো থামাবার জন্য তিন টন ওজনের ও তিন-চার ফুট চওড়া পাথরের চাঁই রাখা ছিল। এই পাথরের চাঁইগুলো না ভেঙে কোনো যুদ্ধের বাহন এগোতে পারত না। নিচে কোথাও কোথাও, ভূগর্ভ তোপখানা ছিল, যার ওপরে খুব মোটা সিমেন্টের পরত ছিল। এক জায়গায় তো এই পাহাড়ের মাথায় এত মজবুত দুর্গ বানানো ছিল যে তা উড়িয়ে দেবার পর সেখানে গভীর গর্ত হয়ে গেল। তবে গিয়ে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক পর্বত-সমুদ্রদ্বার পার হতে পারল। এখান থেকে আমরা দুর্গপঙ্‌ক্তির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর চড়লাম। পাহাড়ে চড়া মানে হিমালয় বা বিন্ধ্যাচলের মত পাহাড়ে চড়া নয়। এটা তো সত্যিই ভেতরে পাথরেরই পাহাড়, কিন্তু ওপরের মাটি এতটা ধৌত হয়নি যে সে পাহাড়ের রূপ দেখাবে। হ্যাঁ, সমুদ্রের দিকে গেলে একটু চড়াই অবশ্যই চড়তে হয়। এই জন্যই একে পাহাড় বলতে সংকোচ হয়। ভূমি এখানে ওঠা-নামা করে চলে গেছে, যার নিচে পাথরের বড় বড় চাঁই ঢাকা আছে। মেইনরহাইম দুর্গপঙ্‌ক্তির উল্টোদিকে একটা গ্রাম দেখা গেল। কিছু কাঠ আর লাল টালি দিয়ে ঘেরা বাড়িও ছিল। গ্রামে এখন রুশরা থাকত। বাড়িগুলো বানিয়েছে যারা তারা কবেই ওগুলো ছেড়ে চলে গেছে। মলীনা আর স্ট্রবেরি অনেক ছিল, কিন্তু এখনো পাকে নি। যাদ্‌দী (এক জঙলী টেপারি) অনেক ছিল, যার স্বাদ আমলকীর মত মনে হচ্ছিল। এই গ্রামে অনেক আলুর খেত ছিল, কিন্তু জল দেবার ব্যবস্থা না থাকাতে দৈব ভরসায় চাষবাস চলত। ফিরে এসে লরি করে ফের দু ফার্লং আগে ৬৬-তম কিলোমিটার পর্যন্ত গেলাম। এই রাস্তা বিপুরী (বীবুর্গ) যাচ্ছিল। ৬৬-তম কিলোমিটারের ওপর একটা ভাঙা গির্জা দেখা গেল, যার দেওয়ালে এখনো ক্রস (সলীব) ঝুলছিল। এখানে যুদ্ধে বিধ্বস্ত অনেক বাড়িঘর কঙ্কাল রূপে বা মাটিতে ভেঙে পড়েছিল। হয়তো ফিনরা এই উঁচু স্থানকে দুর্গের কৌশলে ব্যবহার করেছে, যার কারণে গির্জাকে বরবাদ হতে হয়েছে। বহু লোকই নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছিল—এটা 'মাইনরগীম'-এর মহল। ফিনরা মেইনরহাইমের নামই জানত। তাই প্রত্যেকটা বড় অট্টালিকা ওদের মতে মেইনরহাইমের মহল। এর থেকে অল্প নীচের একটা ছোট পর্যাপ্ত জলের নদী বহে চলেছিল। তার জল কালো ছিল—সেটাকে খুব সহজেই 'কালো নদী' বলা চলত। কালো নদীও ওই সময় রক্ষা-পঙ্‌ক্তির কাজ দিয়ে থাকবে। এখানে কিছু আলুর খেত ছিল। একটা স্ত্রীলোক শুধু স্তনবন্ধ আর ঘাঘরা পরে নিজের আলুর খেতে কাজ করছিল। অনেকগুলো দৃশ্যের ছবি নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের পরিচিত বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের অসাবধানতার জন্য সেগুলো নষ্ট হয়ে গেল।

আড়াই ঘণ্টা যাত্রার পর আমরা ফিরে এলাম। রাস্তার ওপর ওই সময় বাঁদিকে শিশু-উদ্যান আর শকুনিদের নিবাসস্থান চলে গেল। যেখানে কোনো সময় ফিনদের গ্রাম, ছোট শহর আর মনোরঞ্জনশালা হয়তো ছিল, সেখানে এখন সোভিয়েত সংস্থাগুলো নিজেদের আধিপত্য জমিয়েছিল। ভোজনশালা, রেস্তোরা আর খাদ্যপণ্যশালা সব জায়গায় মজুত ছিল।

১১ জুলাই এগারোটার সময় আবার আমাদের হলঘর গরম হয়ে উঠল। অভিনয়ে আর গানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল। শেষ অভিনয় ছিল ঃ তরুণী প্রেমিকার চিঠি পেয়ে তরুণ ছাত্র তার সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছে, তারপর বলছে এখন সময় অনেক আছে, আর একটু পান করে নিই। ফের পান করতে বসে যায়। একটা বোতল শেষ হয়ে যায়, আবার একই কথা বলে দ্বিতীয় বোতল ওঠায়। এইভাবে তিন-চার-পাঁচ-ছয় বোতল শেষ করে ফেলে। প্রত্যেক বোতল অনুসারে ওর অঙ্গভঙ্গিতে ও মুখে বিকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। দেখে লোকেরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। ইগর তো মদখোরের কথা শুনে এত জোরে হাসতে থাকল যে ওকে চুপ করানো মুশকিল হয়ে পড়ল। সব শেষে ষষ্ঠ বোতল শেষ করে ও প্রেমিকার কাছে পৌঁছে যায়। প্রেমিকা ওকে ঝাঁঝের সঙ্গে বকে। না ছিল কোনো সাজ-সরঞ্জাম, না রঙ্গমঞ্চের মূল পর্দা ছাড়া আর অন্য কোনো পর্দার ব্যবস্থা, না অভিনেতা ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ পোশাকের ব্যবহার করেছিল। কিন্তু অভিনয় আনন্দদায়ক ছিল।

সরোবরের সফর—১২ জুলাই প্রফেসর স্তাইন, তার স্ত্রী এবং অন্য আরেকজন সস্ত্রীক প্রফেসরের সঙ্গে আমরা সরোবর দেখতে গেলাম। আমাদের উপবন থেকে তা তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যে ছিল, তাই হেঁটেই গেলাম। রাস্তায় লেনিনগ্রাদ থেকে বিপুরী যাবার রেলপথ পেলাম। আরো কিছুটা এগোলে দেবদারুর ঘন ও সুন্দর জঙ্গল এল। এখানে শুধু দেবদারু বৃক্ষ ছিল। এক জায়গায় বাঁদিকে মাটি কিছুটা উঁচু হয়ে যাওয়ায় দৃশ্য একেবারে হিমালয়ের মত মনে হচ্ছিল। ঘন জঙ্গলে দু কিলোমিটার হেঁটে চলে গেলাম। তারপর কেলু গাছের প্রাধান্য দেখা গেল। এখানে যুদ্ধের অবশেষ—পরিখা আর পাহাড়-পর্বত অনেক ছিল। সরোবর খুকরির আকারে ছিল। লোকে বলছিল, যুদ্ধের আগে এটা পর্যটকদের প্রিয় জায়গা ছিল, তাই সরোবরের পাশে দু কামরার একটা খুব ভালো বাংলো ছিল, যা শীতকালেও গরম করার ব্যবস্থা ছিল। হয়তো যুদ্ধের সময় এখানে অফিসার থাকত। সরোবর বেশ লম্বা ছিল। জল নোনতা না মিষ্টি ছিল, তাতে অনেক মাছ ছিল, কিছু নৌকোও ছিল। পুরনো ফিন বাসিন্দারা চলে গিয়েছিল, আর নতুন বাসিন্দাদের কাছে যুদ্ধের আগের অবস্থার সম্বন্ধে যতটা জানা সম্ভব আমি তা নিজের কল্পনা দিয়েই জানতে পারতাম। রাস্তায় বহু কুঁড়েঘর আমি ভাঙা অবস্থায় দেখলাম। বহু খেত দেখে বোঝা যাচ্ছিল ১৯৪০-এর পরে ফসল বোনা হয়নি। তাই ঘাস হয়েছিল। কিছু খেতে গমও লাগানো ছিল, কিন্তু আশেপাশে মানুষের চিহ্ন এবং চাষের চিহ্ন না থাকায় এইটুকু শুধু বলা যায়, যে কাটা গম ঝাড়ার পর এখানে জংলা গমের রূপে ফসল তৈরি হচ্ছে। এরকম

লাখ-লাখ একর খেত আর হাজার হাজার গ্রাম এই দেশে পরিত্যক্ত পড়ে আছে। আবাদ করার জন্য লোক পাওয়া মুশকিল। সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষেত্রফল সাতটা ভারতের সমান, জনসংখ্যা ভারতের অর্ধেক। আমার মাঝে মাঝে মনে হতো—যদি আমাদের এখানকার এক বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ওখানে পাঠানো হয়, তাহলে এই সমস্ত ভূমি আবাদ করা যায়। কিন্তু আমাদের সমতলে থাকা মানুষ এখানকার শীত সহজে বরদাস্ত করতে পারবে না। যাইহোক, ভারতের জন্য নিজের জনসংখ্যা বাইরে পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানের দ্বার চারদিক থেকে বন্ধ ছিল। রাশিয়ায় যাওয়া সম্ভব না, যদিও সেখানে কালো-সাদার প্রশ্ন নেই। অস্ট্রেলিয়ায় এক কোটি সাদারা একটা মহাদ্বীপকে দখল করে নিয়েছে। সেখানে কালোদের প্রবেশ নিষেধ। তাই সেখানেও যাওয়া সম্ভব না। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা আমাদের সেই বন্ধুদেরও বের করে দিতে পা বাড়িয়ে আছে, যার দেহবলে সেই দেশ মানুষের সুখনিবাস হয়েছে।

লেনিনগ্রাদ থেকে ৬৬ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখে বোঝা গেল যে কয়েক বছরেই এটা ভব্য গ্রীষ্মনিবাসীদের ভূখণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু এই ধরনের যে প্রচুর ঝিল আর পরিত্যক্ত গ্রাম বা রমণীয় স্থান আছে, তখন কি সেগুলোতে বসবাস হবে? সোভিয়েতে তো সর্বত্র খালি জায়গা পড়ে আছে। যুদ্ধে ৭০-৮০ লাখ মানুষ মারা হয়েছে। যা পূরণ করাও সময়সাধ্য, তাও এই দেশের গুরুত্বকে এখানকার শাসক জানে বলে অন্য জায়গা থেকে মানুষজনকে এনে বসবাস করানোর চেষ্টা করছে। এর মধ্যে অনেক ভূতপূর্ব সৈনিক আছে। সরোবরের তটে নতুন ধীবর পরিবার বসবাস করছিল। মাছ বিক্রি ছাড়াও তারা খরগোশ পালন করছিল, কিছু শাক-সবজিও লাগিয়েছিল। সামনে ওই দিকে এক 'দাচা' (গ্রামীণ বিশ্রামগৃহ) দেখা গেল, যেখানে নৌকোয় পৌঁছনো যেত। অতি সবুজ দেবদারুর মধ্যে এই কালো সরোবর খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই সৌন্দর্যের আনন্দ নেবার জন্য এখানে আরো অনেক বাড়ি আর মেছো পরিবারের দরকার হবে। জঙ্গলে এই কাঠের বাড়িগুলোতেও কাঁচ লাগানো ছিল। ওগুলো ছাড়া শীতে বাড়িগুলোকে কি উপায়ে গরম রাখা হবে? রাশিয়ায় তো শীতের ঠেলায় সব দরজা আর খিড়কি দুটো দুটো করা হয়। আজকে পাকা চোর্নীকা (কালো) যাগ্‌দী (এক জংলী টেঁপারি) এখানে অনেক ছিল। সব বিশ্রামবিহারীরা সেগুলো কুড়োতে লাগল। এখানে আগন্তুকদের মধ্যে আমরা সাতজনই শুধু ছিলাম না, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্রাম উপবনের শত-শত নরনারী আর বাচ্চারাও ছিল। দুজন বাচ্চা টেঁপারি খেয়ে-খেয়ে নিজের ঠোঁট আর দাঁত কালো করে ফেলেছিল। পোয়াটাক টেঁপারির যেখানে দু-তিন টাকা দাম, জঙ্গলে সেটা বিনে পয়সায় কুড়োতে আর খেতে কত যে আনন্দ, তা বলার প্রয়োজন নেই। আশেপাশের গ্রামের মেয়েরা টেঁপারি নিয়ে আমাদের ওখানে যেত। আর মেপে মেপে বেচত।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্রামের টিকিট ১৫ দিনের জন্য পেত। পনেরো তারিখে আগে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা ফিরে গেল, যার ফলে উপবনে বিষণ্ণতা ছেয়ে গেল। ওরা থাকার জন্য কখনো সংগীত আর কখনো অভিনয় বা খেলা দেখার আনন্দ থাকত। ওদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। পরিচিত মুখের অভাবের কারণে মানুষের হৃদয়

একাকীত্ব অনুভব করবেই। কিন্তু প্রফেসররা এক মাসের জন্য এসেছিলেন, কাজেই আমাদের সহকারী পরিচিতরা থাকতেনই। সমুদ্রস্নান প্রায় রোজই আর কোনো কোনো দিন দুবারও হতো।

১৭৬ জুলাই অব্দি নতুন যাদের আসার কথা সব এসে পৌঁছল। বাড়ি তো ফের ভরে গেল, কিন্তু এখন আগের মতো আর ধূম ছিল না। দু-তিন দিন তো পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য দরকার। পরিচয়ের স্থান ক্রীড়াক্ষেত্র আর নৃত্যশালা। বিদ্যালয়ে পাঁচ ছাত্রী পেছু একটি ছাত্রও ছিল না, তাই ছাত্র দুষ্প্রাপ্য ছিল, তবুও মুখচোরা তরুণ সহচরী তরুণী জোটাতে অসমর্থ হতো। অতিরিক্ত বাচাল তরুণও নিরাশার মুখ দেখত। ছাত্রদের এখানে এক-একটা ঘরে সাত-আট জনকে এক সঙ্গে রাখা হতো। বলাবাহুল্য, ছাত্র-ছাত্রীদের ঘর আলাদা আলাদা হতো। স্নানের জায়গায়, সমুদ্রে বা বালিতে অধনগ্ন তরুণ-তরুণীরা নাইতে বা রোদে শরীর সেঁকতে নিঃসংকোচে অকৃত্রিম ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকত। রাত বারোটা অব্দি ওদের হাতে হাত ধরে বনস্থলীতে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা ছিল। চুম্বন করাও এই দেশে কোনো মহার্ঘ বস্তু না, সেটাকে তো অধিক পরিচিত ব্যক্তির পরস্পরের সাধারণ শিষ্টাচার বলে মানা হয়। কিন্তু হাতে হাত দিয়ে ঘুরে, চুম্বন বা পার্শ্বালিঙ্গনের এই অর্থ ভাবা উচিত না যে, তাদের সম্পর্কটা যৌন-সংসর্গ অব্দি পৌঁছে গেছে। বস্তুত স্বচ্ছন্দ নর-নারীদের এই রকম সব দেশে ভারতীয় তর্কশাস্ত্র বেকার হয়ে যায়। আবার এর মানে এও নয়, যে ওখানে সবাই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করছে।

আমাদের ঘরের নিচে থাকা পরিচারিকার ছোট ছেলে অলেক মোটামুটি ইগরের বয়েসী। উচ্চতায় ও ছোট ছিল। ওর চুল একদম হলদে, আর রং অত্যন্ত ফর্সা ছিল। ফিন মায়ের ছেলে ছিল বলে নাক ও মুখ ওইরকমই ছিল, যেরকম থাকে আমাদের এখানকারের কোনো শুদ্ধ দ্রাবিড়ের। অলেক হাত-মুখ ধোওয়ার একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। এখনো কল আর বিজলির ভালো ব্যবস্থা হয়নি, ও নিজের মুখকে কল বানিয়ে নিয়েছিল। গ্লাসে জল নিয়ে বাইরে আসত, ফের মুখে জল ভরে ওর কুলকুচো দিয়ে হাত-মুখ ধুতো। অলেকের আবিষ্কার খুব ভালো ছিল আর তাতে মার দিক থেকেও কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এতে শুদ্ধতা আর স্বাস্থ্যের বালাই ছিল না। আমি তা বলছি না যে ভারতের মানুষ খুব শুদ্ধতা পালন করে। শুদ্ধতার মাপকাঠি আমাদের সব জাতি এবং সব প্রদেশে এক ছিল না। যার মধ্যে শুদ্ধতা আছে, সেও শুদ্ধতাকে ব্যক্তিগত শরীর অব্দি সীমিত রাখে। তাতে যদি আঙিনার নালায় ময়লা ছড়ানো থাকে, দরজায় নোংরা আবর্জনা থাকে, তাহলেও চিন্তা নেই। এটা তো বলতেই হবে যে এঁঠোকাঁটার যে ভাবনা স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাথায় বাচ্চা বয়স থেকেই ঢোকানো হয়, তা অন্য দেশে পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্য আর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অধ্যয়নের পর এখানকার লোক তা বুঝতে পেরেছে এবং তা ধীরে ধীরে প্রচারও হচ্ছে, কিন্তু তা চিরাচরিত প্রথার স্থান অতটা চট করে নিতে পারে না।

১৮ জুলাই সমুদ্র অত্যন্ত তরঙ্গায়িত ছিল, যার জন্য জল স্বচ্ছ ছিল না। স্নান করলে কাপড় নোংরা হয়ে যাচ্ছিল। শরীরও পরিষ্কার হতো না। ওদিকে মেঘলার জন্য সূর্য

যখন-তখন দর্শন দিচ্ছিল যার কারণে জল ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আজ স্নানার্থীরা সমুদ্রতটে ছিলই না। এই হপ্তায় শহর থেকে একটা চৌকো ছক মা নিয়ে এসে ইগরকে দিয়েছিল, যাতে পাশা ফেলে নিজের নিজের গুটি চালাতে হয়। খেলার জন্যই ইগর খুব তৎপরতার সঙ্গে অঙ্ক শিখেছিল। কিন্তু তাতে কিছু জায়গা এমন ছিল, যেখানে এসে গেলে গুটিকে চার-পাঁচ সিঁড়ি নীচে নামতে হতো। মাঝখানের স্থান দূরে পড়ে যাওয়ায় এইরকম নামার জায়গায় ইগর কাঁদতে আর ঝগড়া করতে তৈরি হয়ে যেত। ওকে কত বোঝাতাম, যে এতে কারো দোষ নেই, পাশাতেই তো এরকম দান পড়েছে, কিন্তু সে-তর্ক কে শোনে? ও বলত, 'তোমার গুটি কেন আগে আগে যাচ্ছে?'

সন্ধের সময় আজ এক বক্তা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাষণ দিল। বক্তা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল। শ্রোতাদের মধ্যে ছিল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, উঁচু ক্লাশের ছাত্র, কিন্তু সবাই খুব গুরুত্বের সঙ্গে শুনল। ভাষণ জ্ঞানগর্ভ ছিল। মার্কিন পুঁজিবাদ যুদ্ধের বারুদখানা তৈরি করছিল। চীনে খোলাখুলিভাবে সে চিয়াংকাইশেকের প্রতিগামী শক্তিকে মদত দিয়ে, গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করতে মুখিয়ে আছে। বহুকাল ধরে সোভিয়েত নিরপেক্ষতা দেখাতে পারত না। কোরিয়া আর জাপানে ম্যাকার্থার প্রতিগামী শক্তিদের দৃঢ় করছিল। ইটালির উপনিবেশগুলো ইংল্যান্ড দখল করে আফ্রিকায় নিজেকে শক্তিশালী করছিল। পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স আর ইটালির সাম্প্রতিক নির্বাচন বলে দিয়েছে যে জনতার অধিকাংশ প্রতিগামিতা পছন্দ করে না। কিন্তু অ্যাংলো-আমেরিকান পুঁজিবাদ নিজেদের লক্ষ্যে দৃঢ়। দক্ষিণ ইরানকে ইংল্যান্ড সশস্ত্র করছে আর ওখান থেকে গণতন্ত্রকে শেষ করে দিতে চাইছে। কিন্তু অ্যাটমবোমার নীতি সফল হতে পারে না। যে অ্যাটমবোমার বলে আমেরিকা নাচছে, সেটাও এমন কিছু অমোঘাস্ত্র নয়। হালে প্রশান্ত মহাসাগরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাকে লক্ষ্য করে, জাহাজে বহু ছাগল জাবর কাটতে থাকল, কিন্তু তখন ওদের পাশেই অ্যাটমবোমা ফেলা হলো। আমেরিকার জাপানের ওপর ফেলা অ্যাটমবোমার অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত মানুষ যতটা ভয় পাচ্ছে, সেরকম প্রভাব রুশদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। ওদের পুরো বিশ্বাস আছে, যে জার্মানিকে পশ্চিমী শক্তিগুলো হারাতে পারত না, যদি রাশিয়া যুদ্ধে না নামত। সঙ্গে সঙ্গেই রুশরা নিজেদের এখানেও অ্যাটমবোমা আবিষ্কারে রত ছিল। বস্তুত অ্যাটমবোমা সম্বন্ধীর মৌলিক আবিষ্কারের আরম্ভ আমেরিকা করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই রাশিয়ার দুজন বৈজ্ঞানিক তাদের অনু সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকে এক রুশ গবেষণা-পত্রিকায় ছাপিয়েছিল, যার ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল আমেরিকার একটি পত্রিকায়। এটা সম্ভবত ১৯৩৮-এর কাছাকাছির কথা। এক জার্মান বিজ্ঞানী সেটা নিয়েই এগিয়ে অনুগর্ভে ইচ্ছানুসারে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করল। এই সব জিনিস তখন গোপনে করা হতো না। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হতেই যখন হিটলার এই সবের ওপর পর্দা টেনে দিয়ে নিজের এখানে এই রকমের আবিষ্কার করার চেষ্টা করল, তখন মিত্রশক্তিদের নজরও সেদিকে যাওয়া জরুরি ছিল। হিটলারের অত্যাচারে পীড়িত কিছু জার্মান বিজ্ঞানী পালিয়ে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন দেশে চলে গেল, যার সাহায্যে এবং নিজের যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে আমেরিকা সব চাইতে

আগে অ্যাটমবোমা বানাতে সমর্থ হলো আর ট্রুম্যান ও চার্চিলের মত মহান রাক্ষসেরা হেরে যাবার জন্য তৈরি জাপানের দুটি শহরের লাখ লাখ নিরীহ মানুষের ওপর অ্যাটমবোমা ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিতে একটুও টালবাহানা করল না। যদিও সোভিয়েতে এটা অত্যন্ত গোপন খবর ছিল, যে সোভিয়েত বিজ্ঞানী অ্যাটমবোমা আর আনবিকশক্তি আবিষ্কার করতে উঠে পড়ে লেগেছে। যে পরিবারের ব্যক্তিরা এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন এবং নিজেদের নগর থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন, সেই পরিবারের অন্য লোকরা কোনো না কোনোভাবে তাঁদের লোকেদের খবর পেয়ে যেত, যার থেকে সাধারণ মানুষ জানতে পারত যে সোভিয়েতে এই বিষয়ে কাজ খুব তৎপরতার সঙ্গে হচ্ছে।

১৯ জুলাইতেও সমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল। আমরা স্নান করতে যায়নি। তিরযোকীতে এখন মশাদের সেনা এসে পৌঁছেছিল। ছার আর পোকামাকড় আগে বেশ কিছু সংখ্যায় মজুত ছিল, কিন্তু তখন তো শুধু রাতেই তাদের প্রভুত্ব দেখাত। এই মশা দেবতা দিন-রাত বলে কিছু মানতো না। তিনটের জ্বালায় এখন মন অতিষ্ঠ। পায়খানা খোলা ছিল। জল বেরোবার ব্যবস্থা ছিল না। এটাই মশা বাড়ার কারণ হতে পারে। নালার পাইপ বসানো হচ্ছিল, ওই সময় হয়তো জলে বয়ে যাওয়া পায়খানার জন্য মশাও কমবে। কিন্তু যেখানে-সেখানে পঙ্কিল ভূমি ছিল, যার মধ্যে পচা ঘাসে জল উছলে পড়া দেখা যেত। মশা ওখানে নিজের বাসা বাঁধতে পারে।

২০ জুলাই একান্তে কিছুটা আলস্য বোধ হচ্ছিল। এমন কোনো কাজ করছিলাম না যার থেকে আত্মতুষ্টি হয়। ২০ তারিখ স্নান করতে গেলাম। দুদিনের উচ্ছলিত সমুদ্র নিজের ভেতরের কত জিনিস এনে তীরে বমি করেছিল। সেখানে সবুজ শ্যাওলার মোটা পরত পড়ে ছিল, যার মধ্যে শামুকের মত কিছু সামুদ্রিক প্রাণীদের অবশেষও ছিল। ওগুলো থেকে খুব দুর্গন্ধ আসছিল। নোংরা জলে স্নান করলে শরীরের কাপড়ও নোংরা হয়ে যায়। তীর থেকে বেশ কিছুটা ঢুকে গেলে জল একটু পরিষ্কার ছিল। আজ স্নানে ইচ্ছুক লোকদের কম দেখা গেল। সমুদ্রের উথলে ওঠা জলে ছোট ছোট মাছ সর্বদা দেখা যেত। ইগর কিছু মাছ ধরে এনেছিল। সেগুলো ও জল দিয়ে টিনে রেখেছিল। তিনটে মাছের মধ্যে একটা হারিয়ে গিয়েছিল, একটার মরণ আসন্ন মনে হচ্ছিল। আমি বললাম, 'এদের সমুদ্রে ফেলে দাও।' ওর পালন করার আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাও এটা সে অনুভব করল যে মাছেদের ছটফট করিয়ে মেরে ফেলাটা ভালো না, তাই মাছগুলোকে সমুদ্রে ফেলে এল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এখন ভালো ছিল না—এটা আমি আগেও বলেছি। তবু রান্না করা জিনিস ছেড়ে নিজের মত করে কোনো ব্যবস্থা করাও মুশকিল ছিল। তাসত্ত্বেও লোকেরা কিছু করেই নিয়েছিল। আমাদের তো তিনজনের দুটো টিকিট ছিল, তাই একজনের খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল।

লোলা এবার একটা পকেট উনুন এনেছিল, যার মধ্যে ইন্ধনের টিকা জ্বলত। অনেক বছরের পুরনো উনুন, দাম চার রুবল ছিল। টিকাও ছিল চার রুবলের। টিকাটা চার ঘণ্টা জ্বলার পর শেষ হয়ে যেত। চার রুবল মানে ছিল আড়াই টাকা। চার ঘণ্টা ধরে জ্বলার

ইন্ধন আড়াই টাকা, তাও আবার পকেট উনুন! কিন্তু সত্যিসত্যিই টিকাগুলো দেখলে বোঝা যায় না যে এতক্ষণ জ্বলবে। ওতেই আমরা ডিম সেদ্ধ করতাম। এক পেয়ালা টেপারির দাম পাঁচ রুবল অর্থাৎ ইন্ধন আর উনুনের থেকেও বেশি। এখানে এই দেশে এসে সমস্ত অর্থশাস্ত্রকে ছেড়ে দিতে হয় এবং এটা দেখেই সন্তুষ্ট হতে হয়—এখানে কোনো মানুষ বেকার নয়। কেউ এরকম নেই, যার অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের এবং ছেলেদের শিক্ষা দানে অসুবিধে হয়। যখন সস্তায় রেশনের জিনিসও পর্যাপ্ত পাওয়া যায়, তখন আপনি নালিশ করবেন কেন? প্রফেসর, মন্ত্রী বা জেনারেল সাড়ে চার হাজার রুবল মাসে পায়, ওরা তো রোজ একশো রুবলের বেশি খরচা করতে পারে।

বিপুরী যাত্রা—২১ জুলাই লোকজন বিপুরী যাবার ব্যবস্থা করল। ১৯৪০-এর আগে বিপুরী ছিল ফিনল্যান্ডের ভালো শহরগুলোর মধ্যে একটা। এত দূরে যখন বেড়াতে যাবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, তখন আমি কেমন করে নিজেকে বঞ্চিত রাখি?

লরি পৌনে এগারোটার সময় আমাদের নিয়ে গেল। রাস্তায় পৌনে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করতে হলো, তারপর তিনটের সময় আমরা ওখানে পৌঁছে গেলাম। যাবার সময় আমাদের রাস্তা সমুদ্র তট থেকে দূরে দূরে ছিল, কিন্তু ফেরার সময় আমরা সমুদ্রের কাছের রাস্তা দিয়ে এলাম। দুতিন জায়গায় কিছু বসতি পাওয়া গেল, নয়তো সমস্ত ভূমি জঙ্গলে ঢাকা পর্বতস্থলী ছিল, যাতে যেখানে-সেখানে ছোট-বড়ো সরোবর ছিল। দেবদারু, কেলু আর ভূর্জবৃক্ষই জঙ্গলে দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায় এক জায়গায় ওই জঙ্গলেই আগুন লেগে ছিল। এই জঙ্গল একটানা আমাদের উপবন অব্দি এসে গিয়েছিল। আগুন নেভানোর চিন্তা ছেড়ে দিয়ে লোকেদের চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আমার আশ্চর্য লাগছিল—আগুন আমাদের কাছে না চলে আসে! দেবদারু, কেলু আর ভূর্জের সবুজ গাছ পুড়িয়ে ফেলতে অগ্নিদেবতার শুকনো-ভিজের চিন্তা ছিল না। তবে জঙ্গলে যেখানে-সেখানে কাঠের চওড়া পাটা কাটা ছিল, তাই আশা ছিল হয়তো আগুন ওখানে পৌঁছে থেমে যাবে। রাস্তাগুলো একরকম রাস্তার সমস্ত রকম রঙ-রূপই বজায় রাখত। কিন্তু তাতে ধুলোর বাহার ছিল। সত্তর কিলোমিটারের কাছাকাছি উঁচু-নিচু কিন্তু কিছুটা খোলামেলা ভূমি এলো, এখানে বহু গ্রাম আর অনেক খেত ছিল। খেতগুলো আবাদ করা যে কত মুশকিল ছিল তা নিয়ে আগেই বলেছি, কিন্তু তাও অনেক জায়গায় ট্র্যাক্টর এমনিই পড়ে ছিল। এর থেকে আশা বাড়তে থাকল। পুরনো বাসিন্দাদের বাড়িতে এসে রুশ মেয়ে-পুরুষরা এখন বসবাস করতে শুরু করেছিল। বেশিরভাগ স্ত্রীলোক থাকায় বিস্ময়ের কিছু ছিল না। যেই মেইনরহাইম দুর্গ-পঙ্ক্তি আমরা আগে দেখে এসেছিলাম, তার দুটো-তিনটে আরো সুরক্ষাপঙ্ক্তি পাওয়া গেল। অনেকগুলো ট্যাঙ্ক রাস্তায় ভেঙে পড়েছিল। স্বয়ং মেইনরহাইম-পঙ্ক্তিতে চারটে বড় বড় ট্যাঙ্কের 'লাশ' দেখলাম। সিমেন্টের দুর্গ, মাটির ঘর সব জায়গায় দেখা যাচ্ছিল। ফিনেরা বিপুরী অব্দি দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ লড়েছিল। এখানকার দুর্গ-নির্মাণও খুব মজবুত ছিল।' যেখানে-যেখানে সরোবর ছিল, সেখানে অবশ্যই তিন-টনের পাথরের প্রতিরোধ পঙ্ক্তি বানানো ছিল। খেতের ফসল বেশির ভাগ

ছিল আলু, তার পরে জব আর গম। বাড়িগুলোর পাশে বাঁধাকপির খেতও চোখে পড়ছিল। ফেরার রাস্তায় কন্দমূলের খেতও পেলাম। মনে হচ্ছিল সবগুলোই সোবখোজ (সরকারি চাষের গ্রাম) ছিল। চাষ করতে মেশিন খুব ব্যবহার করা হয়েছিল। সেগুলো ছাড়া এতবড় ভূমির আবাদ সামান্য লোকেদের দ্বারা সম্ভবপর হতো না। দুঘণ্টা পরে জঙ্গলে বিশ্রাম করার জন্য আমাদের লরি থামল।

এখানে যাগ্‌দী (টেপারি) অনেক ছিল, টেপারির মতই স্বাদ ছিল। এমনিতে ওটা ঠিক আমরা যাকে টেপারি বলি তা নয়, অন্য কোনো ধরনের ফল। আজ জিম্‌ল্যাঙ্কা (স্ট্রবেরি)-ও খেতে পেলাম। লরি থামতেই লোকেরা নেমে ফলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেখানে ঘাস বেশি ছিল, সেখানে মশাদের ফৌজও যাত্রীদের মধ্যে ভিড়ে যাবার জন্য ফিন-সেনা থেকে কম ভয়ঙ্কর ছিল না।

পৌনে এক ঘণ্টা বাদে আবার আমাদের ভ্রমণকারীর দল চলল। সেই উঁচু-নিচু জঙ্গলের পর্বতস্থল, সরোবরের ভূখণ্ড। যেখানে-সেখানে দুবছর আগের যুদ্ধের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। তিনটের সময় আমরা বিপুরী পৌঁছলাম। প্রথমে একটা চারতলা বাড়ি পড়ল, যার দেয়াল শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু জানলা-দরজা অদৃশ্য—সব কাঠের জিনিস যুদ্ধাগ্নিতে স্বাহা হয়ে গিয়েছিল, ইটের মুখ ঝলসানো ছিল। নগরে ঢোকার আগে ইট গড়ার খুব বড় যান্ত্রিক ভাঁটি দেখা গেল, যার থেকে জানা গেল যে সোভিয়েত-শাসক পুনর্নির্মাণের কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। রাস্তায় আমরা দুবার লেনিনগ্রাদ থেকে এখানে আসা রেল পার করলাম।

নগরে ঢুকতেই ট্রামের লাইন বিছানো আছে দেখতে পেলাম। কিন্তু তার থামগুলো নির্জীব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছিল। ট্রাম হয়তো ১৯৪০-এর পরে আর চলেনি। নগরে মানুষ কম থাকার কারণে হয়তো এখন আরো বহুদিন অব্দি একে চলার পরিশ্রম করতে হবে না। বিপুরী অত্যন্ত ভব্য ও সুন্দর নগর ছিল নিশ্চয়, সেটা এখনও তার ধ্বংসাবশেষ বলে দিচ্ছিল। এখান থেকে পাহাড়গুলো দূরে দূরে। বাড়িগুলোর মধ্যে একটা বারো তলা ছিল আর ছ-সাত তলা বাড়ি তো অনেকই ছিল। নগরের রাস্তা সোজা ছিল না। নগরের মধ্যে পার্ক-লেনিন ছিল, যার ফিন নাম হয়তো অন্য কিছু হবে। এতেই ১৯২৪-এ মস্তাইনিন দ্বারা বানানো বহু শৃঙ্গযুক্ত হরিণের সুন্দর মূর্তি আছে। অন্য জায়গায় একদিকে কুকুর নিয়ে কালো তরুণের মূর্তি ফিন শিল্পীর সার্থক সাধনার উদাহরণ।

খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। তেষ্টা মিটিয়ে আমি নগর সফরে বের হলাম। এখন বড় জোর একশোর মধ্যে দশটা বাড়িকে কাজ চালানোর মত করে নিয়ে লোকজন বসবাস শুরু করেছিল। নগরের পুরনো বাসিন্দারা (ফিন) তো যুদ্ধের সময়ই পালিয়ে গিয়েছিল, এখন সমস্ত রাশিয়া থেকেই খুঁজে-খুঁজে লোক আনা হচ্ছিল। যুদ্ধ খুব বেশি ধ্বংস করেছিল, তাও ১০ শতাংশ বসবাসের ঘর ছাড়াও ৫০ শতাংশে আরো সহজেই বসবাস করতে পারত। সেগুলোর জানলা, দরজা আর শুধু ছাদেরই মেরামত করতে হবে। মাত্র দু'বছর আগেই যেখানে সব জায়গায় কেবল ফিন ভাষা শোনা যেত, এখন তার স্থান রুশ নিয়ে নিয়েছে। শুধু দেয়ালে লেখা পুরনো বিজ্ঞাপনই 'কসল্লিস ওস কে পাভ কী যস্কাচ

বিস্কী'র মত লাতিন অক্ষরে ছিল। ফিনদের রোমান চার্চ খ্রীস্টানরা বানিয়ে ছিল, পরে সেখানে ওই চার্চেরই সংস্কার-সাধনকারী শাখা প্রটেস্টান্টদের প্রাধান্য হলো, তাই ফিন ভাষা রোমান লিপিকে মেনে নিল। প্রথম সংস্কৃতি প্রচারকরা এই রকমভাবে জাতির মধ্যে নিজেদের স্থায়ী চিহ্ন রাখে। মধ্য-এশিয়ায় এবং অন্য জায়গায়ও যেখানে-যেখানে আরবী সংস্কৃতির প্রচার হয়েছে, সেখানে আরবী লিপি দরকার পড়লে পুরনো লিপিকে শেষ করে অথবা তার ভাষা যদি অলিখিত হয়, তাহলে নিজের লিপি তাকে দিয়ে নিজের জন্য চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছিল। রোমান চার্চ প্রভাবিত ইউরোপের দেশগুলো ঠিক এই ভাবেই রোমান (লাতিন) লিপিকে আপন করেছিল। গ্রিক চার্চ যেখানে-যেখানে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করেছিল, সেখানে (রাশিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি) দেশে গ্রিক লিপি নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবেই আজও ভারতীয় লিপি থেকে বেরোনো লিপিগুলো তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ ইত্যাদি স্থানে প্রচলিত।

বিপুরী থেকে সমুদ্র দূরে কিন্তু সমুদ্রের গোঁফের একটা দিক এই অব্দি পৌঁছে গেছে, যার জন্য একটা সমুদ্র তটের বন্দর। নগরের এক ধারে জলের গর্তের মধ্যে পুরনো 'জামুক' (গড়) আছে, যা সুইডিশ ঢঙে বানানো। এখন অব্দি সুইডিশ বংশের লোকেরাই ফিনল্যান্ডের অভিজাত-শ্রেণী, যাদের মধ্যে এক মেইনরহাইম অনেক বছর ধরে ফিনল্যান্ডের সর্বেসর্বা ছিল। প্রথমে এই গড় পুরো পাথরের ছিল, পরে বহু ইটের মিনার জোড়া হয়েছিল। অনেক শতাব্দী আগে এই গড় বানানো হয়ে থাকবে। যে অট্টালিকা তথা রক্ষা-প্রাচীর ইত্যাদি এখানে বানানো হয়েছে, তা বহু শতাব্দীর মানব-শ্রমের পরিণাম। কিন্তু রক্ষা-পঙ্‌ক্তিতে মানুষের যতটা শ্রম লেগেছে তা কিছু সময়ের মধ্যেই লাগানো হয়েছে, তার সামনে এই জামুক কিছুই না। জামুকে এখনও মানুষ থাকতে পারে, কিন্তু ওই রক্ষা-পঙ্‌ক্তিগুলোর এখন কোনো ব্যবহার ছিল না। নগরে রীনক (হাট) ছিল, যেখানে আশেপাশের গ্রামের জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। বিক্রেতাদের দেখলেই বোঝা যায়, যে এই গ্রামে এখন শুধু রুশরাই রয়ে গেছে। বিধ্বস্ত হওয়া বিপুরী এবং তার পর পর্যন্ত ছড়ানো অংশে বসবাস করানোর জন্য রুশদের নিজেদের ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে হতো। এই যুদ্ধেই ক্রিমিয়ার তাতার ওখান থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে আর সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া মনোরম প্রায়দ্বীপেও এখন রুশদেরই গিয়ে বসবাস করতে হচ্ছে। পূর্ব প্রুশিয়ারও (জার্মানি) এক ভাগে রুশদের বসবাস করাতে হচ্ছে, এইভাবে এই যুদ্ধে রুশ জাতিকে উত্তর-দক্ষিণ আর পশ্চিমে অনেক দূর অব্দি ছড়াতে হলো। প্রথম ফিনল্যান্ডের যুদ্ধের পর এই এলাকায় মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গল জাতির মধ্যে থেকেও অনেক লোককে এনে বসবাস করানো হয়েছে, কিন্তু এখন তো ওদের এখানেও বিশাল মরুভূমিকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করতে ওদেরকে এখানে পাঠানো সম্ভব নয়। পার্কের এক কোনায় লাল রঙের গির্জা ছিল, যা যুদ্ধে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছু বড় বড় অট্টালিকা মেরামত করে তাতে সৈনিকদের বসানো হয়েছিল। সৈনিকদের মধ্যে কিছু তুর্ক আর মোঙ্গল মুখও দেখা যাচ্ছিল। সোভিয়েতে বহু পল্টন 'মিশ্রিত' হয়, একই রেজিমেন্টে অনেক রকম জাতির জওয়ান ভর্তি থাকে। সাত বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার কারণে, যার মধ্যে চার বছর

রুশও বাধ্যতামূলক, ভাষাগত কোনো অসুবিধে নেই। সৈনিক জীবনে ওরা সোভিয়েত দেশের ভ্রাতৃত্বের পরিচয়ও পায়। রীনকে আপেল পাওয়া যাচ্ছিল। কাশ্মীরের মত মিষ্টি আপেল তো ইরান আর মধ্য-এশিয়া ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না, তাও এখানকার আপেল খারাপ ছিল না। আমি ৯ রুবলে দুটো আপেল কিনলাম, চার রুবলে কুলফি বরফ খেলাম। জিনিসপত্রের অনেক দাম হওয়ায় একটা খারাপ প্রভাব তো সত্যিই দেখা যায়, যে মানুষ মুক্তহস্ত হয়ে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের স্বাগত জানাতে পারে না এবং দ্রুত 'আমি আর আমার' ঝঞ্ঝাটে পড়ে যায়।

চারটের সময় আমাদের লরি তিরযোকীর অভিমুখে রওনা হলো। এক জায়গায় বিপুরীর পাশেই যাত্রীদের কাগজপত্র দেখা হলো। কিন্তু আমার কাছে নিজের পাসপোর্টও ছিল না। দেখাটা শিষ্টাচার বলেই মনে হলো, না তো এক বিদেশী বিনা পাসপোর্টে এত দূরের যাত্রা এত সহজে করতে পারত না।

এক জায়গায় আমাদের একটা বড় সরোবর চোখে পড়ল। জলে শ্যাওলা ছিল। গরম থাকায় স্নান করতে ইচ্ছে করছিল। ঘণ্টাখানেক থেকে আমরা স্নান করলাম। ৮০-তম কিলোমিটারের কাছাকাছিতে অনেক দূর অব্দি চাষের জমি ছিল, জায়গাটা উঁচু-নিচু ছিল। এখানে খেতে বাঁধাকপি, আলু জাতীয় গাছ ছিল আর চাষীরা জার্মান যুদ্ধবন্দী ছিল। কোনো জেলখানার মত বন্ধ করে তাদের রাখা হয়নি, বরং ওরা পরিত্যক্ত বাড়িতে থেকে খেতে কাজ করছিল। সোভিয়েত-শাসক নিশ্চিত জানত—পালালেও এরা খুব বেশি দূর যেতে পারবে না, এদের ভাষাই শুধু এদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে না, উপরন্তু সোভিয়েত নাগরিকদের তৎপরতাও সে-রকমটা হতে দেবে না। ফেরার পথে আমরা সমুদ্রের পাশে পাশে চলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। কত পরিত্যক্ত গ্রাম, বাড়ি আর খেত দেখে আমাদের এখানকারের জনাকীর্ণ বসতির কথা মনে পড়ছিল। আমরা একশো রুবল করে দিয়ে লরি ভাড়া করেছিলাম। লরি তো নয়—খোলা ধরনের ঠেলাগাড়ি ছিল, যার ওপরে দেবদারু কাঠের বেঞ্চি পাতা ছিল। পেছনে হেলান দেবার ব্যবস্থাও ছিল না। অন্য যাত্রীদের কথা বলতে পারব না কিন্তু আমার তো অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। আমার একেবারে পেছনে কোনায় জায়গা মিলেছিল। মেরুদণ্ডে, হাঁটুতে আর কোমরে যা ব্যথা হচ্ছিল, তা আর কি বলব! পুরো রাস্তা ধরে প্রচুর ধুলো খেতে হয়েছিল। কোথাও কোথাও সোভিয়েত সৈনিকদের খেতে কাজ করতে দেখলাম—খাদ্য সমস্যাকে তো নিজের দেশ থেকে দূরে রাখতে হতো। বিপুরী থেকে বেরোনোর চার ঘণ্টা পরে আমরা নিজেদের উপবনে এসে পৌছোলাম।

আমাদের আজ এক গল্প-কথক শিল্পী এসেছিল। ওর গল্প পড়ায় অভিনয় দেখার আনন্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

এখন আমাদের থাকার আরো এক হপ্তা বাকি ছিল। ২২ জুলাই দুপুরবেলা ভোজ হলো। ভোজ ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে ছিল, সেটা বলার প্রয়োজন নেই। অথবা যখন খাওয়া-দাওয়া করতে অধ্যাপকদের পয়সা দিতে হতো, তখন সেটা আমাদের তরফ থেকেই ভোজ, এটাও বলা যেতে পারে। ইউনিভার্সিটির রেক্টর (চ্যান্সলার)

বোজ্‌নেসেন্সকী আজ স্বয়ং উপস্থিত। এমনিতে হপ্তায় দু-একবার নিজের গাড়িতে তিনি তিরযোকী অবশ্যই আসতেন। এক-একটা টেবিলে যাঁরা খাবেন তাঁদের মধ্যে প্রতি চারজন ব্যক্তির জন্য একটা করে 'পীবা' (বিয়র)-র বোতল একটা লেমোনেডের সঙ্গে রাখা ছিল। আমি তো নিলে কেবল লেমনেডের বোতল থেকেই কিছুটা নিতে পারতাম, তাই আমাদের টেবিলের তিন বন্ধুরা একটা পুরো বোতল পেল। আমাদের টেবিলের মদ জর্জিয়ায় বানানো পুরনো আঙুরের মদ ছিল। অন্যান্য টেবিলেও ভালো ভালো আঙুরের মদ ছিল। ভোজে লেনিনগ্রাদের পাঁচ-ছজন শিল্পীর আসার কথা ছিল, কিন্তু সময়ের বন্ধনকে আমাদের দেশের মত রাশিয়াতেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তার ওপর ওরা আবার শিল্পী ছিল। ওদের জন্য এক ঘণ্টা-পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা হলো। তারপর ভোজ শুরু হলো। বোজ্‌নেসেন্সকী ভোজ-ভাষণ দিলেন। মাতৃভূমির উদ্দেশে মদের পাত্র হাতে নিলেন। মাঝে-মাঝে একটানা আনন্দদায়ক বক্তৃতা হতে থাকল। মদের সঙ্গে মাছ-রুটি এবং আরো অন্যান্য সুস্বাদু জিনিসও ছিল। ডিন ভিক্টর মরিসোভিচ স্তাইনও ভাষণ দিলেন, দু-তিনজন আরো বক্তা বললেন, রেক্টর আমাদের ঘরের প্রত্যেকের কাছে মদের পাত্র নিয়ে গিয়ে টুঙ-টুঙ শব্দ করে স্বাস্থ্য ও স্বদেশের উদ্দেশে পান করলেন, তারপর এইরকমভাবেই অন্য কামরার প্রত্যেক টেবিলে গেলেন। সেই সময় কেন অন্য সময়েও বোজেন্‌সেন্সকীকে লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে দেখে কেউ বলতে পারত না যে তিনি এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চ্যান্সলার।

আমার মদ না খাওয়ার অসামাজিকতার প্রভাব আমার টেবিলেই সীমাবদ্ধ রইল। ওখানকার লোক মদকে একটা সুন্দর জল বই অন্য কিছু মনে করে না এবং তাকে অতিথি-সৎকারের সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মানে। আমি কারো বাড়িতে বা অন্য কোথাও নেশার ঘোরে পড়ে যেতে কাউকে দেখিনি।

আজ ভোজের উপলক্ষে সঙ্গীত-মণ্ডলীও (কনসার্ট) হবার কথা ছিল। ততক্ষণে শিল্পীরা এসে পৌঁছেছিল। সাড়ে নটার সময় প্রোগ্রাম ৭০ বছর বয়স্কা নামকরা নীটো গ্রানোবস্ক্যার কলা-প্রদর্শন দিয়ে আরম্ভ হলো। অন্য শিল্পীদের মধ্যে সঙ্গীত শিল্পী জর্জিন্স্কীও ছিল, যে 'তিখী দীন' (শান্ত দীন) অপেরা ও অন্য অনেক নাট্যবস্তু প্রস্তুত করেছিল। গ্রানোবস্ক্যা বলশেভিক বিপ্লবের সময় ৪০ বছরের ছিল। সেই সময়ও সে জারের রাজধানীর আদরের মেয়ে ছিল নিশ্চয়। নিঃস্ব হয়ে যাওয়া বসন্তকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, যে সে যৌবনে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল। সে চেকোভের গল্পগুলোর মধ্যে একটা গল্প অভিনয়ের ঢঙে পাঠ করল। খুব প্রভাবশালী অভিনয় ছিল। গল্পের যতগুলো পাত্র ছিল, সে তাদের কথাবার্তাকে ঠিক ঠিক এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বলত। গল্পপড়াও যে এক ধরনের বড় শিল্প সেই প্রমাণই সে দিচ্ছিল, আর সেই শিল্পী রাশিয়াতে চরম সীমায় পৌঁছেছিল। এগারোটারও পরে পর্যন্ত কনসার্ট চলতে থাকল।

মনে হচ্ছে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মশা, ছার আর পোকামাকড়েরও বলবৃদ্ধি হয়েছিল। রাতের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। ৩ হপ্তা পরে আমাদের পেছনের পায়খানার দুর্গন্ধ যুক্ত হাওয়াই বলে দিচ্ছিল এখান থেকে ময়লা-ফয়লা তোলো।

—১৯৪৬—

২৩ জুলাই ভোজনোপরান্তে নটার সময় আমরা 'পাহাড়ী'তে ঘুরতে বের হলাম। আমাদের সঙ্গে ঘুরছিল এক মহিলা। সে বলছিল, 'চার-পাঁচ বছর আগে কফকাশ (কাকেকাশ)-এর শ্রী-বিশ্রামোপবনে কিছু লোক উঠেছিল, ১০ জোড়া নর-নারী জঙ্গলে ঘুরতে গিয়েছিল, সেখানে ডাকাতেরা ওদের ধরে সব কিছু কেড়ে নিয়ে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছিল, বেচারারা ওইরকম ন্যাংটো অবস্থায় বিশ্রামস্থানে ফিরেছিল।'

আমি বললাম, 'যেরকমভাবে এখানে তিরযোকীর বনে অর্ধেক রাত অব্দি ঘুরতে ঘুরতে আমরা এই গল্প শুনছি, ওই রকমই কি জানি এই মুহূর্তেই কাকেকাশের বনে ঘুরতে ঘুরতে কিছু লোক তিরযোকীতে ফিন-ডাকুদের দ্বারা ১০ জোড়াকে লুঠ করে ন্যাংটো করে দেবার গল্প শুনছে হয়তো।'

সত্যিসত্যি যে শ্রেণী নিজেদের প্রভুত্বকে হারিয়েছে, তার অবশেষরা তাদের কৌশলকে খুব শিগ্‌গির ছাড়তে পারে না। হয়তো এই শতাব্দীর শেষ অব্দিও পুরনো শ্রেণী-সমাজের প্রতিক্রিয়া আর প্রতিধ্বনি এখান থেকে পুরোপুরি লুপ্ত হবে না।

আজকে বেড়াতে আমাদের একটা সিমেন্টে ও লোহা দিয়ে বানানো রোয়াক চোখে পড়ল, যাতে যুদ্ধের সময় ১০ মাইল অব্দি মারতে সক্ষম বড় জার্মানি তোপ লাগানো ছিল। এমনিতে কাঁটাতারের বেড়া, খালি টিন তথা অন্যান্য জিনিস এখনও জায়গায়-জায়গায় পাওয়া যেত। এই তোপ হয়তো কোন্‌স্তাতের নৌসৈনিক দুর্গ আক্রমণ করত।

২৪ জুলাই সমুদ্র উত্তাল আর জল-হাওয়া ঠাণ্ডা ছিল। স্নানার্থী খুব কম চোখে পড়ছিল। জীববিজ্ঞানের এক ছাত্র সমুদ্রের পাশে ছোট একটা গর্ত খুঁড়ছিল। জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'এতে ব্যাঙ রাখবো।' ইগর একটা ব্যাঙ পুষেছিল। সে নিজের ব্যাঙটাকেও দৌড়ে নিয়ে এল। সে ভাবল, ব্যাঙদের জন্য একটা ছোট সরোবর হবে। সেখানে বিদ্যার্থীদের ব্যাঙগুলো সাঁতার কাটবে, ওতেই আমার ব্যাঙও সাঁতার কাটবে। সে ব্যাঙ নিয়ে তার পরিচিত ছাত্রর সঙ্গে ওখানে কাজে লেগে গেল। আমি বাড়ি গিয়ে ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু ইগরের কোনো পাত্তা ছিল না, সে ওখানেই আটকে ছিল। গিয়ে দেখলাম ছাত্র ব্যাঙের মাথা মুলোর মতো কাঁচি দিয়ে কাটছে, একদম নিশ্চিন্ত মনে। একটুও সঙ্কোচ না দেখিয়ে সে একটার পর একটা ব্যাঙ কোটেই চলছিল, আর শিশিতে কোনোটাতে চোখ আর কোনোটাতে তার অন্য কোনো গ্রন্থি ভরছিল। আমার পক্ষে সেখানে এক মুহূর্তও থাকা অসহ্য লাগছিল, বুক ধড়ফড় করছিল কিন্তু ইগর সেই কাণ্ড ছাত্রের মত ওখানে বসে বসে দেখছিল। এখনও ওর মধ্যে করুণার অনুভূতি জাগেনি যে কোনো প্রাণীকে বধ করা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। মা যখন তার ওই মনটিকে দেখল, তখন ঘাবড়ে গেল আর বকে-ঝকে তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে এলো। তারপর সে খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে লেকচার দিচ্ছিল, 'ওখানে আর যেও না, এটা খুব খারাপ। যদি কেউ তোমার মাথাটা কাটে?' আমাকেও উপদেশ দিতে বলছিল, কিন্তু আমি বললাম, 'ছেড়ে দাও, বলা যায় না, যদি ওকে পরে ডাক্তার বা জীববিজ্ঞানী হতে হয়, তাহলে আমাদের এই শিক্ষা ওর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করবে।' এটা তো সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে করুণাও

অভ্যাস আর সংস্কারের পরিণাম।

আজও ছাত্ররা গুজব ছড়িয়ে রেখেছিল—'কনসার্ট হবার কথা আছে। লেনিনগ্রাদের কিছু নাম করা শিল্পী আসছে।' লোকেরা নটার আগেই চেয়ারে বসে গেল। নটা বেজে গেল, কিন্তু শিল্পী এবং মহিলা-শিল্পীদের কোনো পাত্তাই নেই। পরে রিয়ালে (পিয়ানো) একটি ছাত্র বসে পড়ল। সে তানসেনী লয়ে কিছু ওস্তাদি সঙ্গীতে তার হাত দেখাতে শুরু করল। আধঘণ্টা ধরে তার উচ্ছ্বাস পিয়ানোর ওপর বজায় থাকল। শ্রোতৃমণ্ডলীও শিল্পীদের প্রতীক্ষায় বসে রইল। তারপর বিশ্রামের ঘোষণা হলো। লোকেরা এখনও বিশ্বাস করছিল যে শিল্পীরা আসছে। তারপর আমাদের ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রী, খোঁড়া কিন্তু সুন্দরী ও সুকণ্ঠী, অনেকগুলো গান শোনালো। লেনিনগ্রাদ শহরের অন্য পেশাদার গায়িকাদের প্রতিযোগিতায় ও প্রথম হয়েছিল, কিন্তু 'ঘরের মুর্গি শাকের সমান' বলে ভালোমন্দর কেউ কদর করল না বটে তবে সে গেয়েছিল ভালো। এখন শ্রোতৃমণ্ডলীও বুঝে গেল, যে সঙ্গীতাসরে তাড়াতাড়ি লোক ভরানোর জন্য ছাত্ররা এই উড়ো খবর রটিয়ে ছিল। সাড়ে দশটায় প্রোগ্রাম শেষ হলো। এখন পশ্চিম দিকে গোধূলির লালিমা ছেয়ে ছিল আর মধ্যরাত্রি হতে মাত্র দেড় ঘণ্টা বাকি ছিল।

আমাদের ওপরের ঘরগুলো পায়রার খোপের মত ছিল, যার এক-একটায় এক-একজন সস্ত্রীক প্রফেসর উঠেছিলেন। আমাদের ঘর সব শেষে ছিল, তার পাশের ঘরে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সলর আত্রোখ্‌বেখ্‌খুবা তাঁর মেয়ে আসিয়ার সঙ্গে উঠেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি সরাতোফ ইউনিভার্সিটির রেক্টর ছিলেন। তাঁর যোগ্যতা দেখে রেক্টর বোজেন্‌সিন্‌স্কী তাঁকে এখানে টেনে এনেছিলেন। শিক্ষণ, ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি কাজ তাঁর দায়িত্বে ছিল, সেইসঙ্গে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপনাও করতেন। ছেলে সেনা থেকে এখনও ফেরেনি। বারো বছরের মেয়ে পঞ্চম ক্লাশে পড়তো, যে এখানে সঙ্গে এসেছিল। তাকে ইউনিভার্সিটির কাজে মাঝে মাঝে যেতে হতো। ওর মা ইউক্রেনের আর বাবা জর্জিয়ার। বাবার জন্যই হয়তো অত্যধিক উঁচুমত নাক সে পেয়েছিল। ওর ঘরের পাশের ঘরে মধ্যযুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রফেসর গুকোবস্কী, ডাকনাম গোরিল্লা তাঁর যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। গুকোবস্কীর এই চতুর্থ স্ত্রী সুন্দরী ছিল। লোকেরা বলছিল যে তৃতীয়া খুবই সুন্দরী ছিল। আর তার আগের জনও কম সুন্দরী ছিল না। প্রফেসরের বয়স ৪৫ বছরের কাছাকাছি ছিল। তাঁকে সিদ্ধহস্ত প্রফেসর বলে মানা হয়। তাঁরপর ইউনিভার্সিটির এক কর্মকর্তা কোর্সনোফ সস্ত্রীক উঠেছিলেন। তারপর আমাদের পরিচিত দোকন (ডিন) স্তাইন সস্ত্রীক উঠেছিলেন। প্রফেসর স্তাইন ১৯২৬-এ চীনের জাতীয় সরকারের আর্থনীতিক পরামর্শদাতার কাজ করেছিলেন। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রের তিনি সুপণ্ডিত, বিশেষ করে চীন আর ভারতের। তারপরে প্রফেসর মাবরোদিন রুশ ইতিহাসের ভালো পণ্ডিত আর 'প্রাচীন রুশ রাজ্য-নির্মাণ' গ্রন্থের রচয়িতা তথা ইতিহাস ফ্যাকাল্টির ডিন সস্ত্রীক উঠেছিলেন। মাবরোদিন পায়ে একটু খোঁড়া ছিলেন। তাঁর যুবতী স্ত্রী সব সময় সেজেগুজে থাকত—চোখে খুব কাজল লেপা, মুখে দরকারের বেশি পাউডার, ঠোঁটে মাত্রার অধিক অধর-রাগ এবং পোশাক অত্যন্ত জমকালো। এতটা কৃত্রিম শৃঙ্গার তো রুশ স্ত্রীলোকদের

মধ্যে কেন—বিদেশী স্ত্রীলোকদের মধ্যেও কমই দেখা যেত। তার সমস্ত সময় শরীর সাজাতে আর পোশাক বদলাতেই চলে যেত। প্রৌঢ় পতি যুবতী স্ত্রীর হরেকরকম খোশখেয়ালের জন্য তৈরি ছিলেন। কোরসনোফ বাদে এই খুপরিতে থাকা লোকেদের মধ্যে সবাই উঁচু দরের প্রফেসর। ওঁদের মধ্যে দুজন ফিন ছিলেন। আমি এই খুপরি ঘরগুলোর কথা ভাবছিলাম। কোথায় ছ'বছর আগে এখানে ফিনিশ অভিজাতশ্রেণীর অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য বেশ্যা রাখা হতো, আর আজ কোথায় তাদের সম্ভ্রান্ত পুরুষদের বিশ্রাম-অতিথি রূপে পরিবর্তন। স্তাইন, মাবরোদিন আর গুকোবস্কী ইহুদী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজনে আমার ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলেন। এর থেকে বোঝা যাবে, যে ইহুদীরা কতটা প্রতিভাশালী হয়। স্তাইন ছাড়া বাকিদের স্ত্রীরা রুশ ছিল। বস্তুত, শিক্ষিত ইহুদি এখন বিশাল রুশ জাতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তৈরি। যোগ্যতা থাকলে জাতি এখন কারো রাস্তায় বাধা হতে পারত না, এটাও কারণ, যার জন্য ওরা এতটা এগোতে পেরেছে। রুশ যুবতীরা ইহুদী প্রফেসরদের স্ত্রী হতে কোনো ইতস্ততভাব দেখাতো না। বর্তমান শতাব্দীর শেষ অব্দি মনে হচ্ছে, অধিকাংশ ইহুদী সন্তানদের রুশ হয়ে যেতে দেখা যাবে। এটাও জানতে পারলাম যে ফিজিক্স-ম্যাথমেটিক্স-এর ডিনও ইহুদিই।

২৬ জুলাই ছার, পোকামাকড় আর মশা ছাড়া এখন মাছিরাও দর্শন দিতে শুরু করেছে, তবে সংখ্যায় কম। চোর্নীকা (টেপারি) এখন সব পেকে গিয়েছিল, আর আমাদের উপবনে শুধু কেন, আমাদের নিবাসস্থানের পাশেই তাদের কালো ফলে ভরা গাছ ছিল, যার গায়ের সঙ্গে ছেলেরা লেপ্টে থাকত। এই মাসের শেষ অব্দি ওগুলো শেষ হয়ে যাবার কথা। মলীনা (রাস্পবেরি) এখন নিজের কুঁড়িতে ছোট হয়ে লুকিয়েছিল। আমাদের থাকাকালীন তো সে মুখ খুলতে রাজি ছিল না। পরের মাসে আসা লোকেরা ওদের পেয়ে থাকবে। সেগুলোর গাছও এখানে অনেক বেশি ছিল। জেম্ল্যাঙ্কার (স্ট্রবেরি) গাছ খুব কম ছিল, কিন্তু এই সময় সেগুলো পাকতে আরম্ভ করল। যুদ্ধের সময় অনেক কলখোজ যখন উচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আর তারপর লোকজন পাওয়া যখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, তখন লেনিনগ্রাদের মত নগরের ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাক্টরি আর সংস্থাগুলোকে সোবখোজ (সরকারি খেত) করে দেওয়া হলো। এই খেতগুলোয় বেশির ভাগ শাক-সবজি আর স্ট্রবেরি ফলের চাষ হতো। বেতনভুক্ত শ্রমিক সেখানে কাজ করত, যারা সংস্থাগুলোর মালিকের কাছে জিনিসপত্র পাঠাতো। আজ আমাদের নিজেদের সোবখোজের স্ট্রবেরি খাওয়ার সময় লোকেদের সামনে এসেছিল। লোকেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছিল, 'আমাদের সোবখোজের স্ট্রবেরি।' আমরা সমুদ্র-তটের অন্য দিকে বেড়াতে গেলাম। সেখানে দেখালাম একটা ভালো বাংলা যুদ্ধাগ্নিতে দগ্ধ। লোহার খাট আর বহু ভাঙা-চোরা ধাতব বাসন এখনও দেখা যাচ্ছিল। এও হয়তো যুদ্ধের আগে কোনো ফিন তালুকদারের বিলাসভবন ছিল।

২৭ জুলাই-এর এখন তিন দিন বাকি ছিল। উপবনে এক, দুই অথবা পনেরো তারিখে লোক আসে। যারা যাবে তারা দুদিন আগেই জায়গাখালি করে দেয়, যাতে নতুন অতিথিদের জায়গা ঠিকঠাক করা যায়।

লোকেরা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। অধ্যাপকদের প্রতি ব্যক্তিকে প্রতি মাসে সাড়ে সাতশো রুবল দিতে হতো। ডিন মার্কোভ্না গোল্দমানের মত মহিলা-অধ্যাপকদের, যাঁর স্বামী যুদ্ধে মারা গেছে, অর্ধেক দিতে হতো আর ছাত্রদের কিছুই দিতে হতো না। খাবার অব্যবস্থা কিছুটা অবশ্যই ছিল, তবে তাকে অস্থায়ী বলা উচিত। তা না হলে শত-শত, হাজার-হাজার ছাত্রদের বিনে পয়সায় গ্রীষ্মনিবাসে খাওয়া-দাওয়ার স্থান এবং প্রফেসরদেরও কম খরচে সুন্দর প্রকৃতির কোলে বসে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা আর নিজের ভবিষ্যৎ- কাজের চিন্তার জন্য অবসর দেওয়া অন্যত্র সুলভ হতো না।

মানুষের এখানে সবচেয়ে বেশি শখ ছিল—সমুদ্রস্নান করার, পুরুষদের কেবল জাঙ্গিয়া আর স্ত্রীলোকদের কাঁচুলি আর জাঙ্গিয়া পরে রোদে শুয়ে শরীরকে শ্যামবর্ণ করার। শরীর যত শ্যামবর্ণ হবে ততই প্রশংসনীয় বলে মানা হয়। কেউ একজন আমার সফলতার প্রশংসা করলে, আমি বললাম, 'এতো শত-সহস্র বছরের বংশাবলীর রোদে পোড়া এবং তৎসম্বন্ধীয় রক্তের সংমিশ্রণের পরিণাম।' কতজন তো রোদ পোয়াতে পোয়াতে নিজের ঘাড় আর পিঠের অনেক জায়গার চামড়ার এক পরত তুলে ফেলেছিল, কিছু লোক আমার মত গায়ের রঙে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধেবেলা আবার বেড়াতে গেলাম। যেখানে তোপের সিমেন্ট-লোহাওলা তক্তা পড়েছিল, সেখানেই এখন নতুন বাড়ি বানানোর কাজ শুরু হচ্ছিল। ভারি ভারি ট্যাংক দেবদারুর জঙ্গলে ঘোরানো হয়েছিল, যার জন্য বেচারা দেবদারু শিকড়সুদ্ধ ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল। ওগুলোকে বিজলির করাত দিয়ে কেটে, কাঠ স্থানান্তরিত করে দেয়াল বানানোর কাজ প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিশাল দেবদারুকে ট্যাঙ্ক কত সহজে উপড়ে ফেলেছিল, তা দেখে মানুষের শক্তির প্রতি বিস্ময় জাগছিল। যদি হাত দিয়ে কাটতে হতো, তাহলে দুজন লোক হয়তো একদিনে দুটো গাছও কাটতে পারতো না, আর ট্যাংক একদিনে হাজার হাজার গাছ উপড়ে ফেলছিল। পড়ে-যাওয়া গাছের নীচে বেরিয়ে আসা কালো মাটি বলে দিচ্ছিল যে, হাজার বছর ধরে পাতাগুলো পচে যাওয়ায় এই মাটি হয়তো কালো হয়ে গেছে। যদি আজ এখানে খেত-বানানো হয়, তাহলে উৎপাদিত ফসল দিয়ে এখন কয়েকশো বছরের খাদ্য এখানে মজুত আছে।

আরো এগিয়ে গিয়ে অকাদেমিকদের উপবন দেখতে পেলাম। অকাদেমিক সোভিয়েত রাশিয়ার দেবতা। তার দেবত্ব-প্রাপ্তি নিজের বিদ্যার জন্য হয়েছে। যতটা নাম-যশ ও সুখ তারা পেয়েছে, অতখানি রাশিয়ায় কেউ পায়নি। ওদের কোনো কাজ না করলেও ৬ হাজার রুবল মাসিক পেনশন মেলে। প্রত্যেক জায়গায় তাদের বসার, থাকার, খাওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। দেবদারু জঙ্গলের শোভার ন্যূনতম ক্ষতি করে ওদের জন্য এখানে বাংলো-বাড়িওলা একটা গ্রাম তৈরি হচ্ছে। অনেকগুলো বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। এক-একজনের জন্য অনেকগুলো ঘরের বাড়ি, বারান্দা, স্নানাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। এই পাড়ায় তাদের জন্য ভোজনাদির ভবন আর দোকানপাটের ব্যবস্থা ছিল। বাড়িগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি করার দিকে মন দেওয়া হচ্ছিল। শেষতক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমার মত নিজেদের

আণবিক বোমা তৈরি করার কাজ তো এদেরই করতে হবে? তাহলে কেন এদের এত পূজা-প্রতিষ্ঠা করা হবে না?

২৮ জুলাই আমাদের তিরযোকী বসবাসের শেষ দিন। আজকের রান্না ভালো ছিল। যাবার সময়ই কেন এমন করা হলো?

'কালো ন দুরতিক্রমঃ'[১]

তিরযোকী থেকে লেনিনগ্রাদ পৌঁছনোর জন্য রেল ছাড়া ইউনিভার্সিটির লরির ব্যবস্থা ছিল। একটার পর একটা লরি ছাড়ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত লোলা ঠিক মত তৈরিই হয়ে উঠতে পারছিল না। আড়াইটে অব্দি তো ওর সমুদ্রস্নানই হলো। আমরা সবার পরে খাবার ঘরে পৌঁছলাম। যখন লোকেরা চারটের সময় জিনিসপত্র নিয়ে লরির জায়গায় পৌঁছচ্ছিল, তখন আমাদের জিনিসপত্র ধীরে ধীরে বাঁধা হচ্ছিল। দুটো লরি চলে যাওয়ায় ভয় করতে লাগল, যে আমরা বোধহয় লরিই পাব না।

পাঁচটার কাছাকাছি আমরা স্টপে গেলাম। স্টপ উপবনের ভেতর অফিসের কাছেই ছিল। জানতে পারলাম যে এখান থেকে একটা লরি সোজা লেনিনগ্রাদ যাবে। লোলা লরিতে এত লম্বা যাত্রাকে কষ্টকর বলছিল। আমি বললাম ট্রেনে গেলে তিন-তিনবার বাক্স নামানো ফের ট্রামেও ওঠাতে-নামাতে হবে। যাহোক, কথাটা ওর মাথায় ঢুকলো। লরি এলো। ড্রাইভারের পাশে মা ও ছেলেকে বসিয়ে দিলাম। লরির ভাড়া দেবার দরকার ছিল না, কারণ লরি ইউনিভার্সিটির ছিল। ড্রাইভারকে ২০-২৫ রুবল দিয়ে দিলে সে যাত্রীদের বাড়িতে ছেড়ে দিতে রাজি হলো।

সোয়া পাঁচটায় লরি রওনা হলো। রাস্তা সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। ফিনল্যান্ডের পুরনো সীমা অব্দি মহাবনের রাস্তা সোজা চলছিল। সেখানে সব জায়গায় যুদ্ধের পরিখা ছিল। আমাদের উপবন থেকে ১৫ কিলোমিটার অব্দি তো বিশ্রামোপবনই চলছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশিটা ছিল শিশু-উদ্যানের। ২০ কিলোমিটার যাবার পর ফিনল্যান্ডের পুরনো সীমা পাওয়া গেল। জঙ্গল সাফ করে এখন গ্রাম আর ছোট শহর তৈরি হয়েছিল। রাস্তাতেই সেস্ত্রোনেচ (স্বাসা নদী) নামে খুব ভালো একটি ছোট শহর পড়েছিল। ঘন্টাখানেকের যাত্রার পর আমরা লেনিনগ্রাদের বৌদ্ধ বিহারের কাছে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু লোকদেরকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা, তাই দু'ঘন্টা পরে, আটটা বাজার একটু আগে, আমরা বাড়ি পৌঁছলাম। ভালোই হলো যে রাস্তায় বর্ষা হয়নি, কেননা খোলা লরি ছিল। বাড়িতে জিনিসপত্র রেখে দেবার পর বৃষ্টি শুরু হলো। আমাদের রাস্তা

[১] 'কালের গতি অপ্রতিরোধ্য।'—স·ম·

বেশির ভাগ গোল গোল পাথরের ডেলার ছিল, যেখানে লরি খুব ধাক্কা খাচ্ছিল। যাই হোক, শারীরিক কষ্টর কোনো প্রশ্নই ছিল না।

মাস খানেক বাদে রেডিও-র অর্থাৎ বাইরের দুনিয়ার কাছাকাছি পৌঁছোলাম। ভারতের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গিয়েছিল, লন্ডন আর মস্কোই শুনতে পেলাম।

ইউনিভার্সিটি খুলতে এক মাস দেরি ছিল। তাই আমি আবার পড়তে এবং নোট নিতে লেগে গেলাম।

৩১ জুলাই সকালে একটু বৃষ্টি হলো। আজ আমাদের কো-অপারেটিভ দোকান থেকে জিনিস আনার ছিল। রেশনের জন্য আমাদের দুটো দোকান ছিল, একটা নিজেদের পাড়ার, যেখানে আমরা সাধারণ রেশন কার্ডের জিনিস নিতাম, আর অন্যটা ইউনিভার্সিটি থেকে একটু দূরে অধ্যাপকদের কো-অপারেটিভ দোকান ছিল। এখানে আমি সাড়ে চারশো রুবলওলা বিশেষ রেশন কার্ডের জিনিস নিতাম। এই দোকানে সাধারণ কার্ডের জিনিসও নেওয়া যেত, কিন্তু বিশেষ কার্ডের জিনিস সাধারণ দোকান থেকে নেওয়া যেত না।

ওই দিন চারটের সময় কাজান গির্জার কাছে কো-অপারেটিভে গেলাম। ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষা করার পর লোলাও এসে গেল। ফের জিনিসপত্র কিনতে তিন ঘণ্টা লাগল। একদিন আগে কার্ড দিলে জিনিস সব তৈরি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আমাদের এখানকার মত ওখানকার ঘড়িও দু-ঘণ্টা লেট থাকে, কিন্তু যখন মানুষ প্রত্যেকটা জিনিস নিজের চোখে দেখে বাঁধাতে চায় তখন আর সেটা কি করে হবে? আজ মাসের শেষ দিন ছিল তাই রেশনে যা বেঁচেছিল তা নিয়ে নেওয়া জরুরি ছিল, তার জন্য যত সময়ই লাগুক না কেন। শিক্ষিতশ্রেণীতে এখনও পুরনো মধ্যবিত্তের সংখ্যা প্রচুর, আর মজুর-শ্রেণী থেকে আসা লোকেদের মধ্যে বহু লোকই বিয়ের সম্বন্ধ বা অন্যভাবে পুরনো মধ্যবিত্তের ভাবধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল।

মহিলারা জানতে পারল যে অক্টোবরে রেশন কার্ড উঠে যাবে। ওরা খুব ভয় পেতে লাগল। বলছিল, 'বড় লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সেটা আমাদের পোষাবে না। ওখানে তো যে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে, সেই বেশি কিনতে পারবে। আর পেছন দিক দিয়ে পরে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে।' আমি বললাম, 'যদি প্রচুর সংখ্যক দোকান খোলে, যেরকম এখন রেশনের দোকান খোলা আছে, তাহলে অত কেন দেরি হবে?'

টিনের মাছ, মাংস, মাখন, আনাজ, সব জিনিস নিয়ে এক মণেরও বেশি কেনা হয়েছিল। এত জিনিস পিঠে বয়ে আনা ক্ষমতার বাইরে। যদিও সংকোচের কোনো বালাই ছিল না। ওখানে, সব প্রফেসর আর লেকচারার, পুরুষ আর মহিলা, ১৫-২০ কিলোগ্রাম জিনিস নিজের পিঠে বেঁধে চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, 'এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।'

আমি গিয়ে ইস্তুরিস্তের কাছ থেকে ভাড়ায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে এলাম। ভাড়া ২৬ রুবল ছিল, যদিও আমি ৪০ রুবল দিলাম। যদি মালবাহক নিতে হতো এর থেকে

বেশি মজুরি দিতে হতো।

শহরে বাড়ির মেরামত আর পুনর্নির্মাণ খুব জোর কদমে চলছিল। তিনতলা বাড়ি চারতলা করা হচ্ছিল। আমার আশা হচ্ছিল, হয়তো বেশি বাড়ি হবার কারণে ইউনিভার্সিটির পাশে কোথাও তিন কামরার বাড়ি পাওয়া যাবে। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ইউনিভার্সিটির পাশে নগর স্থাপন করার কথা ভাবছিল, তাই ইউনিভার্সিটি আশেপাশের পাড়াগুলো নিয়ে নিতে চাইছিল। এটা কোনো অসুবিধের ব্যাপার ছিল না, কেননা 'সব জমি গোপালের' অর্থাৎ লেনিনগ্রাদের সমস্ত বাড়ি লেনিনগ্রাদ নগর-পালিকার ছিল।

পয়লা আগস্টের দিন এলো। আজ না কাজ করছিল বিজলি, না জলের কল। কল-কারখানার উৎপাদনের অঙ্ক গলা টেপার জন্য তৈরি ছিল, তাই ওখানে প্রত্যেকটা কাজ ঘড়ির কাঁটার মত খুব মনপ্রাণ দিয়ে হতো। যে জল আর বিজলির কষ্ট নাগরিকদের হচ্ছিল, তার হিসেব টন বা মিটারে করা সম্ভব নয়, তাই সেখানে অতটা সাবধানতা রাখা যাচ্ছিল না।

গতকাল আনা খাদ্য-সামগ্রীতে টিনের বাইরের সসেজ আর মাছের মত জিনিস যথেষ্ট ছিল, যেগুলো বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব ছিল না, তাই বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা জরুরি ছিল। লোলার বান্ধবী সোফি পাশেই ছিল, কিন্তু ওকে ডাকলে বিশেষ প্রস্তুতির দরকার পড়ত, তাই ওকে নিমন্ত্রণ করা হলো না। আরো অনেক বন্ধু-বান্ধব নারী-পুরুষ এলেন।

আগস্টে এখন শীত পড়তে আরম্ভ করেছিল, তাই আমি জানলা বন্ধ রাখতে চাইছিলাম, কিন্তু লোলার ইচ্ছে জানলা খুলে রাখা, কেননা ওর 'ভিটামিনের' ঝাপটা আসছিল। আমি জানলা এই কারণেও খোলা রাখতে চাইতাম না, যে খাবার ঘরে কাজ করার সময় জানলা দিয়ে কোনো জিনিস উড়ে যেতে পারে। কল খারাপ থাকার জন্য আমাকে জল দূর থেকে বয়ে আনতে হলো। বিজলি তবু দেরি করে এলো। তার থেকে শুধু এইটুকু লোকসানই হলো যে, আমি ভারতীয় বেতার শুনতে পেলাম না।

৪ আগস্ট গৃহিণীর অনুরোধে আমেরিকান ফিল্ম 'বলেরিনা' দেখতে গেলাম। পুরনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা আমেরিকান বা ব্রিটিশ ফিল্ম বেশি পছন্দ করত, কেননা ওদের শ্রেণীর জীবনের সুন্দর দর্শন পেত। ফিল্মটা খারাপ ছিল না। ওখান থেকে আমরা ফটোগ্রাফার-এর দোকানে গেলাম— ফটোগ্রাফার না বলে ফটোগ্রাফির দোকান বলা ভাল, কেননা এই দোকানের মালিক কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক কোম্পানি ছিল না। এখানে কোনো দোকানে মধ্যস্থ-ব্যক্তি নেই। কিন্তু যদি কোনো ফটোগ্রাফার নিজে দোকান দিতে চায়, তাহলে তাতে বাধা নেই। ওর সরকারি ফ্যাক্টরিতে বানানো মাল পাবারও কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু ও চাকর রাখতে পারবে না। হ্যাঁ, চার-ছজন ফটোগ্রাফার মিলে নিজেদের কো-অপারেটিভ দোকান খুলতে পারবে। ঘড়ির দোকানের ব্যাপারেও একই কথা।

আমরা ফটোগ্রাফি-কার্যালয়ে গেলাম। বড়দের ফটোর দাম খুব কম ছিল, কিন্তু ছেলেদের পঞ্চাশ রুবল করে লেগে যেত। ছেলেদের ফটো তোলার জন্য ঠিক করে বসাবার অসুবিধে ছিল, তাই ওদের অনেকগুলো ফটো নিতে হতো। আমিও কিছু ফটো

তোলালাম। ফের 'উনিবর মার্গ' (বিশ্ব পণ্যশালা)-এ গেলাম, যেখানে বহুতল বাড়িতে হাজার রকমের জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। ওখানে ইগরের সুবিধে মত কোনো তৈরি জিনিস পাওয়া গেল না। কাপড়-চোপড় ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে তা আগে থেকেই প্রচুর ছিল আর দর্জিদের ঢিলেমির কারণে সেলাই করানো হচ্ছিল না। তারপরে পোস্তিনের দোকান ছিল, যেখানে বহুমূল্য সাইবেরিয়ান সমূর তথা মধ্য-এশিয়ার কারাকুল ভেড়ার রেশমের মত চকমকে ছাল রাখা ছিল। ছোট কোট বানাতেও ৮-১০ হাজার রুবলের থেকে কম লাগত না, আর ইগর তো খুব তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছিল, তাই ছ-মাস বাদেই কোট ওর অকেজো হয়ে যেত। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ইগরকে স্কুলে যেতে হতো, তাই ওভারকোট আর অন্য পোশাক বানাতেই হতো। মায়ের কাজ সব সময় আস্তে আস্তেই হয়। তাই মাসখানেক বাদেও যে ওর পোশাক তৈরি হয়ে যাবে সে-সম্ভাবনা কম ছিল।

৫ আগস্ট আবার আমি পাড়ার আদালতে গেলাম। সময়ের নিয়মকে পালন না করার জন্য তো মানুষ দিব্যি কেটে রেখেছে। এর যদি ব্যতিক্রম কোথাও ছিল, তো সেটা হলো উৎপাদন ক্ষেত্র, কারণ ওখানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্ক গলা টিপতে তৈরি ছিল। আদালতে একজন জজ আর দুজন সহায়ক-জজ বসে ছিলেন। সহায়কদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। একজন প্রধান সহায়ক আইন জানতেন। আইন না জানা লোক কিছু দিনের জন্য নির্বাচিত হতো, তা আমি ইতিমধ্যে বলেছি।

লাল কাপড় বিছানো টেবিলের এক দিকে তিনজন জজ বসেছিলেন। টেবিলের বাঁদিকে একটি ক্লার্ক স্ত্রীলোক বসেছিলেন। সামনে দর্শকদের বসার জন্য পনেরো-কুড়িটা চেয়ার ছিল। একটা কাঠগড়ায় কারখানার মজদুরকে দাঁড় করানো হয়েছিল। জানলাম, সে রেল ইঞ্জিন বানানো কারখানার সাতশো মাসিক আয়ের মিস্ত্রি ছিল। চার বছর সে সেনাতেও কাজ করেছে, আর সিনিয়র সার্জেন্ট হয়ে আগের সেপ্টেম্বরেই সেনার থেকে অবসর পেয়েছে। কোনো মারপিটে ফেঁসে গিয়ে আজ কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। মদ খেয়ে মারপিট করে বসেছিল। বয়ান নিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাকি মোকদ্দমা বেশির ভাগ বাড়ি-সংক্রান্ত ছিল। যুদ্ধের সময় লোকজন বাড়ি ছেড়ে সেনাতে বা অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল, ততদিনে ওদের বাড়িঘরগুলো অন্য লোক এসে দখল করে বসেছিল, এখন ফিরে এসে ওরা নিজেদের বাড়ি চাইছিল। বহু বছর ধরে বসবাসকারীরা এখন কোথায় যায়, তাই ওজর-অজুহাত দেখাচ্ছিল। আমাদের এখানকার মত মামলা মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রাখার প্রথা ওখানে ছিল না। সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে এক-দুবার পেশ করার পরই ফয়সালা হয়ে যেত। আমাদের দেশের কূপমণ্ডুক জানে যে, ইউরোপে একই আইনী-ব্যবস্থা চলে, আর ওটা সেটাই, যা ইংরেজরা মানে। ইংরেজদের প্রথানুসারে আইন শব্দের অনুসরণ করা সবচেয়ে বেশি দরকার, কিন্তু জার্মানি, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে শব্দের নয় বরং দরের প্রাধান্য আছে, তাই সেখানে উকিলদের এত বেশি চল না। সোভিয়েত ব্যবস্থা তো ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমাকে সংকুচিত করে মামলার সংখ্যা অনেক কম করে দিয়েছে। দেওয়ানি মামলা একরকম নামমাত্র আছে, আর সম্পত্তি এবং স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত ফৌজদারি মামলার সংখ্যাও খুব কম হয়ে গেছে। আদালতের এই

ধাঁচ নীচের থেকে ওপর অব্দি চলে গেছে। একজন না থেকে তিনজন জজ থাকেন। হ্যাঁ, উচ্চ আদালতের জজ আইন-বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন।

৬ আগস্ট, মনে হচ্ছে, তাপমাত্রা মাছিদের অনুকূলে ছিল, তাই মাছি প্রচুর ছিল, দিনের বেলা বড্ড বিরক্ত করছিল। হয়তো পাশের খালি জমিতে যে শাক-সবজি আর অন্যান্য জিনিস পড়েছিল, তারজন্যেই তাদের জোর বেড়েছিল। মাছি মারার কাগজ খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। তাছাড়া তলার দিক থেকে খোলা কাঁচের বাসনেও মাছি আটকে যাচ্ছিল, কিন্তু পঞ্চাশ বা একশো মাছির বলিদানে ওদের সংখ্যা কতই আর কমবে? দিনের শত্রু মাছি, রাতে ছার আর পোকামাকড় এবং দুজনের মধ্যে দিন-রাত অখণ্ড রাজ্য মশার।

৭ আগস্ট তিনটের পর গরম কাপড়ের দরকার হতে লাগল। এমনিতে তাপমাত্রা তো এখানে বরাবর কানামাছি খেলতে থাকে, কিন্তু এখন বোঝা গেল যে আগস্টের প্রথম সপ্তাহের পরে শীতের আগমন না হলেও শরৎ-এর আগমন অবশ্যই হয়ে যায়। মেঘও যখন-তখন দেখা যেতে লাগল, কলের জলও ঠাণ্ডা হতে লাগল।

৯ আগস্ট থেকে আমাদের বাড়ি মেরামতের কাজ চলছিল। বাড়ির মালিক (নগর-পালিকা)-দের তরফ থেকে মেরামত হচ্ছিল, কিন্তু কাজ করার লোক একদিনের কাজ চারদিনে করতে চাইছিল। এখন রান্নাঘর আর দালানঘরেরই মেরামত হবার ছিল, যেগুলো আমাদের সবসময় কাজে লাগত না। দেয়ালে কাগজ লাগানোর দরকার ছিল। সে আমাদের কাছে কাগজ চাইছিল কিন্তু কার্যালয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে তা দেওয়া হয়ে গেছে। থাকবার ঘরগুলোতেও কিছু মেরামতের প্রয়োজন ছিল, যার জন্য ২৫০ রুবল চাইছিল। হপ্তায় একদিন তো ঘরগুলোর কাঠের মেঝে ধোওয়া জরুরি ছিল, তার জন্য একটি স্ত্রীলোক ৫০ রুবল চাইছিল—অর্থাৎ দু'ঘণ্টার কাজের জন্য ৩০-৩৫ টাকা। তবে আপনাকে জোর কে করছে? কাজ নিজের হাতে করে নিন। শারীরিক শ্রমের মূল্য ওখানে কম ছিল না। লোলা আরেকজন স্ত্রীলোককে ১৫ রুবল আর এক কিলো আটা দিয়ে রাজি করালো।

১০ আগস্ট ঘরের মেরামত শেষ হয়েছিল। জিনিসপত্র ঠিক জায়গায় রাখা হয়ে গিয়েছিল। জিনিসপত্র সম্বন্ধে বলার কি আছে? 'সর্ব-সংগ্রহঃ কর্তব্য কঃ কালে ফলদায়কঃ' -এর মহামন্ত্র অক্ষরে অক্ষরে অনুসরন করার মহিলা ছিল লোলা। দুটো কামরা আর রান্না ঘরও জিনিসে ভরা ছিল। সে কোনো জিনিসকে ফেলে দিতে বা দিয়ে দিতে রাজি ছিল না। বাসন কবে ভেঙে গেছে, কিন্তু সেটাও তাকে রাখা ছিল, কত বাসন ফেলা হয়ে গেছে কিন্তু তার ঢাকনাগুলো জমা করে রাখা ছিল। বোতল আর ছিপি এত যে সেগুলোর কথা বহু বছর ভুলেও গেছে, তবু জায়গা খালি করার দরকার নেই। এইরকম পরিস্থিতিতে যদি খাবার আর শোবার ঘর মালের গুদাম হয়ে গিয়ে থাকে তো আশ্চর্যের কি? হ্যাঁ, ভাগ্যি ভালো যে, সেগুলো আলমারিতে বা খোলা র‍্যাকে রাখা ছিল।

যে মা নিজের ছেলেকে অত্যন্ত ভালোবাসে, সে ছেলের স্বাস্থ্যের শত্রু হয়, এর প্রমাণও আমার বাড়ি থেকেই পাচ্ছিলাম। ইগরের পেট কখনও ঠিক থাকতে পেত না,

কেননা মা ওকে ঠুসে-ঠুসে খাওয়ানোর চেষ্টা করত। শেষ অব্দি হজম শক্তিরও একটা সীমা আছে। আমি তো ভাবতাম যে, আমাদের দেশেই বোধহয় ঘি-তেল-চর্বি অতিশয় পছন্দ করা হয়, কিন্তু ওখানেও দেখলাম একই হাল। ১৪ আগস্টে আমি নোট করলাম, 'পেটের গড়বড় প্রায় হয়, কারণ লোলার চর্বিপূর্ণ রান্না।'

১৬ আগস্ট অর্থাৎ আগস্টের মাঝখানে পৌছতে-পৌছতে বহু অল্পজীবী তৃণ হলুদ হয়ে গিয়ে পাতাঝরা-ঋতুর আসার খবর দিচ্ছিল। আলু এখন পরিণত ছিল না। জিনিস সস্তা আর অধিক প্রাপ্য হওয়ার ফলে এ বছর লোকেরা শাক-সবজির খেতে অতটা তৎপরতা দেখায়নি।

লোলার একটা ঝি-এর অত্যন্ত দরকার ছিল। বাড়ির কাজ করার জন্যই শুধু নয়, বরং এইজন্য যে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ইগর স্কুল যেতে আরম্ভ করবে আর ওর ফেরার সময় (একটায়) আমরা দুজনেই ইউনিভার্সিটিতে থাকব। একটা বুড়িকে কাজ করার জন্য পাওয়া যাচ্ছিল। রেশনের কড়াকড়ি আর জিনিসপত্রের বেশি দামের প্রভাব লোকেদের সদাচারের ওপরও পড়ছিল। বুড়ি বলল, 'আমি ভগবানে বিশ্বাসী, কোনো জিনিস ছুঁই না' ২০০ রুবল মাসিক আর খাওয়া দিলে রাজি হয়ে যেত। বুড়ির কেউ ছিল না, পেনশন পেত। কি জানি কি কারণে লোলার সঙ্গে ওর পটলো না। ঝি-এর খোঁজ জারি রইল।

১৮ আগস্টে আমাদের পাড়ায় এক রোমনী (সিগানিকা) খালি পায়ে ঘুরছিল। দুজন পুরুষ ওকে হাত দেখাচ্ছিল। পাঁচ রুবল তো দিচ্ছিলই, এভাবে ২০ জনের হাত দেখে ও একশো রুবল প্রতিদিন রোজগার করতে পারে। তাহলে আর কাজ করার চিন্তা থাকবে কেন? হাজার বছরের কুষ্ঠ এক অবতার ধারণ করলেই দূর হয় না। হাত দেখা, ভাগ্য বলা, এ আজকের মিথ্যে বিশ্বাস না। এ দূর করতে বুদ্ধিবাদের বড় শক্তিশালী খুঁটির প্রয়োজন।

ইউনিভার্সিটি বন্ধ ছিল, ছাত্রছাত্রীরাও ছুটিতে ছিল। সবচেয়ে ওপরের ক্লাশের ছাত্রী বর্থা কখনও কখনও আমার পরিদর্শনে সাহায্য করতো। ১৯ আগস্ট সে আমাকে শহীদদের সমাধির দিকে নিয়ে গেল। অক্টোবর বিপ্লবের সময় যে লোকেরা হেমন্ত-প্রাসাদ আর আশেপাশের স্থানে বলিদান হয়েছে সেই বীরদেরই সমাধি এখানে হয়েছিল। ঝকমকে পাথরের পাঁচ-ছ হাত উঁচু-দেয়াল দিয়ে এই সমাধি ঘেরা ছিল। পাশের আলে পুষ্পোদ্যান তৈরি করা হচ্ছিল। সমাধি উদ্যানের পাশেই লেইত্নীইসাদ (গ্রীষ্মোদ্যান) ছিল, যা জারের রাজত্বকালের ধনীমানী লোকদের বিহার করার স্থান ছিল। সত্যিই, গ্রীষ্মে এর শান্ত পরিবেশ ছিল। গ্রীষ্মের রোদ থেকে বাঁচার জন্য এখানে গাছের ঘন ছায়া ছিল। ইউরোপের নামকরা ভাস্করদের কীর্তি প্রতিমূর্তির রূপে এখানে রাখা ছিল। অধিকাংশ মূর্তি শ্বেত-পাথরের ছিল, যার মধ্যে কতগুলোর অঙ্গ ভাঙা ছিল। ১৮০০ সালের প্রসিদ্ধ গল্পকার ত্রিলোকের ধাতব মূর্তিও এখানে স্থাপিত ছিল। ত্রিলোক পঞ্চতন্ত্রের মত পশুপক্ষীদের নামে অনেক গল্প লিখেছিলেন যার দ্বারা তৎকালীন সমাজের অগ্রজদের গভীর আঘাত করা হয়েছিল, কিন্তু সোজাসুজি আঘাত না হওয়ায় তারা জ্বলে উঠত কিন্তু ত্রিলোকের কিছু ক্ষতি করতে পারত না। এটা তো সত্যি, ত্রিলোক

উচু স্তরের মানুষ। তাঁর মূর্তির সঙ্গে গল্পের পশু-পক্ষী, পাত্র-পাত্রীর মূর্তিও বানানো ছিল। সোভিয়েতকালেও ত্রিলোকের গল্প ছেলেদের আর বড়দের খুবই মনোরঞ্জন করে। ছেলেরা তো এখানে প্রবল আগ্রহে দেখতে আসে। এক একটা জন্তুর মূর্তি তাদের পড়া গল্প স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বাগানে সফরকারীদের মধ্যে আমি বেশির ভাগ ছেলেদেরই দেখছি। কলার অদ্ভুত নমুনা দেখে মনে পড়ে, যে একে নির্মাণ করতে কত বেশি ধনরাশি লেগেছে। কিন্তু জনসাধারণকে শোষণ করে পাওয়া অপার সম্পত্তি থেকে কিছু শিল্পকলায় খরচ করা শোষকদের পক্ষে কোনো শক্ত ব্যাপার না।

২১ আগস্টে বর্ষার সঙ্গে আমি রুশ-মিউজিয়াম আর এরমীতাজ মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। রুশ মিউজিয়াম ১৮৯৫-এ স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমে এই বিশাল প্রাসাদ জার আলেকজান্দ্রা (প্রথম)-এর ছোট ভাই মিখাইল পাভলিচের জন্য ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হয়ে চার বছর বাদে ১৮২৬-এ তৈরি হয়েছিল। তার অনেকদিন বাদে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে জারের ফরমান অনুসারে একে রুশ শিল্পকলার মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল। যদিও এর আরম্ভ অর্ধেক শতাব্দী আগে হয়েছে, কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি জিনিস ১৯১৭-এর বিপ্লবের পরে এসেছিল, যখন ধনী আর সামন্ত বাড়িঘরের কলার জিনিস বাজারে বিক্রি হতে শুরু করেছিল। মিউজিয়ামগুলো খুঁজে খুঁজে সেগুলো কিনে নিচ্ছিল। যুদ্ধের সময় অন্যান্য মিউজিয়মের মত এখানকার সামগ্রীও সুরক্ষিত স্থানে পাঠানো হয়েছিল, এখন শুধু অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের আর কিছু মূর্তিকারদের কৃতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এমনিতে এখানকার একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর দুর্লভ কৃতি বিশেষ দর্শনীয়, কিন্তু এখন তা নভেম্বর পর্যন্ত যথাস্থানে রাখার কথা ছিল। ইভানোফের প্রসিদ্ধ চিত্র 'লোকেদের মধ্যে যীশু'র এখানেও একটা কপি আছে, যা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে সেই শিল্পী আগেই বানিয়েছিল। এখানে সেই সব ড্রইং তথা অন্যান্য বস্তু সুরক্ষিত আছে, যেগুলো মহান শিল্পী তার ফিলিস্তিনের দীর্ঘ যাত্রায় বস্তু দেখে এঁকেছিল এবং পরে সেগুলো জুড়ে এই মধ্যচিত্রকে তৈরি করেছিল। শিস্কিন মহান প্রকৃতি-শিল্পী। বসন্ত, হেমন্ত, শরৎ, গ্রীষ্মকে সে সজীব করে দেখাতে অদ্বিতীয় ছিল। তার কত ছবিই দেখেছি, যা খুবই গভীর আর সুন্দর।

সেখান থেকে এরমীতাজ মিউজিয়ামে গেলাম। এরমীতাজ মিউজিয়াম প্রথম জারের মহান প্রাসাদের (হেমন্ত প্রাসাদ) পাশে রাজমহলে খোলা হয়েছিল, যা বিপ্লবের সময় (১৯১৭) অব্দি সেই মহলেই সীমিত ছিল, কিন্তু বিপ্লবের পর জনতার যুগ আরম্ভ হতেই দর্শনীয় বস্তুর সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ল, তাই পাশের হাজার কামরাওলা জারের হেমন্তপ্রাসাদও মিউজিয়ামকে দেওয়া হলো। যুদ্ধের সময় নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সামগ্রী অন্য জায়গায় পাঠানো হয়েছিল, এখন জিনিসগুলো আসছিল, তা সাজানোও হচ্ছিল, কিন্তু সমস্ত মিউজিয়ামকে সাজিয়ে তৈরি করতে এখনও অনেক দেরি ছিল! সেখানে গেলে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর যাকুবোরসকীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রফেসরও, আর উজবেকিস্তানে তথা তাজিকিস্তানে পাঠানো অভিযানের নেতাও ছিলেন। বরখশার সম্বন্ধে বললেন, 'ওটা

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ। ওটা শ্বেত হুনদের রাজধানী হতে পারে। ভিত্তিচিত্রের হাতি, অঙ্কুশ, হাতি চালকদের বেশভূষার ভারতের সঙ্গে খুব বেশি সম্বন্ধ আছে বলে তাঁর মনে হয় না। তাঁর বক্তব্য ছিল ওই চিত্রগুলোতে শাসনের প্রভাব বেশি তাঁর ভাবনা। সেদিকে ছিল না, যে শ্বেত হুনের অর্ধেক উত্তর-ভারতের প্রভু ছিল, আর ওদের এক রাজা তোরমান গোয়ালিয়রে এক খুব সুন্দর সূর্য-মন্দির বানিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে এটা জানতে পারলাম যে, বরখ্শার খননের নেতা শিস্কিকনের একটা ভালো লেখা কোনো এক পত্রিকায় বের হতে চলেছে, কিছু ছবিও থাকবে। আমি তার জন্য পরে অনেক খোঁজ-খবর করেছিলাম, প্রেস অব্দি দৌড় লাগিয়েছিলাম, কিন্তু কোথাও ওই লেখার সন্ধান পায়নি।

এরমীতাজ মিউজিয়ামের এক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ইস্সিনের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ককেশাস আর মধ্য-এশিয়ার ধাতুযুগ বিশেষজ্ঞ। তিনি খুব মন দিয়ে অনেক কথাই বললেন, আর তারপর আমাকে অনেকগুলো ঘর দেখালেন। নতুন-প্রস্তর যুগ, শকযুগ আর উত্তর কাজাকস্তানের প্রাগৈতিহাসিক সামগ্রী বাছা হয়ে গিয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব দশ থেকে সাত শতাব্দীতে উপরি ইর্তিশ-উপত্যকায় জাইসন ঝিলের উত্তরে সোনার খনিতে কাজ হতো। ওখানে সোনাযুক্ত পাথরকে ভেঙে ধুয়ে ধুয়ে সোনা আলাদা করা হতো। কোকচেতোফেও সোনার আরো বড় খনি ছিল। এখানকার সোনাই দক্ষিণ দিকে (ভারত, ইরান) যেত। লেনা-র সোনা এখনও সহজলভ্য হয়নি। উত্তরের ককেশাসে টিনের খনিও ছিল। তামা ওখানে এবং বলকাশের উত্তর তটে ও অন্যান্য জায়গায় অনেক পাওয়া যেত। উত্তরের ককেশাসের ধাতুর ইতিহাসের ওপর বই লেখার পর এখন তিনি কাজাকস্তান-সাইবেরিয়ার খনিজ পদার্থের স্থানগুলোকে নিয়ে কলম চালাচ্ছেন। তিনি খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শক-সর্দারের কবর থেকে বেরোনো একটা লাল রঙের ঘোড়ার শাবকও দেখালেন। এই কবর উত্তর-পূর্ব কাজাকাস্তানের অল্তাই এর পাশে বেরিয়েছিল। কবরে সর্দারের শবের সঙ্গে অনেক সোনা ইত্যাদি জিনিস রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ই চোরেরা সেগুলো খুঁড়ে বার করে নিয়ে গিয়েছিল। কাঠের শবাধার, ঘোড়া আর ঘোড়ার জিনিসপত্র বেঁচে গিয়েছিল। যে ফাঁক দিয়ে চোর ভেতরে ঢুকেছিল সেই ফাঁক দিয়ে সেই সময়ই জল ভেতরে চলে গিয়েছিল, যা ঠাণ্ডার চোটে চিরকালের মত বরফ হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য ঘোড়ার রোমকূপ, চামড়া ইত্যাদি সবই ২২ শতাব্দী পরেও সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেল। যেই স্থানে কবর ছিল, তা হুন আর শকদের সীমায় ছিল। কিন্তু সেখানে কিছু অলঙ্কার ছাড়া কোথাও মোঙ্গলদের শরীরের চিহ্নের কোনো প্রভাব ছিল না। চীনের প্রভাবও এই কবরের জিনিসপত্রে ছিল না। ইস্সিন বললেন, যে এখানকাব ঘোড়া আর পানপাত্র ককেশাসের উত্তরে সিথিয়নদের সমাধিগুলোরই মত। যার অর্থ হলো, পশ্চিমের সিথিয়ন আর পূর্বের শক—দুই জাতিই এক ছিল। এদের ঘোড়া হুনদের মত নয় বরং দক্ষিণ আর পশ্চিমের ঘোড়ার মত বড় বড়।

আমি সেই সঙ্গে আরো কিছু জিনিস দেখলাম। তার মধ্যে পুরনো রুশদের কণ্ঠহার,

কেয়ূর এবং কর্ণফুল—এই অলঙ্কারগুলো ছিল ভারতের মত। হতে পারে এদের মধ্যে কিছু কিছু অলঙ্কার শকদের মাধ্যমে ভারতে এসেছে।

২৪ আগস্ট খবর পেলাম যে ভারতে জাতীয় সরকারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিম লিগ তাতে যোগ দেয়নি।

রাশিয়ায় দেশের আর ব্যবসা-বাণিজ্যের সীমারেখা কমে গেছে। বুদ্ধিজীবীও এখন শরীরজীবী হতে কোনো সংকোচ বোধ করে না। এর প্রমাণ আমাদের বাড়ির দেয়ালে কাগজ আটকাতে আসা মহিলা। সে ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিন্তু নিজের কাজের বাইরে যদি কোনো কাজ পেয়ে যেত তো সেটা করতে কোনো দ্বিধা করত না। আমি নিজের ছোট শোবার ঘরের দেয়ালে রঙিন কাগজ আটকাতে বললাম। সে ২৫০ রুবলে রাজি হয়ে গেল আর ২৫ আগস্ট রোববার দিন সে ওই কাজটা করে দিল। তাকে ১৪ ঘণ্টা দিতে হলো। হাজার রুবলের কম ওর মাইনে হবে না। তাও যদি মাসে পাঁচ-সাত দিন এই ধরনের কাজ করে হাজার রুবল আরো পেয়ে যায় তো ক্ষতি কি?

২৯ আগস্টে এটা শুনে লোলা আর তার বান্ধবীরা স্বস্তির নিশ্বাস নিল, যে যাক এখন অন্তত বছর খানেক রেশন ব্যবস্থা উঠে যাচ্ছে না। সরকারি দোকান এমনও ছিল, যাতে বিনা রেশনে জিনিস পাওয়া যেত। রেশনের জিনিস পাবার আর এক স্থান রীনক (হাট) ছিল। সেখানে ১২০ রুবল কিলোগ্রাম চিনি ৭০ বা ৮০ রুবলে পাওয়া যেত। এইরকমই অন্যান্য জিনিসও এক তৃতীয়াংশ কম দামে বিক্রি হতো। হ্যাঁ, বিনা রেশনের দোকানের মত এখানে জিনিস সব সময় পাওয়া যেত না, কারণ মানুষ নিজেদের রেশনের জিনিস বেচে অন্যান্য প্রত্যাশিত জিনিস কিনত। কোনো মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক অন্যের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে বিক্রি করতে পারতো না, তাই সব সময় জিনিস পাওয়া সম্ভব ছিল না।

৩০ আগস্ট ছেড়ে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ইগরের স্কুল যাবার কথা। আজ পাশের স্কুলে ওর নাম লেখা হলো। মায়ের খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব চিন্তা ছিল। যদিও শিশু-উদ্যানে পুরো খাবার পাওয়া যেত। কিন্তু সকাল-সন্ধে নিজের মিশকা (ইঁদুর)-কে ঠুসে ঠুসে না খাইয়ে মা কি করে পারে? পয়লা তারিখে সব মায়েরা নিজেরা সেজে আর তাদের ছেলেদের খুব ভালো করে সাজিয়ে স্কুলে পৌঁছল। আজ ওদের বাচ্চারা অক্ষর আরম্ভ করতে চলেছে। আগের মাসের শেষ হপ্তায় ছেলেদের এবং তাদের মায়েদেরও শিশু-উদ্যান থেকে ছুটি নিয়ে কেটেছে। ছেলেদের এটা স্মরণীয় দিন ছিল, শিশু-উদ্যানের পরে এবার সামনের দশ বছরের স্কুলের পড়াশুনো, ছেলে আর মেয়েদের আলাদা আলাদা হবে, আর চার বছর এক সঙ্গে কাটানো ছেলেমেয়েরা এখন বাড়িতেই শুধু পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার পরে সোভিয়েতের শিক্ষা-বিদদের সহ-শিক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলাম। তাঁরা দেখলেন যে ১৭ বছরের আয়ুর মধ্যে মেয়েদের বিকাশের গতি কিছুটা বেশি হয়।

সেপ্টেম্বরের সঙ্গে শরৎ এখন পুরোপুরি বিকশিত হতে লাগল। এগুলো বর্ষার দিনও ছিল, তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে তা হিম-বর্ষার দিন হয়ে যাবে। লোকেরা এখন

নিজেদের আলু তাড়াতাড়ি করে খুঁড়তে শুরু করল, কেননা কিছু আলু চুরি হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কেয়ারিতে আগের বছরের থেকে বেশি ষাট কিলোগ্রাম আলু হয়েছে। ৬০০ রুবলের আলু চাষ করা কম সফলতার কথা নয়। আমাদের প্রতিবেশিনীকে যখন চাষকরার কথা বলা হল, সে বলল, 'কেন খেত খুঁড়তে যাব, এক রাত্তির জাগলেই যখন আমার কাজ হয়ে যাবে?

এখন অব্দি লোলা কোন চাকরানী পায়নি। কাজ খুঁজতে একটি বুড়ি ৩১ আগস্টে এলো। সে ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, ইটালিয়ন আর জার্মান ভাষা জানত। পুরনো অভিজাত শ্রেণীর মেয়ে ছিল, তাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সফর করা এবং আর অনেকগুলো ভাষা শেখা তার দরকার ছিল। বুড়ির বাপ জারের পার্লামেন্টের মেম্বার ছিল। কতবার সে ইউরোপ সফর করেছিল। যুদ্ধের সময় শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাই তার কামরায় অন্য কেউ বসে গিয়েছিল। এখন ঝোলায় নিজের সমস্ত সংসার নিয়ে বেঘর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে রান্না ঘরে থাকার জায়গা পেয়ে গেলে এখানেই থেকে ইগরের দেখাশোনা করতে তৈরি, কিন্তু আমার তো এমন লোকের দরকার যে রান্নাও করতে পারবে।

মেশিনের কাজ এরকমই—যখন-তখন সে বিগড়ে যায়, আর তখন কাজ অচল হয়ে যায়। তাই মেশিনের যুগের প্রত্যেক নাগরিককে মেশিনের ব্যাপারটাও শিখে নেওয়া আবশ্যক। বিদ্যুৎ আর উনুনের মিস্ত্রি তো আমি হয়েই গিয়েছিলাম, পয়লা সেপ্টেম্বরে আমার রেডিও সুদ্ধু বন্ধ হয়ে গেল। পেছন থেকে খুলে পরীক্ষা করলাম, মনে হলো একটা ভালব্ বিগড়েছে। আশেপাশে খোঁজার পর এক রেডিও বিশেষজ্ঞ মেজরকে পাওয়া গেল। সে এসে নিজের ভালব্ লাগিয়ে দিল, আর সেই সঙ্গে কিছু কথা আমায় বলে দিল। পারিশ্রমিক দিলে নিতে রাজি হলো না।

পয়লা সেপ্টেম্বর রোববার পড়েছিল, তাই শিক্ষণ সংস্থার বছর আরম্ভ ২ সেপ্টেম্বর থেকে হলো। ইউনিভার্সিটিতে আগের বছরের মত ছেলেদের নিতান্ত অভাব ছিল না, এখন ছেলেদেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। পড়ানোর সময় ইত্যাদি আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের গাড়ি আবার আগের মত চলতে থাকল।

সেই দিনই এক ভারতীয় ছাত্রের চিঠি আমেরিকা থেকে এলো। সে যোজনা সম্বন্ধে বিশেষ পড়াশুনো করতে আসতে চাইছিল। ভারত থেকে সে অনেকগুলো চিঠি রাশিয়ায় পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে কোনো উত্তর পায়নি। সে চাইছিল, যে তার জন্য আমি কিছু চেষ্টা করি। বেচারা জানত না, পুঁজিবাদী দুনিয়ার কটু অভিজ্ঞতার কারণে সোভিয়েতেরা বিদেশী ছাত্রদের নিতে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজি হয় না, যতক্ষণ পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মায় যে ও কোনো বিদেশী সরকারের গুপ্তচর নয়।

ভারত থেকে ২৪ জুনে উড়ো জাহাজের ডাকে পাঠানো চিঠি ৭ সেপ্টেম্বরে পেলাম। এর থেকে জানতে পারলাম যে ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা কতটা অসম্ভব। কিছু চিঠি চার মাসে বাদেও আমার কাছে পৌঁছেছে।

২০০ রুবল মাসিক, খাওয়া তথা রোববারের ছুটি দিলেও চাকরানী পাওয়া মুশকিল

হচ্ছিল। যদি কেউ কাজ করতে রাজি থাকত, তো সে নিজের কাজ থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার আজ্ঞা পাচ্ছিল না। আমি দুটো ঘর ধোবার জন্য প্রতি রোববার ৪০ রুবলে ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম।

সেপ্টেম্বরের প্রথম হপ্তায় ভারতে জায়গায় জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর আসছিল। কংগ্রেস জাতীয় মন্ত্রীসভাকে সামলে নিয়েছিল। লিগ নিজের গোঁ ধরে বসেছিল আর তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঝগড়া হচ্ছিল। ৮ সেপ্টেম্বরের জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা রেডিওতে শুনলাম 'ভাইয়ো আর বহনো' বলে শুরু আর 'জয়হিন্দ' বলে শেষ। ১২ মিনিটের বক্তৃতা। এখন এই প্রথম সরকারের লাগাম হাতে এসেছে, তাই ওপর-ওপর কথাই বেশি ছিল।

১১ সেপ্টেম্বরে ইউনিভার্সিটি যাবার সময় প্রথমে প্রফেসর ইস্‌সিনের সঙ্গে এরমীতাজে গিয়ে কথা বললাম। তিনি বললেন যে কাজাকাস্তানের তামা, টিন আর সোনার খনি বেশির ভাগ পেতল যুগ (প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক)-এর ছিল। সোনার খনিতে এক-আধটা লোহার অস্ত্রও পাওয়া গেছে। তামাযুগ কাজাকাস্তানে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী অব্দি ছিল। এর পরে খনিগুলোতে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই খনি তারপর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ এবং বেশিরভাগ বিংশ শতাব্দীতে আবার চালু হয়েছিল। নকমোলিঅস্কে অর্ধেক ভূগর্ভস্থ বাড়ি পাওয়া গেছে, যেগুলোতে খনি-শ্রমিকরা থাকত। তারা হিন্দু-ইউরোপীয় জাতীর লোক ছিল। সেই সময় অকমোলিন্‌স্কে আরো বেশি জঙ্গল ছিল। খনির স্থানগুলোর সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছেন—

তাম্র অকমোলিন্‌স্ক, বলখাশ, অলতাই (ইর্তিশ থেকে দক্ষিণ)।

সোনা—কোক্‌চেতোফ প্রদেশের ৩০ স্থান, অলতাই (ইর্তিশ থেকে দক্ষিণ)।

টিন—দক্ষিণ আলতাই, কল্বা পাহাড়, ইর্তিশের উভয় তট।

তাঁর থেকে এটা জানতে পারলাম যে বিপ্লবের আগে কাজাক শ্রমিক খুব কম ছিল, কিন্তু তারা খনি আর কারখানায় যথেষ্ট আছে।

ইউনিভার্সিটির পড়াশুনো নিয়মানুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিয়মানুগ মানে অধ্যাপকদের নিয়মানুগ যাওয়া। যুদ্ধের পর ছাত্রদের মনোভাব নিয়ে একথা প্রায়ই নালিশ করা হত, যে তারা পড়াশুনোর বেশি পরোয়া করে না। আমাকে সংস্কৃত, তিব্বতী আর হিন্দি পড়াতে হতো। বাড়ি থেকে ইউনির্ভাসিটি পৌছতে দেড় ঘণ্টা আর ফিরতেও তাই লাগত। যখন সেখানে ছাত্রদের কামাই দেখতাম, তখন সময় নষ্ট হওয়ায় আফশোশ হতো। ফেরবার সময় ট্রামে আসা সোজা ছিল না। দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যদি যেত তাও লোকেদের জ্বালায় চিঁড়ে চ্যাপ্টা হতাম। যদি বসার জায়গা পেতাম, তো হাঁটু থেকে পায়ের নীচের দিকটা বাঁচতো না।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলম। সেন্সরের চালাকি যেরকম চলছিল, তাতে আশা করিনি যে টেলিগ্রাম পৌছে যাবে। কিন্তু ১৪ সেপ্টেম্বরে দিল্লী রেডিও থেকে নেহেরুজীর কাছে শুভেচ্ছা পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে লেনিনগ্রাদের

প্রফেসর রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের নামও শোনা গেল। তার থেকে এটা তো বোঝা গেল যে রাশিয়াতেও নতুন সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, কিন্তু যাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তারা এই নতুন সরকারকে কোনো মর্যাদা দিত না।

লোলা নিজের বন্ধু-বান্ধবদের চাকরানীর জন্য বলে রেখেছিল। এক মহিলা, এক ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বরে এলো। তারপর অন্য এক সম্বন্ধিনীও নিজের দুটো বাচ্চার সঙ্গে এলো। বাড়িতে চার-পাঁচজন ছেলে, আর তিন-চারজন অতিথি এসে যাওয়াতে খুব হৈ-হট্টগোল হলো। লোলার খুড়তুতো ভাই-এর মেয়ে নাতাশা খুব ভদ্র মহিলা। তার দুটো বাচ্চা ছিল। স্বামী দূরে চলে গিয়েছিল আর হয়তো ছেড়েও দিয়েছিল। মা নিজে টাকা রোজগার করে করে দুটো বাচ্চা পালন করছিল। সে নিজের ছোট বাচ্চাকে পিতৃকুলের নাম (বের্নস্তাম) দিয়েছিল। লোলা খুব বেশি প্রেম-ভালোবাসা দেখানোর মেয়ে ছিল না, কিন্তু নাতাশার সঙ্গে ওর ভালোবাসা ছিল। তার এই ব্যাপারে আফশোশ ছিল, যে এই রক্তকেশী এক ইহুদিকে বিয়ে করেছে। ওর ছেলের চুলও লাল ছিল। সে যদিও ইগরের থেকে এক বছরেরই বড়ো, কিন্তু খুব গল্পের বই পড়ত। পড়ার শখও ছিল খুব। আর ও টের পাচ্ছিল যে মা কত খেটে তাদের দেখাশোনা করছে। বৃদ্ধা বোধ হয় কাজ করতে পারতো না, তাই তাকে রাখা গেলো না।

১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার বলে আমাদের স্নানের দিন ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহের মত আজও স্নান করতে গেলাম। দুপুরের পরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। যেন ধুমধাম করে শরৎ আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন দিনের বেলায়ও ঘরে বসে থাকার জন্য গরম কোটের দরকার হয়ে পড়ল।

বিনা রেশনের জিনিসের দাম আরো কমে গেল। চিনি ১২০ রুবলের জায়গায় ৭০ রুবল কিলোগ্রাম হয়ে গেল। রেশন কার্ডে চিনি পাঁচ রুবল কিলোগ্রাম পাওয়া যেত। চতুষ্কোণ চিনির ডেলা ৫·৭০ রুবল থেকে ১৫ রুবল কিলোগ্রাম করা হলো। অর্থাৎ একদিকে রেশনের জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আর অন্য দিকে বিনা রেশনে জিনিসের দাম কমানো হচ্ছিল। কালো রুটি ১·১০ রুবল থেকে ৩·৪০ রুবল কিলোগ্রাম হয়ে গিয়েছিল। মাখন বিনা রেশনে সাড়ে ৩৫০ থেকে ২৬০ রুবল হয়েছিল। রুটির এত দাম বেড়ে যাওয়াটা কম বেতন পাওয়া লোকেদের পক্ষে কষ্টকর ছিল, কেননা সবচাইতে কম বেতন যারা পেত তারা দুশো থেকে তিনশো রুবল মাইনে পেত। হ্যাঁ, ৮০০ টাকা অব্দি মাসিক বেতন পাওয়া লোকদের ২০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সেখানকার অর্থশাস্ত্র বোঝা মুশকিল বলে মনে হতো, কিন্তু আমি কাউকে অভুক্ত দেখিনি।

আমাদেরই পাড়ার এক প্রৌঢ়া মানিয়াকে লোলা ঝি ঠিক করল। তার বাড়ি পাশেই ছিল। সে একটি ছেলের ও একটি মেয়ের মা ছিল। যুদ্ধের পরে ওর বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল।

শিস্কিনের বরখা সম্বন্ধীয় লেখা খুঁজতে আমি ১৯ সেপ্টেম্বরে অকাদেমি প্রেসে গেলাম। কিন্তু তা ওখানে পেলাম না। অকাদেমির প্রাচ্য-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে গেলাম।

পাসপোর্ট না দেখে ভেতরে যাবার আজ্ঞা ছিল না। এই রকমের উৎপাদনহীন শ্রমে প্রত্যেক জায়গায় অনেক লোকদের লেগে থাকতে দেখে মনে হতো—এদের এখান থেকে হঠিয়ে কোনো উৎপাদনক্ষেত্রে আরো দরকারি কাজে লাগানো যায় না? এতে সন্দেহ নেই যে এইরকম ব্যবস্থায় বিপদের আশঙ্কা খুব কম থাকে। কিন্তু এরকম খেয়ালি বিপদের ভয়ে সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যবস্থা নেওয়া ভালো বলে মনে হচ্ছিল না। যাক, আমার কাছে পাসপোর্ট ছিল, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হবার প্রমাণ-পত্র ছিল তাই যেতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

বরান্নিকোফ খুব স্বল্পভাষী বিদ্বান, যার অর্থ নয় তিনি যে তিনি নিজের বিষয়ে ভাষণ দিতে বা লিখতে অক্ষম। তিনি অনেক বই লিখেছেন, আর 'প্রেমসাগর'-এর গদ্যে ও তুলসীদাস রচিত রামায়ণের পদ্যে রুশ অনুবাদ করেছেন, তাই আমি তাঁকে অলস-লাজুক ভাবতে পারি না। ২১ সেপ্টেম্বর আমি তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। ববান্নিকোফ অকাদেমিক, তাই তিনি রাশিয়ার দেড়শো জীবনমুক্ত দেবতাদের একজন। তাঁর স্ত্রীও প্রফেসর। বই জমা করার তাঁর যে কত শখ তা তাঁর বাড়ির বিশাল গ্রন্থগারই বলে দিচ্ছিল। ইউক্রেনের এক গরিব ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে নিজের অধ্যবসায়ে এই স্থান অর্জন করেছে। যদি সোভিয়েত না গড়ে উঠত তাহলে তিনি এই পদে হয়তো পৌঁছতে পারতেন না। আমাকে অনেকবার তুলসীদাসের রামায়ণের অনুবাদ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে যেতে হয়েছিল। অনুবাদ তিনি আগেই শেষ করেছিলেন, এখন তা প্রেসে যাচ্ছিল।

২৩ সেপ্টেম্বরের হাত আর পা শীতে সিটিকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে চলে গেছে। এখন সাড়ে পাঁচটার সময় অন্ধকার হয়ে যেত আর দুদিন ধরে রেডিও খারাপ থাকায় ২৪ সেপ্টেম্বরে তো আমার জগৎ অন্ধকার মনে হচ্ছিল।

২৬ সেপ্টেম্বর যখন ইউনিভার্সিটির থেকে বাড়ি পৌঁছলাম, তো দেখলাম আমাদের নতুন চাকরানী মানিয়া বাড়িকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এখানে-সেখানে পড়ে থাকা জিনিসকে এক জায়গায় ঠিক ঠিক করে রেখে দিয়েছে, ঘর পরিষ্কার করেছে। কিন্তু পুরো ব্যবস্থা জারি রাখতে মানিয়ার স্বাধীনতা কোথায়?

নাটক আর ফিল্‌মের সম্বন্ধে না বললে এটা ভাবা উচিত নয়, যে এখন আমি সেগুলো দেখতে যেতাম না। ২৮ সেপ্টেম্বরে মারিন্‌স্কী থিয়েটারে আমরা 'ক্ন্যাজ ইগর' (বাজুর ইগর) দেখতে গেলাম। অপেরার লেখক ছিলেন মহান নাট্যকার অ.প. বোরোদিন (১৮৭৪-৮৭ খ্রীস্টাব্দ)। আজ থেকে ৭০-৭৫ বছর আগে এই অপেরা অভিনীত হয়েছিল। ইগর রাশিয়ার ঐতিহাসিক বীর, যে তাতারদের সঙ্গে লড়ে রাশিয়াকে স্বাধীন রাখার চেষ্টা করেছে। সেই বীরত্বের কারণে রুশ ছেলেদের মধ্যে ইগর নাম অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। ক্রিমিয়া আর দক্ষিণ রাশিয়ায় সেই সময় তাতারদের খুব প্রতাপ ছিল। তারা রুশদের নাজেহাল করে রেখেছিল। সেই সময় রাশিয়ার শাসনকেন্দ্র কিয়েফ ছিল। তার সঙ্গে আরো ছোট ছোট রাজা যেখানে-সেখানে থাকত। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তাতার খান ইগরকে সপুত্র বন্দী করে ফেলে। এই ঘটনাকে নিয়ে এই অপেরা লেখা হয়েছিল। নভোগ্রাদ শিবিস্কীর শত্রু ইগর খয়াতো স্লভিচ তার প্রতিবেশী

পলোবেতস্কী খান কোচকের পিছনে ধাওয়া করেছিল। পিতা-পুত্রকে ধরে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। অভিযানে যাবার সময় ইগর আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে গির্জা গেল। তারপর পত্নী ইউরোস্লাভা বিদায় নিতে গেল। যে সময় ইগর বিদেশে বন্দী ছিল, সেই সময়ের বিরহ-বেদনা প্রকাশ করতে কোনো অজ্ঞাত কবি 'স্লাবা ও পোলকু ইগারারেবে' (ইগোরের ফৌজের বাণী) নামে একটি কবিতা লিখেছিল। কবিতাটা খুব একটা বড় নয়, কিন্তু রুশ ভাষায় সেটা সব চেয়ে পুরনো ও আদিকাব্য, তাই এর খুব মহত্ব। বন্দী ইগরের সঙ্গে কোঞ্চক খানের কথা বার্তাভালোই ছিল। ইগরের পুত্র ভ্লাদিমিরের খানের কুমারী মেয়ের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা হলো। খানও ধীরে ধীরে ইগরের ওপর বিশ্বাস করতে লাগলো। কিন্তু সেই বিশ্বাস থেকে সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা ইগর করেনি। খান এই ব্যাপারে প্রসন্ন হয়ে বলেছিল 'যদি আমি তোমায় ছেড়ে দিই, তুমি কি করবে?' ইগর উত্তর দিল, 'তাই, যা এক শত্রুর সঙ্গে করা উচিত।' ইগর এইভাবে বন্দীজীবন কাটাচ্ছিল, আর ওদিকে ওর রানীর ভাই ভ্লাদিমির ভ্লাদিমি, তথা পুতিব্ল ষড়যন্ত্র করে রাজ্যে থেকে নিজের সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। দরবাবীদের নিজের দলে টানতে সুবিধে ছিল। সেই খবর ইগর পেল। সে ওখান থেকে পালিয়ে গেল। পত্নী আর প্রজা বীরকে স্বাগত জানাল।

১১৮৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি এই সময়টা ছিল সেই সময়, যখন জয়চন্দ্রের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছিল আর দিল্লীর বুকে তুর্কি মুসলমানরা তাদের পতাকা পুঁততে চলেছিল। গল্প, সংগীত আর অভিনয়ের দৃষ্টিতে এই নাটক সুন্দর ছিল না, বরং নাটকের রূপে সেই সময়ের বেশভূষা, জীবন-যাপন, নগর-গ্রাম, রাজা-রাজনীতির খুব সুন্দর এক পাঠ দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। তাতে অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্মও ছিল সেই সময়ের। সামন্তদের যেরকম কাঠ দিয়ে বাড়ি আর কাঠের দুর্গ হতো, বাড়ির ভেতর যেরকম ছবি বানানো হতো, সবই ছিল সেরকম। এমনকি বাসনপত্র আর বাদ্যযন্ত্র ও সেই সময়েরই ব্যবহার করা হয়েছে। বাজনাওলা নিজে নাচ আর অভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করছিল। সেই সময়ের বাজনাগুলোর একটার সঙ্গে সারেঙ্গীর কিছু মিল ছিল।

২৯ সেপ্টেম্বর শনিবার ছিল। আমি আমার এক ছাত্রকে বলে রেখেছিলাম। আজ কলখোজের সফরে ও আমার পথপ্রদর্শক হলো। ফিনল্যান্ড স্টেশন থেকে যে লাইন চলে গেছে, তার পাশের কোনো গ্রামে আমাদের যাবার ছিলো। দশ নম্বর ট্রাম যেখানে শেষ হয়, সেখানে একটা ট্রামে গিয়ে আমরা ট্রেন ধরলাম, আর কিছুদূরে গিয়ে নেমে পড়লাম। আমরা সেই স্থানে ছিলাম, যেখানে জার্মানদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল এবং যেখানে জার্মান নৌ-সেনা নশো দিনের বেশি দৃঢ় হয়ে ছিল। কলখোজ আগের মতো এখনো জমে ওঠেনি। রাস্তায় এক জায়গায় একটার পর একটা বর্ম দিয়ে ঢাকা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। পুরনো কলখোজের খেতগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন কারখানাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে আলু-কপির চাষ শুরু করে দিয়েছিল। আগে আমরা যে ফার্মে গেলাম, তার ব্রিগেডিয়ার খুব খুশি হয়ে আমাদের খেত দেখালেন। তার পাশে ২৫ একর খেত ছিল। একটা ঘর ছিল, যেখানে

কাজ করার লোকদের জন্য ছ-সাতটা খাট পড়েছিল। ফ্যাক্টরির মজদুর, সময়ে সময়ে এসে কাজ করে যেত। শীতে ওখানে কেউ থাকত না।

সেখান থেকে আবার আমরা 'খিমিচেস্কী কম্বিনাত' (রসায়ন-সমবায়)-এর খেত দেখতে গেলাম। আড়াইশো একরে শাক-সবজির খেত ছিল। বাঁদিকে এরোড্রাম ছেড়ে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। এখানে ট্রাক্টর আর অন্যান্য মেশিনও রাখা ছিল। যোগাযোগের ফলে কম্বিনাতের ডাইরেক্টরও নিজের মোটরে সেখানে এসেছিলেন, তিনি আমাদের বিশেষ রূপ-রঙ দেখে জন্মভূমির নাম জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্র আমাদের বিদেশীয়ানা গোপন করতে মধ্য-এশিয়া বলে দিল। তাজিক লোকেদের মধ্যে আমাদের মত রূপ-রঙের লোক খুব কম দেখা যায়। যদিও আমি পাসপোর্ট দেখিয়ে দিলাম। তিনি জানতে পারলেন যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। আমরা খেতে যেখানে-সেখানে ঘুরে চাষবাস দেখলাম। পাশেই সৈনিকদের এরোড্রোম ছিল, তাই সেখানে কোনো বিদেশীর তো অতটা স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। হয়তো এতটা স্বাধীনতা ইংল্যান্ড আর আমেরিকার ওরাও নিজেদের দেশে দিতে পারত না, যারা সুযোগ বুঝে ব্যক্তি-স্বাধীনতার গর্ব করে থাকে এবং সোভিয়েতকে 'লৌহ-পর্দার দেশ' বলে। সেদিন আমরা সন্ধে অব্দি এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকলাম। কলখোজে এখন এখানে দেখার মত সৌন্দর্য ছিল না, কেননা জনশূন্য যাওয়া গ্রাম এখনোও ঠিকমত বসেনি, আর শহরে কারখানাগুলো শুধু নিজেদের শাক-সবজির জন্য যেটুকু জমি দরকার, সেইটুকুই কেবল আবাদ করেছিল। কৃষকদের গৃহজীবন এখন দেখা যেত না।

আজ ৩০ সেপ্টেম্বরে এক সরকারি হুকুম নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছিল, যাতে বলা হয়েছে যে কারখানাতে আর রাষ্ট্রীয় সংস্থায় যারা কাজ করে না বা পেনশনার নয়, তারা রেশনকার্ড পাবে না। প্রকৃতপক্ষে সেটা এই জন্য করা হচ্ছিল যে দেশের পুনর্নির্মাণ ও নবনির্মাণের কাজ সোভিয়েত সরকার তাড়াতাড়ি করতে চাইছিল, যার জন্য লোকের খুব অভাব ছিল। যুদ্ধের সেনাবাহিনী থেকে ফিরে লোকেরা মজদুর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছিল। কিন্তু হিসেব থেকে জানা গেল, যে লাখ-লাখ স্ত্রীলোক এরকম আছে, যারা গৃহিণী হয়ে বাড়িতে বসে আছে। তাই এই নিয়ম বানানো হয়েছিল, যাতে বেকার বসে থাকা মহিলারা কিছু কাজ করতে শুরু করে। জাদুর মত ফল হলো। কেননা রেশনকার্ড কেড়ে নেবার পর এখন ১০ গুণ ২০ গুণ দাম দিয়ে রুটি-মাখন কিনে বাড়ি বসে থাকতে কোনো স্ত্রীলোক রাজি ছিল না, আর কাজও কিছু কঠিন ছিল না। সবাই বসে থাকা স্ত্রীলোকদের হালকা কাজ দিতে ইচ্ছুক। তারা বুঝত যে হালকা কাজ যদি স্ত্রীলোকেরা সামলে নেয়, তাহলে ভারি কাজে পুরুষদের লাগানো যাবে। ওরা এর অভিজ্ঞতাও অনেক অর্জন করেছিল। নগরের পুলিশের মধ্যে রাস্তায় ৯০ শতাংশ স্ত্রীলোক ছিল। ট্রামের ড্রাইভার প্রায় সবই ওরাই ছিল। গুজব বণ্টনকারীরা রুটির দাম বেড়ে যেতে এও বলছিল যে, স্নানাগারের শুল্ক এখন এক থেকে সাড়ে তিন রুবল হয়ে যাবে, ট্রামের টিকিট ১৫ থেকে ৪৫ কোপেক হয়ে যাবে। কম বেতনের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত ছিল, কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। বড় জোর সরকারের মনে হয় এই উদ্দেশ্য ছিল যে কাজ করতে

পারা দেশের প্রত্যেকটা লোক কিছু কিছু কাজ করুক।

এদিকে রেডিও খারাপ হয়ে বসেছিল। যদি ভালব বদলাতে জানতাম তাহলে আমি নিজেই করে নিতে পারতাম। ইউনিবর্-মাগে গেলাম। ৩ মাসেরও বেশি কেনা হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা কলকব্জা বদলে দিতে পারবে না, কিন্তু মেরামত করার জন্য লোক পাঠাতে রাজি। সেখানে তাদের হাটে প্রচুর জিনিস ছিল। সমুরী ওভার কোটের দাম ১২ হাজার রুবল ছিল। তা কেনার লোক তো অকাদেমিক বরান্নিকোফের মতো লোকই হতে পারেন। সাধারণ গরম ওভারকোটের দাম ৪ রুবল ছিল। এটা বিনা রেশনের দাম ছিল। রেশন বা সীমিত কার্ড থাকলে এক-তৃতীয়াংশ দাম কম হতে পারে। ১৭০০ রুবলে রেডিও পাওয়া যাচ্ছিল। হিসেব বড্ড ওলোট-পালোট মনে হচ্ছিল। ১৭০০ রুবল অর্থাৎ আড়াই মণ রুটি একটা রেডিওর দাম, যা ভারতে এখন ৫০ টাকার বেশি হবে না।

বাড়ি পৌঁছলে স্কুলের ডাক্তারের কাছ থেকে খবর এলো ইগরের স্কারলেট ফিবার[১] আছে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত। স্কুলের ডাক্তার শুধু আমাদেরই খবর দিয়ে সন্তুষ্ট হননি, উপরন্তু তিনি হাসপাতালেও খবর দিয়েছিলেন। আমরা ভেবে উঠতে পারছিলাম না যে, কি করা যায়। এমনি সময়ে সন্ধেবেলায় দেখি হাসপাতালের গাড়ি এসে গেল। হাসপাতালের নামে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোলা গ্রামে জন্মানো রুশ মেয়েদের মতই ভয় পেত। সে চেষ্টা করল খালি গাড়ি ফিরিয়ে দেবার কিন্তু এটা ছোঁয়াচে রোগ, অন্য ছেলেদের এবং পাড়ার কথাও মনে রাখতে হবে। লোলার মতো মেয়েদের সামাজিক ধর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেদিন ওর জেদ কাজে লেগে গেল।

২ অক্টোবর আমি ইউনিভার্সিটি গেলাম। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখলাম বাড়ির দরজায় দুটো লাল লাল কাগজ আটকানো, যার ওপর 'সাবধান স্কারলেট জ্বর' ছাপা ছিল। লোলা এখন হাসপাতাল পাঠাতে ঝামেলা করছিল। আমি বারণ করলাম। শেষে ডাক্তার হাসপাতালে লিখে জানালেন। খবর এলো যে কাল নিয়ে যাবে। বাড়িতে দেখলাম হাসপাতালের মোটর গাড়ি রোগ-নিক্রমণের সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে গেছে এবং ঘরের সব জায়গায় ভাপ আর ওষুধ দিয়ে নিক্রমণ করা হচ্ছিল। প্রথমে তো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরের দিন নিয়ে যাবার কথা বলেছিল, কিন্তু মোটর দশটার সময়ই পৌঁছে গেল। তৈরি হতে ১ ঘণ্টা লাগল, তারপর আমরাও ছেলের সঙ্গে হাসপাতাল গেলাম। এক ঘণ্টায় লেখালিখির কাজ শেষ হলো, তারপর একটা বাক্সওলা কামরায় ওকে রাখা হলো—যেখানে ছোঁয়াচে রোগ থাকতে পারে বলে যাদের সন্দেহ করা হয় সেইসব রুগীদের রাখা হয়। মা সেই ঘরের ভেতরেও ঢুকতে চাইছিল। কিন্তু আমার তো মস্কো হাসপাতালের অভিজ্ঞতা ছিল। সে সব জায়গায় ঝগড়া করতে থাকল। বাড়িতে ডাক্তারের সঙ্গে, হাসপাতালে প্রবেশক ডাক্তারের সঙ্গে, এখানেও যখন বুড়ি বারণ করল, তখন তার সঙ্গে ঝগড়া করল এবং যাবার সময় লেনিনগ্রাদের ঘেরাও-এর সময় নিজের

[১]লালবর্ণের ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বরবিশেষ।—স·ম·

প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা পুত্র কাছ-ছাড়া হওয়ায় কেঁদেও ফেলল।

৩ অক্টোবর যখন আমি ইউনিভার্সিটি গেলাম তো সেখানে স্থলাভিষিক্ত রেক্টরের চিঠি পেলাম—ক্লাশ নেওয়া থেকে মুক্তি, কারণ বাড়িতে ছোঁয়াচে রোগের খবর এসেছে। অন্যান্য কাজে ঘড়ির কাঁটা দু-ঘণ্টা ধীরে চলত, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বিপজ্জনক অসুখের সময় ঘড়ি একেবারেই তার মন্দগতি ভুলে যায়। এখন আমি কিছুদিনের জন্য ইউনির্ভার্সিটি থেকে ছুটি পেয়ে গেছি। সেদিন হাসপাতালে ইগরকে দেখতে গেলাম। বাক্স-কামরা মানে সেটা ছোটখাটো ঘর নয়। হ্যাঁ, সেখানে ডাক্তার আর পরিচারিকা ছাড়া অন্য কেউ যেতে পেত না। দেখতে আসা লোকেরা পেছন দিকে দাঁড়িয়ে কাঁচের জানলা দিয়ে পেছনে দাঁড়ানো ছেলেকে দেখতে পেত। দুটো সবুজ কাঁচের জানলা বন্ধ ছিল, তাই আওয়াজ খুব কষ্ট করে শোনা যাচ্ছিল। পরিচারিকাদের থেকে বুঝতে পারলাম যে, তারা ছেলের মধুরভাষিতা আর ভদ্র ব্যবহারে খুব প্রভাবিত হয়েছিল। ওর জন্য কিছু ফল আনা জরুরি ভেবে আমরা নেবস্কী সড়কে গেলাম। আপেল, আঙুরের মত ফল ৭০-৮০ রুবল প্রতি কিলো পাওয়া যাচ্ছিল। তরমুজও ১০ রুবল প্রতি কিলো ছিল। এত দামী জিনিস কিনতে এত খরিদ্দার কি করে রাজি হয়, আমার সেটা দেখে আশ্চর্য লাগছিল।

৪ অক্টোবরে হাসপাতাল গেলে জানতে পারলাম, যে অল্প জ্বর হয়েছিল। কিন্তু স্কারলেট-জ্বর হয়েছে বলে এখনো নিশ্চিত নয়। আজকে ওদের কথাবার্তা শুনে লোলাও স্বীকার করল যে ডাক্তার আর নার্স সবাই ভালো মানুষ, ওদের হাতে ইগর পুরোপুরি সুরক্ষিত। ইগর এখন মাত্র একমাস লেখাপড়া করেছিল কিন্তু সে কাগজে চিঠি লেখার চেষ্টা চালিয়েছিল—মামা, পাপা কেমন আছ? সে নিজের বুড়ি পরিচারিকাকে ক-খ শেখার জন্য খুব চাপ দিচ্ছিল। সে বেচারি বলছিল, 'এখন আমি ৭০ বছরের বুড়ি। কবরে পা দিয়েই আছি, পড়ে কি লাভ?'

শীত এত বেড়ে গিয়েছিল যে রাতে জল জমে যাচ্ছিল। পাতা খুব তাড়াতাড়ি হলুদ হয়ে আসছিল।

৫ অক্টোবরে আমরা ইগরের খাওয়ার জন্যে ফল আর দুধ দিয়ে এলাম। কো-অপারেটিভে জিনিস আনতে যেতে হতো মনে পড়ল। জিনিসের দাম সেখানেও বেড়ে গেছে, আর ৪৫০ রুবলের জায়গায় এখন আমরা নশো রুবলের জিনিস নিম্ন-মাত্রায় কিনতে পারতাম—

মাংস	৭ কিলোগ্রাম
পাখির মাংস	১ কিলো ৩৪ রুবল প্রতি কিলো
সসেজ	অর্ধেক "
ভাজা মাছ	১ "
কাঁচা মাছ	২ "
চর্বি	আড়াই "
তেল	অর্ধেক "

ডিম	৩৫ ”
দুধ	৪ লিটর
চিনি	২ কিলো
টিনের খাদ্য	২ টিন
আলু	২৬ ” (সাড়ে বত্রিশ সের), ২৬টিন তরকারি
সাবান	২টি (গায়ে মাখা)
সাবান	২টি (কাপড় কাচা)
চা	১০০ গ্রাম

এগুলো বিশেষ রেশনকার্ডের জিনিস ছিল। এ ছাড়াও সাধারণ রেশনকার্ডের জিনিসও ছিল। লোলাও এ বছর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবার ফলে একটা বিশেষ কার্ড পেয়েছিল, যা দিয়ে এর থেকে এক তৃতীয়াংশ জিনিস পাওয়া যেত। এর থেকে বোঝা যাবে যে, রেশনের কষ্টকর দিনগুলোতেও সাধারণ নাগরিকদের ও শিক্ষিত কর্মীদের খাওয়া-দাওয়ার কত সুবিধে ছিল।

৬ অক্টোবরে যখন হাসপাতাল গেলাম, তো ইগরের জ্বর ইত্যাদির কোনো নালিশ ছিল না। ক্যাঙ্গারু মা মনে করত যে, সে যে-রকম নিজের ছেলেকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারে না, সেরকমই তার ছেলেও। কিন্তু সে একলা থাকতে ভয় পেত না। খুব সম্মান দিয়ে হাসপাতালের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, তাই ডাক্তার, নার্স আর পরিচারিকারা সবাই সন্তুষ্ট ছিল। ইগরের এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখে, লোলা চার বছর আগের শিশু-নিকেতনের অভিজ্ঞতার কথা বলল—সেই সময় ও তিন-চার বছরের ছিল। মা কোনো কাজের জন্য একমাস ওকে দেখতে পায়নি। যখন সে ওখানে দেখা করতে গেল, তো ইগর শুধু বলেছিল, ‘চাচী (মাসি), তুই বোস আমি একটু খেলতে যাচ্ছি।’ বলে সে খেলতে চলে গেল। মা বেচারি কাঁদতে বসল। তার ছেলে এত তাড়াতাড়ি তাকে ভুলে গেছে! আর মামা না চাচী বলছে। সেদিন তিরযোকী থেকে যখন আমরা আসছিলাম, তখন ইগর ওখানেই থেকে যাবার কথা বলছিল। আমি লোলাকে বললাম, ‘এখন হাসপাতাল ছাড়ার সময়ও বোধ হয় সেই একই ব্যাপার হবে। আর চাচী-মামাকে খালি হাতেই ফিরতে হবে। মানব-শিশু বোধ হয় স্বাবলম্বীর পাঠ পড়তে চায়।’

৭ অক্টোবরে দেখলাম, রাতে বরফ হয়ে যাওয়া জল বেলা এগারোটা অব্দি ওই রকমই পড়েছিল। গাছের পাতা এখন প্রচুর ঝরে যাচ্ছিল। ৮ অক্টোবর হাসপাতাল গেলাম ইগর ক্যালেন্ডার বানাতে ব্যস্ত ছিল। খেলা, গান করা আর কথা বলা—ব্যস, এই ছিল ওর কাজ। মিশকার চাচী-মামার খুব বেশি পরোয়া ছিল না। বাড়ি এসে দেখলাম লরিতে করে বয়ে কয়লা আনা হচ্ছে। আশা হলো যে, এই বছর বাড়ি তাড়াতাড়ি গরম হবে। লোকেরাও বলল, এবার ১৫ অক্টোবর থেকেই গরম হবে।

১০ অক্টোবরে সময়ের আগেই গিয়ে নেব্‌স্কী রাজপথে বই আর নতুন ফিল্মের

—১৯৪৬—

খোঁজ করতে করতে একটা মোঙ্গল ফিল্ম (মরুভূমির সওয়ার) দেখতে গেলাম। ফিল্মটা ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গলিয়ার রাজধানী উলানবাটোরে (উর্গা) তৈরি করা হয়েছিল। এর সমস্ত অভিনেতা আর অভিনেত্রীরা মঙ্গোল ছিল, শুধু টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল রুশ। ফিল্মের গল্প ১৭ শতাব্দীর এক মোঙ্গল বিজেতার জীবন নিয়ে। ফিল্মে রুশ ভাষার প্রয়োগ এখানকার কথা ভেবে করা হয়েছে। মোঙ্গলিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর ছিল, যাতে ওখানকারের বিস্তৃত ময়দান, মরুভূমি, ছোট ছোট পাহাড়, নদী, দেবদারু দিয়ে ঢাকা পর্বত, পশুপালকদের তাঁবু আর চারণভূমিতে জানোয়ার দেখানো হয়েছে। ওই সময়ের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধেরও দৃশ্য ছিল। অস্ত্রশস্ত্র আর পোশাক ঠিক দেশ-কাল অনুসারে রাখা হয়েছিল। গুম্বা (মঠ)-এরও অনেক দৃশ্য ছিল। পুরনো মোঙ্গল প্রথা অনুসারে গল্পের নায়ককে যখন খান (রাজা) বানানো হলো, তখন তাকে পশমী কম্বলে বসিয়ে লোকেরা শোভাযাত্রা বার করেছিল। মোঙ্গল রাজাদের সিংহাসনারোহণ হয় না, পশমের কম্বলারোহণ হয়। খান মোঙ্গলদের একটানা চলতে থাকা গৃহ-বিবাদ বন্ধ করে সমস্ত মোঙ্গল জাতিকে একতাবদ্ধ করল। তারপর সে যখন জানতে পারল, যে আমাদের ধর্মের পোপ দলাই-লামাকে খুব কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, তখন সে মোঙ্গলদের একটা বড় বাহিনী নিয়ে তিব্বতের দিকে বেরিয়ে পড়ল।। তৎকালীন দলাই-লামা এক দশ-বারো বছরের ছেলে ছিল,যে খুবই সুন্দর ছিল। তার অভিনয়ও খুব প্রভাবশালী ছিল। ফিল্মে পোতলা আর লাসাকেও চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। খানের জামাই বিরোধী-সেনাদের পুরোপুরি পরাজিত করেছিল। বিরোধী তিব্বতী সামন্ত এক সুন্দরী বিষকন্যা পাঠিয়ে ওকে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছিল, যার খবর পেয়ে খান নিজের একমাত্র জামাইকে প্রাণদণ্ড দেবার চিঠি পাঠালো। যুবকের মাথা কেটে আনা হলো। খানের হুকুম ছিল, তাই কোনো মোঙ্গল তাকে বাধা দিতে পারল না। শ্বশুর চোখের জল ফেলতে লাগল, কিন্তু রাজধর্ম পালন করেছে বলে সে সন্তুষ্ট ছিল। তার মেয়ে মূর্ছা গেল, পিতা চোখের জল মুছে-মুছে তাকে বোঝাচ্ছিল। মেয়ে যুদ্ধে লড়াই করতে করতে মারা গেল। এই ফিল্ম থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছিল, যে চেঙ্গীস কেমন লোকদের পেয়েছিল, যাদের বল নিয়ে সে বিশ্ববিজয়ী হতে সফল হয়েছিল।

আবার শীতকাল

১৩ অক্টোবর সকালে উঠলাম, দেখলাম বাইরে সব জায়গায় বরফের চাদর বিছানো। রাতে বরফ পড়েছিল, যদিও তাপমাত্রা দেখে তখন আশা করিনি যে এই অবস্থা থাকবে। সন্ধে অব্দি অনেকটা গলেও গেল। এই শীতকালে যদিও শীত কম ছিল না, কিন্তু বরফ কম থাকায় অনেক অভিযোগ ছিল।

১৫ অক্টোবরে এখনও কিছু বরফ বাকি ছিল। ১৭ তারিখ সকালে ফের তিন ইঞ্চি মোটা সাদা বরফে মাটি ঢাকা ছিল, কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত রাস্তার বরফ অনেকটা গলে গিয়েছিল।

ইউনিভার্সিটি আমাকে রোজ যেতে হতো না। যদি ওখানে না যেতাম তাহলে, বাড়িতে বসে লেখাপড়া করতাম। গেলে আমাদের এখান থেকে ইউনিভার্সিটি ৪-৫ মাইল ছিল। নগরের সবচেয়ে বড় রাজপথ নেবস্কী দিয়ে যেতে হতো। রাস্তায় অনেক সিনেমা হলো পড়তো। যদি কোথাও এরকম ফিল্ম চলতে দেখতাম, যার থেকে অতীত বা বর্তমান সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে কোনো বিশেষ কথা জানা যেত, তাহলে যাতায়াতের পথে তা অবশ্যই দেখতাম। বয়স্কদের সিনেমা হলে বাচ্চাদের নিয়ে যাবার অনুমতি নেই, তাই ইগরের বঞ্চিত হবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সিনেমার থেকেও বেশি আমার পুরনো বই-এর দোকানে গিয়ে নিজের বিষয়ের বইপত্র খোঁজার শখ ছিল। কিছু এরকম দোকান নেবস্কী রাজপথের পাশেই ছিল। কখনো-কখনো ওখানে খুব কাজের বইও পাওয়া যেত। ইউনিভার্সিটিতেও পুরনো বই-এর দোকান ছিল। এই পুরনো বই-কাগজের দোকানগুলো সংস্থার ছিল, কোনো পুরনো কাগজের ব্যাপারীর নয়। নতুন বই দুষ্প্রাপ্য ছিল, আমার কাছে তো এইগুলোই ছিল কামধেনু।

১৮ অক্টোবরে কাফিদরলের (বিভাগ) অধ্যক্ষ অকাদেমিক বরান্নিকোফের বাড়িতে অধ্যাপকদের বৈঠক বসে ছিল। তাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তথা ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রম ইত্যাদির বিষয়ে সবাই নিজের নিজের রিপোর্ট দিল। প্রথম আর দ্বিতীয় বছরে বহু ভালো ছাত্র এসেছিল। তৃতীয় বছরের তানিয়া, কতিনিনা, আর সাসা মেল্নীকোফকে সবাই প্রশংসা করছিল। চতুর্থ বর্ষ যুদ্ধের কারণে ছাত্র শূন্য ছিল। পঞ্চম বর্ষের দুজন ছাত্রীদের ওপর অধ্যাপকরা অতটা সন্তুষ্ট ছিল না, এরা হামেশাই ফ্রেঞ্চ-লিব (ইচ্ছেমত ছুটি) নিত।

রাত এগারোটায় ফেরার সময় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। নীচে মাটির ওপর বরফ বিছানো ছিল আর ওপর থেকে জল বর্ষণ, তার মানে, মাটি বেশি ঠাণ্ডা আর আসমান বেশি গরম ছিল। মাটি বরফকে তার অধিকার থেকে ছাড়তে চাইছিল না।

সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষার শিক্ষণের মান নিঃসন্দেহে পশ্চিমে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেশি। পঞ্চম বর্ষে 'দশকুমার চরিত' পড়ানো হতো। তানিয়া, কতিনিনা আর সাসা আগে খুব উৎসাহ নিয়ে এসে তিব্বতী ভাষা শুরু করেছিল, কিন্তু সাসার উৎসাহ বেশি দিন অব্দি রইল না। সাসার ঝোঁক অর্থশাস্ত্র আর রাজনীতির দিকে খুব ছিল, তাই ও সেই দৃষ্টি দিয়ে ভারতের বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চাইছিল। তৃতীয় বর্ষে এসে এখন ও হিন্দি ভালোই বুঝত। ভারত থেকে ইতিহাস, রাজনীতি আর অর্থশাস্ত্রের ওপর লেখা নতুন নতুন হিন্দি বই ও পেতে চাইছিল। আমি চেষ্টা করলাম। সাসা ভাষাতত্ত্বের এক দুর্লভ রুশ গ্রন্থও ভারতে পাঠালো, কিন্তু গ্রন্থের আদান-প্রদানও পুঁজিবাদী দুনিয়া সমাজবাদী দেশের সঙ্গে সহজে করতে দিতে চায় না। তিব্বতী ভাষার আরম্ভের প্রাথমিক পর আমি জাতকমালাকে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে বাছলাম, কেননা তার সংস্কৃত আর ভোট (তিব্বতী অনুবাদ) দুটো পাওয়া যেত। একটা

বই হলেও কোনো অসুবিধে ছিল না, কেননা ইউনিভার্সিটির পাশে আমাদের একটা খুব ভালো ফটো আর ফিল্‌ম স্টুডিও ছিল, যেখানে যতগুলো দরকার কপি বানানো যেত। কতিনিনা খুব মনোযোগী ছাত্রী ছিল, সে খুব বুদ্ধিমতীও ছিল, আর পরিশ্রম এত করত, যে বই-এ মগ্ন হলে হাত-মুখ ধুতেও ভুলে যেত। ওর সহপাঠী নালিশ করত যে স্নান করাতে ওর খুব আলস্য। আশ্চর্য, এরকম মেয়ে কিভাবে নিজেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতো? আমার বিশ্বাস ছিল যে, যদি সে নিজের রাস্তায় চলে যায়, তাহলে রুশ সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বানদের পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হবে।

২০ অক্টোবর এখনও ইগর হাসপাতালে। তার সবচেয়ে বেশি দাবি ছিল খেলনার। যদিও ছোঁয়াচে রোগের হাসপাতালে থাকার কারণে ও সেই খেলনা সঙ্গে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তাও ওর দাবি পূরণ করা হতো। সে নিজের খেলা আর কাগজে ইচ্ছে মত লিখে এখন বাড়িকে ভুলেই গিয়েছিল।

২৪ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে গিয়েছিল, শুধু দেবদারুর মত সর্বদা সবুজ থাকা গাছই চোখকে নিজের শ্যামলিমায় তৃপ্ত করত। আমি ভাবতাম—রাস্তা বা বাগান এই বৃক্ষ দিয়ে ভরিয়ে ফেলা হয় না কেন? কিন্তু পরে জানলাম, যে ওগুলোর দেখাশুনা করা বেশি পরিশ্রমসাধ্য। অন্য গাছ অক্টোবরের শেষ নাগাদ নিজের পাতা ঝরিয়ে ন্যাড়া হয়ে যায়। এর পাতাগুলোকে বরফ ঢেকে ফেলে, তাই সেগুলো বসন্তেই একবার পরিষ্কার করার দরকার হয়। দেবদারু পাতা ঝরার কোনো নির্দিষ্ট কাল নেই। সে সব সময় নিজের ছুঁচগুলোকে ছড়িয়ে দিতে তৈরি থাকে, যার জন্য রোজ ঝাড়ুটাড়ু দেবার দরকার হয়।

আমাদের ঝি মানিয়া কাজে বড় দক্ষ ছিল। পরিষ্কার করা আর সবকিছু গুছিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে মনে ফূর্তিও সে যথেষ্ট রাখত। সে ৩৫-৩৬ বছরের মাঝবয়সী মহিলা কিন্তু দেখতে বেশি বুড়ি বুড়ি লাগতো। ওর এক ছেলে আর এক মেয়ে ছিল, যাদের নিয়ে ও যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদ ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। ওর ড্রাইভার স্বামী এখানেই ছিল। তিন বছর অব্দি বেচারা কতই আর সংযম রাখবে, আর বিশেষ করে যখন পুরুষদের মধ্যে এত বেকার ছিল? সে অন্য এক স্ত্রীলোকের প্রেমপাশে বাঁধা পড়ল। মানিয়া ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ফিরে এলো। বাপ নিজের বাচ্চাদের ভালোও বাসত। কিন্তু ডাইনি তাদের ছাড়তে রাজি ছিল না। মানিয়াকে সে যখন-তখন টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্যও করত। মানিয়া খুব কান্নাকাটি করত। স্বামী কখনও ফিরে আসার আশ্বাসও দিত, কিন্তু এরকম ঠিক করে না-জানি কত দিন কেটে গিয়েছিল, তাই ফেরার আশা কমই ছিল। হ্যাঁ, বাচ্চাদের দেখতে সে অবশ্যই আসত। মানিয়া কখনো কাঁদত, কখনো কুপিত হতো। একদিন এমনই সময়ে তার আট বছরের মেয়ে মাকে গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিচ্ছিল, 'মামা, চুলগুলো স্থায়ীভাবে কোঁকড়ানো করে ফেল, পাউডার আর লিপস্টিকও লাগিয়ে নাও হয়তো এই দেখে পাপা এসে যাবে।' আট বছরের মেয়ে বাল্যার এত দৃঢ় পরামর্শ আসলে বলে দেয়, যে সেও তার মায়ের স্বাবলম্বী জীবন থেকে কিছু আদায় করতে পেরেছে। আরেক দিন বাল্যা বলছিল, 'মামা, পাপা এলে তাকে ভালো ভালো খাওয়াবে,

তাহলে হয়তো সে ফিরে আসবে।' বাল্যার পাপা এবার পয়লা নভেম্বর থেকে এসে থাকার কথা দিয়েছিল, কিন্তু সে নিজের প্রেমিকার সঙ্গে বেশি সুখে থাকতো। মানিয়া এক গ্রাম্য মেয়ে। ১৭-১৮ বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে এসেছিল। সেই সময় সে এর প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু স্বামী এখন শহরকে বেশি পছন্দ করতে আরম্ভ করেছিল। মানিয়া সারা জীবন যে গ্রাম্য সেই গ্রাম্যই রয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, মানিয়ার জন্য রেশনকার্ড পাওয়া যাবে আর খাবার চিন্তা থাকবে না, কিন্তু নতুন নিয়ম অনুসারে বাড়ির চাকরদের কাজকে জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন কাজ বলে ভাবা হতো না। তাই মানিয়াকে আমাদের বিনা রেশনের জিনিস খাওয়াতে হতো। লোলা তার চিন্তা ব্যক্ত করলো, আমি বললাম, 'আলু, কপি বেশি খাব।' কিন্তু তাও তো ৩০-৪০ রুবল কিলো ছিল।

২৯ অক্টোবর হাসপাতাল গেলাম। ডাক্তার বলল যে স্কারলেট জ্বর ছিল না, তবে রক্তে ডিপথেরিয়ার বীজানু পাওয়া গেছে। সেই দিন আমরা ইগরকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলাম।

৩১ অক্টোবর মাসের শেষ দিন তথা শীতেরও এক মাস কেটে গেছে, কিন্তু শীত কম ছিল। রাস্তায় কোথাও কোথাও কাদা ছিল। লোলার এখন চাকরানী রাখার অনুতাপ হচ্ছিল। ২০০ রুবলের জায়গায় যদি ৫০ রুবল দিলে কাজ চলে যেত আর খেতে দিতে হতো না, তাহলে ও খুশি মনে রাজি ছিল, কিন্তু এখন যে রেশনকার্ড বন্ধ ছিল। লোলা ঝি ছাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছিল, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে দিলে বাড়ির কাজকর্মে গণ্ডগোল দেখা দিত। আমাদের ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর মোটর গাড়ি কিনেছিলেন। মোটর গাড়ি কেনা কিছু কঠিন ছিল না, তার দাম ছিল দুটো রেডিওর সমান। প্রফেসর সাহেব ড্রাইভার আর চাকরানীও রেখেছিলেন। দুটো চাকরের কথা তো ছেড়ে দাও, প্রফেসর সাহেবের বিবির রেশনকার্ডও নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তিন-তিনটে মানুষের বিনা রেশনের জিনিসে খাওয়া-দাওয়া মানে দেউলিয়া হবার যোগাড়। সরকারি দোকান থেকে হাটে জিনিস কিছুটা সস্তায় পাওয়া যেত, কিন্তু সেখানে এখন খুব ভিড় হচ্ছিল। আলু ১২ রুবল কিলো পাওয়া যাচ্ছিল। মানিয়া বেচারি একলা কি করে ভালো ভালো খাবার খায়, ওর দুটো বাচ্চাও যখন আছে? রুশ চাকরদের সম্বন্ধে এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে কাজের সময় সে অবশ্যই চাকর, বাকি সময় তার সঙ্গে একেবারে সমান মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। মালিকের সঙ্গে সে একই টেবিলে বসে চা খেত। মানিয়া নিজের খাবার বাড়ি নিয়ে গিয়ে খেত—বাচ্চাদের কথা ভেবে কিছুটা বেশিই নিয়ে যেত। লোলার দেউলিয়া হয়ে যাবার ভয় হতো।

২ নভেম্বরে আমাদের গৃহনিয়ন্ত্রণ-কার্যালয়ের বুড়ি শীতের চোটে বৈদ্যুতিক উনুনে আগুন পোয়াচ্ছিল। কোথাও কাঠের সঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল আর পুড়তে আরম্ভ করেছিল। বুড়ি এবং কার্যালয়ের লোকেরা কেউই বুঝতে পারেনি, কিন্তু পাশেই আমাদের ঘর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। আমাদের মনে হলো হয়তো নীচে মাটির তলায় কুঠরিতে আগুন লেগেছে, সেখানে এক ছুতোর মিস্ত্রি কাজ করছিল। নীচে গিয়ে দেখলাম তালা

লাগানো। ধোঁয়া এত দ্রুত ভরে যাচ্ছিল, যে আমি জানলা খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে বইগুলো বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করে দিলাম। আমাদের ঘর মাটির নীচের ঘরের ওপরে হওয়ায় জানলা বাইরের জমি থেকে বেশি উঁচু ছিল না। লোলা নিজের নিয়মে এক ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টায় করতে চাইত। ওকে ফায়ার ব্রিগেড যাবার জন্য ফোন করতে বললাম আর আমি জিনিসপত্র সামলাতে লাগলাম। ফায়ার ব্রিগেড তক্ষুণি এসে গেল। তারা মাটির নীচের ঘরের তালা ভেঙে দেখল কিন্তু সেখানে কোনো আগুন ছিল না। সব শেষে আসল কথাটা জানা গেল। বুড়ি শীতের অজুহাত দেখালো শীতের অজুহাতে বাড়িতে আগুন লাগানোর অধিকার কি করে কেউ পায়? হয়তো ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা বুড়ির বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট দেয়নি, তা না হলে বেচারি মুশকিলে পড়তো। এর থেকে একটা সুফল হলো—আজই সন্ধে থেকে ঘর গরম করা ইঞ্জিন কাজ করতে থাকল। ইঞ্জিনের কাজ ছিল, ফোটানো জলকে চারতলা বাড়ির প্রত্যেক কামরায় মোটা নলের জালে পৌঁছে দেওয়া। নল স্বয়ং গরম হয়ে কামরার হাওয়া গরম করে দিত। এইভাবে তাপমাত্রা হিমাঙ্ক থেকে ১০°—১৫° সেন্টিগ্রেড ওপরে উঠে যেত। কিন্তু ৪ নভেম্বরে দেখলাম যে ইঞ্জিনের ঘর্ ঘর্ আওয়াজে আমাদের কান ঝালাপালা হচ্ছিল। অন্যদিক ঘর যে ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডাই। হয়তো কিছু টন কয়লা বেঁচে গেছে দেখাতে গিয়ে ইঞ্জিনকে ক্ষুধার্ত রাখা হচ্ছিল। অথবা ইঞ্জিনের মেরামত ঠিক করে হয়নি। উৎপাদনের সংখ্যার রাজ্য যেটা নয় সেখানে এরকমটা হওয়া এখন অস্বাভাবিক ছিল না। লেনিনগ্রাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা অর্থাৎ পার্টি-মন্ত্রীকে এই দিকে দেখা উচিত ছিল, কিন্তু লোকেরা তাকে গাধার খেতাব দিয়ে রেখেছিল। কি জানি কি করে সে এরকম দায়িত্বপূর্ণ পদ অব্দি পৌঁচেছে। যেরকম বড় নেতা সে রকমই হবে ছোট নেতাও, তাই পপোফ-এর জন্য খুব অব্যবস্থা ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ায়ও এরকম অযোগ্য ব্যক্তিদের কখনো কখনো দায়িত্বের পদে পৌঁছনো সম্ভব, কিন্তু 'উধরে অন্ত ন হোই নিবাহু' অনুসারে জানতে পাবার পর সে ওই পদে টিকতেও পারে না। পপোফের পতন আমাদের সেখান থেকে চলে আসার পর হয়েছে। ইঞ্জিনের এই অবস্থা কিছু দিনই রইল। নভেম্বরে বাড়ির ভেতরের তাপমাত্রা ১৪°-১৫° সেন্টিগ্রেড রইল।

বিপ্লবের মহোৎসব—বিপ্লবের দিন ৭ নভেম্বর এসে পৌঁছল। ৪ তারিখ থেকেই তার প্রস্তুতি চলতে থাকলো। পতাকা, ছবি এবং রঙ-বেরঙের বড় বড় বিজ্ঞাপন জায়গায়-জায়গায় আটকানো হচ্ছিল। আমাদের স্নানাগারের সামনে একটা বড় রঙিন চিত্র আটকানো ছিল, যাতে মেশিনের সামনে দাঁড়ানো তাঁতি-বৌ কাপড় দেখাচ্ছিল। তার পরে দোতলার সমান আর একটা বিজ্ঞাপন-চিত্র ছিল,যাতে স্তালিন বাচ্চাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। এক জায়গায় রাস্তার দু পাশে লেনিন আর স্তালিনের ত্রিমাত্রিক ছবি দাঁড় করানো হয়েছিল, যার মধ্যিখানে রাত্তিরে বৈদ্যুতিক আলো ওগুলোকে আলোকিত করত। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে লোকেদের আজকের উৎসবে অতটা আনন্দ হচ্ছিল না। রেশনের জিনিসের দাম বাড়িয়ে আর বিনা রেশনের জিনিসের দাম

কমিয়ে দুটোকেই একই তলায় এনে রেশনিং তুলে দেবার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা ভালো হতে পারে, যদি রেশনের জিনিসের দাম অতটাই বাড়ানো হতো, যতটা মাইনে বৃদ্ধি হয়েছিল। এরকম না করাতে যারা কম বেতন পায় তাদের কষ্ট ছিল, বেশি বেতনের চাকর রেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। সৌভাগ্যবশত বেশি মাইনে পাওয়া লোকেদেরও নিজের কাজ নিজের হাতে করার অভ্যেস ছিল।

৭ নভেম্বরে বিপ্লবের মহোৎসবের বড় বড় শোভাযাত্রা বের হলো। নগর সব রকম ভাবেই অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। মস্কোর খবর থেকে জানতে পারলাম যে, আজকের মহোৎসবে লাল ময়দানে স্তালিন উপস্থিত ছিলেন না এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও প্রভাবশালী শিষ্য জ্‌দানোফ বার্ষিক বক্তব্য দিয়েছিল। রাতে দীপমালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

১১ নভেম্বর আমার বরান্নিকোকের বাড়ি যাবার ছিল। আজ সেখানে সামনের ছমাসের প্রোগ্রাম বানানোর ছিল। কাল অব্দি মেঘ, বৃষ্টি আর কাদায় লোকেরা ব্যতিব্যস্ত ছিল। রাতে বরফ পড়েছিল, তাতে জমি দেড়-ইঞ্চি শুধু ঢেকেই যায় নি উপরন্তু কাদার ঠেলায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। বরান্নিকোফ সেই অকাদেমিকদের একজন, যাঁরা সোভিয়েতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি। বরান্নিকোফের রোজগার সব মিলিয়ে মাসে ৩০ হাজার রুবলের থেকে কম নয়। অকাদেমিক হলে ছ হাজার রুবল মাসিক পেনশন তো পাওয়াই যায়, তারপর প্রফেসর, শিক্ষা-পরামর্শদাতা, বই-এর রয়াল্টি ইত্যাদি থেকে মোটা আমদানি ছিল। লোকেরা এইরকম অকাদেমিকদের মাইনে দেখে বলে বসে যে, সোভিয়েতে কম করেও আড়াই শ রুবল বেতনভোগী লোক খুব বেশি হলেও ৩০-৩৫ হাজার আছে। কিন্তু একে আমরা নিয়ম বলতে পারি না। মহান বিজ্ঞানী আর সাহিত্যিকদের আমরা সাধারণ কোঠায় রাখতে পারি না এবং তাঁদের সংখ্যা একশোর বেশি নয়। যদি নিজের দেশের বিজ্ঞানীদের আর আবিষ্কর্তাদের এই ধরনের পারিতোষিক না দেওয়া হয়, তাহলে সবাই তো আর আদর্শবাদী কম্যুনিস্ট না। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে ইংল্যান্ড আর আমেরিকা অনেক অনেক মাইনের প্রলোভন দিয়ে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করবে। এমনিতে সবচেয়ে কম আর সবচেয়ে বেশি বেতনের মধ্যে অন্তর ১৮-২০ গুণের বেশি নয়। এও মনে রাখতে হবে যে সেখানের এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সেনার জেনারেল, আর সরকরের মন্ত্রীর বেতন একই রকম, তাই আমাদের এখানকার মত ইউনিভার্সিটি ছেড়ে প্রতিভাশালী তরুণদের সিভিল সার্ভিসের দিকে দৌড়নোর দরকার নেই।

বরান্নিকোফ খেতে ও খাওয়াতে খুব উদার ছিলেন। যখনই তাঁর বাড়িতে অধ্যাপকদের এবং ছাত্রদের বৈঠক হতো—আর সেটা হামেশাই হতো—তখন খাওয়ার আর পানের ভালো ব্যবস্থা থাকত। তিনি নিজের পুরনো বাড়িতেই থাকতেন, তাই লেনিনগ্রাদের বাড়ির স্বল্পতার মুখোমুখি তাঁকে হতে হতো না। তাঁর চারটে-পাঁচটা ভালো-ভালো ঘর ছিল, যাতে গ্রন্থাগার আর অতিথিদের আতিথেয়তারও স্থান ছিল। ভালো-ভালো মদ, নানা রকমের সুস্বাদু মিষ্টি ও ফল সেখানে সাজানো থাকতো।

বরান্নিকোফ ডায়বেটিসের রোগী ছিলেন বলে মিষ্টি থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতেন, কিন্তু অতিথিদের খাওয়াতে তিনি খুব আনন্দ অনুভব করতেন। বস্তুত, যতটা অল্পভাষী ছিলেন, ততটাই বেশি সহৃদয় ছিলেন। তিনি চাইছিলেন যে আমি হিন্দি আর সংস্কৃতের পাঠ্যপুস্তক লিখি, কিন্তু এখন তো আমি পরের বছর ভারত চলে যাব স্থির করেছিলাম।

১৪ নভেম্বরে দেড় মাস বাদে ইগর স্কুলে গেল। গণিতটা আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম আর মা বই পড়াটা, তাই স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের থেকে সে পিছিয়ে পড়েনি। প্রথমে আমার ভয় ছিল, যে ও একটু কম-বুদ্ধিসম্পন্ন হবে, কিন্তু সেই ভাবনা তাড়াতাড়িই দূর হলো। স্কুলের প্রথম বছরের ছেলেদের কাছেও একটা ছোট নোটবুক থাকে, যার মধ্যে শিক্ষিকা রোজ নম্বর দিত। পাঠ্য বিষয়ে যেখানে পূর্ণাঙ্ক ৫-৫ ছিল, সেখানে স্বভাবের জন্য ছিল ৪ নম্বর। বরাবর ৫-৫ নম্বর পেলেই বোঝা যেত, যে সে সব বিষয়েই ভালো। একদিন আচরণের জায়গায় শূন্য বসানো ছিল। আমি প্রশ্ন করতে সব খোলসা হলো। ওখানে কোনো সহপাঠীর সঙ্গে মহাত্মা ঝগড়া করেছেন। স্কুলে কোনো বাচ্চাকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হতো না। অন্যায় করলে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করানো হতো, আরো কিছু করলে ক্লাশ থেকে বার করে দেওয়া হতো, যার জন্যে সে নিজের সহপাঠী ছেলেদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতো। এই দণ্ডই যথেষ্ট ছিল।

ইউনিভার্সিটির বসন্তারম্ভের সময় প্রথম বছরে প্রায় ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী দাখিল হয়েছিল। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ কেউ পরে নিজে থেকেই অন্য বিষয় নিয়ে চলে গেল, হিন্দি আর সংস্কৃতের উচ্চারণ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এক সমস্যা ছিল। সংস্কৃত যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ রুশরা আমাদের থেকেও ভালো করে। আর তিন-চারটি যুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ করতে পারে কিন্তু ট-বর্গের উচ্চারণ ওরা পেরে ওঠে না, ট-বর্গের উচ্চারণের জায়গায় ত-বর্গের উচ্চারণই চলে। আসলে ট-বর্গের প্রচার পৃথিবীতে কমই। ইংরেজির নকল করে আমরা বিদেশী নাম আর শব্দে ট দিয়ে ভরিয়ে দিই, আমরা এটা বুঝে নিলে ভালো, যে দুনিয়ায় ট-বর্গের ক্ষেত্র খুব সঙ্কুচিত, তাই যদি ট-বর্গের স্থানে ত-বর্গের ব্যবহার করা হয় তো খুব ভুল হবে না। জাপান আর চীনে ট-বর্গ নেই। মধ্যিখানে তিব্বত ট-বর্গের দেশ এসে যায়। তারপর মধ্য-এশিয়ার তুর্কি-ফারসী তথা রুশের সব ভাষা, পূর্ব-ইউরোপের ভাষা, এইভাবে গ্রিস, ইটালি, পর্তুগাল, স্পেন আর ফ্রান্সই শুধু নয়, বরং জার্মানির অর্ধেক ভাষাও ট-বর্গ শূন্য। ইংবিজিতে ট-বর্গ অবশ্যই আছে। জার্মান ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ভাষাও ট-বর্গবহুল। ভারতে আর্যদের ভাষা নিজেদের কুলধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে ট-বর্গবহুল হয়ে গেছে। ট-বর্গ দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য। আমার মনে আছে, বম্বেতে ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেদের সমাগম ছিল, যাতে তারা নিজেদের জায়গার গান গেয়ে শুনিয়েছিল। ওখানে হিন্দি ভাষাভাষী অনেকে ছিল। লোকেরা অন্য প্রদেশের গান খুব ভালো বাসার সঙ্গে শুনছিল, কিন্তু যখন এক তেলুগু তরুণ নিজের ভাষায় গাইতে শুরু করল, তখন খুব তাড়াতাড়ি লোকেরা অনিচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করল। আমি ওদের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। বলল, 'আমরা বুঝি না।' আমি বললাম, 'এক্ষুণি আসামী গান যা আপনারা মন দিয়ে শুনলেন সেগুলো কি

আপনারা বুঝেছেন?' আসলে ট-বর্গের প্রাচুর্যই ওদের এই অনিচ্ছার কারণ ছিল। এক দক্ষিণী তরুণ বেনারসে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় তেলুগু ভাষায় তাঁর নিজের নতুন লেখা কবিতা শোনানোর কথা বলছিলেন। আমি বললাম, 'আপনারা লোকেদের অনিচ্ছা কেমন করে থামালেন?' তিনি বললেন, 'আমি তেলুগুর সেই শব্দগুলোই বেছে ছিলাম যেগুলোর বেশিরভাগ সংস্কৃত আর যার মধ্যে ট-বর্গের শব্দ ছিল না।'

রুশরা যদি ট-বর্গের উচ্চারণ করতে না পারে, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু মুশকিল হলো যে ওরা হ্রস্ব-দীর্ঘর বিস্তার রাখে না। অনেক বর্ণমালার মত রুশ বর্ণমালায় হ্রস্ব-দীর্ঘর জন্য আলাদা সংকেত নেই, আর হ্রস্ব-স্বরকেও ইচ্ছানুসারে দীর্ঘও পড়া যায়, তাই 'গঙ্গা'কে ওর 'গাঙ্গ' পড়তো। প্রথম বর্ষের ছাত্রদের উচ্চারণ শেখাতে আমাকে কখনো কখনো যেতে হতো। হ্রস্ব-দীর্ঘর বিচার না করতে দেখে আমি ওদের বলেছিলাম, 'দেবনাগরী বর্ণমালায় দীর্ঘ-র জন্য আলাদা সংকেত আছে। তাও কেন ভুল কর?'

দেখলাম সাইবেরিয়ার সবচেয়ে বড় জাতি (স্কিমো জাতিগুলোর একটা) নেনেৎস্ক-এর দুটি মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে তৃতীয় বর্ষে পড়ছিল। আমি ভাবলাম মোঙ্গল বা কাজাক হবে। আসল কথা জানতে পারলে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না, যে সোভিয়েত কত তাড়াতাড়ি অক্ষর জ্ঞান-শূন্য সবচেয়ে পেছনে পড়ে থাকা জাতিদের এতটা এগিয়ে দিয়েছে। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় ছিল। বিপ্লবের পর নেনেৎস্ক আর অন্য অলিখিত ভাষাগুলোকেই শিক্ষার মাধ্যম বানানো হয়েছে। তখন এই সব জাতিদের মধ্যে কেউ লেখাপড়া করেনি আর কোনো লিপিও ছিল না। সেই সময় এই কাজ নিশ্চয়ই কঠিন মনে হয়েছিল কিন্তু আজ তো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে বেরোনো বহু ছেলে-মেয়ে সেখানে পৌঁছে গেছে। এই জাতিরা শুদ্ধ মোঙ্গল। কেননা এদের দেশে অন্য জাতিদের আসা-যাওয়া হয়নি, তার জন্য এদের রক্ত সংমিশ্রণ থেকে বেঁচেছিল। শুদ্ধ মোঙ্গল জাতিদের মুখ শরীরের থেকে বেশি ভারি আর চওড়া হয়, চোখ ও ভুরু কিছুটা বাঁকা আর গালের হাড় বেশ ওঠানো থাকে। পুরুষদের দাড়ি-গোঁফ খুব কম হয়।

২০ নভেম্বরে নেবা জমে আছে দেখে খুব আনন্দ হলো, কেননা এখন আমরা ঘুরে পুল পার হবার জায়গায় সামনের নদী পার করে ট্রাম ধরতে পারব। কিন্তু এই আনন্দ চিরস্থায়ী হলো না। নেবা অনেক দিন অব্দি লুকোচুরি খেলতে থাকলো। এখন অকালেই ওর এই ঘুম পেয়েছিল।

আমার পছন্দের ফিল্মের মধ্যে আধুনিক মোঙ্গলিয়ার ফিল্মও ছিল। ২১ তারিখে 'মোঙ্গলিয়া পুত্র' ফিল্ম দেখতে পেলাম। ফিল্ম নির্মাতাদের মধ্যে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞও ছিল। কিন্তু অভিনেতা আর অভিনেত্রীরা ছিল সব মোঙ্গল। গল্প ছিল—উলানবাটোরে এক ড্রাইভার-যুবক কোনো এক যুবতীর প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু তাকে প্রেম নিবেদন করার জন্য আরো দুজন যুবক ছিল। বেচারা ড্রাইভার ব্যর্থ হলো। সে ওখান থেকে পালিয়ে ভিতর—মোঙ্গলিয়ায় চলে গেল, যেখানে সে-সময় জাপানীদের শাসন ছিল—ভিতর মোঙ্গলিয়াকে মাঞ্চুরিয়ার অংশ বলে ধরা হতো। জাপানীদের জুলুম আর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যুবক ব্যক্তিগত বাহাদুরিও দেখাল, কিন্তু

এতেই জাপানীদের জোয়াল কি হঠানো সম্ভব? শেষে সে ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ফের উলানবাটোরে চলে যেতে বাধ্য হয়। চেঙ্গিস খাঁন এবং তার আগে থেকেই বীরত্ব আর বাহাদুরির টুর্নামেন্ট মোঙ্গলদের মধ্যে হতো। যুবক তাতে যোগ দিল এবং মোঙ্গলিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানকে মাটিতে শুইয়ে দিল। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানকে তার প্রেমিকা এখন কি করে তিরস্কৃত করতে পারে? দুজনের আবার মিলন ঘটলো। জনতা তাদের স্বাগত জানালো। আগের মোঙ্গল ফিল্‌মের মত এই ফিল্‌মে সংলাপ রুশ ভাষায় ছিল না, মোঙ্গল ভাষাতেই ছিল, তাই বার্তালাপ বুঝতে পারিনি। কুস্তি, দর্শকবৃন্দ ইত্যাদি দৃশ্য খুবই সুন্দর ছিল।

ভারতে এশীয় সম্মেলন হতে যাচ্ছিল, যার জন্য রাশিয়ারও কিছু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। আশা করা হচ্ছিল যে অকাদেমিক বরান্নিকোফ যাবেন। ওঁর ইচ্ছেও ছিল। যে দেশের অতীত আর বর্তমান সাহিত্যর অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেই তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে সেই দেশকে তিনি এখনো একবারও দেখেননি। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তাররা নিষেধ করেছিলেন এবং তিনি যেতে পারেননি।

২৬ নভেম্বর এক মিশর-প্রবাসী রুশ বিদ্বানের চিঠি এলো। তাঁর পিতা বিপ্লবের আগে ক্যাখতায় (বুরিয়ত, সাইবেরিয়া) মদের কারখানার মালিক ও ধনী মানুষ ছিলেন। ছেলে কাহিরায় ১৬ বছর ধরে বসবাস করছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সুদানের রাজকুমারীকে বিয়েও করেছিলেন, যার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'হয়তো পূর্বজন্মেও এ আমার সহযাত্রিণী ছিল।' পূর্বজন্ম বলতেই আমি বুঝে গেলাম যে ইসলামের প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগ নেই। যদিও তিনি বহুদিন যাবৎ একটি মুসলমান দেশে মুসলমান হয়ে বাস করছিলেন। তিনি কারো কাছ থেকে আমার কথা জানতে পেরেছিলেন, তাই চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন যে অনুবাদ ছাড়া পালি আর বৌদ্ধ ধর্ম তিনি কি ভাবে পড়তে পারবেন। আমি স্বয়ং তাঁকে পালি পড়ার নিয়ম লিখে দিলাম এবং বৌদ্ধ-ধর্মের পরিচয়ের জন্য কিছু দরকারি ইংরেজি বই-এর নামও দিয়ে দিলাম।

সোভিয়েতে যখন সাধারণ লোকেদের সুখ আর নিশ্চিন্ততার স্তরকে দেখি, তখন বলতেই হয় যে দুনিয়ায় আমেরিকার মত অত্যন্ত ধনী দেশেও এত ভালোভাবে লোকেরা নেই। আমেরিকায় সব সময় লক্ষ লক্ষ লোক বেকার থাকে। বেকারের মানে হলো, প্রত্যেকটা শস্য-দানার জন্য ব্যাকুল হওয়া। রাশিয়ায় না কেউ বেকার আছে, আর না প্রত্যেকটা শস্য-দানার জন্য কারো ব্যাকুল হবার প্রয়োজন আছে। গরিবিয়ানার ওখানে অত্যন্ত অভাব। হ্যাঁ, বেতন আর রোজগার সবার একরকম নয়, কিন্তু ন্যূনতম বেতনভোগীদেরও খাওয়া-পরা আর থাকা ইত্যাদির চিন্তা করতে হয় না। মানুষ নিজের বর্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। থাকা উচিতও না। নিজের পূর্ব-স্থিতির সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায় তারা, বিশেষ করে যদি তা দুঃখ আর দারিদ্রের হয়। যে লোক নিজে নিজেই বোকামি করে বসে, তাকে তো কষ্ট সইতেই হয়। আমাদের ওপরের ঘরে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ছিল, যে কয়েকটি বাচ্চার মা সে কোনো কাজ করতে চাইছিল না। তাহলে রেশনকার্ড তো বন্ধ হবারই কথা। শেষে ২৭ নভেম্বরের রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে মারা গেল।

মানিয়া সেই দিন বলছিল, 'আমি আজ স্বপ্নে বড় শিংওলা চোর্ত (শয়তান) দেখেছি।' আমি লোলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মানিয়া তো চোর্ত দেখেছে আর তুমি?' লোলা বলল, 'আমি কিছু দেখিনি।' আমি বললাম, 'না ভগবানকে দেখেছো, না চোর্তকে, তাহলে খ্রীস্টান ধর্মে এতো ভক্তির কি ফল?'

লোলা তার ইগরকে পুরো ধার্মিক খ্রীস্টান বানানোর চেষ্টা করছিল। তাকে ত্রিমূর্তির (পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা) নাম নিয়ে ক্রস বানানোও শিখিয়েছিল। ভগবানের প্রতি ইগরের কিছু বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল। কখনো সে নিজের প্রার্থনায় বলত, 'হে বোজিঙ্কা (ভগবান) এরকম কর, যেন আমার মা চেঁচামেচি করা ছেড়ে দেয়।' কিন্তু ভগবান ওর প্রার্থনা শুনছিল না। এখন আমি ভারত যাওয়া ঠিক করে ফেলেছিলাম, তাই কখনো কখনো বোজিঙ্কার প্রার্থনায় আমার ভারতে না যাবার বরদানও জুড়ে দিত। এই ভগবান-ভক্তির একটা প্রভাব তো তক্ষুণি দেখা গেলো—সে অন্ধকার ঘরে পা ফেলছিল না। যখন ভগবানের মতো মহান জিনিস না দেখে থাকতে পারছে, তখন নিশ্চয় চোর্ত (শয়তান) কোথাও অন্ধকারেই লুকিয়ে আছে। বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা তখুনি হলো, যখন প্রতিবেশী তোসিয়ার ছ মাসের বাচ্চার (কোলিয়া) হাতে সে আলপিন দিয়ে ফুটো করার চেষ্টা করল। সে ওই বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসতো, নিজের হাতে খাওয়াতো, তাই বুঝতে পারলাম না যে আলপিন দিয়ে ওর হাত কেন ফুটো করতে চাইছিল। পরে জানলাম আমাদের শোবার ঘরে যিশু খ্রীস্টের মূর্তি রাখা ছিল, যার হাতে রক্ত লেগেছিল। কি জানি ও আসলে জানতো কিনা যে যিশু খ্রীস্টের মাথা-পা আর দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে পেরেক মেরে কাঠের তক্তায় আটকে দেওয়া হয়েছিল, তাই সেখান থেকে নামানোর পর হাতে রক্তের দাগ ছিল। ইগরের মাথায় এই চিন্তা এলো, যে ওই ছোট মিশকাকেও যিশু খ্রীস্টের রূপ দেওয়া হোক। এই সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে মিশকার হাতের তালুতে আলপিন ফোটাতে চাইল। আমি লোলাকে বললাম, 'নাও আরো ধর্মের কথা বাচ্চাকে শেখাও।' সেও বলল, 'হ্যাঁ, এতো এখন শুধু হাতেই আলপিন ফোটাতে চাইছিল, যদি মাথায় কোনো মর্মস্থানে ফুটিয়ে দিত!' কিন্তু তার অর্থ এই নয়, যে ইগরের ধর্ম-শিক্ষা কিছু কমানো হলো।

পয়লা ডিসেম্বরের সকালের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে চলে গিয়েছিল আর দিনের বেলায় বরফও পড়ল। আমাদের মত আরো অনেক লোক বলতে লাগলো—যাক, কাদার হাত থেকে প্রাণ বেঁচেছে। কিন্তু পরের দিনই বরফ গলতেও শুরু করেছিল। ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁয়ে পড়তে লাগল।

এমনিতে গরিব আর বেকার না থাকার কারণে রাশিয়ায় ভিখিরি থাকার কথা নয়, কিন্তু ভিখিরির জন্মদাতা শুধু বেকারী নয়; কুঁড়েরাও ভিক্ষে করতে পারে। নিয়ম-কানুনের ভয়ে তারা লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজেদের পেশা চালাত। অনেকের কাছে সেটা ছিল ভালো একটা পেশা। পয়লা ডিসেম্বরে একজন খুবই বুড়ি ভিখিরি আমাদের জানলার ধারে এলো। ওর চোখ ভেতরে ঢোকানো ছিল। কোমরে ভাঁজ ছিল। এরকম মূর্তি দেখে কার না দয়া হবে? লোলা এক টুকরো রুটি আর মাছ দিল। বুড়ি সফল

হলো। আজকালের রেশনের কড়াকড়ির দিনে এত দয়ালু কোথাও পাওয়া যাবে? সে খুব আশীর্বাদ দিল, 'ভগবানের মাতা তোমায় রক্ষা করুক, তুমি ফুলে-ফলে ভরে ওঠো।' মানিয়া বলল, 'ওর স্বামী যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকে, তার মা-ও ভিখিরি আর সারাদিনে রুটি, আলু ইত্যাদি এত চেয়ে আনে, যে তিনটে প্রাণীর খাওয়া-দাওয়ার কোনো চিন্তা থাকে না।'

৪ ডিসেম্বরে এখন বরফ আর কাদা পালা করে করে আসছিল যাচ্ছিল। সেই দিন রাতে বরফ পড়ল, সকালেও পড়তে থাকলো। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি ছিল। সন্ধে অব্দি অনেকটা বরফ গলে গেল, ফের কাঁচা রাস্তায় কাদা উথলে পড়ছিল। কিছুদিন ধরে সূর্যের দর্শন মেলেনি, পরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাপমাত্রা এত উঁচু কেন? এই গরমের কারণ সূর্য বাদে অন্যত্র খুঁজতে হবে।

যদি লেখাপড়ার জিনিস চট করে ভারতে পাঠানো আর ছাপানোর ব্যবস্থা থাকত, তাহলে হয়তো আমার মন এতো তাড়াতাড়ি উচাটন হতো না, কিন্তু চিঠির এমন অবস্থা ছিল যে অর্ধেকও যদি পৌঁছে যায়, তাহলে আমি তার জন্য ধন্যবাদ দিতাম। নিরালা, রবীন্দ্র আর প্রেমচন্দের ওপর আমি তিনটে প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটারই ছাপার খবর পেয়েছিলাম। এই অবস্থায় আমি বহু মাস আর বছর ধরে লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপিগুলোকে ডাকের দায়িত্বে কি করে ছেড়ে দিই?

প্রথমে রাত্রি ছোটো হয়ে শূন্যে পৌঁছল। এখন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিন ছোটো হতে হতে ৬ ঘণ্টার হয়ে গিয়েছিল, যদিও সন্ধিক্ষণের একটু সময় অব্দি লাল কিরণ, লাল আভা দেখাতো। নেবার এখন ঘুমিয়ে পড়ার নামই ছিল না। প্রথমে সূর্য দেখা না গেলেও তাপমাত্রা উঁচুতে উঠে কাদা ছেটালো। ৮ তারিখে সূর্যকে খুব দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তাপমাত্রা নীচে নেমে কাদাকে বরফ বানিয়ে দিল। ৯ ডিসেম্বরেও সূর্য সারাদিন মেঘহীন আকাশে ফুটেছিল, কিন্তু তাপমাত্রা হিমাঙ্ক থেকে বেশ নীচে ছিল। ১০ তারিখ শীত খুব ছিল, কিন্তু বরফের নাম ছিল না, নেবাও নিজের ঢিমে চালে চলছিল। আজ ইউনিভার্সিটিতে রবীন্দ্র-দিবস পালন করা হলো। লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটিতে প্রেমচন্দ-দিবস আর রবীন্দ্র-দিবস পালন করার পরিপাটি চলছিল। যদিও প্রাচ্য বিভাগের অধ্যাপক আর ছাত্ররাই একে বেশি পালন করে, কিন্তু উৎসবে অংশগ্রহণ করতে সব বিভাগ থেকেই আসে। হলের সব চেয়ার সেদিন ভরা ছিল। লোকেরা চার ঘণ্টা অব্দি ভাষণ শুনল। বরান্নিকোফ কবির জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করলেন। আমাদের অর্থশাস্ত্র আর রাজনীতির অধ্যাপক বন্ধু সুলেকিন রবীন্দ্রনাথের সময়ের সামাজিক আর আর্থিক কাঠামোর সিংহাবলোকন[১] করালেন আর রবীন্দ্রনাথের মানবতা প্রেম তথা প্রগতিশীলতার প্রশংসা করলেন। ভেরা নাভীকোভা 'রুশ ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য'-র ওপর একটা সুন্দর প্রবন্ধ পড়লেন। তারপর রবীন্দ্র-মহিমার ওপর আমি নিজের লেখা

[১] সিংহ যেমন শিকারে গমনকালে বারংবার সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে, তেমনি পূর্বকৃতির পর্যালোচনা করতে করতে অগ্রসর হওয়া।—স·ম

হিন্দিতে পড়লাম, যার রুশ অনুবাদ দীনা মার্কোভ্না পড়ে শোনাল। এটা জানাই ছিল, যে ইংরেজিতে নিজের লেখা পড়লে তা রুশ অনুবাদের দ্বারাই শ্রোতাদের কাছে পৌঁছনো যেত, তাই এরকম দ্রবিণ-প্রাণায়মের কি দরকার ছিল। বেতারের এক মহিলা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পকে নাটকীয় ঢঙে রুশ ভাষায় পড়লেন, যা শুনে লোকদের মনোরঞ্জন হলো। সমস্ত অনুষ্ঠানের ফিল্ম তোলা হয়েছিল। ইউনিভার্সিটির নিজের ফটো স্টুডিও আছে। জয়ন্তী খুব ভালোভাবে উদ্‌যাপিত হলো। কিন্তু ভারতে যে নতুন রাজনীতিক পরিবর্তন হ্যলে হয়েছে, তার গুরুত্বকে স্বীকার করতে সেখানকার লোকেরা রাজি ছিল না। হ্যাঁ, ভারতের গুরুত্বকে তারা ভালোভাবে স্বীকার করত, যার প্রমাণ ছিল এই উৎসব।

১৩ ডিসেম্বরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের থেকে ১৪° আর ১৪ ডিসেম্বরে ১৬° সেন্টিগ্রেড নীচে চলে গিয়েছিল। নেবা এখন অব্দি বড্ড বেশি ঠমক করছিল, কিন্তু আজ তাকে জবরদস্তি ঘুমিয়ে পড়তে হলো। ১৮ তারিখের মোটা বরফ দেখে মনে হলো, যে এখন সাধারণ শীতকাল শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু পরের দিনই তাপমাত্রা ওপরে উঠল আর নেবস্কীর রাজপথের বরফ গলে গেল। নেবাও ফের জেগে উঠল। তার জল বয়ে যেতে দেখা গেল। বাড়িতে আমাদের কন্ট্রোল অফিসের ঘরেই ছেলেরা জমা হয়েছিল। ইগরও দেখতে ছুটল। কিন্তু ওর মা হায়-হায় করছিল, কেননা ছেলে সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে চলে গেল, সে আবার ওদের সঙ্গে গুণ্ডা না হয়ে যায়।

২০ ডিসেম্বর এসে গেল। ৫ দিন বাদেই ক্রিসমাস (বড়দিন) হবে। এ বছর বরফের যেরকম অভাব দেখা গেল, তাতে লোকেরা ভয় পাচ্ছিল, যে এ বছর কালো-ক্রিসমাস আর কালো নববর্ষ না দেখতে হয়। ২২ তারিখ কালো ক্রিসমসের সম্ভাবনা আরো বেশি করে দেখা দিল। বরফ খুব কমই চোখে পড়ছিল। শহরের ভেতরে তো তার পুরোপুরি অভাব ছিল। সাড়ে তিনটে পর্যন্ত সূর্যের কিরণ দেখা যাচ্ছিল। ২৪ তারিখে ক্রিসমাসের সন্ধে উপস্থিত। লোলা উৎসবের বিশেষ তোড়জোড় করল। খাবার ঘরে দেবদারু শাখা সাজানো হলো। বন্ধুদের কাছে ক্রিসমাসের উপহারও পাঠানো হলো। ২৫ তারিখের সকালও উপস্থিত। শীত খুব কিন্তু বরফের অভাব, তাই এবার কালো ক্রিসমাসই দেখতে হলো। সরকারি উৎসব না হওয়ায় আজ কাজের ছুটি ছিল না। কিন্তু লোকেরা নিজেদের উৎসবকে ভালোরকমে উদ্‌যাপন করল। গির্জায় প্রসাদের জন্য খাবার তৈরি করে ভোগ দিতে যারা গিয়েছিল, তাদের দু-ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হলো। কে বলে যে বলশেভিকরা রাশিয়া থেকে ধর্ম উঠিয়ে দিয়েছে? লেনিনগ্রাদের গির্জায় ক্রিসমাসেই নয়, রোববারেও এমনি ভিড় থাকতো, যা অন্যান্য দেশে দেখা যেত না।

২৬ ডিসেম্বরে সপ্তদশ শতাব্দীর উক্রেনের নেতা 'বগদান খ্মেলিৎস্কী' ফিল্ম দেখতে গেলাম। ঐতিহাসিক ফিল্ম বা নাটক ইতিহাসপ্রেমিদের জন্য স্বয়ং এক জ্ঞান-বর্ধক পাঠশালার কাজ দেয়। বগদানের মানে হলো ভগবান দত্ত। 'বগ' ভগবান আর 'দান' দত্ত বা দীন-এর রুশ সমার্থবোধক শব্দ। কিন্তু উক্রেনের নেতা নিজের নামানুসারে কোনো ভগবানের ভক্ত নয়, বরং সে এক দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিল। বোলোরুশ আর উক্রেনী

বস্তুত রুশ ভাষারই কথা, কিন্তু এখন তিনটেই স্বাধীন সাহিত্যিক ভাষা বলে ধরা হয়। রুশ শাসক-জাতি ছিল, তাই বিপ্লবের আগে উক্রেনী আর বোলোরুশি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বকে চাইছিল। বিপ্লবের পর তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। যেখানে জার-শাসনের অদূরদর্শিতার কারণে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ অব্দি উক্রেন স্বাধীন হতে চাইছিল সেখানে আজ থেকে প্রায় তিন শতাব্দী আগে এই উক্রেনের দূরদর্শী নেতা বুঝে গিয়েছিল, যে রাশিয়ার সঙ্গে থাকার মধ্যেই উক্রেনের হিত। সে সময় উক্রেন রাশিয়ার অধীন ছিল না। তার প্রতিবেশীদের মধ্যে একদিকে পোল্যান্ডের শাসকরা তাকে দাবিয়ে রাখতে তৈরি ছিল, আর অন্যদিকে ক্রিমিয়ার তাতার ওদের 'দুর্বল বৌ সমস্ত গ্রামের বৌদি' বানিয়ে রেখে ছিল।

সেই সময়ের উক্রেনের লোকেরা মাথায় হিন্দুদের মত লম্বা বিনুনি বাঁধত। প্রথম রুশ রাজারও (যে দশম শতাব্দীতে বাইজেনটাইনের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছেছিল) মাথা কামানো আর মধ্যিখান থেকে হিন্দুদের মত টিকি ছিল। জানি না কেমন করে হিন্দুদের এই জিনিস উক্রেন পৌঁছল, তাদের টিকি হিন্দুদের কাছে পৌঁছল। হিন্দুদের মধ্যেও আগে মাথাভর্তি চুল রাখা প্রথা ছিল, যা পূজা-পার্বণের সময় এলোমেলো যাতে না হয় তার জন্যে বেঁধে রাখতে হতো। এইভাবে টিকি-বন্ধন ধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। যখন টিকিতে লোকেদের অরুচি হয়ে গেল অর্থাৎ ফ্যাশান বদলে গেল, তখন ধর্মের চাহিদা টিকি-বন্ধনকে পুরো করতে চুলের বেশির ভাগকে রেখে ছেড়ে চলে গেল। টিকির এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের দেশে আর উক্রেনে একরকম ছিল। কিন্তু খ্রীস্টান হয়ে যাবার পরও টিকি রাখা কেন আবশ্যক বলে মনে করা হলো? হয়তো এতে খ্রীস্টানদের মুসলমানদের মতো অসহিষ্ণু না হওয়াই কারণ ছিল। বগদানকে যদি আকবর, জাহাঙ্গীরের সময় কেউ দেখত, তাহলে রঙের কারণে হয়তো সন্দেহ হতো, কিন্তু টিকি তাকে অবশ্যই বলে দিত যে সে হিন্দু। পোল, তাতার আর উক্রেনরা কিরকম বেশভূষা আর রীতি-রেওয়াজ পালন করত, এই ফিল্ম থেকে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতো। সব দৃশ্য আর জিনিসকে ব্যাপক পরিমাপে দেখিয়েছে। বগদান পোলদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের দেশকে স্বাধীন করতে সফল হলো। অনেকগুলো যুদ্ধে নিজের সফল বীর নেতাকে দরবারের লোকেরা স্বাধীন করতে চাইল আর তাকে পদোচিত পরিচ্ছদ এনে পরালো। বগদান সেই পরিচ্ছদ সেখানেই ছিঁড়ে ফেলে দিল এবং বলল যে উক্রেনের স্বাধীনতা রক্ষার গ্যারান্টি নিজের ভাই রুশদের সঙ্গে থাকার মধ্যেই আছে।

২৯ ডিসেম্বরে এক ব্যালে 'বখশীকা সরায় ফৌবারা' দেখলাম। এও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছিল। সেই সময় পোল সামন্ত দক্ষিণ রাশিয়ার ওপর স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছিল। ক্রিমিয়ার তাতার খান দক্ষিণ থেকে আক্রমণ করছিল। কিন্তু উক্রেনের স্বাধীনতা প্রেমিকরা নিজেদের তলোয়ার রেখে দিতে রাজি ছিল না। তাতারদের আক্রমণে তরুণ নায়ক মারা গেল আর তার প্রেমিকাকে খান ধরে নিয়ে গেল। তরুণীর সামনে খানের হারেমের সমস্ত সুন্দরীদের ফ্যাকাশে দেখালো। ঈর্ষার

জ্বালায় খানের পাটরানী (শাহবেগম) তাকে লোক দিয়ে মেরে ফেলল। খান শাহবেগমকে জলে ডুবিয়ে নিজের কপাল ঠুকতে থাকল। ব্যালের সৌন্দর্য হলো দেশ-কাল অনুযায়ী পর্দা, বেশভূষা আর উৎকৃষ্ট নৃত্য, এসবই এই ব্যালেতে ছিল। নাট্যশালায় হাজারের কম দর্শক ছিল না আর টিকিট ছিল পঁচিশ-তিরিশ রুবল। এত দামী জিনিস সামন্তবাদ অথবা সাম্যবাদই প্রস্তুত করতে পারে, তা পুঁজিবাদীদের পক্ষে সম্ভব না। পুঁজিবাদী দেশে তো সিনেমা আসতেই নাট্যশালাগুলোর ওপর বজ্রাঘাত হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বরে সোভিয়েত শিশুদের উৎসব পালন করা হয়। তার পরের দিন পয়লা জানুয়ারির নববর্ষের উৎসব সব লোকদের জন্য। আমাদের বাড়িতে দুটো দেবদারু শাখা আগেই নিয়ে এসে দাঁড় করানো হয়েছিল। লোলার নজরে পড়লো, আরেকটা ভালো শাখা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সে সেটাও কিনে আনল। এখন ছোট্ট খাবার ঘর দেবদারু বনের রূপ নিয়ে বসেছিল। ইগরের স্কুল আর শিশু-উদ্যানের বন্ধু ছেলে-মেয়েরাও এসে দেবদারু শাখার বাহার দেখে মিষ্টিও খেয়ে গিয়েছিল। ওদের গান আর নৃত্যের কিছু আনন্দ আমরাও পেয়েছিলাম।

আজ ফের এক বছর শেষ হচ্ছিল। আমি কাজ কি করেছি? মধ্য-এশিয়ার জন্য কিছু বই পড়ে সামগ্রী অবশ্যই জমা করেছিলাম। নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কিছু বই ও জমিয়ে ছিলাম, কিন্তু লেখা প্রায় হয়নি বললেই চলে।

১৯৪৭-এর আরম্ভ

পয়লা জানুয়ারি বুধবার দিন পড়ল। আজকে অল্প বরফ দেখা গেল। শীতও ছিল। অতিথিদের আশায় খাবার তৈরি করা হলো, কিন্তু অতিথি কেউ নিমন্ত্রিত ছিল না। উৎসবের দিন দেখা-সাক্ষাৎ করতে লোক আসতেই থাকে। এই মনে করেই তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে যারা তারা অধিকাংশ ইউনিভার্সিটির আশেপাশেই থাকে। ৫মাইল ট্রামে ধাক্কা খেতে খেতে আসা সবার পোষাতো না। দেবদারুর প্রদর্শন শুধু বাড়িতেই ছিল না, বরং শিশু-উদ্যান আর স্কুলে তা আরো ধুমধাম করে সাজানো হয়েছিল। ইগরের স্কুলেও বুড়ো দেবদারুর শাখা সাজানো হয়েছিল। ২ জানুয়ারি ইগর তা মায়ের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল। ও দুটো করে আপেল আর একটা কমলালেবু পেল, যার মানে হলো, স্কুলের সমস্ত ছেলেরাই দুটো করে আপেল আর একটা কমলা পেয়ে থাকবে। শুধু ইগরের স্কুলের কেন, আর লেনিনগ্রাদ নগরের কেন—সমস্ত সোভিয়েতের স্কুলের বাচ্চাদের দুটো আপেল আর একটা করে কমলালেবু জাতীয় কিছু অবশ্যই পেয়ে থাকবে।

ইগর এখন রোজ স্কুলে যেতো। হোক না সে তার সহপাঠীদের থেকে আট-দশ

মাসের বড়, কিন্তু ও নিজেকে ছেলে নয় পুরুষ মনে করতো। তার ক্লাসের চাচী (শিক্ষিকা)-র তো স্নেহের পাত্র সে ছিলই, তবে ছেলেদের খেলার সময় সে খুব কমই অন্য কোনো শিক্ষিকার সঙ্গে হাঁটতো। একদিন তার শিক্ষিকা তাকে ঠাট্টা করে বলল, 'যদি ওকেই পছন্দ, তাহলে বল ওর ক্লাসেই পাঠিয়ে দিই।'

ইগর খুব গাম্ভীর্য নিয়ে জবাব দিল, 'না তার দরকার নেই। তরুণী বেশি সুন্দর তাই তার সঙ্গে হাঁটতে যাচ্ছি।'

২ জানুয়ারিতে তাপমাত্রা হিমাঙ্ক থেকে ৮০° নীচে চলে গেছে অর্থাৎ ফারেন হাইটে নিলে হিমাঙ্ক থেকে ৩০°-৩২° নীচে ছিল। আমার এমন কিছু শীত মনে হচ্ছিল না। শরীর তো গরম কাপড়ে ঢেকেই রাখতে হতো। শীতের টের পাওয়া যেতো কান দিয়ে। যখন আমি কান খুলেই বাইরে যেতে পারতাম, তার মানে, শীত বেশি ছিল না। পরের দিন তাপমাত্রা ২০° (হিমাঙ্ক ৩৫-৩৬° ফারেহাইট) নীচে চলে গিয়েছিল। কাশ্মীর মাত্র ৯° নীচে গিয়েছিল,যখন সেখানে ৬০ ইঞ্চি বরফ পড়েছিল, এটা রেডিও বলছিল। লেনিনগ্রাদের এতো শীতে বরফ খুব কমই চোখে পড়ছিল। সেইদিন ভারতের এক প্রকাশকের চিঠি এলো। জানতে পারলাম যে বড় বড় ক্রোড়পতি শেঠরা ৫০ লাখ পুঁজি দিয়ে এক কোম্পানি খুলেছে, যার উদ্দেশ্য হলো হিন্দিরও ভালো ভালো গ্রন্থ প্রকাশ করা। ওদের তরফ থেকে আমার কাছে চিঠি এলো—'আমরা ১৫ শতাংশ রয়াল্টি দেব।' আমি ডাইরেক্টরদের নামগুলো দেখলাম। তাদের মধ্যে কিছু ক্রোড়পতি শেঠ ছিল আর কিছু বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রী। পরামর্শ দেবার জন্য বোর্ডে ৩৮ জন লোক ছিল, যাদের মধ্যে খুব কষ্ট করে ১১ জনকেই বলা যেত যে সে সাহিত্য আর লেখালিখির সঙ্গে যুক্ত। পাঁচটি প্রদেশের মন্ত্রী এই সব পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিল। এই লোকেরাই কি আমাদের বই-এর মূল্যায়ণ করবে! যাহোক, মিথ্যে হোক বা সত্যি হোক, আশান্বিত হলাম, যে এখন ক্রোড়পতিদের টাকা সাহিত্যে প্রকাশনেও এগিয়ে আসছে। ভারতীয় মন্ত্রী-সভা স্থাপিত হওয়ার অবশ্যই এটা একটা ফল।

৬ জানুয়ারি এখন বরফ নেই বলে অভিযোগ করা হচ্ছিল। এখন চারদিনের জন্য স্কোলিন্‌কোং-এর ছুটি ছিল, তাই ইগরও বাড়ি ছিল। আজ ওকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সোভিয়েত ফিল্‌ম 'পাষণ পুষ্প' দেখাতে নিয়ে গেলাম। আমাদের পাড়ার সিনেমা হলেই ফিল্‌মটা এসেছিল, টিকিট ছিল ১ রুবল। সিনেমা হলে খুব ভিড় ছিল। সব মায়েরা তাদের ছেলেদের সঙ্গে সেখানে পৌঁছেছিল। ফিল্‌ম উরাল পর্বতের এক লোক-কাহিনী নিয়ে বানানো। সামন্ত দ্বারা নির্যাতিত বৃদ্ধ প্রস্তর শিল্পী (শঙ্গতরাশ) রঙ-বেরঙের পাথরের শিল্পকৃতি নির্মাণ করছিল। ওর দত্তক পুত্র আরো প্রভাবশালী ছিল। বাঁশি বাজাতেও সে অদ্বিতীয় ছিল। তরুণের মন উরালের একটি তরুণীর মোহে পড়েছিল। দুজনের বিয়ে হলো। পুরনো দিনের পোশাক, পুরনো সময়ের নৃত্য আর পুরনো সময়ের বৈবাহিক রীতি-রেওয়াজ দেখানো হলো, যা এশিয়ার সঙ্গে অনেকটাই মেলে। শিল্পী তরুণকে বনদেবী পাষাণ পুষ্পের লোভ দেখিয়ে পাহাড়ের ভেতরে নিয়ে যায়। সেখানে নানা রঙের চকমকে পাথরের অনেক রকম পুষ্প বানানো

ছিল। শিল্পী স্বয়ং ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে সেখানেই এমন এক বিশাল পুষ্প বানায় যে তার সৌন্দর্য বনদেবীর দেখানো ফুলের চাইতে কম নয়। শেষে দুজন প্রেমিকের মিলন হলো—এই ফিল্‌ম ভারতেও এসে গেছে।

৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধ-পক্ষ চলছিল। অধ্যাপকরা নিজের নিজের বিষয়ের ওপর জ্ঞানপূর্ণ নিবন্ধ পড়ছিলেন, যা শুনতে অনেক শ্রোতা-প্রফেসর আর ছাত্র জড়ো হতো। অকাদেমিক বরান্নিকোফ তুলসী দাসের কবিতার ওপর একটা নিবন্ধ পড়লেন, যা সবাই খুব পছন্দ করল। প্রফেসর ফ্রাইমান আর অন্যান্য বিদ্বানরাও তাঁদের নিবন্ধ পড়লেন। যেখানে সাড়ে তিন হাজার অধ্যাপক সেখানে নিবন্ধ শুনতে সবার জড়ো হওয়া সম্ভব নয়। তাও সবার কাছে নিবন্ধাবলীর সঙ্কেত পৌছনোর পুরো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইউনিভার্সিটির নিজের একটা পত্রিকা ছিল, যাতে সঙ্কেত পাওয়া যেত এ ছাড়া পনেরা দিনের নিবন্ধগুলোর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে একটি ছোট পুস্তিকা বার করা হলো।

১২ জানুয়ারি বোম্বাই-এর ডাক্তার সুফী কারো কাছ থেকে আমার ঠিকানা নিয়ে লিখল যে হমদানী সন্তের কবরের ফটো পাঠাতে। সে সোভিয়েতের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থাগুলোকে অনেক চিঠি দিয়েছে, কিন্তু জবাব পায়নি। হমদানির কবর তাজিকিস্তানের খুত্তল প্রদেশে আছে, কিন্তু ছবি পাওয়া আমার পক্ষেও অতো সোজা হবে বলে মনে হয়নি, তাও আমি স্তালিনগ্রাদের ইউনিভার্সিটিকে চিঠি লিখে দিলাম। চিঠির উত্তর না দেওয়া এখানকার লোকেদের স্বভাব। বিশেষ করে অপরিচিত লোকের কাছে পত্রের উত্তর পাবার আশা কম রাখা ভালো। যার পুস্তক বা ছবি চেয়ে পাঠায়, তাদের তো আরো অসুবিধে। কেননা এই জিনিসগুলোকে দুটো রাজ্যের সেন্সরের ভেতর দিয়ে বের হতে হয়।

১৮ জানুয়ারিতেও তাপমাত্রা ওপরেই উঠে ছিল, তাই রাস্তার ওপর যেখানে-সেখানে শুধু জল আর জল চোখে পড়ছিল। রাতে আমাদের পাড়ার ক্লাবের (বোলোদার্সকী ক্লাব) হলে চ্যু-চ্যু-সান্ দুঃখের অপেরা-নাটক দেখতে গেলাম। এটা কোনো স্থায়ী নাট্য-সংস্থার পক্ষ থেকে দেখানো হচ্ছিল না, বরং নগরেরই এক নাট্য-দল অভিনয় করার আয়োজন করেছিল। সেটা ছিল তো পাড়ার ক্লাবের ঘর, কিন্তু অন্যান্য দেশের বড়-বড় নাট্যশালাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। সব রকমের মনোরঞ্জন আর কলা প্রদর্শনে জনসাধারণ এখন খুব অংশগ্রহণ করছে বলে এইরকম নাট্যমঞ্চ আর বাড়ির ওপর পয়সা খরচা করতে সরকার ইতস্তত করত না। লোকেরাও মঞ্চ পূর্ণ করে অনেক টাকা জমা করে দিত। অপেরা অর্থাৎ পদ্যময় নাটক আমার পছন্দ নয়, তা আগেই বলেছি। কিন্তু বন্ধুদের বার বার অনুরোধকেও দেখতে হতো, তাই আমিও চলে গেলাম। গল্প ছিল—এক মার্কিন অফিসার জাপানের গৈসার (নর্তকী) সঙ্গে জাপানী রীতিতে বিয়ে করে। কিছুদিনের দাম্পত্য জীবনের পরই পুরুষ তার দেশে চলে যায়। তরুণ-পত্নী চ্যু-চ্যু সান, তার স্বামী চলে যাবার পর জন্ম নেওয়া পুত্রের জন্য আশায় পথ চেয়ে থাকে। আর্থিক সঙ্কটের পাহাড় তার ওপর ভেঙে পড়ে। মার্কিন কন্‌সালকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে,

সে জানায়—যুবক দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছে। বাচ্চাকে দেখে সে বলল, 'চাইলে একে দিতে পারো।' কিন্তু মা বাচ্চাকে ছেড়ে দিতে রাজি না। আশা-নিরাশায় পাঁচ-ছয় বছর আরো কাটে। পরে স্বামীর আসার খবর শুনে বাড়ি ফুল দিয়ে সাজিয়ে সারা রাত প্রতীক্ষা করে। সকালে সে তার মার্কিন-বউকে নিয়ে আসে।

মার্কিন-বউ নিজের দোষ না থাকার কথা বলে চ্যু-চ্যু-সান্‌কে সহানুভূতি দেখায়। বাচ্চাকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে তাকে চায়, কিন্তু মা এখন পুত্রকেই বা কি করে দেয়? শেষে আর্থিক সংকট থেকে অপারক হয়ে বুদ্ধের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করে সে হরাকিরী (আত্মহত্যা) করতে চায়, এমন সময় পুত্র এসে উপস্থিত হয়। তাকে কোনো মতে ভুলিয়ে পরে নিজের পেটে ছুরি মারে। পিতা মার্কিন কন্‌সালের সঙ্গে আসে আর বাচ্চাকে তুলে নেয়। অভিনয় খুব সুন্দর ছিল। পুরুষদের পোষাক ভালো ছিল না আর বুদ্ধমূর্তিও বিশ্রী ছিল। কিন্তু এটা তো কোনো পেশাদারী দলের অভিনয় ছিল না।

লেনিনগ্রাদের সব চাইতে পুরনো ও বড় লাইব্রেরি 'সাধারণ গ্রন্থাগার' (পাব্লিক-লাইব্রেরি)। আমি সেখানেও যখন-তখন যেতে থাকলাম। আমার বেশির ভাগ কাজ ছিল মধ্য-এশীয় বিভাগের তাজিক উপবিভাগের সঙ্গে। এখানে আমি অনেক রকমের নতুন নতুন বইও দেখলাম, যেগুলো না ছিল ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য গ্রন্থাগারে আর না ছিল অকাদেমির প্রাচ্য প্রতিষ্ঠানে। গ্রন্থাগারিক খুব আন্তরিকতার সঙ্গে নানান জিনিসকে দেখাচ্ছিল। এই গ্রন্থাগার জারের রাজত্বকালেও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। প্রতি বছর হাজার হাজার বই অন্যান্য দেশ থেকেও আনানো হতো। সোভিয়েত বিপ্লবের পরও তাতে কোনোরকমের অভাব না রেখে বাজেটকে আরো বাড়ানো হয়েছিল। শীতের দিনে রাশিয়ার অন্যান্য সংস্থার মতো এখানেও বাড়ির ভেতরে যাবার পর এক জায়গায় নিজের ওভার কোট, হ্যাট আর হাতের ব্যাগ রাখতে হতো। ঘর গরম আছে, আর মানুষের শরীরে গরম স্যুটও আছে, তাহলে আর ভেতরে শীতের কি ভয়? কাপড় নিয়ে নম্বর লাগিয়ে রাখার জন্য লোকেরা সেখানে মোতায়েন থাকে। এক লেনিনগ্রাদেই ওভারকোট রাখার লোক ৫-৭ হাজারের কম হবে না। একে আপনি অপব্যয় বলতে পারেন, কিন্তু সেটা মানুষের আরামের জন্যই করা হয়। মোটা ওভারকোট পরে চেয়ারে বসতেও অসুবিধে, আর যেখানে বহুমূল্য বই পড়ে আছে, সেখানে থলি নিয়ে যেতে দেওয়াও বুদ্ধির কাজ নয়, তাই এই ব্যবস্থা করতেই হয়। পাঠাগারে টেবিল-চেয়ারের জঙ্গল মত হয়ে ছিল, যেখানে শত-শত লোক চুপচাপ বসে অধ্যয়ন করছিল। বইয়ের নম্বর আর নাম দিয়ে দিলে সেটা টেবিলে আসতে দেরি হতো না। অনুসন্ধানরত বিদ্বান আর ছাত্রদের এই ধরনের সুবিধে লণ্ডন মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারেও আছে।

জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হতেই সোভিয়েত আর তাদের পশ্চিম দেশের মিত্রদের ঝগড়া দেখা দিল। জাপানের সঙ্গে মোকাবিলায় সোভিয়েত সেনা যে তেজের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়া দখল করছিল এবং ইংল্যান্ড আর মার্কিন সেনা তাদের দুর্বলতাকে যেভাবে পশ্চিমী যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছিল, তা দেখে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের ভয় করতে লাগল যে কোথাও এমনটি না হয় যে আমাদের পৌঁছনোর

—১৯৪৭—

আগেই সোভিয়েত সেনা জাপানকেও কাবু করে ফেলে; তাই সোভিয়েতকে না জিজ্ঞেস করেই চার্চিলের রায়ে ট্রুম্যান জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকী নগরের ওপর দুটো পরমাণু বোমা ফেলল। এখন যুদ্ধ বন্ধের দ্বিতীয় বছর চলছিল, মনোমালিন্যও অনেক দূর অব্দি গড়িয়ে ছিল। সোভিয়েত নিজেদের জনতাকে সজাগ রাখার জন্য যুদ্ধসম্বন্ধীয় ফিলমের উৎপাদন বন্ধ করেনি। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়াকে দুর্বল দেখে আরমেনিয়া আর জর্জিয়ার কিছু ভাগ তুর্কিরা আত্মসাৎ করেছিল, তাও আবার হাজার হাজার আর্মেনিয় নর-নারী বুড়ো আর বাচ্চাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডর কথা শুনে সেই সময় সমস্ত পশ্চিমের দেশগুলো পাগল হয়ে উঠেছিল। যখন সোভিয়েত আর্মেনিয়ার নিজেদের হারানো ভূ-ভাগকে ফিরিয়ে দিতে বলছিল। তুর্কি তা ফিরিয়ে দিতে কি করে রাজি হয়, যখন আমেরিকা তাকে প্রহার করার জন্য তৈরি? আর্মেনিয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এই জেলা সোভিয়েত আর তুর্কির মনোমালিন্যের মুখ্য কারণ। তুর্কিকে সতর্কবাণী দেবার জন্যেই বলা যায় 'অদমিরল নখিমোফ' ফিল্‌ম বানানো হয়েছিল। ১৮৫৩-এর ঘটনা, যখন ক্রিমিয়ার জন্য তুর্কি আর রাশিয়ার মধ্যে ঝগড়া হলো। ইংল্যান্ড আর তুর্কি পুরো কৃষ্ণসাগরকে নিজের হাতে করতে চেষ্টা করলো। দুটো পশ্চিমী সাম্রাজ্য আগে গোপন সাহায্য দিয়ে আসছিল। কিন্তু যখন তুর্কিকে মার খেতে দেখল, তখন তারাও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইংল্যান্ড তবুও চালাকি করতে থাকে। সে চাইছিল যে তুর্কি বেশি বলিদান দিক এবং তার চেয়েও বেশি দিক ফ্রান্স। সে সময় রাশিয়ার নৌসেনার প্রধান সেনাপতি ছিল নখিমোফ। জার তার নিষ্কর্মা সভাসদদের পরামর্শে নখিমোফকে তার তরি ডুবিয়ে দেবার হুকুম দিল, যাতে সে শত্রুদের হাতে না পড়ে। নিরুপায় হয়ে নখিমোফকে তাই করতে হলো। সেবেস্তাপোলের রক্ষার জন্য নখিমোফ অত্যন্ত বাহাদুরির সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিল। পরিণামে তুর্কির কোনো লাভ হলো না। নখিমোফও তুর্কিকে শেষ উপদেশ দিয়েছিল—'তুর্কি যখনই অন্যের কথা শুনেছে, তখনি তাকে চোখরাঙানি সহ্য করতে হয়েছে।'

ফেব্রুয়ারি মাস পড়ল। ৪ ফেব্রুয়ারির তাপমাত্রা ২৫°, ৭ ফেব্রুয়ারি ২৭°, ৮ ফেব্রুয়ারি ২৪°—এইভাবে শীত বাড়তে থাকল। ১০ ফেব্রুয়ারি খুব শীত ছিল, বরফও খুব পড়েছিল। বরফ পড়া মেঘের মধ্যে থেকে নির্মল হয়ে আসা সূর্যালোক বৃক্ষের শাখায় আর ছোট ছোট ডালে জড়ানো বরফকে খুব সুন্দরভাবে চমকাচ্ছিল। ডালগুলো তো মনে হচ্ছিল, যেন সাদা প্রবালের লতানো গাছ। টেম্পারেচার খুব নেমে যাওয়াতে, নিশ্বাসে বেরিয়ে আসা বাষ্পের মাত্রা বেশি ছিল। এ ছাড়া কাজে-কর্মে আমার কষ্ট হচ্ছিল না।

২৩ ফেব্রুয়ারিতে ব্লীনী (চীলা)-র সপ্তাহ শেষ হলো। চীলা মিষ্টি আর নোনতা দুরকমই উত্তর ভারতের লোকরা খুব পছন্দ করে। আমি মিষ্টিটা খুব পছন্দ করি। রুশরা চীলা আমাদের থেকে কম পছন্দ করে না। প্রাচীনকালে যখন এদের এখানে চিনি ছিল না, তখন সাদা চীলা রেঁধে ওপর থেকে মধু লাগিয়ে নিত। নিজেদের চীলার প্রতি প্রেমের কারণেই রুশ এই ব্লীনী সপ্তাহকে এখন বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ থেকে ৮ শতাব্দী

আগে, যখন রুশরা খ্রীস্টান হয়নি, তখন তারা সূর্য-দেবতার পুজারি ছিল। মাখনে চুবিয়ে বা লুচির মত মাখনে ফেলে রাঁধা চীলাকে রুশ ভাষায় ব্লীনী বলা হয়। গোলাকার এবং আটার মত রঙ হওয়ায় রাঁধার পর লাল রং আর তার ওপরেও মধু মাখিয়ে দেওয়ার ফলে রঙ আরো লাল হওয়া যেন—সূর্যোদয়ের সময়ের সূর্যের অনুকরণ। বসন্তের সূর্যের উপলক্ষে এই উৎসব প্রাচীন রুশরা উদযাপন করে। সেই সময় খুব ব্লীনী খাওয়া হয়, যেরকম পূর্ব উত্তর-প্রদেশ আর বিহারে কার্তিকের ছটের ঠকুয়া। কার্তিকের ছটও সূর্য-পূজারই পর্ব। আমাদের বাড়িতেও ব্লীনী প্রায় বানানো হতো আর ব্লীনী-সপ্তাহে তো আসা যাওয়া-লোকেদেরও খাওয়ানো হতো।

মনে হচ্ছে, ব্লীনী-সপ্তাহের জন্য সূর্য ভগবান বরফকে থামিয়ে রেখেছে। বরফ পড়তে দেরি হলেই ভালো, কিন্তু ৬ ফেব্রুয়ারিতে ৬ ইঞ্চি বরফ পড়ল। সারাদিন তা পড়তে থাকল। হাওয়া বরফের ধুলো ওড়াচ্ছিল। ঠাণ্ডা খুব ছিল। সেটা স্নানের দিন ছিল, কিন্তু স্নানাগার থেকে ফিরে স্কুলে ইগরকে আনতে গেলাম। দেখলাম প্রথম বারের ছেলেরা স্কুল থেকে বের হচ্ছে আর দ্বিতীয় বারের ছেলেরা ভেতরে যাচ্ছে। সাড়ে বারোটা বাজছিল। যুদ্ধের জন্য বাড়িগুলোর যা ক্ষতি হয়েছিল, তার কারণে স্কুলের অট্টালিকারও অভাব ছিল। তারই জন্য একটা স্কুলেরই অট্টালিকায় ক্ষেপে ক্ষেপে দুবার স্কুল বসত।

অকাদেমিক বরান্নিকোফ খুব পরিশ্রম আর অনুরাগের সঙ্গে তুলসীদাসের অমরকাব্য রামায়ণের রুশ ভাষায় পদ্যানুবাদ করেছিলেন। অকাদেমিও সেটা যতটা সম্ভব ভালোভাবে ছাপা ঠিক করেছে। আমি ভারতে চলে আসাতে বই ছাপা হলো আর এক বছরের মধ্যেই বিক্রিও হয়ে গেল, যার থেকে মনে হয়, যে বিদ্বান আর সাধারণ পাঠক দুজনেই বরান্নিকোফের অনুবাদ পছন্দ করেছে। বইকে সাজাতে, চিত্রিত করতে ইত্যাদি কাজে অনুবাদক আমার কাছে পরামর্শ নিয়েছিলেন। তুলসীদাসের কাব্য কতটা উৎকৃষ্ট, তা জ্ঞাত করাতে রেডিও তাঁকে তুলসীদাসের ওপর বলতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমাকে বরান্নিকোফ মূল চতুষ্পদী ছন্দগুলোকে আবৃত্তি করে দিতে বললেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি আমরা দুজনে রেডিও কার্যালয়ে গেলাম। আমি সাধারণ লয়ে মূল-কাব্য পড়ছিলাম। আর বরান্নিকোফ তাঁর ভূমিকার পরে তার পদ্যানুবাদ রুশ ভাষায় পড়লেন। রেডিও স্টুডিও-এর লোকরা এক আঙুল চওড়া রবারের মত ফিতের ওপর শব্দগুলো তুলে নিয়ে সময় অনুকূল করতে ফিতেকে কাট-ছ্যাঁট করছিল। আমি দেখলাম, দু-তিন হাত ফিতে কাঁচি দিয়ে কেটে সে ফেলে দিল আর জুড়ে ভাষণ আবার শোনাল। আমি এই প্রথম আমার নিজের স্বর শোনার সুযোগ পেলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এটা আমারই গলা। প্রত্যেক মানুষ ভাবে, যে আমি নিজের স্বরই শুনছি, কিন্তু বস্তুত কেউ নিজের স্বর নয় বরং নিজের প্রতিধ্বনিকেই শোনে, যে প্রতিধ্বনী ততটা পরিষ্কার নয়। যা ভালো রেডিও বা ফোনোগ্রাফের রেকর্ড থেকে বের হয়। ফিল্মকে কেটে ফেলে দেবার ব্যাপারে রেডিও-র লোকরা বলছিল, 'চিন্তার কিছু নেই, আমাদের কি অন্য দেশ থেকে কিনতে হবে?' হ্যাঁ, রাশিয়া সব জিনিস নিজেই বানায়, সে পরের মুখাপেক্ষী নয়। আর জিনিসপত্র অন্য দেশ থেকে আনার জন্য বিদেশী বিনিময় হিসেবে মোটা টাকাও

পাঠাতে হয় না।

আজ সাতটা থেকে ইরানী-সম্মেলনও হচ্ছিল। আমি সেখানে গেলাম। অকাদেমিক ফ্রাইম্যানের ইরানী সংস্কৃতির কোনো দিক নিয়ে ভাষণ হলো। এনীরও আসার কথা ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে আসেননি। তাজিক (ফারসী)-এর মহান কবি লাহুতী এসেছিলেন। লাহুতীর কবিতা আমি আগেই পড়েছিলাম আর আমার কাছে তাঁর কিছু বই-এর সংগ্রহও ছিল। সাদা চুল, রুশদের মত ফর্সা, উজ্জ্বল চোখের এই মহান কবিকে তাঁর বৈপ্লবিক ভাবধারার জন্য ইরান ছাড়তে হলো। ২৫ বছর ধরে তাঁর মাতৃভূমি তাজিকিস্তান। তিনি সেখানকার মহান নাগরিক ও মহান কবি।

পয়লা মার্চে (১৯৪৭) ঠাণ্ডা হিমাঙ্ক থেকে ২৩° নীচে ছিল। আগের বছর তাপমাত্রা ২৮° অব্দি পৌঁছেছিল আর এবছর—২৯° অব্দি প্রথম সপ্তাহেই পৌঁছেছিল। কিন্তু লন্ডনের মত এখানে কেউ বলত না, যে এরকম শীত একশো বছরে কখনো পড়েনি। খেতে শরতে বোনা গম জমে বরফের নীচে পড়ে থাকে, যা বরফ গলে যাবার পরেই খুব তেজে বেড়ে বসন্তের রোপন করা গমের থেকে তাড়াতাড়ি পেকে যায়। শীতের গমে তখনই ক্ষতি হয়, যখন বরফ পাতলা হয় কিংবা একেবারেই বরফ থাকে না এবং শীত যদি বেশি পড়ে। এরকম শীত গমের গাছকে মেরে ফেলে। কিন্তু রোপন করা গমের ঠাণ্ডা হবার ভয় ছিল না, কেননা যেখান তার রোপন বেশি হয়েছিল, সেখানে বরফের মোটা পরত পড়েছিল। এখন তো বরফ যথেষ্ট পড়ে গিয়েছিল।

পাড়ার ক্লাবের রঙ্গশালায় এমনিতে বয়স্কদের জন্য হামেশাই ফিল্‌ম আর অন্যান্য জিনিস দেখানো হতো, কখনো কখনো সেখানে বাচ্চাদের খেলাও হতো। ২ মার্চে ছেলেদের প্রোগ্রাম ছিল আর এত উপভোগ্য ছিল, যে মঞ্চে বসার জায়গা খালি ছিল না। বাঁদরদের খেলা হবার কথা ছিল। পাড়ার শত শত বাঁদরও এসে খেলা দেখতে নিজেদের সিটে গেড়ে বসেছিল। ওদের হৈ-হল্লা মারপিট বন্ধ করা সোজা ছিল না। একটু পরেই সারা হলঘর ওদের চেঁচামেচিতে ভরে গেল। শিশুদের জন্য যারা নাটক করে তারা ওদের মনোবিজ্ঞানের সঙ্গেও পরিচিত হয়। তক্ষুণি হারমোনিয়াম নিয়ে এক পুরুষ আর তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরকারিণী এক স্ত্রী রঙ্গমঞ্চে এলো। সে কিছু প্রশ্ন করল, কিছু ধাঁধা বলল আর কিছু গান গাইল। এইরকম ভাবে কয়েক মিনিটও কাটেনি, ইতিমধ্যে ছেলেদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত করা গেল। খেলার সঙ্গে সার্কাসও ছিল, যাতে ১টি বাঁদর, ৪টি ভালুক, ৪টি কুকুর, ১টি ভেঁড়া, ১টি ছাগল, ১টি কাঠবেড়ালী অংশগ্রহণ করছিল। কুকুর আর ভালুক নাচও করছিল। ওদের গানও খুব মজার ছিল। ছেলেরা খেলা হয়ে যাবার পরও আরো দেখার প্রতীক্ষায় উঠতে চাইছিল না, কিন্তু শেষে উঠতেই হলো। সবাই নিজের নিজের বন্ধুদের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আলোচনা করতে করতে খুশি-খুশি বাড়ি ফিরল।

৩ মার্চ স্নানের দিন ছিল। ঠাণ্ডা কম ছিল কিন্তু আবার বরফ পড়ছিল। স্নানাগারে যাবার সময়ও নিজের চামড়ার ওভারকোট আর চামড়ার টুপিকে ছাড়া যাচ্ছিল না। সেদিন স্নানাগারে খুব ভিড় ছিল, কেননা পালানো ছেলেদের ৫০-৫০ জন করে দুটো

লাইন আসছিল। এই ছেলেরা যুদ্ধের ফসল। যুদ্ধে মা-বাবা মরে যাওয়ায় বা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ায় পালিয়েছিল এবং জায়গায় জায়গায় ভিক্ষে করে বা অন্য কোনো উপায়ে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল আর দুনিয়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। বদমায়েসি করছিল। যুদ্ধে মা-বাপহীন হয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ ছেলেদের লোকেরা দত্তক পুত্র করে নিয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার তুর্ক আর তাজিকদের পরিবারেও ইউরোপীয় দত্তকপুত্র পালন করছিল। এর ফলে অনাথ বাচ্চাদের অতটা বেশি কষ্ট হয়নি, যতটা এই পরিস্থিতিতে কোনো পুঁজিবাদী দেশে হয়। তাও কিছু নির্ভীক ছেলেরা কারো দত্তকপুত্র না হয়ে নিজের মনে ঘোরা আর যা ইচ্ছে তা-ই করা পছন্দ করত। তাদের এই অবস্থায় ছেড়ে দিলে যেমন তাদের নষ্ট হয়ে যাবার ভয় ছিল, তেমনি তাদের শিক্ষার সময়ও পেরিয়ে যেত, তাই সোভিয়েত সরকার জায়গায়-জায়গায় বাচ্চাদের বাড়ি তৈরি করেছিল। সেখানে ওদের পালন-পোষণ আর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু খারাপ হয়ে যাওয়া ছেলে একটু সুযোগ পেলেই পালিয়ে যেতে উদ্যত হতো তাই তাদের কড়া শাসনে রাখতে হতো। তারা প্রত্যেক সপ্তাহে লাইন করে স্নানাগারে যেতো। সারা দেশে পুলিশদের কাজ ছিল, পালিয়ে যাওয়া ছেলেদের ধরে কাছের শিশু-গৃহ পাঠিয়ে দেবার। এ ছাড়াও যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের ছেলেদের জন্য সুবারোফ সৈনিক স্কুল স্থাপিত ছিল, যাতে ওদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে সৈনিক অফিসার হবার সুযোগ দেওয়া হতো। বিপ্লব দিবস বা মে দিবসে যখন সুবারোফ স্কুলের ছেলেরা নিজেদের পোশাক পরে মর্যাদার সঙ্গে প্যারেড করতে করতে লাল ময়দানে যেত বহুক্ষণ ধরে তার্লি বাজতে শোনা যেত।

ভারত থেকে আসা চিঠিগুলোর বিচিত্র হাল ছিল। অমৃতরায়ের চিঠি বেনারস থেকে এক মাসে পৌঁছে গেছে আর আমার চিঠিও সে এক মাসে পেয়ে গেছে, কিন্তু আনন্দজীর কাছে আমার উড়োজাহাজের চিঠি ৭ মাসে পৌঁছেছে। উড়োজাহাজের চিঠিতে কখনো ভরসা হতে পারে? যেদিনে (৯ মার্চ) এই চিঠিগুলো পেয়েছে, সেই দিন আমি 'দাখুন্দা' (তাজিক ভাষা)-র উর্দু অনুবাদ শেষ করেছিলাম। সময় কাটাবার জন্য আমি ভাবলাম, ভারতে গিয়ে অনুবাদ করার চেয়ে এখানেই অনুবাদ করে ফেলাই ভালো। উর্দুতে অনেক মৌলিক তাজিক (ফারসী) শব্দ রাখা যেতো, তাই আমি আগে উর্দুতেই তরজমা করলাম। সোভিয়েতে থাকতে থাকতেই মধ্য-এশিয়ার মহান উপন্যাসকার এনীর 'দাখুন্দা' আর 'গুলামান' দুটো উপন্যাসের উর্দুতে অনুবাদ করে নিয়েছিলাম। দুটো দুটো কপি করার সময় ছিল না এবং এই একটা কপি ডাক আর সেন্সরের গড়বড়ের মধ্যে ভারতে পাঠানো বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না।

১৭ মার্চে ঠাণ্ডা হিমাঙ্কের ১০° নীচে ছিল, যাকে আমরা গরম মনে করছিলাম। এখন সূর্যের দর্শনও মাঝে মাঝে হতো। কিন্তু বসন্তের এখনো দেড় মাস দেরি ছিল—আমাদের এখানের আর লেনিনগ্রাদের বসন্তের এতটা তফাৎ। আমাদের এখানে পাতাঝরা আর বসন্ত এক সঙ্গে আসে কিন্তু রাশিয়ায় পাতাঝরা সেপ্টেম্বরে আর বসন্ত মে মাসে আসে। মাদ্রাজের দিকে গেলে তো বসন্ত আর পাতাঝরাই শুধু নয়, সমস্ত ঋতুর আগমন এক সঙ্গেই হয়। তফাৎ শুধু বর্ষা আর না-বর্ষার।

—১৯৪৭—

সময় চলে যাচ্ছিল। সে দিন কাছেই, যখন ইউনিভার্সিটির পড়াশুনোর বছর শেষ হয়ে যাবে আর আমি এখান থেকে চলে যাব। সবচেয়ে বড় চিন্তা কোন রাস্তা ধরব? লন্ডনের রাস্তা খুব ঘোরার। অদেস্‌সা (কৃষ্ণ সাগর) থেকে জাহাজে করে সমুদ্রপথে বোম্বাই পৌছনোর রাস্তা ছিল। তৃতীয় রাস্তা ইরান থেকে ছিল, কিন্তু আসার রাস্তা দিয়ে ফিরে যাওয়া আমার পছন্দের নয়। চতুর্থ রাস্তা স্থলপথে আফগানিস্তান হয়ে, যা সবচেয়ে কাছেও। কিন্তু অসুবিধে এই যে আমার কাছে বিদেশী বিনিময়ের যে চেকটা ছিল, তা সোভিয়েত দেশে বা ভারতেই ভাঙানো যাবে। সোভিয়েত রুবলের অভাব ছিল না। কিন্তু তা তেরমিজ (আমুদরিয়া তট) পর্যন্তই কাজে লাগানো সম্ভব। তেরমিজ থেকে দরিয়া পার হলেই আফগানিস্তান এসে যায়। যেখানে সোভিয়েতের মুদ্রা বেকার হয়ে যেত, আর বৈধভাবে আমি সেগুলো নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেও পারতাম না। আমুর ঘাটে নেবে মাজারশরীফ অব্দি ভাড়া কোথা থেকে আসবে, আর মাজারশরীফ থেকে কাবুল যাবারও ব্যাপার ছিল। ভাগ্যকে ভরসা করে যাত্রা করা আমার পক্ষে কোনো নতুন ব্যাপার নয়, হয়তো মানবতা সেখানেও কোনো রাস্তা বার করে দিত বা নিজের কাছের এক-আধটা জিনিস বিক্রি করে ভাড়ার টাকা জমা করে নিতাম, কিন্তু আমার কাছে আড়াই বছরের কাজের যে দুর্লভ বই জমা হয়েছিল, তা প্রায় সবকটা রুশ ভাষায় ছিল, সেগুলোর জন্য বিপদ হতে পারত। কম্যুনিজমকে সব দেশের শাসকই প্রতিরোধ করতে চায়, যদি তারা কোনো বই রেখে নেয়, তাহলে?

১৩ মার্চে আরেকটা দুঃখের ঘটনা শুনলাম। লিথুয়ানিয়ায় উৎপন্ন বহু ভাষার পণ্ডিত ডাক্তার সিম্বোচিকস মারা গেছেন। সিম্বোচিকস লন্ডনেও ছিলেন, তিনি ছিলেন লন্ডন ইউনিভার্সিটির পি· এইচ· ডি·। ইউরোপের নতুন-পুরনো তথা ইবরানী এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বহু ভাষার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। লিথুয়ানিয়ায় যখন জার্মানি আক্রমণ করল, তখন তিনি সেখান থেকে সোভিয়েতের দিকে পালিয়ে এলেন। পুরো যুদ্ধের সময়টা কোনো না কোনো কাজ করে জীবন চালাতে লাগলেন। ইহুদি হওয়ায় তাঁর জার্মানদের যা ভয় ছিল, তাতে তিনি সোভিয়েত-বিরোধী হতে পারতেন না। চার বছর অব্দি সোভিয়েতে শরণার্থী হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে এখন তিনি ইউনিভার্সিটিতে এসেছেন। চাকরির জন্য ইউনিভার্সিটিতে এখন অনেক জায়গা খালি ছিল। তাঁর আশা ছিল, যে কোনো একটা কাজ তিনি পেয়ে যাবেন। তিনি প্রাচ্য-বিভাগের গ্রন্থাগারে রোজ আসতেন। আস্তে আস্তে অনেক লোক তাঁর পরিচিত ও বন্ধু হয়ে হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় মহত্বের কাজ না করা লোকেদের জন্য রেশনকার্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই বেচারা সিম্বোচিকস বেশ বিপদে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী আর একটা ছোট বাচ্চা ছিল। তিনজনের রেশনের বাইরের খাদ্য থেকে জীবন চালানো মুশকিলের ছিল। খুব দৌড়-ঝাঁপ করলাম, সব তৈরি ছিল, কিন্তু আমাদের বিভাগের দল-সচিব এতো মূর্খ পেয়েছিলাম, যে সে নাকোচ করে দিল। বলল—লন্ডনের পি· এইচ· ডি·! কে বলতে পারে যে ইংরেজদের গুপ্তচর নয়?' তার এই রায়ের বিরুদ্ধে যাবার কারো সাহস ছিল না। আমাদের ডিন প্রফেসর স্টাইন ইহুদি ছিলেন, তাই তিনিও কোনো মতামত দিতে চাইছিলেন না। জানতে পারলাম,

একটু-আধটু খাবার যা সিশ্চোচিকস যোগাড় করতেন, তা তিনি মেয়ের মাকে দিয়ে দিতেন এবং নিজে কোনো অজুহাত দেখিয়ে খিদে সহ্য করতেন। সিশ্চোচিকসের স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না। এই অনাহারে তিনি ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে গেলেন। শেষে একদিন তাঁর প্রাণ শরীরকে ছেড়ে দিল আর এক প্রতিভাশালী ভাষাতাত্ত্বিক থেকে দেশকে বঞ্চিত হতে হলো। সিশ্চোচিকসের রক্ত তো কারো মাথায় অবশ্যই পড়া দরকার। কিন্তু তার জন্য আমরা সাম্যবাদ বা রুশের কম্যুনিস্ট পার্টিকে দোষী বলতে পারি না। লেনিনগ্রাদের কিছু মূর্খ সেই সময় পার্টির সর্বেসর্বা হয়ে গিয়েছিল। দুবছর বাদে দণ্ড অবশ্যই পেয়েছিল, কিন্তু সেই সময় তো নাজিদের দুষ্ট কৌশল দিয়ে এই অনর্থ করতে সমর্থ হয়েছিল।

এইভাবেই এক মোঙ্গল বিদ্বানও সেই সময় অধ্যাপনার কাজ খুঁজতে লেনিনগ্রাদ এসেছিল। সে আগের ষড়যন্ত্রে জবের সঙ্গে কাষ্ঠকীটের মতো পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েক বছর জেলে থেকে সবে ছাড়া পেয়েছিল। এমনিতে ইউনিভার্সিটিতে সে সায়েন্স নিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মোঙ্গল বুদ্ধ হওয়ায় আগে সে ধর্মভাষা তিব্বতী পড়েছিল, জেলে তার আরো পড়ার সুযোগ এলো। ৯ বছরে সে তিব্বতী ভাষা খুব ভালো অধ্যয়ন করেছিল। এখন প্রাচ্য-বিভাগে তিব্বতী ভাষার অধ্যাপকদের দরকারও ছিল। বিভাগীয় গ্রন্থাগারেই এমন একজন ব্যক্তির দরকার ছিল। সময়ে-সময়ে সেও গ্রন্থাগারে বসে অধ্যয়ন করত আর ব্যবস্থাপিকাদের সাহায্য করত। তাকেও লোকেরা অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে চাইছিল, কিন্তু সিশ্চোচিকসের সঙ্গে যারা অন্যায় করেছে সেই মূর্খরাই বাধার সৃষ্টি করল। বলল, 'রাজদ্রোহে যার সাজা হয়েছে, তাকে কিভাবে নিযুক্ত করা হবে?' কিন্তু মোঙ্গল বিদ্বানকে সিশ্চোচিকসের অবস্থায় পৌছনোর দরকার হয় নি। কিছু মোঙ্গল (বুরিয়ত) লেনিনগ্রাদে থাকত, তাদের সাহায্যে ট্রেনে উঠে সে আবার তার দেশে ফিরে গেল। এটা একটা কালো দাগ, যা অত্যন্ত উজ্জ্বল বস্ত্রে থাকলে খারাপ লাগে। এতে সন্দেহ নেই যে সোভিয়েতের শাসক-এর জন্য জাগ্রতও থাকে আর জানতে পারলে ক্ষমাহীনভাবে অপরাধীকে দণ্ড দেয়।

পূর্বের ভাষা পড়ানোর সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল উচ্চারণের। আমি তার ছাত্রদের উচ্চারণ ঠিক করার খুব চেষ্টা করতাম। আমাদের অধ্যাপকরা যখন শুনলেন যে আমি ভারত ফিরছি, যদিও তখন আমি দু-বছরের জন্যই যাওয়ার কথা বলেছিলাম, তো তারা বললেন, যে আমি যেন উচ্চারণের ব্যাপারে কিছু জিনিস গ্রামোফোন রেকর্ডে বলে রাখি। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে বড় ফটোগ্রাফির বিভাগও ছিল। কিনদের ফিল্ম আর গ্রামোফোনের মত বিভাগের কথা শুনে আমাদের এখানে হয়তো আশ্চর্য লাগবে, কিন্তু রাশিয়ায় শিক্ষার মাধ্যম ছাড়া শিক্ষণ-সংস্থাগুলোর কাজা বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে ভাবা হয়। গ্রামোফোন রেকর্ড করার বিভাগ আমাদের প্রাচ্য বিভাগের পাশেই ছিল। আমি সেখানে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, হিন্দি, উর্দু আর তিব্বতী ভাষার গ্রন্থের পাঠ রেকর্ড করালাম।

২৪ মার্চে দিল্লী রেডিও থেকে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তঃএশিয়া কনফারেন্সের রিপোর্ট শুনলাম। বক্তারা তাদের ভাষায় প্রচুর ভাষণ দিয়েছিল। সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের মধ্যে গুর্জী (স্তালিনের জাত), কাজাক, আর উজবেক প্রতিনিধিও ছিল। এশিয়ার এত

বড় সম্মেলন অনেকদিন বাদে ভারতের মাটিতে হয়েছিল। আমার নালন্দার কথা মনে পড়ছিল। সেখানে মধ্য-এশিয়া তথা সমস্ত পূর্ব-এশিয়ার ছাত্র পড়তে আসত। আবার একবার ভারতের পুরনো সম্পর্কগুলো জাগ্রত করার সুযোগ এলো। যদিও সেই সময়ও বৌদ্ধধর্ম আক্রমণকারী সংস্কৃতির প্রচার করেনি। বরঞ্চ যে দেশেই তা গেছে, সেখানকার সংস্কৃতি রক্ষা করতে তার অবদানে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তাও আজকের যুগে তো ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষের কোনো কারণ নেই। সংঘর্ষের কারণ তো আসলে আর্থিক শোষণ। আর্থিক শোষণ দূর করে দিন, তাহলে দেখুন সংস্কৃতির সমন্বয় খুব মধুরভাবে হয়ে যায়। সোভিয়েত রাশিয়া এর উদাহরণ। মধ্য-এশিয়া ইসলামিক-সংস্কৃতিতে পালিত। রাশিয়া তার ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই খ্রীস্ট-সংস্কৃতিকে মেনে আসছে, মোঙ্গল বৌদ্ধ-সংস্কৃতিকে তাদের জাতির থেকে আলাদা করে দেখতে পারে না। এ ছাড়া ধর্ম অনুযায়ী ইহুদী সমস্ত রাশিয়ায় ছড়িয়ে আছে, আব যাদের এক ভৌগোলিক ঐক্য স্থাপন করতে সুদূর পূর্বে বোরোবিজানের এক স্বায়ত্ত-শাসিত ভূ-ভাগ স্থাপন করা হয়েছে। এই সংস্কৃতিগুলোতে অনেক ভেদাভেদ আছে। পিছনের ইতিহাসকে দেখলে বোঝা যায় যে ওদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতটা কটু ছিল। ধর্ম-নির্ভর সংস্কৃতি ছাড়া রক্ততেও পরস্পরের ভেদ ছিল, যা উঁচু-নিচু মনোভাবকে নিয়ে ঝগড়ার কারণ হয়ে যেত। কিন্তু আজ সমস্ত সংস্কৃতি পরস্পরের জলভাত হয়ে গেছে। একে অপরজনের ভাবকে মানুষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং একে অপরকে বীরের সম্মান দিতে পেছপা হয় না। সংস্কৃতির সুন্দর সমন্বয় কি করে হবে, তার রাস্তা সোভিয়েত রাশিয়া দেখিয়েছে। কিন্তু তার জন্য আর্থিক শোষণ বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

তিরযোকীতে এক বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান সংগীত-শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি লেনিনগ্রাদের সেরা ওস্তাদদের মধ্যে একজন। ৪ মাস তিনি লেনিনগ্রাদের প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত কন্সর্বেতরী (সংগীত-বিদ্যালয়)-তে প্রফেসরের কাজ করতেন আর আট মাস কাজ করতেন তার জন্মভূমির রাজধানী যেবরান নগরে। তাঁর নিমন্ত্রণে ১৬ মার্চে আমি তাঁর বাড়ি গেলাম। সেখানে আরো একজন ৭০ বছরের বৃদ্ধা সংগীতাচার্যও নিমন্ত্রিত ছিলেন। বৃদ্ধার সঙ্গে তাঁর তরুণ নাতি (মেয়ের ছেলে)-ও এসেছিল। ২০ বছরের তরুণ এমনিতে সায়েন্সের ছাত্র ছিল, কিন্তু সংগীত তো ছিল ওর রক্তে, তাই তাতেও ওর যথেষ্ট দখল ছিল। লোক-সংগীতকে সে খুব পছন্দ করত আর তার জন্য দুটিতে তার এশিয়া ও অন্যান্য জায়গার জাতিদের লোক-সংগীতের চর্চা আর সংগ্রহ করে কাটাতো। ভারতীয় সংগীতের সম্বন্ধে আমি কি বলতে পারি? আমি আগেই বলে দিলাম যে সংগীত আর কাব্য এই দুটো বিষয় সর্বদা আমার কাছে অপরিচিত। এগুলোর প্রতি না আছে আমার বিশেষ রুচি, না আছে দখল। আমি হয়তো তাকে ওদের তুলনায় শূন্য ভাবতে পারতাম, কিন্তু কিছু সংগীত—বিশেষ করে গণসংগীত আর কিছু কবিতা—বিশেষ করে গণকবিতা ও অন্যান্য কিছু কবিতায় আমার হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায়, তাই তাকে সর্বদা শূন্য বলতে পারি না। ভারতীয় সংগীতের সম্বন্ধে কিছু না বলে আমি আমার সঙ্গে আনা গ্রামোফোন রেকর্ড চালালাম। তার মধ্যে একটা সাধারণ চলতি

সিনেমার গান ছিল, যাকে খুব অরুচিপূর্বক দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শুনল এবং আলাদা রেখে দিল। সৌভাগ্যবশত, 'তানসেন' ফিল্‌মে গাওয়া দুটো গানের রেকর্ডও ছিল, যাতে ভারতীয় সংগীতের বেশি শুদ্ধ রূপ ছিল। এগুলো খুব পছন্দ হলো। আমি দুজন সংগীত বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলাম ভারতীয় সংগীতকে আন্তর্জাতিক নোটেশন-এ লেখা সম্ভব? বৃদ্ধা এর জবাবে কোনো ইংরেজি গবেষণা পত্রিকার পুরনো দু-তিনটে সংখ্যা বের করে রাখল। সেখানে আমাদের রাগকে ইউরোপীয় নোটেশনে বদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ছাপা নোটেশন তো আমার কাছে হলো 'মোষের সামনে বীণা বাজানো।' তখন বৃদ্ধার নাতি বলল, 'আমি নোটেশন বেঁধে শোনাচ্ছি।' রেকর্ড আবার লাগানো হলো। সে তাড়াতাড়ি কাগজের ওপর নোটেশন লিখে নিল। ফের 'বরসো রে বরসোরে'-র রাগকে পিয়ানোতে বাজিয়ে দেখিয়ে দিল। সে বলল, 'কোনোও বাস্তবিকতাকে রেখায় বাঁধা সম্ভব নয়, সেকথা সংগীতের ক্ষেত্রেও ঘটে।' নোটেশনের কাজ হলো স্বর আর লয়ে বাস্তবিকতার কাছাকাছি পৌঁছনোর সাহায্য করা। আমি দেখলাম, সে কাজ এখানে হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমার মনে হলো—আমাদের ভারতীয় সংগীতের জন্য আন্তর্জাতিক নোটেশন নেওয়া ভালো। না নিয়ে আমরা তাদের ক্ষতি করব। নোটেশন-বদ্ধ ভারতীয় সংগীতর মহিমাকে দুনিয়ার সেই মানুষেরা বুঝতে আরম্ভ করবে, যাদের কাছে এই সংগীত একটা বন্ধ বই-এর মত। আন্তর্জাতিক নোটেশানের উদ্ভব ইউরোপে হলেও আজ কিন্তু সে জাপান অব্দি এশিয়ার সমস্ত দেশে প্রচলিত। সংকীর্ণ জাতীয়তার ফেরে পড়ে তাকে বয়কট করা আমাদের কাছে শ্রেয়স্কর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কয়েকজন এশীয় তরুণ লোকগীত গেয়ে শোনালো। সংগীতের জন্য প্রায় শুকনো আমার হৃদয়ও ওই সভাতে সরস হয়ে উঠেছিল।

২৭ মার্চে ইউনিভার্সিটি যাবার সময় রাস্তায় শুধু জলই চোখে পড়ল। নেপাতে বরফের ওপর জল বয়ে যাচ্ছিল। এবছর আমাদের জন্য নেবা রাস্তার কাজ খুব কম করেছিল। এখন তো মানুষ তার জমে থাকা ধারকেও বিশ্বাস করছিল না—কে জানে কোথাও যদি বরফ পাতলা আছে তাহলে বোঝা বইতে পারবে না, তখন ধোঁকা খেয়ে সমুদ্রে পৌঁছে যাবার কার আর ইচ্ছে হয়? আজ হিন্দি-উর্দু-কবিতা তথা যজুর্বেদ-এর নিজের কিছু মন্ত্রের রেকর্ড করালাম।

২৮ মার্চ মানবতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে আবার গেলাম। সেখানকারের পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললাম। অর্থ উপার্জনের অসুবিধের থেকে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য সোভিয়েত বিদ্বানদের শাস্ত্রচর্চা করার জন্য অনেক সময় পাওয়া যায় আর সেই দিকে তাদের রুচিও থাকে। কিন্তু যে বিষয়ে যার রুচি নেই সে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন আর অধ্যাপনের দিকে পা-ই বাড়ায় না—এটা সব লোকেদের কাজ পাবার গ্যারান্টী। উক্ত বিদ্বানের সঙ্গে আমি মধ্য-এশিয়ার প্রাগৈতিহাসিককালের বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলো জানালেন ঃ

উজবেকিস্তান—এখানে মৃস্তর (নিয়ন্ডর্থল) মানবের শরীরের কঙ্কাল শিকতাশের গুহায়

পাওয়া গেছে। পাশেই আমীর তৈমুখ গুহায় হাড় নয়, ওদের পাষাণাস্ত্র পাওয়া গেছে। তেরমিজের কাছে মচই গুহায় মৃস্তর আর মধ্য-প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। সমরখন্দ এলাকায় পুরনো-প্রস্তের যুগের বাইরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

তাজাকিস্তান—এখানে প্রস্তর যুগের অবশেষ রয়েছে এমন অনেক গুহা আছে, কিন্তু এখন খোদাই করার কাজ হয়নি।

তুর্কমানিস্তান—এখানে বক্ষু নদীর পুরনো তীর উজবোই যেখানে কাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গে মিশেছে সেই মনকিশ্লক-এ প্রাক পুরনো-প্রস্তর যুগ আর মধ্য-এশিয়ার প্রস্তর যুগের অস্ত্র পাওয়া গেছে। এটা স্মরণে রাখা দরকার যে কোনো এক সময় বক্ষু (আমুদরিয়া) আজকের মত অরাল সমুদ্রে না পড়ে কাস্পিয়নে পড়ত, পরে সে অরাল সমুদ্র পড়তে থাকল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধে খালের জন্য বানানো বাঁধ ভেঙে গেল, তখন উজবোয়ী আরেকবার বক্ষুর রূপ নিয়েছিল। বহু শতাব্দী ধরে উজবোই শুকনো পড়েছিল। বর্ষা অত্যন্ত কম হবার দরুন আশেপাশের মাটি বক্ষুর জল থেকে বঞ্চিত হয়ে কত দিন আর সবুজ থাকতে পারত? সেখানকার মাটি করাকুমের বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। কিন্তু এখন আবার ওর দিন ফিরে আসার সময় হয়েছিল। এই বছর থেকেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খাল—প্রধান তুর্কমান খাল, আধুনিকতম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খোঁড়া হচ্ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই আমু আবার কাস্পিয়নে পড়বে। তার অজস্র খাল দিয়ে কারকুমের ভূমি আবার সবুজ হয়ে উঠবে। খাল খোঁড়ার সময় এই ভূমিরও পুরনো মানব-অবশেষের আরো কিছু খবর জানা যাবে, অতীত যুগের সভ্যতার ওপর তার ভালো প্রভাব পড়বে।

কাজাকস্তান—ইর্তিশ নদী-তটের ওপর অল্ভাই-এর পাশে এখানে প্রাক প্রাচীন-প্রস্তর যুগের যে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে সাইবেরিয়া থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীর সম্বন্ধ আছে। কুস্তাই জেলায় কেরিনকুল ঝিলের কিনারায় প্রস্তরোত্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু তার সঙ্গে মৃৎপাত্র নেই।

কির্গিজিস্তান—ত্যান-শান পর্বতমালায় অবস্থিত এই গণরাজ্যতেও প্রাক প্রাচীন-প্রস্তর যুগের অবশেষ পাওয়া গেছে।

মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের সামগ্রীর জন্য আমার যেরকম বই অধ্যয়ন করা দরকার ছিল, সেই রকমই পুরাতত্ত্ব-সামগ্রীর বিষয়ে বিদ্বানদের সংসঙ্গও জরুরি ছিল। মধ্য-এশিয়ার পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক সামগ্রী অনেকগুলো সংগ্রহালয়ে রাখা আছে, তাদের মধ্যে কিছু তো মধ্য-এশিয়ার গণতন্ত্রে ছিল, যেখানে আমার এখন যাবার সম্ভাবনা ছিল না। লেনিনগ্রাদ আর মস্কোর সংগ্রহালয়ের ঘরগুলোকে ধীরে ধীরে সাজানো হচ্ছে, তাই বিদ্বানরাই এই ব্যাপারে বেশি সহায়ক হতে পারে।

২৯ মার্চে জানতে পারলাম যে ভারত সোভিয়েত দেশের সঙ্গে দৌত্য-সম্বন্ধ স্থাপন করতে চলেছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারতের দূত হয়ে আসছেন আর এখান থেকে জুকোফ দিল্লী যাচ্ছেন। আমার থাকাকালীন বিজয়লক্ষ্মীজী আসেননি, তার পরে জুকোফ কিংবা অন্য কোনো দূত সোভিয়েতের তরফ থেকে দিল্লী পাঠানো হয়েছিল। এপ্রিলের প্রথম হপ্তা থেকে এখন ভারতীয় খবরের কাগজ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় অনেক সংখ্যা আমার কাছে আসতে থাকল। যদিও সবই তিন মাস পুরনো ছিল, কিন্তু তার থেকে দেশের অনেক কথা বোঝা যেত। তাজা খবরের জন্য রেডিও কাছে ছিলই। হ্যাঁ, কোনো খবরের কাগজের সব সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, কিছু কিছু সংবাদপত্র প্রেমিকরা রাস্তাতেই কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু যা-ই পাওয়া যেত, আমি তো সেগুলোকেই যথেষ্ট ভাবতাম। হায়! যদি এই ব্যাপারটা দেড় বছর আগে থেকেই হতো

১৫ এপ্রিল আরো একটা কাজ আমার কাছে এলো। সেটা ছিল রুশ ফিল্মের হিন্দি ভাষান্তর করা। 'শপথ' ফিল্মের সিনারিয়োকে আমার কাছে রুশ থেকে হিন্দি তরজমা করতে পাঠানো হয়েছিল। এতে যতটা অভিনয় ছিল, ততটা সংলাপ ছিল না। সব সুদ্ধ ৩৪ পৃষ্ঠার সামগ্রী হবে হয়তো। ফিল্ম-বিভাগ এর অনুবাদ করতে সাড়ে চার হাজার রুবল পারিশ্রমিক দেবার জন্য লিখেছিল। যাহোক, রুবল তো মন্দ ছিল না। কিন্তু আমার সেটা করার তেমন ইচ্ছে ছিল না। তারা এও লিখেছিল, 'আমরা এরকম অনেক ফিল্মের অনুবাদের কাজ আপনাকে দেব।' ওদিকে পত্র-পত্রিকাও লেখা দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিল আর আমি একটা লেখা লিখেও ফেলেছিলাম। এখন আমার আয়ের সম্বন্ধে অকাদেমিক বরান্নিকোফের রাস্তা কিছুটা ছোট আকারে সামনে দেখা যেতে লাগল। রেডিওর চাহিদাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে সামগ্রী এর্মীতাজ আর মানবতত্ত্ব মিউজিয়মগুলোতে ছিল। সেখানে বিশেষজ্ঞ-পরামর্শদাতা হবার কথা চলতে থাকল। সোভিয়েতে কোনো বিদ্বানের কোনো কাজ বিনা পয়সায় নেওয়া হয় না। প্রত্যেক জায়গায় কাজ করার জন্য পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট ছিল। তাই যেখানে টাকা-পয়সার প্রশ্ন ছিল, সেখানে তা প্লাবনের মতো আসতো। ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে তিন-চারটি ঘরের একটা ভালো বাড়িরও খোঁজাখুঁজি এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে শুরু হয়েছিল। আমার সামনে এখন প্রশ্ন ছিল—এখানে থেকে কি আরামের জীবন কাটিয়ে দেব, নাকি ভারত পৌঁছে নিজের সাহিত্য কর্মকে আবার আরম্ভ করব? প্রথম রাস্তা আমার জীবন-মৃত্যুর মত মনে হচ্ছিল। এরকম আরামের জীবন নিয়ে কি করার ছিল? ঠিক ঠিক কাজগুলোই আমি এখানে থেকে করে উঠতে পারছিলাম না। ভারত থেকে আসা আড়াই বছরের বেশি হয়ে গিয়েছিল। ভারতে থাকলে এতদিনে দু-আড়াই হাজার পাতা তো অবশ্যই লিখতাম। এই আড়াই বছরে আমার মাথা খালি ছিল না। কত বই-এর কল্পনা মনে মনে তৈরি হচ্ছিল। যেগুলো এখানে থেকে কাগজে তোলা বেকার ছিল, কেননা খুব সন্দেহ ছিল, যে সেগুলো সেন্সরের মার থেকে বেঁচে প্রেসে পৌঁছতে সফল হবে কিনা। আমার এই সিদ্ধান্ত নিতে একটুও অসুবিধে হয়নি, যে আমি মৃত্যুকে কখনো পছন্দ করতে পারি না। এই কারণে মনে যে ব্যথা হচ্ছিল সেটাকে মেটাতেই

আমি 'দোখুন্দা' আর 'গুলামান' অনুবাদ করতে শুরু করলাম। 'দাখুন্দা' শেষ হয়ে ৬ এপ্রিলে 'গুলামন' (যে দাস ছিল)-এর ৩৬৪ পৃষ্ঠা অব্দি পৌঁছে গেলাম। গতি ছিল প্রতি সপ্তাহে ২০০ পৃষ্ঠা। কিন্তু যখন সেগুলো প্রকাশ করার কথা মনে পড়ত, তখন তো কোনো রাস্তা দেখতে পেতাম না।

৬ এপ্রিল খ্রীস্টানদের খুব বড় উৎসব ইস্টার-রোববার এলো। ক্যাথলিকরা সেটা আজ পালন করছিল, কিন্তু রাশিয়ায় গ্রিক চার্চের প্রাধান্য। তাদের উৎসব সামনের রোববারে (১৩ এপ্রিল) হবার কথা। লোলার ঠাকুরদাদা ফ্রেঞ্চ ক্যাথলিক ছিলেন, যে কারণে বাবা আর লোলা ক্যাথলিকই থাকল। আজ লোলা ইগরকে নিয়ে ক্যাথলিক চার্চে পূজা-প্রার্থনা করতে গেল। বাড়িতে তো ইগর রোজই যিশু খ্রীস্টের প্রার্থনা করতো, কিন্তু এই প্রথম ওর চার্চের ভেতরে যাবার সুযোগ এলো। বোজিন্‌কা (ভগবান) দর্শনের জন্য খুব উতলা হচ্ছিল। মনে করত যে গির্জায় অবশ্যই ভগবান বিরাজ করে। সেখানে আমি তো যাইনি। কিন্তু ওর মার মুখ থেকে সব কথা শুনলাম। সে সামনে বসে কাঁদছিল। এক ভক্ত বুড়ি দেখে বলল, 'কি সুন্দর-মনের ছেলে, ভগবান-ভক্তিতে গদগদ হয়ে কাঁদছে।' ইগর খুব চাইছিল ভগবানের কাছে পৌঁছতে কিন্তু উৎসবের কারণে খুব ভিড় ছিল, সেখান অব্দি পৌঁছনোর সুযোগ পেল না। তখন ও তাড়া দিতে থাকল, 'মামা কিনো (সিনেমা) শেষে হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করো।' এখানে ইগরের ভক্তি নগ্ন হয়ে গিয়েছিল। বোজিন্‌কা দর্শনের থেকে বেশি ফিল্‌ম নিজের দিকে টানছিল। জানিনা বুড়ি এই ভক্ত-হৃদয়ের শিশুকে এই রূপে দেখেছে কিনা। রাতের বেলা আমিও কখনো কখনো বোজিন্‌কার কথা বলতাম, আর জগতের সমস্ত সুখ, দুঃখ, অন্যায়-পক্ষপাতের জন্য দায়ী সেই সর্বশক্তিমান বলে তার এমন ছবি তুলে ধরতাম যে সে বোজিন্‌কাকে নয় বরং চোর্ত (শয়তান)-কে দেখতে পেত। লোলার এসব খুব খরাপ লাগত। ও চটে গিয়ে বলত, 'বাচ্চাদের সামনে এরকম বলা উচিত নয়।' আমি বলতাম, 'বাচ্চাদের মনকে নতুন শ্লেটের মতো রাখতে হয়। সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হবে না নাস্তিক হবে, সেটা ওদের ওপরই ছাড়ে দেওয়া উচিত।'

এটা আগেই বলেছি, যে রাশিয়ায় ভিক্ষে চাওয়াটা আইনত না, কার্যতও উঠে গেছে, কিন্তু কিছু ফাঁকিবাজ এটা বেশ লাভের কাজ মনে করে সুযোগ নিতে দ্বিধা করত না। গির্জার কাছে এরকম ভিখিরি মাঝে মাঝে দেখা যায়। এক বুড়িকে লোলা সেদিন পয়সা দিয়েছিল। বুড়ি তখন 'ক্রিসতুস্‌'-এর জন্য বলে তার ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে মাথা বুক আর দুটো কাঁধ ছুঁয়ে ক্রস বানালো। সেদিন ঘরে ফিরে ইগরকে যখন মা মিষ্টি দিল, তখন সে ঠিক বুড়ির মতোই 'ক্রিসতুস্‌'-এর জন্য বলে ক্রস বানালো। ক্রিসতুস্‌-এর ভক্তিতে পড়ে প্রতিবেশী তোসিয়ার ৭-৮ মাসের বাচ্চা কোলিয়ার হাতে তো ছুঁচ ফোটানোর চেষ্টা করে ইগর ধরা পড়েছিল এবং বাচ্চাকে সে ক্রুসবিদ্ধ করতে পারেনি। সেটা মনে করিয়ে দিয়ে আমি লোলাকে খুব করে বললাম, 'আগে হুঁস আসতে দাও, এখন থেকেই ধর্মের কড়া ওষুধ দিও না। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

১০ এপ্রিলে মস্কোর খবরে জানতে পারলাম, যে সেখানে নদী মুক্তধারা হয়ে বয়ে

চলেছে। এখানে নেবার ঘুম এখনো ভাঙেনি। তবে হ্যাঁ, কখনো-কখনো সরু ধারা বেরিয়ে আঁকাবাঁকা চালে দূর অব্দি গিয়ে বরফে গুম হয়ে যাচ্ছিল।

আমাদের বিভাগে হিন্দি বই-এর অভাব ছিল, নতুন বই তো আসতই না। ১১ এপ্রিল আমার নিজের লেখা এগারোটা বই পৌঁছল, যার মধ্যে 'জীবন-যাত্রা', 'মানব সমাজ', 'দিমাগী গুলামী', 'সতমীকে বাচ্চা' 'নয়ী সমস্যাএঁ' 'বিস্মৃতিকে গর্ভ মে' 'শৈতান কী আঁখ', 'সাম্যবাদহী কৌ্যা,' 'বাইসবী সদী' ছিল। আমি একটা করে কপি প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে দিলাম। প্রকাশক আরো হাল্কা হাল্কা কিছু বই পাঠিয়ে ছিল, এটা দেখার জন্য যে এগুলো সেখানে পৌঁছয় কিনা, কিন্তু এখন অন্য বই আনানোর সময় ছিল না। আমি কয়েকটি হিন্দি সংস্থাকে নতুন কিছু বই বিনা পয়সায় পাঠাতে লিখলাম। দাম পাঠাতে বিদেশী বিনিময়ের ঝগড়া এত ছিল, যার ফেরে পড়ে কাজটাই প্রায় হতো না। হ্যাঁ, সোভিয়েত রাজদূতের দিল্লী পৌঁছে যাবার পর এই অসুবিধে দূর হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

১৩ এপ্রিল রোববারে গ্রিক-চার্চ এর পাসখ (ইস্টর)-এর দিন ছিল। গ্রিক চার্চের অনুগামীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ সব বাড়িতেই উৎসব পালন করা হচ্ছিল। ইগর জিজ্ঞেস করল, 'মাম, উৎসবের দিন, কিন্তু ঝাণ্ডা-পতাকা নেই কেন?'

লোলা বলল, 'এটা সরকারি মহোৎসব নয় বাবা।' ছেলে কথাটা বুঝতে পারছিল না। সরকারি মহোৎসব কি আর বেসরকারি মহোৎসব কি। আজ অনেক অতিথি বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিল, যাদের মধ্যে তিনজন লোলা আর দুজন সিরিযোজা ছিল। এক লোলা, লোলার ভায়ের মেয়ে ছিল, আর দ্বিতীয় লোলা ওর বোনের ছেলে সিরিয়োজার বৌ। সিরিয়োজার ভগ্নীপতির নামও সিরিয়োজা ছিল। ভোজে মদ্যপান অবাধ ছিল। ভোজও ভালো ছিল। দু হপ্তার বাছুরের মাংসের স্যুপ, তার পরে ভেড়ার মাংস, বেকন, কেক ছিল। পনির আর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে খুব সুস্বাদু পাসখ হয়েছিল। সবাই পানপাত্র তুলছিল, ইগরই-বা কি করে চুপ করে থাকে? ওকে শরবতে লেবুর রস দেওয়া হয়েছিল। প্রথম চুমুকেই ওর ঘোর এলো। মনে হচ্ছে, ছেলের মধ্যে অভিনেতা হবার কিছু গুণ অবশ্যই ওর আছে। হয়তো দ্বিতীয় চুমুক খেতে খেতেই সে উলটে-পালটে যেত, কিন্তু শরবত দিতে সে দেখে ফেলেছিল, তাই নেশা খুব বেশি চড়ল না। মানিয়া আজ প্রচুর পান করে গিয়েছিল। ওর ওপর নেশার প্রভাব বেশি ছিল। এমনিতে সবার চোখই লাল ছিল। সেখানে সাধারণ মদকে পীবা বলে, যাতে নামমাত্র নেশা হয়, কিন্তু ভোদকা খুব নাম করা আর কড়া মদ, যা আজকাল বেশির ভাগ আলুর থেকে তৈরি হয়। শব্দার্থ নিলে 'পীবা' সংস্কৃতর পেয়, আর 'ভোদকা' সংস্কৃতের উদক। রুশ ভাষায় বদা (উদা) জলকে বলে, কিন্তু 'ক' আরো জুড়ে দিলে ভদকা (ভোদকা)-র অর্থ কড়া মদ হয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশী তার সাত মাসের বাচ্চাকে পীবা নয় ভদকার পেয়ালা চাখাল। শেষমেশ ওকে ছোটবেলা থেকেই তো অভ্যেস করাতে হবে। পাসখ উৎসব হয়ে দাঁড়ালো। উৎসবে যদি এতো জিনিস না রান্না হয়, যাতে দু-তিন দিন চলে, তাহলে সে আর উৎসব কি?

১৯ এপ্রিল থেকে এক হপ্তা ইগরকে একটানা জ্বরে ধরল। বাঁচোয়া যে ছোঁয়াচে রোগ নয়,তাই সে বাড়িতেই রইল। দ্বিতীয় দিনেই ডাক্তার ডাকা হলো, তারপর ফের সে প্রতিদিন আসতে থাকল। যদি ফিজ দিতে হতো, তাহলে সমস্ত অসুখটায় হাজার হাজার রুবল খরচা হতো। চিকিৎসার জন্য সোভিয়েতে কারুরই এক পয়সা খরচা করা দরকার হতো না। সঠিক ভাবে অসুখের কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই আমরা ডাক্তারের পরামর্শে ইগরকে পাড়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, যা পাশেই ছিল। তার তিনতলা বিশাল এবং সুন্দর অট্টালিকা আর কর্মচারীদের সেনাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এটা পাড়ার হাসপাতাল। সেখানে চিকিৎসা-ব্যবস্থা সরকার বিনে পয়সার করে রেখেছিল। শিশু-নিকেতন হোক বা শিশু-উদ্যান, পাঠশালা হোক বা চিকিৎসালয়, যত বড় মাপের তার ব্যবস্থা এবং তার যা বার্ষিক-খরচ তা দেখে তো আমি ভারতের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে নিরাশ হতাম। সোভিয়েত সরকার যত লেনিনগ্রাদের হাসপাতালগুলোরে পিছনে খরচ করে, সেটা আমাদের উত্তর-প্রদেশের পুরো বাজেটের সমান। তাই আমরা এখানে কি করে ওদের অনুসরণ করতে পারি? রোন্তেগেন (এক্স-রে)-এর ঘরে নিয়ে গিয়ে ইগরের ফুসফুস ইত্যাদি। ভালোমত পরীক্ষা করল। আমাদের এখানে যাকে এক্সরে বলে, তার আবিষ্কারক জার্মান বৈজ্ঞানিকের নামে তাকে রাশিয়ায় আর অন্যান্য দেশে 'রোন্তেগেন' বলা হয়। এক্সরের ডাক্তার বলল টি· বি·-র প্রভাব নেই। অন্য ডাক্তার বলল, একটানা জ্বর কাজেই হাসপাতালে রাখা হোক। কিন্তু লোলার মাথায় এ কথা সহজে ঢুকবে না, ওর ডাক্তার বা ওষুধের থেকে বেশি নিজের হাতের রান্নার ওপর ভরসা ছিল। আমরা আবার একটা বড় হলঘরে গেলাম। সেখানে অনেক মহিলা কাজ করছিল। চিরকুট দেবার পর এক মহিলা অনেকগুলো টিউবে আর স্লাইডের ওপরে ইগরের রক্ত নিল। এটা স্পষ্ট যে এখানকারের ডাক্তার অত্যন্ত বস্তুবাদী এবং জিজ্ঞাসাবাদে এদের ততটা বিশ্বাস নেই, এদের বেশি বিশ্বাস নিজের যান্ত্রিক মাধ্যমগুলোর ওপর।. মহিলাটি এক ডজন টিউবে ইগরের রক্ত নিয়ে ইগরের নম্বর আটকে দিল। এখন সে অন্য কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছে পরীক্ষা করতে যাবে, যেখান থেকে সে আলাদা-আলাদা বিষয়ের রোগ-জীবাণুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির খবর দেবে। রক্ত নেওয়ার কাজে মহিলা খুব দক্ষ ছিল। তার যন্ত্রপাতিও যন্ত্রচালিত ছিল যাতে হয়তো সেকেন্ডের শতাংশ ভাগে ক্ষত হয়ে রক্ত বেরোত। মস্তিষ্কে ক্ষতের খবর পৌঁছনোর আগেই কাজ হয়ে যেত, তাহলে কষ্ট বোধ কষ্ট কেন হবে? এই বিশাল কর্মক্ষেত্র দেখার সময় আমার এও মনে হচ্ছিল যে, একটা লেনিনগ্রাদের একটা পাড়ার চিকিৎসালয়।

২৪ এপ্রিলে ইউনিভার্সিটি যাবার সময়, নেবা পুরোদমে জেগে মুক্তপ্রবাহ ছিল। হয়তো দু-একদিন আগেই সে বরফমুক্ত হয়েছিল। এখন বরফের চিহ্ন কোথাও ছিল না। আজ গরমও লাগছিল। চামড়ার ওভারকোট আর টুপি বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম, কিন্তু যখন সন্ধেবেলা ফিরছিলাম, তখন শীতও ফিরে এসেছিল, তাই নিজের বোকামিতে হাসি পাচ্ছিল।

পয়লা তারিখে আবার মে-মহোৎসব এসে গেল। আবার ঝাণ্ডা, পতাকা আর নেতাদের ছবি, যোজনার রেখাচিত্র জায়গায়-জায়গায় আঁটা ছিল। আমার মে-দিবস দেখার দরকার ছিল না, তাই বাড়িতে রেড়িওতেই উৎসবের সব কথা শুনতে থাকলাম। হ্যাঁ, সেদিন তিন ছেলে নিয়ে এক স্ত্রীলোক ভিক্ষে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমাদের পাড়ার এক কোনায় ছিল, আশেপাশে পুলিশ ছিল না, তাই সে নির্ভয়ে নিজের এই কাজ করতে পারছিল। শুধু নিজের লজ্জাটুকু ঝেড়ে ফেলার দরকার, তখন আর এতটা নির্লজ্জ কে হবে, যে একটুকরো রুটি বা এক রুবল দিতে রাজি হবে না?

নেবা লদোগা নামে একটা বিশ্রী ঝিল থেকে বেরিয়ে আসে, যার বরফ তাড়াতাড়ি শেষ হয় না, তাই মুক্তপ্রবাহ নেবার ধারায় এখন লদোগা থেকে বয়ে আসা বরফের বড় বড় টুকরো আসছিল। লোকেরা বলছিল যে এর জন্যেই এখন শীত বেড়েছে, এমনিতে সূর্যের দর্শন একটানা হচ্ছিল। বয়ে আসা বরফখণ্ডের সঙ্গে হাওয়াও খুব সাহায্য করে ছিল, তাই আমরা বসন্তকে পুরাদমে নিজেদের কাছে পাচ্ছিলাম না।

১০ মে এক জায়গায় কিছু ছোট-ছোট পাতা আমি দেখলাম, দু-এক জায়গায় সবুজ ঘাসও বেরিয়েছিল। নগরে এমনিতে শিশু-উদ্যান ছাড়া শ্যামলিমার অভাব ছিল। পাঁচ মাস ধরে শ্যামলিমার জন্য ব্যাকুল হওয়া চোখ কেনই-বা সবুজ পাতা আর ঘাসের দিকে আটকে যাবে না? বসন্তের মূল্য এখানকার লোকই বুঝতে পারবে।

আবার যাত্রাপথের চিন্তা করা দরকার ছিল, কেননা এপ্রিলের অর্ধেক মাস কেটে যাচ্ছিল আর হয়তো জুনেই এখান থেকে যেতে হতো। লন্ডনের এক বন্ধুকে লিখে জানতে পারলাম সেখান থেকে বোম্বাই অব্দি জাহাজের ভাড়া ৭২ পাউণ্ড। জাহাজের অভাব আর যাত্রীর আধিক্যের জন্য কখনো-কখনো পুরো মাস অপেক্ষা করতে হয়। সে এও লিখল, সে লন্ডনে পুরো মাসের খরচ চাই ৪০ পাউন্ড। ১১২ পাউণ্ড সিধে হিসেবে আসছিল, অথচ এখানে আমার কাছে মাত্র ৬০ পাউণ্ডের চেক রয়ে গিয়েছিল,তাই সেখানে হয়ে যাবার ইচ্ছে ছেড়ে দিতেই মন চাইছিল। কৃষ্ণ সাগরের রাস্তার দিকে কখনো কখনো মন যেত। খোঁজ নিয়ে বুঝতে পারলাম যে অদেসা বন্দর থেকে সোভিয়েতের জাহাজ বরাবর আসতো। সোভিয়েত জাহাজে সবচেয়ে বড় সুবিধে ছিল, যে আমি সোভিয়েতের মুদ্রা ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আরো জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে সোভিয়েত জাহাজ বোম্বাই-এর দিকে যায় না, সে ফিলিস্তিন-এর বন্দরে নামিয়ে আমেরিকার দিকে চলে যাবে। ফিলিস্তিন থেকে পোর্টসইদ পর্যন্ত যাওয়ার টাকা কোথা থেকে আসবে আর পোর্টসইদ থেকে বোম্বাই-এর জন্যও তো ভাড়া চাই? যদি যুদ্ধ না হতো, তাহলে আমার ৬০ পাউণ্ডের চেকের ওপর রাশিয়ার নাম থাকাটা দরকার ছিল না। তখন আমরা সহজেই ফিলিস্তিন বা পোর্টসইদে নিজের চেক ভাঙাতে পারতাম, কিন্তু সে তো হবার কথা নয়। এখন আমি যাত্রাপথের ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তায় পৌঁছতে পারিনি। এইটুকু বলতে পারি যে এখন ভারত যাওয়াটা নিশ্চিত। ইগর এ বছর দুবার অসুস্থ হল, যার জন্য ওর পড়াশুনোর ক্ষতি হলো। শেষ অব্দি পরীক্ষার সময়ও অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে রইল। কিন্তু সোভিয়েতের শিক্ষা-বিভাগের শুধু পড়ানোর

নয়—বাচ্চাদের অগ্রগতির চিন্তাও আছে। তাই ইগরের অধ্যাপিকা বাড়ি এসে ওর পরীক্ষা নিল। গণিত আর রুশ ভাষার পরীক্ষাতে ও ৫ নম্বর করে পেল, মানে একশোর মধ্যে একশো। হাতের লেখা অতটা ভালো নয়, তাই ৪ নম্বর পেল, আঁকায় ৪ নম্বর। সবচেয়ে কম নম্বর ও শারীরিক ব্যায়ামে পেল অর্থাৎ ৩, যেটা হচ্ছে পাস মার্ক। আজ সব মা-বাবা নিজের বাচ্চাদের সফলতা সম্বন্ধে জানতে স্কুলে জমা হয়েছিল। অধ্যাপিকারা সারা বছরের হিসেব দিল। ইগর নিজের ক্লাশে প্রায় সব বিষয়ে প্রথম হলো, সেটা জেনে খুশি হলাম।

শেষ মাস

সিনেমা কোনো দুর্লভ জিনিস ছিল না, আমার কাছেই নয়—অন্যান্য নাগরিকদের কাছেও একই কথা। সে তো গ্রামে পর্যন্ত সুলভ ছিল। কিন্তু নাটক ছিল দুর্লভ বস্তু, তার মধ্যে ব্যালে (কথাকলি) আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। এখন আসতে যেতে তার দেখার সুযোগ আমার হাত থেকে ছাড়তে আমি রাজি নই, তাও প্রতি হপ্তায় একটার বেশি দেখতে পছন্দ করতাম না। সেই সময় 'জোলুস্কা' নামে ব্যালে হচ্ছিল। রাশিয়া তার ব্যালের জন্য অদ্বিতীয়। সর্বোৎকৃষ্ট নৃত্য আর অভিনয় দেখতে যদি হয় তো রাশিয়ার ব্যালে দেখো। আমি ভাবছিলাম, সোভিয়েতের অভিনেতা যদি ইউরোপ অব্দি কলার প্রদর্শন করতে যায়, তাহলে কি একে ভারতে পাঠানো যায় না? সেখানে ভাষারও প্রশ্ন নেই। তার কাছে যেরকম লেনিনগ্রাদ, সেই রকমই লন্ডন আর সেইরকমই দিল্লী। কিন্তু আবার মনে হতে অভিনয়ের জিনিস আর শিল্পীদের পিছনে যে মুক্তহস্তে খরচ এখানে করা হচ্ছে, তাতে ওদের নিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে। অর্ধসহস্র নট-নটী বাদক আর বাদিকা এখান থেকে ভারতে পাঠানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হবে। যদি তা কম করা হয়, তার জন্য ব্যালেকে কাট-ছাঁট করতে হবে, তাহলে হয়তো পাঠানো যেতে পারে। এটা দেখে ভারতীয় নাগরিক আর শিল্পীদের চোখ খুলে যাবে। ওরা ভাববে যে এই সেই বলশেভিকদের দেশের জিনিস, যাদের কলা আর সংস্কৃতির শত্রু মনে করা হয়।

২০ এপ্রিলে লোলার ছেলেবেলার বান্ধবী বেরা নিকোলায়েভনার খবর এলো ওর কারবাঙ্কল (বিষ-ফোঁড়া) হয়েছিল, বেচারা খুব কষ্টে বেঁচেছিল। এদিকে বেশ ক-মাস ধরে সে লেনিনগ্রাদ আর কিবিশিয়েফকে এক করার চেষ্টা করছিল। বাবার একমাত্র মেয়ে। লোলা আর ওর বাবা একই শ্রেণীভুক্ত এবং বন্ধু ছিল, তাই তাদের মেয়েদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। বেরার বাবা এক নামকরা ইঞ্জিনিয়র। খুব ধনীও। তার কাছে এক বাক্সভর্তি রুপো, সোনা আর দামী চীনে মাটির বাসন ও অন্যান্য জিনিস ছিল, যা সঙ্গে না

নিয়ে সে যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদ ছাড়তে রাজি ছিল না। জার্মান লেনিনগ্রাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তাই এরকম দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হারাতে সরকার রাজি ছিল না। শেষে সোভিয়েত সরকার নিজের বিশেষজ্ঞদের নজরবন্দী করতে তৈরি থাকেই, তাই বেরার বাবাকে একটা মাল বওয়ার বাক্স দেওয়া হলো। তাতে বুড়ো নিজের জিনিসপত্র ভরে নিয়ে কিবিশিয়েফ পৌঁছল, যেখানে সেই সময় সোভিয়েতের অস্থায়ী রাজধানী ছিল। বেরার স্বামী যুদ্ধের পরে লেনিনগ্রাদ চলে এলো। তাই বেরা সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকতে পারছিল না। বাবার মৃত্যুর সময় কাছে ছিল। মেয়ের কাছে খবর এলো। পৌঁছতে-পৌঁছতে দু-চারদিন তো লেগেই গেল, তখন পর্যন্ত বহু জিনিসই পরিচারিকা সরিয়ে ফেলেছিল। সে এও দাবি করেছিল যে সে বুড়োর পত্নী, তাই সম্পত্তি যা আছে-টাছে— অন্তত পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি— তাতে তার ভাগ আছে। বেরা বেচারিকে এখন দেওয়ানি আদালতের মুখ দেখতে হবে। তবে এটা ঠিকই যে বিয়ের রেজিস্ট্রি হয়নি, তাই পরিচারিকার কাছে বিয়ের কোনো প্রমাণপত্র ছিল না কিন্তু সোভিয়েত আইন বিয়ের জন্য রেজিস্ট্রিকে অনিবার্য বলে মানে না। এখন মামলা সাক্ষীদের ওপর নির্ভর করছিল। সাক্ষী বেরার পক্ষেই পাওয়া যাচ্ছিল, তাই ওর বিশ্বাস ছিল, যে সমস্ত সম্পত্তি ও পেয়ে যাবে। তার একটা কাপবোর্ড (আলমারি)-এর খুব চিন্তা ছিল। বলছিল, 'আলমারির দেরাজের এক কোনায় আমার বাবা বাড়ির পুরনো মণিমুক্তোগুলো লুকিয়ে রেখেছিল, যার কথা বাবা আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।' যে করে হোক, সেই কাপবোর্ডকে সে নিজের হাতে করতে চাইছিল, কিন্তু এখন অব্দি তাতে সফল হয়নি। মধ্যিখানে বেচারি দু-তিন মাস ধরে এই বিশ্রী অসুখে ফেঁসে গেল আর সঙ্কোচের জ্বালায় সে তার বাল্যবান্ধবীকেও সবে বলেছে। বেরার এই উদাহরণ থেকে সোভিয়েতের দেওয়ানি মোকদ্দমারও একটু নমুনা পাওয়া যায়। সোভিয়েতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, যদিও জমিও কলকারখানা ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমগুলো কারো নিজস্ব সম্পত্তি হতে পারে না। অন্য রূপে মানুষ লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি রাখতে পারে। বস্ত্র ও ভূষণ, বহুমূল্য রত্ন, বাসন, চিত্রপট, বাড়ির জিনিসপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক জিনিসের উত্তরাধিকারী হিসেবে সোভিয়েত সরকার এখানে স্ত্রীলোকদের আর বাচ্চাদের মানে এবং লালসার দৃষ্টি দিয়ে তা দেখে না।

২২ এপ্রিল ইগরকে নিয়ে প্রাণী সংগ্রহালয়ে গেলাম। এখন একটা সিংহ এসেছিল বাকি সব একই জন্তু ছিল, যা আমরা আগের বছর দেখেছিলাম। হ্যাঁ, একটা উট আর একটা সাদা ভালুকও অবশ্যই ছিল। উটের পিঠে বাচ্চাদের চাপিয়ে ঘোরানো হতো। ইগর দেখতে খুব ভালোবাসত। কিন্তু ও উটেও চড়তে চাইত না আর ঘোড়াতেও না।

এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকলাম এই মনে করে যে এবার তো চলে যাবার সময়। কিন্তু ১৫-২০ পাউণ্ড ছাড়া কাজ বিগড়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম যদি কাবুল অব্দি বিমান যেত, তাহলে কত ভালো হতো! কিন্তু ভালো বললে থোড়াই ভালো হয়। তেহরান অব্দি বিমান যেত, কিন্তু ইরানের রাস্তা দিয়ে ফিরতে আমি মোটেই রাজি ছিলাম না। আমি জানলার ধারে বসে এই ধরনের কথাবার্তাই ভাবছিলাম। আর লোকেরা বাইরে পড়ে

থাকা জমিতে আলু আর অন্যান্য তরকারি রোপন করছিল। ২৫ এপ্রিল বৃষ্টি হয়েছিল, লোকেরা কাজে লেগে গিয়েছিল। এখানে গ্রামের খেতগুলোতে শাক-সবজি আর গম ইত্যাদি বোনা হচ্ছিল। সেই সময় তুর্কমানিয়ায় সবে ফসল কাটা হয়েছিল। তুর্কমানিয়া যদিও সোভিয়েতের সব চেয়ে গরম প্রদেশ বলে ধরা হয়, কিন্তু সেখানে এরকম স্থান নেই, যেখানে বছরে একবার বরফ পড়ে না।

২৫ এপ্রিলে দিল্লী রেডিওর খবর শুনে আমি বলতে লাগলাম, কি এমন হলো যে এখন হিন্দি শব্দও চলে আসছে? দিল্লী রেডিও তো হিন্দুস্তানীর নামে উর্দুর পৃষ্ঠপোষক ছিল। কখনো কখনো মাথা ধরানো প্রোগ্রামও আমার রেডিওতে চলে আসত। ২৭ এপ্রিল অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের নাটক প্রচারিত হলো, যেখানে লেখক বারুদের বিস্ফোরণও ঘটিয়েছিল। ঐতিহাসিক গল্প আর নাটক দেখালে তৎকালীন সমাজের বিষয়ে জ্ঞান থাকার একেবারেই আবশ্যকতা আছে বলে মনে করত না। পৃথিবীর কত কত প্রান্তের আর কেমন কেমন মানুষ এই ধরনের নাটক শুনছে। তারা আমাদের অগভীরতায় না জানি কত হাসাহাসি করছে!

২৯ এপ্রিল এলো। এখন বিদেশী বিনিময় আর সোভিয়েত থেকে বাইরে যাবার (রপ্তানি মালের) ভিসা নেবার চিন্তা হলো। পড়ানোর কাজ আর দু-তিন দিনই বাকি থেকে গিয়েছিল, তার পর বার্ষিক ছুটি হয়ে যাবার কথা। সরকারি ব্যাঙ্কে গেলাম। বলা হলো—বিদেশী চেকেব বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে না। তারা রুবল দিতে রাজি কিন্তু আমার কাছে তো কয়েক হাজার রুবল ছিল। এটাই বোঝা গেল যে অন্য রাস্তা না পেলে লন্ডনের রাস্তাই ধরতে হবে। লন্ডন আর কাবুল—ব্যাস, এই দু দিকেই লক্ষ্য ছিল। তাড়াতাড়ি যেতে আর কিছু নতুন জিনিস দেখার পক্ষে তো কাবুলের রাস্তাই ভালো ছিল, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে যাবার পক্ষে ছিল লন্ডনের রাস্তা। ইন্তুরিস্তের লোকেরা আমাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারত না। ওরা মস্কো যাবার উপদেশ দিচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম যদি মস্কো যেতেই হয় তো ওদিক থেকে ওদিকে যাওয়াই ভালো হবে। তেহরান যেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। সেখানে এত পরিচিত ছিল, যে ভারতে ফিরতে টাকা পাওয়া যেত, অথবা দু-চারদিন থেকে টেলিগ্রামে টাকা চাওয়া যেত কিন্তু চার মণ বই যে সঙ্গে ছিল।

জুন মাস শুরু হয়ে গেল। ৩ তারিখে লন্ডনে ৯° ফারেনহাইট তাপমাত্রা ছিল। লোকেরা গরমের চোটে ছটফট করছিল। আর এখানে আজ বৃষ্টি ছিল না, তাও শীত সঙ্গ ছাড়া হতে চাইছিল না। মে-র শেষ সপ্তাহ থেকেই পুরোপুরি শ্বেত রাত্রি শুরু হয়ে গেল, তার ফলে এখন অখণ্ড দিবালোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এই বছরের প্রস্তুতি বেশি বলে মনে হচ্ছিল। যুদ্ধের দিনে উদাস হয়ে যাওয়া লেনিনগ্রাদের এক বিশাল উদ্যান বাবুস্কিন এখন খুব সাজানো ছিল। মদ্য, ভোজন ইত্যাদির দোকান খুলে গিয়েছিল। ছেলেদের ঝোলার জন্য কাঠের ঘোড়াও লেগে গিয়েছিল। রঙ করা আর পরিষ্কার করার কাজও হয়ে গিয়েছিল। একদিকে বাবুস্কিনের ওপর হিটলারী আক্রমণের চিহ্ন ছিল না। এটা বাড়ির থেকে বেশি দূরে ছিল না তাই চাইলে রোজ বাবুস্কিন উদ্যানে যেতে

পারতাম, কিন্তু আমার বেড়ানোর আর ইগরের পরিশ্রমের খেলা খেলতে কম শখ ছিল। ৫ জুনে যখন আমি ওখানে গেলাম, তখন ইগরের সমবয়স্ক মেয়েরা যত ভালোভাবে খেলছিল, ও ঠিক ততোটাও খেলতে পারছিল না। চার বছরের মেয়েও যদি ধমকে দেয় তো সে ভয় পেয়ে যায়। আমি ভাবছিলাম—এত ভয় কিসের? এটা কি স্বাভাবিক ভীরুতা, না ক্যাঙ্গারু মায়ের লালন-পালনের পরিণাম? হয়তো দুটোই। পড়াশুনোয় সে ভালো হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানো হয় যে সাহিত্যের বই তা সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা বসে পড়তে থাকতো, কবিতাও বুঝত আর রস নিত, কিন্তু মনে হচ্ছিল, শারীরিক সাহসের কাজে সে পেছনেই থাকবে। হয়তো পরে যখন বুদ্ধির তালা পুরো খুলে যাবে, তখন সে নিজে-নিজেই চিন্তা করে এতটা ভয় পাওয়া পছন্দ করবে না।

৭ জুনে গরম লাগছিল, কিন্তু গরম মানে আমাদের এখানকার গরম কাল না। কোনো সময় আমার স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে পড়েছিলাম—

'মঈ কা আন পহুঁচা হৈ মহীনা। বহা চোটী সে এড়ী তক পসীনা।'[১]

কিন্তু এখানে মে মাসের এখনি তো কাপড় ছাড়বার সাহস ছিল না। তবে আজ তাপমাত্রা ৩০° সেন্টিগ্রেডের নীচেই নামছিল। এটা এখানকারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রতিমাস একই তাপমাত্রার পুনরাবৃত্তি নাও হতে পারে।

৯ তারিখে আমরা সাংস্কৃতিক উদ্যানে গেলাম। আগের বছর জুনে নদীতে সাঁতার কেটেছিলাম, কিন্তু এখন জল ঠাণ্ডা ছিল। লোকেরা তাই আগের বছরের মতো স্নান করার সাহস দেখাচ্ছিল না।

ইন্তুরিস্ত বলল যে আজ (৭ জুন) এখান থেকে লন্ডনের জাহাজ ছাড়ছে। এখন প্রত্যেক ১৫ দিন অন্তর একটা জাহাজ যাবে। সামনের মাসে ৫ জুলাই-এর কাছাকাছি তার যাওয়ার কথা শুনে আমি সেই দিনই প্রস্থানের দিন স্থির করে বন্ধুদের জানালাম, যাবার সময় প্রায় নিশ্চিত হতে চলেছিল। মনে বিচিত্র রকমের ভাব উৎপন্ন হচ্ছিল। ২৫ মাস লেনিনগ্রাদে থেকে সে-জায়গা ছাড়তে হচ্ছে। ওখানকার অভিজ্ঞতা বেশিটাই মধুর ছিল, কটু অভিজ্ঞতার মাত্রা খুব সামান্য ছিল, আর তার মধ্যেও যেটা মনে খটকা লাগছিল তা হলে কলম থেমে থাকা। অদেস্সাতে চিঠি দিয়ে ইন্তুরিস্ত খবর চাইল। এইটুকুই জানতে পারলাম যে সেখান থেকে আমেরিকাগামী জাহাজ জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে যাবে আর হায়ফায় (ফিলস্তিন) আমাকে ছেড়ে দেবে। তারপরের সমস্যার কোনো সমাধান ছিল না।

১৫ জুন (রোববার) সংস্কৃতি উদ্যানে একদিন ছুটি কাটাতে গেলাম। সত্যিই এ বছর তার আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। উদ্যান খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর সুব্যবস্থিত ছিল। অট্টালিকাগুলো সারানো আর তার ওপর রং লেপাও হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এখন কোনো অভিযোগ ছিল না, ছিল না টেবিলে বসে অনেকক্ষণ

[১] 'মে মাস চলে এলো। মাথার ঘাম নামলো পায়ে।'—স·ম·

অপেক্ষা করার প্রয়োজন। আগের বছর থেকে নিঃসন্দেহে খুব উন্নতি হয়েছিল। তেমন গরম ছিল না, তাই আজ নদীতে স্নান করবার লোক কম ছিল। এক জায়গায় ময়দানে মার্কিন বাজনা হচ্ছিল, আর দ্বিতীয় জায়গায় বাদ্য, গান আর নৃত্য হচ্ছিল। আজ এটা দেখে খুশি হলাম, যে গত দু-বছরে লোকেদের যেসব ব্যাপারে নালিশ ছিল, সে সব দূর হয়েছিল। বস্তুত, সোভিয়েতরা প্রথমের কাজ প্রথমে করতে জানে। প্রথমে থাকার এবং উৎপাদনের উপযুক্ত বাড়ি-ঘর আর কারখানা বানানো আবশ্যক ছিল, তাই তাদের সমস্ত চিন্তা সেদিকে ছিল, এখন অন্য সব দিকে মন দিচ্ছিল। নেবস্কী রাজপথ ও অন্যান্য রাস্তায় পড়ে যাওয়া, বা ভাঙা-চোরা বাড়িঘর পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছিল—মুখ্য নগরে যুদ্ধের কোনো চিহ্ন প্রায় ছিল না। শুধু বাড়ি-ঘরের নির্মাণ আর মেরামতের দিকেই মন দেওয়া হয়নি, তার ওপর সুন্দর রঙও লাগানো হয়েছিল। রঙের কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠনগুলো খুব সাহায্য করেছিল আর এই ভাবে তারা অন্যান্য মজদুরদের অন্য কাজের জন্য মুক্ত করে দিয়েছিল।

আমি খবর নিচ্ছিলাম যে সুদূর পূর্বের দিকে যাওয়া কোনো জাহাজ যদি পাওয়া যায়। ভেবেছিলাম হয়তো ভারত মহাসাগর থেকে ব্লাদিভোস্তকের জাহাজ যায়, যাতে আমি কলম্বোয় গিয়ে নামতে পারি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে এরকম কোনো জাহাজ পেলাম না। অদেস্‌সা থেকে ৫ জুলাই আমেরিকাগামী জাহাজ হায়ফায় ছেড়ে দেবে, তা জানতে পারলাম। এক সহৃদয় মহিলা নিজের কাছে অনেকদিন ধরে রাখা ১২ ডলার আমাকে দিয়ে দিলেন, কিন্তু তিন সাড়ে তিন পাউণ্ডে কিবা হতো? হ্যাঁ, এ দিয়ে বক্ষুতট থেকে মাজারশরীফ তো আমি পৌঁছতে পারতাম? কিন্তু ১৯ জুনে আমার বন্ধু ডঃ বাঁকে বিহারী মিশ্রর চিঠি লন্ডন থেকে এলো, যার জন্য আবার চিন্তাধারা পাল্টাতে হলো। তিনি জানিয়েছেন এখান থেকে বোম্বাই পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাড়া ৫২ পাউণ্ড, আর লন্ডনে থাকতে সপ্তাহে ৫ পাউণ্ডে কাজ চলে যাবে। ৬০ পাউণ্ডের চেক আমার কাছে ছিল, তাই অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে এটা করা সম্ভব ছিল। বাঁকেজী আমার পুরনো সহযোগী বন্ধু ছিলেন। বিহারে কৃষক-সত্যাগ্রহ করে আমি জেলে গিয়েছিলাম। তখন তিনি এক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ ছেড়ে কৃষক-সত্যাগ্রহ সামলান এবং খুব একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেন। এদিকে ইতিহাসে পি· এইচ· ডি করার জন্য তিনি লন্ডন এসেছিলেন। তাঁর পরামর্শ ছিল এক সঙ্গে ভারতে ফেরার। আমি তাঁকে লিখে দিলাম, যে পাঁচ জুলাই-এর জাহাজে এখান থেকে যাব আর ১৯ জুলাই লন্ডন পৌঁছবো।

২০ জুন, জানলা দিয়ে দেখছিলাম লোকেরা খেত থেকে আলু তুলছিল। নিড়িয়ে জল দেওয়াও শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের আলু 'রামের ভরসা'য় চলছিল।

২১ জুন থেকে যাত্রার প্রস্তুতির জন্য কিছু জিনিসও কেনা হতে লাগল। কাপড়-চোপড় আমি তো নেব না। ১৫ রুবলে একটা টুথপেস্ট কিনে আনলাম। পোর্টফেলের দাম ১১০ রুবল। আমি ভাবলাম, বাইরে আরো সস্তায় পাওয়া যাবে, তাই কেনার কি দরকার? আমাদের প্রতিবেশী ইঞ্জিনিয়ার মহিলাকে যখন শাক-সবজির সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক লেনিনগ্রাদ থেকে ৩০

কিলোমিটারের কাছে নিজের তরকারির খেত করে রেখেছে। প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে চলে যায়। যখন বিশ-তিরিশ রুবল কিলোগ্রামে আলু কিনতে পাওয়া যায়, তখন মানুষ কেন ২০ মাইল অব্দি দৌড়বে না। হ্যাঁ, এই খেত রেল স্টেশনের কাছে। যুদ্ধের কারণে অনেক গ্রাম জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল, তাই খেত পেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। পুঁজিবাদী দেশে এটা হতে পারে না, জমি পড়ে থাকলেও মালিককে বেদখল কি উপায়ে করবে?

তালাকের আইন কড়া করলে কি অবস্থা হতে পারে, তার উদাহরণ আমাদের প্রতিবেশী মহিলা তোসিয়া ছিল। সে বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি ছিল। সে প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছিল। মদখোর হওয়া আর মার-পিট করাটা হয়তো কারণ হবে। সে এখন অন্য এক পুরুষের স্ত্রী। তার সঙ্গে ও বেশ কয়েক বছর আছে। স্বামী যুদ্ধের পর সেনা থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি এসেছিল—দুজনের ৭-৮ মাসের বাচ্চা কোলিয়া ছিল। তালাক নেওয়া মুশকিল ছিল বলে প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়নি। এখন কোলিয়া কাগজ-কলমে তার বাপের নয়—তার মায়ের স্বামীর পুত্র। ইগরের মাসতুতো বোন লোলাও বিয়ে করেছিল, ওর স্বামীরও প্রথম স্ত্রী ছিল। তালাক নিতে দু-হাজার রুবল দণ্ড দিতে হতো, তাই দু-জন রেজিস্ট্রি না করেই বিয়ে করে এক সঙ্গে থাকা শুরু করে দিল। এটা বিচিত্র বলে মনে হতো। একটা স্বচ্ছন্দ সমাজে এত কঠোর বৈবাহিক নিয়ম কেন রাখা হয়েছে? কেন পুত্রকে নিজের বাবার নাম বাদ দিয়ে অন্য আরেক জনের নাম রাখতে জোর করা হবে? কিন্তু এর সমাধানে বলা হয় 'তালাক সুবিধে করে দেওয়া ভালো নয়। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের প্রভাব শুধু তাদের মধ্যেই সীমিত থাকে না, তা তাদের সন্তানের ওপরেও এসে পড়ে। তালাক সুবিধে করে দিলে বহু পরিবার তাড়াতাড়ি গড়বে-ভাঙবে, যা সন্তানদের পক্ষে ভালো হবে না।' যদিও তোসিয়া আর কোলিয়ার অবস্থাকে আমরা ভালো মনে করতাম না, তবু পারিবারিক স্থায়িত্ব বেশি লাভদায়ক ভেবে আমাদের তালাকের কড়া নিয়ম বানাতেই হলো।'

২৫ জুন আমি নির্গম ভিসা (দেশের বাইরে যাবার আজ্ঞাপত্র)-র জন্য আবেদন পত্র দিতে গেলাম। অফিসার বলল যে যদি দক্ষিণ সীমান্ত (আফগানিস্তানের রাস্তা) দিয়ে যেতাম তাহলে তারা দু-দিনে ভিসা দিয়ে দিত, লন্ডনের রাস্তা হয়ে যাবার ভিসা মস্কোর স্বীকৃতি নিয়ে দিতে হতো, যাতে অনেক দিন লাগতে পারে। জুলাই-এর ৫ তারিখে যাওয়াটা অনিশ্চিত হয়ে গেল। তাই লন্ডনের রাস্তা ছেড়ে দেবার কথা মনে হতে লাগল। ভাবলাম, আফগানিস্তানের রাস্তা দিয়েই যাই না কেন?

এখন বিছানাপত্র বাঁধা আর দেখার কাজ বাকি রইল। ২৭ জুনে আমি আবার রাশিয়ার ম্যুজিয়ম দেখতে গেলাম। এখন তো সব ঘর সাজানো শেষ হয় নি, কিন্তু অনেক ছবি আর অন্যান্য জিনিস দেখতে পেলাম। ছবি দেখে বুঝলাম, যে একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী অব্দি এখানেও পুরনো ঢঙের বেশির ভাগ কাল্পনিক আর ধর্মীয় চিত্র বানানো হয়। আমাদের এখানকারের মত বাস্তবতার সঙ্গে ওদের নিকট-সম্বন্ধ ছিল না। তাই পোর্টরেট (ব্যক্তি-চিত্র) তৈরি হয়নি। ভারতীয় শিল্পকলা গুপ্তযুগে উন্নতির

শিখরে পৌঁছেছিল। সেই সব চিত্র আর মূর্তি দুটোই খুব সৌন্দর্য ও ভাবপূর্ণতা নিয়ে তৈরি হতো; কিন্তু পোর্টেটের বিষয়ে আমাদের শিল্পীরা একেবারে বাচ্চাদের মত, গুপ্তযুগের সীলমোহরকে গ্রিক ব্যাকটেরিয়ার মোহরের সঙ্গে মেলালে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। চতুর্দশ শতাব্দী অব্দি এই অবস্থা রাশিয়ারও ছিল। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে যিশু হওয়ার আগের ছবি এবং দেবমূর্তি রাশিয়ায় পাওয়া যায় না। হালে পুরনো শকদের কিছু পুরনো নগর খোঁড়া হয়েছে, যাতে কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। তার ওপর গ্রিক প্রভাব পরিষ্কার। বিশাল শক-জাতি খ্রীস্টাব্দের আরম্ভের সময় চীনের সীমা থেকে দানিয়ুবের তট পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তাদের এই পূর্বাঞ্চলের ওপর ভারতীয় সংস্কৃতি নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেখানে পশ্চিমাঞ্চলে গ্রিক প্রভাব পড়ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে রাশিয়ার চিত্রকলা একটু একটু বাস্তবিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, কিন্তু এখন অব্দি ভূতকালের ভূত তাকে ধাওয়া করা ছাড়েনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে সে একটু একটু ছেড়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম পিটার রাশিয়াকে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিল, যার জন্য নতুন ধরনের বস্তুবাদী ছবি হতে লাগল, পোর্টরেটও ভালোভাবে তৈরি হতে থাকল, যাতে পাশ্চাত্যের শিল্পগুরুদের সাহায্য খুব লাভদায়ক হলো। কিন্তু এখনো অনেক ছবিতে প্রত্যেক মুখের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব রেখায় অঙ্কিত করার কাজ খুব কম হয়েছিল। এই কাজ উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে হতে থাকল। ইভানোফ, রেপিন, সুরিবোফের মতো মহান শিল্পীরা তুলি ধরার পর রাশিয়ার চিত্রকলা বিশ্বের চিত্রকলায় মাথা তুলে দাঁড়ানোর যোগ্য হয়ে ওঠে।

সেই দিন 'স্বারিণী ভোদোভিল' নামের সোভিয়েত রঙিন ফিল্ম দেখতে গেলাম। ১৯৪৬ সালে এ একেবারে নতুন জিনিস ছিল। এতে, ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের রুশ সমাজ আর মস্কোকে খুবই বস্তুবাদী ঢঙে চিত্রিত করা হয়েছিল। এখন অব্দি ফিল্মের যুদ্ধ আর বীরত্ব অথবা অর্থকল্পনার প্রাধান্য থাকতো, যার জন্য যে আমেরিকান বা ব্রিটিশ ফ্যাশন আর প্রেমের ফিল্ম আসতো তাতে ভিড় পড়ে যেত। 'লেডি হ্যামিলটন' লোকেরা কে জানে কতবার দেখেছে। কারণ ওতে ইংরেজ সেনাপতি নেলসন আর তার প্রেমিকার বাঙালী জীবন চিত্রিত করা হয়েছিল। হয়তো সোভিয়েত ফিল্ম উৎপাদকও নিজের ত্রুটি বুঝতে পারছিল—শুধু রুক্ষ-সূক্ষ্ম জ্ঞানবর্ধক ছবির প্রতি লোকেদের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায় না, অতএব ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর পুরোপুরি বস্তুবাদের ভিত্তিতে বানানো এই ফিল্মে প্রেমের মাত্রা বেশি ছিল, তাই দর্শকদের ভিড় খুব হতো। বিপ্লবের আগে বহু বছর অব্দি অথবা গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ও পাউডার, লিপস্টিকের মত বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সোভিয়েতে ভালো মনে নেওয়া হতো না, কিন্তু ওরা দেখল, যে স্ত্রীলোকদের এই স্বাভাবিক আকর্ষণগুলোকে এইভাবে হটানো যায় না, তার পরিণাম এই হয়, যে বাজে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক বস্তুর ব্যবহার বেড়ে যায়। তাই তারা অনেক রকম বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য কারখানা খুলল।

২৯ জুনে আমি এবার সঙ্গে নিয়ে যাবার বই বাছাবাছি করছিলাম। দুবছরে ৬-৭ মণ

বই জমে গিয়েছিল—এমনিতে জাহাজের ফলে যাবার সমস্ত বই নিয়ে যেতে ভাড়া বেশি হবার ভয় ছিল না, কিন্তু ভয় হচ্ছিল কোথাও সোভিয়েত কাস্টমের লোকেরা বলে না বসে, 'এই পুরো গ্রন্থাগারটা এখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।' পরে দেখা গেল সে ভয় মিথ্যে। কিন্তু সেই সময় কত বই-ই ছেড়ে দিতে হলো। আমার বড় চামড়ার স্যুটকেশ আর অন্য বাক্সতেও সমস্ত বই ঢুকছিল না। একটা কাঠের পুরনো মামুলি বাক্স আমি মান্যাকে দিয়ে কেনালাম। লোলার ভাগ্নী লোলা কুজমিনার স্বামী যখন শুনল, তখন সে একটা খুব বড় বাক্স বানিয়ে নিয়ে এলো। ওর পেশা ছুতোর মিস্ত্রির নয়, কিন্তু সব রকমেরই কাজ অভ্যেস করা এদের শিক্ষা আর রুচিতে সম্মিলিত হয়ে গেছে। আমার বইগুলো রাখার এখন আর চিন্তা রইল না।

৩০ জুনে ভিসার জন্য আরেক ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। ভিসা যারা দেবে তারা ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটির চিঠি আনতে বলল। আমি ভেবেছিলাম, সাধারণ গ্রীষ্মের ছুটি দু মাস চলবেই। চলাকালীন আরো পরের জন্য ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দেব। ছুটির আবেদনপত্রে অসুবিধে এই ছিল যে তার ওপর রেক্টরের হস্তাক্ষর থাকা দরকার। ৫ দিন বাকি ছিল, আর রেক্টর ছিলেন সবজান্তা, ভয় ছিল, হয়তো আবার মস্কোর রাস্তাই ধরতে হয়, কারণ সমস্ত আয়োজন করে অন্য জাহাজের জন্য পনেরো দিন বসে থাকা আমার পোশাবে না। লোলার আমার যাত্রা পছন্দ হচ্ছিল না, এটা স্বাভাবিক।

পয়লা জুলাই এই অনিশ্চিত অবস্থায় ছুটির চিঠির ফেরে পড়লাম। ইউনিভার্সিটি গেলাম। লোলা বলাতে বুঝলাম, যে এত তাড়াতাড়ি হয়তো তা পাব না। দিনা-মার্কোভনা রুশ ভাষায় আবেদন পত্র লিখে দিল। আমি রেক্টরের সেক্রেটারিকে দিয়ে দিলাম। তিনি বললেন—'কাল হয়তো হাতে পাওয়া যেতে পারে।' একটু আশা বাড়ল। কিন্তু পরের দিন তিরযোকী যাওয়ার ছিল, ইগোরের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে।

সেদিন আমাদের বিভাগের বার্ষিক বৈঠক হলো। এটা জেনে আমার এবং ছাত্রীদের ভালো লাগলো, যে পঞ্চম বর্ষের দুই তরুণী—বের্থা বলচুক আর তানিয়া শোকলোভা উত্তীর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম বর্ষের পড়াশুনোর পর এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতিকা। যুদ্ধের সময় ওদের দু-এক বছর নষ্ট হয়েছিল, তা না হলে পড়াশুনো শেষ করে কোনো কাজে লেগে যেতো।

বার্ষিক বৈঠক আর আমার বিদায় ছিল, তাই অকাদেমিক বরান্নিকোফের ওখানে বিশেষ আয়োজন ছিল। কত রকমের মিষ্টি আর ফলের সঙ্গে উৎকৃষ্ট জাতের মদও মজুত ছিল। আমাদের সহকারীদের মধ্যে বিসক্রোব্নীর শরীর ঠিক ছিল না, তাই সে আসতে পারেনি, তা ছাড়া সবাই উপস্থিত ছিল। কালিয়ানোফ সংস্কৃত মহাভারতের রুশ অনুবাদক ডঃ শ্চেরবাৎস্কীর প্রিয় শিষ্যদের একজন ছিলেন, যার জন্যে ওঁর সঙ্গে আমার বেশি ঘনিষ্ঠাতা হওয়া দরকার ছিল। তিনি সংস্কৃতের বিশেষজ্ঞ এবং তাতে তাঁর বিশেষ রুচি আছে। তিনি আমার সঙ্গে খুব দেখা করতেন আর সংস্কৃতের অপঠিত গ্রন্থ পড়তেন। দীনা মার্কোভনা গোলদমান হিন্দি পড়াতো। 'সপ্তসরোজের' রুশ অনুবাদ সে করেছিল।

সুলেকিন, অব্রামোফও আজকের পান-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। অকাদেমিক বরান্নিকোফ বিদায়ের সময় তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ করলেন। আঙুরজাত মদ থেকে আজও আমি বঞ্চিত থাকলাম। হয়তো সারা জীবনই বঞ্চিত থাকব।

২ জুলাই-এ ট্রেনে করে তিরযোকী গেলাম। লোলা দেরি করে দিল, ট্রেন বেরিয়ে গেলো, দেড় ঘণ্টা ফিনল্যান্ড স্টেশনে প্রতীক্ষা করতে হল। দু ঘণ্টায় সেই পরিচিত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ট্রেনে তিরযোকী পৌঁছলাম। এক বছরের মধ্যে দেশ কতটা এগিয়ে গেছে, এটা মাপার জন্য আজ স্টেশন থেকে উপবনে নিয়ে যাবার জন্য লরি নয়—ইউনিভার্সিটির বাস দাঁড়িয়েছিল। খুব রঙ-চঙে আরামের নতুন বাস। উপবনে দেখলাম, অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে। ঘর পরিষ্কার ছিল, সব কটা ঘরে বৈদ্যুতিক বাতিও চালু হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবে রেডিও ছিল। তট থেকে সমুদ্রের জল অব্দি কাঠের তক্তার রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খাবারও আগের চাইতে বেশি ভালো ছিল। কত তাড়াতাড়ি যুদ্ধের প্রভাব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল! আগের বছর দাবাগ্নি থেকে সাবধান থাকবার জন্য নোটিশ টাঙানো হয়েছিল। আমার আগের পরিচিত মুখ খুব কম দেখা যাচ্ছিল। প্যারিসে শিক্ষা-প্রাপ্তা এক মহিলা তার এক বান্ধবীর সঙ্গে সমুদ্র তটের ওপর রোদ আর হাওয়া বদলাতে এসেছিল। তারা নিজের সঙ্গে স্বাস্থ্য লাভের জন্য তাদের বেড়ালও এনেছিল, যে খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরিচিত নতুন জায়গা ছিল, বেচারির তা ভালো লাগছিল না। আর সে সারা রাত চিল্লাতে থাকতো। সন্ধেবেলা বেড়ানোর সময় অকাদেমির নগরে গেলাম। এখন সে-নগর তার অতিথিদের স্বাগত জানাতে অনেকটাই তৈরি ছিল। বাড়িটি পুরো কাঠের ছিল, কিন্তু সুরুচিপূর্ণ আর সুখকর ছিল। সেই রাতে তিরযোকীতেই রয়ে গেলা । পরের দিনও চারটে অব্দি ওখানেই থাকার ছিল, তাই বহু দূর অব্দি ঘুরতে গেলাম। সব জায়গায় সারা বছর বেকার না থাকা হাতের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। এটা ঠিকই যে এবছর এখানে আসা অতিথিদের খুব বেশি নালিশ থাকবে না।

চারটের সময় যাবার জন্য তৈরি হলাম। ইগর কিছুদূর অব্দি এলো। ৯ বছরের হয়েছিল। বয়স অনুসারে ও বুঝত বেশি। বিদায়বেলায় সে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। আমি খুব বোঝালাম—কিন্তু সে ধৈর্য ধরতে রাজি ছিল না। বলছিল, 'তুমি যাবে না।' কি জানি, ওর ভবিষ্যৎবাণী যদি ঠিক হয়। এ কথা আমারও মনে এলো, কিন্তু জীবনের কর্তব্য কোনো মায়া-মোহের ফাঁদ স্বীকার করতে রাজি নয়। নরম হৃদয়কে কিছুটা শক্ত করে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

লোলা সেখানে থেকে গেল। আমি সন্ধে পাঁচটায় গাড়ি ধরে লেনিনগ্রাদের দিকে এগোলাম—ভাড়া ৪ রুবল ছিল। ট্রেন হয়তো তিরযোকী থেকে আরও পিছন দিক থেকে আসছিল। সেই সময় সেখানে খালি জায়গা অনেক ছিল, কিন্তু নগরের পাশের স্টেশন থেকে তরকারির খেতের নরনারী সন্ধেবেলা ফিরছিল, তাই ভিড় ছিল খুব।

৪ জুলাই সকালে ঘুম থেকে উঠেও চিন্তার বোঝা আমার বেড়েই চলেছিল। পুলিশের কাছে গিয়ে ভিসা-সমেত পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। জাহাজে খুব বেশি ভিড় ছিল না,

তাই একদিন আগে টিকিট পেতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। আমি পাসপোর্ট আর লন্ডন অব্দি ৪৫১ রুবল ভাড়া ইন্তুরিস্তকে দিয়ে দিলাম। লোলা সেদিন দুপুরে তিরযোকী থেকে এলো। সে বলল, 'কাল ছাপ লাগাতে হবে, তা না হলে আমার দু মাসের মাইনের টাকা পাওয়া যাবে না।' বেতন সাড়ে চার হাজার রুবল মাসিক ছিল, কিন্তু তার মধ্যে চাঁদা, মজুর-সভার মেম্বর হবার শুল্ক, ইন্সিওরেন্স তথা পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ঋণ ইত্যাদির জন্য দেড় হাজারের কাছাকাছি বেরিয়ে যায়। যদিও, টাকা না পাওয়ার অসুবিধের জন্য আমি কালকের যাত্রাকে স্থগিত করতামই না, তাও আমি অবশ্যই চাইছিলাম যে, টাকা ও পেয়ে যাক।

৫ জুলাই-এর দিনও উপস্থিত। আজ আমাকে লেনিনগ্রাদ থেকে প্রস্থান করতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এটা দেখে খুশি হলাম, যে দু-মাসের বেতনের রুবল লোলা পেয়ে গেছে। আমার খরচের জন্য ৪৫১ রুবল জাহাজের ভাড়া আর ভোজন তথা মোটর, কুলি ইত্যাদির জন্য ৪১০ রুবল খরচ হলো। লোলার কাছে বেশ কয়েক হাজার রুবল রইল। মাসিক দু হাজার রুবল সে পেতেই থাকবে, যদি মোঙ্গল ভাষায় অধ্যাপিকার কাজ পেয়ে সে গ্রন্থাগারের কাজ ছেড়ে না দেয়। লন্ডনে টাকার অভাব হতে পারে, তাই আমার প্রকাশকের কাছে টাকা পাঠানোর জন্য টেলিগ্রাম করে দিলাম। বাঁকেজীকে লন্ডন আসার খবর টেলিগ্রামের মাধ্যমে দিয়ে দিলাম। কত বন্ধুদের চিঠি লিখে ফেললাম। ইউনিভার্সিটিতে বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। সবাই দুঃখ করছিল, কিন্তু আমি বললাম, 'দু বছরে আমার লেখার কাজ শেষ হয়ে যাবে, তারপর আমি এখানে এসে পড়ব।' লোলা আমার কথা বিশ্বাস করত না। আমাদের দুজনের প্রকৃতিতে সামঞ্জস্য ছিল না। আমি বই-এর একনিষ্ঠ প্রেমিক আর ও সেটাকে অতটা আবশ্যক বলে মনে করতো না। কতবার আমাদের মনোমালিন্য হয়ে যেত, যদিও ঝগড়া করার স্বভাব না আমার ছিল না ওর। তাই কথা বেশিদূর এগোতো না। আমার কবিরত্ন সত্য নারায়ণের পঙ্‌ক্তি মনে আসত—'ভয়ো ক্যোঁ অনচাহত কে সংগ'। তাও আমি ওর কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ ছিলাম, কেননা কয়েকটা স্বভাবের কথা বাদ দিলে ওর মধ্যে অনেক গুণ ছিল।

সেদিন রেক্টরের কার্যালয়ে জানতে পারলাম যে এখন ছুটি পাওয়ার চিঠি তৈরি করেনি। ইন্তুরিস্তরা ৪৭ দিনের বিশ্রামপত্র পেয়ে বলে দিল, যে এতেই হবে। আমার সহকারী বন্ধু জাহাজে পৌঁছতে আসতে চাইছিল, কিন্তু ইন্তুরিস্তের লোকেরা বলল যে, পাস ছাড়া বন্দরের গেটে যাবার অনুমোতি নেই।

ইন্তুরিস্তের কার জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলো। সোয়া দশটায় বেরিয়ে আমি আগে ইন্তুরিস্তের অফিসে গেলাম। জিনিসপত্র পাঠানোর কাজ ওদের ছিল। জাহাজ পাঁচটার সময় ছাড়ার কথা তাই আমার কাছে এখনো দু-তিন ঘণ্টা ছিল, যা আমি ইউনির্ভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে কাটালাম। তারপরে কারে করে লোলার সঙ্গে বন্দরের সদর দরজায় পৌঁছলাম। দারোয়ান আমাদের পথ অবরোধ করল। লোলাকে তাই সদর দরজা থেকে বিদায় জানাতে হলো। বেচারি নিরাশ আর বিহ্বল হয়ে ছিল। আমি বিয়োগব্যথা বেশি দেখানোর চেষ্টা করিনি। ও সেখান থেকে চলে গেল। কার আমাদের সমুদ্র তটে

পৌছতে গেল। আমার সঙ্গে ইন্তুরিস্তের এজেন্ট ছিল। জাহাজে চলে যাবার পর বৃষ্টি হতে লাগল। আমি ভেবেছিলাম, এখন সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু কলিয়ানোফ মানল না—ভিজে ভিজে কে জানে কেমন করে সামনের অসুবিধে দূর করে জাহাজ অব্দি চলে এলো।

জাহাজে কাস্টমের লোক এসে জিনিসপত্রের দেখাশোনা করল, তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। একটা পুরনো ছাপা বইকে ওরা বার করে নিল। ইন্তুরিস্তের লোক যখন আমার পরিচয় দিল, তো ওরা সেটাও ফেরৎ দিল আর দু-একটা বাক্স তো খোলালোই না। 'ক্যামেরায় ফিলম নেই তো?' জিজ্ঞেস করলে আমি ভাবলাম, নেই, কিন্তু ৩৬ এক্সপোজারওলা সোভিয়েত লাইকা (ফেদ) ফিল্‌ম এতো তাড়তাড়ি থোড়াই শেষ হবার কথা। ফিল্‌ম মজুত ছিল। যাহোক, তা তো বার করে দিল। মনে হলো যেন মনের ওপর থেকে বড় ভার নেমে গেল। কলিয়ানোফের কাছ থেকে খুব অভিবাদন আর অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে বিদায় নিলাম। অবশ্যই শ্চেরবাৎস্কীর পর তাঁর সঙ্গেই আমার খুব ঘনিষ্ঠ ভালোবাসা ছিল।

লন্ডনের উদ্দেশে প্রস্থান

নিশ্চয়তা আর অনিশ্চয়তার দোলায় ঝুলতে ঝুলতে শেষ অব্দি এক মাসের আগে স্থির করা দিনে ৫ জুলাই আমি লেনিনগ্রাদ থেকে বিদায় নিলাম। ৩ জুন ১৯৪৫-এ আমি সোভিয়েত সীমায় দাখিল হয়েছিলাম। ৪ তারিখ লেনিনগ্রাদ পৌছলাম। বলা যায়, ২৫ মাস ৩ দিন আমি থাকার পর সোভিয়েত দেশ ছাড়ছিলাম।

আমাদের জাহাজের নাম 'বেলোস্ত্রোফ' অর্থাৎ 'শ্বেতদ্বীপ' ছিল। পাঁচটার সময় সে রওনা হলো। শ্বেতদ্বীপ খুব সুন্দর নতুন ছোট জাহাজ ছিল। কেবিন আর হলের পরিচ্ছন্নতা আর সাজানো ইত্যাদিতে তার তুলনা ছিল না। বৈদ্যুতিক ল্যাম্পও শিল্পমণ্ডিত ছিল। চেয়ার টেবিলের ব্যাপারেও সে-কথা বলা যায়। ১২ নম্বরের কেবিন আমি পেয়েছিলাম। তাতে একজন লোকেরই জায়গা ছিল। বিছানাপত্র ইত্যাদি আর কেবিনের ভেতরের অবস্থা খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। ভেতরেই ঠাণ্ডা-গরম জলের কলের সঙ্গে চীনে মাটির প্রক্ষালনপাত্রও ঝকঝক করছিল, ছোট কাঠের ফলক দিয়ে ঢেকে দেবার পর সেটা ছোট টেবিলের কাজ দিচ্ছিল। কেবিনে দুটো বাতিও ছিল। জানলা সমুদ্রের দিকে খোলা ছিল, যাতে দূরের দৃশ্য খাটের ওপর বসে বসে দেখতে পারতাম। সভ্যতা আর স্বচ্ছতার কষ্টিপাথর হলো পায়খানা, থাকার ঘর নয়। আমার শৌচালয়ও খুব পরিষ্কার ছিল, কমোড চকচকে ছিল। পালিশ করা কাঠের দেওয়ালে নিজেকে দেখা যাচ্ছিল। বেশ

সাজানো আর পরিচ্ছন্নতা সব জায়গায় চোখে পড়ছিল। আমি এর তুলনা সেই উড়োজাহাজের সঙ্গে করছিলাম যাতে চড়ে তেহরান থেকে সোভিয়েত দেশে এসেছিলাম। হয়তো যদি দু-বছর আগে সমুদ্র-যাত্রা করতে হতো, তাহলে সেই সময় 'শ্বেতদ্বীপ'-এর মত জাহাজ পাওয়া যেত না। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবার দুটো বছরকে সোভিয়েত-রাষ্ট্র প্রতিটি কাজে খুব তৎপরতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল। তারই এই ফল ছিল আমাদের সামনে। লেনিনগ্রাদের বন্দর একেবারে সমুদ্র-তটে না হয়ে একটু ভেতরের দিকে, কিন্তু সেটা খুব বড়। সেখানে পৃথিবীর বড় বড় জাহাজ শত শত সংখ্যায় নোঙর ফেলতে পারত। জাহাজ চলাকালীন তীরে আমরা দেখছিলাম—মালগুদামের সারি দূর অব্দি চলে গেছে। এখানে যুদ্ধের প্রভাব এখনো ছিল। অনেক পেট্রোলের ট্যাঙ্ক ভেঙে-চুরে পড়েছিল। যুদ্ধের সময় পেট্রোলের ট্যাঙ্ককে সব চেয়ে আগে লক্ষ্য বানানো হয়। ওর তেলই শুধু নষ্ট করা জরুরি মনে করা হয় না, সেই সঙ্গে ভীষণ আগুনের ঝাপটা তৈরি করে শত্রুর নগরকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়। যদিও তেলের ট্যাঙকগুলো নগরের থেকে দূরে রাখা হয়।

কিন্তু সময়ের মধ্যেই আমাদের 'শ্বেতদ্বীপ' এখন ফিনল্যান্ডের খাড়ির খোলা সমুদ্রে এসে গেল। সমুদ্র চঞ্চল ছিল না। রাত সাতটায় খাওয়া হলো—কাটলেট, ম্যাকারোনি, কোনো মিষ্টি, রুটি, মাখন আর আপেল। খাবার সুস্বাদু ছিল। আমাদের জাহাজ উত্তরদিকে যাচ্ছিল। সাড়ে এগারোটার রাতে এখনোও গোধূলি ছিল—রাত কেবল প্রচলিত অর্থেই বলা যেত। সমুদ্রে ঢেউ উঠছিল, কিন্তু আমাকে তো সমুদ্রও বিচলিত করতে পারত না।

হেলসিংকি—সকাল ছটায় যখন জানলা থেকে বাইরেটা দেখলাম, তখন সামনে ফিনল্যান্ডের সবুজ মাটি দেখা যাচ্ছিল। দেবদারু দিয়ে ঢাকা পাহাড় মনে হচ্ছিল সমুদ্রে ডুব দেওয়ার খেলা খেলছে। অনেক ছোট-ছোট দ্বীপ ছিল, যার মধ্যে অধিকাংশ মানুষের বসবাসের উপযুক্ত ছিল না। নটার সময় 'শ্বেতদ্বীপ' কিনারায় লাগল। জানতে পারলাম যে এখন ২৪ ঘণ্টা জাহাজ এখানেই থাকবে। আমাদের জাহাজে ৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিল না। ১৬ ঘণ্টায় আমি লেনিনগ্রাদ থেকে হেলসিংকি পৌঁছলাম। এখন পরের ২৪ ঘণ্টার আঠারো-কুড়ি ঘণ্টা তো আমরা ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর কাজে লাগাতে পারতাম।

ফিনল্যান্ডের এক ভূতপূর্ব নগর—বিপুরীকে আমি এক বছর আগেই দেখেছিলাম, কিন্তু বিপুরী ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং পুরনো নিবাসীদের দ্বারা পরিত্যক্ত। তার থেকে কোনো ফিন-নগরীর কল্পনা আমরা ভালোভাবে করতে পারবো না। এখানে আমাদের সামনে ফিনল্যান্ডের রাজধানী ছিল—কেল্লা, বিশাল বাড়ি আর গির্জা দূর অব্দি দেখা যাচ্ছিল। জাহাজ দাঁড়ানোর ডক একটা নয় অনেক ছিল। সমুদ্র এত গভীর ছিল, যে জাহাজ কিনারায় গিয়ে লাগতে পারত। বন্দরে যুদ্ধের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। পাসপোর্ট দেখার সময় নগর দেখার আজ্ঞাপত্রও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি আর বাদলের ভয় ছিল। মাখন, কফি, জ্যাম, অমলেট, কোকো দিয়ে প্রাতরাশ হলো। দুটোর

সময় মধ্যাহ্নভোজনও হলো, আর অপরাহ্নের চা পর্যন্ত আমাদের ঘোরাফেরা মূলত বন্দরের কাছাকাছিতেই সীমিত রইল। বস্তুত, যাত্রায় দুজন পর্যটকের খুব দরকার হয়, না তো মানুষ আলস্য বা অনিচ্ছার দরুন দেখা-শোনায় নিজের সময়কে পুরো কাজে লাগাতে পারে না। আমাদের জন্য হেলসিংকি নতুন নগর, কিন্তু সে ইউরোপের অন্য নগরের মত বলেই এমন কিছু আকর্ষণীয় ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আমি ছটা থেকেই দেখতে এবং তার আনন্দ নিতে শুরু করেছিলাম। পাঁচটায় শহর দেখতে বেরোলাম। এখানে আমার কলকাতার ধর্মশালার মতো মনে হচ্ছিল—বাড়ি চারতলা পাঁচতলার থেকে বেশি উঁচু ছিল, আর তার মধ্যেও অধিকাংশ ১৯৮৭-র পরে বানানো। কতকগুলোর ছাদই সিমেন্টের ছিল, আর কয়েকটির ওপর লাল টাইলও দেখা যাচ্ছিল। আসলে পাশের দ্বীপে যে যে বাড়িগুলো ছিল, তার লাল টাইলযুক্ত ছাদ, সবুজের মধ্যে সুন্দর মনে হচ্ছিল। চওড়া রাস্তার ওপর ছায়াপ্রদ গাছ লাগানো ছিল। লেনিনগ্রাদ থেকে এখানকার ট্রাম আর মোটরবাস খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু হেলসিংকিকে লেনিনগ্রাদের মতো যুদ্ধের ভয়ঙ্কর উনুন থেকে বেরোতে হয়নি। সেখানে শ্রেণী-বৈষম্যের রূপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। লেনিনগ্রাদের মজদুর স্ত্রীলোকেরাও বাজার বা বিনোদোদ্যানে যাবার সময় অভিজাত শ্রেণীর মহিলাদের কাপড় পরে বেরতো, সেখানে ছেঁড়া-ফাটা বিশ্রী কাপড়-চোপড় পরা নর-নারীর দেখা পাওয়া যেত না। কিন্তু এখানে মজুরদের ওপর দারিদ্রের ঝলক স্পষ্ট দেখা যেত, উল্টোদিকে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর ফ্যাশনে ভরপুর নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে দেখা যেত। একটু এগোলেই আর একটা জিনিস দুটো জগতের ভেদাভেদকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। একটা লোক এসে ইংরেজিতে বলল, 'খুব সুন্দরী মেয়ে আর দারুণ আঙুরের মদ তৈরি আছে। চলুন, রাতের অতিথি হবেন।' আমি বললাম, 'ধন্যবাদ! আমার কোনোটাই চাই না।' সোভিয়েত দেশে এমনটি ভাবাই যায় না। রোববার বলে আজ দোকান বন্ধ ছিল। খোলা থাকলেও আমার কাছে কেনবার পয়সা কোথায়? ১২ ডলার যে একজন সহৃদয় ব্যক্তি দিয়েছে, তা এতটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা ভালো নয়। নগরের বাড়ি, কারখানা, সম্পত্তি তথা নাগরিকদের পোশাক আর জীবন দেখে আমি ভাবছিলাম—ফিনল্যান্ড আমাদের এক গোরখপুর জেলারও সমান নয়, কিন্তু গোরক্ষপুর জেলাতে কি হেলসিংকি আর বিপুরীর মতো নগর কল্পনা করা যায়? কি কারণে গোরক্ষপুর এতটা দরিদ্র আর এ এতটা ধনী? এর উত্তর খুব কঠিন নয়। এটা তো পরিষ্কার যে গান্ধীবাদ গোরক্ষপুরকে হেলসিংকির সমান বানাতে পারবে না। এখানকার লোকেরা নিজেদের হাত ও মস্তিষ্ক ব্যবহার করে, সায়েন্সের নতুন নতুন আবিষ্কার তাড়াতাড়ি কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত থাকে। পুঁজিবাদী বাধার পরও তারা এত সম্পত্তি করতে পেরেছে। ফিনল্যান্ডের জঙ্গল হলো কাগজের খনি। এখানে অনেকখনিও আছে। তাই জন্য এখানে কলকারখানা গড়ে তোলার খুব সুবিধে হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানেও তো গাড়োয়াল আর কুমাউনের থেকেও বেশি খনিজ ও বানস্পতিক সম্পত্তি আছে। তাও সেখানে দারিদ্রের অখণ্ড রাজ্য কেন? যদি ফিনল্যান্ড কাগজের দেশ হয়, তাহলে গোরখপুর চিনির দেশ। সে নিজস্ব

চিনি দিয়ে সমস্ত দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে। তারপর টাকা কামানোর জন্য তামাক, সিগারেটের কারখানা, সুতি কাপড়ের মিল ইত্যাদি অনেক শিল্প-বাণিজ্য সেখানে চলা সম্ভব, সম্পদ দিয়ে সেই ভূমিকে সমৃদ্ধ করা যায়। এই ভাবতে ভাবতে স্থাবর-জঙ্গম বস্তুর ওপর দৃষ্টি রেখে হেলসিংকির রাস্তায় পা বাড়াচ্ছিলাম। বই-এর দোকান এলো। কাঁচের ভেতর বহু রকমের খুবই সুন্দর করে ছাপা নতুন নতুন বই সাজানো দেখা যাচ্ছিল। একটা নয়, অনেকগুলো বই-এর দোকান ছিল। গোরক্ষপুর শহরে এই ধরনের বই-এর দোকান কি দেখা যেত? যে ভাষায় কথা বলার ৩৫ লক্ষ লোক আছে, সে ভাষায় এত বই ভারতবর্ষে ছাপা যেতে পারে? ৩৫ লাখ কেন, ১৫-১৬ কোটি নর-নারীর ভাষা হলেও হিন্দির এতো সংখ্যায় এরকম বই ছাপার সৌভাগ্য হয়নি। তার জন্য শিক্ষার প্রচার এতটা হওয়া চাই যাতে দেশে কোনো স্ত্রী-পুরুষ মূর্খ না থাকে সেই সঙ্গে সম্পদ সৃষ্টি করতে আধুনিক উপকরণের প্রয়োগ ঘটিয়ে লোকেদের পকেটে টাকা ভরে দেওয়া দরকার। রাজধানীর দু-তিনটে উদ্যানও আমি দেখেছি। আজ ছুটির দিন ছিল তাই স্ত্রী-পুরুষরা সেখানে চিত্তবিনোদনের জন্য এসেছিল। দুটো রেস্তোরাঁ খুব সাজানো ছিল, যেখানে ঠাসাঠাসি ভিড় ছিল। সেগুলোর সাজানো দেখে প্রথমে মনে হলো যে, ফুলের বাজার। 'কিনো সবায়' পেলাম। তার সামনে টিকিট-ক্রেতাদের খুব লম্বা লাইন ছিল। মনে হচ্ছিল, হয়তো এদের মধ্যে অনেকে আজ সিনেমা দেখা থেকে বঞ্চিত হবে। লেনিনগ্রাদে সিনেমা হলের সংখ্যা অনেক, সেখানকারের সিট সব সময় দর্শকে ভরা থাকে। কিন্তু এখানে সিনেমা হল বেশি থাকার কারণে ভর্তি হয় না। প্রত্যেক সিনেমা হলে আরো একটা বিশাল হলঘর দর্শকদের প্রতীক্ষালয় হিসেবে অবশ্যই থাকে। টিকিট যারা পায় না তারা ওখানে গিয়ে বসে পড়ে। টিকিট নিয়েও লোকেরা প্রতীক্ষা করতে সেখানে চলে যায়। কোনো কোনো প্রতীক্ষালয়ে তো গান বাজনারও ব্যবস্থা আছে। এগুলোকে প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশ বাজে খরচ মনে করে। সিনেমার টিকিট ১ রুবলে কেনা আর বিনা পয়সায় গান বাজনার আনন্দও উপভোগ করা। সোভিয়েতের এই সব প্রতীক্ষালয়ের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার দোকানও হয়। প্রতীক্ষারত লোকজন সেখানে থাকায় লোকজন জিনিসপত্রের বিক্রিও হয়। হয়তো এই বিক্রির জন্য প্রতীক্ষালয়ের খরচও বেরিয়ে আসে। ফিনল্যান্ডের লোকের সেই বংশের সঙ্গেই সম্বন্ধ আছে, যার সঙ্গে আছে দ্রাবড়ি-মুণ্ডা লোকেদের। ভাষাতত্ত্বজ্ঞদের বিচারে, নতুন-প্রস্তর যুগে দ্রাবিড়দের পূর্বজ জাতির এক শাখাকে উত্তরদিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওদেরই সন্তান কোমী, ইস্তোনিয়া এবং তারাই ফিনল্যান্ডে এখন থাকে। আমাদের এখানে শুদ্ধ দ্রাবিড়ের চিহ্ন গায়ের কালো রঙ, কিন্তু হেলসিংকিতে কালো কেশযুক্ত নরনারী পাওয়াও খুব মুশকিল ছিল। ৬-৭ হাজার বছর অব্দি অতিশীতল প্রদেশে থাকার জন্যই কি এতটা তফাৎ হয়ে গেল? হ্যাঁ, হেলসিংকির গলি-গলিতেও এরকম নর-নারী অনেক ছিল, যাদের ফটো নিয়ে যদি কোনো শুদ্ধ দ্রাবিড় স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেলানো হয়, তাহলে পরিষ্কার মিল পাওয়া যায়—তফাৎ রঙেরই ছিল, তা না হলে নাক, মুখের হাড় আর সাজসজ্জা ও ঢঙ-ঢাঙ একই রকম ছিল।

'শ্বেতদ্বীপ' ৭ জুলাই-এর সকালে হেলিসিংকি ছাড়ল। রাস্তায় অনেক জায়গায় সে খানিকক্ষণ করে থেমে কোথাও কয়লা নিল আর কোথাও যাত্রী। এখন জাহাজে খালি জায়গা ছিল না। আমার মাথায় এখনও ফিনল্যান্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে রেখেছিল। ৩৫ লক্ষ জনসংখ্যার দেশের মধ্যে হেলসিংকির মতো নগর—ট্রাম, রেল, জাহাজ, বিমান, যুদ্ধের ব্যয়সাধ্য যন্ত্র আর মানুষ নিয়ে জমজমাট। আবার সেখান থেকে শয়ে শয়ে যাত্রী চিত্তবিনোদন বা অন্য কোনো কাজে সুইডেন ও ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করছিল। আমাদের দেশের কাছে তো তা স্বপ্নের মতো ছিল। পুরনো রাশিয়ার পিটারবুর্গের মতো নগরেও অভিজাতশ্রেণীর সুখ-সম্পত্তি হয়তো অনেক, কিন্তু জনসাধারণ রাশিয়া এবং পরাধীন এশিয়ার দারিদ্রের নিষ্ঠুর চাকায় পিষ্ট হচ্ছিল। সোভিয়েত শাসনের খুব বড়ো একটা কাজ হলো—সমাজবাদের ভিত্তিতে নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যকে খুব তাড়াতাড়ি ভীষণ বড় করে তোলা। সমাজবাদ এত শক্তি আর সামগ্রী উৎপন্ন করল, যার কারণে রাশিয়া যুদ্ধে নিজেকে অজেয় প্রমাণ করল। সংস্কৃতি আর শিক্ষার যতটা সার্বজনিক প্রসার সেখানে আছে অতটা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এখনো তার অনেক কাজ করার আছে। নিজস্ব অনেক ত্রুটি দূর করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে কাজ সোরিয়েত-শাসন করল তার জন্য আমি তার সাত খুন না—হাজার খুন মাফ করতে রাজি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের আমলাতন্ত্র যান্ত্রিকতার দ্বারা অবশ্যই দূর হবে এবং তার কাজে বেশি বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। নগণ্য মানুষ, যদি তার সংখ্যা হাজার কেন লাখে একজনও হয়, সেও যদি সোভিয়েত-তন্ত্র আর তার নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায়, তাহলে তাকেও পুরো সুযোগ দেওয়া হবে, কারণ এতে কোনো ক্ষতি হতে পারে না। এরকম কিছু ত্রুটি—যার প্রভাব খুবই নগণ্য সংখ্যক মানুষের ওপর পড়ে, তাদের নিয়েই সোভিয়েত আর সমাজবাদের শত্রুরা বিশ্বে অনেক রকমের প্রোপাগাণ্ডা করে। শুধু এই কথা চিন্তা করেও ওদের সরাতে হবে।

আটটা বেজে দশ মিনিটে 'শ্বেতদ্বীপ' হেলসিংকি ছাড়ল। এখান থেকে আমি উড়োজাহাজে অনেকগুলো চিঠি পাঠালাম।

স্টক হোম—৮ জুলাই সকালে সমুদ্র কিছুটা তরঙ্গিত ছিল। বিকেল পাঁচটায় দেবদারু দিয়ে আচ্ছাদিত সুইডেনের পাথুরে মাটি দেখা গেল। ছটার সময় 'শ্বেতদ্বীপ' ফ্যর্ডে ঢুকল। সুইডেন আর নার্বে এই ফ্যর্ডের জন্য প্রসিদ্ধ—সমুদ্রের 'গোঁফ' ফ্যর্ডের রূপে স্থলের মধ্যে ঢুকে চলে গেছে। এর কিনারা বালুকাহীন আর পাথুরে, কিন্তু মাটি অবশ্যই আছে, তাই তো এই পাথুরে পাহাড় আর দ্বীপে সব জায়গায় সবুজে-ভরা দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ চোখে পড়ে। এক একটা ফ্যর্ড থেকে বেরিয়ে হাজার হাজার আঁকা-বাঁকা স্রোত দূর অব্দি চলে গেছে। একটি ঘোরালো ফ্যর্ডের ভেতর আমাদের জাহাজ চলে যাচ্ছিল। কিনারার পাহাড়গুলোর ওপর জায়গায় জায়গায় লাল টাইলের লালবাড়ি বানানো ছিল, সেগুলোতে যাতায়াতের উপায় ছিল নৌকো, যেগুলো বেশির ভাগ মোটর-পরিচালিত ছিল। আমরা রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। সুইডেন তার দুর্গ

নির্মাণের ওপর নয়, তটস্থ থাকাতে বেশি বিশ্বাস করে। দুটো দুটো মহাযুদ্ধে সে তটস্থ হয়ে রইল আর আমাদের দেশের দু-তিনটে জেলার সমান দেশের সম্পদ দিয়ে নিজের দেশকে অত্যন্ত ধনী করে তুলল। কোনো এক সময় এই ছোট দেশটি এত শক্তিশালী ছিল, যে এর বিজয়-যাত্রা রাশিয়া অব্দি পৌঁছেছিল। সে-ই ওখানকারের রোইরিক রাজবংশের জন্ম দিয়েছিল। ২৫ ঘণ্টা যাত্রার পর সকাল নটায় 'শ্বেতদ্বীপ' স্টকহোমের তটে গিয়ে লাগল। শহর এখান থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছিল। পাসপোর্ট দেখতে দেখতে অনেক সময় লাগল, হয়তো বলশেভিকদের দেশের জাহাজ ছিল, তাই পুঁজিবাদী সুইডেনের খুব ভয় ছিল। জানতে পারলাম, এখন পরশু সন্ধে অব্দি জাহাজ এখানেই থাকবে। দেখার অনেক সময় ছিল। হায়! যদি আরো পনেরো পাউণ্ড আমার পকেটে থাকত, তাহলে আমি অর্ধেক সুইডেন দেখে নিতাম। শুধু বারো ডলারে কি ভরসা করতে পারি, যখন লন্ডনে কুলি আর ট্যাক্সি ভাড়া এর মধ্যে থেকেই মেটাতে হবে? সুইডেনের অফিসার পাসপোর্ট দেখে-টেখে সেখানেই রেশনের কার্ডও দিয়ে দিল। কিন্তু আমি রেশনকার্ড নিয়ে কি করব? আমাকে তো 'শ্বেতদ্বীপ'-এর খাবারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। নগরও সমুদ্রের কিনারাতেই অবস্থিত ছিল। জন সংখ্যায় সুইডেন ফিনল্যান্ড থেকে দুগুণ বড়, তাই তার রাজধানীও হেলসিংকি থেকে অনেক বড় আর সুন্দর হওয়া দরকার। অনেক বাড়ি পাহাড়ের গায়ে গায়ে বানানো হয়েছে বলে আরো বেশি বড় মনে হতো। লোকেরা প্রায় সবাই পিঙ্গল বা পাণ্ডু-কেশ ছিল। মাথা ওদের লম্বা আর শরীর বেশ উঁচু ছিল। এদেরই আসল ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য জাতির নমুনা বলে ধরা হয়। মানতে হবে, এখানকার লোকেদের সৌন্দর্যও অপেক্ষাকৃত বেশি।

৯ জুলাই সারাদিন স্টক হোমে থাকার কথা। খরচ করার জন্য টাকা ছিল না, খালি পেটে থাকারও ভয় ছিল না। তাই চা আর ভোজনের সময় ছাড়া বাকি সময়টা আমি হাঁটার কাজে লাগালাম। টমাস কুকের শাখা এখানে ছিল, আমার যাত্রার চেক ওদেরই ছিল, কিন্তু সেটা ভাঙাতে তারা তাদের অক্ষমতা জানালো। কেননা চেকে সুইডেনের নাম ছিল না। ১২ ডলারের মধ্যে ৭ ডলারকে ৩·৬ ক্রোনর প্রতি ডলারে ভাঙালাম। ক্রোনর মোটামুটি এক টাকার সমান। দেখে সস্তা বলে মনে হচ্ছিল। ৪৩ ক্রোনরে ভালো রেনকোট পাওয়া যাচ্ছিল। একশো সোয়াশো ক্রোনরে গরম স্যুট অবশ্যই সস্তা। বই অতটা সস্তা ছিল না। স্টকহোম গাইড (ইংরেজি) ৫ ক্রোনর দিয়ে কিনতে হলো। একটা বাগানে পাখিদের জন্য শুধু রুটির টুকরো নয়—তিন-চারটে ছোট রুটিও ফেলা ছিল। শস্যের প্রাচুর্যের কথা এর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট স্টোর (মহাদোকান) ছিল। ফ্যাশনও খুব দেখা যেতো। রাজার প্রাসাদ বিশাল আর অনেক দূর ছড়ানো ছিল। পার্লামেন্টের ভবনও খুব রমণীয় ছিল। নগরের পাশেই অনেকগুলো বিশাল বাড়ি ছিল। মজুরদের বেশভূষা দেখলে বোঝা যেত, যে নগরের আর দেশের সমস্ত বৈভব ওদের জন্য নয়, যদিও সবচেয়ে কঠোর কাজ ওদের থেকেই আদায় করা হতো। এখানকারের ট্রাম আর বাস অনেক বেশি পরিষ্কার ছিল, ভিড়ও কম ছিল। লন্ডনের খবরের কাগজ উড়ো জাহাজ করে এখানে আসতো। আমি 'টাইমস' আর অন্য

দু-একটা খবরের কাগজ নিলাম। জানতে পারলাম, কলকাতায় আবার হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা হয়ে গেছ, রক্ত-গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান শস্য দেওয়া বন্ধ করেছে। এখন পাকিস্তান হয়ে গিয়েছিল। যদিও এখনো সীমা-কমিশন নিজের কাজ শেষ করেনি।

১০ জুলাই-এ আবার আমার পা স্টকহোমের রাস্তায় বাড়ালাম। শহর পাহাড়ী জায়গায় অবস্থিত, কিন্তু পাহাড় শিমলা বা মুসৌরীর মত উঁচু ছিল না। বাড়ি আর রাস্তা সুপরিকল্পিতভাবে বানানো হয়েছিল। নগরে জায়গায়-জায়গায় প্রচুর উদ্যান আছে। আমি একটা বড় উদ্যানে গেলাম। জানতে পারলাম, মানুষ বিলাসোপবনে দেবদারু কেন রাখে না। এর পাতাঝরার সময় নির্দিষ্ট না থাকায় সে সব সময় শুকনো পাতা ঝরাতে থাকে। যদি নীচে ঘাসও থাকে, তবুও তো এই পাতা পরিষ্কার করা সোজা নয়। উদ্যান খুব মনোরম ছিল।

৯৫ ক্রোনর অর্থাৎ প্রায় একশো টাকায় চুল পরিষ্কার করার সাবান সস্তা বলা যায় না। পোশাক অবশ্যই সস্তা ছিল, যদি সেলাই-এর বেশি দামও তার মধ্যে যোগ করা হয়। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে আমি লিখেছিলাম—'সুইডিশ নর-নারী শুধু উচ্চতায় বড় না, তারা খুব বেশি সুন্দরও। সবারই দীর্ঘকপাল।' সুইডেন আমাদের দুটো বড় জেলার সমান আর তার এই বৈভব। সে শুধু নিজের জন্যই নয়, সোভিয়েতের জন্যও ডজন-ডজন জাহাজ বানাচ্ছে, যার সমস্ত সামগ্রী এদের কারখানায় তৈরি হয়। হ্যাঁ, মোটর আর বিমান এখানেও বেশির ভাগ বাইরে থেকে আসে। বাজারে অন্যান্য অনেক জিনিসও বিদেশী। ভারতীয় জিনিসের একটা দোকান ছিল, যাতে হাতির দাঁতের সামগ্রী রাখা ছিল।

সন্ধে সাড়ে ছটায় 'শ্বেতদ্বীপ' আবার নোঙর তুলল। রাত ১১·৪০-এ এখনো গোধূলিই ছিল, তাহলে আর রাতের সম্ভাবনা কোথায়? ১১ জুলাই আমি সমুদ্রেই কাটালাম। আজ সমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল, কিন্তু খুব বেশি নয়, তাও লোকেরা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। আমার দোলনায় দোলার আনন্দ হচ্ছিল। আমাদের জাহাজ সমুদ্রতট থেকে অল্প দূরেই যাচ্ছিল। তার মুখ দক্ষিণ আর কখনো-কখনো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হচ্ছিল। আমি কখনো হলঘরে গিয়ে সেখানে রাখা সোভিয়েত সম্বন্ধীয় ইংরেজি বই পড়তাম, আর কখনো বাইরের দিকে সমুদ্র আর তটভূমির দৃশ্য দেখতাম। কিছু ইংরেজি ভাষাভাষীর লোকেরাও আমাদের জাহাজে ছিল। আমার কারো সঙ্গে বেশি পরিচয় হয়নি।

১২ জুলাইয়ের সকালেই তটভূমি দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে ডান দিকে ডেনমার্ক-এর ভূমি আর পরে বাঁ দিকে জার্মানির। দিনের রেল সোয়া দুটোর সময় 'শ্বেতদ্বীপ' কীল খালের মুখে পড়লো। এই খালে আমাদের ৩ ঘন্টা যাত্রা করার কথা। যদি খাল না থাকতো, তাহলে ডেনমার্ক আর নার্বের মাঝখান দিয়ে দুদিনেরও বেশি চক্কর কেটে যেতে হতো। তিনটের থেকে সাড়ে নটা অব্দি 'শ্বেতদ্বীপ' চলতে থাকলো। গতি হয়তো ১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ছিল। খালের দুপাশে আগে নগর এলো। বাড়িগুলোর ছাদ বেশির ভাগ লাল টালির ছিল। কারখানার চিমনিগুলো ধোঁয়াবিহীন ছিল। খালে দুটো

উল্টে পড়া জাহাজ বিগত মহাযুদ্ধের পরিচয় দিচ্ছিল। কারখানাগুলোও ভাঙাচোরা ছিল আর তেলের ট্যাঙ্কগুলো বিদীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এমনিতে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা লেনিনগ্রাদের তুলনায় খুবই কম ছিল। এক সহযাত্রিণী ইংরেজ মহিলা বলছিল, 'প্রদেশ সমৃদ্ধ।' এখানে যুদ্ধ শুধু বোমা বর্ষণেই সীমিত ছিল। কিল খাল সুয়েজ থেকে দ্বিগুণ চওড়া। এখানে এক সঙ্গে দুটো-তিনটে জাহাজ চলতে পারে। কিছু দূর অব্দি খাল আশেপাশের মাটি থেকে ওপরে ছিল। খালের কাছাকাছি কিছু কারখানার গ্রামও ছিল। অনেক চাষের জমি গরু চরানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ দেশে তো দুধ আর মাংসেরও খুব দরকার পড়ে। সমস্ত প্রদেশ সবুজে ভরা ছিল। দেবদারু বনও যেখানে-সেখানে ছিল। জার্মানির এই ভাগ ইংরেজদের হাতে ছিল, তাই কোথাও কোথাও ইংরেজ সেনার ছাউনিও চোখে পড়ছিল। এ সেই জার্মানি, যে জগৎ জয় করতে উঠে এখন পরাস্ত হয়ে পড়েছিল। যদি যুদ্ধের নেশা হিটলারের মাথায় চড়ে না বসতো আজ তার এই দশা কেন হতো? কিন্তু পুঁজিবাদের উদ্দেশ্যই তো যুদ্ধ। শান্তির সময় সে নিজেদের রক্ত চোষে, আর যুদ্ধের সময় অন্যদের। যদি শোষণ সম্ভব না হতো, তাহলে দেশের অধিকাংশ মানুষকে দারিদ্রের মার খেতে হতো না। যদি শোষণের লোভ না হতো তাহলে অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছেও হতো না।

খালের অন্য প্রান্তে পৌঁছে এক ঘণ্টারও বেশি জাহাজ দাঁড়িয়ে রইল। আর পৌনে দশটায় (লেনিনগ্রাদের সময়) সে আবার অতলান্তিক সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগলো।

বাইরের খবর আমি যা কিছু পেয়েছিলাম, তা স্টকহোমে কেনা ইংরেজি কাগজের মারফত। এখন আবার নিঃস্তব্ধতা ছিল। রেডিও খুব কম কাজে আসছিল। খেলাধুলোর মধ্যে দু জোড়া দাবা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দাবার ঘুঁটিতে আমি নজরবন্দীর সময় হাত তো দিয়ে ছিলাম, কিন্তু তার জন্য যতটা সময় দেওয়া দরকার, তা দিতে আমি কখনো রাজি হইনি; তাই বই আর প্রকৃতি নিরীক্ষণ ছাড়া মন-ভালো করার কোনো উপায় ছিল না। হ্যাঁ, এ সময় আমি আমার তাজিক ভাষা থেকে অনুবাদ করা 'দাখুন্দা' আর 'গুলামান' আবৃত্তি করতাম।

১৩ জুলাই (রোববার) সারাদিন তটভূমি দেখা যায়নি। 'শ্বেতদ্বীপ' এমন বেগ দেখাচ্ছিল যে পরশু সন্ধের জায়গায় কালই লন্ডনে পৌঁছনোর আশা ছিল। আজ জাহাজ বেশি দুলছিল। রেডিওর খবরে জানতে পারলাম যে সিলহেট ৫০ হাজার মতাধিক্যে পাকিস্তানে যাওয়া স্থির করেছে।

১৪ জুলাই (সোমবার) সকাল আটটায় 'শ্বেতদ্বীপ' টেম্স-এর ভেতর দিয়ে চলছিল। লন্ডনের কুয়াশা এগিয়ে এসে আমাদের স্বাগত জানাল, কিন্তু লন্ডন ডকে পৌঁছতে পৌঁছতে তা সরে গেল। সাড়ে দশটায় আমরা তটে পৌঁছলাম। পাসপোর্ট মোটামুটি দেখলো। যাত্রীদের সুখ-সুবিধের খেয়াল ইংরেজরা খুব বেশি করে রাখে। যে দেশ এরকম করবে, সে তার এখানে পকেট খালি করাতে বেশি যাত্রীদের ডাকতেও পারবে। কাস্টমের লোকেরা আমার বড় ব্যাগের মুখটা শুধু খুলেছিল। বাকিগুলোতে সব বইই আছে—আমি এটা বলাতে তারা দেখারও প্রয়োজন মনে করলো না। যদিও সেখানেই

জানতে পারলাম, যে ভারত থেকে চেকোস্লোভাকিয়া যাবার আসা এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে যত বই ছিল সব নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই বইগুলোয় হয়তো সাম্যবাদের প্রচারের সামগ্রী ছিল, কিন্তু আমি তো সাম্যবাদের জন্মভূমি থেকে আসছিলাম। জাহাজ সময়ের ৩০ ঘণ্টা আগে এসেছিল। আমি ভাবলাম হয়তো বাঁকেজি এই কারণেই আসতে পারেননি। এখন ভারতের জাহাজ পাওয়া অব্দি লন্ডনে কোথাও ঠাঁই-ঠিকানা খোঁজার দরকার ছিল।

ইংল্যান্ডে

জাহাজঘাট থেকে ট্যাক্সি করে আমি টমাসকুক-এর মুখ্য কার্যালয়ে গেলাম, কারণ প্রথমে আমার চেকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার ছিল। সেখানে পৌছতে ঘণ্টা খানেক লাগলো। ভেবেছিলাম, জিনিস রাখার জায়গা পেয়ে যাব, কিন্তু সেখানে তার জন্য কোনো জায়গা ছিল না। হয়তো হোটেলের ব্যবস্থা হতে পারতো, কিন্তু তার জন্য নিজের পকেট আগে দেখতে হতো। ট্যাক্সি ড্রাইভার পরামর্শ দিল যে জিনিসপত্র স্টেশনে রেখে দিলে ভালো হয়। আমি সেখানে আসবাব-ঘরে জিনিসপত্র রাখলাম আর ভালো মানুষ ট্যাক্সি ড্রাইভার সাড়ে তিন শিলিং নিয়ে ১৬ হিলগ্রোভ রোডে পৌছে দিল, যেখানে বাঁকেজি থাকতেন। জানতে পারলাম, বাঁকেজি তিন সপ্তাহ আগে এডিনবরার দিকে চলে গেছেন। আমার টেলিগ্রাম এসেছিল, যা সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানতে পারলাম না, সে ভারত যাবার জন্য তৈরি কিনা। কিন্তু এখন তো সবচেয়ে আগে থাকার সস্তায় একটা কোনো ব্যবস্থা করা দরকার। এই বোর্ডিং হাউসে বিহারের দু-একজন ছাত্র ছিল। তারা ৩৫ লংরিজ রোডে বেয়ারলি হোটেলের নাম দিল। আমি সেই হোটেলে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে অনেক ভারতীয় ছিল। ৩ গিনি, ৩ পাউণ্ড, ৩ শিলিং বা সপ্তাহে প্রায় ৪০ টাকায় একটা কামরায় জায়গা পেলাম, যেখানে আগে থেকেই একটা ভারতীয় ছাত্র থাকতো। এর মধ্যেই দুবারের খাওয়াও যোগ করা ছিল। ৭ শিলিং খরচা পড়ল স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে জিনিস আনতে। এখন হাতে ৫৫ পাউণ্ড রয়ে গিয়েছিল। এটা বলার দরকার নেই, যে রাশিয়ার জন্য দেওয়া চেক টমাসকুক এখানে ভাঙিয়ে দিতে রাজি ছিল। এখন মাটিতে পা ছিল, তাই খুব ভয় করছিল না। এখন আমি জানতাম না, কত দিন পরে জাহাজ পাব। প্রথম চিঠি থেকে আমি এক মাস প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম।

লন্ডনে যত্র-তত্র এখনো ভেঙে পড়ে থাকা বাড়ি দেখা যেত। লেনিনগ্রাদে এরকম দৃশ্য দেখতে নগরের ধারে যেতে হতো। এমনিও লেনিনগ্রাদ লন্ডনের থেকে বেশি

সুন্দর, তার রাস্তাঘাট খুব সুন্দর। দু-দিকের বাড়িগুলোও খুব ভালো ছিল। এখানেও কম পরিষ্কার ছিল না। প্রত্যেক চৌরাস্তায় খুব ভিড় দেখা যেতো, যা লেনিনগ্রাদে দিনের কোনো কোনো সময়েই শুধু দেখা যেতো। লেনিনগ্রাদের রাস্তাও খুব চওড়া ছিল, কিন্তু এখানকারের রাস্তা সরু সরু, কিছু আবার আঁকাবাঁকা। আজ জানতে পারলাম, মুহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান ডমিনিয়নের গভর্নর-জেনারেল হলো।

দ্বিতীয় দিনে বাঁকেজির এক বন্ধুর কাছে জানতে পারলাম, যে সেখানে তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু আছে। যা হোক নিশ্চিন্ত তো হতে পারলাম, যে সে অপরিচিত স্থানে পড়ে নেই। টমাসকুক আর ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে ভারতের যাত্রার জন্য কিছু কাজ ছিল, ভেবেছিলাম তার পর গ্লাসগো যাব। আমার কাছে যে ৫৫ পাউণ্ড ছিল তা যথেষ্ট ছিল না।

হয়তো আমি ভালোভাবে ঘুরে বেড়াতে পারতাম কিন্তু এমন কিছু বেশভূষা বানানো হলো যার জন্য দু-হপ্তা আরো থাকতে হলো, তবু বেশি বেড়ানো হলো না। ইন্ডিয়া-হাউসে এখন ভারতের উচ্চ-ভারপ্রাপ্ত মিস্টার মেননের দরবার ছিল। ইংরেজদের মতই এখনো নির্দয়ভাবে চাকর-বাকরদের পেছনে টাকা খরচ করা হচ্ছিল। আমলাতন্ত্রের মেশিনও সেই ভাবেই চলছিল। কিন্তু সেখানকারের ইংরেজ কর্মচারী মিস্টার হার্ডিং খুব সহৃদয়তা দেখালো। পি· ও· কোম্পানির দফতরে ফোন করে বি· ক্লাশের টিকিটের ব্যবস্থা করিয়ে চিঠি লিখে দিল। আমি ভেবেছিলাম, বাঁকেজিও যাবেন, তাই দুটো টিকিটের ব্যবস্থা করেছিলাম। ভাড়া ৫৪ পাউণ্ড দেবার ছিল, অর্থাৎ ভাড়া চুকিয়ে দেবার পর তাহলে হাত খালি হয়ে যেতো। ইন্ডিয়া অফিস থেকে কিছু নেবার জন্য প্রদেশ সরকারের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যা হোক এতটা হয়ে যাবার পর এটা তো জানতে পারলাম যে, চিঠিতে জাহাজ না পাবার যে ভয় দেখানো হয়েছিল সেটা ঠিক নয়।

এখন দেখাশোনা করার ছিল। প্রস্থানের সময় ইত্যাদির ব্যাপারে এখন কিছু ঠিক হয়নি। কম্যুনিস্ট খবরে কাগজ 'ডেলি ওয়ার্কার' থেকে কিছু জানা যাবে ভেবে আমি খুঁজতে-খুঁজতে সেইখানে পৌছলাম। জানতে পারলাম যে মুরাদাবাদের কমরেড শরফ অতহর এখানেই আছে। মজুরদের আর কৃষকদের অবস্থা দেখতে চাইলে বলা হলো, যে লন্ডন পার্টি অফিস থেকে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। লন্ডন কি একটা ছোটো শহর? ৭০-৭৫ লাখ জনসংখ্যার শহরকে একটা জেলাই মনে করুন, তাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যেতে সময় খুব লাগতো। পয়সা কম খরচা করার ব্যবস্থা লোকেরা করে রেখে ছিল। তবে ভূগর্ভ-রেল তথা বাসে খুব সস্তা পড়ত। পার্টি অফিস পরশু (১৮ জুলাই) মজুরদের বস্তি দেখানোর কথা দিয়েছিল। কমরেড শরফকেও টেলিফোন করে দিয়েছিলাম। সে আমার পুরনো পরিচিত। সন্ধেবেলা সে আমার এখানে চলে এলো আর বলল, 'কৃষক আর খেত-মজদুরদের অবস্থাও দেখ, তার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে।'

১৭ জুলাই আকাশে মেঘ জমে ছিল আর টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধেবেলা তো বেশ ভালো বৃষ্টি হয়ে গেল। সেদিন লন্ডনের বড় উদ্যান রিজেন্ট পার্ক দেখতে গেলাম।

অন্য জায়গার চিড়িয়াখানাকে যুদ্ধ শূন্য করে দিয়েছিল। কলকাতার চিড়িয়াখানায় সাপের বিশাল সংগ্রহ ছিল, কিন্তু জাপানী বোমা পড়ে মুক্ত হাজার হাজার সাপ কোথাও আবার শহরে না ঢুকে পড়ে, তাই সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোকে মেরে ফেলতে আর কতকগুলোকে স্থানান্তরিত করে দিতে হয়েছিল। লন্ডনের চিড়িয়াখানা এখনো ভালো অবস্থাতেই ছিল। বাঁদর, পাখি, শিম্পাঞ্জি, উট, ভালুক, বাঘ, সিংহও ছিল—সিংহ-বাঘ প্রচুর সংখ্যায় ছিল। লেনিনগ্রাদের চিড়িয়াখানা ভালো অবস্থায় থাকার সময়ও এর থেকে ছোটই ছিল, এখন তো তা ফাঁকা হয়ে গেছে। জার-এর সামন্ততান্ত্রিক সরকার মনে করতো, চিড়িয়াখানার গুরুত্ব শুধু চিত্তবিনোদন, কিন্তু পুঁজিবাদী ইংল্যান্ড তাকে বিজ্ঞানের প্রয়োগশালা মনে করত, তাই তাকে সমৃদ্ধ রাখার পুরো চেষ্টা করা হয়েছিল। আর সেইজন্যই অত্যন্ত ঘন-বসতির লন্ডনের এত পরিত্যক্ত জমিকে কিছুটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু যখন একবার প্রাণী উদ্যানের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ফের বসতির জন্য তার থেকে কি করে কেটে নেওয়া যায়? আজ কোনো রোববার বা ছুটির দিন নয়। কিন্তু দর্শকদের সংখ্যা অনেক ছিল।

রিজেন্ট পার্কের কাছেই কোথা গ্লৌসিস্টর রোড ছিল, যার একটা বাড়িতে পনেরো বছর আগে আমি তিন মাস থেকেছিলাম। ভাবলাম, যাই সেটাও দেখে নিই। খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে পৌছলাম, কিন্তু এখন গ্লৌসিস্টর রোডের জায়গায় তার নাম গ্লস্টর এভিন্যু হয়েছিল। তার ৪১ নং বাড়িতে এখন কোনো মহাবোধি সভা ছিল না। পুরনো লোকে একটা অন্য বাড়ি দেখালো। সেখানে যারা কাজ করছে সেই মজদুরদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে এখন লোকেরা হ্যাম্পটন রোডের কাছে ২৯ ইফেল্ড স্কোয়ারে চলে গেছে। যা হোক, লোকটা তো বোধহয় আমার পরিচিত নয়, তার ওপর বৃষ্টি পড়ছিল, তাই সেখানে যাবার চিন্তা আমি ছেড়ে দিলাম। আধুনিক যুগের মহান বৌদ্ধ মিশনারী অনাগরিক ধর্মপাল যে বাড়ি কিনেছিলেন সেটা এই জন্য যে ইংল্যান্ডে বৌদ্ধধর্মের একটা ভালো মন্দির আর প্রচার কেন্দ্র হোক, এখন সেখানে তার কোনো ঠিকানাই ছিল না। বাড়িটা যুদ্ধের বোমা বর্ষণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু জানিনা এখনো তা মহাবোধি সোসাইটির নামে আছে কিনা। আমার পৌছনোর একটু পরেই ভারত-স্বাধীনতা আইনকে ইংল্যান্ডের কমন-সভা পাশ করেছিল। আজ লর্ড-সভাও তা পাশ করে দিল। ভারত নিজেদের বলিদানে স্বাধীনতা পায়নি, বরং পেয়েছে ইংরেজদের সদিচ্ছায়—এটাই তার অভিপ্রায় ছিল।

মজদুরদের বস্তি—পূর্ব-নির্দিষ্ট ১৮ জুলাই-এ এক কম্যুনিস্ট তরুণ হ্যারি ওয়াটসন আমাকে মজদুরদের বস্তির দিকে নিয়ে গেল। নটা থেকে তিনটে অব্দি আমি ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ডক, ইস্ট ইন্ডিয়া ডক, ভিক্টোরিয়া ডক ইত্যাদি ঘুরে কাটালাম। ডক অর্থাৎ জাহাজ ঘাট ইংল্যান্ডের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা নাম না জানা ছোট দ্বীপ নিজের বাণিজ্যের বলেই বিশ্বের এক মহান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং সেই বাণিজ্য এই ডকগুলো থেকেই হতো। ইস্ট ইন্ডিয়ার মানে ভারত আর পূর্বের দেশ, যেখানে

আসা-যাওয়ার জাহাজ এই ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতো। বলা যায়, সে তিন শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধির কীর্তি-স্তম্ভ। ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ডক থেকে আমেরিকার দিকে জাহাজ হয়তো যাতায়াত করতো। ডকে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নামানোর কাজ হতো, যাতে মজদুরদের হাতই কাজ করতে পারত। ওখানকার মজদুর যদিও বেশির ভাগ ইংরেজ ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর অন্য দেশের অনেক লোকও এখানে চোখে পড়ত। চৈনিক এবং ভারতীয় রেস্তেরাও ছিল। যুদ্ধের সময় এখানে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ হয়েছিল, তাই বেশির ভাগ বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছু বাড়িকে অস্থায়ী রূপে বাসযোগ্য করা হয়েছিল। এমনিতে যে গতিতে লেনিনগ্রাদে পুনর্নির্মাণের কাজ হয়েছিল, তার অর্ধেক গতিতেও যদি কাজ করা হতো, তাহলে এখানে অনেক বাড়ি তৈরি হয়ে যেত। শত শত বাড়ি এমন ছিল যার ছাদ, জানলা, দরজা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো সহজেই মেরামত করে মানুষের থাকার যোগ্য বানানো যেতো, কিন্তু লেনিনগ্রাদ আর লন্ডনে অনেক তফাৎ। বলতে গেলে লন্ডনে মজদুরদের সোশ্যালিস্ট গভর্নমেণ্ট শাসন করছিল, কিন্তু এখনো ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে খুব পবিত্র বলে ধরা হতো। বাড়িওলারা এই দেওয়ালগুলোকে না নিজেরা থাকার উপযুক্ত করতে পারতো আর না নগরপালিকাকে তা করার অধিকার দিত। কিনতে গেলে যা পয়সা দিতে হতো, তা নগরপালিকার ক্ষমতার বাইরে। এও জানতে পারলাম, এখানকার সমস্ত বাড়িগুলো বানানোর কাজ ঠিকাদারেরাই করতে পারে। সে এরকম ঠিকাদারি নিতে কেন রাজি হবে, যাতে লাভ কম? নতুন বাড়ি বানাতে তারা রাজি কিন্তু এই মজবুত দেওয়ালের ওপরে ছাদ রাখার জন্য নয়। হ্যারি বলল যে, এখানে শুধু বোমায় বাড়িগুলোর তেমন ক্ষতি হয়নি, যতটা ক্ষতি হয়েছে আগুন আর হাওয়ার ধাক্কায়। একটা পাঁচতলা বাড়ি দেখিয়ে হ্যারি বলল, 'এর ওপর বোমা পড়ার সময় আমি কাছেই ছিলাম।' একটু জায়গা দেখিয়ে সে বলল যে, এখানেই উড়ন গোলা (রকেট) পড়েছিল। কাছেই একটা বড় জুটের গুদাম ছিল; যা সারা হপ্তা জ্বলছিল। স্কুলের একটা চারতলা অট্টালিকার শুধু কাঠামোটা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ আর ফাঁকিবাজির জন্য কে জানে কত দিন বাদে এই বিধ্বস্ত নগরোপান্ত ফের বসবাসযোগ্য হবে। আর এই দেশও অহঙ্কার করছিল যে এদের এখানে সমাজবাদী মজদুর পার্টির রাজত্ব আছে। এরকম সমাজবাদ থেকে ভগবান বাঁচাক, যাকে দেখতে খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হবে। লেনিনগ্রাদ আর রাশিয়া থেকে নিশ্চয় এখন লন্ডন আর ইংল্যান্ড অনেক দূর। লন্ডন নগরপালিকা চায়—মাল গুদামগুলো এখানে অনেক জায়গা ঘিরে রেখেছে, ওগুলো সরিয়ে নগরের বিস্তার করা হোক, মানুষের জন্য ভালো ভালো ঘর বানানো হোক, কিন্তু জমির মালিক এতো দাম চাইছে, যে তা দেওয়া সম্ভব নয়।

এক জায়গায় চৈনিক নাবিক-সংঘর অফিস দেখলাম। পাড়ায় বহু সংখ্যক চৈনিক ছিল। যদিও তারা সবাই শুদ্ধ চৈনিক না হয়ে ইংরেজ মায়েদের সন্তান ছিল। চৈনিক মুখমুদ্রা এত দৃঢ় হয়, যে এক বংশে সামান্য সম্পর্ক হয়ে গেলে অনেকগুলো বংশ ধরে তা একটানা চলতে থাকে, তাই চৈনিক মুখাবয়বসম্পন্ন কোনো পুরুষকে জানতে হলে

তার ইংরেজ মায়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে হবে। এই পাড়ায় ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা হয়েছিল। যারা রয়ে গিয়েছিল, তাদের ঘরদোর খুবই ময়লা-নোংরা ছিল। একটার সময় ওয়াটসর্ন আমাকে ডাক-মজদুরদের সভায় নিয়ে গেল। আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল না কিন্তু ওয়াটসান দাঁড়াতেই দুশো মজদুর আশেপাশে জমা হয়ে গেল। বক্তৃতা ছোট ছিল, কয়লাওলা-মজদুর কম করেও ৬ পাউণ্ড প্রতি সপ্তাহ মজুরির দাবি করছে, তার সমর্থন চায়। আর্জেন্টিনার অত্যাচারী শাসকের স্ত্রী ইভা পেরোন যদি লন্ডনে আসে তাহলে তার বিরুদ্ধে পূর্ণ হরতাল আর বিক্ষোভ হওয়া উচিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া ডকের গেটের কাছে সভা হলো, তারপর ঘুরতে-ঘুরতে আমরা ভিক্টোরিয়া ডকের দিকে গেলাম। এখানেও ধ্বংসলীলা সেই রকমই ছিল। ইংল্যান্ডের খাদ্যদ্রব্য এই ডকেই খালাস হতো, তাই হিটলার চাইল, একে নষ্ট করে ইংরেজদের ভাতে মারা হোক। আমরা নগরপালিকাদের বানানো বাড়িগুলোর দিকে গেলাম। ভাড়া ২৫ থেকে ৩০ শিলিং ছিল, যা খেলাঘরের মত এই বাড়িগুলোর পক্ষে অবশ্যই বেশি ছিল। নীচের তলার বাড়ি ভাড়া ১০-১১ শিলিং ছিল। হপ্তায় একজনের ভোজনে ২৪ শিলিং এর কমে খরচ হতো না। যদি স্ত্রী-পুরুষ আর দুটো বাচ্চা হতো, তাহলে ৩৮ শিলিং নিজেদের এবং ৩ শিলিং প্রত্যেক বাচ্চার জন্য স্কুলে দিলে তারা একবেলার খাবার পেত। ৪ জনের পরিবারের জন্য প্রতি হপ্তা ৫ পাউণ্ড দরকার হতো। বই-এর দামও বেশি ছিল। তা এত দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল যে, ছেলেদের পড়ানোর জন্য পুরনো বইকে কাজে লাগানো হতো। সবচেয়ে সস্তা (ইউটিলিটি) স্যুটের দাম ৪ পাউণ্ড ১০ শিলিং অর্থাৎ ৬০ টাকার বেশি ছিল। ওভারকোট ২০ পাউণ্ড, ২·৫ থেকে ৩ পাউণ্ড মজুরদের জুতো (ওয়ার্কিং বুট) ২৫ থেকে ২৮ শিলিং অর্থাৎ ১৮ টাকা, জুতো মেরামত ১০ শিলিং (৬ টাকার ওপর), একটা স্যুট ধুতে ৩০ শিলিং, সিনেমার টিকিট ১ থেকে ৪·৫ শিলিং অব্দি, মামুলি মদ এক পাঁইটের ১ শিলিং, ২০খানা সিগারেটের আড়াই শিলিং। জীবন-ধারণ এমনি ব্যয়সাপেক্ষ ছিল—যখন সব মানুষের কাজ পাওয়াও নিশ্চিত ছিল না। বাড়িতে অসুখ করলে যারা হাসপাতাল সেভিং অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বরের চাঁদা দেয় তাদেরই বিনে পয়সায় চিকিৎসা হতো, না তো সাধারণ ডাক্তারের জন্যও ৩-৪ গিনি প্রতি হপ্তা দিতে হতো। বাবা বেকার হলে বাচ্চাদের বিনা পয়সায় দুধ পাওয়া যেত, না তো পৌনে শিলিং-এ ১ ছটাক গুঁড়ো দুধ পাওয়া যেত।

ওয়াটসন তার এক পরিচিত বাড়িতে নিয়ে গেল। অবিবাহিত বড় ছেলে মায়ের সঙ্গে থাকতো, আর রাজমিস্ত্রির কাজ করত, তার থেকে তার ৪ পাউণ্ড ৫ শিলিং প্রতি সপ্তাহে মিলত। দেশলাই-এর বাক্সের মত ছোট ছোট চারটে ঘর ছিল, তার মধ্যে তিনটে শোবার ঘর আর একটা খাবারব ঘর ছিল—পঞ্চম ঘরটা ছিল রান্নাঘর। বাড়ি ভাড়া প্রতি সপ্তাহে ১০ শিলিং ছিল—যদি ওপর তলায় হতো তাহলে, তো ১১·৫ শিলিং দিতে হতো। বিদ্যুতের ৪ শিলিং। উনুনের গ্যাসের ৫ বা ৬ শিলিং প্রতি সপ্তাহে আলাদা করে লাগতো এবং মেথর প্রতি সপ্তাহে পেতো কেবল ৪·৫ পাউণ্ড, (অর্থাৎ ৮৫ শিলিং)। আমি বলেছি যে, দুটো বাচ্চা আর দুজন মিয়া-বিবির খাওয়া খরচা ১০০ শিলিং হতো।

ইংরেজ মজদুর পরিবারের কি অব্যবস্থা তাহলে হবে, সবাই এর অনুমান সহজেই করতে পারবে। শোবার ঘরে লোহার খাট, গায়ে দেবার ও পাতবার চাদর এবং টেবিল আর বৈদ্যুতিক আলো ছিল। এই মজদুরদের বুকে চেপে জমির মালিক, বাড়ির মালিক আর ভাড়া আদায় করা এজেন্ট এই তিন-তিনটে কুঁড়ে মজা লুটছিল। এদের নামেই লেনিনগ্রাদের লোকেরা হেসে উঠতো। মজদুর সরকার এতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে রাজি ছিল না। কখনো যুদ্ধ আর কখনো কম্যুনিজম-এর জুজুর নামে আমেরিকা থেকে রুটি-মাখন আসতো, মজদুর নেতা ভাবতো, এই ভাবেই ওদের তরি পার হয়ে যাবে। কিন্তু আগের থেকে আজকের অবস্থা ঐতে এত কম পরিবর্তন হওয়ায় মানুষ কাঁহাতক মজদুর সাম্রাজ্যবাদীদের লম্বা লম্বা কথা বিশ্বাস করত? একদিন অবশ্যই তারা তাকে বাইরে বার করেই ছাড়তো। প্রশ্ন এই ছিল—মজদুর সাম্রাজ্যবাদীদের হটিয়ে টোরি-সাম্রাজ্যবাদীদের নিকৃষ্টতম শাসন ব্যবস্থায় যাবে, না যে শাসনতন্ত্র যেখান থেকে সমস্ত দারিদ্র আর দুঃখ চিরকালের জন্যে নষ্ট করে দেবে সেই শাসন-ব্যবস্থায় যাবে?

লন্ডনে এখন খবরের কোনো অভাব ছিল না। দুনিয়ার সব মোটা-মোটা খবর কথায় কথায় এখানকার খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যেত, আর ইংরেজদের গোলামির কারণে আমাদের সুবিধে ছিল, ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে নেবার। ২০ জুলাই জানতে পারলাম, বর্মায় ওংগ-সাংগ আর পাঁচজন অন্য মন্ত্রীকে গুলির শিকার বানানো হয়েছে। বিরোধী পার্টিকে তলোয়ার দিয়ে কুচোকাটা করা ভালো নয়, কারণ তলোয়ারের বিরুদ্ধে ফের তলোয়ার উঠতে থাকে। ভারতের অস্থায়ী সরকার তৈরি হলো। সমস্ত বিভাগ দুটো দুটো করে ভাগ করে নতুন মন্ত্রীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। লন্ডনে এখন ভারতীয় ছাত্রদের আগমন কমেনি, বরং মনে হচ্ছিল এখানে ছাত্রবৃত্তি দিতে খুব উদারতা দেখানো হচ্ছিল। পাউন্ডের প্রাপ্য-অর্থ অনেক জমে গিয়েছিল, তাই তো অত্যন্ত নির্দয়ভাবে খরচ করা হচ্ছিল—শেষমেশ ব্যারিস্টারি বা সংস্কৃতের পি· এইচ· ডি· করে আসার জন্য পাউন্ডকে সমান করার কি দরকার ছিল? যদি ছাত্রবৃত্তি দিতে হয়, তাহলে তা সায়েন্স আর টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য দেওয়া দরকার।

২১ জুলাই খুব সকালেই আমি বেড়াতে বেরোলাম। ভাবলাম টাকা কোথাও খরচ হয়ে যেতে পারে, কাজেই আগে জাহাজের টিকিট নিয়ে আসি। পি· ও· কোম্পানির জাহাজ 'স্ট্রেথমোর' পয়লা আগস্টে এখান থেকে গিয়ে ১৭ তারিখে বম্বে পৌঁছনোর কথা। আমি ৫৪ পাউন্ড দিয়ে বম্বের টিকিট নিয়ে নিলাম। ২১ জুলাই আর ১ আগস্টে ১০ দিনের তফাৎ ছিল, যার জন্যে কাছে পয়সা বেঁচে ছিল না। ২০ পাউন্ড ধার নিলে কাজ চলতে পারত। কিন্তু ইন্ডিয়া-হাউসে তো প্রাদেশিক সরকারকে জিজ্ঞেস করে তবেই টাকা পাওয়া যাবে, যা ন মণ তেলে রাধার নাচার শর্ত ছিল। কেউ একজন হাই কমিশনারকে লিখতে বলল। টমাসকুকের কাছে কিছুদিন যাবৎ আমি না গিয়ে ভুল করলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে ৫০-৫০ পাউন্ডের দুবার দুটো ড্রাফট ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের নামে আমার জন্য এসেছিল। ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্ক ব্রাক-স্ট্রিটে ছিল যেখানে সবই শুধু ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্ক। লক্ষ্মীর প্রতাপ যেখানে দিনরাত বিরাজমান।

সেখানকার রাস্তাঘাট, বেনারসের কচুরি গলির মত—সেটা মোটেই ঠিক কথা নয়। ভাবলাম, এখন তো টাকা অনেক চলে এসেছে আর তা পাউন্ডের রূপে ভারতে ফেরত দেওয়া ঠিক না।

এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াবার কথা ভাবতে লাগলাম। ২২ তারিখে ব্রিটিশ মিউজিয়ম গেলাম। শুধু একটা হল খোলা ছিল, যাতে অল্প অল্প সব কিছুরই সংগ্রহ ছিল। ওসব দেখতে ৩০ মিনিটও লাগেনি। বাকিগুলোর সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পারলাম, তাতে তো মনে হলো হয়তো বহু বছর লাগবে, ব্রিটিশ মিউজিয়মকে ফের সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে। এর তুলনা লেনিনগ্রাদের এর্মিতাজ মিউজিয়মের সঙ্গে করলে ইংরেজদের সাংস্কৃতিক প্রেমের গতির মন্দতা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। এর্মিতাজে আগের বছরেই পঁচিশটা হলঘর খুলে গিয়েছিল আর এ বছর তো একশোর কাছাকাছি হলঘর সাজানো হয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানে শুধু আমার কাজের জিনিস দেখলাম। এই দেখার জন্যেও ছ-সাত ঘণ্টা পর্যাপ্ত ছিল না।

আজ আমি একটা সফরি রেডিও কিনলাম। যদি এখন এটা নিশ্চিত ছিল না, যে ভারতে বিদ্যুৎ রয়েছে এরকম শহরে আমি থাকব কিনা। চেষ্টা করলাম যে ব্যাটারি আর বিদ্যুৎ দুরকমেই চলে এরকম রেডিও কেনার, কিন্তু সেরকমটি পেলাম না। সেদিন ৫-৬ ঘণ্টার ঘোরা-ফেরা কখনো হেঁটে, কখনো বাসে বা পাতাল-রেলে করলাম। সন্ধেবেলা বিহারের পরিচিত শিক্ষক-ছাত্র ডাক্তার ব্রহ্মচারী, প্রফেসর দিবাকর বিদ্যার্থী ইত্যাদির সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা হতে থাকল। তারা এখানে আসার আগের ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলল।

২৩ জুলাই অনেকগুলো মিউজিয়ম দেখলাম, তাদের মধ্যে ছিল ভিক্টোরিয়া এ্যালবার্ট মিউজিয়ম, ভূতত্ত্ব মিউজিয়ম আর সায়েন্স মিউজিয়মও। ভূ-তত্ত্ব আর সায়েন্স মিউজিয়মগুলোকে প্রায় পুরোপুরি সাজানো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঐতিহাসিক সামগ্রী ও শিল্পকলার জিনিসের সংগ্রহালয় ভিক্টোরিয়া এ্যালবার্ট মিউজিয়মের সূক্ষ্ম-চিত্রকলার অল্প কটা ঘরই ঠিকঠাক করা সম্ভব হয়েছিল। এশীয় জিনিসের সংগ্রহ এখনো কিছুই রাখা হয়নি। আমি মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধীয় জিনিসগুলোকে দেখতে খুব উৎসুক ছিলাম, কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়মের মত এই মিউজিয়মের ব্যাপারেও হতাশ হতে হলো। ভূ-তত্ত্ব আর সায়েন্সের মিউজিয়মকে এতো তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দেওয়াতে বোঝা গেল ইংরেজ কতটা যথার্থবাদী। ইংল্যান্ডের মাটিতে কি কি সম্পত্তি আছে, আর তার মাটি কিভাবে গঠিত হলো, সেটা জানাতে এক-একটা এলাকাকে ভূতত্ত্ব মিউজিয়মে ভালোভাবে দেখানো হয়েছিল। সেখান থেকে পাওয়া জিনিস যেখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল, সেখানে তার সঙ্গেই নকশা আর রেখাচিত্র বানিয়ে সেগুলো সুন্দর করে বোঝানো হয়েছিল। লেকচারের ব্যবস্থাও ছিল। সেই সময় ভেতরে অনেক ছাত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আনবিক বোমার যুগে এখন ইউরেনিয়াম (উইরান) ধাতুর গুরুত্ব বেশি, তাই তার ডেলাও সেখানে রাখা ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ভারতের মাটি রত্ন-গর্ভা, কবে সেখানকার ভূ-গর্ভের সামগ্রী এইভাবে দিল্লী ইত্যাদি জায়গায় এক সঙ্গে করা হবে এবং সেগুলো

ছাত্র আর সাধারণ লোকের জানার সুযোগ হবে। সায়েন্স মিউজিয়মে রেল, মোটর, বিমান, জাহাজ, প্রেস, সেলাই ইত্যাদি শত শত প্রকারের মেশিনের বিকাশের ইতিহাস দেখানো হয়েছিল। কিছু মেশিন তো সেখানে এমনিই রাখা ছিল, যেগুলো আবিষ্কারকরা সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। অ্যালবার্ট মিউজিয়মের চিত্রশালা দেখলে মনে হয় যে ইংল্যান্ড পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বস্তুবাদী হয়ে গিয়েছিল, যেখানে রাশিয়াকে সেখানে পৌঁছতে অষ্টাদশ শতাব্দী অব্দি অপেক্ষা করতে হলো। পোর্ট্রেটগুলোর মধ্যে ভারতীয়দের চিত্রও ছিল।

এখন তো ভারতের ডোমিনিয়ন স্বাধীনতা আরম্ভের সময় কেটে গিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতার কারণে দেশের মনোবৃত্তিতে যা পরিবর্তন হওয়া দরকার, তার অভাব অনেক দিন থাকবে। লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের আধিক্য ছিল, সংখ্যায় বোধহয় আগের থেকেও বেশি ছিল। আশ্চর্যের বিষয় তো এই যে এখন আইন আর শিল্পকলার ডিগ্রির জন্য মানুষ দৌড়ে দৌড়ে আসছিল। ইন্ডিয়া-হাউসে এখনো ইংরেজ কর্মচারীদের আধিক্য ছিল। ভারতীয় কর্মচারীদের মনোভাব দেখে তাদের কালো সাহেবের থেকে বেশি কিছু বলা যেত না। এই পাড়ায় ভারত ছাত্রসংঘ (ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ব্যুরো) ছিল, যেখানে ভারতীয় খাবার পাওয়া যেত। আমাদের হোটেলে দিল্লীর এক ব্যবসায়ী জৈন ভদ্রলোক উঠেছিলেন। যদিও এখন জৈন হওয়া অসাধারণ কিছু ছিল না, কিন্তু উক্ত ভদ্রলোক এই ব্যাপারে সৎ ছিলেন। দিল্লীতে তিনি স্টেশনারির কারবার বিশ বছরেরও অনেক আগে আরম্ভ করেছিলেন। যারা অল্প লাভ হয়ে গেলেই কলুর বলদের মতো অতটুকু সীমাতেই ঘুরে ঘুরে অনেক লাভ করার কথা ভাবে, তিনি তেমন ব্যবসায়ী ছিলেন না। স্টেশনারি করতে গিয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। যা তাঁর কাছে রাখা ছাপা সূচি থেকে বোঝা যাচ্ছিল। তিনি এক মাসেরও বেশি সময় সেই ব্যাপারেই লন্ডনে ছিলেন আর ইংল্যান্ডের বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেখান থেকে শেখার আর নেবার জিনিস সংগ্রহ করছিলেন। পরে তিনি এই ব্যাপারেই জার্মানি, আমেরিকাও ঘুরেছিলেন। দিল্লীনিবাসী হওয়ায় দিল্লীর মুসলমানী খিচুড়ি পোশাক তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না—যা নেহরুজী ভারতের জাতীয় পোশাক বানানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। পায়ের সঙ্গে সাঁটা পাতলা পাজামা, শেরবানী আর মাথায় নৌকাকার টুপি—রোগা-পাতলা ছিলেন না, তা না হলে 'শঙ্কর' কার্টুন বানানোর শিল্পীকে বেশি পয়সা দেবার দরকার হতো না আর ফটো দিয়েই কাজ চলে যেত। যাইহোক, জৈন ভাই-এর কাছে জানতে পারলাম যে এখানে ভারতীয় খাবারও পাওয়া যায়। সেই লোভে তিনি দশ মাইল চক্কর কেটে ব্যুরোর হোটেলে যেতেন। যদিও এখানে হোটেলে তাঁর নিরামিষ খাবার পেতে কোনো অসুবিধে হতো না—ইউরোপের কোনো দেশে, রাশিয়ায়ও— নিরামিষ খাবার পেতে কোনো অসুবিধে হতো না, কেননা রুটি মাখন, দুধ, ফল সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যেত। সেদ্ধ আলু, কফি খাওয়ার তো সেখানে রেওয়াজ আছে। হ্যাঁ, নিরামিষাহারীদের ভাজা জিনিসে সংযমী হওয়া প্রয়োজন, কারণ সেখানে ভাজাভুজিতে চর্বি ব্যবহার করা হয়। পাঁউরুটিতে ডিম দেয় এমন বেকুব সেখানে কাউকে পাওয়া যাবে না, কেননা ডিমের

দাম খুব বেশি। কিন্তু ভালো বিস্কুট বা কেকে সেটা থাকার ভয় অবশ্য আছে। জৈনভাই ভারতীয় হোটেলে যেতেন। ২৫ তারিখ আমিও গেলাম। সেখানে 'ঘাস-মাঁস' দুটোরই ব্যবস্থা ছিল। লঙ্কা খুব ধানী মনে হলো। আমি এরকম দেশে ২৫ মাস পরে এলাম, যেখানকার লোকজন বন্ধুর নাম মুখে আনতেও তীক্ষ্ণতা অনুভব করে, যেখানে মশলা চোখে দেখতেও পাওয়া যায় না। আমার কাছে কিছু গোলমরিচ ছিল।একদিন আমি কাপড়ের পঁটুলিতে চারটে-পাঁচটা মরিচ বেঁধে মাংসের স্যুপে দিয়ে দিয়েছিলাম। ইগর আর লোলা দুজনেই নালিশ করছিল, যে ওদের কণ্ঠনালী জ্বলে পুড়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে আমার কণ্ঠনালীও তো দু-বছর ধরে লঙ্কার জ্বালা থেকে মুক্ত ছিল। এমনিতে আমি লঙ্কা বয়কট তো করিনি, কিন্তু খুবই কম খাই। বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত থাকার দরুন সেদিন আমার কণ্ঠনালীও ভারতীয় ভোজনালয়ের ভোজনে জ্বলছিল। আমি আর সেখানে যায়নি। ভারতে আসার পর ছ মাস অব্দি লঙ্কায় অভ্যস্ত হতে কণ্ঠনালীকে তৈরি করতে হলো। ছাত্রদের আর ব্যাপারীদের এত ভিড় থাকতো, যে লোকেদের প্রতীক্ষা করতে হতো। সেই রেস্তোরাঁর পক্ষে জায়গাও কম ছিল। অন্য জায়গায় বড়ো ঘর ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সে ইন্ডিয়া-হাউস থেকে দূরে যেতে চাইছিল না, কেননা ভারতীয় কর্মচারী, ব্যাপারী, ছাত্র এদিকে আশেপাশে খুব থাকতো। ব্যাপারী প্রচুর সংখ্যায় লন্ডনে থাকতো। আমি দেখলাম, শেয়ালকোটে বানানো খেলার সামগ্রী বেচাকেনা করা ব্যাপারী নিজের মজবুত, সুন্দর আর সস্তা খেলার জিনিসে নিজের আর দেশের বেশ কিছু মুনাফা তুলছিল। ছাত্রদের এতটা প্লাবন তো বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু তা কি উপায়ে বন্ধ হয়? যখন প্রত্যেকটা মন্ত্রী আর পদস্থ ভারতীয় কর্মচারী তাদের আত্মীয়-স্বজনদের এখানকারের ডিগ্রি দিয়ে বাজিমাৎ করতে চাইছে, আর বড় চাকরি দিতে এখনও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ইংরেজদের মত পরিচয় থাকা আবশ্যক বলে মনে করা হয়? ইংরেজ টাঁকশালে ছাঁচে ঢালা মাথা এখন.ইংরেজিকে তার স্থান থেকে পদচ্যুত করতে রাজি নয়। ইন্ডিয়া হাউস পড়লেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে পত্র-পত্রিকা অনেক ছিল। কিন্তু সরকারি পত্র 'আজকাল' আর 'ফৌজী অখবার' ছাড়া সবই ইংরেজি ছিল। ভারতীয় খবর দেবার জন্যও মেনন সাহেব আর তার অনুচরদের কোনো পরোয়া ছিল না। রয়টারের মেশিন থেকে যা স্বয়ং-মুদ্রিত খবর বের হতো, তা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি পড়ে নিতে পারেন। হপ্তায় একবার বুলেটিন বের হতো, তাতেও মন্ত্রিদের কীর্তি আর সরকারের কাজের কথাই ভরা থাকতো।

সেদিন মনে পড়লো ইংল্যান্ডে এসেছি, তাহলে এখানকার জিনিসও খাওয়া উচিত, তাই ফল দিয়ে শুরু করলাম। ফলের দোকান থেকে আপেল আর কালো আঙুর কিনে আনলাম। আঙুর ভালো না হলেও খারাপ ছিল না, কিন্তু আপেল এত টক ছিল যে তার শুধু চাটনি খাওয়াই সম্ভব, তাও চিনি দিয়ে। ইংল্যান্ডের লোকেরা যখন নিজের কারখানায় বানানো জিনিস আর সাম্রাজ্যের লুট থেকে মাখন, রুটি, মাংস এবং ভালো ভালো ফল বাইরে থেকে সস্তায় কিনে খেতে পারে, তাহলে ওদের কি দরকার, ভালো জাতের ফলের উৎপাদন করার?

—১৯৪৭—

২৬ জুলাই-এর এখন আর পাঁচদিনই বাকি ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে এতগুলো দিন আমি লন্ডনে এমনি এমনি যেতে দিই নি। তবে স্কটল্যান্ড অব্দি ঘোরার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা পূর্ণ হতে দেখলাম না। আমি তো বলেছি ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে একজনের থেকে দুজন থাকা আবশ্যক। কেননা দুজনের রুচির সমন্বয়ের জন্য যাত্রা বেশি ভালো হয়। যদি আমার সঙ্গে আরো কোনো ভবঘুরে থাকতো, তাহলে এতদিনে আমি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডই নয় আয়ার্ল্যাণ্ডেও ঘুরে আসতাম। উত্তর স্কটল্যান্ড আর ওয়েলশের সম্বন্ধে আমি পড়েছিলাম, তার কারণ সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। যাইহোক, ভাই অতহরের কৃপায় লন্ডনের বাইরে গিয়ে দু-তিন দিন কাটানোর সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। আমি ২৬ জুলাই নটার সময় আমার জায়গা ছাড়লাম। আর্লকোট স্টেশন আমাদের কাছেই ছিল, সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশন অব্দি পাঁতাল রেলে গেলাম। লন্ডনের পাতাল-রেল খুব পুরনো এবং খুব কর্মক্ষমও। যদি এই রেল না থাকতো তাহলে লন্ডনে যাতায়াত করা খুব মুশকিল হতো। পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেন ছাড়ে, আর রাস্তায় কোনো ভয় না থাকায় হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে। লন্ডনের পাতাল-রেল আর তার স্টেশন মস্কোর সমান হতে পারবে না, কেননা মস্কোতে সেখানকারের শাসকেরা কার্যোপযোগী ট্রেন বানায়নি। বরং প্রত্যেক স্টেশনকে তাজমহলের রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। নানান রঙের মার্বেল পাথর খুব শৈল্পিক রীতিতে লাগানো হয়েছে। আলোক-সজ্জাও খুব সুন্দর। পুঁজিবাদী লন্ডন কেন তার পাতাল-রেলের ওপর এত শ্রম আর মূলধন খরচ করতে যাবে? ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ওপর আমি পাতাল-রেল ছেড়ে আরো ওপরের ট্রেন ধরলাম। মাঝখানে ক্লেপহৈমে ট্রেন বদলে টেম্পডিক্টন পৌঁছলাম। ইংল্যান্ডের গ্রাম—টেম্পডিক্টন লন্ডনের বাইরে, কিন্তু তার বাড়ি আর রাস্তা, ইলেকট্রিকের আর জলের ব্যবস্থা দেখে তাকে গ্রাম বলা চলে না। বাসিন্দারাও চাষবাসের কাজ নয় বরং বেশিরভাগ লন্ডন বা তার আশেপাশের কারখানা ও কার্যালয়ে কাজ করে।

অতহর ভাই হয়তো খবর দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সময় বলেননি। আমার মিস্টার জন কোমারের বাড়ির ঠিকানা বার করতে অসুবিধে হয়নি। সেই অব্দি পৌঁছতে এক ঘণ্টা লেগে থাকবে। এখানে বেশির ভাগ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা থাকত। উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের বাড়ি সারিতে ছিল, যেখানে অনেক পেন্সন-প্রাপক ভারতীয় আই· এস· পরিবারও বাস করতো। জন কোমার আর তার স্ত্রী মার্গারেট কোমার স্বাগত জানাল। সেখানেই কম্বরলের (কার্লাইল) এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। সে কাম্বারল্যান্ডের সম্বন্ধে অনেক কথা বলল। এই দ্বীপের উত্তর অঞ্চলে এটা একটা খুব পিছিয়ে থাকা প্রদেশ। লোকেরা বেশির ভাগ মেষপালক। বেশির ভাগ চাষীদের নিজেদের খেত-খামার যা আছে সেগুলোর অবস্থা খুব ভালো। তাদের চাকর খেত-মজদুরদের অবস্থা খুব খারাপ। তারা নিজেদের মালিকের সঙ্গে বসবাস করে। তাদের কাছে না আছে নিজেদের জমি, না আছে নিজেদের বাড়ি। আমাদের এখানে খেত-মজদুররা অন্তত পক্ষে নিজের কুঁড়ে ঘরে তো থাকে। কৃষক নিজের মজদুরদের

জন্য হয় বাইরে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে দেয়, আর নয় তো নিজের সঙ্গেই থাকতে দেয়। কুঁড়ে ঘরে বাঁধা এরা দাসের মতো, তাই এই প্রথাকে সেখানে 'টাইট কটেজ' (বাঁধা কুঁড়েঘর) বলে। আসলে খেত-মজদুররা গৃহ সহায়ক। তারা কাজ ছাড়ার সাহস করে না। কারণ কাজ ছাড়ার মানে হলো, সপরিবারে বেকার হওয়াই নয়—গৃহহীন হয়ে পথচারী হওয়া। মজদুর সরকার আইন করেছে ওদের ৪ পাউণ্ড ১০ শিলিং (৬০ টাকা) প্রতি হপ্তা মজুরি দিতে হবে। কিন্তু গৃহহীন তথা জায়গায়-জায়গায় ছড়ানো-ছেটানো লোকেরা তাদের অধিকার পুরোদমে ব্যবহার কি উপায়ে করবে? উক্ত বন্ধু বলল যে কাম্বারল্যাণ্ডে 'টাইট কটেজ' প্রথা খুবই জোরদার। এই এলাকায় প্রায় সাত-হাজার খেত মজদুর আছে। এখন সেখানে মজদুর-হাট বসে, যেখানে মজদুর নিজের শ্রম বিক্রি করে, আর কৃষক তা কিনতে যায়। এটা দাস-হাটের অবশেষ মাত্র। পুরনো কালের মতই মালিক মজদুর কেনার সময় তার হাত-পা নেড়ে চেড়ে দেখে সে কাজ করার কতটা শক্তি রাখে। আগে ইংল্যাণ্ডের অনেক অনেক গ্রাম এই হাটে (হায়ারিং মার্কেট) এসে বসতো। এখন তার অবশেষ কাম্বারল্যাণ্ডের মতো পেছনে পড়ে থাকা এলাকাতেই রয়েছে। এর পরেও ইংরেজরা দুনিয়াকে সভ্যতা শেখানোর ক্ষমতা রাখে। বস্তুত, ইংরেজ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীদের লুট থেকে ইংল্যাণ্ডের-জনসাধারণের খুব একটা সুবিধে হয়নি। কিছু সুবিধে যদি না হতো, তাহলে সেখানে কবেই বলশেভিজম এসে যেতো। আর ইটালির সাম্রাজ্যবাদী মজদুর পার্টি রাজ্য চালাতে পারত না। কেম্বরলীর বর্ণনা শুনে আমার জীবে জল আসতো, কিন্তু এখন আর দিন কোথায়? যখন সময় ছিল, তখন হাতে পয়সা ছিল না। আর যখন হাতে পয়সা ছিল তখন সময় নেই। রিচার্ডল্যাম্প এক কৃষক ছিল। কৃষক বলতে ভারতীয় কৃষকের মতো বলা উচিত না। ইংল্যাণ্ডের কৃষক (ফার্মার) এমন ছোটোখাটো কৃষক নয়। ছোটখাটো কৃষক কয়েক প্রজন্ম আগে নিজের সব কিছু বেচে দিয়ে হয় কারখানার মজদুর কিংবা 'টাইট কটেজ' শ্রেণীর খেত মজদুর হয়ে গিয়েছিল। ল্যাপ ২৫ জুলাই-এর টাইমস-এ লিখেছিল—'খেত মজদুরদের মজদুরি বাড়ালে বিপদ হবে, যদি মজদুরি বৃদ্ধি অনুসারে খেতের আনাজের দাম না বাড়ানো যায়।' ইংল্যাণ্ডের খেতে বিজ্ঞানের ব্যবহারও বেশি করা হয় না। তাই সেখানে উৎপাদন করা জিনিসের দাম খুব বেশি। এর থেকেও বেশি দাম করলে বাইরে থেকে কেনা জিনিস খুব সস্তা হয়ে যাবে। দেশের জিনিস কে কিনবে, যদি বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাবিয়ে রাখতে, ভারি করের দেওয়াল না দাঁড় করানো যায়? আগের শতাব্দীতে দেওয়াল তোলা হয়েছিল, যার পরিণাম ভালো হয়নি, কেননা ইংল্যাণ্ড স্বয়ং নিজের জিনিস দুনিয়ার বাজারে অবাধে বিক্রি করার চেষ্টায় ছিল।

উক্ত বন্ধু বলছিল যে সেখানে ১২-১৪ বছরের ছাত্রও খেতে আলু বাছতে যায়। কৃষক খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে আর কিছু পয়সা দিয়ে দেয়। বেচারা ছেলেগুলো চায়,যে কিছু টাকা কামিয়ে সংসার খরচের সাহায্য করে। খেত মজদুরদের এখানে সংগঠন হয়েছে, তাদের জন্যে সংবাদপত্রও বের করা হয়েছে, কিন্তু তারা কারখানার মতো এক জায়গায় থাকে না যে কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে আপনি তাদের বক্তৃতা দিয়ে

সংগঠিত করতে পারবেন। ওপর থেকে কৃষক নিজের কুঁড়েঘরে বসবাসকারী মজদুরদের ওপর কড়া নজর রাখত, যাতে তাদের ওপর বাইরের প্রভাব না পড়ে। কম্যুনিস্ট সমস্ত দুনিয়ার মত ইংল্যাণ্ডেও সবচেয়ে বেশি মেহনতী আর স্বার্থত্যাগী। তাঁরা এই চাষী মজদুরদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যায় এরা এত কম, যে এরা এদের সংগঠন আর ভোটের দ্বারা এই গভর্নমেণ্টের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে না। মজদুরদের ওপর এখন মজদুর-পার্টির প্রভাব আছে। চাষী-মজদুরদের মাথার ওপর সব সময় খিদে আর বিপত্তির তলোয়ার ঝুলছে। অসুখ করলে মালিক বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করে। কৃষকদের সংগঠন—ন্যাশনাল ফার্মাস ইউনিয়ন (জাতীয় কৃষকসংঘ) খুব মজবুত। কৃষি খেত-মজদুর জাতীয় সংঘ অতটা মজবুত নয়, তাও সে এই ব্যাপারে জোর দিচ্ছে যে সরকার নিজের তরফ থেকে চাষী-মজুরদের জন্য জায়গায় জায়গায় বাড়ি বানিয়ে দিক, কম ভাড়ায় সেগুলো ওদের দেওয়া হোক। কিন্তু ফার্মার এর কড়া বিরোধিতা করছে। যদি তাদের বাড়ি থেকে ওরা বেরিয়ে আসে, তাহলে নিজের মজুরির জন্য ওই ভাবেই লড়বে, যেভাবে লড়ে কারখানার মজদুর। এই কৃষকেরা ট্যোরিদের সবচেয়ে বড় সমর্থক। ১৯৫১-এর ব্রিটিশ নির্বাচনে চার্চিলকে জেতানোর মধ্যে সব থেকে বড় হাত এই দেহাতী কৃষকদের ছিল।

মিস্টার কোমার জানালেন যে পশ্চিম এলাকায়, এখানে, ছোট ছোট কৃষক আর পুবে বড় বড়। নার্ফোকে কোমারের নিজের ১৫০০ একরের খেত আছে, যার মধ্যে তার এক হাজার এক জায়গায় আর কুড়ি একর অন্য জায়গায়। ২০ একর বেকার আর ২৫ একর ঘাসের জমি ছেড়ে জমিতে অনেকটা গম, জব, বাকল, কপি, গাজর এবং গাজর জাতীয় সবজি উৎপাদন করা হয়। সে নিজের খেতকে হোয়াট নামের এক কৃষককে দিয়ে রেখেছে। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে হাজার পাউণ্ডে এই খেতের জমি সে কিনেছে, ৫০০পাউণ্ড আরো তাতে লাগিয়েছে, ফের ৯৫ পাউণ্ড খাজনার পেছনে দিয়েছে যার মধ্যে ২৫ পাউণ্ড সরকারের আয়কর, ৩০ পাউণ্ড টাই (টিথে,ধর্মকর) সরকারের কাছে দিতে হয়। যে কৃষক ঠিকা চুক্তিতে খেত নিয়েছে, তার স্ত্রী-পুরুষ আর বেটা-বৌ—চার প্রাণীর পরিবার খেতে কাজ করে। আইন অনুযায়ী খেতের মালিক তখনই নিজের ভাড়াটেকে সরাতে পারে যখন সে নিজেই চাষবাস করতে ইচ্ছুক হয়। যদি কোমার স্বয়ং চাষবাস করতে চায় তাও তাকে একবছর আগে নোটিশ দিতে হবে আর দুবছরের খাজনা অর্থাৎ ১৯০ পাউণ্ড যারা চাষ করে তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ফেরত দিতে হবে। সেই সময় যে নিয়ম পার্লামেন্টে পেশ হবার কথা ছিল, তা পাশ হয়ে যাবার পর জোতদারদের হাটানো আরো মুশকিল হয়ে যাবে। কোমার বলছিল যে আমার ঠিকাদারের কাছে ১২টি গরু, ছোট বড় ২টি ট্রাক্টর, একটা দুধ দোহন করা মেশিন, একটা মোটর গাড়ি, একটা লরি, দুটো ঘোড়া, দুটো শুয়োর, বারোটা মাদি শুয়োর আর অনেক মুর্গি আছে। তার নিজের গরুর দুধ-বেচার জন্য চিন্তা করতে হয় না, দুগ্ধশালার লরি বাড়িতে এসে দুধ নিয়ে যায়।

সেই খেত মজুরের প্রগতির ইতিহাস বলতে গিয়ে কোমার বলল যে সর্বপ্রথম সে ১৯২০ সালে এক আটা মিলের মজুর ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৪৫ অব্দি সে একটা ছোট

দোকানের মালিক, সঙ্গে পোস্টমাস্টারও ছিল, যার হপ্তায় তিন পাউণ্ড বেতন ছিল। আগে সে এক একর জমি নিয়ে সবজির চাষ শুরু করে, সবজি খুব চড়া দামে বিক্রি হচ্ছিল, তার লাভ দেখে সে ৫০ একর জমিতে চাষবাস শুরু করে। ১৯৪৫-এ কোমরের ১৫০ একরের চাষ ঠিকাতে নেয় এবং সেই বছরেই সে পোস্টমাস্টারি ছেড়ে দেয়। কোমারের হাজার পাউণ্ড (১৩ হাজার টাকা) কেনার পিছনে খরচা করা ছাড়া ১০০ পাউণ্ড দিয়ে জলের রাস্তা ঠিক করতে হলো, যার অর্ধেক সরকার ফেরত দিয়ে দেয়। একটা ঘর পাকা করেছে আর রান্নাঘর তৈরি করতে আরো ৫০০ পাউণ্ড লেগেছে। সবচেয়ে ভালো জমি খুড়তুতো ভাইকে ২০ পাউণ্ড প্রতি একরে বেচে দিয়েছে, বাকি জমি ১২ পাউণ্ড প্রতি একর পড়েছিল। জমিতে খামার, থাকার জায়গা, অশ্বশালা, পশুশালা ছাড়া নীচে তিনটে আর ওপরে তিনটে ঘর ও রান্নাঘর আছে। জমি খুব একটা উর্বর নয়। যদি ১৯৩০ সন হতো তাহলে ৯৫-এর জায়গায় ২৫ পাউণ্ডের খাজনা পাওয়া যেতো। দেড় হাজার পাউণ্ডের ওপর পঞ্চাশ পাউণ্ডের লাভ। কোমার দম্পতি নিজের চাষজমিকে এই ভাবে অন্যোর হাতে দিয়ে নিজেরা এখন এখানে চাকরি করছিল। এ হয়তো বেশি শিক্ষার পরিণাম। আমাদের এখানেও এই ব্যাধি ছড়াচ্ছে। কিন্তু দুজনেই স্বামী-স্ত্রী কম্যুনিজমের সমর্থক, তাই এটা বলা যাবে না, যে তারা জীবন থেকে পালাতে চায়।

ফলের এলাকা ইংল্যান্ডে দক্ষিণদিকে, হিমালয়েও সাত হাজার ফুটের ওপরের জায়গায় শীতের আধিক্যের কারণে আপেল আর অন্যান্য ফল টক হয় এবং তাকে ফলের জমিতে পরিণত করা যায় না। উত্তর ইংল্যান্ডের এই অবস্থা। দক্ষিণ ইংল্যান্ড কর্ণওয়ালে এবার প্রথম বার বরফ পড়লো। ওরা বলছিল, নর্থ রোড থেকে পুবদিকে উর্বর জমি আছে। জানিনা দক্ষিণ ইংল্যান্ডের আপেলও সেরকমই হয় নাকি যেমনটি আমি সেদিন কিনেছিলাম।

ইংল্যান্ড আর ওয়েলশের দুগ্ধ-ব্যবসা একটা বড় ডেয়ারি সংস্থার হাতে, যার হেড কোয়ার্টর টেমস্ ডিক্টনে। শুধু তার অফিসে ৮৫০ জন কর্মচারী আছে। কোমার সেখানকারই অফিসার। হিসেব করা বা লেখা সব মেশিন দ্বারাই হয়, তা না হলে কর্মচারীর সংখ্যা আরো বেশি হবে। কার্যালয়ের অট্টালিকা দেখতে গেলাম। সেটা বিশাল ছিল। দুধের রোজগার বেশির ভাগ ওয়েলশদের হাতেই। উপ-ডাইরেক্টরও এই সংস্থার একজন ওয়েলশ ছিল। কার্যালয়ের বাড়ি খুব পরিচ্ছন্ন আর আর খোলামেলা ছিল। কোমার আমাকে সন্ধেবেলায় রয়্যাল অর্সনল কো-অপারেটিভ ডেয়ারির কারখানা দেখাতে নিয়ে গেল। এখানে কয়েকশো মাইল দূর থেকে লরিতে করে হাজার হাজার মণ দুধ প্রতিদিন আসে। দুধ একশো ষাট ডিগ্রি তাপমাত্রায় গরম করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ফের মেশিনে ঠাণ্ডা করে হাত না লাগিয়ে বোতলে ভরা হয়। ভরা বোতল ছোট-ছোট খোলা খাঁচায় রেখে লরিতে পৌঁছে যায়। যেখান থেকে সেগুলো গ্রাহকদের দরজার দিকে এগোয়। সকালের সময় প্রত্যেক গ্রাহকের দরজায় দুধে ভরা বোতল মজুত থাকে। দুধে ভেজাল দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারখানার কর্মচারীরা প্রত্যেকটা জিনিস

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। আমি রাত বারোটায় বাড়ি ফিরলাম।

কোমার পরিবারকে দেখে আমি সাধারণ ইংরেজ পরিবারদের অনুমান করতে পারতাম না। অন্ততপক্ষে স্বভাবেও অনেক তফাত ছিল। কোমার দম্পতি কম্যুনিজমের ভক্ত হবার কারণে বেনেপনা করা ভুলে গিয়েছিল। ওদের এখানে আমিই নই, আরও একজন উত্তর ইংল্যান্ডে কর্মরত পুরুষ অতিথি ছিল, সঙ্গে একজন মহিলাও পরিবারে থাকতো। আমাদের দুজন অতিথিকে টাকা দেবার সুযোগ দিতে তারা রাজি ছিল না। এমনিতে আমি প্রাচীন ভারতীয় প্রথা পছন্দ করি যে অতিথি হয়ে গেলে মানুষের খালি হাতে যাওয়া উচিত নয়, আজকের ভারতে সেই প্রথার আরো আবশ্যকতা আছে। সাধ্যমত এমন করা উচিত, যাতে অতিথির বোঝাকে স্বামীর খুব হালকা লাগে। সবুজ ছোলা সেদ্ধ বা ভেজে খাওয়া সেখানেও ভালো বলে মনে করা হয়। শ্রীমতী কোমার খোসাগুলো ফেলে দিচ্ছিল। আমি তোকে বললাম যে এই খোসাগুলোরও উপকারিতা আছে। শুধু তার ভেতরের মোটা চামড়া বার করে দেওয়া উচিত। আমি সেগুলো টিপে বের করেও দেখিয়ে দিলাম। আমার আবিষ্কার দেখে তার খুব আশ্চর্য লাগলো। আমি বললাম, 'এটা আমার আবিষ্কার নয়, তিব্বতে আমি নরম খোসাকে এই ভাবেই ছাড়িয়ে কাঁচা খেতে দেখেছি। আর এ দিয়ে তরকারি বানিয়ে আমি নিজে এর স্বাদের পরীক্ষা করেছি।' চড়া দামের সবজিতে খোসার ব্যবহার লাভদায়ক। এই গৃহিণী জানতে পেরেছিল যে তার দেখাদেখি পরে অন্যান্য গৃহিণীরাও খোসা ফেলে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

টেমস্‌ডিস্টন একটি নদীর ধারে, যার অপরদিকে হ্যাম্পটন কোর্টের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাসাদ আছে। ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে কার্ডিনাল (রোমান ক্যাথলিক পাদরী) বোঞ্জেলী এই প্রাসাদ বানিয়েছিল। সামনে এক ছোট মতো সরোবর, বাটিকা, সবুজে ভরা উপবন আর ময়দান আছে। ২৭ তারিখ রোববার দিন ছিল, তাই হাজার-হাজার লোক সেই সময় হ্যাম্পটন কোর্টে চিত্তবিনোদনে এসেছিল। এটা বানাতে ফ্রান্সের নাম করা প্রাসাদ ভার্সাই-এর নকল করার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকাল এই প্রাসাদ বিনোদ-বাটিকার রূপ নিয়েছে, কিন্তু আগে এখানে পেটুক লর্ড পরিবার বসবাস করতো। দুপুরবেলা আমি গিয়ে হ্যাম্পটন কোর্ট দেখলাম।

বিকেলবেলা ৩০ মাইল দূরের এক চাষ (ফার্ম) দেখাতে মিঃ কোমার আমাকে লরিতে করে নিয়ে গেল। এই ফার্ম জঙ্গলের মধ্যে। ইংল্যান্ডের শস্য-শ্যামলা ভূমির সৌন্দর্য এখানে দেখা যাচ্ছিল। প্রকৃতি ইংল্যান্ডকে দরিদ্র বানায়নি, যদি সে দুনিয়ার শোষণ না করতো তাহলে সমৃদ্ধ জীবন কাটাতে পারতো। হ্যাঁ, জমি তো উঁচু-নিচু। এই ফার্ম কোনো লর্ডের, কিন্তু তার লন্ডনে অনেক বাড়ি-জমিজমা আছে, হয়তো অনেক কোম্পানির ভাগীদারও ছিল, তাই তার ফার্মের চিন্তা হবে কেন? কোনো খেতমজুর পরিবারকে এখানে বসবাস করতে দিয়েছিল যে কোমারের ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টারের মতো নিজের জমি মনে করে কাজ করতো না—হয়তো তার অতো শক্তিশালী হাতও ছিল না। চাষের জমি হয়তো দেড়-দুশো একরের হবে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি

খেতে বোনা আলু ছেড়ে সমস্ত জমি বেকার পড়েছিল। মেশিনগুলো উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল, যব, গম, আর কপির খেতগুলো দেখে এটা বলা মুশকিল ছিল, যে সে ঘাসের জমি, না ফসলের। যেখানে শস্যের এত কষ্ট, রেশনিং এত কড়া রাখতে হয়, সেখানে একশো-দুশো একর জমি এইভাবে নষ্ট! সোভিয়েত রাশিয়ায় তো একে বড় অপরাধ বলে মানা হয়। ফার্মের আশেপাশে দূর অব্দি জঙ্গল ছিল, যেখানে শেয়ালের মতো জানোয়ার ছিল। ইংল্যান্ডের লর্ডদের শেয়াল শিকার বড় পছন্দের, আর জায়গায়-জায়গায় হাজার-হাজার একর জঙ্গল শুধু এই শিকারের শখ মেটাতে ফেলে রাখা আছে। ইংল্যান্ড বস্তুত খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারে যদি এই শিকারের শৌখিনতা চুকিয়ে দিয়ে অনেক জঙ্গলকে খেতে পরিণত করে, আর বিজ্ঞানের আধুনিকতম উপকরণকে ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহার করে। আমিও জঙ্গলে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রোববার দিন ঘুরে বেড়ানো নর-নারী হাজার-হাজার সংখ্যায় এসেছিল। যাতায়াতের সব জায়গায় সুবিধে থাকার কারণে মানুষ লন্ডনের গলি আর উদাসীন আবহাওয়া ছেড়ে মন ভোলাতে এরকম জায়গায় এসে পড়ে।

এর্ফিংগহ্যামে আমি ফেরার সময় ট্রেন ধরলাম। লন্ডনের আশেপাশে অনেকটা দূর অব্দি রেলের বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে, কিন্তু বম্বে আর অন্যান্য দেশের মতো বিদ্যুৎ তার মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে থামে বাঁধা হয়নি, বরং দুটো রেলের মধ্যে একটা আরও রেল লাগানো হয়েছে, যাতে বিদ্যুৎ ভরা থাকে। যদি কোনো প্রাণীর পালক বা ডানা একটু তাতে ছুঁয়ে যায়, তাহলে এক সেকেণ্ডে মৃত্যু নিজের কাজ করতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে তো পশু আর জঙ্গলের জানোয়ার অনেক মরে যায়?' কোমার বলল, 'আগে আগে অনেক মরেছে, কিন্তু এখন তারাও জানে যে এখানে মৃত্যু অপেক্ষা করছে।' পালিত পশুদের রুখতে তো পাশে তারও লাগানো ছিল।

দুটো দিন পুরো কেটে গেল, ইংল্যান্ডের গ্রামীণ জীবনের একটুখানি পরিচয় নিয়ে ২৮ জুলাই আমি কোমার দম্পতিকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ দিয়ে সাড়ে দশটার সময় লন্ডন ফিরে এলাম।

জানতে পারলাম যে উত্তর ইংল্যান্ডে ঘোরার জন্য মাসিক টিকিট পাওয়া যায়, যাতে আমি যেখানে খুশি নেমে দেখে বেড়াতে পারি। কিন্তু এখন সময় কোথায়? ইচ্ছে তো খুব করছিল কিন্তু আমি অপারগ। সেইদিন বেশির ভাগ খবরের কাগজ এবং সঙ্গে আনা জিনিস পড়তে থাকলাম। রেডিওটা কোম্পানি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। দেখলাম তাতে সুদূর দেশের খবর আসছে না। ভারত সম্বন্ধে এটুকু জানতে পারলাম যে মজদুর সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত ছাড়ার সময় যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তা এখন সফল হতে চলেছে। ভারতকে ভারত আর পাকিস্তানে ভাগ করেই ইংরেজরা সন্তুষ্ট হয়নি, উপরন্তু তারা পুরনো সন্ধিপত্রের অজুহাত দেখিয়ে আমাদের দেশের ছত্রধারীদের একদম স্বাধীন করে দিয়েছিল। ট্রাভানকোর, হায়দ্রাবাদ, ভূপাল ইত্যাদি অনেকে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষিত করার সংকল্প করেছিল আর নবস্থাপিত জাতীয় সরকার নাজেহাল হয়েছিল। কিন্তু এরা জানতো না যে, ভারতীয় জনতা এখন সামন্ততান্ত্রিক যুগের থেকে দূরে সরে

গেছে। এখন তারা ইংরেজদের সংরক্ষিত পুতুলদের বেশিদিন পর্যন্ত অত্যাচার করতে[১] দেবে না।

লন্ডনে রেশনের কড়াকড়ি ছিল। কোনো ভোজনালয়ে গেলে তিনটে জিনিসই খেতে পাওয়া যেতো। কিন্তু যদি কাছে পয়সা থাকে তাহলে কাউকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না। আপনি এক রেস্তোরাঁ থেকে উঠে গিয়ে অন্য আরেক রেস্তোরাঁয় খেতে পারতেন, কারণ রাশিয়ার মতো রেশনকার্ডের কড়া নিয়ম ছিল না। হ্যাঁ, গরিবদের আর কম মাইনে পাওয়া লোকেদের অবশ্যই বিপদ ছিল। মজদুর-সরকারের কি ভালো সমাজবাদ চলছিল। সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা দেখলেই বোঝা যেত যে মজদুর-পার্টি থেকে গরিবদের কল্যাণ হতে পারে না। তারা লম্বা লম্বা কথা দিয়ে লোকেদের ভোলাতে চায়। আর নিরাশ জনতাকে আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলার ব্যবস্থা করে। তারা এই ব্যাপারে ভাগ্যবাদী যে শাসক পার্টিগুলো পালা করে করে শাসনের লাগাম নিজের হাতে রাখছে। পাঁচ বছর মজদুর-পার্টি রাজত্ব করে তারপর পাঁচ বছর টোরি। এটা নিশ্চিত যে যখন অব্দি ইংল্যান্ডের আর্থিক কাঠামোকে আমুল পরিবর্তন করে শোষণ নির্মূল না করা যায়, তখন পর্যন্ত জনতা কখনো মজদুর-পার্টিকে নিজেদের স্থায়ী শাসক করতে পারবে না। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ফাঁস হয়ে গেলেই নতুন নির্বাচনে সে বিরোধী পার্টিকে তাদের ভোট দেবে। এই লুকোচুরি সেখানের রাজনীতিকদের বিনোদনের জিনিস হতে পারে, কিন্তু সাধারণ জনতা তো সর্বদা পিষ্ট হতে থাকবে। আমাদের দেশের সমাজবাদী বন্ধুও এই আদর্শকেই ভারতে কায়েম করার চেষ্টা করছে আর চায় যে এ্যাটলি এবং চার্চিলের মত এখানেও জয়প্রকাশ আর নেহেরুর মধ্যে অদল-বদল হতে থাক। কিন্তু ভারত ইংল্যান্ডের থেকে অনেক আলাদা। শিল্প প্রধান হবার দরুন ইংল্যান্ড দরিদ্র দেশ নয়। ভারতের দারিদ্র আর অনাহারে মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের এখানে এই ধরনের লুকোচুরি খেলায় লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর বলিদান হবে।

২৯ তারিখে আমি স্নান করার সাবানের খোঁজে বেরোলাম। অনেকগুলো দোকানদার বলল যে এর জন্য রেশন-বুক-এর দরকার। আমার কাছে তা ছিল না। কাপড় কাচার সাবানে এ ধরনের অসুবিধে ছিল। আমি ভেবেছিলাম, যে কিছু কাপড় কেচে নিলে ভালো হয়। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। বই-এরও এই রকমই আকাল ছিল। খবরের কাগজের কোনো অভাব ছিল না।

আর একদিনই বাকি ছিল লন্ডন নিবাসের। আমার এক বন্ধুর জন্য প্লাটের হিন্দি-ইংরেজি ডিক্সনারির দরকার ছিল। ৩ পাউণ্ড ৩ শিলিং-এ তা পেলাম আর আমি ৫ পাউণ্ডের বীমার সঙ্গে সেটা লেনিনগ্রাদ পাঠিয়ে দিলাম। ভারতে পরে দেখলাম যে এখান থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় বই পাঠানো যত মুশকিল অতটা লন্ডনে ছিল না। এখানে তো তার জন্য বিশেষ অনুমোতি দেবার দরকার পড়ে, এই কারণেই আমি নিজের বই রাশিয়ায় পাঠাতে পারিনি। লন্ডনে একটু অন্য রকমের অনেকগুলো সস্তা রেস্তোরাঁ

[১] *এক্ষেত্রে মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত লোককথাটি—ছাতী পর কোঁদো দলনা।—স·ম·*

আছে। এ· বি· সি-র ভোজনালয়ের শত শত শাখা নগরের ভিন্ন-ভিন্ন ভাগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ভোজনশালায় টেবিল-চেয়ার পড়ে থাকে, হাত লাগাবার জন্য চাকর-খাকরের দরকার হয় না, যারা খায় তারা নিজেরাই প্লেট তুলে পরিবেশকের কাছে গিয়ে খাবার জিনিস নিয়ে নিজের টেবিলে বসে পড়ে। অন্যান্য ভোজনশালা থেকে এগুলোর রান্না খারাপ হয় না, আর অল্প পয়সার মানুষও ভালো করে খেতে পারে। ভোজনশালার কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটা জিনিস থোক দামে কেনে, তাই তারা এক-দেড় টাকায় মানুষকে খাওয়াতে পারে।

৩১ জুলাই সর্বশেষে দিন। নিজের তিনটে বাক্স আগে ওয়াটারলু স্টেশনে সাউথ এ্যাম্পটনের জন্য দিয়ে এলাম। নিজের জিনিস রেলওয়ে কোম্পানি বা অন্য কোনো যাত্রা এজেন্সিকে দিয়ে এলে, আর কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। সে আপনার গন্তব্যস্থলে পৌছে যাবে। ডিপার্টমেন্ট স্টোর-এর মতন রেলওয়ে এজেন্সিগুলোও জিনিসপত্র বাড়ি পৌছে দেয়।

প্রথম শ্রেণীর টিকিট নিয়ে জিনিসপত্র সাউথ এ্যাম্পটনের জন্য বুক করাতে ভাড়া ৬ শিলিং-এর কাছাকাছি। ট্যাক্সিওলাকে সোওয়া চার শিলিং দেবার কথা, ৫ শিলিং দেবার পরও সে পুরস্কার চাইল। বুঝতে পারলাম এখন পুরস্কার আর বকশিশের সার্বজনিক ব্যবহার ইংল্যান্ডেও চালু হয়েছে। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমি রেস্তোরায় গেলাম, যেখানে ৩ টাকায় আধপেট খাবার পেলাম। ২৮ আনা সের নাসপাতি, ১২-১২ আনা করে এক একটা পিচ ফল কিনতে গিয়ে জানতে পারলাম যে ফলও এখানে কত চড়া দামের।

আজ পার্লামেন্ট ভবনকে দেখলাম আর পাশেই ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবেকেও। যুদ্ধের সময় পার্লামেন্ট ভবনের কিছু ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু এখন তার মেরামত করা হয়ে গিয়েছিল। ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবে ইংল্যান্ডের সম্মানীয় মৃত ব্যক্তিদের কবরস্থানেরও কাজ দেয়। আগে এটা একটা মঠ ছিল, আর আজও ইংল্যান্ডের রাজার অভিষেক এখানেই হয়। বীর-পূজা সব দেশ আর সবকালেই দেখা যায়। ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবেতে শরীর বা শরীবাবশেষকে পোঁতা অথবা নামযুক্ত কাঠের কালি লাগানো খুব সম্মানের কথা।

ভারতের উদ্দেশে প্রস্থান

লন্ডনের কাছে সামুদ্রিক বন্দর সাউথ এ্যাম্পটনে পয়লা আগস্ট-এ 'স্ট্রেমথোর' জাহাজ ধরার কথা। চা খেয়ে তৈরি হলাম, কিন্তু ট্যাক্সি পেতে দেরি হলো। ৬ শিলিং (৪ টাকা) দিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে যাবার ট্যাক্সি পেলাম, যেখানে আমি সোয়া এগারোটায়

পৌঁছলাম। কিন্তু জাহাজ সাউথ এ্যাম্পটনের উদ্দেশে সোয়া একটার সময় রওনা হলো। ২ ঘণ্টার রাস্তা ছিল। বলা বাহুল্য, এই ট্রেনে সবাই সমুদ্রপথের যাত্রী ছিল, যাদের মধ্যে অনেক ভারতীয়ও ছিল। ট্রেন খুব বড়ো ছিল। ৫ শিলিং দিয়ে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন পেলাম। দু-ঘণ্টা যাত্রীর পর ট্রেন জাহাজের পাশে গিয়ে ভিড়লো। টিকিট, পাসপোর্ট সব দেখলো। স্টিমারে গেলাম। বি· ক্লাশে খুব ভিড় ছিল, বরং 'শ্বেতদ্বীপ'-এর সঙ্গে তুলনা করলে দুটোতে স্বর্গ আর নরকের পার্থক্য ছিল। সেখানে শ্বেতদ্বীপের পরিচ্ছন্নতা, উৎকৃষ্ট সাজানো, সুখ-সুবিধের দিকে সব রকম নজর আর কোথায় এই জানোয়ারের খাঁচা! এ· ক্লাশে কেবিন (ঘর) ছিল। কিন্তু বি· ক্লাশ তো নীচে ওপরে মাচা বাঁধা নীলের গুদাম ছিল। আমার ৩৯ বছর আগের কথা মনে পড়লো। আপার প্রাইমারি স্কুল পাশ করে আমি মিডিল স্কুলে পড়তে নিজামাবাদ, আজমগড় গিয়েছিলাম। নিজামাবাদে প্লেগ হওয়ায় স্কুল উঠে গিয়ে টৌস নদীর আরেক পারে এক পরিত্যক্ত নীলের গুদামে হচ্ছিল। নীলের ব্যবসা তখন জার্মানির কৃত্রিম রং (এনি লাইট) এসে পড়ায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো লোকজন আশা নিয়ে বসেছিল, তাই গুদাম ধ্বংস হয়ে যায়নি, নীলের বাড়িগুলো শুকোনোর জন্য নীচে ওপরে নানা রকমের মাচা বাঁধা ছিল। এটাই ছাত্রদের বোর্ডিং ছিল। কিন্তু সেটা এতটা দামী ছিল না। এই মাচাই এখন ১৭ দিনের জন্য আমাদের বাড়ি ছিল। ভিড়ও খুব ছিল। যদি কেবিনের ব্যবস্থা না করতে পারে, তাহলে ভাড়া কম করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধ প্রত্যেকটা জিনিসের দর বাড়িয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় অনেক-অনেক সৈনিকদের ভরে নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হতো, তাই কেবিন ভেঙে মাচা করা হয়েছিল। বলছিল, মাচা ভেঙে ফের কেবিন তৈরি করা হবে, কিন্তু তখনো ভাড়া ৭০-৭২ পাউণ্ড হয়ে যাবে। যুদ্ধ শুধু যাত্রীদের ভাড়াই বাড়ায়নি—মজদুরদের মজদুরিও বাড়িয়ে দিয়েছিল। সবচেয়ে কম মাইনে ছিল কয়লাকর্মীদের। যুদ্ধের আগে ২৩ টাকা মাসিক, এখন তা ৯০ টাকা হয়ে গিয়েছিল, ৫০ টাকা পেতো যে সারঙ্গ সে এখন ২০০ পাচ্ছিল। অন্য জাহাজের মতো 'স্ট্রথমোর'-এও হিন্দুস্থানী মাঝি মাল্লাদের রাখা হতো। ইংরেজ মজদুর এই বেতনে পাওয়া যেতো না, তাই ইংরেজ শেঠ হিন্দুস্থানীদের ভারতী করে চারগুণ লাভ কামানোর তালে থাকতো।

১৯৪০ থেকে ১৯৪২ অব্দি আড়াই বছরের জেল-জীবনে আমি সিগারেট খাওয়া শিখে গিয়েছিলাম। বাইরে বেরিয়েও তা ছাড়িনি। ইরানের সাত মাসে তা ছিল মন ভালো লাগানোর উপায়। কিন্তু আমি সিগারেটে কখনো রস পায়নি। আমার সিগারেট খাওয়া বন্ধুরা বলত যে ৫০ টাকার সিগারেট খাবার পর কোনো কোনো সময় রস পাওয়া যায়। আমার সেই অব্দি পৌঁছনোর সামর্থ ছিল না। আমার তো এমনই মনে হতো, যেন অভ্যেস হয়ে যাওয়ায় কোনো কাঠের টুকরো মুখে দিয়ে আছি। তাই যেদিন তেহরান থেকে সোভিয়েত যাবার বিমানে পা রাখলাম, সেই দিন (৩ জুন ১৯৪৫) সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলাম। সমস্ত সোভিয়েত আর লন্ডনে প্রবাসকালে সিগারেট খায়নি। এমনিতে খুব উৎকৃষ্ট সিগারেট কোনটা আর খুব খারাপ কোনটা, নরম কোনটা, আর কড়া

কোনটা, সে-পরীক্ষা জেনে গিয়েছিলাম। করের কোনো ঝগড়া না হবার দরুন 'স্ট্রথমোরা'-এ খুব ভালো সিগারেটটা সস্তা দরে পাওয়া যাচ্ছিল। ১৭ দিনের জাহাজী সফরে এখন আমার কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সুযোগ পাবার কথা ছিল না। আর মাচায় একে-অপরজনের সঙ্গে শুয়ে মানুষ কি লেখাপড়া করতে পারে? বাইরে ডেকে কাপড়ের চেয়ার পড়ে ছিল,যার সংখ্যা এমন ছিল না, যে প্রত্যেক যাত্রী বসতে পারে। বসলেই গল্পগুজব শুরু হয়ে যেতো। এক তো অনেক বছর পর ভারতীয়দের দেখা সাক্ষাৎ, তাই আমারও অনেক ব্যাপার জানার উৎসুকতা ছিল, দ্বিতীয়ত রাশিয়ায় ২৫ মাস থেকে আমি ফিরছিলাম, তাই জন্যে ভারতীয় বন্ধুও সেই রহস্যময় দেশের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাইছিল। এটা বলতে পারি যে, ১৭ দিনে প্রায় প্রতিদিন ৬-৭ ঘণ্টা কথা বলার মত টোটা আমার কাছে ছিল না। এমনিতে শ্রোতা পালটাচ্ছিল, আর তাদের জিজ্ঞাসাও পাল্টাচ্ছিল। কথা বলায় সিগারেটের টান যদি মাঝে-মধ্যে নেওয়া যায় তো বেশ একটু রস পাওয়া যায়। এটাও একটা কারণ ভেবে নিতে পারেন অথবা সস্তায় উৎকৃষ্ট সিগারেট সুলভে পাওয়া যায় বলে, ভেবে নিন, যেদিন আমি 'স্ট্রেথমোর'-এ পা রাখলাম, সেদিন থেকেই সিগারেট ফের ধরলাম, যার সমাপ্তি ঘটলো গান্ধীজীর অস্থি প্রয়াগে স্রোতে বয়ে যাওয়ার দিন।

এ· এবং বি· ক্লাশের জায়গা আলাদা আলাদা ছিল। এ· ক্লাশের কেবিন ভালো, কিন্তু খাবার দুটো ক্লাশেরই এরকম। স্নানাগার আর পায়খানাও এ·-র বেশি ভালো। বি· ক্লাশে সবাই ভারতীয় ছিল যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ছাত্র, যারা ব্যারিস্টার, ডাক্তার বা অন্য কোনো ডিগ্রি নিয়ে লন্ডন থেকে ভারতে ফিরছিল। গোওয়ালিয়র থেকে শংকররাও পিসাল দর্জির ডিপ্লোমা নিতে এসেছিল, আর দু-মাস থেকে তার কাছে সফল হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তার ক্রেতাদের ওপর লন্ডন থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত দর্জির রোয়াব অবশ্যই পড়বে। কিন্তু সূচিশিল্পের ওপর তার বই আগে থেকেই চলছিল। কতদিন ধরেই সে সেলাই-এর শিল্পকর্ম নিয়ে নিজের পত্রিকাও বার করছিল। এটাই কি যথেষ্ট ছিল না? যাহোক, লন্ডনে তার বেশি কিছু শেখার ছিল না। ডিপ্লোমা দেবার লোকও তার যোগ্যতার বিষয়ে জানতো, তাই দু মাসের বেশি থাকার দরকার হয়নি। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এক ভারতীয় মেজর ছিল, যে বলিয়ার হায়লটশাহীতে সৈনিক অফিসার হয়ে গিয়েছিল। সে বালিয়ার লোকদের ওপর সৈনিকদের মত অত্যাচার করতে পুরোপুরি অস্বীকার করত। বলত, 'এ সব কাজ পুলিশের ছিল, এগুলো সৈনিকদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'স্ট্রেথমোর'-এর খাবার খারাপ ছিল না, আর কখনো-সখনো ভারতীয় খাবারও পাওয়া যেতো।

'স্ট্রেথমোর' কাল সন্ধেয় কোনো এক সময় চলেছিল। ২ আগস্টে সাড়ে তেইশ হাজার টনের এই ভারি জাহাজ এখন সমুদ্রতট থেকে এত দূর দিয়ে যাচ্ছিল, যে তীর আমাদের নজরে পড়ছিল না। জাহাজের গতি খুব দ্রুত ছিল। ২৪ ঘণ্টা মাচায় থাকার পর তো আমি বলতে লাগলাম। যে এটা তৃতীয় শ্রেণীর থেকেও বাজে। এখানকার সবচেয়ে অসহ্যের জিনিস ছিল নোঙরা পায়খানা। পরে কিছু পরিচয় হয়ে যাবার পর

স্নানের ব্যবস্থা আমি এ· ক্লাশে করে নিয়েছিলাম। সেই সময় ভারতীয়দের মধ্যে ১৫ আগস্টের (১৯৪৭) আলোচনা হচ্ছিল। আমাদের জন্য কেন, এটা আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল, কেননা সেদিন তলোয়ারের জোরে দখল করা ইংরেজ সেনাদের ছেড়ে চলে যাবার কথা। আমাদের দেশ নিজের ভাগ্য বিধাতা হতে চলেছিল। আমি সর্বদা এটা এইভাবেই নিয়েছি, যদিও তার মানে এই নয় যে নিজের স্বাধীনতাকে আমি সীমিত মনে করি না। কিন্তু ইংরেজদের দ্বারা সীমিত হচ্ছিল না, হচ্ছিল তাদের চেলা-চামুণ্ডাদের দ্বারা যারা ভারতে জন্মে আমেরিকার মুক্ত হাবশি গোলামের মতো নিজের মূর্খতাকে মালিকের আস্তাবলেই রাখতে চাইছিল, আর এখনও তাই চাইছে। দেশে স্বাধীনতার জন্য কতবার বড় বড় বলিদান সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত রূপে সংঘটিত হয়েছে, সেই বলিদান আর রাষ্ট্রের নবজাগরণের কারণে ইংরেজরা ভাবল যে, এখন দেশ শাসন করাটা খুব মূল্যবান কাজ হবে, যার জন্য আমাদের কাছে উপকরণ আর শক্তি কোনোটাই নেই। ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ বিপদের সংকেত দিয়েছিল এবং দেউলিয়া ব্রিটিশ সরকারকে তাড়াতাড়ি নিজেদের পোঁটলা বেঁধে ভারত ছাড়তে বাধ্য হতে হলো।

এটা কেমন করে হয় যে 'স্ট্রেথমোর'-এর ভারতীয়রা ১৫ আগস্ট পালন করতে উৎসাহিত হবে না? আমাদের ১৭ আগস্টের আগে বম্বে পৌঁছনো সম্ভব ছিল না, তাই সেই মহোৎসব দেশে নয় জাহাজে পালন করতে হতো। কিন্তু জাহাজে ভারত আর পাকিস্তান দুটোর নাগরিকই ছিল এবং যে মনোবৃত্তির জন্য এক দেশকে দুটো দেশ বানানো হয়েছিল তা সেখানেও মজুত ছিল, তাই মহোৎসব এমনভাবে পালন করা উচিত ছিল, যাতে ভারতীয় আর পাকিস্তানী দুজনেই সম্মিলিত হতে পারে। দুটো দেশের পতাকাই উড়তে দেওয়া হবে। ভারত আর পাকিস্তানের মহামন্ত্রীদের কাছে শুভ সংবাদ পাঠানো হোক, বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়ানো হোক, আর এর সঙ্গেই কিছু চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের প্রোগ্রাম করা হোক।

জাহাজে চড়ার দ্বিতীয় দিনেই মহোৎসব কমিটি বানানো হয়ে গিয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টাতেই ভারতীয়দের মধ্যে আমার কিছুটা বেশি পরিচিতি হয়তো রাশিয়া থেকে আসার কারণে হয়ে গিয়েছিল, তার পরিণাম এই হলো যে আমাকেও কমিটির মেম্বার বানানো হল—রাজনীতিক জীবনের বাইরে এই ধরনের সার্বজনিক পরিদর্শনের পদে থাকা আমি কখনো পছন্দ করতাম না।

৩ আগস্টে পরিচয় বাড়ার আরো এই ফল হলো যে, এখন আমি কিছু পড়তে পারতাম না আর যে অনুবাদের (গুলামান) আমি আবৃত্তি করতে চাইছিলাম, তাও হচ্ছিল না। বেশির ভাগ সময় কথাবার্তা বলতেই চলে যেত। পাকিস্তানের হিন্দুরা ভীত ছিল, তা আমাদের সঙ্গের যাত্রীদের কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল। এক সিন্ধী ব্যবসায়ী বলছিল, 'আমাদের পুঁজি তো তরল, তাই আমরা আমাদের হেড কোয়ার্টারকে ভারতে পরিবর্তিত করে দেব।' দেশের ভেতর পরাক্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনেক লোকের পরিচয় আছে। কিন্তু সিন্ধীদের সম্বন্ধে খুব কম লোকই জানে। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই

যেখানে সিন্ধী দোকানদার পৌঁছয়নি। বিপ্লবের আগে ওরা রাশিয়ার অনেক নগরেও ছিল, আর বাকুর সিন্ধী ব্যবসায়ীরা তো সেখানকার বড় জ্বালামাইকে নিজেদের শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়ে খুব জাগ্রত করে রেখেছিল। জ্বালামাই-এর মঠে সর্বদা ভারতীয় সাধুরা বসবাস করতো। অন্যান্য দেশে, জাপানকেই ধরুন বা কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া বা মিশর, আফ্রিকা আর উত্তর-দক্ষিণ, পশ্চিমের ভিন্ন-ভিন্ন দেশ, বা দক্ষিণ আমেরিকা—সব জায়গায় রেশমী তথা অন্যান্য ভালো ভালো কাপড়ের ব্যবসায়ী বলতে সিন্ধীদের অবশ্যই পাওয়া যাবে। এই ব্যবসায়ীদের বাড়ি করাচী, হায়দ্রাবাদ, শিকারপুরে, কিন্তু তারা দু-তিন বছর বাদে-বাদেই বাড়ি ফেরে। তারা নিজের গোমস্তা আর মুনীমদের নিজেদের দেশে নিয়ে যায়, যারা দেশের থেকে অনেক বেশি বেতন পায় এবং সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোর সুবিধেও, যদিও সব চাকুরেই ভবঘুরে প্রকৃতির হয় না। পাকিস্তানের কারখানায় যাদের পুঁজি কাজে লাগানো হয়েছে, সেই হিন্দুদের ভীষণ অসুবিধে ছিল, তারা খুব হয়রান হয়ে ছিল।

এখন জাহাজের হিন্দু-মুসলমানরা আসন্ন সংকটের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল না। তারা ভাবত, যেরকম কাগজ-কলমে সহজেই দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছিল সেইরকমভাবেই মানুষের মনের পরিবর্তন হয়ে যাবে। লাহোরের এক সর্দার সাহেব আমাদের সহযাত্রী ছিল। এখন সীমা কমিটি তাদের রিপোর্ট দেয়নি। কিন্তু তাদের পুরো বিশ্বাস ছিল, যে লাহোর পাকিস্তানের নয় ভারতই শেষ অব্দি পাবে, কারণ লাহোরে মুসলমানদের নয় অ-মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। আমি বললাম, 'কোনো একটা বড় ভূখণ্ড কোনো দেশে দ্বীপের মতন অন্য দেশের অধীনে থাকতে পারে না আর আপনারা এটা তো জানেন যে লাহোরের আশেপাশের গ্রামে মুসলমানই অধিক সংখ্যায় আছে।' এই কথায় সে বহু শিখদের মনোভাব প্রকাশ করে বলল, 'রক্ত-গঙ্গা বয়ে যাবে। যদি লাহোরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' আমার বক্তব্য হল, 'রক্ত-গঙ্গা বহে যেতে পারে। কিন্তু তার পরিণাম যা আপনি চাইছেন তা হবার নয়।' আসলে গত পঁচিশ বছরে যখন মুসলমান প্রধান পাঞ্জাবী এলাকায় হিন্দু আর শিখদের জন্য মূলের এক-চতুর্থাংশ সুদ আর দোকানদারীর ততটা সুবিধে গ্রামে-গঞ্জে ছিল না, আর সুবিধে ছিল না গ্রামবাসীদের জমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের করে নেওয়ার, তখন তারা পালিয়ে পালিয়ে শহরের দিকে আসতে থাকলো। তাদের লাহোরের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। আমি সর্বপ্রথম ১৯১৬-তে লাহোরে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমি যে লাহোর দেখেছিলাম, তার সঙ্গে ১৯৪৩-১৯৪৪-এর লাহোরের অনেক তফাৎ পেয়েছিলাম। শিখ হিন্দুদের দৌলতে শহর খুব বেড়ে উঠেছিল, আর রামনগর, কৃষ্ণনগর, সন্তনগরের মতো বহু লাহোরের বহু শাখানগর বসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেখানে মানুষ নিজেদের রোজগারের টাকা দিয়ে পাকা অট্টালিকা আর বাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তাদের নিজেদের ধনের আর শ্রমের মোহ ছিল, যার জন্য তাদের পুরো আশা ছিল যে লাহোরকে ইংরেজরা পাকিস্তানের হাতে দিয়ে দেবে না। তারা ভুলে যেত যে, ইংরেজ কোনো সৎ ইচ্ছার প্রেরণা পেয়ে ভারত পরিত্যাগ বা ভাগ-বাঁটোয়ারা করছে না। যদি ভাগ-বাঁটোয়ারার পরিণামস্বরূপ

দেশে রক্তের নদী বহে যায় তাহলে তারা খুশি হবে এবং বলবে, 'দেখেছ আমরা থাকতে দেশের কি হাল ছিল আর এখন বেরিয়ে চলে আসাতে কি হাল হলো।' ভারতে যত বেশি ঝগড়ার কারণ থেকে যায়, ততই ইংরেজরা খুশি হবে আর ততই ভারতের দুই দেশ নিজেদের পুরনো প্রভুদের খোশামোদ করতে তৈরি থাকবে। রাজ্যগুলোকে তারা এমন অবস্থায় রেখে গেছে, যার কারণে অনেক রকমের ভয় হচ্ছিল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের বিশ্বাস ছিল যে ছোট ছোট রাজ্যগুলো না হোক, কিন্তু হায়দ্রাবাদ, মহিশূর, ট্রাভানকোর, বরোদা, কাশ্মীরের মত ১৫-২০টি বড় বড় রাজ্য অবশ্য স্বাধীন রাজ্যের রূপ ধারণ করবে। আমি বলতাম—তা তখনি হবে যখন আমাদের বর্তমান শাসক-নেতাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যাবে। এখন এই পুতুল রাজা ইংরেজদের সঙ্গে গোলামির সন্ধি নিয়ে নাচানাচি করছে। ওরা ভাবছে, কোনো আদালতে যেমন জেতার জন্য কাগজে-কলমে প্রমাণই যথেষ্ট, সেই রকমই জাতিদের ভাগও কাগজের টুকরোয় চিরকালের জন্য বেচা-কেনা করা যায়। তারা জানে না যে, কামান যখন রক্ষা করার জন্য আর রইল না, তখন কাগজের টুকরো দিয়েও তা সম্পূর্ণ হবে না, বরং এখন বহুসংখ্যক নির্বাক প্রজার দ্বারাই ফয়সালা তার হবে। এখন এই লুকিয়ে থাকা শক্তিকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু যখন পুতুল-রাজা মহান মুঘলদের অনুকরণ করবে, তখন এই নগ্ন হাতের থাবা চারদিক থেকে খামচাতে উদ্যত হবে আর এদের জয়ের বদলে পরাজয় ঘটবে।

আমার বন্ধুদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের (সিন্ধ) শর্মাজীও ছিলেন। তিনি সাহসী ও উদার মানুষ ছিলেন। আফ্রিকার কোনো প্রান্তে তার বা তার মালিকের দোকান ছিল, ব্যবসার কাজেই তিনি লন্ডনে এসেছিলেন, এবং এখন ভারতে ফিরে যাচ্ছিলেন। ব্যবসায় কর আদায়কারীদের ধোঁকা দেওয়া আর চোরাবাজারী করা সাট্টাবাজীর মতো অধর্ম বলে মনে করা হয় না, তাই যে মানুষ এধরনের কাজ করে, তাকে আমরা জন্ম-সিদ্ধ অপরাধী মনে করতে পারি না। ওদের মধ্যে ভালো লোকও থাকতে পারে। বাজারে দেখা যায় যে, যদি আমরা অন্যের পথকে না মেনে নিই, তাহলে সর্বস্বান্ত হতে হবে। আর শুধু নিজেকে নয় নিজের পরিবারবর্গকেও না খাইয়ে মারা হবে। তাই সেটাও গতানুগতিক হয়ে যায়।

শর্মাজীর কাছে অনেকগুলো ট্যাঙ্কে খুব দামী রেশমের কাপড়-চোপড় ছিল। কাস্টমের লোক এগুলোর ওপর অনেক ট্যাক্স নেয়, তাই তার বড় চিন্তা ছিল যে কি ভাবে কাস্টমকে ঠকিয়ে নিজের জিনিসগুলো নামানো যায়। হতে পারে তার কাছে সোনাও আছে। আমাদের দেশে সোনার আমদানির ওপর বিরাট কর লাগিয়ে তাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্যবান করে তোলা হয়েছে, তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে সোনা আনাও একটা বড় লাভের ব্যবসা ছিল। শর্মাজীর সঙ্গে অনেক কথা হতো। হায়দ্রবাদে তার ঘর বাড়ি ছিল, যে-বাড়ির ওপর তার খুব একটা নজর ছিল না।

তৃতীয় দিন দুপুরের কাছাকাছি আমাদের জাহাজ জিব্রাল্টারকে পাশ কাটিয়ে গেল। সেই সময় আফ্রিকা আর ইওরোপ দুটোর দেশেরই তট আমাদের ডানদিকে আর বাঁদিকে ছিল। শর্মাজী জানালেন, 'জিব্রাল্টারে আমাদের সিন্ধীদের এক ডজনেরও বেশি দোকান

আছে।' আমার মনে পড়ছিল জিব্রাল্টারের আসল নাম জবরুত-তারিক (অর্থাৎ তারিক পর্বত) এর। জিব্রাল্টার একটা পাহাড়ের ধারে অবস্থিত, তাই আরব ভাষায় এর নাম জব্র হতে বাধ্য, কিন্তু তারিক কে ছিল? উমৈয়া খালিফাদের নামকরা রাজা তারিক, যে ইসলামের প্রচার তথা সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য তার এক অর্বুদ সেনার সঙ্গে আজ থেকে ১৬ শতাব্দী আগে এই জায়গায় আফ্রিকা থেকে ইউরোপের উদ্দেশে পা বাড়িয়ে সে নিজের নৌকোগুলো ভাঙতে ভাঙতে সৈনিকদের বলেছিল, 'জয় করো কিংবা মরো। এখন তোমার আর তৃতীয় রাস্তা নেই।' তার পরের পাঁচ-ছ শতাব্দীর মধ্যে স্পেন মুসলমানদের দেশ হয়ে গিয়েছিল, আর বিপদের ঠেলায় সমগ্র খ্রীস্টান-ইউরোপ নিজেদের মঙ্গল কামনা করছিল। উত্তর স্পেনের এক বড় যুদ্ধে খ্রীস্টান সেনা মুসলমান সেনাদের ভীষণভাবে পরাস্ত করলো, তার জন্যে ইসলাম ফ্রান্সের ভেতর ঢুকে গিয়ে এগোতে পারল না। সেই জবরুত-তারিককে নিজের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মহা অভিযানে ইংরেজরা স্পেন থেকে কেড়ে নিল আর তাদের বাণিজ্যিক পথের রক্ষায় তাকে এক সুদৃঢ় দুর্গ ও ব্যবসায়িক নগরের রূপ দিল। শত শত বছর কেটে গেল। বিংশ শতাব্দীতেও দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু ইংরেজদের থাবা জবরুত-তারিকের ওপর থেকে উঠলো না। সে অন্যান্য দেশের শব্দ আর নামের মত এর নাম বিকৃত করে জিব্রাল্টার বানিয়ে দিল। পূর্বে সুয়েজ আর পশ্চিমে জিব্রাল্টারকে নিজের হাতে রেখে ইংরেজ ভূমধ্যসাগরকে তাদের হ্রদ বানিয়ে রেখেছে। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ইউরোপের দেশ—স্পেন, ফ্রান্স, ইটালি, গ্রিস, তুর্ক মুখের দিকে তাকিয়েই থাকল, আর সেখানে প্রভাব খাটাচ্ছে ইংরেজ নৌ-সেনা। আমি ভাবছিলাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইংল্যান্ডকে দেউলিয়া করে দিয়েছিল। সে আমেরিকার দেওয়া টুকরোগুলো দিয়ে পেট চালাচ্ছিল, তাদের সমস্ত দুর্গ এখন আমেরিকার দুর্গ। এখন তো এটাও গর্বেরও কথা নয়, যখন ইংল্যান্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ইটালির পরে ফের ব্রিটেনকে আমেরিকার ৪৯তম রাজ্য বানানোর জন্য প্রস্তুত। যখন অব্দি অন্যের ওপর এই ধরনের জবরদস্তী দখল থাকবে, তখন অব্দি কি করে বিশ্বে শান্তি থাকতে পারে?

আমাদের জাহাজে এখন রেডিও থেকে টাইপ করা খবর পড়তে পাওয়া যেত। সেদিন জানতে পারলাম গান্ধীজী এর জন্য রাগ করেছে, যে ভারতের ডোমিনিয়ন থাকা পর্যন্ত জাতীয় পতাকার সঙ্গে ইউনিয়ন জ্যাক (ইংরেজদের পতাকা)-কে রাখার তার প্রস্তাব লোকেরা অগ্রাহ্য করেছে। এখন ভারতের সরকারি অট্টালিকাগুলোতে ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে না। আমি সেদিন লিখেছিলাম—'বুড়োকে বাটে ধরেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।' ৬০ বছর পার করলে কি শরীরের মতো মানুষের বুদ্ধিও ক্ষীণ হয়ে যায়? হতে পারে, অনেক সময়ই এ কথাটা সত্যিই ঘটে, কিন্তু বাটে ধরার আর একটা কারণও আছে—মানুষের সময়ের সঙ্গে এগিয়ে না যাওয়া। আমি পঁচিশ বছর আগে বাচ্চাকে ন্যাংটো দেখেছি, ২৫ বছর পরেও তাকে সেই রূপেই ভাবতে চাই। এটা বুঝি না যে এখন সে শিশু নয়। শরীর আর মস্তিষ্ক দুটোতেই সে এখন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। তরুণ হলে প্রত্যেকটা গ্রহণ করার মত নতুন জিনিসকে সে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তাই তাকে ৬০

বছরের বুড়োর থেকে বেশি সক্ষম মনে করা উচিত। সায়েন্সের বড় বড় আবিষ্কারের সম্বন্ধে আমরা এই কথার যাথার্থ্যকে ভালোভাবে জানি। আবিষ্কারকদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় তরুণদের পাওয়া যায়। যদি ৬০-এর দরজায় এসে পড়া প্রখর মস্তিষ্ক তরুণদের বুদ্ধিমত্তার ওপর বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়, আর সর্বদা নিজেই পথপ্রদর্শক হবার লালসা ছেড়ে ওদেরও পথ-প্রদর্শন করার আজ্ঞা দেয়, সেই পথে চলতে প্রস্তুত হয়, তাহলে কাউকেই ঘাটের ধরার দরকার হবে না।

মহোৎসবের জন্য চাঁদা জমানো হচ্ছিল। ৫ আগস্ট পর্যন্ত তা প্রায় ৮০ পাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। পাঞ্জাবের এক পেনশন-প্রাপক পোস্টমাস্টার জেনারেল ইংরেজ ভারতে ফিরছিলেন। বলছিলেন, 'ইংল্যান্ডে আমার পেনশন খরচের পক্ষে অপর্যাপ্ত, কারণ সেখানে জীবনোপযোগী জিনিস খুব চড়া দামের। তার ওপর আবার আমাদের ভারতে চাকর-বাকর রাখা অভ্যেস ছিল, আর ইংল্যান্ডে তা খুব খরচের। ট্যাকস্‌ও সেখানে খুব বেশি, যখন ভারত থেকে আসা পেনসনের ওপরই বেঁচে থাকতে হবে, তাহলে ভারতে ফিরে গিয়েই আরামে থাকি না কেন?' বৃদ্ধ ৭০ বছরের ছিলেন। খুব সুস্থ বলেও মনে হচ্ছিল না। তার ওপরে সংসারের বোঝাও ছিল না, তাই হিন্দুদের কাশীবাসের মত তিনি ভারতবাস করতে আসছিলেন। পাকিস্তানবাসে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ইংরেজরা যদিও হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বদা উৎসাহ দিয়ে এসেছে, কিন্তু নিজেদের মনে ভেতরে ভেতরে তারা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না। হয়তো এর পেছনে বহু শতাব্দী আগে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা কাজ করছিল, যখন ইসলামের গাজী আর খ্রীস্টানদের ক্রুসেডর ধর্মের নামে পরস্পরকে ওপর সব রকমের অত্যাচার করাকে উচিত বলে মনে করেছিল। উক্ত বৃদ্ধ-ইংরেজ যখন শুনলেন যে স্বাধীনতা মহোৎসবের জন্য চাঁদা জমা পড়েছে, তিনি নালিশ করলেন, 'আমার কাছে থেকে কেন চাঁদা চাইল না, আমি ভারতের নুন খেয়েছি আর জীবনের শেষ সময় আমি সেখানেই কাটানোর ইচ্ছা রাখি।' শেষ অব্দি বৃদ্ধ এক পাউণ্ড চাঁদা দিল। আমাদের জাহাজে তিনিই একলা এরকম পেনশন-প্রাপক ইংরেজ ছিলেন না, যিনি ভারতে শেষ জীবন কাটাতে আসছিলেন।

কমিটির প্রোগ্রাম ঠিক করার ছিল। সেখানে দুরকম ভাবধারার লোক ছিল। কিছু আমাদের পরিচিত শর্মাজীর মতো অনেকে পুরনো মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যাকে তারা শুদ্ধ ভারতীয়তা বলছিল, আর কিছু আলট্রা মডার্ন (চরম আধুনিকপন্থী) ছিল, যারা চাইছিল যে উৎসব এমন জাঁকজমক করে পালন করা হোক, যা দেখে ইউরোপীয় যাত্রীদের ওপর ভালো প্রভাব পড়ে। এ· ক্লাশে ইউরোপীয় যাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল। যেখানে আমাদের আলট্রা মডার্ন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা থাকতেন আর যাদের সঙ্গে তাদের সম্ভাষণ আর নৃত্য ইত্যাদি দিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। তারা ভাবত, যতক্ষণ মদ্যপান আর নাচ না হয়, ততক্ষণ অব্দি সভ্য দুনিয়ায় তাকে মহোৎসব বলে মানা যায় না। কমিটির কিছু লোক নিজেদের ইউরোপীয় বন্ধুদের মদ্যপান করাতে চাইছিল— টাকা পয়সার প্রশ্ন ছিল না, তারা হয়তো নিজের পকেট থেকে মদ কিনেও

পান করাতে পারতো; কিন্তু কিছু লোক মতের দিক থেকে এর বিরোধী ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল—গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, আমাদের গান্ধীবাদী-শাসক ধর্মের নামে মদ্যপান বন্ধের পক্ষপাতী, তাই এই মহোৎসবে মদ্যপান মহা পাপ। আমি জীবনে মদ্যপান করিনি, কিন্তু পান করাকে কোনো মহাপাপ বলে মনে করিনি, যেমন মনে করিনি মাংস খাওয়াকে। অসংযম সব জায়গায় খারাপ এই নিয়ম মদের ব্যাপারেও চালু করা যায়। আমাদের শর্মাজীকে অন্ধ পুরনোপন্থী বলা চলে না। নিজের যৌবন অবস্থা থেকে ৫০-৬০-এর মধ্যে পেছনো অব্দি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তিনিও মদ্যপান করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভাবতেন, এই পবিত্র মহোৎসবের সময় কমিটির দিক থেকে পানের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। ৫ আগস্ট এই নিয়ে খুব গরম-গরম আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তার ফয়সালা সেদিন হতে পারেনি।

৬ আগস্টে আমরা ভূমধ্য সাগরে ছিলাম। গরম খুব বেড়ে গিয়েছিল, বা হয়তো আমারই শুধু বেশি গরম লাগছিল। বি· ক্লাশের কেবিনগুলোকে ভেঙে মাচা বানানোর সময় তুলে ফেলা হয়নি, সেটাই ছিল মঙ্গল, তাই হাওয়ার পিচকারি ছড়িয়ে গিয়ে আমাদের প্রাণ দান করছিল। দিনেরবেলা এমনিতে ডেকে বসলে খোলা হাওয়া পাওয়া যেত, কিন্তু রাত্রিবেলাতে বায়ু-পাত্রই প্রাণাধার ছিল। খাবারের ব্যাপারে জাহাজের নিয়ম ছিল—সকালে বিছানায় চা, আটটায় প্রাতরাশ, একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন (লাঞ্চ), সাড়ে চারটের সময় রাত্রের আহার। খাবার-দাবার ভালোই ছিল বলা যায় আর তা পেট ভরা পাওয়া যেতো। ৬ তারিখে উৎসবের জন্য ৯০ পাউণ্ড চাঁদা হয়ে গিয়েছিল। সে দিনে অধিকাংশের মতে খাবারের সঙ্গে মদ সংযোজন করার প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছিল। এটাও ঠিক হলো, যে ভারতীয় নাবিকদের খাবার দেওয়া হবে আর বাচ্চাদের দেওয়া হবে মিষ্টি।

৬ তারিখে কিছু দ্বীপও যখন-তখন দেখা যাচ্ছিল। হ্যাঁ, কখনো-সখনো এক-আধটা জাহাজ উল্টোদিকে যেতে যেতে আমাদের দেখে ভেঁপু বাজাচ্ছিল। আমাদের সামনে তো বিস্তৃত নীল সাগর আর অনন্ত নীল আকাশই নজরে আসছিল। জগৎ আমাদের জাহাজেরও একটি জগৎ ছিল, যাকে আমরা এ· বি· ক্লাশের অধিকাংশ যাত্রীদের জন্য হাসিখুশির জগৎ বলতে পারি। আশিজন ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে বড় বড় আশা নিয়ে কেউ ডাক্তারী বা অন্য কোনো ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরছিল, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য আর কয়েকজন পর্যটন করে নিজের আনন্দের জীবন কাটিয়ে দেশে যাচ্ছিল।

৮ আগস্টেও আগের মতই আবহাওয়া ভালো ছিল, কিন্তু কোথাও ভূমির দর্শন পাওয়া যাচ্ছিল না। পরের দিন সকাল ছটায় আমাদের জাহাজ পৌঁছে মিশর দেশে এসে পড়লো। কমিটি ঠিক করেছিল, যে ভোজের সামগ্রী পোর্টসঈদ থেকে কিনবে। তার আগে জাহাজ দাঁড়াবার সেরকম কোনো স্থান ছিল না; যেখানে সব জিনিস সস্তায় এবং সহজে পাওয়া যাবে। 'স্ট্রেথমোর' খাঁড়ির মুখে এসে নোঙর ফেললো। আশেপাশে বহু দেশের জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলোর মধ্যে তুর্কি আর আমেরিকার বেশ কিছু জাহাজ

ছিল। কিছু নামার যাত্রী এখানে নেমে গেল। পর্যটকদের পাসপোর্টে মিশরের অফিসের ছাপ মারল আর আমাদের মতো তারাও পোর্টসঈদে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লো। পোর্টসঈদ আন্তর্জাতিক শহর। এটা যদিও আফ্রিকার উত্তর-পূর্বে স্থিত, কিন্তু এর উত্তরের দিকে ভূমধ্য সাগরের ওপারে ইউরোপ, আর এশিয়া তো এখানে আফ্রিকার সঙ্গে মিশে গেছে। একেই বাধা মনে করে সুয়েজ খাল বানানো হলো, যার সঙ্গে ভারত মহাসাগর বা আরব সাগর, লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগরকে মেলানো যায়। তিনটে মহাদ্বীপের মিলন-স্থান হওয়ায় তিন মহাদ্বীপের জাতিদের সমাগমের এটা স্থান, সেখানে তিনটে মহাদ্বীপেরই গুণ্ডা, গাঁটকাটা আর বেশ্যাদেরও একটা বড় আড্ডা স্থল। দিনের বেলাতেও অলি-গলিতে একলা বেরনো বিপদ মুক্ত নয়। আমাদের এক সহযাত্রী কোনো একটা গলি দিয়ে যাচ্ছিল। একটা শয়তান লোক তাকে 'হীরের' আংটি কিনতে বলল। তার সন্দেহ হলো, কিন্তু 'হীরে' বিক্রেতা ছুরি দেখিয়ে এক পাউন্ড দামের আংটি দিয়ে তার মাথায় চাঁটি মেরে চলে গেল। আরেকজন জোশী মশাইকেও ছোরা দেখানো হয়েছিল। ব্যাপার হলো, জাহাজ কয়েক ঘণ্টার জন্য দাঁড়ানোর কথা, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাও জাহাজ কোনো যাত্রীর জন্য নির্ধারিত সময়ের বেশি দাঁড়াতে পারবে না। যাত্রীরাও নিজেদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার জন্য দৃঢ় সংকল্প থাকে, তাই সে ছোরার জবাব না ছোরাতে দিতে পারে আর না পুলিশ তথা আদালতের শরণ নিতে পারে। এই দুর্বলতাকে পোর্টসঈদের গুণ্ডারা ভালোভাবেই জানতো। আমরা চারজন এক সঙ্গে শহরে ঘুরতে গেলাম। আড়াই ঘণ্টা অব্দি ঘুরতে থাকলাম। রমজানের মাস বলে রোজার দিন ছিল, কিন্তু ইসলামিক দেশে কারোরই সে চিন্তা ছিল না—সমস্ত রেস্তোরাই খোলা ছিল। গরম-গরম তন্দুরী রুটি বিক্রি হচ্ছিল। শাসক সে মুসলমান ধর্মযোদ্ধা হলেও, যে কোনো দেশে আর যে কোনো কালে ইসলামের সাধারণ নিয়মগুলোতে নিজেকে আটকে রাখা জরুরি মনে করে না। ইসলামের নামে ভারতের লক্ষ-লক্ষ লোকেদের রক্তস্রোত সৃষ্টিকারী, মন্দির আর নগর ধ্বংসকারী যে মহমুদ গজনীর, সে রাতের পর রাত মদের আসর জমাতো। আচ্ছা, শাসকদলের রোজা, নমাজ-এর অত শত নিয়মবদ্ধতার মধ্যে যাওয়ার কি দরকার? যদি তাদের দেখাদেখি এখন পোর্টসঈদ বা অন্য কোনো জায়গার মুসলমান জনতা রামজান কে বিদায় দেয়, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এখানে তো বহু উলঙ্গ আর অশ্লীল ছবিতে, মনে হয়, আইনসম্মতভাবেই ভালোই রোজগার হয়। অনেকে এই সব ছবিগুলোকে হাতে নিয়ে চুপিচুপি দেখিয়ে বিক্রি করছিল। তাতে কখনো-কখনো মানুষ খুব বাজে ভাবে ফেঁসে যায়। সিলোনের এক ভিক্ষু ইউরোপ থেকে ফিরছিলেন, তিনি এই ছবি কিনেছিলেন। যখন কলোম্বোয় জাহাজ থেকে নামলেন আর তাঁর জিনিসপত্র পরীক্ষা করা হলো, তখন সেই ছবিগুলো বের হলো। তার সঙ্গে খুব কুৎসিত ব্যবহার করা হলো। এর আগের ইউরোপ-যাত্রা থেকে যখন আমি ফিরছিলাম তখন এক চীনের ছাত্র এই ধরনের অনেক ছবি এখানে কিনেছিল। যখন আমি তাকে কলম্বোর সেই ঘটনা শোনালাম, তখন কোনো কিছুর পরোয়া না করে সে বলল, 'আমাদের বন্দরে কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।' বেশ্যা-নগরের দালালদের নিমন্ত্রণ

তো পদে-পদে ছিল—'খুব সুন্দর গ্রিক যুবতী আছে' বা অন্য কিছু বলে সেই রাস্তায় পথ দেখাতে ডজন-ডজন মানুষ ঘাটে মজুত ছিল।

আমি দেড় পাউণ্ডে একটা চামড়ার থলে-বাক্স কিনলাম। শর্মাজী হায়দ্রাবাদী আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাই দর-দাম করতে কোনো অসুবিধে হয়নি। দু-তিন পাউণ্ডের কাপড়-চোপড় আর কাগজ উৎসবের জন্য কেনা হলো, আর ১৯ পাউণ্ডের মিষ্টিও। এ রকমই আরো কিছু জিনিস কেনা হলো। ফিরে এসে জাহাজের দিকে যাবার সময় কাস্টম-এর লোকেরা পথ আগলে দাঁড়ালো। কেনা জিনিসগুলোর জন্য মোটা ট্যাক্স চাইছিল। হয়তো ১০-১৫ পাউণ্ড আরো খরচা করতে হতো। শর্মাজী বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, 'আমরা ভারতের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের দিনের জন্য এই সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছি।' কিন্তু আবেগভরা আবেদন যখন সফল হলো না, তখন তিনি আটকে রাখা হাতে দু-পাউণ্ড ধরিয়ে দিলেন এবং সমস্ত ঝুট-ঝামেলা মিটে গেল। জমা করা জিনিসগুলোকে তিনি আলাদা আলাদা করে ভাগ করেছিলেন আর বলেছিলেন, 'কিছু কিছু করে হাতে নিয়ে যাও।' কিছু কিছু করে নিয়ে আসতে আমাদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না, কিন্তু এই বাধা আসবে আমরা আগে বুঝিনি তাই অনেক লোক আগেই চলে এসেছিল। যা হোক, দু-পাউণ্ডে কাজ হয়ে গেল। পোর্টসঈদ আর তারপর সুয়েজখালের কাছাকাছির জায়াগুলো আমি দেখলাম, মিশরের লোক ইংরেজদের অতি নোঙরা-নোঙরা গালি-গালাজ করছে। এটা ১৯৫১-র শেষ নয়, ১৯৪৭-এর আগস্ট। সেই সময়ও মিশরের লোকেরা ইংরেজদেরকে তাদের বড় শত্রু বলে মনে করতো, আর নিজেদের ঝাল নোঙরা গালি-গালাজ দিয়ে মেটাতে চাইছিল। সুয়েজ খালে রাতেও যেখানে-সেখানে এই গালি-গালাজ, মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল—ঘৃণা প্রদর্শনের এটা একটা ভালো পথ তারা বার করেছিল। মিশরের মুসলমান মহিলাদের পর্দা ছিল, কিন্তু মুখের ওপর নাক আর ঢাকা চোখ খোলা রাখতে কাপড়ের জালি ব্যবহার করতো। এই জালির ভেতর দিয়ে তাদের ঠোঁট আর গালও দেখা যেতো। ইংল্যান্ডের তুলনায় পোর্টসঈদে জিনিসপত্র বেশি সস্তা ছিল। যে ব্যাগ আমি দেড় পাউণ্ডে নিয়েছিলাম, তা ইংল্যান্ডে চার-পাঁচ পাউণ্ডের কম নয়।

১০ আগস্ট 'স্ট্রেথমোর' লোহিত সাগর পাড়ি দিচ্ছিল। লোহিত সাগর শুনেছি সব সময়ই রেগে লাল হয়ে থাকে। নিজের যাত্রীদের কাবু করাই তার কাজ বলে মনে করে। এর আগের যাত্রায়ও আমার এরকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবারও যখন হাওয়া বইত, তখন ধড়ে প্রাণ আসতো, না হলে খুবই বিপর্যস্ত মনে হতো। সেদিন জানতে পারলাম, যে জাহাজের ক্যাপ্টেন ১৫ আগস্টের মহোৎসব পালনের প্রোগ্রামে স্বাধীনতার শহীদদের জন্য দু-মিনিট মৌন রাখতে অরাজি ছিল। তারপর আর কি, লোহিত সাগরের প্রভাব আমাদের লোকেদের ওপরও পড়েছিল। সবাই রেগে লাল।

১১ আগস্টও আমরা লোহিত সাগরেই ছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরতে থাকলো। হাওয়া একেবারে স্তব্ধ। যাত্রীরা হাওয়ার খোঁজে এক ডেক থেকে অন্য ডেকের দিকে ঘোরাফেরা করছিল। জেনে আনন্দ হলো যে কাপ্তেন পুরো প্রোগামই মেনে

নিয়েছে। সমস্ত ইংরেজদের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা জল বয়ে গেল। সবাই বিরোধ-প্রদর্শনের হরেক রকম পন্থা বার করছিল। ডেকের ওপর বসে ঘেমে নেয়ে কোনোক্রমে দিনের বেলাটা কাটলো, কিন্তু রাতে ঘামে ভাসতে থাকা শরীরের জন্য এখন সর্বশীতলা রাশিয়ার কথা মনে পড়ছিল।

১৩ আগস্ট আরব সাগরে পড়তেই তরঙ্গিত সমুদ্রে ভাসতে লাগলাম। বিনা হাওয়ায় সমুদ্র তরঙ্গিত হয়নি, কাজেই সেই হাওয়াই এখন গরম কমিয়ে দিল। ভূমধ্য রেখার কাছে গরমকালের জন্য হাওয়াও গরম থেকে পুরোপুরি রেহাই দিতে সমর্থ হয়নি।

১৪ আগস্ট সমুদ্র অসম্ভব তরঙ্গময় ছিল। কত লোক একেবারে ঢলে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মহোৎসবের দিন মঞ্চস্থ নাটক 'বিলেত থেকে ফিরেছি'-র পাত্র-পাত্রীও ছিল। তাড়াহুড়ো করে উৎসব কমিটিতে পরিবর্তন আনা হলো। কমিটির অধ্যক্ষা মহোদয়ার মতে সভ্যতার স্বরূপ সেটাই যথার্থ যা ইউরোপ দেখা যায়। এই ধরনের মতে সহমত হওয়া ভারতীয়দের পক্ষে মুশকিল ছিল—যারা বছরের পর বছর ইংল্যান্ডে বাস করে ফিরছিল। অতিথিদের মদ খাওয়ানোর চিন্তা যদিও বাতিল করা হয়েছিল, কিন্তু প্রোগ্রামে কমিটিকে না জিজ্ঞেস করেই নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিরোধিতার কোনো উচিত কারণ ছিল না—ভারতীয় নৃত্যে কোনো আপত্তি নেই আর ইউরোপীয় নৃত্যের প্রতি বিরোধ? এর মধ্যে কি তত্ত্ব ছিল? সমুদ্রে উদ্বেলিত হবার কারণে আজ অনেকে খেতে আসেনি। যারা খেতে এসেছিল, তাদের মধ্যেও কয়েকজনের বমি হয়েছিল। আমি অচল-অটল হয়ে রইলাম। সাড়ে তেইশ হাজার টন ভারি ওজনের 'স্ট্রেথমোর' উত্তাল তরঙ্গে কাগজের নৌকার মতো উঁচু-নীচু লাফাচ্ছিল—আমার দোলনায় দোলার আনন্দ হচ্ছিল, শুধু তাই নয়, আমি তরঙ্গের গতি মাপতে ডেকের পাশের রেলিংটা কাজে লাগাতে শুরু করলাম।

১৫ আগস্ট—শেষ অব্দি ১৫ আগস্টের দিন উপস্থিত, কিন্তু আজ তো উপরিতল অষ্টম রেলিং পর্যন্ত উঠেছিল। উৎসবের কাজ ভালোভাবে হতে পারছিল না। দাঁড়িয়ে থাকাও সবার মুশকিল ছিল, কেননা যখন জাহাজ একদিকে দাঁড়াবার উপক্রম করছিল, তখন লোকজন অন্যদিকে ঢলে পড়ছিল। যাহোক, উৎসব তো করতেই হতো। দশটার সময় পতাকা ওড়ানো হলো। চারদিকে ভারতীয় আর অভারতীয় যাত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। অধ্যক্ষা মহোদয়া ছদ্মনামে বম্বের এক ইংরেজি কাগজের অধ্যাপিকাও ছিলেন, তিনি মনে এলো বলে দিলেন। ভাষণের গুরুত্ব তো তাতে ছিলই না, পুরো ছুঁচো মার্কা ভাষণ ছিল। বাঁচোয়া এটাই যে হাওয়ার ঠেলায় ভাষণ পাঁচ-সাতজন লোক পেরিয়ে আর কারো কানে পৌঁছতে পারছিল না। পাকিস্তান আর ভারতের পতাকা দুজন ছোট-ছোট ভাই-বোন ওপরে ওড়ালো। ভারতের জাতীয় গান 'জনগণমন' হলো আর পাকিস্তানের 'পাকিস্তান হামারা'। শহীদদের স্মৃতিতে দু-মিনিটের মৌনও পালন করা হয়েছিল। ইকবালের লেখা পাকিস্তানের রাষ্ট্রগীতে—'চীন ও অরব হমারা, সারা জহাঁ হমারা।' 'তলবার কী সায়া মে হম পলে হ্যায়।' সব শেষে 'অল্লাহো অকবর'-এর মত পুরনো ইসলামীয় গাজীদের

স্লোগান গলা ফাটিয়ে বলা হলো—কতটা অন্তঃসার শূন্য কথা। জেহাদের নামে এক যুগে যদি ইসলামী গাজীরা বিশৃংখলিত কাফেরদের মধ্যে সাফল্য অর্জন করলেও শত শত বছর ধরে এক ইসলামিক দেশ পশ্চিমের কাফিরদের পায়ের তলায় দলিত হচ্ছে, এ কথাও সত্যি। জেহাদ-এর যুগ পার হয়েছে, এখন সায়েন্সের যুগ, কিন্তু পাকিস্তানী মুসলমান ভাবত যে তারা ইসলামী ছোরাবাজদের বলের দ্বারা পাকিস্তান কায়েম করেছে, আর জিন্না নিজের বুদ্ধির চমৎকারিতা দেখিয়ে পাকিস্তান তৈরি করতে সফল হয়েছে। তারা এটা মানতে রাজি ছিল না যে ইংরেজরা নিজেদের নাক কাটিয়ে অশুভ জিনিসের জন্ম দিতে পাকিস্তান বানিয়েছিল। যাই হোক, উৎসব সানন্দে সমাপ্ত হলো।

ছেলেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। লস্করদের পতাকাত্তোলনে না ডাকায় তারা মিষ্টি নিতে রাজি হলো না। 'লস্কর' একটা পারিভাষিক শব্দ, যা ইউরোপীয় জাহাজের ভারতীয় নাবিকদের জন্য উপযুক্ত। কোনো জাহাজ থেকে কাজ ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের এই জাহাজে করে দেশে পাঠানো হচ্ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ চাটগাঁ বা পাকিস্তানের লোক ছিল। জেনে-শুনে তাদের ডাকা হয়নি, তা নয়। সবাই জানতো যে অমুক সময়ে অমুক স্থানে পতাকাত্তোলন হবে। সবাই নিজে নিজেই চলে এসেছিল। লস্করা জানতে পারল যে, অন্যদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, আর তাদের করা হয়নি। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু তারা মানলো না।

সাড়ে চারটের সময় বাচ্চাদের 'ফ্যান্সি ড্রেস' হলো। দুটো ছেলে গান্ধী আর জিন্নার পোশাকে এলো। সবাই খুব বাহবা দিল। খাওয়া-দাওয়ায় বিশেষত্ব আনার জন্য জাহাজের লোকেরাও সহযোগিতা করলো। কিছু ভারতীয় রান্নাও বানানো হলো। রাত নটা থেকে মনারঞ্জনের অন্যান্য জিনিস অনুষ্ঠিত হলো। 'বিলেত থেকে ফিরেছি' নাটক হলো। কেউ আবার জাদু খেলাও দেখালো, কেউ অন্য কিছু। আমরা ভারত-ভূমি থেকে দুদিনের রাস্তা আরব সমুদ্রে ছিলাম, কিন্তু আমরাও এই মহান দিবস ভালোভাবে পালন করলাম।

পরের দিন (১৬ আগস্ট) জাহাজে থাকার সর্বশেষ দিন ছিল।

১৭ আগস্ট রোববার দিন এলো। সকাল দশটা থেকে ভারতীয় তট দেখা যেতে লাগলো, ৩৪-৩৫ মাস বাদে ফের আমি ভারত-ভূমির দর্শন করছিলাম। থেকে থেকে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল—এখন আমাদের মাতৃভূমি ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত।

বারোটার কাছাকাছি জাহাজ সমুদ্র তটে গিয়ে লাগলো। তার মানে মাতৃভূমি স্পর্শ হলো, তাই হৃদয় আহ্লাদে ভরপুর হয়ে উঠল। অফিসার এসে জাহাজের ওপরেই পাসপোর্টে সীলমোহরের ছাপ লাগিয়ে দিল। কাছে থাকা পাউণ্ডের থেকে কিছু ভাঙালাম। জাহাজের শেষ খাওয়াও শেষ। জাহাজের নীচে কয়েকজন কর্মী পতাকা নিয়ে ধ্বনি দিচ্ছিল। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম—হয়তো আদিল সায়েবের জন্য। আদিল সাহেব মজদুরদের নেতা ছিলেন, হয়তো কংগ্রেস বা সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আমার এটা খেয়াল হলো না, যে এটা

আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য হতে পারে। কিন্তু এখন ধ্বনির সঙ্গে 'কমরেড রাহুল'-এর নামও শোনা যাচ্ছিল, তখন তো আর আবিষ্কার করে কোনো লাভ হবে না। যে লোকেরা ১৭ দিন ধরে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসছিল তাদের এটুকুই জানা ছিল যে আমি লেনিনগ্রাদে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলাম। এখন ধ্বনিই জানিয়ে দিল—না, এ তো এক নেতা, যার জন্য বম্বের মজুররাও ধ্বনি দিচ্ছে। তখন তো অনেকই সহযাত্রী 'গুস্তাখী মাফ' জাতীয় কথা বলতে থাকলো। এটা তো আত্মগোপন করা নয়, যদি আমি বলি যে নিজেকে দেখাতে আমার ভালো লাগে না। একান্তে চুপচাপ কাজ করতে যতটা আনন্দ আমার হয়, প্রদর্শনে ঠিক ততটাই আমার চিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। আমার সহযাত্রীরা না ছিল ইন্ডোলোজির বিদ্বান, না ভাষাতত্ত্ব বা ইতিহাসের। তাদের যে সব জিজ্ঞাসা সোভিয়েত সম্বন্ধে ছিল, সবই বলতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম। আমি দুর্দান্ত মার্কসবাদী প্রচারক নই, যে সবাইকে কনভার্ট (মত পরিবর্তন) করার নেশায় ২৪ ঘণ্টা চুর হয়ে থাকবো। নিজের জীবনে আমার এরকম করার প্রয়োজনও এই জন্যে ছিল না, যে সময়ে-অসময়ে বলে যে কাজ হচ্ছিল না, তা আমার বই থেকে হচ্ছিল।

কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড মিরজাফর অধিকারী, রমেশ, ওমপ্রকাশ মঙ্গল, মহেন্দ্র আচার্য ইত্যাদি পুরনো বন্ধুরা জাহাজে উঠে দেখা করল। কেউ ভয় দেখালো যে কাস্টম-এর লোক বইগুলোর জন্য খুব বিরক্ত করবে। তাদের কথায় খুব একটা ভুল ছিল না, কিন্তু আমি ১৫ আগস্টের দু-দিন মাত্র পরেই এসেছি। ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক দিনের সামনে পুরনো কর্মকর্তারা ভীত ছিল। সত্যি সত্যিই সেই সময় যদি বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা হতো, তাহলে তার চেহারা অনেক বদলাতো, কিন্তু যখন পরে তারা নিজেদের মালিকদের আসল রূপ-রঙ দেখল তখন, 'বহী রফ্‌তার বেঢংগী, জো পহিলে থী সো অব ভী হ্যায়'[১]-কে স্বীকার করে নিল। আমার কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ রাশিয়ায় সংগৃহীত বই ছিল, যার মধ্যে কম্যুনিজম সম্বন্ধীয় দু-চারটেই মাত্র ছিল, বাকি বেশির ছিল ভাগ মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের সম্বন্ধে, তাও সেগুলো রুশ ভাষায় তাই কাস্টমের লোকরা কি জানে, তারা চাইলে বাধা দিতে পারতো। কিন্তু ১৫ আগস্টের ধুলোঝড়ের কারণে খুব সহজেই ছুটি পাওয়া গেল। মোটামুটি দেখলো, দু-একটা বাক্স তো খুললই না। হ্যাঁ, রেডিওর জন্যে ১৫০ টাকা ট্যাক্স অবশ্যই ধার্য করল। হয়তো তার মধ্যেই আমি ওইরকম রেডিও ভারতে পেতাম। কাস্টম থেকে ছুটি পেতে পেতে নিজের বাসস্থানে পৌঁছতে চারটে বাজল। আজও বম্বের রাস্তা-ঘাটে ১৫ আগস্টের প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছিল। মহোৎসবের দীপমালা দেওয়া হয়েছিল। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা আর ফুল-পাতা দিয়ে বানানো উৎসবের পতাকা উড়ছিল। আমারও নতুন ভারতে ফিরে আসার ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল।

[১]উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির বাংলা ভাষ্য—*সেই এলোমেলো চলন—আগে যা ছিল, আজও তাই।*—স·ম·